মনের স্বাস্থ্য ও মনের বিকার

শ্রীবিভুরঞ্জন গুহ, এম. এ.

প্রাক্তন অধ্যাপক: যোগমায়া দেবী কলেজ, কলিকাতা, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ ও গুরুচরণ কলেজ, শিলচর; শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা, শিক্ষায় পথিকৃৎ, অবাধ্য শিশু ও শিক্ষা সমস্যা, মানুষের মন ও শিক্ষা প্রসঙ্গ, সহজ তর্কবিদ্যা, মনোবিদ্যার রূপরেখা, সমাজ-দর্শন, নীতিবিদ্যার রূপরেখা, পাশ্চাত্ত্য দর্শনের রূপরেখা ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণেতা

নলেজ হোম

৫৯, বিধান সরণি (কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট)

কলিকাতা-৬

প্রকাশক :
শ্রীশান্তিকুমার মজুমদার, বি. এ.
নলেজ হোম
৫১, বিধান সরণি
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ শিল্পী :
সমীর রায়চৌধুরী

প্রথম প্রকাশ :
ী, ১৩৭২

দাম : বার টাকা মাত্র

মুদ্রণে :
শ্রীঅজিত কুমার সামই
ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১/১এ, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ পত্র

কল্যাণীয়া অধ্যাপিকা শান্তি দত্ত

সহোদরা সমানাসু

ভূমিকা

বর্তমান সভ্য জগৎ যে অভূতপূর্ব সংকটের মধ্য দিয়া চলিয়াছে, তাহাতে কি রাজনৈতিক, কি অর্থনৈতিক, কি আধ্যাত্মিক সকল দিক হইতেই মানুষের চিরাচরিত বিশ্বাসের ভিতগুলি যেন টলিয়া উঠিয়াছে। এই অস্থিরতা এবং অশান্তির চাপে মানুষ আপনাকে সুস্থ রাখিয়া জাগতিক ছন্দের তালে পা ফেলিয়া যদি সুসমভাবে বিকশিত হইতে না পারে, তবে আশ্চর্য্যের কিছু নাই। এইজন্য যে কোন শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে, বিশেষতঃ সকল শিক্ষাবিদের পক্ষে, মনের স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করা অবশ্যকর্তব্য। কোন্ পথে চলিলে ব্যক্তি সুষম সুপরিণত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হইতে পারে, তার নির্দেশ পাইতে হইলে, জানিতে হয় মানসিক অসুস্থতার কারণগুলি। পাশ্চাত্ত্য জগতের উপর দিয়া যুদ্ধ বিগ্রহের ঝড় অনেক বহিয়া গিয়াছে। হারানো সত্তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টাও ঐ দেশে অনেকদিন ধরিয়া সুরু হইয়াছে। আমাদের দেশে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান এখনও নবীন। বিশেষতঃ বাংলাভাষায় এ বিষয়ে কোন পুস্তক একেবারেই বিরল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমার প্রিয় ছাত্র অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিভূরঞ্জন গুহ তাঁর অভ্যস্ত প্রাঞ্জল ও মনোগ্রাহী ভাষায় এ বিষয়ে একখানা প্রামাণিক পুস্তক লিখিয়া বহুদিনের একটি অভাব দূর করিয়া বিদ্বজ্জনের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। জাতীয়-অধ্যাপক, শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় বলেন যে বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আলোচনা এবং বৈজ্ঞানিক বিষয় লইয়া গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি লেখা ও বক্তৃতা দেওয়া সম্ভব ও উচিত। মাতৃভাষায় শিক্ষা সহজ ও সরল হয়। মাতৃভাষায় শিক্ষা দিলে জ্ঞানানুরাগ বৃদ্ধি পায়, বোধশক্তিরও উন্নতি হয়। অধ্যাপক বসু মহাশয়ের কথায় এবং উপদেশে অনেক মনীষী অধ্যাপক উৎসাহিত হইয়াছেন। ইহাতে সুফলও আসিয়াছে। পূর্বে পাঠ্যতালিকাভুক্ত হওয়ার মত মনোবিজ্ঞানের আদর্শানুযায়ী পুস্তক বাংলা ভাষায় ছিল না। কিন্তু অল্প কয়েক বৎসরের ভিতর মনোবিজ্ঞানেরই অনেক সুন্দর সুন্দর পুস্তক বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীবিভূ রঞ্জন গুহ ও শ্রীমতী শান্তি দত্তের প্রণীত আরো দুইখানি মনোবিজ্ঞানের পুস্তক বি. এ. এবং বি, টি

পরীক্ষার্থীদের কাছে বিশেষ সমাদর পাইয়াছে। আমি আশা করি, তাঁর লিখিত "মনের স্বাস্থ্য ও মনের বিকার" বই খানিও বিশেষ সমাদৃত হইবে। তাঁহার লেখায় নিপুণতা আছে। তিনি অত্যন্ত জটিল ও কঠিন বিষয় কিভাবে প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া প্রকাশ করিতে হয় তাহার কৌশলটি জানেন। তিনি অতি সহজ ও সরল ভাষায় মনের সুস্থতা ও বিকার সম্বন্ধে এই বইখানার ভিতরে যেরূপ যুক্তিযুক্ত বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছেন তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। বইখানা তাহার গভীর জ্ঞানের ও বাংলা ভাষার উপর তাঁহার নিঃসংশয় অধিকারের পরিচায়ক। মনোবিজ্ঞানে এরূপ তথ্যপূর্ণ অথচ সুখপাঠ্য পুস্তক বিরল। ছাত্রছাত্রীরা এই পুস্তক পাঠ করিয়া বিশেষ উপকৃত হইবে। এরূপ পুস্তকের সমাদর নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

কলিকাতা
১৪ই নভেম্বর, ১৯৬৫

শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় [এম. এ ; পি. আর. এস ; এফ. এন. আই ; এফ. এ. এস।]
অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক সায়েন্স কলেজ এক্স-পেরিমেণ্টাল্ সাইকোলজী বিভাগ (C.S.I.R.)

নিবেদন

সুস্থ দেহ যেমন সকল মানুষেরই কাম্য, সুস্থ শান্ত সতেজ মনও তেমনি কাম্য। দেহের স্বাস্থ্য যেমন আকস্মিক নয়, মনের স্বাস্থ্যও তেমনি সম্পূর্ণ বিধিদত্ত নয়। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে মনের নানা রোগ ও বিকৃতি ক্রমেই বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সে সব দেশের মানুষ দৈবে বিশ্বাসী নয়, বিজ্ঞানের শক্তিতে, মানুষের শক্তিতে বিশ্বাসী। তাই সে সব দেশ এ সমস্যার প্রকৃতি-নির্ণয়, কারণ-বিশ্লেষণ ও নিবারণের উপায় নির্ধারণের জন্য নিরলস-ভাবে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের ভিত্তিতে একটি নূতন বিজ্ঞান গড়িয়া তুলিয়াছেন। এ বিজ্ঞানের নাম দেওয়া হইয়াছে মনঃস্বাস্থ্যবিজ্ঞান বা মেণ্টাল্ হাইজীন্। সে দেশে শুধু উচ্চতর শিক্ষার কেন্দ্রেই কেবল মাত্র এ বিজ্ঞানের চর্চা সীমিত নয়, বিদ্যালয় স্তরেও ইহা একটি অবশ্যপাঠ্য বিষয়। বাস্তবিক পক্ষে ইহা এমনই একটি বিষয় যে, সকল মানুষেরই ইহাতে আগ্রহ আছে অন্ততঃ দেশের চিন্তাশীল সমস্ত শিক্ষাবিদ্ই মনে করেন যে, মন কি করিয়া সুস্থ রাখা যায়, মনের নানা রোগ বা বিকৃতি কেন হয়, কি ইহার প্রতিকার, এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দ্বারা আহৃত সাধারণ জ্ঞান সমস্ত কিশোর ও যুবকদেরই শিক্ষাদান অবশ্য কর্তব্য। কারণ, কোন দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সে দেশের সর্বাঙ্গীন সুস্থ সতেজ বুদ্ধিমান মানুষ। তাহারা দেহে-মনে যদি সুস্থ ও সবল থাকে, তবেই দেশের দ্রুত উন্নতি সম্ভবপর। তাই দেশের জনসাধারণের মধ্যেও মনের স্বাস্থ্যবিধি শিক্ষাদানের উদ্যোগ সমস্ত সভ্য ও অগ্রসর দেশে আছে। এই কথাটিও দেহ ও মনের সমস্ত চিকিৎসকই জানেন যে রোগের চিকিৎসার চেয়ে রোগের নিবারণই বেশী বুদ্ধিমানের কাজ, তাই পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে মনঃস্বাস্থ্য বিজ্ঞানের অসাধারণ গুরুত্ব সম্পূর্ণ স্বীকৃত।

মানসিক রোগ ও বিকৃতির সমস্যা আমাদের দেশে সে সব দেশের মত ভয়াবহ আকার ধারণ না করিলেও, সমাজের ক্রমবর্ধমান জটিলতা এবং অর্থনৈতিক দুঃসহ চাপের ফলে এ সমস্যা ক্রমেই উদ্বেগের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এবং তাহারই স্বীকৃতি স্বরূপ মনঃস্বাস্থ্যবিজ্ঞান স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে, শিক্ষকশিক্ষণ ও ফলিত মনোবিদ্যার ছাত্রদের জন্য একটি

বিষয়রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং মনের সুস্থতা ও অসুস্থতা বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রামাণ্য পুস্তক রচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। ইতিপূর্বে মাতৃভাষায় এই জাতীয় পুস্তক কেহ লিখিয়াছেন বলিয়া জানা নাই। যদিও এ বিষয়ে বহুদিন যাবৎ আগ্রহ বোধ করিয়াছি এবং এই বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ 'অবাধ্য শিশু ও শিক্ষাসমস্যা', 'মানুষের মন ও শিক্ষাপ্রসঙ্গ' পুস্তকে ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে, তথাপি এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দিতে দ্বিধাবোধ করিয়াছি। তাহার কারণ নিজের এ বিষয়ে যোগ্যতার অভাব সম্পর্কে আমি সচেতন। আমি চিকিৎসক নই, মনোবিদ্যা বিষয়েও আমি বিশেষজ্ঞতা দাবী করিতে পারি না। তথাপি আমার আত্মীয়া অধ্যাপিকা শ্রীমতীশান্তি দত্ত এম এ, এম এড্, (লণ্ডন)—বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান পরিদর্শিকা—যখন আমাকে ভরসা দেন যে তাঁহার এ বিষয়ের উপর সংগৃহীত পুস্তকাদি এবং সযত্নে প্রস্তুতকৃত 'নোটস্' ইত্যাদি দিয়া আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিবেন, তখনই সাহস করিয়া এ বিষয়ে নিয়মিত পড়াশুনা করিতে আরম্ভ করি। বাস্তবিক পক্ষে এই পুস্তকের কোন কোন অধ্যায়ে আমি তাঁহার 'নোটস্'-এর উপরই বিশেষভাবে নির্ভর করিয়াছি। প্রকাশক শ্রীশান্তিকুমার মজুমদার মহাশয়ও আমাকে তাগিদ দিতে থাকেন এবং পুস্তক সংগ্রহ করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দেন। ইহাই পুস্তকখানা রচনার সূচনা। কিন্তু কাজ আরম্ভ করিয়াই অনুভব করিতে থাকি এই বিজ্ঞানের বিপুল পরিধি। যাহা হউক পরীক্ষার্থী ছাত্রের মতই এই বিষয় সম্পর্কে স্বদেশী ও বিদেশী পুঁথিপত্র প্রবন্ধ যখন যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা পড়িয়া বুঝিতে ও রস গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। বাস্তবিক এই বিষয়ের বিভিন্ন দিকের আলোচনা এতই হৃদয়গ্রাহী যে ইহার যে কোন একটি দিক লইয়াই সমস্ত জীবন কাটাইয়া দেওয়া যায়। এ সমস্ত বিভিন্ন সূত্র হইতে অকৃপণ ভাবেই উপাদান সংগ্রহ করিয়াছি এবং যথাস্থানে ঋণ স্বীকার করিয়াছি। এই বিষয়ের আলোচনা বহু বিরুদ্ধ ও বিপরীত মতামত দ্বারা কণ্টকাকীর্ণ। সর্বত্রই বিভিন্ন মতগুলি যথোচিত শ্রদ্ধার সহিত অনুধাবন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু সর্বত্রই নিজের জ্ঞানবুদ্ধি মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি। এ বিষয়ে সমস্ত ভুলত্রুটির দায়িত্ব আমার—নিজ অক্ষমতাবশতঃ যদি কোথায়ও বিষয়বস্তুকে যথেষ্ট পরিষ্কার করিয়া তুলিয়া ধরিতে অক্ষম হইয়া থাকি, তবে সেজন্য নিন্দাও আমারই প্রাপ্য।

এই পুস্তক রচনায় বিদেশী প্রামাণ্য গ্রন্থগুলির উপরই প্রায় সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়াছি। হয়তো আমাদের বর্তমান অবস্থায় ইহা অনিবার্য। কারণ আমাদের দেশে এ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা এখন পর্যন্ত যৎসামান্য হইয়াছে এবং মানসিক রোগ চিকিৎসালয়গুলিতে চিকিৎসিত রোগীদের সম্পর্কে তথ্য ভিত্তিক আলোচনা (case history) জানিবার সুযোগ পাই নাই। নিজের দৈহিক অপটুতা এবং পরিচিতের গণ্ডীর সংকীর্ণতাই ইহার জন্য বিশেষ-ভাবে দায়ী। যখন পুস্তকের ছাপা প্রায় সমাপ্ত হইয়া আসিয়াছে, তখন দৈবাৎ সুলেখক শ্রীরামেন্দ্র দেশমুখ্যের সঙ্গে পরিচয়। তাঁহার সহৃদয় জীবন্ত উৎসাহ আমার লেখক জীবনের একটি সম্পদ। তাঁহার মাধ্যমেই আর একজন মহানুভব শিশুচিকিৎসক ডাঃ বি. এন্. রায়. এম, বি ; এফ. আর. সি. এস্ এর সঙ্গে পরিচয় ঘটে। তিনি এবং তাঁহার সেবাব্রতী সহকর্মীরা জড়বুদ্ধি, বিকলাঙ্গ এবং অব্যবস্থিত শিশুদের চিকিৎসা ও শিক্ষার জন্য অলোকেন্দু বোধ নিকেতন নামে যে সুন্দর সেবা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালাইতেছেন তাহা পরিদর্শন করিয়া এ জাতীয় শিশুদের বাস্তব সমস্যা সম্পর্কে কিছুটা বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করিবার সুযোগ পাই, যাহা আমার পক্ষে খুবই প্রয়োজন ছিল। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত মনস্তত্ত্ববিদ্ শ্রীশশী রায়, শ্রীমতী শিপ্রা দত্ত এবং প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী দীপা রায়ের সঙ্গে এ সব সমস্যা বিষয়ে আলোচনা করিয়া কিছু কিছু নূতন তথ্য জানিতে পারিয়াছি। ইহাদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

যাঁহারা বই-পুস্তক সংগ্রহ করিয়া দিয়া এবং নানা বিষয়ে আলোচনা দ্বারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীবিমান কুমার বসু, অধ্যাপক ভুজঙ্গ ভূষণ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক বিধুভূষণ ঘোষ এবং অধ্যাপিকা প্রতিভা আচার্যের নিকট আমি বিশেষ ভাবে ঋণী। পাণ্ডুলিপি অবস্থায় এ পুস্তকের বহু প্রবন্ধ সম্বন্ধে শ্রীমতি রাধারানী সেন ও শ্রীমতী সুনন্দা ঘোষের সঙ্গে আলোচনা করিয়া অনেক ক্ষেত্রে আমার চিন্তাকে স্পষ্টতর করিতে পারিয়াছি এঁদের আন্তরিক আশীর্বাদ জানাই। ডাঃ মীরা বেরী (অরোরা) ও ডাঃ অনিলকুমার বসু শারীরতত্ত্ব ও চিকিৎসা বিষয়ক আমার নানা প্রশ্নের সুসমাধান করিয়া আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। ফরাসী নামের উচ্চারণ এবং ফরাসী পুস্তক হইতে উদ্ধৃতির অনুবাদ বিষয়ে আমি

অধ্যাপিকা শ্রীমতী স্বর্ণা দাসের নিকট হইতে সর্বদা সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। ইহাদের সকলের কল্যাণ কামনা করি।

যাঁহারা কাছে এবং নিকট হইতে তাঁহাদের প্রীতি, শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা ও উৎসাহ দিয়া আমাতে শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন এবং যাঁহারা আমার এই পুস্তক সম্বন্ধে অবিরত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া ক্লান্তি ও নিরাশা অপনোদন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক মহীতোষ রায় চৌধুরী, শ্রীমতী সুমিত্রা বসু, শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, শ্রীমতী মিঠু চৌধুরী, অধ্যাপিকা অলকা রায় চৌধুরী, অধ্যাপিকা অপরাজিতা, শ্রীমতী মমতা চৌধুরী, অধ্যাপক মতিলাল মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শংকরী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী অঞ্জলি মিত্র, অধ্যাপিকা সুব্রতা বসু, অধ্যাপিকা রত্না সেন, শ্রীমতী চিন্ময়ী বসু, অধ্যাপিকা উমানাথ, অধ্যাপক মনমোহন চক্রবর্তী, অধ্যক্ষা নলিনী দাশ, শ্রীমতী পার্বতী মুখার্জি, অধ্যাপক দুর্গেশ দাশ, শ্রীজগদীশ দাশ, শ্রীমতী সুরুচি দাশ, শ্রীমতী লীনা নন্দী, শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী বসু, শ্রীমতী ভারতী গুহ, শ্রীমতী মুক্তি গুহ, শ্রীমতী কৃষ্ণা গুহ, শ্রীদেবব্রত ঘোষ অধ্যাপক গোপিকা কান্ত দত্ত, অধ্যাপিকা অনীতা বসু, শ্রীমতী সুশীলা গুহ, প্রফুল্ল চন্দ, শ্রীমতি কণা সেন ও সদাশিব সেনগুপ্তের নাম প্রীতি ও আনন্দের সহিত স্মরণ করি। নলেজ হোমের প্রুফ রিডার ও অন্যান্য কর্মীদের নিকট, বিশেষতঃ শ্রীমাখন লাল দত্ত মহাশয়ের অনলস সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

আমার শিক্ষক, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ চন্দ্র মুখার্জি এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া প্রাক্তন ছাত্রের প্রতি তাঁহার আশীর্বাদ জানাইয়াছেন। শুধুমাত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ দ্বারা এ ঋণ শোধ হইবার নহে। এই পুস্তকের কয়েকটি অধ্যায় ইতিপূর্বে শিক্ষক, বসুধারা, জনসেবক ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। বিভিন্ন সময়ে প্রবন্ধগুলি রচিত হইয়াছে। সুতরাং কোন কোন ক্ষেত্রে পুনরুক্তি দোষ ঘটিয়াছে।

ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস যথোচিত যত্নের সঙ্গে এই পুস্তক ছাপাইয়াছেন। কিন্তু স্কুলের বই ছাপানো বিষয়ে তাঁহারা অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় এই পুস্তকের ছাপা তিন মাসের উপর বিলম্বিত হইয়াছে। এজন্য সকলের নিকট আমি মার্জনা ভিক্ষা করিতেছি।

এই পুস্তক প্রণয়নে যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়াছি। যদি ইহা দ্বারা দেশের ছাত্রছাত্রী শিক্ষক ও জনসাধারণের এ বিষয়ে আগ্রহ বর্ধিত হয় এবং তাঁহারা কিছু মাত্রও উপকৃত হন, তবেই আমার পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব।

বিনীত

বিভুরঞ্জন গুহ

৭ জে, এস আর দাশ রোড্
কলিকাতা-২৬
ফোন নং—৪৬-৮৯৩৯

শ্রীপঞ্চমী, ১৩৭২

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

মনের স্বাস্থ্য

মানুষের কত রকমের যে বাতিক আছে তার ইয়ত্তা নেই। এক ভদ্রলোক আছেন, যিনি পশ্চিমমুখো হয়ে কখনো বসেন না; আর একজনের ধারণা তাঁর হৃদ্‌পিণ্ডটায় একটা ফুটো আছে, আর একজন সারাদিনই চেঁচাচ্ছেন 'সব যাক'। কোন উচ্চতম শিক্ষিতা এক মহিলা, তাঁর বাতিক কানের নিচে চুনের ফোঁটা দেওয়া—ওতে নাকি সব ব্যথা-বেদনা সারে, হজম ভাল হয়। আবার আর এক মহিলার কোন জিনিস ছোঁয়ার পরই হাত ধোওয়া চাই। কারো আছে সন্দেহ-বাই—বৌ যদি অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে কথা বলেছেন তো সর্বনাশ! কারো কারো আছে বিনা প্রয়োজনে চুরি করা।

'মানুষের' এসব বাতিকের কথা শুনে আমরা হাসি। কিন্তু আমরা ভুলে যাই আমাদের প্রত্যেকেরই অল্পবিস্তর কোন না কোন 'বাই' আছে। এর মধ্যে কতকগুলো আছে নির্দোষ, অথচ অন্যের কাছে কিছুটা কৌতুকপ্রদ বা বিরক্তিকর। যেমন ধরুন, একজন সহৃদয় সুপরিচিত চিকিৎসক আছেন, যিনি কোন একটা বিষয়ে চিন্তা করতে গেলেই চট্‌চট্‌ করে নিজের ডান কানটা মোচড়াতে থাকেন। আবার কতক বাতিক আছে যা গভীর মানসিক বিকৃতি বা রোগের পরিচায়ক—যেমন পাগলা গারদের এক রোগীর ধারণা তার সম্পত্তির লোভে ডাক্তার-নার্স সবাই তার খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেয়। কতকগুলো বাতিকের মূল সম্ভবত জন্মগত, কতকগুলো অভ্যাসগত, কতকগুলো মানসিক সংঘাতজনিত।

বাতিক ছাড়াও আরো হাজারো রকম মানসিক বিকার আছে। সবই মনের 'অস্বাভাবিক' অবস্থা বা পরিণতি। সম্পূর্ণ 'স্বাভাবিক' কোন মানুষ আছে কিনা সন্দেহ, তবুও মানসিক বিকারের আলোচনার শুরুতেই, 'স্বাভাবিক' বা 'মানসিক সুস্থ' অবস্থা কাকে বলে তার একটা সংজ্ঞা অবশ্যই দরকার।

দেহের স্বাস্থ্যের সঙ্গে তুলনা করে মনের স্বাস্থ্যের প্রকৃতি-নির্ণয় করা যেতে পারে। দেহের কতকগুলি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে। সেগুলি সবলভাবে, সম্মিলিত-

ভাবে সমগ্র জীবটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে যদি কাজ করে, তবেই আমরা বলি প্রাণীটি সুস্থ। যার কোন অঙ্গ অপুষ্ট রয়ে গেল, সে তো বিকল। চোখ দিয়ে ভালো যদি দেখতে না পাই, যদি রসক্ষরা গ্রন্থি থেকে ক্ষরণ যথেষ্ট না হয়, তা হলে সে দেহ নিশ্চয়ই সুস্থ নয়। কিন্তু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রত্যেকটি পুষ্ট হয়েও যদি তারা পরস্পর সহযোগী না হয়, কোন একটা অঙ্গ অন্যের তুলনায় যদি বেশী পুষ্ট বা সক্রিয় হয়, তা হলে তা-ও স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। সেখানে পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষে প্রাণীর জীবনীশক্তির সুষ্ঠু ও সমন্বিত বিকাশ হতে পারে না। এ-ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থা।

শিশুর মনও তেমনি কতকগুলি আকাঙ্ক্ষা, আবেগ, সংস্কারবোধ, ইচ্ছা ইত্যাদির সমষ্টি। শিশু ভালবাসা চায়, সে নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়াচাড়া করতে চায়, ভাঙতে চায়, গড়তে চায়, বুঝতে চায়। এই বৃত্তি- ও সংস্কারগুলির সম্যক বিকাশ ও পুষ্টি প্রয়োজন। যার বুদ্ধি উপযুক্ত বিকশিত হল না, সে নির্বোধ বলে উপহসিত হবে। আবার বৃত্তি, ইচ্ছা, আবেগ, বুদ্ধির সমন্বয়ও হওয়া চাই। যদি বিভিন্ন আবেগ ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কঠিন সংঘর্ষ থাকে তবে সে শিশু অস্থিরমতি, বিষণ্ণ, অসামাজিক, কলহপরায়ণ, অসন্তুষ্টচিত্ত হতে পারে। সমগ্র ব্যক্তিত্বের সুসমঞ্জস বিকাশের কাজে যেখানে শিশুর বৃত্তি, আবেগ, বুদ্ধি সহজ সহযোগিতায় মিলিত হয়, সেখানেই বলি সে মানসিক সুস্থ।

অধিকাংশ মানুষ মানসিক অসুস্থ। মনোবিজ্ঞানীদের মতে এর কারণ অধিকাংশ মানুষের শৈশবে বোধ, বৃত্তি, আবেগ, আকাঙ্ক্ষার সহজ সুসমন্বিত বিকাশ ঘটে নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের শৈশব থেকেই তারা সংঘাত ও সংঘর্ষের বীজ অন্তরে বহন করে গড়ে উঠেছে। এর ফলে ব্যক্তিত্ব বিভক্ত, দ্বিধাগ্রস্ত, এমন কি বিপর্যস্তও হতে পারে।

তা ছাড়া মানুষ সামাজিক জীব। তার দেহ ও মনের সুষ্ঠু বিকাশ সামাজিক প্রভাবের ওপর অনেকটা নির্ভরশীল। কাজেই সামাজিক আদর্শ, রুচি ও প্রচলিত আচারের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পারলে সমাজের সঙ্গে তার সংঘাত ঘটতে পারে এবং তার দ্বারাও তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ব্যাহত বা বিকৃত হতে পারে। সুতরাং ব্যক্তির মানসিক সুস্থতা নিজস্ব প্রবৃত্তি, সংস্কার ইত্যাদির সমন্বয়ের ওপর যেমন নির্ভর করে, তেমনি তা সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যের ওপরও নির্ভরশীল।

কাজেই হ্যাডফিল্ড পূর্ণতর সংজ্ঞা দিয়েছেন—"সমগ্র ব্যক্তিত্বের সুষম

বিকাশের সাধারণ উদ্দেশ্যে পরিচালিত আমাদের জন্মগত ও আয়ত্তীকৃত সমস্ত শক্তি ও সম্ভাবনার সামঞ্জস্যই হল মানসিক সুস্থতার লক্ষণ।"[১]

মানুষ শুধুমাত্র অন্ধ সংস্কার- বা আবেগ-চালিত জীব নয়। তার বুদ্ধি,বিবেচনা, বিচার আছে। কাজেই তার সমগ্র ব্যক্তিত্বের বিকাশ কতকগুলি আদর্শ- ও উদ্দেশ্য-অনুসারী হয়। কিন্তু সব উদ্দেশ্য ও আদর্শ ব্যক্তিত্বের সমগ্র ও সুষম বিকাশের পক্ষে সমান কার্যকরী নয়। যেমন ধরা যাক, অর্থের আকাঙ্ক্ষা। মানুষের কার্যোদ্যমকে উদ্দীপ্ত করে তোলবার পক্ষে এ উদ্দেশ্য যথেষ্ট কার্যকরী। কিন্তু এ আকাঙ্ক্ষা যদি তার সেবাপরায়ণতা, মানবপ্রীতি ইত্যাদি আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করে দেয়, যদি তা মানুষের মানসিক স্থৈর্য ও শান্তি বিনষ্ট করে, তবে এ আদর্শকে মানসিক সুস্থতার সহায়ক বলা যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বলা যায়, আমাদের বিচ্ছিন্ন মুহূর্তের বিশৃঙ্খল আকাঙ্ক্ষাগুলি আমাদের সমগ্র ও সুষম ব্যক্তিত্বকে খণ্ডিত করে, বিকৃত করে। তাই অধিকাংশ মানুষই কম-বেশী মানসিক অসুস্থ। মানুষের জন্মগত সবগুলি সংস্কারেরই ব্যক্তিত্ব-বিকাশের উপাদান হিসাবে স্থান আছে। কোন আকাঙ্ক্ষা বা আবেগই হীন বা নিন্দনীয় নয়। প্রত্যেকেরই প্রয়োজন আছে। যখন কোন আকাঙ্ক্ষা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য-সাধনের সহায়ক হয়, যখন তা নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন না করে, যখন তা জীবনের অন্যান্য আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সংঘর্ষ সৃষ্টি না করে সুসমঞ্জস ব্যক্তিত্ব-গঠনের পথে নিয়ে যায়, তখনই তার উপযুক্ত মূল্য আছে। বাইবেলের এই উপদেশ "Render unto Caesar what is due to Caesar", শুধু রাজনৈতিক উপদেশ নয়, সমাজবিদ্যা ও মনোবিদ্যার উপদেশও বটে। যে মানুষ আত্মদ্বন্দ্বে লিপ্ত, যে আত্মসর্বস্ব মানুষ 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' নিজ ইচ্ছা ও প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না, তার পক্ষে মানসিক শান্তি আশা করা বৃথা। টেনিসন্-এর 'ইউলিসিস' জাগ্রত যৌবনের আদর্শ—সে চায় অনলস আগ্রহে নতুনকে জানতে, দুর্গমকে জয় করতে—"to strive, to seek, to find and not to yield"। এ আদর্শের মধ্যে একটা অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ আছে। কিন্তু তথাপি এ আদর্শ সুষম সুস্থ জীবনের আদর্শ নয়—এ আদর্শ

১, The full and free expression of all our native and acquired potentialities in harmony with one another by being directed towards a common end or aim of the personality as a whole. J. A. Hadfield—Psychology and Mental Health, p. 14

সাময়িক—সামগ্রিক নয়। ভারতবর্ষও যুবশক্তিকে আহ্বান করে বলেছে, 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত'। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়—তারপর তাই বলা হয়েছে, 'প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'। মানসিক সুস্থতার এই সত্য আদর্শ—সমগ্র ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু কল্যাণকর বিকাশ।

মানসিক স্বাস্থ্যের এই আদর্শ নঙার্থক নয়। একথা ঠিক নয় যে, যার বাতিক নেই, অস্বস্তি নেই, সে-ই মানসিক সুস্থ। এই সুস্থতা একটি সদর্থক আদর্শ—সম্পূর্ণ ও সুষম বিকাশের আদর্শ। এ আদর্শ স্থিতিশীল নয়—গতিশীল ও জীবন্ত। এ আদর্শ একটা স্থির অবস্থা নয়—ক্রমপরিপূর্ণতা ও পরিণতি ("it is not stagnation, but a harmony of movement, living and active.")।

মানসিক স্বাস্থ্যের বিশুদ্ধ আদর্শ সকলের জন্যে এক হলেও, ব্যক্তিত্বের বিভিন্নতা আছে বলে এর উপাদান ও পরিণতির প্রক্রিয়া এক নয়। কোন মানুষ অনুভূতিপ্রবণ, স্নেহশীল, কোমল ও সেবাপরায়ণ; আর একজন যুক্তিবাদী, কঠোর কর্তব্যপরায়ণ, কখনো বা উদাসীন। এ দুই জনের জন্যে একই ছাঁচে-গড়া মানসিক স্বাস্থ্যের আদর্শ সম্ভব নয়। বাঘের বাচ্চা বাঘ হয়ে গড়ে উঠলেই তার মানসিক স্বাস্থ্য অব্যাহত থাকবে। তাকে গরুর মতো ঠাণ্ডা শান্ত করে গড়তে গেলেই যত গোল বাধবে। এই কথাটা শিক্ষক ও পিতামাতা অনেক সময় ভুলে যান। তাঁরা চান তাঁদের সন্তান বা ছাত্রদের নিজস্ব একটি কাল্পনিক আদর্শে গড়ে তুলতে। সব মানুষকে একই ছাঁচে গড়ে তোলা মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়।

মানসিক স্বাস্থ্য যেমন মানুষের পক্ষে একটা আদর্শ, তেমনি আরো অন্য আদর্শও মানুষের আছে। সে সব আদর্শ মানসিক স্বাস্থ্যের আদর্শের বিরোধী নয়, কিন্তু তারা সমার্থকও নয়।

যেমন ধরা যাক, জৈবিক সুস্থতার আদর্শ। ডাক্তার বলবেন, সৈন্য-বিভাগের প্রধান বলবেন, শিল্পপতি বলবেন, মানুষের আদর্শ হবে তার দৈহিক ও অন্যান্য জৈবশক্তির সম্পূর্ণ ও সুষ্ঠু বিকাশ। তার পেশী, রক্তচলাচল, স্নায়ু সবল ও স্বচ্ছন্দ ক্রিয়াশীল হলেই মানুষ সুস্থ। সবল, সতেজ, দৈহিক কর্মে নিপুণ মানুষই সুস্থ মানুষের আদর্শ। এ আদর্শ মানসিক সুস্থতার আদর্শের পরিপন্থী নয়, কিন্তু সম্পূর্ণ একও নয়। ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ ও সুষম বিকাশের জন্যে জৈবিক শক্তিসমূহের সবলতা ও সামঞ্জস্য অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু

জৈবিক অর্থে সুস্থ ও নিপুণ যে মানুষ, সে অসুখী, পাপবোধ দ্বারা জর্জরিত, পরপীড়ক অথবা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে পারে—অনেক সময়ে হয়েও থাকে। কাজেই মানসিক সুস্থতার জন্যে জৈবিক সুস্থতা প্রয়োজন, কিন্তু জৈবিক সুস্থতাই মানসিক সুস্থতা নয়।

আবার আর এক আদর্শ হচ্ছে সমাজের সঙ্গে সঙ্গতি। মানুষ সমাজের মধ্যেই জন্মে—সমাজেই বর্ধিত হয়। তার ভাষা, তার আচরণ, তার ন্যায়-অন্যায়ের আদর্শ সমাজ থেকে সে গ্রহণ করে। কাজেই বুদ্ধিমান মানুষ সমাজের মতামতকে উপেক্ষা করতে পারে না। আমাদের সুখের একটি শ্রেষ্ঠ উৎস সমাজের প্রশংসা, আমাদের দুঃখের একটি প্রধান হেতু সমাজের নিন্দা। যেখানে সমাজের সঙ্গে পদে পদে বিরোধ ঘটে সেখানে ব্যক্তির শান্তি নষ্ট হয়, তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী ও মতামত অনেক সময় পরিবর্তনীয়। কে না জানে, কোন ফ্যাসানের আয়ু দুমাসের বেশী নয়? কিন্তু মানসিক সুস্থতার আদর্শ পরিবর্তনীয় নয়—তা সমাজের অস্থিরতাকে অনুসরণ করাই বাঞ্ছনীয় মনে করে না। মানুষ সমাজের ক্রীতদাস নয়। তাই মানসিক সুস্থ মানুষ তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশকল্পে সমাজকে কখনো কখনো বাধা দেয়, তাকে আঘাতও করে। একথা অবশ্যই সত্য যে, যারা মানসিক অসুস্থ যেমন, নিউর‍্যাটিক্ বা হিস্টিরিয়াগ্রস্ত বা উন্মাদ ও অপরাধপ্রবণদের মধ্যে অনেকেই সমাজের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে না, তারা অসামাজিক, কোন কোন ক্ষেত্রে সমাজের শত্রু। কিন্তু যারা সমাজকে মেনে চলে, যারা বেশ মিশুক ও সমাজের স্রোতে গা ভাসিয়ে চলে—তারা সবাই সুখী নয়, মানসিক সুস্থ নয়, তাদের স্থির ব্যক্তিত্ব বলে কিছু নেই। আবার এটাও অনেক মনোবিজ্ঞানীর মত যে সমাজের ভয়ে তীব্র ব্যক্তিগত ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ও মতামতে স্বাধীন ও স্বাভাবিক প্রকাশকে বাধা দেওয়ার ফলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিউরোসিস্, হিস্টিরিয়া ইত্যাদি মানসিক রোগের সৃষ্টি হয়। কাজেই মানসিক স্বাস্থ্য ও সামাজিক সঙ্গতি ঠিক এক জিনিস নয়।

আর একটি আদর্শ—মানুষের প্রাচীন আদর্শ—নৈতিকতার আদর্শ, ভালো-মন্দর বিচার। এ আদর্শ বলে, সৎ মানুষ, সাধু মানুষই শ্রেষ্ঠ। মানুষের এর চেয়ে বড় আদর্শ নেই। মানসিক সুস্থতার জন্যে মহান আদর্শ ও উদ্দেশ্যে বিশ্বাস অপরিহার্য। যাঁরা মানসিক সুস্থ, তাঁরা নীতিবানও বটেন। কিন্তু নৈতিকতার আদর্শ বলতে অনেক সময় বাইরের আচরণের শুদ্ধতার কথাই ভাবা

হয়। অর্থাৎ যাঁর আচরণ নিন্দনীয় নয়, তিনিই নীতিবান। তাহলে বাইরের আচরণে নীতিবান হয়েও, কোন মানুষ মানসিক সুস্থ না হতে পারেন। এমনও হতে পারে, অন্তরের তীব্র আকাঙ্ক্ষা-কামনা এই বাইরের নীতিপালনের কাছে নিজেকে বলি দিয়ে, অবদমিত ইচ্ছার একটি জট মনের মধ্যে পাকিয়ে তুলেছে। তাই নৈতিক আচরণই সব সময় মানসিক সুস্থতার মাপকাঠি নয়।

মানসিক অসুস্থতার মূল কারণ অনেক সময় জন্মগত। সে সব ক্ষেত্রে এর নিবারণ বা নিরাময়ের উপায় সহজ নয়।

কিন্তু যেখানে এর মূল জন্মগত নয়, সেখানে এর নিবারণ বা চিকিৎসা অসাধ্য নয়। এ দায়িত্ব মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার (Mental Hygiene)। এ বিজ্ঞান খুব প্রাচীন নয়, কিন্তু ইতিমধ্যেই বৈজ্ঞানিক ধারা অনুসরণ করে নিবারণ ও চিকিৎসা এই দুই ক্ষেত্রেই এ বিজ্ঞান যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে।

বিজ্ঞানীদের মতে মানসিক রোগ বা বিকৃতি শিশুকালের কোন দুঃখকর, অপ্রীতিকর, ভীতিকর বা বীভৎস অভিজ্ঞতা থেকেই শুরু হয়। এ অভিজ্ঞতা আকস্মিক, অত্যন্ত তীব্র অথবা দীর্ঘদিনস্থায়ী হলে শিশুর মনের সহজ স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত বা বিকৃত হয়। এতেই ভবিষ্যৎ জীবনের নিউরোসিস্, হিস্টিরিয়া, অপরাধ-প্রবণতার বীজ সৃষ্টি হয়। বড় হয়ে কোন একটা উত্তেজক ঘটনা এই সুপ্ত বিকৃতির বীজকে ফুটিয়ে তোলে। তাই মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীর পক্ষে শিশুর জীবনের বিকাশের ধারাটা জানা একান্ত দরকার। কোন্ কোন্ অভি-জ্ঞতা শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের পক্ষে হানিকর তা জানলেই নিবারণ বা চিকিৎসা হতে পারে। তাই বর্তমানে শিশুমনোবিদ্যা এবং শিশুর বিকাশের ধারানির্ণয় ক্রমেই অধিকতর গুরুত্বলাভ করছে। অবশ্য মানুষের নিজের মধ্যেই প্রতিকূল অভিজ্ঞতা সহ্য করবার ক্ষমতা থাকে। কিন্তু এ ক্ষমতার একটা সীমা আছে, আর প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই এ সীমাটা বিভিন্ন। তা ছাড়া একজন শিশুর পক্ষে যে অভিজ্ঞতা বিষম হানিকর, অন্যের কাছে তা নয়। এ বিষয়ে শিশুতে-শিশুতে জন্মগত পার্থক্য আছে, সে কথা বিজ্ঞানীকে মনে রাখতে হবে। তবে একথা সাধারণভাবে বলা যায়, যে কতকগুলি অভিজ্ঞতা সব শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষেই বিঘ্নকর। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এ প্রবন্ধে সম্ভব নয়। সাধারণভাবে কিছু আলোচনা করছি।

প্রত্যেক শিশুরই মানসিক সুস্থতার জন্যে প্রথম প্রয়োজন—অকৃত্রিম ভালোবাসা ও নিরাপত্তাবোধ। সাধারণত শিশুরা মাতা ও পিতার নিকট

থেকে জীবনের এই মৌলিক প্রয়োজন সুস্থ ও সহজভাবেই মেটাতে পারে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে (যেমন যেখানে পিতা ও মাতার মধ্যে স্বাভাবিক প্রীতির সম্বন্ধ বর্তমান নেই, যেখানে শিশুকালেই পিতা বা মাতা মারা যান, অথবা শিশুর বাল্যকালে পিতামাতার বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে, অথবা যেখানে মাতার কাছে শিশুর জন্ম অবাঞ্ছিত ইত্যাদি) শিশু নিজেকে স্নেহবঞ্চিত বোধ করে এবং তার নিরাপত্তাবোধ বিঘ্নিত হয়। শিশুর মনের এ বিক্ষোভ দীর্ঘকালস্থায়ী হলে, অথবা এ বিক্ষোভের পরিপোষক কোন তীব্র অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা ঘটলে এবং এর সুস্থ স্বাভাবিক প্রকাশের পথ রুদ্ধ হলে, শিশুর অচেতন মনে জটিলতার (complex) সৃষ্টি হয়। অচেতন মনের এই জটিল গ্রন্থি তার সুস্থ সমগ্র মানবজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন (dissociation) হয়ে নিজস্ব একটি জগৎ সৃষ্টি করে এবং তাতে তার ব্যক্তিত্বের সুস্থ ও সম্পূর্ণ বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। একবার এ রকম জটিল গ্রন্থি সৃষ্টি হয়ে বিচ্ছিন্নতা ঘটে গেলে তার প্রতিকার সহজ নয়। তখন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেও শৈশবের ক্ষতির পূরণ করা অনেক সময় দুঃসাধ্য হয়। এ জটিলতাগুলি অচেতন মনের অবস্থা। তাই যার মনে এই জটিলতার সৃষ্টি হল, সে-ও তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকে না, বাইরের সাধারণ পর্যবেক্ষণেও তাদের অস্তিত্ব ধরা পড়ে না। কাজেই তাদের চিকিৎসা খুবই কঠিন। শিশু বড় হলে এই অবচেতন গ্রন্থি তার সামাজিক ব্যবহারকে কখনো কখনো অদ্ভুতভাবে বিকৃত করে। এ অন্যায় আচরণ যে করে, সে নিজেও জানে না কেন সে এ আচরণ করল। তার অচেতন মনের বিচ্ছিন্ন গ্রন্থি আপন কুটিল নিয়মানুযায়ী ব্যক্তিকে অসামাজিক আচরণে যেন বাধ্য করে। তাই দেখা যায় এমন কাজ করে ব্যক্তি বিব্রত ও অনুতপ্ত হচ্ছে, অথচ নিজেকে কিছুতেই সংশোধন করতে পারছে না। একটি উদাহরণ দিলে কথাটা হয়তো স্পষ্ট হবে। অবস্থাপন্ন গৃহস্থের ছেলে বোর্ডিংএ থাকে। পড়াশুনায় সে ভাল, মেধাবী, বুদ্ধিমান। অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে তার বেশ সদ্ভাবও আছে। কিন্তু প্রায়ই বোর্ডিংএর ছেলেদের নানা ছোটখাটো সামান্য মূল্যের জিনিস চুরি যেতে লাগল। একদিন দৈবাৎ এ ছেলেটির বাক্স খুলে সব জিনিস পাওয়া গেল—সস্তা রঙীন পেন্সিল, খাতা, লাট্টু, ঘুড়ির সূতা, লাল ফিতে ইত্যাদি। এগুলির চেয়ে ভালো জিনিস তার নিজেরও অনেক ছিল। কেন যে চুরি করেছে তা সে নিজেও জানে না। নিজের অপরাধ ঢাকবার সে কোন চেষ্টা করল না। ধরা পড়ে সে অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হল। এর

পর তার বাবা তাকে অন্য এক বোর্ডিংএ ভর্তি করে দিলেন। সেখানে সে আদর্শ ছাত্র হিসাবে সকলের স্নেহ ও প্রীতি আকর্ষণ করল। কিন্তু কিছুদিন বাদে এখানেও সে চুরি করে ধরা পড়ল। এবার তার বাবা তার চিকিৎসার জন্যে মনঃসমীক্ষণে পারদর্শী ডাক্তারের শরণাপন্ন হলেন। তিনি ধৈর্যসহকারে ছেলেটির শিশুকাল সম্পর্কে বহু প্রশ্ন করে জানলেন শিশুর যখন দুই বৎসর বয়স তখন ওর মা অন্য এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পালিয়ে যান। তার পিতা আবার বিবাহ করেন। শিশুর সৎমা তাকে অযত্ন না করলেও তাঁর কাছে সে তৃপ্তিকর সম্পূর্ণ ভালবাসা পায় নি। বিশেষ করে, তার নতুন মায়ের একটি ছেলে হওয়ার পরে তার দিকেই মা বেশী দৃষ্টি দিতেন এবং নতুন শিশুর জন্যে অনেক খেলনা ইত্যাদি দেওয়া হত, যা ওকে দেওয়া হত না। এতে ওর মনে হিংসা হত—যদিও এ হিংসা বা রাগ দেখাবার ওপায় ছিল না। ডাক্তার সিদ্ধান্ত করলেন এই অবদমিত হিংসা ও পিতামাতার ওপর নিরুদ্ধ আক্রোশই পরবর্তী জীবনে তাকে অহেতুক চুরি (Kleptomania) করতে প্রবৃত্ত করছে। সহানুভূতিশীল বিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা মনঃসমীক্ষণ (Psycho-analysis) বিজ্ঞানের সূত্র-অনুযায়ী চিকিৎসায় শিশুটির এ রোগ সেরে গিয়েছিল।[২]

বাড়ন্ত শিশুর জীবনের আর একটি প্রধান প্রয়োজন—কিছুটা পরিমাণ স্বাধীনতা। এর দ্বারা তার ব্যক্তিত্বের সুস্থ বিকাশ ঘটে। যেখানে শিশুকে সর্বদা আড়াল করে রাখা হয় সেখানে সে পরনির্ভর ও দুর্বলচিত্ত হয়ে গড়ে ওঠে। আর তার স্বাধীন ইচ্ছাকে পদে পদে বাধা দিলে সে বিদ্রোহী, অবাধ্য ও তিক্তস্বভাব হয় এবং নিজ স্বাধীনতা প্রমাণ করার জন্যে ও পিতা-মাতার অতিস্নেহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে অন্যায় অসামাজিক আচরণে প্রবৃত্ত হয়।

দেহের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে আজকাল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ওপর নির্ভর করা হয়। তেমনি মনের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

মনের স্বাস্থ্যরক্ষা যে দেহের স্বাস্থ্যরক্ষার চেয়ে কম প্রয়োজনীয় নয় একথা ক্রমশই পাশ্চাত্ত্য সভ্য দেশগুলি বুঝতে পারছে। আর এ ব্যাপারেও যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করলেই উপযুক্ত সুফল পাওয়া যাবে এ কথাও স্বীকৃত। তাই মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা (Mental Hygiene) ক্রমশই

২ M. Merill—Problems of Child Delinquency, p. 11

অধিকতর গুরুত্ব লাভ করছে। এ বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুর সুস্থ ব্যক্তিত্ব-বিকাশের ধারা সম্বন্ধে পূর্ণতর জ্ঞানলাভ, মানসিক বিকৃতির কারণ-অনুসন্ধান এবং বৈজ্ঞানিক পন্থা অনুসরণ করে মনের এ বিকার নিবারণ ও তার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা। পূর্বেই বলা হয়েছে শিশুকালেই এই বিকৃতি-নিবারণ বা তার চিকিৎসা সহজ। এ বিকৃতি অবচেতন মনে গভীর মূল বিস্তার করলে রোগ তখন দুশ্চিকিৎস্য হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের দেশে এ বিজ্ঞানের চর্চা সামান্যই হয়েছে। কিন্তু জাতির ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্যে এ বিষয়ে অবহিত হওয়া আশু কর্তব্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার সূচনা

পৃথক একটি শাস্ত্র হিসাবে মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার স্বীকৃতি খুব বেশী দিনের কথা নয়।

বহুপূর্বে মানুষ উন্মাদ রোগকে রহস্যময় বলেই মনে করত। গুরু অপরাধের এটা দৈবী শাস্তি, অথবা কঠিন অভিশাপ বা অভিচার ক্রিয়ার অ-প্রাকৃতিক ফল, মানুষের এই রকম ধারণা ছিল। চিকিৎসাবিদ্যার উন্নতির ফলে চিকিৎসকেরা একে মস্তিষ্কের কঠিন ব্যাধি বলেই চিকিৎসা করতেন। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে চিকিৎসকরা এটা বুঝতে পারেন যে এ জাতীয় ব্যাধির পেছনে মানসিক কারণ বর্তমান থাকে। ফ্রএড্-এর পর থেকে মানসিক ব্যাধি সম্বন্ধে চিকিৎসক ও জনসাধারণের আগ্রহ বাড়তে থাকে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই এই আগ্রহ বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। কিছু দিন আগে থেকে আমেরিকার হাসপাতালে মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে মানসিক রোগের চিকিৎসা আরম্ভ হয়েছিল। এ সময় থেকে বোঝা যায় যে সুস্থ মানুষেরও সমাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে (human adjustments) চলবার প্রয়োজনে এবং চেষ্টায় নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। ফলে এ বিষয়ে মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা শুরু হয়।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ক্লিফোর্ড বীয়ার্স নামে ইয়েল্ বিশ্ববিদ্যালয়ের চব্বিশ বৎসর বয়স্ক এক যুবক তাঁর বাড়ীর পাঁচতলার জানলা থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যার নিষ্ফল চেষ্টা করেন। তাঁর বিচারকালে তাঁর মানসিক বিকারের স্পষ্ট লক্ষণ দেখে তাঁকে বিচারক মানসিক রোগের হাসপাতালে পাঠান। উন্মাদদের জন্যে এই জাতীয় বিভিন্ন চিকিৎসালয়ে তিনি তিন বৎসর ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি নিরাময় হয়ে ওঠেন। সমাজের মধ্যে এবং হাসপাতালগুলিতে মানসিক-রোগগ্রস্তদের প্রতি যে বিরূপতা ও নির্মমতা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, কেন তিনি নিজেকে সমাজের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছিলেন না, তাঁর সমস্যা কি ছিল, কি মানসিক ক্লেশ তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল,

কি করে নিজের চেষ্টায় তিনি মানসিক সমতা ফিরে পেয়েছিলেন, এ সমস্ত বর্ণনা করে বীয়ার্স একখানা বই লেখেন—"A Mind that found Itself"। ১৯০৮ সালে বইখানি প্রকাশিত হয়।

প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বইখানি বেশ জনপ্রিয় হয়। চিকিৎসক ও সমাজ-সেবীদের দৃষ্টি বইটির সমস্যার প্রতি আকৃষ্ট হয়। সমস্ত আমেরিকাব্যাপী মানসিক রোগীদের সুচিকিৎসা ও এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণার দাবিতে একটি আন্দোলন আরম্ভ হয়। বীয়ার্স নিজে এবং একজন প্রসিদ্ধ মনোবিকার-চিকিৎসক (Psychiatrist) অ্যাডলফ্ মেয়ার্ এ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। মেয়ার্-ই এই নূতন বিজ্ঞানের নাম দেন 'মেণ্টাল্ হাইজীন্।' ১৯০৮ সালেই ইয়েল্-এ প্রথম 'স্টেট কমিটি ফর মেণ্টাল্ হাইজীন্' এবং পরের বৎসর ১৯০৯ সালে সমস্ত আমেরিকার জন্য কেন্দ্রীয় 'ন্যাশন্যাল্ কমিটি ফর মেণ্টাল্ হাইজীন্' স্থাপিত হয়। অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই এ আন্দোলন দেশের অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়ে এবং শীঘ্রই আরো অনেক স্টেট কমিটি গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলি স্বেচ্ছামূলক বেসরকারী চেষ্টায় গঠিত। মানসিক রোগের চিকিৎসক এবং এ বিষয়ে গবেষণারত বিজ্ঞানীরা এর সদস্য। এ আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল সাধারণ শিক্ষিত মানুষও এর সদস্য হতে পারেন। আমেরিকার বাইরে অন্যান্য দেশেও পৃথক একটি বিজ্ঞান হিসাবে মেণ্টাল্ হাইজীনের চর্চা বিস্তৃতি লাভ করেছে।

স্বভাবতই প্রথম দিকে মানসিক রোগের হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসা-বিষয়ে সাহায্য করাই এ কমিটিগুলির প্রধান কাজ ছিল। কিন্তু ক্রমশই এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও গবেষণা অধিকতর গুরুত্ব লাভ করে এবং বিগত অর্ধশতাব্দীব্যাপী এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনার ফলে যে সব তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলি চিকিৎসা, শিক্ষা, সমাজসেবা ইত্যাদি জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়েছে। আজ এই বিজ্ঞান অন্যান্য বহু সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান থেকে সমর্থক নানা তত্ত্ব অবিষ্কার করে এখন দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

সমাজের পক্ষে এই বিজ্ঞানের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমেরিকার বহু উচ্চবিদ্যালয়ে দৈহিক স্বাস্থ্যবিদ্যা যেমন অবশ্যপাঠ্য বিষয়, মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যাও তেমনি অবশ্যপাঠ্য বলে বিবেচিত হচ্ছে। মেণ্টাল্ হাইজীন্ আন্দোলনের আর একটি প্রত্যক্ষ ফল ছাত্র-

ছাত্রীদের জীবনের নানা সমস্যা সম্বন্ধে যাতে তারা সদুপদেশ পেতে পারে সে জন্যে 'চাইল্ড গাইডেন্স ক্লিনিক্' স্থাপন। শিক্ষকেরা বুঝতে পারছেন যে, ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান-ব্যাপারে বুদ্ধি, উৎকৃষ্ট পুস্তক, বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম, সুষ্ঠু শিক্ষাপদ্ধতিই সব নয়—আর একটি বিষয়ও বিবেচ্য: তা হল ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক সুস্থ ও শান্ত অবস্থা। ছাত্রের মনটি বিরুদ্ধ ও বিপরীত শক্তিদ্বারা আন্দোলিত ও অস্থির হলে সহজ বিষয়ও তার বোধগম্য হয় না। আবার তার মনটি শান্ত ও কৌতূহলী হলে অত্যন্ত কঠিন বিষয়ও তাকে বোঝান সহজ হয়।[১] পাটীগণিতের একেবারে গোড়ার কথাগুলিও কোন কোন ছাত্রের মনে ভূতের মতো আতঙ্ক সৃষ্টি করে। দেখা গেছে এইরূপ আতঙ্ক, যা মনোবিজ্ঞানীদের দীর্ঘকালব্যাপী চেষ্টাতেও দূর হয় নি তা-ও, ছাত্রদের মন প্রক্ষোভ- ও উত্তেজনা-মুক্ত হয়ে ধীর ও শান্ত হওয়ামাত্র অন্তর্ধান করে। শিক্ষক ক্রমশ একথা বুঝেছেন যে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য সমাজজীবনের সঙ্গে শিক্ষার্থীর মনের সামঞ্জস্যবিধান। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের কর্তব্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি দ্বারা শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশের সাহায্য করা।

চিকিৎসার ক্ষেত্রেও এই বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি অধিকতর নিপুণ বিশ্লেষণ-পদ্ধতি ও নূতন নূতন চিকিৎসা-পদ্ধতি আবিষ্কারে সহায়ক হয়েছে ।

মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য

ব্যক্তি-মনের সমতাবিধান ও সমাজজীবনের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য-বিধানের দ্বারা মানবকল্যাণই এই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। এই বিজ্ঞান তিনটি প্রধান লক্ষ্য অনুসরণ করে :—

(১) দেহ-মনের সুস্থ স্বাভাবিক বিকাশের সঙ্গে জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার প্রকৃত সম্বন্ধনির্ণয়, এবং সে জ্ঞানের সাহায্যে মানসিক বিকৃতি-নিরোধ।

১ Bugbears of arithmetic fundamentals which have for many years remained formidable against the assaults of every weapon in the essentialist arsenal shrink to insignificance when the pupil is relaxed, instead of tense, adjusted rather than in a state of conflict. Harold Benjamin—Editor's Introduction to Mental Hygiene by Crow and Crow (1st ed.)

(২) ব্যক্তি ও সমাজের মানসিক স্বাস্থ্য ও সমতা রক্ষা।

(৩) মানসিক রোগ-নিরাময়কল্পে উৎকৃষ্টতর ঔষধ বা প্রক্রিয়া আবিষ্কার ও মানসিক রোগ ও অস্বাস্থ্য চিকিৎসায় তাদের ব্যবহার।

মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার সূত্রানুযায়ী বহু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে মানসিক বিকারের মূল কারণ অস্থির মানসিক সংঘাত ও আবেগ, এবং অনুভূতির ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা। সুতরাং এই বিজ্ঞান এই দিকে বিশেষ মনোযোগী এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা নূতন পথের সন্ধানে রত আছে। এটি মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার রোগচিকিৎসার দিক (Mental Hygiene as Cure)। এই বিজ্ঞানের আর একটি দিক হল প্রতিরোধ ও সংরক্ষণ (Mental Hygiene as Prevention and Preservation)। এ বিজ্ঞান-আলোচনা দ্বারা আমরা জানতে পারি কি করে ব্যক্তির মনে সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গী ও অভ্যাস-সৃষ্টি করতে হয়, কি করে জীবনের বিভিন্ন প্রধান সমস্যার সম্মুখীন হতে ও সামঞ্জস্যবিধান করতে হয়, কি করে অনাবশ্যক অবাঞ্ছনীয় সংঘাত দূর করতে হয়, প্রতিকূল অবস্থায় মনের সমতারক্ষা করতে হয় এবং সর্বোপরি আত্মবিরোধ ও সমাজের সঙ্গে অসামঞ্জস্য দূর করে মানসিক শান্তি ও সুখ অর্জন করতে হয়। আত্মসংযম, উগ্র বাসনা-কামনা-আবেগ নিয়ন্ত্রণ ভিন্ন মানুষের জীবনে সুখশান্তি অসম্ভব—এই সুপ্রাচীন কথাটিই আধুনিক মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা নতুন করে স্বীকার করছে ও প্রচার করছে।[২]

মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার কয়েকটি সংজ্ঞা

ডি. বি. ক্লাইন্-এর মতে মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা জীবনের নানা অপ্রিয় অবস্থা বা দুঃখ (trouble) কি ভাবে দূরে রাখতে হয়, অথবা বুদ্ধিমানের মতো তাদের সম্মুখীন হয়ে তাদের জয় করতে হয়, তা মানুষকে শিক্ষা দিয়ে তাদের সাহায্য করে। দুঃখ বলতে মানুষ প্রচলিত অর্থে যাকে দুঃখ বলে, তাই ধরা হয়, এবং তাদের একটি মোটামুটি তালিকা এই—রোগ, ধর্ম-বিষয়ে অবিশ্বাস, আর্থিক ক্ষতি, বিবাহিত জীবনে অতৃপ্তি, সামাজিক সমস্যা, জীবিকার অনিশ্চয়তা, দুর্ঘটনা, বার্ধক্য, অগ্নিভয়, উপযুক্ত বাসস্থানের অভাব ইত্যাদি।[৩]

২ Crow and Crow—Mental Hygiene, (2nd ed.), p. 4

৩ D. B. Klein—Mental Hygiene, p. 4

রোজানফ্ বলছেন—মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা বলতে মনের সজীবতা, স্বাস্থ্য ও সক্রিয়তা রক্ষার সহায়ক বিদ্যা ও প্রক্রিয়া যে বিজ্ঞানে আলোচিত হয় তা-ই বোঝায়। এর তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য:—(১) সুপ্রজনন এবং অন্যান্য উপায়ে সমস্ত ব্যক্তি যাতে উপযুক্ত বুদ্ধি, অনুভূতি ও অন্যান্য স্বভাবসিদ্ধ সদ্‌গুণের অধিকারী হতে পারে সে বিষয়ে চেষ্টিত হওয়া, (২) মানুষের স্বভাব ও জন্মগত বুদ্ধি, প্রবৃত্তি ইত্যাদির উপযুক্ত, আনন্দপূর্ণ ও বৈজ্ঞানিক ব্যবহার দ্বারা যাতে দেহে, শিক্ষায়, সমাজজীবনে, বিবাহিত-জীবনে সে সুসামঞ্জস্য ও আনন্দলাভ করে, এবং (৩) তার অন্তর্নিহিত সমস্ত শক্তি যাতে বিকাশলাভ করতে পারে সে বিষয়ে পথনির্দেশ, এবং সর্বশেষ মানসিক বিকৃতি ও ব্যাধির নিবারণ।[৪]

ওয়ালিন্ বলছেন—"মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা,—মনোবিদ্যা, শিশুপালনবিদ্যা, শিক্ষাবিদ্যা, সমাজবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, জীববিদ্যা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে মনের স্বাস্থ্যরক্ষার উদ্দেশ্যে সূত্র ও প্রক্রিয়া আহরণ করে। এই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে;—(১) ব্যক্তি ও সমাজের মানসিক স্বাস্থ্যসংরক্ষণ ও তার উন্নতি, (২) শিক্ষা, সমাজ অথবা ব্যক্তির মানসক্ষেত্রে নানা কারণে উদ্ভূত বিরোধ দূর করবার উপায়নির্দেশ এবং সামান্য বা গুরুতর মানসিক ব্যাধির প্রতিকার বা চিকিৎসা।"[৫]

৪ Rosanoff—Manual of Psychiatry, p. 3

৫ Wallin—Problems of Subnormality, p. 401

তৃতীয় অধ্যায়

মনের স্বাস্থ্যরক্ষা

সম্ভবত এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, আমরা আমাদের সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী সচেতন হয়েছি। দৈহিক রোগের প্রতিবিধান- ও দৈহিক স্বাস্থ্যরক্ষা- বিষয়ে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের চেয়ে অনেক বেশী সতর্ক ও উদ্যোগী হয়েছি। কোন পিতামাতা যদি তাঁদের সন্তানের দৈহিক স্বাস্থ্যরক্ষা-বিষয়ে উদাসীন হন, যদি রুগ্ণ শিশুর চিকিৎসার ব্যবস্থা তাঁরা না করেন, তবে সমাজে তাঁরা নিন্দিত হন। শিশুদের দৈহিক স্বাস্থ্যরক্ষা অবশ্যকর্তব্য, একথা সমাজ স্বীকার করে নিয়েছে।

কিন্তু স্বাস্থ্য কি শুধু দেহের? রোগ কি শুধু দেহের? মনের স্বাস্থ্যরক্ষা, মনের রোগের প্রতিকার ও চিকিৎসা সম্পর্কে আমরা কিন্তু খুব কমই চিন্তা করি। যখন উন্মাদ রোগের মতো গুরুতর মানসিক বিকৃতি দেখি, তখনই কেবল আমরা বিচলিত হই। কিন্তু তখনও ভাবি, এই রোগ নিতান্তই দুঃখজনক ব্যতিক্রম, এবং এর চিকিৎসা দুঃসাধ্য। এ রোগ যে কতকগুলি প্রতিরোধযোগ্য কারণ থেকে উদ্ভূত, এ কথা আমরা অনেক সময়ই চিন্তা করি না। বাতুলতা বা উন্মত্ততা মানসিক রোগের বিষম গুরুতর অবস্থা এবং তা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু আরো যে বহুতর মানসিক বিকার আছে, অধিকাংশ মানসিক বিকারের কারণগুলি যে আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই উপস্থিত থাকে এবং এই কারণগুলি যথাকালে দূরীকরণের উপযুক্ত চেষ্টা না করলে তা গুরুতর পরিণতিলাভ করতে পারে, এ কথা আধুনিক মনোবিদ্‌রা বুঝতে পেরেছেন এবং আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করছেন।

বাস্তবিকপক্ষে মানসিক রুগ্ণতা ও মানসিক স্বাস্থ্যের মধ্যে সীমারেখাটা খুবই ক্ষীণ।

আমরা প্রত্যেকেই নিজেকে মনের দিকে থেকে 'সুস্থ' ও 'স্বাভাবিক' বলে গর্ব করে থাকি, এবং নিজেকেই মানসিক সুস্থতা ও স্বাভাবিকতার মাপকাঠি বলি মনে করে থাকি। এটা নিতান্তই অন্ধ অহংকার। বাস্তবিক পক্ষে, দৈহিক দিক থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ যেমন নেই, তেমনি

মনের দিক থেকেও সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ কেউ নেই। **সকলেই** আমরা অল্পবিস্তর রুগ্ণ। কিন্তু দেহ ব্যাধিমন্দির হলেও যেমন তার নিজের মধ্যেই থাকে স্বাভাবিক রোগ-প্রতিরোধের শক্তি, তেমনি মনেরও আছে প্রতিকূল অবস্থা ও পরিবেশ এবং নিজের মধ্যে সঙ্গতিস্থাপন করে মোটামুটি সুস্থ থাকবার ক্ষমতা।

তা হলে, **মনের স্বাস্থ্য বা সুস্থ অবস্থার মানে কি?** দেহের স্বাস্থ্য মানে যেমন বাইরের পরিবেশের সঙ্গে দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতিরোধ ও সহযোগিতার মধ্য দিয়ে পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান এবং সবটা মিলিয়ে একটা সঙ্গতিপূর্ণ অবস্থা, তেমনি মনের স্বাস্থ্য মানেও মনের বিভিন্ন বৃত্তি, অবস্থা, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির এমন ভাবে সামঞ্জস্যবিধান (adjustment) যাতে বাইরের (সংসারের ও সমাজের) বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা ও সংগ্রাম করে একটা সমতালাভের স্বাভাবিক শক্তি লাভ করা। জীবন অর্থই বাহ্য ও অন্তরের বিভিন্ন ও বিপরীত শক্তির সহযোগিতা-প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে সামঞ্জস্যবিধান। **স্বাস্থ্যের মূল কথা হল সঙ্গতি-বিধান, সমতা- ও শান্তি-বিধানের স্বাভাবিক শক্তি।**

আমাদের প্রত্যেক মানুষের প্রাত্যহিক জীবনেই নানা অভিজ্ঞতা, নানা অবস্থা, নানা উত্তেজনা এসে পৌঁছে। এদের মধ্যে কতকগুলি প্রীতিকর, কতক-গুলি অপ্রীতিকর; কতকগুলি স্পষ্ট ভাবে প্রীতিকরও নয়, অপ্রীতিকরও নয়। দুঃখ আসে, আঘাত আসে, আশাভঙ্গ হয়, বিফল হই; আবার ভালবাসা, প্রীতি, প্রশংসা, সাফল্যও জোটে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এই সব মিলিয়ে নিজের সঙ্গে বাইরের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করে চলতে পারে। এটাই হল মানসিক সুস্থতার লক্ষণ। সুস্থ হওয়া মানেই স্বস্থ হওয়া—বাইরের অবস্থার সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিজের মধ্যে শান্ত হয়ে ফিরে আসা। যখন কোন অভাব বা প্রয়োজন আসে, তখন আমরা চঞ্চল (tension) হই। সে অভাব বা প্রয়োজন মিটলে চঞ্চলতা শান্ত হয় (tension reduction)। কখনো পরিবেশ পরিবর্তন করে শান্তি আসে, কখনো বা অধিকতর বলশালী পরিবেশের সঙ্গে আপস করে সামঞ্জস্যবিধান করি। এই সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা যেমন একটা নিয়ত ক্রিয়া, তেমন সামঞ্জস্যবিধান-দ্বারা শান্তিবিধান একটা অপেক্ষাকৃত স্থির অবস্থা। 'অপেক্ষাকৃত স্থির অবস্থা' বললাম, কারণ যতক্ষণ জীবন আছে ততক্ষণই চলছে সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টারূপ ক্রিয়া বা পরিবর্তন। মৃত্যু বা

নির্বিকল্প সমাধিতেই কেবল সম্পূর্ণ শান্ত স্থির অবস্থা আসতে পারে। এই **সামঞ্জস্যবিধানের জন্যে কখনো পরিবেশকে পরিবর্তন বা সংশোধন করতে হয়, কখনো পরিবেশের সম্বন্ধে ব্যক্তির মনোভাবের পরিবর্তন করতে হয়, আবার কখনো বা দুইয়েরই পরিবর্তন সাধন করতে হয়।** কখনো ব্যক্তি নিজের চেষ্টা দ্বারাই এই সামঞ্জস্যবিধান করে; কখনো বা পিতা মাতা শিক্ষক সমাজসেবী অথবা রাষ্ট্রের চেষ্টায় এই কাজটি সম্পন্ন হয়। যে ভাবেই এটা সাধিত হোক না কেন, এর ফল সব সময়েই কল্যাণপ্রদ। যে ব্যক্তি তার পরিবেশের সঙ্গে সংহতিবিধান করতে পেরেছে, সে মানসিক সুস্থ। মনের দিক দিয়ে সে সুখী ও শান্ত হয়, কর্মক্ষমতাও তার বৃদ্ধি পায়।[১] শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি হয় ব্যক্তির সমস্ত শক্তি ও সম্ভাবনার সম্পূর্ণ বিকাশ, তা হলে সহজেই আমরা বুঝতে পারি শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর নির্ভর করে শিক্ষার সাফল্য।

যে ব্যক্তি মানসিক সুস্থ, সে নিজের সঙ্গে এবং পরিবেশের সঙ্গে সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানে সমর্থ হয়েছে। সে-ই **স্বাভাবিক** (normal) ব্যক্তি। সে-ই হচ্ছে মাপকাঠি। যে এই সঙ্গতিবিধানে অন্য দশজনের তুলনায় কম সমর্থ, অথবা যে এক মানসিক শক্তিতে (যেমন বুদ্ধি) ন্যূন, সে **অনুস্বাভাবিক** (sub-normal); যে ব্যক্তির দশজনের সঙ্গে বা পরিবেশের সঙ্গে গুরুতর অসঙ্গতি, যে মোটেই নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারছে না, সে **অস্বাভাবিক** (abnormal)—তার দৃষ্টিভঙ্গী অন্য দশজন স্বাভাবিক মানুষের থেকে পৃথক; যেমন, একজন বয়স্ক মানুষ যদি একটা ব্যাং দেখে ভয়ে চীৎকার করে, তবে সে অস্বাভাবিক।[২]

অসঙ্গতির অবস্থা স্বভাবতই ব্যক্তির পক্ষে অসুখকর, অস্বস্তিজনক। যে মানুষ স্বাভাবিক ও সুস্থ, সে এই অবস্থার বাস্তব দূরীকরণেই চেষ্টিত হয়। সঙ্গতিসাধনের চেষ্টাই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। কি ভাবে ব্যক্তি এই চেষ্টা করে?

যখন ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা- বা প্রয়োজন-সাধনের পথে, কোন বাহ্য পরিবেশগত বাধা (obstruction in the physical environment) দেখা দেয়, **তখন** তা দূর করবার জন্যে সে সংগ্রাম করে (he resists the environment)—

১ Gates & Jersild etc.—Educational Psychology, pp. 614-15

২ Fisher—An Introduction to Abnormal Psychology, p. 5

সে পরিবেশ-পরিবর্তন বা -সংশোধন করতে চেষ্টা করে। ঝড়ে গাছ পড়ে রাস্তাঘাট যদি বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে, তবে সে কুড়ুল দিয়ে গাছপাতা কেটে রাস্তা সাফ করে; শিশুর হাত থেকে তার রাঙা বলটি কেড়ে নিতে চাইলে সে সাধ্যমত বাধা দেয়—না পারলে কান্নাকাটি করে, চীৎকার করে। বিরুদ্ধ পরিবেশ অতিরিক্ত প্রবল হলে ব্যক্তি তার থেকে পলায়ন করে ও আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। পলায়নও একপ্রকার প্রতিরোধ। বাহ্য-পরিবেশ যেমন ব্যক্তির ওপর চাপ দেয়, তেমনি সমাজ-পরিবেশও তার ওপর কখনো কখনো এমন চাপ দেয় যা সে পছন্দ করে না। যাকে তার স্বার্থের বিরোধী মনে করে, তার বিরুদ্ধে ব্যক্তি যথাসাধ্য সংগ্রাম করে।[৩] শিশুদের মধ্যেও এটা আমরা দেখি। মা-বাবা বললেন, "অনেক রাত হয়েছে, খোকা এবার ঘুমুতে যাও।" খোকা বলল, "না মা, এখন ঘুমুব না, এখন খেলা করছি।" বাবা-মা বেশী জোর করলে বাধ্য হয়েই তাকে ঘুমুতে যেতে হয়। এমনি করেই সঙ্গতিস্থাপন হয়।

ব্যক্তির সঙ্গে পরিবেশের আর এক রকম সম্বন্ধ হচ্ছে, ব্যক্তি পরিবেশকে নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্যে ব্যবহার করে (he uses the environment)—নদীকে মানুষ যাতায়াতের উপায় হিসাবে ব্যবহার করে, জমিকে ব্যবহার করে ফসল উৎপাদনের কাজে। শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের পক্ষে পরিবেশ থেকে উদ্দীপনা বা ধাক্কা (stimulation) প্রয়োজন আছে; তাহলেই তার শক্তিগুলির প্রকাশের পথ (outlet) হয়।[৪] তার সঙ্গে মা-মাসী আদর করে কথা বলেন, তাই ছোট শিশুও তাঁদের অনুকরণে কথা বলতে চেষ্টা করে। এমনি করেই শিক্ষালাভ হয়।

পরিবেশের শক্তির ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ

পরিবেশকে বাধা দেওয়া হল নেতিবাচক, আর তাকে ব্যবহার করা হল ইতিবাচক ক্রিয়া। ব্যক্তির সঙ্গে পরিবেশের সম্বন্ধের মধ্যে আর একটি অতিরিক্ত ক্রিয়াও আছে, তাকে বলা যায় অংশগ্রহণ (participation)। অন্য দশটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে যখন একটি বালক খেলছে, তখন সে পরিবেশের সমগ্র ক্রিয়ার সঙ্গে অংশগ্রহণ করছে। যখন আমরা সাঁতার শিখছি, তখন বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম যেমন আছে, সহযোগিতাও তেমনি আছে। সবটা

৩ Woodworth & Marquis—Psychology, pp. 197-98

৪ Woodworth & Marquis—Psychology, p. 198

মিলিয়ে, আমরা প্রকৃতির শক্তি-সমবায়ের ক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করি। এই পরিবেশের ক্রিয়ায় অংশগ্রহণের একটা দিক হচ্ছে পরিবেশকে জানা। জানাটা ব্যক্তির সঙ্গে পরিবেশের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক। এটাও এক ধরনের অংশগ্রহণ। সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের পক্ষে এর যথেষ্ট দাম আছে তা বলাই বাহুল্য।[৫]

এক কথায় এই সমস্ত ক্রিয়ার সামগ্রিক নামই হচ্ছে সঙ্গতিসাধন (adjustment)। পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তি সঙ্গতিসাধন করে। অর্থাৎ এ সমস্ত ক্রিয়ার সাহায্যে, এর মধ্য দিয়ে, সে পরিবেশের সঙ্গে, নিজ সাধ্যমত, পূর্বাপেক্ষা অনুকূল সম্বন্ধস্থাপনে সমর্থ হয়। এ করতে গেলে **কখনো সে পরিবেশকে পরিবর্তিত করে, কখনও বা সে নিজেকে পরিবর্তিত করে।** কোন জায়গায় সে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের জন্যে নিজে নতিস্বীকার করে, আর কোনখানে পরিবেশকেই পরিবর্তন করে নিজ ইচ্ছা বা প্রয়োজনের সঙ্গে মিলিয়ে নেয়।[৬]

যেখানে ব্যক্তি নিজের সঙ্গে ও পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করতে পারছে না এবং এর ফলে সে অসুখী, সেখানে আমরা বলি সে mal-adjusted। কখনো কখনো বাল্যকালে গুরুতর অসঙ্গতির জন্যে ব্যক্তির স্বভাবের বা দৃষ্টিভঙ্গীরই এমন বিকৃতি ঘটে যায় যে, বড় হয়ে অনুকূল পরিবেশেও সে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না। এমন ব্যক্তিকেই বাস্তবিক mal-adjusted person বলা উচিত। কোন চারাগাছকে গোড়া থেকেই কাত করে হেলিয়ে দিলে বড় হয়েও সে গাছ কাত হয়ে হেলেই থাকবে। আর যদি পূর্বের ত্রুটি সংশোধন করে পরে গাছটি সোজাও হয়ে যায়, তবুও তার কাণ্ডে স্থায়ী বক্রতা থেকে যাবে। মানুষের বেলায়ও একথা সত্য। অধিকাংশ ব্যক্তির মধ্যেই বিরুদ্ধ বা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও নিজেকে মোটামুটি মানিয়ে নেবার অদ্ভুত ক্ষমতা থাকে। কিন্তু কারো কারো পক্ষে তা সম্ভব হয় না। বাল্যজীবনের অসঙ্গতির ফলে মানসিক যে ক্ষত বা বিকৃতি সৃষ্টি হয়, তারা তা কাটিয়ে উঠতে পারে না। তারাই হচ্ছে বাস্তবিক পক্ষে mal-adjusted।[৭]

যে ব্যক্তি মানসিক সুস্থ, সে তার কাজের উপযোগী মানসিক শক্তি- ও বৃত্তি-বিকাশ করে, এবং স্বচ্ছন্দে ও সানন্দে তা ব্যবহার করে। যে সুস্থ,

৫ Woodworth & Marquis—Psychology, p. 200
৬ Ibid, p. 200
৭ Griffith—An Introduction to Applied Psychology, p. 272

উদ্দেশ্য-সম্পাদনে শক্তি-ব্যবহারে তার মনে অহেতুক ভয়, অযথা দ্বিধা, বৃথা দুশ্চিন্তা, সংকল্পের শিথিলতা, দুর্বলতা, অনিপুণতা এবং উদ্যোগের অভাব দেখা যায় না। নিজের অন্তরে তার শক্তি-ক্ষয়কর বৃথা দ্বন্দ্ব নেই। সে নিজ সহকর্মীদের সঙ্গে সহজে মিশতে পারে, বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্বন্ধেও তার জড়তা দেখা যায় না। যেখানে এর বিপরীত অবস্থা, সেখানে বলা যাবে ব্যক্তি অল্পবিস্তর mal-adjusted।[৮] সেখানে ব্যক্তির সম্বন্ধ সুসঙ্গত, সেখানে ব্যক্তি তার শ্রেষ্ঠ শক্তি ও নিপুণতা ব্যবহার করে নিজে সন্তুষ্ট থাকে, আত্ম-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং সমাজকেও সে সর্বোৎকৃষ্ট সেবা করতে সক্ষম হয়।

এই অসঙ্গতি সম্পর্কে মনোবিদ্ বা সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা এমন ভাবে আলোচনা করেন যাতে মনে হতে পারে যে, ব্যক্তির সাথে সমাজের সঙ্গতিসাধনের সমস্ত দায়িত্ব বুঝি ব্যক্তিরই। কিন্তু তা সত্য নয়। **ব্যক্তি যাতে সুসঙ্গত সম্বন্ধে সমাজের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে, তার জন্যে সমাজেরও দায়িত্ব আছে।** চোরের সমাজে চোর হলেই সমাজের সঙ্গে মিলিয়ে চলা যায় (adaptation), কিন্তু ব্যক্তির নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে এমন মিলিয়ে চলাকে সুসঙ্গতি (adjustment) বলা যায় না। adaptation এবং adjustment এক নয়।[৯]

তা ছাড়া, সুসঙ্গতির (adjustment) একটা দিক যেমন আছে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সঙ্গতি, তেমনি আর একটা দিক হচ্ছে ব্যক্তির নিজের সঙ্গেই নিজের সঙ্গতি। বহু ক্ষেত্রেই ব্যক্তির সংগ্রাম বাহ্য পরিবেশের সঙ্গে ততটা নয়, যতটা তার নিজের সঙ্গে। ব্যক্তির বিভিন্ন তীব্র আকাঙ্ক্ষা কখনো কখনো পরস্পর বিপরীতমুখী। কখনো কখনো ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তার শক্তি, বুদ্ধি বা কুশলতার সামঞ্জস্য থাকে না। সেখানেও আমরা বলি ব্যক্তি mal-adjusted।[১০]

যে ব্যক্তি সুস্থ ও স্বাভাবিক সে তার পরিবেশের মধ্যে জীবনের প্রধান প্রয়োজনসাধনের উপায়গুলি খুঁজে পায় এবং তাতে তৃপ্তি- ও আনন্দ-লাভ করে। তার জীবন কতগুলি আকস্মিক ঘটনার সমষ্টি নয় এবং সে নিষ্ক্রিয় গ্রাহকমাত্র নয়। **কিন্তু তার তৃপ্তি ও আনন্দের সঙ্গে সামাজিক দায়িত্ব-**

৮ Ibid, p. 273

৯ Gates, Jersild etc.—Educational Psychology, p. 616

১০ Sherman—Basic Problems of Behaviour, p. 56

ও কর্তব্য-বোধের যোগ থাকতে হবে। যে ব্যক্তি নিতান্ত স্বার্থপরের মতো পরিবেশ থেকে নিজ পাওনা-গণ্ডা ষোল আনার ওপর আঠারো আনা আদায় করে নেয় এবং অন্যকে তার ন্যায্য তৃপ্তি ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে, তাকে সুস্থ স্বাভাবিক সুসঙ্গত ব্যক্তি বলা চলে না। ব্যক্তির তৃপ্তি ও আনন্দের সঙ্গে সমাজের জন্য দরদ ও সামাজিক কর্তব্যবোধও যুক্ত থাকা প্রয়োজন।[১১]

মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার কাজ হবে মনের স্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্যের লক্ষণ নিরূপণ করা, কি কি কারণে মনের স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হতে পারে তা নির্ধারণ করা, মানসিক বিকৃতি বা রোগের শ্রেণীবিভাগ করা এবং সর্বোপরি এই বিকৃতি- বা রোগ-নিরাকরণের উপায় নির্দেশ করা।[১২]

অসঙ্গতির বিভিন্ন দিক

ব্যক্তির কর্ম বা ব্যবহারের চারটি প্রধান দিক আছে এবং চারটি বিভিন্ন দিক থেকে অসঙ্গতির তাৎপর্যটি বুঝতে পারি।

(১) অসঙ্গতি-বিচারের একটি মাপকাঠি হল ব্যক্তির মনোযোগ ও আগ্রহের গতি এবং বর্তমানের মনোযোগ ও আগ্রহের সঙ্গে অতীত ও বর্তমানের যোগ। ব্যক্তির সমস্ত কর্মের তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে: (ক) যাকে সে মূল্যবান বলে সংগ্রহ করেছে তার সংরক্ষণ (Maintenance), (খ) নতুন সম্পদ আহরণ (Acquisition), এবং (গ) যা নষ্ট হয়েছে তার পুনরুদ্ধার (Restoration)।

আমরা আমাদের ধনসম্পদ রক্ষা করতে চাই, পারিবারিক সম্ভ্রম ও মর্যাদা রক্ষা করতে চাই, প্রিয়জনের প্রীতি শ্রদ্ধা বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখতে চাই। কিন্তু শুধু বর্তমানের সংরক্ষণ নয়, আমরা ভবিষ্যতে আরো উঁচুতে উঠতে চাই। এই ভবিষ্যতে লাভের আশায় বর্তমানে কিছু ক্ষতিস্বীকার করতেও রাজী

---

১১ Not only must a person be in an environment which enables him to satisfy his basic needs satisfactorily, and be able to manage his life so that the satisfaction of one need does not make the satisfaction of another impossible, but also he must satisfy his needs in such a way, as to avoid interfering with the fulfilment of the legitimate need of others. In short, the well-adjusted person is one whose needs and satisfactions in life are integrated with a sense of social feeling and an acceptance of social responsibility. Gates & Jersild etc.—Educational Psychology, p. 617

১২ Mental hygiene: investigation of the laws of mental heath, and the taking, or advocacy of measures for its preservation. Drever—Dictionary of Psychology, p. 167

থাকি। এ লাভটা শুধুই আর্থিক এমন নয়—যশ সম্মান এমন কি স্বর্গলাভ ইত্যাদি অপার্থিব অবস্থাও হতে পারে। আর সাধ্য থাকলে কেই বা না চায় অতীত সম্পদ, অতীত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে? মানুষের এই মৌলিক আকাঙ্ক্ষা ও কামনার কথা ভারতীয় ঋষিরা জানতেন বলেই গীতাতে শ্রীভগবানের এই প্রতিশ্রুতিবাণী—'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্'।

মানুষের এই তিনটি প্রধান আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যুক্ত মনোভাব ও ব্যবহার তুলনা করলে সুস্থ ও অসুস্থ মানুষের প্রভেদটা ধরা পড়বে। যে সুস্থ মানুষ, তার কাছে ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্যটাই প্রধান। তার বর্তমান কর্মের অনেকখানিই সেই মূল্যবান ভবিষ্যতের অভিমুখে—তাকে সার্থক করে তোলবার কাজেই ব্যয়িত। কিন্তু যে ব্যক্তি, অতীতে যা ছিল তা নিয়েই শুধু গর্ব করতে ভালবাসে, যে অতীত আর ফিরে আসবে না তার জন্যই হাহাকার ও অশ্রুপাতে সময়ক্ষেপ করে[১৩] অথবা যে শুধু বর্তমানের প্রাত্যহিক তুচ্ছতায় দিনগত পাপক্ষয় করে, সে ব্যক্তি সুস্থ ও স্বাভাবিক নয়—সে mal-adjusted। যে ব্যক্তি সুস্থ সে অতীতে মনোযোগ দেয় তার থেকে শিক্ষাগ্রহণের জন্যে, তার ভ্রম ও ত্রুটি সংশোধনের জন্যে। যে মা তার একটি সন্তানকে হারিয়ে তার শোকেই মগ্ন হয়ে থাকেন—মৃত সন্তানের জামাকাপড় রোজ ঝেড়েমুছে গুছিয়ে রাখা, তার বিছানা রোজ নতুন করে পাতা ও তোলা এই সব বৃথা কাজে বর্তমান সময়কে বৃথা নষ্ট করেন, তিনি সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ নন।

আবার এমন মানুষও আছে যে শুধু রঙীন ভবিষ্যতের কল্পনার জাল বুনেই বর্তমানের কর্তব্যকে অবহেলা করে বৃথা সময়ক্ষেপ করে, সে-ও সুস্থ মানুষ নয়।

বর্তমান আমাদের সামনে তার প্রকাণ্ড দাবি নিয়ে উপস্থিত থাকে। তাই বর্তমানকে কোন বুদ্ধিমান মানুষই উপেক্ষা করতে পারে না। কিন্তু সুস্থ মানুষ বর্তমানকে অতীতের শিক্ষা দিয়ে সার্থকতর করে গঠন করতে চেষ্টা করে এবং ভবিষ্যতের শুভ উদ্দেশ্যের অভিমুখেই বর্তমান কর্মকে চালনা করে। যে ব্যক্তি অন্ধ পশুর মতো শুধুমাত্র বর্তমান মুহূর্তের তৃপ্তির কথাই চিন্তা করে, ভবিষ্যৎ শুভ উদ্দেশ্যের সঙ্গে বর্তমানের কর্মকে যুক্ত করে না, সে যথেষ্ট বুদ্ধিমান ব্যক্তি নয়—তার ব্যবহার সুসঙ্গত নয়। যে ব্যক্তি আয়ের সমস্তই

১৩ ...that it is weak, that is mal-adjustive, to expend time and energy in repentance or regret for one's past acts or mistakes. The more adjustive way of reacting is to draw a lesson from past errors and then go ahead with present and future. Dunlap—Habits—their making & unmaking, p. 224

ব্যয় করে ফেলে—ভবিষ্যতের জন্যে তার স্ত্রী সন্তান-সন্ততির জন্যে কিছুই সঞ্চয় করে না, সে নিশ্চয়ই নির্বোধ।[১৪]

মানসিক সুষমতা ও তৃপ্তিবোধ

ব্যক্তি মানসিক সুস্থ কিনা, তার আর একটি মাপকাঠি হচ্ছে সে তার কাজের মধ্যে সত্যই আনন্দ পায় কিনা এবং তার বিভিন্ন আশা আকাঙ্ক্ষা উদ্যম সুসমঞ্জস কিনা। একটি মানুষ, সে বেশ গুছিয়ে প্ল্যান করে, ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংসারের কর্তব্য-সম্পাদন করে যায়। বাইরের থেকে সবাই বলে, "লোকটা বেশ আছে"। কিন্তু একদিন সকালে উঠে দেখা গেল লোকটা পাগল হয়ে গেছে! এখানে বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও লোকটি তার অন্তরে দ্বন্দ্ব ও অসামঞ্জস্যের অশান্তির. আগুন বয়ে বেড়িয়েছে। আজ তার পুঞ্জীভূত মানসিক সংগ্রাম, তার ব্যক্তিত্বের আপাতদৃষ্ট সুষম ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছে। বহু মানুষের কাছেই তাদের জীবিকার প্রয়োজনে করণীয় কাজ বিস্বাদ, অপ্রীতিকর—যদিও সংসারের কর্তব্য হিসাবে তা তারা করতে বাধ্য হয়। কাজের সঙ্গে তাদের 'ভাব' হয়ে ওঠে না (there is no job-satisfaction)। অনেক মানুষই লোকচক্ষুর অন্তরালে কোন ব্যক্তিগত অপরাধ-বোধ (guilt consciousness) বহন করে, অথবা পারিবারিক অশান্তি এবং বিষম ও উত্তেজনাকর অবস্থায় আপাতত শান্তভাবে কাজ করে যায়। কিন্তু একদিন হয়তো তা গুরুতর মানসিক বিকৃতির আকারে আত্মপ্রকাশ করে। একটি স্বল্পভাষী কর্তব্যনিষ্ঠ যুবক বহুদিন এক অফিসে যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করে, হঠাৎ একদিন বিনা কারণে চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসে শয্যা নিল এবং তার স্নায়বিক বিকৃতি স্পষ্ট দেখা দিল।[১৫]

১৪ ...an excessive degree of attention to past facts is definitely mal-adjustive; that excessive attention to present facts which have no facilitating or constructive bearing on future effort is likewise mal-adjustive. But today is tomorrow's greatest rival and very few persons succeed in always subordinating the desire of the moment to the claims of future, even when they believe that such should be the case. Fisher—An Introduction to Abnormal Psychology, pp. 55-56

১৫ A second important criterion of adjustment, one which too often is neglected by students of psychology and sociology, is the feeling-tone of the individual as he goes about his daily life, the degree of satisfaction or dissatisfaction which he derives from his everyday activities...Many persons feel their daily work to be a tasteless task which is difficult to endure,

যারা আত্মানুসন্ধানে অভ্যস্ত 'কুনো' স্বভাবের মানুষ (introverts) তাদের মানসিক অশান্তি ও অস্থিরতা অনেকটা সহজে ধরা পড়ে। কিন্তু যারা বহির্মুখী, হৈ-হল্লা করতে অভ্যস্ত (extroverts) তারা নিজেদের মানসিক অসঙ্গতি অন্য মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে পারে, এমন কি তারা নিজেরাও নিজের অন্তরের অস্বস্তি বাইরের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে চাপা দিয়ে নিজের মনকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু অচেতন মনে অশান্তি (conflict) এবং পাপবোধ থেকে যে অসঙ্গতির সৃষ্টি, তা অনেক সময় অন্ধতা- (blindness) বা অঙ্গের অবশতা- (paralysis) রূপ গুরুতর পরিণতি লাভ করতে পারে।[১৬]

বাহ্য অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি

বাইরের সঙ্গে ব্যক্তির অসঙ্গতিই বেশী চোখে পড়ে। যে ব্যক্তি mal-adjusted সে যে সমস্ত অবস্থায়ই বেমানান, সমস্ত অবস্থায়ই অস্বস্তি বোধ করে তা নয়। একটি ছয় বছরের মেয়ে, বাড়িতে বেশ আনন্দেই থাকে, বেশ বুদ্ধিমতী ও কর্মকুশলী, সমবয়স্ক অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গেও বেশ সহজেই মিশতে পারে, কিন্তু স্কুলের অবস্থার সঙ্গে সে কিছুতেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না। স্কুলে গেলেই সে বমি করে, পড়াশুনা কিছুই পারে না।[১৭] স্কুলের জীবনের সঙ্গে বাড়ির জীবনের অনেকখানি প্রভেদ। এবং প্রথম প্রথম স্কুলে গিয়ে কাঁদাকাটি করে না বা অস্বস্তিবোধ করে না, এমন ছেলেমেয়ে কম আছে। বিশেষত শিক্ষক বা সহপাঠীরা যদি সহানুভূতিপরায়ণ না হন, তা হলে নতুন

or their domestic situations are laden with a distressing dissatisfaction to themselves or they are daily pre-occupied with some personal problem of a disquieting nature. Yet these persons may succeed in concealing their discontent from everyone. Ibid, p. 57

১৬ একটি স্বাস্থ্যবতী, ক্রীড়ায় পটু, শিক্ষিতা (আমেরিক্যান) যুবতী নিজেই মোটর চালিয়ে নিজের কাজের জায়গায় যাতায়াত করত। সে নিজেকে আধুনিকা ও সংস্কার-মুক্ত বলে গর্ব করত এবং বহু পুরুষের সঙ্গে অবৈধ প্রেমে লিপ্ত ছিল। সে একটি সদ্যবিবাহিত যুবককে প্রলুব্ধ করে তার সঙ্গে যৌনসম্বন্ধ স্থাপন করল। এর ক'দিন পরেই সে অপেক্ষাকৃত নির্জন এক পথের ধারে (তার যৌন অপরাধের স্থানের সন্নিকটে) গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়ে গুরুতর মোটর দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসল। অথচ সে কুশলী মোটরচালিকা। মনঃসমীক্ষক মেয়েটিকে পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত করলেন যে, মেয়েটির অবচেতন মনে গভীর পাপবোধ এবং তার ক্ষালনের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত ও দণ্ড গ্রহণের ইচ্ছাই এখানে এই মোটর দুর্ঘটনার কারণ। Freud—Introductory lectures on psycho-analysis, p. 93

১৭ Fisher—An Introduction to Abnormal Psychology, p. 39

ছাত্রের পক্ষে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে যাওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি হয়। এই অসঙ্গতির কারণ, অনেক ক্ষেত্রেই ছাত্রের বুদ্ধির ন্যূনতা নয়। অন্য জায়গা থেকে অথবা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে যদি ছাত্রটি এসে থাকে, তবে অনেক সময় সহপাঠীরা নতুন ছেলেটিকে সহজভাবে গ্রহণ করে না। এক্ষেত্রে তার পক্ষে সঙ্গতিসাধনের কাজটা কঠিন হয়। যা হোক, বাইরের সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে (যেমন বিদ্যালয়, জীবিকার ক্ষেত্র, উৎসব ইত্যাদি) নানা বাধা ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সুস্থ একজন মানুষ মোটামুটিভাবে মানিয়ে চলতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষেরই জীবিকার ক্ষেত্রে কাজের প্রতি একটা বিরূপতা আছে। এ জাতীয় কাজ মাত্রই বিরক্তিকর, কারণ এখানে ব্যক্তি বোধ করে তার ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে, বাইরের কর্তাব্যক্তিরা তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। কাজেই আলস্যই সাধারণত ব্যক্তির কাছে প্রীতিপ্রদ—সে মনে করে এই আলস্যের মধ্যেই তার ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রকৃত বিস্তার। এই অবচেতন মনোভাব (ego-identification with idleness) অনেক ক্ষেত্রে জীবিকার ক্ষেত্রে ব্যক্তির অসঙ্গতির কারণ।

এক ব্যক্তি কতটা সমাজের মাপকাঠিতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছে, তা দিয়েই বিচার হয়, সে কতটা সুস্থ ও স্বাভাবিক। যে পারল না নিজেকে দশজনের সাথে মিলিয়ে নিতে, সমাজ অঙ্গুলিনির্দেশ করে বলবে, "ও লোকটার মাথার কয়েকটা 'স্ক্রু' ঢিলে আছে।" এটা সহজেই অনুমেয় যে বিচারটা সমাজ বা গোষ্ঠীই করে এবং তারা সর্ব অবস্থায় ব্যক্তিকেই অপরাধী বলে গণ্য করে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে ব্যক্তিই অপরাধী এমন কথা বলা চলে না।[১৮] সাধারণত একথা বলা চলে যে, বহির্মুখী মানুষেরা (extroverts) বাহ্য সমাজের ক্ষেত্রে (যথা জীবিকাস্থল, বা সভা-সমিতি, উৎসব ইত্যাদি) মোটামুটি ভালভাবে সঙ্গতিসাধনে সমর্থ হয়, কিন্তু নিজ পারিবারিক বা ব্যক্তিগত জীবনে তারা সুসঙ্গতিস্থাপনে সমর্থ (well-adjusted) নয়। আবার যারা অন্তর্মুখী (introvert) তারা সাধারণত নিজ পরিবারের ছোট

১৮ The proper social adjustment of the individual requires, from an objective point of view, that he conform to the standards and expectations of his family and of the society in which he lives. From the standpoint of the social criterion the fault cannot lie with society, of course...But as a matter of fact, a social group itself may be definitely mal-adjusted. Fisher —An Introduction to Abnormal Psychology, pp. 62-63

গণ্ডীর মধ্যেই সন্তুষ্ট, কিন্তু বাইরের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ তেমন সুসঙ্গত নয়। সামাজিক জীবনের দায়িত্বগ্রহণে তারা পশ্চাৎপদ।

বংশরক্ষা এবং বংশের বিস্তারসাধনে আগ্রহ ও দায়িত্বগ্রহণ

যে ব্যক্তি দৈহিক ও মানসিক সুস্থ, সে স্বাভাবিক ভাবেই বিবাহবন্ধন ও সুপ্রজননের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ব্যক্তি শুধু নিজ দেহসীমার মধ্যে আবদ্ধ স্বাধীন জীব নয়, সে বংশের অতীত ঐতিহ্যের বাহক ও রক্ষক এবং সে ঐতিহ্য ও শক্তিকে বংশের গতিধারায় প্রবাহিত করে দেওয়ার ও তাকে অধিকতর শক্তিশালী করবার দায়িত্ব তার ওপর রয়েছে। এই দায়িত্ব পালনে অনিচ্ছুক যে ব্যক্তি, তাকে অবশ্যই সামাজিক ঋণ-পরিশোধে পরাঙ্মুখ, অব্যবস্থিত ব্যক্তি বলে অভিহিত করতে হবে। বর্তমান কালে বহু সবল সুস্থ যুবক-যুবতী ব্যক্তিগত স্বাধীনতা- এবং জীবন-উপভোগের সুযোগ সঙ্কুচিত হবে এ আশঙ্কায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে অথবা সন্তানধারণের কষ্ট স্বীকার করতে অনিচ্ছুক। আধুনিক সমাজের এই আচরণ অবশ্যই তথাকথিত সভ্যতার এক গভীর ব্যাধির প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করে। পাশ্চাত্ত্য দেশে এমন উদাহরণ মোটেই বিরল নয়। অনেক সুস্থ, সবল, উপযুক্ত অবস্থাসম্পন্ন যুবক চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর 'জীবন উপভোগ' করে, প্রৌঢ় বয়সে ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য- ও সেবা-লাভের আশায় অনেকটা অনিচ্ছাসত্ত্বে বিবাহ করেন এবং একাধিক সন্তান যাতে উৎপন্ন না হয় সে জন্য নিজে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করেন, স্ত্রীকেও বাধ্য করেন। বিবাহের পূর্বে তাঁরা অবশ্যই ব্রহ্মচর্য পালন করেন না। অর্থ দ্বারা তাঁরা বহু নারীসঙ্গই ক্রয় করেন, অথচ বিবাহের দায়িত্ব গ্রহণ করেন না। আবার বহু নারী পুরুষের আধিপত্য স্বীকারে অনিচ্ছুক, তাই বিবাহ করতে চান না, অথবা নিতান্ত বাধ্য, গো-বেচারী ধরনের পুরুষ, যাকে তাঁরা ইচ্ছামত চালাতে পারবেন, তাকেই বিয়ে করতে সম্মত হন। বিয়ে করেও, অনেক বিত্তশালিনী জীবনের আনন্দ ও দৈহিক আকর্ষণ নষ্ট হবে আশঙ্কা করে সন্তান-ধারণের পরিবর্তে কুকুর পোষেন। এই সমস্ত আধুনিক সমাজের ব্যবহার গভীর ব্যাধিরই লক্ষণ।[১৯] আশঙ্কার বিষয় আমাদের সমাজেও এই ব্যাধির লক্ষণ ক্রমশ. দেখা দিচ্ছে।

১৯ Presssey & Pressey—Mental Abnormality & Deficiency, p. 63

সুব্যবস্থিত ব্যক্তি কে?

বাস্তবিক পক্ষে অব্যবস্থিততা (mal-adjustment) নেতিবাচক অবস্থা এবং এটা স্বভাবের ব্যতিক্রম। স্বাস্থ্য ও সুসাম্যই স্বাভাবিক। যদিও অস্বাভাবিক ও ব্যতিক্রমরাই বেশী সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, বাস্তবিক পক্ষে তাদের সংখ্যা নগণ্য। কাজেই এ কথা সহজেই বলা যায়, যারা স্বাভাবিক, সুস্থ ও সুব্যবস্থিত, তারাই হল মাপকাঠি। যারা অব্যবস্থিত তারাই ব্যতিক্রম।

চতুর্থ অধ্যায়

মনের সুস্থতার লক্ষণ

মানসিক সুস্থতার লক্ষণ কি? দেহের স্বাস্থ্যের বেলায় আমরা বলি, যে ব্যক্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ ও সুগঠিত, যার বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে সুসঙ্গত সম্বন্ধ আছে, যার দৈহিক ক্রিয়াগুলি নিয়মিত,স্বাভাবিক এবং সতেজ আনন্দপূর্ণ, সে হল প্রকৃত সুস্থ। যদিও দেহের স্বাস্থ্য ও মনের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ একার্থবাচক নয়, তথাপি একথা নিশ্চিতই বলা চলে যে দেহকে মন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে বোঝা যায় না এবং যার মনের সমতা ও সুসঙ্গতির অভাব, সে ব্যক্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুগঠিত ও সুসমঞ্জস হলেও সে দৈহিক দিক থেকেও সম্পূর্ণ সুস্থ নয়। মন যেখানে অসুস্থ, দেহ সেখানে সম্পূর্ণ সুস্থ থাকতে পারে না। মনের স্বাস্থ্য একটা **অস্তিবাচক অবস্থা,** কিন্তু এ অবস্থা **আপেক্ষিক**। যে সাধারণ মানুষ তার শক্তি ও সম্ভাবনার নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে জীবনের মৌলিক দাবি মেটাতে পারে এবং যার ব্যক্তিগত জীবন সমাজজীবনের সঙ্গে সুসঙ্গত, সেই মানুষকেই আমরা বলি মানসিক দিক থেকে সুস্থ। সে আপেক্ষিক ভাবে নিজের সঙ্গে এবং পরিবেশের সঙ্গে সংঘর্ষ- ও বিরোধ-বিমুক্ত এবং প্রফুল্লচিত্ত। **'আপেক্ষিক'** বলার তাৎপর্য হচ্ছে সুস্থব্যক্তির নিজের মধ্যে অথবা পরিবেশের সঙ্গে একেবারেই কোন বিরোধ থাকবে না, এটা অসম্ভব এবং ব্যক্তির মানসিক সুস্থতা ও প্রফুল্লতার অবস্থানুযায়ী তার ব্যতিক্রম ঘটে।[১] এই সংজ্ঞার মধ্যে জোরটা বিরোধশূন্যতা-রূপ নেতিবাচক অবস্থার ওপর নয়, অস্তিবাচক সুষমতা ও প্রফুল্লতার ওপরে। এই কথাটা, দৈহিক- ও মানসিক-স্বাস্থ্য এ দুয়ের বেলায়ই সত্য।

মনের স্বাস্থ্যের একটা দিক হচ্ছে ব্যক্তির নিজস্ব আন্তরিক সুষম অবস্থা সম্পর্কে এবং আর একটা দিক হচ্ছে সমাজের সঙ্গে সঙ্গতি সম্পর্কে। ব্যক্তির

১ A normal state of well-being is a positive but *relative* quality of life. It is a conditiou which is characteristic of the average person who meets the demands of life on the basis of his own capacities and limitations. By the word *relative* we imply that the degree of mental health which an individual enjoys at a time is continuously changing. Johns, Sutton, Webster & Lloyd—Health for effective Living, p. 17

নিজের দিক থেকে যে মানুষ মনের স্বাস্থ্যের অধিকারী, সে প্রাত্যহিক জীবনের সমস্যার দ্বারা ভীত-অভিভূত নয়, সে আত্মপ্রত্যয়শীল এবং স্বচ্ছন্দ ও শান্ত। বিভিন্ন বিরোধী, অনিয়ন্ত্রিত আকাঙ্ক্ষা তার শক্তি ও কুশলতাকে ক্ষয় করে না এবং হীনতাবোধ বা পাপবোধ দ্বারা সে ভারাক্রান্ত নয়। অন্যদিকে, নিজ পরিবার, কর্মস্থল ও সামাজিক অন্য ক্ষেত্রে, সে সহজে পরিবেশের সঙ্গে যুক্তিগত সম্বন্ধস্থাপনে সক্ষম হয়, এবং নিজ ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি শান্তভাবে স্থির করতে পারে।

যে মানুষ মানসিক সুস্থ তার একটি গঠনাত্মক ও অস্তিবাচক জীবন-দর্শন আছে। সে এই জগৎকে অস্বীকার করে না—এ জগৎ ও জীবনের দায়িত্ব ত্যাগ করে কাপুরুষের মতো সে পালিয়ে বাঁচতে চায় না। চিন্তা ও কর্মের মধ্য দিয়ে জীবনকে সে উপভোগ করে।[২]

এমন ব্যক্তি কল্পনা দিয়ে বাস্তব জগতের সমস্যাকে বাড়িয়ে দেখতে চায় না। সে বাস্তব জগতের রূঢ় সত্যের সম্মুখীন হয়ে, যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে, বাস্তব গঠনাত্মক উদ্যম দিয়ে, সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে চায়। কাল্পনিক বৃথা ভয়ের দ্বারা সে নিজের স্বচ্ছ দৃষ্টিতে আচ্ছন্ন করে না এবং নিজ শক্তিকে অবসন্ন করে না।

মানসিক যে সুস্থ, সে জানে যে এ জগতে দুঃখ বিফলতা নিরাশা আছেই। একে মেনে নিয়েও সে আশাবাদী। সে মানুষের শক্তি ও মৌলিক সততায় বিশ্বাসী।

তার অনুভূতি ও প্রক্ষোভের ওপর শাসন ও সংযম আছে। রাগ ভয় ভালবাসা ঈর্ষা ইত্যাদি সমস্ত প্রক্ষোভের সঙ্গে সে পরিচিত, কিন্তু কোন অনুভূতিই তাকে অভিভূত করে না। প্রক্ষোভের প্রকাশে সে সামাজিক ভদ্রতা ও শালীনতার সীমা রক্ষা করে। কোন অবস্থায়ই সে সংযম হারিয়ে দিশাহারা হয় না।

নিজ দেহের স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়ে সে মনোযোগী। নিয়মিত খাদ্যগ্রহণ, বিশ্রাম ও ব্যায়াম দ্বারা সে দেহকে সবল ও কর্মক্ষম রাখতে সচেষ্ট। সে এই দেহকে পাপ বলে (পাপোহং পাপসম্ভবম্) ঘৃণা করে না এবং ক্ষুধা তৃষ্ণা মৈথুন

২ A mentally healthy person has developed a zest of living that includes a desire for activity which is reflected in an attitude of utilising whatever potentialities he possesses, in productive forms of behaviour. Fromm—Man for himself, p. 5

ইত্যাদি দেহের স্বাভাবিক দাবি স্বাস্থ্যবিধি এবং সমাজসম্মত সীমার মধ্যে অসঙ্কোচে মিটিয়ে থাকে।

সে স্বাধীন চিন্তায় অভ্যস্ত এবং কঠিন ও জটিল সমস্যা-বিষয়েও স্থির সিদ্ধান্তগ্রহণে অভ্যস্ত।

নানা বিষয়ে তার আগ্রহ ও আনন্দ আছে এবং কাজ ও খেলাধুলার মধ্যে একটি সুসঙ্গত সম্বন্ধস্থাপনে সে সমর্থ।[৩]

জীবন ও জগৎ সম্পর্কে জীবন্ত আগ্রহ ও অনুরাগ সত্ত্বেও তার মধ্যে দার্শনিকসুলভ কিছুটা নিরাসক্ততা আছে। মানুষের শক্তিতে বিশ্বাসী হলেও সে জানে এক অমোঘ অলৌকিক শক্তি বিশ্বজগৎকে নিয়ন্ত্রণ করছে। সে কর্মী। কিন্তু সে বিনম্র ভক্তও। সে প্রীতি-দান ও -গ্রহণ করতে পারে। সমাজজীবনে সফল ভাবে বাঁচতে গেলে বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ব্যক্তিকে বিবিধ সম্বন্ধে যুক্ত হতে হয়। মানসিক স্বাস্থ্যসম্পন্ন ব্যক্তি সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা এবং ভাব ও উদ্যোগের আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে সমাজে নিজের স্থানটি স্বচ্ছন্দে খুঁজে নিতে পারে। সমাজজীবন নিত্যই প্রবহমান, তার শক্তিগুলি নিয়ত পরিবর্তনশীল। যে মানুষ মানসিক সুস্থ, সে এই নিত্য পরিবর্তনের মধ্যে, বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে, নিজের ও অপরের সঙ্গে সামঞ্জস্য- ও সঙ্গতিবিধানে সমর্থ। অতিরিক্ত উদ্বিগ্ন না হয়ে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও সিদ্ধান্তগ্রহণ, দায়িত্বগ্রহণ প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য ও তৃপ্তিবোধ এবং নিজ সাধ্য-অনুযায়ী কুশল ভাবে উদ্দেশ্যসাধন—এ সবই মানসিক সুস্থতার লক্ষণ। মানসিক সুস্থ যে ব্যক্তি তার মধ্যে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি উল্লেখযোগ্য :

(১) এমন ব্যক্তি নিজ ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার প্রকৃতি- ও বিষয়-সম্পর্কে সচেতন, নিজ সামর্থ্য ও দুর্বলতা সম্বন্ধেও সে অন্ধ নয়। সে নিজ চরিত্র ও ব্যবহারের বস্তুগত নিরপেক্ষ বিচারে সক্ষম এবং নিজ ত্রুটি ও দুর্বলতা স্বীকার করে সে কাজে প্রবৃত্ত হয়।

(২) কিন্তু নিজ মূল্য ও স্থান সম্পর্কেও সে সচেতন। অযথা হীনমন্যতার ভারে সে পীড়িত নয়। সে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এবং পরিবার বা গোষ্ঠীর মধ্যে সে নিশ্চিন্ত।

৩ Bhatia & Craig—Elements of Psychology & Mental Hygiene, pp. 257-58.

(৩) তার এই প্রত্যয় আছে যে পরিবার বা বৃহত্তর সমাজগোষ্ঠীতে সে অনেকের প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র। সে নিজেকে অবাঞ্ছিত বোধ করে না।

(৪) তার নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে আত্মবিশ্বাস আছে। সে যেমন অতিরিক্ত উচ্চাশা-তাড়িত হয়ে অসম্ভব-সাধনের জন্যে অস্থির হয় না, তেমনি দৈনন্দিন সমস্যাগুলির সামনে সে নিজেকে অসহায় বোধ করে না। নিজের ওপরে এ আস্থা তার আছে যে, জীবনের সমস্যাগুলি নিজ চেষ্টাদ্বারা সে সমাধান করতে পারবে।

(৫) সে অন্য মানুষের অভিসন্ধি-বিষয়ে অযথা সন্দেহ পোষণ করে না। অপরকে সে স্বাভাবিকভাবে বিশ্বাস করে, এবং অপরের সঙ্গে প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হতে সে সক্ষম। দশের মধ্যে সে দিশাহারা হয় না, বরঞ্চ অন্যের সঙ্গ তার কাছে প্রীতিপ্রদ।

(৬) বুদ্ধি ও বিবেচনার সঙ্গে সে নিজের বাহ্য পরিবেশকে বিচার করতে পারে এবং তার পরিবেশের প্রকৃতি তার কাছে জ্ঞাত বলেই সে ভরসা হারায় না, সে উদ্বেগকর কর্মের মধ্যেও শান্ত থাকে। সে বীর হয়েও ভক্ত। বীরত্ব ও মাধুর্য তার চরিত্রে অঙ্গাঙ্গি-সম্বন্ধে জড়িয়ে আছে।[৪] সে বাস্তবিক ধার্মিক।

অবশ্যই এই লক্ষণগুলি পরিপূর্ণ আদর্শ মানুষেরই লক্ষণ। এই মানুষই কর্মযোগী ও স্থিতধী।

মানসিক সুস্থতার ভিত্তি

মানসিক সুস্থতার মূল ভিত্তি চারটি :

(১) বংশগতি

(২) দৈহিক অবস্থা

(৩) গৃহ বিদ্যালয় প্রতিবেশী ইত্যাদি সামাজিক সংস্থা

(৪) বাড়ন্ত ও বাল্য- ও কৈশোর-জীবনের মৌল প্রয়োজন ও তাড়না-গুলির তৃপ্তির ব্যবস্থা।

৪ ধার্মিকের লক্ষণই নিয়তকর্মশীলতা ; কর্মপরায়ণ থাকাই ধর্মপরায়ণ হয়ে ওঠা। কার্মিকই ধার্মিক।…কিন্তু জ্ঞান আর কর্ম দাঁড়াবে কোথায়? দাঁড়াবে ভক্তিতে। ভালবাসায়। ঝিনুক বালিকেই মুক্তো করে, তেমনি প্রেম মানুষকেই উদার করে তোলে। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত—ভক্ত বিবেকানন্দ, পৃঃ ২৬, ৩০

(১) **বংশগতি**—ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক বিকাশের সীমা ও সম্ভাবনা বংশগতি দ্বারা নির্দিষ্ট। বুদ্ধি প্রকৃতি চেহারা ইত্যাদি শক্তি ও সম্ভাবনার বিকাশের গতি বা ধারা, কতটা তারা বিকশিত হবে, এবং কোন্ দিকে বিকশিত হবে, তা অবশ্য অনেকটা নির্ধারিত হয় পরিবেশ দ্বারা। ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য নির্ভর করে, ব্যক্তির শক্তি-সম্ভাবনার স্বচ্ছন্দ বিকাশ এবং সুষম ব্যবহারের সুযোগের ওপরে। পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানা যায়, কোন কোন ব্যক্তির জন্মগত মানসিক গঠনই এমন যে সামান্য প্রতিকূল অবস্থার চাপেই তার বিশেষ ধরনের মানসিক বিকৃতি দেখা দেয়। ঠিক একই অবস্থায় আর একজন ব্যক্তি কিন্তু শান্ত থাকে, তার মনে কোন বিকার দেখা দেয় না। গভীর ও কঠিন মানসিক রোগীর বংশগতি অনুসন্ধান করে জানা গেছে, তাদের দৌর্বল্যের মূলে জন্মগত স্নায়বিক অসাম্য (hereditary nervous imbalance) বর্তমান থাকে।[৫]

(২) **দৈহিক সুস্থতা**—দেহ ও মন অচ্ছেদ্য, নিবিড় সম্বন্ধে যুক্ত। তাই সর্বদাই আমরা দেখি, দেহ সুস্থ ও সতেজ থাকলে মনও শান্ত ও প্রফুল্ল থাকে। দেহ যখন অসুস্থ তখন নতুন বা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিবিধান কঠিন হয়। দেহে খাদ্যপ্রাণ (vitamins), ক্ষার (calcium) লৌহ ও অন্যান্য ধাতব লবণের (mineral salts) অভাব মানসিক বিষণ্ণতা, দৌর্বল্য এবং অন্যান্য লক্ষণ উদ্রেক করে। রসক্ষরা গ্রন্থির যথোপযুক্ত ক্ষরণ-ব্যতিরেকে সুষ্ঠু ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় না। আরো দেখতে পাওয়া যায়, যারা চক্ষুহীন, বধির বা কোন অঙ্গহীন তারা অনেক সময় মনের মধ্যে হীনতাবোধ ও হিংসা পোষণ করে। ইতিবাচক ভাবে বলা যায়, যে মানুষ নিয়মিত খাদ্য, ব্যায়াম, বিশ্রাম এবং স্বাস্থ্যবিধিসম্মত জীবনযাপন করে সে মনের দিক থেকেও শান্ত ও প্রসন্ন থাকে।[৬]

৫ Defective heredity may furnish a fertile soil for the development of mental and nervous diseases, but so far as minor personality mal-adjustments are concerned, heredity supplies, only a predisposing condition. Wallin—Personality, Mal-adjustments & Mental Hygiene, p. 56

৬ Persons suffering from serious physical defects may have problems of adjustment on account of inferiority feelings which they have not been able to deal with adequately. Positively speaking, the individual who follows a hygienic regimen, pertaining to food, drink, elimination, bathing, physical activity, work, sleep, rest, relaxation, prevention of disease and correction of defects is more likely to have mental health. Bhatia and Craig—Elements of Psychology & Mental Hygiene, p. 263

সুষ্ঠু সমাজজীবন—সমাজের নিকট থেকেই শিশু তার দৃষ্টিভঙ্গী, রুচি, নৈতিক আদর্শ, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি গ্রহণ করে। কাজেই এটা সহজেই বোঝা যায় যে যেখানে সমাজজীবন নির্মল ও উদ্যমশীল, সেখানে ব্যক্তির পক্ষে সঙ্গতিকরণের কাজ সহজ ও প্রীতিপ্রদ হয়।

সমাজজীবনের প্রধান কয়টি সংগঠন হচ্ছে: পরিবার, বিদ্যালয় ও প্রতিবেশী। পরিবারের মধ্যে পিতামাতার প্রভাব শিশুর ওপর সর্বাধিক। যে পরিবারে মাতা সুস্থ শান্ত স্নেহশীলা বুদ্ধিমতী সদাচারপরায়ণা, সেখানে শিশুও মানসিক সুস্থ থাকে। শিশুর অবাধ্যতা ও অপরাধ-প্রবণতার (অর্থাৎ মানসিক অসুস্থতার) একটি প্রধান কারণ দুষ্ট পারিবারিক প্রভাব। যেখানে পিতামাতার মধ্যে সহজ প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্বন্ধ নেই, যেখানে গৃহ বিধ্বস্ত, সেইসব পরিবারের সন্তানদের মধ্যেই মানসিক সঙ্গতিবিধানের সমস্যা সবচেয়ে বেশী দেখা যায়।

বিদ্যালয়ে শিশু একদিকে যেমন বাধ্যতা সৌহার্দ্য নিয়মানুবর্তিতা পরিশ্রম ইত্যাদি সদ্‌গুণ অর্জন করে, তেমনি সহপাঠী ও শিক্ষকের সাহচর্যে নিজ জীবনকে বিস্তার ও বিকাশের সুযোগলাভ করে। ব্যক্তির বুদ্ধি নিপুণতা আত্মনির্ভরতা আত্মমর্যাদা ইত্যাদি গুণ মানসিক বিকৃতি থেকে ব্যক্তিকে রক্ষা করতে সাহায্য করে এবং ইতিবাচক ভাবে সুস্থ মানসিক জীবনগঠনে সহায়ক হয়।[৭]

প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্কের মধ্য দিয়েই ব্যক্তি বৃহত্তর সমাজের জীবনের স্বাদগ্রহণ করে। সুস্থ ও পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যে এপ্রকার সহযোগিতা-প্রতিযোগিতা সম্পর্ক নিতান্ত আবশ্যক। সুস্থ প্রতিবেশী-কেন্দ্রিক সমাজজীবন সুস্থ ব্যক্তিত্বগঠনের বিশেষ সহায়ক।[৮] এই সুস্থ জীবনের সহায়ক প্রতিষ্ঠান হচ্ছে হাসপাতাল লাইব্রেরি খেলাধুলা এবং সামাজিক উৎসবের ব্যবস্থা।

৭ The school can develop a sense of personal worth, social growth and special competence if its experiences are satisfying and if they evoke affectional responses. Such a school is a positive factor in the development of sound mental health. Ibid, p. 293

৮ The community furnishes the framework and climate within which the family lives and develops; it must therefore, provide a healthy atmosphere and a well-organised net-work of public and private community service of the highest possible quality. Fred McKinney—Psychology of Personal Adjustment, p. 53

বাল্যকালে জীবনের মৌলিক প্রয়োজনগুলির তৃপ্তি—দেহের মৌলিক প্রয়োজনগুলি (খাদ্য, পানীয় ইত্যাদি) যথাসময়ে তৃপ্ত না হলে শুধু শারীরিক ক্লেশের কারণই নয়, মানসিক অশান্তিও সৃষ্টি করে। সুস্থ দেহ ও সুস্থ মনের জন্য সমগ্র দেহযন্ত্রের এ স্বাভাবিক দাবিগুলি যথাসময়ে মেটাতেই হবে। বাল্যকালের সম্বন্ধে একথা বিশেষভাবে সত্য।[৯]

দেহের যেমন কতগুলি মৌলিক প্রয়োজন মেটান দরকার, তেমনি শিশুর মানসিক জীবনেরও কয়েকটি অপরিহার্য দাবি আছে। তার মধ্যে দুটি হচ্ছে প্রধান :—**নিরাপত্তাবোধ ও স্বাধীনতা**। পিতামাতার প্রচুর স্নেহের অভাব ঘটলে শিশু নিজেকে অসহায় (insecure) পরিত্যক্ত (rejected) ও মূল্যহীন বলে মনে করে। এই বুকজুড়ানো স্নেহের ওপর মাতৃস্তন্যের মতোই শিশুর স্বাভাবিক ও জন্মগত দাবি রয়েছে। যেখানে এর অভাব ঘটে, সেখানকার শিশুর ভবিষ্যৎ মানসিক বিকারের আশঙ্কা থাকে। অন্যদিকে, স্নেহ ও সাবধানতা দিয়ে শিশুকে অতিরিক্ত ঘিরে রাখলেও শিশুর স্বাভাবিক ও স্বাধীন ব্যক্তিত্বের বিকাশ ব্যাহত হয়। যে পরিবারে শিশুর এই মৌল প্রয়োজন ও স্বাভাবিক দাবি মেটাবার ব্যবস্থা আছে, সেখানেই সুস্থদেহ ও সুস্থমন মানবশিশু স্বচ্ছন্দে ও সতেজে বেড়ে ওঠে।[১০]

আপাত বিপরীত এই দুটি দাবি—স্নেহের আকাঙ্ক্ষা ও নিরাপত্তাবোধ, এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও আত্ম-উন্মোচনের আগ্রহ—এ দুটি মেটাবার সুব্যবস্থা থাকলে মানস-জীবনের সুস্থতা অব্যাহত থাকে।

৯ Hunger, thirst, fatigue, lack of sleep, physical pain, exercise, heat or cold and the like set up certain tensions in the individual which must be relieved. Preston—Substance of Mental Health, p. 11

১০ The child feels secure, when he is reassured that his parents care for him, want him, and accept him, as he is. Accepted in this way, the child can establish healthy relationship with the world outside...the second ego-need is for recognition or regard as a person of worth and importance. Once the child has a 'feeling of adequacy and importance, he will be able to cope with and if possible solve the problems which confront him. **Hadfield—Psychology & Mental Health, p. 23**

পঞ্চম অধ্যায়

মনের রুগ্ণতার কারণ

পূর্বেই বলেছি আধুনিক মনোবিদেরা মানসিক রোগকে দৈব বা আকস্মিক (supernatural or accidental) মনে করেন না। প্রাকৃতিক কারণ থেকেই মানসিক স্বাস্থ্যের বৈকল্য বা বিকৃতি ঘটে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান দ্বারা মনোবিদ্ সেই কারণগুলি বা তার উৎপাদক অবস্থাগুলি (contributing factors) নির্ধারণ করতে চেষ্টিত হয়েছেন। বহু বর্ষব্যাপী বহু বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন মনোবিদের সতর্ক অনুসন্ধান ও ধীর বিশ্লেষণের ফলে এ সিদ্ধান্ত স্থাপিত হয়েছে যে মানসিক রুগ্ণতার কারণ একটি মাত্র নয়—বহু অবস্থা এই বিকৃতির জন্য দায়ী।[১] এই কারণ বা অবস্থাগুলিকে আমরা প্রধান কয়টি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি: যথা, (১) বংশগতি (heredity), (২) দৈহিক ও স্নায়বিক অসুস্থতা (physiological & neurological abnormality), (৩) পরিবেশগত ও সামাজিক প্রতিকূল অবস্থা, (৪) অমীমাংসিত মানসিক সংঘাত, অস্থিরতা এবং চেতনার বিচ্ছিন্নতা।

(১) বংশগতি—মানসিক বিকারকে আধুনিক মনোবিদ্ কলেরা বা বসন্তের মতো 'রোগ' (disease) বলে মনে করেন না এবং মানসিক বিকৃতি মাত্রই বংশগত কারণে ঘটে ও উত্তরপুরুষে বর্তায়, এ কথাও বিশ্বাস করেন না। কিন্তু মানসিক যারা রুগ্ণ তাদের অধিকাংশের পূর্বপুরুষদের মধ্যে মানসিক ন্যূনতা বা বিকৃতি থাকে এ কথা সত্য। সম্ভবত মানসিক রোগটা বংশগতির ধারায় উত্তরপুরুষে বর্তায় না, কিন্তু এর প্রবণতা যে তাদের মধ্যে বংশগতির সূত্রে এসে পৌঁছায়, এটা প্রায় নিঃসন্দেহ। এদের মস্তিষ্কের স্নায়বিক গঠনে উচ্চ মস্তিষ্কের বোধকেন্দ্র (sensory centres), ধারণাকেন্দ্র (retentive centres) ও সংযোগকেন্দ্রে (association centres) দুর্বলতা অথবা

১ ...mental illness is as much the result of organic, physiological and biochemical factors as that of social and cultural forces and disturbed human relationships which concern the impulses, affective experiences and other needs and purposes of the individual's inner life. Hart—Psychopathology, p. 59

সংবদ্ধতার অভাব থাকে, এটা অনুমান করা যেতে পারে। খুব সম্ভব বংশগতির মূল দৈহিক একক জীন্-এর (Genes, the original primary units of hereditary traits) মধ্যেই এর মূল খুঁজতে হবে। কিন্তু পিতামাতা বা নিকট-পূর্বপুরুষদের মধ্যে গুরুতর মানসিক রুগ্‌ণতা (যথা, উন্মাদরোগ বা insanity) থাকলেই তা উত্তরপুরুষে অবশ্যই দেখা দেবে, এমন নয়; তবে তার প্রবণতা বা সম্ভাবনা যথেষ্ট থাকে এবং প্রতিকূল সংঘাতপূর্ণ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েও স্থির হয়ে থাকার যে স্বাভাবিক ক্ষমতা সাধারণ মানুষের থাকে, তা এদের থাকে না, অর্থাৎ সহজেই এরা মানসিক স্থিরতা হারিয়ে ফেলবে এ ভয় থাকে।[২]

দেহাভ্যন্তরস্থ অবস্থা এবং মস্তিকের স্নায়বিক বিকার

হলম্যান্ (Holman) দেহের অভ্যন্তরস্থ প্রধান কয়টি মানসিক রুগ্‌ণতার কারণ (principal organic causes) হিসাবে নিম্নলিখিত কয়টি অবস্থার উল্লেখ করেছেন :

(ক) মস্তিষ্কের তন্তুর ধ্বংস ;

(খ) বিষক্রিয়ার ফলে মস্তিষ্কের তন্তুর হানি ;

(গ) রক্তের রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে মস্তিষ্কের তন্তুদের স্বাভাবিক ক্রিয়ায় বাধা ;

(ঘ) অভ্যন্তরস্থ গ্রন্থির ক্ষরণের ফলে মস্তিষ্কের স্নায়ুপদার্থের ক্রিয়ায় বিশৃঙ্খলা।

উচ্চমস্তিষ্কের বোধকেন্দ্র (sensory centres), কর্মকেন্দ্র (motor centres), সংযোগকেন্দ্র (association centres) এবং ধারণাকেন্দ্রগুলির (centres of retention) সুস্থ ও স্বাভাবিক ক্রিয়ার ওপরেই ব্যক্তির

২ Studies have revealed that about three-fourths of mental defectives and one-third of psychotic individuals owe their defective condition mainly to unfavourable heredity. What one inherits is not the illness or its symptoms but a proclivity or predisposition to develop the illness—a peculiarity of the physiological-neural constitution which plays an improtant part in psychological functioning, This predisposition is determined by 'genes' the primary units of heredity. But a predisposition or proclivity suggests a strong possibility but it does not mean that the individual must develop that illness. Noyes—A Text book of Psychiatry, p. 38

মানসজীবনের সুস্থতা নির্ভর করে। ব্যাধি আঘাত বা স্বাভাবিক বিকাশে ব্যাঘাতের ফলে যদি এই কেন্দ্রগুলির কোন একটিতে অথবা অনেকগুলিতে ক্ষত অথবা রুগ্‌ণতা দেখা দেয়, তবে স্বাভাবিক ভাবেই ব্যক্তির মানসজীবনে তা প্রতিফলিত হবে।[৩]

(ক) মস্তিষ্কে গুরুতর আঘাতের ফলে মস্তিষ্কের তন্তু ধ্বংস হলে অথবা ছিন্ন হলে ব্যক্তির বাক্য-বিষয়ে ক্ষমতার বিলুপ্তি (word-blindness, word-deafness) দেখা দিতে পারে। মস্তিষ্কে উপদংশ-জীবাণুর আক্রমণ (brain syphilis), মস্তিষ্কে জলসঞ্চয় (encephalitis) বা উচ্চ রক্তচাপের ফলে স্নায়ুতন্তুর ভঙ্গুরতা বা রুগ্‌ণতার (arteriosclerosis) ফলে স্মৃতিলোপ, বুদ্ধিভ্রংশতা, সুশৃঙ্খল চিন্তার ক্ষমতার বিলুপ্তি বা শৈথিল্য, অস্বাভাবিক রুক্ষ মেজাজ অথবা অহেতুক উদ্বিগ্নতা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং দেখা দেয়ও।

(খ) বিষ- বা মাদকদ্রব্য-গ্রহণে মস্তিষ্কতন্তুতে বিশৃংখলা বা রুগ্‌ণতা সৃষ্টি হয়, গুরুতর ক্ষেত্রে তন্তু ধ্বংস হয়ে যায়। অ্যাল্‌কহল্‌ বা মদ্যজাতীয় পদার্থ মস্তিষ্কের উচ্চতর বোধ-, কর্ম-, সংযোগ- ও ধারণা-কেন্দ্রের ওপর প্রতিকূল ক্রিয়া সৃষ্টি করে, এবং এটা সকলেই প্রায় লক্ষ্য করেছেন যে, মদ্যপেরা নানা কাল্পনিক চিন্তার বশে পশুর মতো নির্লজ্জ আচরণ করে অথবা শিশুদের মতো নির্বোধ বা হাস্যকর কাজ করে। আফিং গাঁজা ভাং এবং এজাতীয় মাদক দ্রব্যে যারা অভ্যস্ত (drug addicts) তাদের স্বচ্ছ চিন্তার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়—যদিও সামাজিক ভাবে একটা অকারণ আনন্দ-বিহ্বলতায় (euphoria) তারা আচ্ছন্ন হয়। ব্রোমাইড- ও বার্বিটোন্‌-ঘটিত ঘুমের ওষুধ অথবা সালফা ড্রাগস্‌ বা কোকেন্‌ বা মর্ফিন্‌ ইত্যাদি বিষাক্ত দ্রব্যের দীর্ঘকালব্যাপী ব্যবহারও মানসিক সুস্থতা ব্যাহত করতে পারে।

(গ) নানা কারণে রক্তে যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে তার ওপরে দেহ ও মনের স্বাস্থ্য অনেকটা নির্ভর করে। রক্তে শর্করার মাত্রা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেলে (যেমন বহুমূত্র রোগে) দৈহিক নানা বৈকল্য দেখা দিলেও মস্তিষ্কের তন্তুগুলির কোন হানি হয় না। কিন্তু রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে গেলে (hypoglycaemia) অকারণ রুক্ষতা (irritability), অস্বাভাবিক অভিমান (touchiness), অতিরিক্ত ক্রোধ অথবা অমূলপ্রত্যক্ষ ইত্যাদি মানসিক রুগ্‌ণতার লক্ষণ দেখা দেয়।

৩ Portia Holman—Psychology & Psychological Medicine, p. 102

সুস্থ মানুষের রক্তে অ্যাসিড ও অ্যালকালির একটা নির্দিষ্ট পরিমাণগত সম্পর্ক থাকে। সেই সুষম সম্পর্কের হানি হলে ইউরিমিয়া (Uraemia) -রূপ কঠিন ব্যাধি আত্মপ্রকাশ করে এবং মানসিক সুস্থতাও বিঘ্নিত হয়। কখনো কখনো সম্পূর্ণ স্মৃতিলোপও (dementia) ঘটে থাকে।

যক্ষ্মা ইত্যাদি ফুসফুসের রোগ, হৃদ্‌যন্ত্রের বৈকল্য, এবং রক্তে লোহিত কণিকার অল্পতার (anaemia) ফলে রক্তে অক্সিজেনের অপ্রাচুর্য ঘটে। এর সঙ্গে সঙ্গে অকারণ রুক্ষতা, অস্থিরতা ইত্যাদি মানসিক রুগ্‌ণতার লক্ষণও দেখা দেয়।

রক্তে জলের পরিমাণের বিপর্যয় ঘটলে, মস্তিষ্কের কোষে জলসঞ্চারের ফলে মৃগী অথবা মূর্ছা ইত্যাদি মানসিক রোগ দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থাকে।

(ঘ) দেহাভ্যন্তরস্থ অনালী রসক্ষরা গ্রন্থিগুলি থেকে রক্তে অত্যন্ত শক্তিশালী রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরিত হয়। এ গ্রন্থিগুলির মধ্যে থাইরয়েড, অ্যাড্রিনাল, এবং গোনাড্ গ্রন্থিগুলির অতিক্ষরণ বা ক্ষরণের অল্পতার সঙ্গে নানা মানসিক রোগের নিবিড় সম্পর্ক আছে। বিভিন্ন গ্রন্থির ক্ষরণের মধ্যে সামঞ্জস্যও সুস্থ দেহমনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। যেখানে এ ভারসাম্যের হানি ঘটে সেখানে দৈহিক নানা বিকারের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক বিকারেরও নানা লক্ষণ দেখা দেয়।[8] অস্বাভাবিক ক্লান্তি, নিরাশাবোধ, অকারণ ভয় এসব লক্ষণের মধ্যে প্রধান।

(ঙ) খাদ্যে ভিটামিনের অভাব ও পুষ্টিহীনতা শুধু দৈহিক রোগেরই কারণ নয়, মানসিক বিকৃতি-সঞ্চারকও বটে। মানসিক বহু রুগ্‌ণতার সঙ্গে

8 ...Thyroid deficiency tends to sluggishness, but if the subject is constantly criticized for his sluggishness he may develop an irritable behaviour quite different from what one would expect from the thyroid deficiency alone. Lack of gonadal hormones naturally leads to lack of sex interest, but the subject's reaction...may lead him into some a typical form of sex behaviour. Some endocrine imbalance may make an adolescent drowsy and unable to concentrate, while his appetite is enormous and he lays on great quantities of fat. Much comment is sure to arise and his reaction may be to withdraw from society, or to be sullen and resentful against authority or to acquire the habit of stealing to satisfy an appetite for sweets, Woodworth & Marquis—Psychology, p. 132

Also, Murphy, Murphy & Newcombe—Experimental Social Psychology, p. 109

ভিটামিন বি-পুঞ্জের নিকট সম্পর্ক আছে। পেলাগ্রা রোগের সঙ্গে বহু মানসিক বিকারও দেখা দেয় এবং এর কারণ হচ্ছে নিকোটিনিক অ্যাসিডের অভাব। থিয়ামিন-এর অভাবও মানসিক অস্বাস্থ্যের সঙ্গে যুক্ত।

অঙ্গহানি, ইন্দ্রিয়ের বৈকল্য ও শারীরিক ব্যাধি

যাদের কোন অঙ্গহানি ঘটেছে (খঞ্জ) অথবা ইন্দ্রিয় বিকল হয়েছে (বধির, অন্ধ) অথবা যারা বিকৃত অঙ্গ নিয়ে জন্মেছে (কুব্জ, লিঙ্গের আকার-বিকৃতি) তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজেদের হীনতা সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন ও স্পর্শকাতর (over-sensitive) হয়। সমাজও অনেক সময় তাদের কৃপা বা ঘৃণার চোখে দেখে। ফলে তারা সমাজজীবনের সাথে সুস্থভাবে সামঞ্জস্যবিধানে অসমর্থ হয় এবং তাদের মনের মধ্যে একটা হীনতা-বোধ জন্মে। অনেক সময় তারা সমাজের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে ওঠে এবং তাদের অবচেতন মনে বিকৃতি নানা অসদাচরণের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।[৫] সিফিলিস্ মৃগী যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগের অনুষঙ্গী বিষণ্ণতা হতাশা পাপবোধ উদ্বিগ্নতা ইত্যাদি মানসিক অশান্তি।

ক্লান্তি

দৈহিক ও মানসিক শ্রমের ফলে ক্লান্তি অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু অত্যন্ত প্রতিকূল, বিরক্তিজনক বা বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে কাজ এবং শারীরিক বিশ্রামের অভাব বা মানসিক উদ্বেগের ফলে অনেক সময় গভীর অবসাদ দেখা দেয়। তার সঙ্গে যুক্ত থাকে অস্বাভাবিক ভয়, জীবনে হতাশা, আত্মহননেচ্ছা ইত্যাদি মানসিক বিকৃতি। দীর্ঘকাল অনিদ্রা দেহের পক্ষের শুধুই ক্লান্তিকর নয়, মানসিক বিকার-সঞ্চারকও বটে।

অস্ত্রোপচার ও আকস্মিক আঘাত

রোগীকে পূর্বে উপযুক্তভাবে প্রস্তুত না করে দেহের কোন কোন স্থানে (মস্তিষ্ক, জননেন্দ্রিয়) অস্ত্রোপচার মানসিক দুর্বল ব্যক্তিদের মানসিক স্থৈর্য-

৫ Physical defects include all physical anomalies or disturbances... These defects generally tend to create a sense of inability to meet the social situation and lead to feeling of inferiority and insecurity. These, in turn, may cause undesirable psychological reactions of a compensatory, aggressive or other defensive nature. Evelyn Pearce—Nurse & Patient, p. 98

হানির পক্ষে যথেষ্ট হতে পারে। অকারণ মৃত্যুভয়, উন্মাদ হবার ভয়, সন্তান-উৎপাদন বা সন্তান-ধারণের ক্ষমতাহানির ভয় রোগীদের অস্বাভাবিক ভাবে অভিভূত করতে পারে। আকস্মিক দৈহিক ও মানসিক আঘাতেরও অনুরূপ প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া দেখা যেতে পারে।

গর্ভাবস্থা

গর্ভাবস্থায় নারীর দেহে স্বাভাবিক ভাবে কতকগুলি পরিবর্তন ঘটে, তার অনুষঙ্গী কতকগুলি অস্বস্তি (বমনেচ্ছা, মাথা-ঘোরা) অবস্থাও দেখা দেয়। অনেকের এ সময় নানা জিনিস খেতে ইচ্ছা হয় (দোহদ লক্ষণ)—পোড়ামাটি, ইত্যাদি জিনিসের প্রতিও কারো কারো অস্বাভাবিক আকর্ষণও দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি মানসিক পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যায়। অনাগত সন্তানের জন্যই শুধু নয়, সাধারণভাবে সকলের প্রতিই কোমল স্নেহময় ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কারো কারো ক্ষেত্রে অত্যন্ত উদ্বেগ বিষণ্ণতা অস্বাভাবিক ক্লান্তিবোধ অনিদ্রা ইত্যাদি মানসিক অস্থিরতার লক্ষণও দেখা যায়। বিশেষ করে যে সব নারীর বিবাহিত জীবন সুখের নয়, সন্তান-ধারণ যেখানে তার কাছে অবাঞ্ছিত, সেখানে স্বামী বা সন্তানের প্রতি বিদ্বেষ বা বিমুখতা দেখা দিতে পারে। যে নারীর বিবাহপূর্বে গোপনে অন্যপুরুষ-সংসর্গ ঘটেছে তার মনে এ সময়ে তীব্র পাপবোধের অশান্তি দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থাকে।

প্রথম রজোদর্শন, রজোবন্ধ ইত্যাদি সংকটকাল (Epochal crises)

যৌবনাগমের (adolescence and puberty) সময়টা পুরুষ ও নারী উভয়ের পক্ষেই একটা উন্মাদনা ও অস্থিরতার অবস্থা। আবার ৪৫-৫০ বৎসরের সময় রজোবন্ধের কালে (climacteric or menopause) নারীর মধ্যে অনেক সময় মানসিক নানা অস্থিরতা দেখা দেয়। পুরুষদেরও আর একটু বেশী বয়সে (৫৫-৬০) মানসিক অশান্তি বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকে। আবার বার্ধক্যাগমে মৃত্যুভয়, অনিরাপত্তা-বোধ বৃদ্ধি হয় এবং ব্যক্তির মানসিক সুস্থতা অনেক সময় বিঘ্নিত হয়। ষাট বৎসরের পরে মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্র ক্রমে ক্রমে নির্জীব হয়ে পড়ে এবং স্মৃতিশক্তি বিচারশক্তি ইত্যাদি হ্রাস পায়।

মানসিক কারণ

মানসিক রুগ্ণতার অন্য বহু কারণ থাকলেও মানসিক কারণই যে সর্বাপেক্ষা গুরুতর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই মানসিক কারণগুলি (psychogenic factors) ব্যক্তির মৌলিক জৈব প্রয়োজন, সহজাত প্রেষণা ও অনুভূতির অতৃপ্তি, অবচেতন মনে সংঘাত, এবং অসন্তোষজনক ব্যক্তি-সম্বন্ধেব সঙ্গে যুক্ত।

বুদ্ধির ক্ষীণতা এবং মানসিক রুগ্ণতা সমার্থক নয়, কিন্তু মানসিক রোগের বহু হাসপাতালে রোগীদের বুদ্ধিবৃত্তি পরীক্ষা করে একথা নিশ্চিত করে জানা গেছে যে গড়পড়তা হিসাবে মানসিক রোগীদের মধ্যে বুদ্ধির ক্ষীণতা সাধারণের চেয়ে বেশী।

যে পরিবারে বা সংসারে কলহ ঈর্ষা নিন্দাপরায়ণতা ইত্যাদি দ্বারা ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে সম্পর্ক বিষদুষ্ট, সেখানে ব্যক্তির মনের স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হবে এটা সহজেই বোঝা যায়।

বিশেষত শৈশবে এই জাতীয় অপ্রীতিকর গৃহপরিবেশ অত্যন্ত প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে। শিশুর কাছে পিতামাতা সমস্ত শক্তি, সমস্ত স্নেহ, সমস্ত সৌন্দর্যের আকরস্বরূপ। শিশু পিতা ও মাতার সঙ্গে সম্পূর্ণ ভাবে এক হতে চায় (identification)। মার সঙ্গে নাড়ীর যে অচ্ছেদ্য বন্ধন ভ্রূণাবস্থায় ছিল, জন্মের পরও তা শিশুর মনের দিক থেকে ছিন্ন হয়ে যায় না। কাজেই পিতা ও মাতার মধ্যে যদি সহজ ভালবাসা ও শ্রদ্ধার সম্বন্ধ না থাকে, তা হলে তারাও পিতামাতার নিকট থেকে স্বতোৎসারিত স্নেহ-ভালবাসা পায় না। তাতে তারা নিজেদের অসহায় ও অ-নিরাপদ বোধ করে। তাদের অবচেতন মনে এ জন্যে অস্বস্তি সৃষ্টি হয় এবং পিতামাতার একজন বা উভয়ের প্রতি একটা বিদ্বেষের ভাব অচেতনভাবেই তাদের মনে সঞ্চিত হতে থাকে। পিতামাতার মধ্যে বিরোধ তাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয় এবং তারা কখনো বা পিতাকে, কখনো বা মাতাকেই বিশেষ করে আঁকড়ে ধরে এবং অন্যের প্রতি বিরূপ ও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। এই অবচেতন বিরুদ্ধ মনোভাবের অনুষঙ্গী হিসাবে আবার অপরাধবোধও তাদের পীড়িত করে তোলে। ফলে তাদের অবচেতন মনে অমীমাংসিত সংঘাতের গ্রন্থি জট পাকায়। এই 'গ্রন্থি'র (complexes) ধর্মই হচ্ছে নিজের সৃষ্ট গোলকধাঁধার জালে ঘুরে মরা এবং চেতনার প্রবাহের ঐক্যে

বিচ্ছিন্নতা ঘটানো। এমনি করেই শিশুর জীবনে মানসিক অস্বাস্থ্যের বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হয়। বহু বয়স্ক মানুষের মানসিক অসুস্থতার শিকড় থাকে শৈশবের অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতায়। আবার কেউ কেউ বাল্যজীবনে স্নেহবঞ্চিত হয়ে সমাজজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্ষুব্ধ অভিমানে নিজের অবাস্তব কল্পনার রংয়ে রাঙিয়ে নানা দিবাস্বপ্নে মগ্ন হয়ে থাকতে পারে। এতে বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে তাদের ক্ষমতা ক্ষীণ হয়ে যেতে পারে।[৬] পিতা-মাতার বুদ্ধি বিদ্যা বা চরিত্র সামাজিক বিচারে মূল্যবান সম্পদ বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু মানসিক দিক থেকে সুস্থ শিশুগঠনের পক্ষে সব চেয়ে বড় প্রয়োজন পিতামাতার স্বতোৎসারিত স্নেহ ও সন্তানের প্রতি অকৃত্রিম দরদ, শিশুর প্রয়োজন বোঝবার মতো অন্তর্দৃষ্টি এবং তা মেটাবার জন্যে আন্তরিক চেষ্টা। এমন সুমাতার বিদ্যাবুদ্ধি খুব বেশী না থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর অন্তরের সহজ সম্পদই সন্তানের পক্ষে মস্ত সম্পদ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানবদের মায়েরাই তাদের গড়েছেন। এমন পিতামাতার বিরোধহীন শান্ত ও স্নেহময় জীবনই শিশুর মানসিক স্থৈর্যের শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ।[৭] যেখানে মাতার মনে অমীমাংসিত সংঘাতের জটিল গ্রন্থি বিদ্যমান সেখানে তাঁর অজানিতেই—এমন কি তাঁর সচেতন ইচ্ছার বিরুদ্ধেই—শিশুর প্রতি তাঁর সহজ স্নেহ-ভালবাসা ব্যাহত হবে এবং শিশুর মনে তার বিরূপ প্রতিফলন হবেই। যেখানে দেখা যায়

৬ ...A sense of insecurity cannot be accepted by a child complacently. As a result one may become aggressive in order to construct a spurious feeling of assurance. Aggressiveness leads to hostility, the hostile act often leads to guilt which creates further insecurity. Again, a sense of insecurity may tend to separate a person from his social group. This isolation in turn, contributes to the development of pathological phantasy; from this it is not a far step to the projection in the form of hallucinations of wishes which cannot be fulfilled in reality. Noyes—Modern Clinical Psychiatry, p. 93

৭ The organised social community to which the child is first born... embraces the personalities of the parents, their relationship to each other and the atmosphere of the home created by them. There is a fundamental pattern of behaviour in this individual community which constitutes a most vital factor in the baby's upbringing...the mother's spontaneous emotional relationship to her child is of incalculable moment, and all *conscious* planning falls into second place of importance.

I said "personality" rather than character. There is a difference. A person may be in adult respects an admirable character if we are considering

কোন মা সন্তানের ছোটখাটো আব্দার বা অপরাধ অতিরিক্ত কঠোর শাসনে দমন বা সংশোধন করতে চান অথবা যেখানে দেখা যায় শিশুর সামান্য একটু অসুখবিসুখ নিয়ে মা বড় বেশী বাড়াবাড়ি করেন, অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা করেন, সেখানেই বুঝতে হবে মায়ের অবচেতন মনে তাঁর নিজ পিতা-মাতার প্রতি কোন বিরুদ্ধ মনোভাবজনিত সংঘাতের জট অমীমাংসিত রয়ে গেছে এবং তাঁর ব্যবহার তারই প্রকাশ। এবং এর ফল শিশুর মনেও প্রতিফলিত হবে।[৮]

ফ্রএড্-অনুগামী মনঃসমীক্ষকেরা মানসিক রোগের কারণ হিসেবে অবচেতন মনে অমীমাংসিত সংঘাত এবং অবদমনের ওপর সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেন। ব্যক্তির জৈব প্রয়োজনের দাবি ও আকাঙ্ক্ষা তার সমাজ-পরিবেশ এবং সচেতন আদর্শ- কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত ও নিন্দিত হতে পারে। ফ্রএড্-এর মতে ব্যক্তির সমস্ত মৌলিক আকাঙ্ক্ষাই যৌন-কেন্দ্রিক (Id)। ব্যক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তার মৌল কামের সঙ্গে বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতা ও সমাজজীবনের আদর্শ, ভদ্রতার আদর্শের সংঘাত শুরু হয় এবং ব্যক্তি তার প্রবল মৌলিক কামাকাঙ্ক্ষার স্বাভাবিক প্রকাশকে সচেতন মনে আসতে জোর করেই বাধা দেয়। ঈদ্-ঈগো এবং সুপার-ঈগোর এই অমীমাংসিত সংঘাত এবং অবদমনই সমস্ত 'মনের জটের' অর্থাৎ মানসিক অসুস্থতার মূল কারণ। এই অমীমাংসিত সংঘাতই ব্যক্তির মনে অস্থিরতা পাপবোধ ইত্যাদি অসুস্থতা সৃষ্টি করে এবং তার প্রকাশই দেখা যায় বিভিন্ন প্রকারের মানসিক রোগে। এর ফলে ব্যক্তি বাস্তব জগৎ ও তার পরিবেশের সঙ্গে

virtues that are socially valuable such as honesty and strength of will. Such character traits are nevertheless compatible with lack of imagination and hardness of heart. It is *personality that counts for the baby, the whole person emotionally, not the crystallized virtue of adult character*···whether we like it not, it is not what we say, nor what we *plan*, but what we *are* in total personality that counts. There are parents who through ignorance make many mistakes in the details of handling children, and yet the children ride triumphantly over them. There are parents who through conscious knowledge can avoid making these same mistakes, but whose children nevertheless turn out failures. Ella F. Shaye—Planning for Stability, in On the Bringing up of Children by Five Psycho-analysts, pp. 3-4

৮ Ibid, pp. 4-5

সামঞ্জস্যস্থাপনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে নিজের কাল্পনিক মিথ্যা জটিল জালে জড়িয়ে নিজের অন্ধকার খোলসের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে সমস্ত আঘাতের মার এড়াতে চায়।

সামাজিক-অর্থনৈতিক-সংস্কৃতির চাপ

ব্যক্তি পরিবারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, সমাজ-পরিবেশ থেকে পুষ্টি আহরণ করে—তার বিকাশের উপাদান সে সমাজ থেকে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সমাজ যেমন ব্যক্তিকে প্রাণরস দান করে তেমনি তার কাছে দাবিও করে। প্রত্যেক সমাজের কতগুলি রীতি আচার বিশ্বাস অনুষ্ঠান সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকে এবং সমাজ দাবি করে যে ব্যক্তি সেই সমষ্টিগত প্রত্যয় ও কর্মকাণ্ডের শরিক হবে। যে সব ব্যক্তি মৌলিক চিন্তার সম্পদে মনস্বী, যাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী বস্তুনিষ্ঠ ও কঠোরভাবে বৈজ্ঞানিক, যাঁদের অনুভূতির তীক্ষ্ণতা ও সূক্ষ্মতা সাধারণ মানুষের চেয়ে উঁচু দরের, তাঁরা অনেক সময় সমাজজীবনের অন্ধ গড্ডালিকাপ্রবাহে নিজেদের সহজে ভাসিয়ে দিয়ে সমাজজীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে পারেন না। সমাজের বা রাষ্ট্রের অনেক আচার বিশ্বাস ও আচরণ এমন অসাধারণ ব্যক্তিদের মার্জিত রুচি ও বুদ্ধিকে আঘাত করে। তাই একটা মানসিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত অনেক সময় অনিবার্য হয়ে ওঠে। তাঁদের মধ্যে যাঁরা অতি সাহসী এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন তাঁরা সমাজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, সমাজকে অমান্য করেন, আঘাত করেন, সমাজের অন্ধতা ও মূঢ়তার সংস্কারসাধনে প্রবৃত্ত হয়। তাঁরা সমাজের প্রতিকূলতা নিন্দা বিরুদ্ধতার কাঁটা পায়ে দলেই নিজের আদর্শ ও বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করতে অগ্রসর হন। রামমোহন বিদ্যাসাগর প্রমুখ মহাপুরুষ এই দলের; স্বভাবতই এঁদের সংখ্যা নগণ্য। এঁদের ব্যক্তিত্ব এত সবল যে শত আঘাতেও এঁরা বিচলিত হন না। তাঁদের মানসিক সুস্থতা বারে বারে বাধা বিপত্তি প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু অনেকেরই এমন প্রবল মনের বল নেই। তাঁরা সমাজের নিন্দায়-প্রতিকূলতায় আহত হন, ক্ষুব্ধ হন, কিন্তু সাহস করে সমাজকে উপেক্ষা করতে পারেন না। এ জাতীয় অভিমানী ব্যক্তিরা অনেক সময় সমাজের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানে অসমর্থ হয়ে বিষম বিষণ্ণ হন, অস্বস্তি বোধ করেন এবং অনেকে সমাজজীবন থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়ে নিজের মনোজগতের কাল্পনিক সৃষ্ট দুর্গের

পশ্চাতে আত্মগোপন করে আঘাত এড়াবার চেষ্টা করেন। এঁরা মানসিক অসুস্থ—এঁরা জীবনযুদ্ধে বিপর্যস্ত দুর্বল সৈনিক। এঁরা সমাজজীবনের সংঘাতপূর্ণ কর্মক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে আত্মরক্ষার প্রয়াস করেন।

সমাজজীবনে অর্থনৈতিক ও অনুভূতিগত অসঙ্গতি ব্যক্তির মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য ও সুস্থতাকে বিঘ্নিত করতে পারে। যে ব্যক্তি এই তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ জীবিকার ক্ষেত্রে নিজ বিদ্যা বুদ্ধি যোগ্যতা-অনুযায়ী জীবিকা খুঁজে পেল না, যে জীবনের মনোমত সঙ্গী বা সঙ্গিনী সংগ্রহ করতে পারল না, যে সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারল না, তার মনে নৈরাশ্য বিষণ্ণতা তিক্ততা অনিরাপত্তাবোধ ইত্যাদি খুবই স্বাভাবিক। একটা বিশেষ মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে তাকেই আমরা মানসিক দিক থেকে অসুস্থ বলব। ছোটদের বেলায়, তাদের বিদ্যালয় ও সঙ্গীসাথীর সাথে মেলামশা, পড়াশুনা, খেলা-ধুলার মধ্য দিয়ে সঙ্গতিসাধন সহজ না হলে তারা অসুখী, আত্মবিশ্বাসহীন এবং সমাজের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠতে পারে অর্থাৎ মানসিক অসুস্থতার সমস্যা তাদের বেলায়ও দেখা দিতে পারে। সাধারণত প্রাক্-যৌবন স্তরের পূর্বে গুরুতর মানসিক অসুস্থতা বা বিকার দেখা দেয় না এবং বুদ্ধি অনুভূতি কর্মজীবন বিকশিত ও বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংঘর্ষ ও অসঙ্গতির কারণ ও সম্ভাবনা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। এটা খুবই স্বাভাবিক। যে শিশু ও কিশোরদের গৃহপরিবেশ আনন্দময়, প্রীতি ও পারস্পরিক বিশ্বাসপূর্ণ, যারা পিতামাতা ও শিক্ষকের নির্মল জীবন দ্বারা অনুকূল ভাবে প্রভাবিত, তারা ভবিষ্যৎ জীবনে প্রায়ই মানসিক বিকারের সমস্যা থেকে মুক্ত। আবার বিবাহিত ব্যক্তিদের তুলনায় অবিবাহিতদের মধ্যে মানসিক রোগ বেশী দেখা যায়। তার কারণ যারা বিবাহ করে সুখী হয়েছে তাদের জীবনের মৌলিক প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষাগুলি স্বাভাবিকভাবে মেটাবার পথ থাকায় তারা সহজেই জীবনের দুঃখ কষ্ট আঘাত ও সমস্যাকে গ্রহণ করতে পারে।[১]

[১] Statistics show that mental disorder is more common among the single than among the married. This may be due to the fact that a happy married life provides for the satisfaction of our basic urges and gives us a sense of security. Bhatia & Craig—Elements of Psychology & Mental Hygiene, p. 315

ষষ্ঠ অধ্যায়

মনের রোগ

রোগের লক্ষণ

সব মানুষই অবাঞ্ছিত ও কঠিন অবস্থায় পড়লেও নিজেকে তার সঙ্গে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে। এ রকম অবস্থার সম্মুখীন হয়ে ব্যক্তি একটা অস্বস্তি ও অস্থিরতা (tension) বোধ করে। সাধ্যমত মীমাংসার সমাধান করতে সে চেষ্টা করে এবং তা দ্বারা অস্থিরতার উপশম হয়। যখন অবস্থাটা এমন যে, ব্যক্তির বুদ্ধি বা সামর্থ্য দিয়ে তার সমাধান চলে না, তখন সে নানা উপায়ে বিফলতাজনিত নিজের লজ্জা বা হীনতা ঢেকে রাখতে চেষ্টা করে। এমন কি নিজের মনেও সে হার মেনে নিতে চায় না। এজন্যে ব্যক্তি যেসব কৌশল অবলম্বন করে, তাকেই আমরা বলেছি 'অহঙ্কারের আত্মরক্ষা'। এ কৌশলগুলির কোনটা না কোনটা, কোন না কোন সময়ে, সব মানুষই ব্যবহার করে। ব্যক্তি ভান করে, তার 'কৌশল'টা অন্যে বুঝতে পারে না, এবং তাতেই নিজের কাছে তার আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ থাকে। এটা কিছু মনের অস্বাভাবিক বা বিকৃত অবস্থা নয়! এ 'ভানে'র প্রয়োজন আছে।

কিন্তু কোন কোন মানুষ বারে বারেই এ কৌশলগুলি ব্যবহার করে কঠিন বাস্তব সমস্যা এড়াতে চায়। ফলে তাদের ব্যক্তিত্বেরই পরিবর্তন ঘটে। তারা বাস্তব জগৎ থেকে সরে গিয়ে ক্রমেই নিজস্ব কল্পনা বা ভান দিয়ে গড়া মিথ্যা জগতে বাস করতে অভ্যস্ত হয়। তখন আমরা বলি ব্যক্তিটি মানসিক দিক থেকে 'রুগ্ণ'। ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে সুষম ঐক্য থাকে, তার ক্ষেত্রে তা বিনষ্ট হয়েছে এবং সে ব্যক্তিত্বের একটা বা একাধিক বিচ্ছিন্ন অংশের সঙ্গে নিজ সমগ্র জীবনকে একান্ত করে চিন্তা করে বিশ্বাস করে মিথ্যে একটা খোলসের মধ্যে বাস করে।[১]

---

১ Adjustive mechanisms serve the useful function of enabling the individual to relieve his tensions which are produced by conflicts and frustrations. They assist him in overcoming threats to his ego and maintain his psychic balance. But if these mechanisms are used again

মানসিক রোগের মূল—অবচেতন মনে বিচ্ছিন্নতা

সুস্থ ব্যক্তিত্বের লক্ষণ এই যে তার মনে বহু বিভিন্ন ও বিপরীত চিন্তা ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা প্রবৃত্তি ও উদ্যমের স্রোত একই কালে চলতে থাকলেও তাদের মধ্যে একটি সামগ্রিক যৌগিক ঐক্যসূত্র থাকে। এই ঐক্যের সূত্র হচ্ছে উদ্দেশ্যমুখীতা ও সংকল্প। কিন্তু আধুনিক মনঃসমীক্ষকদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, হঠাৎ বাইরের কোন আঘাত অথবা দীর্ঘব্যাপী মনের ভিতরে সংঘাতের ফলে কোন কোন ব্যক্তির মধ্যে এই ঐক্যের ধারা ছিন্ন হয়ে যেতে পারে এবং কতকগুলি মানসিক অবস্থাকে মিলিয়ে নিয়ে ব্যক্তির মধ্যে একাধিক জটিল সংঘাতকেন্দ্র (complexes) সৃষ্টি হয়ে তার ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক যৌগিক ঐক্য ধ্বংস হয়ে যেতে পারে অথবা এমন ব্যক্তিত্ব-বিধ্বংসী সর্বনাশের আশঙ্কা দেখা দেয়।[২] মানসিক যারা রুগ্ণ তাদের মধ্যে উদ্দেশ্য ও সংকল্পের ধার-বাহিকতা থাকে না। ঝানে গত শতাব্দীর শেষ অংশে এই 'বিচ্ছিন্নতা'র ধারণাটি (concept of dissociation) ব্যাখ্যার সূত্র হিসাবে প্রথম মনোবিদ্যায় আমদানী করেন। তার পর থেকে যাঁরা মগ্নচৈতন্যতত্ত্বে (theory of the unconscious) বিশ্বাসী, তারা 'বিচ্ছিন্নতা'কে সমস্ত মানসিক রোগের মূল কারণ বলে দৃঢ় সিদ্ধান্ত করেছেন।[৩]

অবশ্য সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মধ্যেও একই কালে মনের মধ্যে একাধিক স্বাধীন ক্রিয়া চলতে পারে। এ লেখাটা যখন লিখছি তখনই সঙ্গে সঙ্গে বড মেয়ের কাছে মাদ্রাজে কিছু টাকা পাঠাতে হবে, সেই কথাটাও মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারছে। এদুটোর মধ্যে কোন যোগসূত্র নেই, দুটো স্বাধীন বিচ্ছিন্ন ভাবে সমান্তরাল রেখায় যেন চলেছে। কিন্তু এখানে চেতনার

and again, there is likelihood of our personality undergoing a gradual change for the worse, leading to a persistent state of maladjustment or some form of mental illness or mental disorder. Bhatia & Craig—Elements of Psychology & Mental Hygiene, p. 300

২ Hart—The Psychology of Insanity, p. 2

৩ Their (abnormal persons') minds are frequently very far from being uniform streams of thought, progressing towards some definite end, but are, on the contrary, composed of more or less isolated mental processes, each pursuing its own development. This division of the mind into independent fragments, which are not co-ordinated together to attain some common end, is termed "dissociation of consciousness". Hart—The Psychology of Insanity, p. 41

ক্ষেত্রে ছুটো সম্পূর্ণ পৃথক অংশে ভাগ হয়ে যায় না (যেমন ঘটে, একজন উন্মাদের মধ্যে)। তবে এখানে বিচ্ছিন্নতা সাময়িক এবং তা সম্পূর্ণ নয়। এখানে ছুটি ক্রিয়ার ওপরই ব্যক্তির সচেতন ইচ্ছার শাসন রয়েছে এবং ইচ্ছা করলে সে একটা চিন্তার ধারাকে বন্ধ করে দিতে পারে।[৪] আর যখন ছুটো চিন্তাই পাশাপাশি চলছে তখন মন প্রজাপতির মতন কখন উড়ে উড়ে যেন ক্ষণে এই চিন্তা ক্ষণে অন্য চিন্তায় ভর করছে (oscillation of attention) [মনোযোগ অধ্যায় দ্রষ্টব্য]। মনের ঐক্য সেখানে ধ্বংস হয় না।

মানসিক রুগ্ণ অবস্থায় চেতনার বিচ্ছিন্নতার দৃষ্টান্ত ছু একটি দেওয়া যাচ্ছে। ঝানে আইরীন্ নামে একটি মেয়ের মানসিক অবস্থার বিবরণ দিয়েছেন। মেয়েটির মা অনেকদিন ধরে ভুগছিলেন। সেবাপরায়ণা আইরীন্-এর শত চেষ্টা সত্ত্বেও দীর্ঘকাল ক্লেশকর রোগে ভুগে অত্যন্ত শোকাবহ অবস্থার মধ্যে মা মারা যান। মার মৃত্যু আইরীন্ কিছুতেই সহজে গ্রহণ করতে পারে নি। এর পর আইরীন্ কাজ করতে করতে হঠাৎ সব ভুলে, মায়ের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বের বেদনাময় দৃশ্যগুলি পুনরভিনয় করত। তখন তার বাস্তব পরিবেশ থেকে সে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হত, এবং তখন কেউ ডাকলে বা কথা বললে সে শুনতে পেত না। কিছুক্ষণ এ স্তব্ধাবস্থা চলার পর হঠাৎ আবার তার সম্বিৎ ফিরে আসত, কিন্তু তার পূর্বের মোহাবস্থা সম্পর্কে সে কোন কথাই স্মরণ করতে পারত না।[৫]

৪ ...Even the normal mind does not always present that undivided field of consciousness which we might be tempted at first sight to ascribe to it. Suppose, for example, I sit at the piano and play a piece of music. If I am a sufficiently expert performer it is possible that I may at the same time be able to carry on a complex train of independent thought, let us say, the solution of some problem of conduct...In all these cases, however, the dissociation of consciousness is temporary, activities are under the control of the subject and either may be abandoned at will. Ibid, p. 24

৫ ...the case of Irene presents a clear-cut instance of dissociation; certain strong sentiments toward a specific situation including her mother and herself, instead of becoming modified and properly integrated with her other experiences, became dissociated. This dissociated system was sufficiently strong to usurp, upon different occasions, the entire mechanisms of the individual and consequently all the reactions of Irene at these times were manifestations of this dissociated system. Fisher—An Introduction to Abnormal Psychology, pp. 243-44

কখনো কখনো এমন রোগীরা যেন স্বপ্নাবস্থায় চলতে শুরু করে, কথা বলতে শুরু করে, কাজ করতে শুরু করে।[৬] যদিও রোগীর এই ক্রিয়াগুলির সঙ্গে তার ঘুমিয়ে পড়বার আগের জীবনের কোন সম্বন্ধ থাকে না, তথাপি স্বপ্নাবস্থায় তার চলা বলা কাজের পরস্পরের মধ্যে কোন অসঙ্গতি দেখা যায় না। এই অবস্থাকে **স্বপ্নচারিতা** (somnambulism) বলা হয়ে থাকে।[৭]

অনুরূপ আর একটি চেতনা-বিচ্ছিন্নতার উদাহরণ দিচ্ছি। এক্ষেত্রে মনোবিকারের লক্ষণ হচ্ছে ব্যক্তি হঠাৎ তার অতীত জীবন ভুলে গৃহ থেকে অনেক দূরে পালিয়ে যায়। তার স্মৃতিলুপ্ত হওয়ায় সে নতুন অপরিচিত জায়গায় অন্য পরিচয়ে অন্য জীবন যাপন করতে শুরু করে। হঠাৎ আবার তার পূর্বস্মৃতি ফিরে এলে সে নতুন স্থানে কি করে এল বুঝতে না পেরে সম্পূর্ণ দিশাহারা হয়ে পড়ে। এপ্রকার হঠাৎ স্মৃতিলোপকে **অস্মার** (amnesia) বলে এবং **স্মৃতিলোপকালে গৃহত্যাগকে** fugue বলে। ম্যাকডুগ্যাল্ তাঁর "অ্যাব্‌নর্মাল সাইকোলজী" গ্রন্থে এ জাতীয় মনোবিকারের চমৎকার একটি উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি সংবেশনের (hypnosis) সাহায্যে কি করে তার চেতনার বিচ্ছিন্নতা দূর করেছেন তা-ও বলেছেন।[৮]

আর একপ্রকার চেতনা-প্রবাহের ঐক্যের বিচ্ছিন্নতার উল্লেখ করা যাচ্ছে। এ সব ক্ষেত্রে রোগী হঠাৎ বোধ করতে থাকে তার চার পাশে যা কিছু ঘটছে তা সবই মিথ্যা, এসবের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই। এমন কি সে নিজেকেও যেন অন্য একজন ব্যক্তি হিসাবে বাইরের থেকে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ ভাবে দেখতে থাকে (Feelings of unreality and depersonalization)। এ এক ধরনের **মানসিক অসাড়তা** (Psychasthenia)।[৯]

মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ কি?

আমরা যখন বলি চোখের অসুখ, দাঁতের অসুখ, পেটের অসুখ তখন বুঝি দেহের কোন অঙ্গ বা ইন্দ্রিয়ের কাজটা ঠিকমত হচ্ছে না। কখনো বা

৬ Hart—Psychology of Insanity, p. 33

৭ ...the case of Irene presents a clear-cut instance of dissociation; certain strong sentiments toward a specific situation including her mother and herself, instead of becoming modified and properly integrated with her other experiences, became dissociated. This dissociated system was sufficiently strong to usurp, upon different occasions, the entire mechanisms of the individual and consequently all the reactions of Irene at these times were manifestations of this dissociated system. Fisher—An Introduction to Abnormal Psychology, pp. 243-44

৮ McDougall—Abnormal Psychology, p. 258

৯ Janet—Major Symptoms of Hysteria, p. 186

একাধিক অঙ্গ বা ইন্দ্রিয় বিকল হয়ে ব্যাধি আত্মপ্রকাশ করে। ব্যাধি বা অসুখ মানেই অ-সুখ, অ-স্বাচ্ছন্দ্য। মানসিক রোগ কিন্তু কোন একটা অঙ্গ বা ইন্দ্রিয় বা মানসিক বৃত্তির ক্রিয়ার বৈকল্য নয়—যদিও অবশ্য সব মানসিক অসুস্থতায়ই কিছু না কিছু দৈহিক বৈকল্য থাকেই। মানসিক অসুস্থতার প্রধান লক্ষণ হচ্ছে, ব্যক্তি হিসাবে তার জৈবিক-মানসিক অবস্থার কতকগুলি পরিবর্তনের ফলে ব্যক্তি ও তার পরিবেশের সঙ্গে গুরুতরভাবে অসঙ্গতির লক্ষণ দেখা দেয়। ব্যক্তির পরিবেশ, তার বাইরের বাহ্যজগৎ ও সমাজজীবনও হতে পারে এবং নিজ মানসিক-জীবনও হতে পারে। **মানসিক রোগ তাকেই বলব যখন দেখা যাবে ব্যক্তির পরিবেশের চাপ এবং তার সঙ্গতিসাধনের স্বাভাবিক চেষ্টার মধ্যে সামঞ্জস্য হচ্ছে না—** এ দুইয়ের মধ্যে সম্বন্ধটি বিশৃঙ্খল ও সংঘর্ষপূর্ণ। এই অসামঞ্জস্যজনিত অসুস্থতার পেছনে দৈহিক অসাম্যের অবস্থা কতকটা দায়ী; কিন্তু বিশেষ করে দায়ী মানসিক কোন না কোন সংঘাতপূর্ণ অভিজ্ঞতা। এসব দৈহিক-মানসিক কারণে ব্যক্তি যখন তার স্বাভাবিক সঙ্গতিবিধানের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, তখন তাকে আমরা মানসিক রোগগ্রস্ত বলে বিবেচনা করি।[১০] মানসিক রোগের ফলে ব্যক্তি সমাজ -কর্তৃক গৃহীত স্বাভাবিক ও সহজ উপায়ে তার জীবনের সমস্যাগুলি সমাধানে অসমর্থ হয়ে পড়ে। এ জাতীয় রোগী ক্রমশই বাস্তবজগতের নিয়মকানুন ও সামাজিক বিধি-ব্যবহারের গৃহীত আদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তার রোগের মূল থাকে ব্যক্তির তীব্র অনুভূতি এবং মৌলিক সহজাত সংস্কারের গভীর অন্তস্থলে এবং সে জন্যেই যখন চেতনার একটা অংশ সমগ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজস্ব একটি মানসিক জটিল গ্রন্থি সৃষ্টি করে সেই জালে জড়িয়ে পড়ে, তখন তাকে উদ্ধার করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। **আধুনিক মনোবিদেরা মানসিক রোগকে বিশেষ একটি 'ব্যাধি' বলে জ্ঞান না করে জীবন ও আচরণের বিশৃঙ্খল ভঙ্গী বলেই বিবেচনা করেন।**[১১]

---

১০ ...The hallmark of mental illness is that by reason of some change in the patient as a person, whether the change be due to physiological disturbances or to experiences of life, he is no longer able to adapt himself satisfactorily to his material, social or cultural environment. The illness is intelligible as a disturbance of the relationships between the adaptive capacity of the individual on the one hand and his environmental load on the other. Skottowe—Psychological Treatment, p. 58

১১ The modern tendency is to regard a *mental disorder as a mode of behaviour or of living* rather than a disease entity. Bhatia & Craig—Elements of Psychology & Mental Hygiene, p. 301

পূর্বে মানুষেরা মানসিক রোগকে ভয়ের চোখে দেখত, মনে করত এ কোন অপ্রাকৃত কোন দুষ্ট শক্তির (ভূত, প্রেত, অভিচার ক্রিয়া) রহস্যময় অপ্রতিরোধ্য ফল। কিন্তু বিজ্ঞানের শক্তিতে স্বচ্ছবুদ্ধি মানুষ আজ জানে যে গুরুতর উন্মাদ রোগও 'স্বাভাবিক' কারণেই ঘটে। সাধারণ মানুষের থেকে উন্মাদেরা অবশ্যই পৃথক। কিন্তু তা বলে উন্মাদের জীবন চিন্তা ও কর্ম সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল, একেবারেই অর্থহীন ও এলোমেলো তা নয়। মানসিক রোগ সম্পর্কে বহু পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করে মনোবিদ্‌রা আজ এ সিদ্ধান্ত করেছেন যে মানসিক রোগের ব্যাখ্যার কতকগুলি যুক্তিগত কারণ আছে। এসব ব্যক্তির জন্মগত দৈহিক-মানসিক কতকগুলি অবস্থায়, পরিবেশগত বিভ্রান্তিকর অভিজ্ঞতার ধাক্কায় তাদের ব্যক্তিত্বের ঐক্য বিপর্যস্ত হয়ে কতকগুলি নির্দিষ্ট পথেই তাদের মানসিক সুস্থতা বিঘ্নিত হয়। সেই বিপর্যয়ের সূত্রগুলি অনুসরণ করেই তাদের চিকিৎসা -দ্বারা নিরাময় করা সম্ভব।[১২]

বাস্তবিকপক্ষে দেহে বা মনে সম্পূর্ণ সুস্থ কেউই আমরা নই। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই শারীরিক-মানসিক কিছু না কিছু রুগ্‌ণতা আছেই। তবে সাধারণ সুস্থ মানুষ জীবনের গুরুতর বিভ্রান্তিকর বা তীব্র শোকাবহ অভিজ্ঞতায় অশান্ত হলেও ব্যক্তিত্ব বা চেতনার ঐক্য হারিয়ে বিপর্যস্ত হয়ে যায় না। কিন্তু মানসিক সুস্থতা বা অসুস্থতার মধ্যে ভেদরেখাটা খুব তীক্ষ্ণ নয়। তবে মোটামুটি একথা বলা যায়, যারা (অপেক্ষাকৃত) সহজে পুনঃপুনঃ মানসিক স্থৈর্য এবং পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিস্থাপনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তাদেরই মানসিক রোগগ্রস্ত বলে ধরতে হবে। মানসিক যারা রুগ্‌ণ তাদের মস্তিষ্কে গোলযোগ আছে, এটা বললে মানসিক রোগের উপযুক্ত ব্যাখ্যা হয় না। বিভিন্ন মানসিক রোগে বিভিন্ন কতকগুলি দৈহিক-স্নায়বিক-মানসিক বিশৃঙ্খলা একত্র জড়িত হয়ে থাকে। প্রত্যেক

১২ The mental disorder or the mode of behaviour is the logical, although socially mal-adjusted, outcome of the particular individual's original endowment as influenced and moulded by the home, the traumatic experiences, the stresses and problems that spring to some extent, from deep within his emotional and instinctive life. The individual may be unable to meet these strains, and thus, it may impair the integrity or efficiency of his biological organism. Landis, Carvey & Bolles—Textbook of Abnormal Psychology, p. 43

মানসিক রোগের সহগামী জটিল এই গ্রন্থিজালকে Syndrome বলা হয়।[১৩] এই সামগ্রিক জটিল গ্রন্থির কোন কোন লক্ষণ প্রত্যেক সুস্থ মানুষের মধ্যে দেখা যেতে পারে। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে **তাদেরই আমরা মানসিক রোগগ্রস্ত বলব যাদের মধ্যে এই লক্ষণগুলি অতি তীব্রভাবে এবং পুনঃপুনঃ দেখা যায়।**[১৪] এই লক্ষণগুলি কি তা আমরা আলোচনা করব।

তার আগে আর একটা কথাও আলোচনা করা দরকার। **মানসিক রোগ এবং মানসিক ন্যূনতা এক কথা নয়।** যারা জড়বুদ্ধি বা নির্বোধ তাদের বুদ্ধি-রূপ মানসিক ক্ষমতা সাধারণের চেয়ে কম আছে। কিন্তু সেজন্যে তাদের মানসিক রোগগ্রস্ত বলা যায় না। মানসিক যারা রুগ্‌ণ, তারা যথেষ্ট বুদ্ধিমান হতে পারে, কিন্তু তাদের কোন না কোন দিকে বিকার আছে।

মানসিক বিকারের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ

পূর্বেই বলেছি, মানসিক যারা রুগ্‌ণ তাদের দৈহিক-স্নায়বিক-মানসিক কতগুলি লক্ষণের গ্রন্থিজাল দেখা যায়। বিভিন্ন মানসিক রোগে এগুলি ভিন্ন ভিন্ন। তথাপি কতকগুলি লক্ষণ সাধারণত সব মানসিক বিকারেই

(ক) **দৈহিক লক্ষণ**—অনেক মানসিক রোগেই দেহের উত্তাপ, নাড়ী চলাচল ও হৃদ্‌স্পন্দনে বিশেষ অনিয়মিতা লক্ষ্য করা যায়। অনেকের তীব্র বমনেচ্ছা, শিরোঘূর্ণন, আহারে অনিচ্ছা (anorexia) অথবা অতি-ভোজনেচ্ছা, দেহের ওজনহ্রাস, অস্বাভাবিক ক্লান্তিবোধ, তীব্র মাথাধরা দেখা যায়। এই লক্ষণগুলির মূল কারণ মানসিক (psychological) হলেও শারীরিক অসুস্থতার লক্ষণগুলি মিথ্যা নয়।

অনেক মানসিক রুগ্‌ণ ব্যক্তির চোখের পাতা অস্বাভাবিক দ্রুত স্পন্দিত হয়, কেউ আবার কোন প্রকার আলো চোখে সহ্য করতে পারে না।

তা ছাড়া হাত-পা কাঁপা (tremors and spasms), বিভিন্ন ইন্দ্রিয় বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালনে অসামঞ্জস্য বা নানা প্রকার মুদ্রাদোষ (tics) ইত্যাদিও

১৩ Syndrome: a complex going together of the various symptoms of a disease, a symptom-complex. Drever—A Dictionary of Psychology, p. 286

১৪ ...Even normal individuals manifest these symptoms in their behaviour but not so frequently and in such great intensity or exaggerated form as is the case with the mentally ill. Hadfield—Mental Health, p.16

মানসিক অসুস্থতার সঙ্গে অনেক সময় দেখা যায়। কথার জড়তা ও তোতলামীও (stuttering and stammering) মানসিক অস্থিরতার অনুষঙ্গী হিসাবে অনেক সময় দেখা দেয়।

সর্বাঙ্গের অথবা কোন বিশেষ অঙ্গ বা ইন্দ্রিয়ের অসাড়তা (paralysis) অনেক সময় গুরুতর মানসিক বিকারের ফলে ঘটে।[১৫]

(খ) **ইন্দ্রিয়াদির বৈলক্ষণ্য**—চক্ষু ও কর্ণ এই দুইটিই প্রধান ইন্দ্রিয়। কোন কোন মানসিক রুগ্‌ণ ব্যক্তির ইন্দ্রিয়বোধ সাময়িক ভাবে বিলুপ্ত হয় (anaesthesia)। এ জাতীয় কোন রোগী হঠাৎ একটা গুরুতর মানসিক আঘাতের ফলে অন্ধ বা বধির হয়ে গেছে এমন দেখা যায়। কখনো কখনো গন্ধ- বা স্বাদ-বোধেরও বৈলক্ষণ্য ঘটে। কখনো কখনো বিপরীত লক্ষণ দেখা দেয়—অর্থাৎ হঠাৎ কোন ইন্দ্রিয়বোধ (সাধারণত স্পর্শ) অতিমাত্রায় তীক্ষ্ণতা লাভ (hyperaesthesia) করে। কখনো বা অদ্ভুত ভাবে ইন্দ্রিয় বোধ-বিকৃতি (parasthesia) দেখা দেয়।[১৬]

(গ) **স্মৃতি-বিষয়ক বৈলক্ষণ্য**—কোন কোন মানসিক রোগীর কোন বিষয়ে আকস্মিক স্মৃতিলোপ (amnesia) পায়। সাধারণত সেই বিষয়টি ব্যক্তির পক্ষে লজ্জাকর, বেদনাদায়ক বা ভীতিজনক। আবার কখনো বিপরীতও ঘটে—হঠাৎ শৈশবের একেবারেই ভুলে-যাওয়া বহু বিষয়ের স্মৃতি রোগীর মনে ভীড় করে আসে (hypermnesia)। এমনও কখনো

[১৫] Among the particular forms of maladjustment in behaviour, we may mention the following. A *tremor* is a slight muscular contraction having a distinct rhythm....More pronounced contractions of large muscular groups are known as *spasms*. If spasms are the result of a functional rather than an organic factor, they may take the form known as a *tic*, that is a convulsive fluttering of the eyelids, of the shoulders, or of any other muscle group...In opposition to these excessive movements, there are many forms of *paralysis* ranging from complete inability to move to a slowing down or marked enfeeblement of movement. Still another type of motor disorder appears in *stammering and stuttering*. Griffith—An Introduction to Applied Psychology, p. 276

[১৬] Anaesthesia: loss, abolition, or depression of sensitivity to stimuli. Hyperaesthesia: excessive sensitivity, particularly to tactual stimuli. Parasthesia: abnormal, distorted or wrongly localized sensation. Drever—Dictionary of Psychology.

কখনো হয় যখন রোগী এমন সব বিষয় স্মরণ করতে থাকে যা আদৌ তার জীবনে ঘটে নি (paramnesia)।

(ঘ) প্রত্যক্ষ-বিষয়ে গোলযোগ—ভ্রান্তি ও অমূলপ্রত্যক্ষ—এজাতীয় রোগীরা বলে কেউ তাদের নাম ধরে ডাকছে—হয়তো দেখে দীর্ঘদিন পূর্বে মৃত কোন কোন আত্মীয় জীবন্ত মূর্তি ধরে তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘন ঘন এ প্রকারের অভিজ্ঞতা মানসিক রোগের একটি খুবই পরিচিত লক্ষণ। উন্মাদ রোগীদের মধ্যে সাধারণত দুই প্রকারের ভ্রান্তি দেখা যায়। এক হচ্ছে, রোগী বলে, কেউ তাকে গালাগালি করছে, কেউ তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, তার খাবারে বিষ মিশিয়ে দেবার চেষ্টা করছে —এ জাতীয় ভ্রান্তিকে বলে delusions of reference। আর একরকম আছে তারা বলে তারা ঈশ্বর বা প্রবলপরাক্রান্ত সম্রাট ইত্যাদি। এ জাতীয় ভ্রান্তিকে বলে delusions of grandeur। কোন কোন রোগীতে বিষম ক্লান্তি এবং প্রত্যক্ষের ক্ষমতালোপ (agnosia) দেখা যায়।

(ঙ) ধারণা-শক্তি-বিষয়ে বিপর্যয়

মানসিক যারা রুগ্ণ তাদের ধারণার শক্তি হ্রাস পায়। তারা বিভিন্ন চিন্তার মধ্যে সংযোগসাধন সহজে করতে পারে না (the range of association may become very poor)। হয়তো এককথা অনেকবার বললে, তার পর সে-কথার অর্থগ্রহণ করতে পারে। বারে বারেই তাদের চিন্তার খেই হারিয়ে যায়। গুছিয়ে কোন বিষয়ে চিন্তা করতে তারা অসমর্থ। কখনো কখনো বিশেষ একটা চিন্তা তাদের পেয়ে বসে (obsession), কিছুতেই তারা তা ঝেড়ে ফেলতে পারে না। কখনো কখনো তারা বোধ করে কোন একটা কাজ তাদের করতেই হবে (compulsive actions)। এ সব কাজ তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও যেন তারা করতে বাধ্য হয়। কোন কোন মানুষের মধ্যে দেখা যায় অকারণ চুরির অভ্যাস (kleptomania)[১৭] অথবা বারে বারে হাত ধোয়ার বাতিক (শুচিবাই)।

(চ) উচ্চতর মস্তিষ্ক-কেন্দ্র কর্তৃক জৈব তাড়না ইত্যাদি শাসন ও সংযমের অভাব

মানসিক রোগে ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তি বিপর্যস্ত হয়। তাই মস্তিষ্কের

[১৭] Kleptomania: an obsessive impulse to steal, not infrequently shows in stealing objects for which the individual has no desire. Drever—Dictionary of Psychology

নিম্নতর কেন্দ্রশাসিত কর্মগুলি ব্যক্তির পরিচালনা- ও শাসন-ব্যতিরেকে ব্যক্তির ইচ্ছার অপেক্ষা না রেখে স্বাধীন ভাবেই যেন সংঘটিত হতে থাকে। তার ফলে হয়তো দেখা যায় রোগীর মধ্যে অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য ও কর্মব্যস্ততা। সে তখন তার জৈব তাড়নার দাস। কাজেই মানসিক রোগীর ক্ষেত্রে কখনো কখনো লজ্জা ঘৃণা রুচিবোধ ভদ্রতা ইত্যাদি উচ্চতর আদর্শ ও রীতির শাসনের অভাব দেখা যায়। তারা ঝোঁকের মাথায় এমন কাজ করে বসে যা সমাজের চোখে নিতান্তই নিন্দনীয়। অর্থাৎ তাদের সেই উচ্চতর বোধের শাসনই শিথিল হয়ে যায়। মস্তিষ্কের উচ্চতর কেন্দ্রগুলির শক্তি-হ্রাসের ফলে তারা দুটি সহজ বিষয়ের মধ্যে একটিকে বেছে নিতেও বারে বারে দ্বিধাগ্রস্ত হয়। কোন বিষয়ে দ্রুত মনস্থির করতে বা সিদ্ধান্ত করতে তারা অসমর্থ। লাল শাড়ীখানাই পরবে, না নীল শাড়ীখানাই পরবে এই সোজা বিষয়ে মনস্থির করতেই তাদের হয়তো দুঘণ্টা কেটে যাবে—কখনো লাল শাড়ীখানা পরছে, তার পরক্ষণেই বিরক্ত হয়ে সেখানা ছেড়ে নীল শাড়ীখানা পরল। কিন্তু দুমিনিট না যেতেই আবার হয়তো লালখানাই বাছল, তার পরেই হয়তো হতাশ হয়ে দুখানাই ফেলে দিল।

(ছ) বাক্য-বিষয়ক বিপর্যয়

মানসিক রোগীর কথাবার্তা অনেক সময় থাপছাড়া বিশৃঙ্খল অর্থহীন বা ওলোট-পালট। হয়তো সামান্য বিষয় নিয়ে সারাদিন বকর বকর করতে লাগল, আবার হয়তো দুদিন কারো কথার কোন জবাবই দিল না। মানসিক রোগী কখনো কখনো কুৎসিত গালাগালি দেয় বা কদর্য কথাবার্তা বলে। মনস্তাত্ত্বিকদের মতে এ সব অনেক ক্ষেত্রেই রোগীর যৌনাকাঙ্ক্ষার স্বাভাবিক পথে প্রকাশ জোর করে অবদমন (repression) করবার বিকৃত প্রতিক্রিয়া।

(জ) অনুভূতি-বিষয়ক বিপর্যয়

মানসিক রোগে অনুভূতি-বিষয়ে বিপর্যয় বিশেষ লক্ষণীয়। তাদের রাগ ভয় শোক আনন্দ সবই হয়তো মাত্রাতিরিক্ত—হো হো করে হাসছে, তো দুঘণ্টাই হাসলো; আবার কান্না একবার শুরু হলে সে আর থামেই না! সামান্য বিষয় নিয়ে হয়তো বৃথা ভীষণ রাগারাগি করে।

অসময়ে, অকারণে, অনুপযুক্ত পাত্রে, অপরিমিত ঘৃণা বা ভালবাসার প্রকাশ দেখা যায়! কখনো বা একই পাত্রে বিপরীত প্রক্ষোভ দেখা যাচ্ছে। গুরুতর ক্ষেত্রে দেখা যায়, রোগীর সমস্ত অনুভূতির বোধ ও প্রকাশ একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে।

(ঝ) সাধারণ স্বাস্থ্যের অবনতি ও ঘুমের ব্যাঘাত

মানসিক রোগের সাধারণ অনুষঙ্গী রোগীর স্বাস্থ্যের অবনতি। ক্ষুধা, মলমূত্র-নিঃসরণ এবং সাধারণ জৈবক্রিয়া ব্যাপারে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। অনিদ্রা ও ঘুমের ব্যাঘাত মানসিক রোগীর অতি সাধারণ লক্ষণ। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা দেয় অস্বাভাবিক দুর্বলতা, উৎসাহের অভাব, জীবনে বিতৃষ্ণা, পোশাক-পরিচ্ছদ বিষয়ে অপরিচ্ছন্নতা এবং কখনো বা উদ্ভট খেয়াল।

(ঞ) ব্যক্তিত্বের বিপর্যয় ও অবাস্তবতা-বোধ

আগেই বলা হয়েছে সমস্ত মানসিক রোগেই ব্যক্তিত্ব ও চেতনার ঐক্য বিঘ্নিত হয়। গুরুতর মানসিক রোগে এই ঐক্য ধ্বংস হয়ে রোগীর চেতনা কতগুলি বিচ্ছিন্ন গ্রন্থির জটিল পাকে আবর্তিত হতে থাকে। এসব কারণেই ব্যক্তি নিজেকে একটি জীবন্ত বিশিষ্ট বাস্তব সত্তা হিসাবে বোধ করতে পারে না (depersonalization)। সে তার চারপাশের বাস্তব জগৎ থেকে বিচ্যুত হয়ে নিজেকেও যেন আর চিনতে পারে না। সে ভাবে "আমি বুঝি আমি নই"।[১৮]

১৮ The patient frequently complains that he is not sure whether all these things are happening to him or whether he is watching someone else very much like himself go through these troubles. Or he will complain that things seem somehow unreal; that he is not sure how much he is imagining or dreaming or what is real and what is imagination. He has difficulty in holding things together in his mind. Landes, Carvey & Bolles—Textbook of Abnormal Psychology, p. 73

সপ্তম অধ্যায়

নৈরাশ্য ও সংঘাত

বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে মানুষের ভোগের বস্তু ও উপকরণ সহস্র গুণ বেড়েছে—মানুষের শক্তি ও আকাঙ্ক্ষাও ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জীবনের জটিলতাও অনেক বেড়েছে—ভোগের উপকরণ-সংগ্রহের জন্যে প্রতিযোগিতা অনেক বেশী তীব্র হয়েছে, জীবন-সংগ্রাম বিষমতর হয়েছে। তাই একদিকে মানুষের সুখ ও সাফল্যের সম্ভাবনা যেমন বেড়েছে, তেমনি অসাফল্যের বেদনাও তীব্রতর হয়েছে, দুঃখের পরিধিও অনেক বিস্তৃততর হয়েছে। এ যুগ সফলতা দিয়েই জীবনের মূল্য-নির্ধারণ করে, সুতরাং যারা সফল হল না তারা যেমন সমাজে উপহসিত, তেমনি আত্মধিক্কারের গ্লানিতেও দগ্ধ হয়। এর ফলে আগের তুলনায় অনেক বেশী লোক মানসিক অসুস্থতা ভোগ করছে—জীবনে অস্থিরতা (tension) বেড়েছে। সভ্য মানুষ তাই আগের তুলনায় অনেক বেশী পরিবেশের সঙ্গে সংঘাত ও আত্মদ্বন্দ্বে নিপীড়িত হচ্ছে। সমস্ত সভ্য দেশে মানসিক রোগের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাদের জটিলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কিন্তু বর্তমান যুগের সভ্য মানুষ এ কথা বিশ্বাস করে যে, বিজ্ঞানই কেবলমাত্র আমাদের সমস্ত সমস্যা সমাধানের, সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা-দূরীকরণের পথ বলে দিতে পারে। তাই আজ সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানী সর্বব্যাপী নৈরাশ্য (frustration) ও সংঘাতের (conflict) বিশ্লেষণ ও হেতু-নির্ণয়ে আগ্রহশীল। হেতু-নির্ণয় হলে তবেই সুচিকিৎসা সম্ভব।

জীবনে আমরা অনেক জিনিস চাই। এ চাওয়ার বস্তু কখনো সহজ, কখনো জটিল, কখনো তা দেহের কোন অবস্থা বা পরিবর্তন, কখনো বহির্জগতের কোন বস্তু। পড়াশোনা করছি, সন্ধ্যা হয়ে আঁধার হয়ে এল, আলোর অভাব বোধ করে বিজলী বাতির সুইচটি টিপলাম। এখানে অভাবটা সহজ এবং অভাব-দূরীকরণের উপায়ও প্রায় নির্দিষ্ট। কিন্তু জীবনে যদি যশ-প্রতিপত্তি চাই, তাহলে তার পথ সোজা নয়—উপায়ও একটিমাত্র নির্দিষ্ট নয়।

প্রাত্যহিক জীবনের হাজারো অভাবের অনেকগুলিই সহজে মেটানো যায়। সব অভাব-দূরীকরণই অল্পবিস্তর চেষ্টাসাপেক্ষ। এ সব সহজ অভাব দূর করবার চেষ্টা আমাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফল হয়, তাই জীবনটা দুঃসহ ও দুর্বহ বোঝা হয়ে দাঁড়ায় না। কিন্তু অনেক সময় আমাদের চেষ্টা সহজে সফল হতে চায় না, অনেক বাধা অতিক্রম করতে হয়। তাতে মন অশান্ত হয়, আমরা বিরক্ত হই, উদ্বিগ্ন এই। যেমন, পোষ্টাফিসে গিয়ে খাম-টিকিট কিনতে গরমের মধ্যে লম্বা লাইন দিতে হয়। এই যে অপেক্ষা করতে হয়, এতে আমাদের ধৈর্যের ওপর চাপ পড়ে—ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকাই, অফিস না বন্ধ হয়ে যায়—মনে একটু মৃদু উদ্বেগ বোধ করি। যাই হোক, প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্র ও ক্ষণিক বিরক্তি এবং উদ্বেগ কোন গভীর দাগ মনের মধ্যে রাখে না।

কিন্তু কখনো কখনো আমাদের তীব্র আকাঙ্ক্ষা মেটাবার কোন উপায় থাকে না। হয় বহির্জগতে কোন বাধা, নয় নিজের অক্ষমতা, অথবা নিজের অন্তরের মধ্যেই কোন কঠিন সংশয় বা দ্বন্দ্ব বাঞ্ছিত দ্রব্য পাওয়ার পথ রুদ্ধ করে দেয়। মনের সেই যে অপ্রীতিকর অবস্থা, তাকেই বলি **নিরাশা বা frustration**।

ক্লিফোর্ড টি. মরগ্যান্ বলেছেন, লক্ষ্যে শীঘ্র পৌঁছতে না পারলে প্রেষণা অতৃপ্ত থেকে যায়। যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে যে প্রেষণা পরিতৃপ্ত হল না তাকেই ব্যর্থ প্রেষণা বলে।[১]

সমস্ত নিরাশার পশ্চাতেই থাকে কোন দুর্লঙ্ঘ্য বাধা—তীব্র অথচ তা পরিতৃপ্তির পথ রুদ্ধ। এ ক্ষেত্রেই আসে নিরাশা। এর ফল মানসিক বিষাদ বা **মানসিক দ্বন্দ্ব (conftict)**। মান্ তাই লিখেছেন, কোন কোন ক্ষেত্রে বলবতী প্রেষণা এমন সব বাধার দ্বারা বিঘ্নপ্রাপ্ত হয় যা অতিক্রম করা অসম্ভব মনে হয়। এই অবস্থাতেই নৈরাশ্য, ব্যর্থতা ও সংঘাতের উৎপত্তি হয়। এই ব্যর্থকরী অবস্থার নামই **বাধা (barrier)** এবং এই ব্যর্থতার অভিজ্ঞতাকেই সময়ে সময়ে মানসিক বেদনা বা মানসিক সংঘাত বলে অভিহিত করা হয়।[২]

---

১ ...If the goals are not achieved soon enough, the motives go unsatisfied. A motive not satisfied within a reasonable time is a frustrated motive. C. T. Morgan—Psychology, p. 248

২ ...in some cases strong motives are blocked by impossible barriers, which it seems impossible to overcome. It is with reference to such situations

এ দুর্লঙ্ঘ্য বাধা প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম কোন বাহ্য অবস্থা হতে পারে। অনেক দিন পর অতি প্রিয় বন্ধু দেশে ফিরে আসছে—তোমাকে চিঠি লিখেছে স্টেশনে উপস্থিত থাকতে, কারণ তার অপেক্ষা করবার উপায় নেই—পরদিন উত্তর প্রদেশে চাকরিতে যোগ দিতেই হবে। তুমি স্টেশনে যাবার জন্যে খুবই আগ্রহান্বিত, কিন্তু গাড়ী আসবার এক ঘণ্টা আগে থেকে প্রবল জল-ঝড় শুরু হয়ে রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে গেল। কোন রকম যানবাহন পাওয়া গেল না—তোমার বন্ধুর সাথে দেখা করা হল না—মন খারাপ করে ঘরে বসে রইলে।

আবার বাধাটা মনুষ্যসৃষ্টও হতে পারে। অফিসের তরুণী এক বান্ধবীকে সন্ধ্যার শো-তে সিনেমায় নিয়ে যাবে বলে কথা দিয়েছ—টিকিট কেনা হয়ে গেছে। কিন্তু বাড়ী ফিরে এসে শুনলে—গৃহিণীর মাস্‌তুতো বোনের বিয়েতে তাঁকে নিয়ে অবশ্যই যেতে হবে কাশীপুর! গৃহিণীরা এমনই অবিবেচক, অথচ সিনেমায় যাওয়ার কথা তাঁকে বলবারও উপায় নেই!

অনেক সময় বাধাটা সামাজিক। তুমি ব্রাহ্মণের মেয়ে, অবস্থাপন্ন ঘরের। একটি দরিদ্র অথচ মেধাবী সুন্দর সাহা ছেলেকে ভালবেসেছ, তাকে বিয়ে করতে চাও। কিন্তু তোমার পরিবার এর ঘোর বিরোধী। তাঁরা বাধা দিলেন।

এ বাধাগুলো হল বাইরের। কিন্তু বাধা থাকতে পারে ব্যক্তির ভেতর থেকেই। নিজের পারিবারিক ও মানসিক অসামর্থ্য অনেক সময় আকাঙ্ক্ষা-পূরণের পথে প্রতিবন্ধক হতে পারে। দৌড়ের বাজিতে প্রথম হবার প্রচণ্ড লোভ থাকলেও যোগ্যতর প্রতিযোগীদের কাছে হেরে গেলাম। কবি হতে পারলাম না, সুবক্তা হতে পারলাম না, ক্লাসে পড়াশুনায় ভাল ছেলে বলে নাম কিনতে পারলাম না। এ সব ক্ষেত্রে নিজের অক্ষমতার জন্য মনস্তাপ হওয়াই স্বাভাবিক। এখানে দুঃখ গভীরতর, কারণ বাইরের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা পীড়া দিলেও তাকে মেনে নেওয়া ভিন্ন পথ থাকে না। কিন্তু নিজের অসামর্থ্য নিজের কাছে স্বীকার করে শান্ত হয়ে থাকা কঠিন।

that frustration, stress or conflict arises. The frustrating situation may be called a barrier or obstacle and the frustrating experience is sometimes referred to as mental distress or mental conflict. Munn—Psychology, p. 136

কিন্তু সবচেয়ে মানসিক অশান্তি ও দ্বন্দ্বের কারণ হয় যখন মনের মধ্যে বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষা বা ভয়ের আকর্ষণ-বিকর্ষণের সুসমন্বয়ের অভাবে মন দিশেহারা হয়, যখন দ্বিধা-সংশয়ে মন দোদুল্যমান, যখন 'মনস্থির' করতে পারি না।[৩]

সব ব্যক্তিই একই ভাবে বাধা ও সংঘাতের সম্মুখীন হয় না। এখানেই ব্যক্তিত্বের প্রভেদ ও চরিত্রের পরীক্ষা। কোন কোন ব্যক্তি বাধামাত্রেই ভয় পায়। এরা দুর্বলচিত্ত। কেউ বা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে সংগ্রাম করে জয়ী হয়, কেউ বা এই সংঘাত ও সংগ্রামে মানসিক সুস্থতা হারিয়ে গুরুতর মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়। খুব সামান্য কয়জন আত্মসংযমী যোগীপুরুষ সমস্ত প্রতিকূল অবস্থাতেই শান্ত নিরুদ্বিগ্ন থাকেন। নিজ আকাঙ্ক্ষাকে তাঁরা পরিমিত করেন, স্থির বিচার দ্বারা বাধার পরিমাণ ও নিজ শক্তির উপযুক্ততা বিবেচনা করে কাজে প্রবৃত্ত হন। তাঁরা কেবল স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা চালিত হন না, তাঁরা আদর্শানুযায়ী কল্যাণবুদ্ধি দ্বারা নিজের কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং সমস্ত কর্মফল ভগবানে অর্পণ করে সর্ব অবস্থাতেই অচঞ্চল থাকতে পারেন।

অধ্যাপক কুর্ট লিউয়িন্ বাধা ও সংঘাতের ক্ষেত্রে মানুষের ব্যবহার এক অভিনব দৃষ্টিতে দেখতে চেষ্টা করেছেন এবং পদার্থবিদ্যা ও বলবিদ্যার ভিত্তিতে এ বিষয়ের ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন। কোন জড়দ্রব্যের ক্রিয়া নির্ভর করে সেই দ্রব্যের ওপর বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়ার ওপর। প্রাণীর ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। সমস্ত প্রাণীর ব্যবহারই (behaviour) বিভিন্ন শক্তির আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বারাই নির্ণীত হয়। বিভিন্ন শক্তি সম্বন্ধে প্রাণীর আকর্ষণ-বিকর্ষণের সম্বন্ধকেই জড়বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় **যোজ্যতা (valency)** এবং বিভিন্ন শক্তির প্রভাবের ফলে বস্তু (বা প্রাণীর) ব্যবহারের গতিতে বলা হয় **ভেক্টর (vector)**। বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে বস্তুর আকর্ষণ-বিকর্ষণের সমস্ত সম্বন্ধ জানা থাকলে কোন বিশেষ অবস্থায় সে বস্তুর গতি কি হবে তা আঙ্কিক ভাবে নির্ধারণ করা যায়। লিউয়িন্-এর মতে প্রাণীর ব্যবহারও বলবিদ্যার একই মৌলিক নিয়মগুলি অনুসরণ করে। যথা: একই বস্তুর ওপর দুটি বিপরীত অথচ

৩ Inability to make up our mind on some issue demanding decision exemplifies such conflict,—the presence of conflicting possibilities of action may be more frustrating than any of the barriers already mentioned. Munn —Psychology, p. 137

সমান আকর্ষণশক্তি ক্রিয়া করলে বস্তু ন-যযৌ ন-তস্থৌ অবস্থায়, কখনো
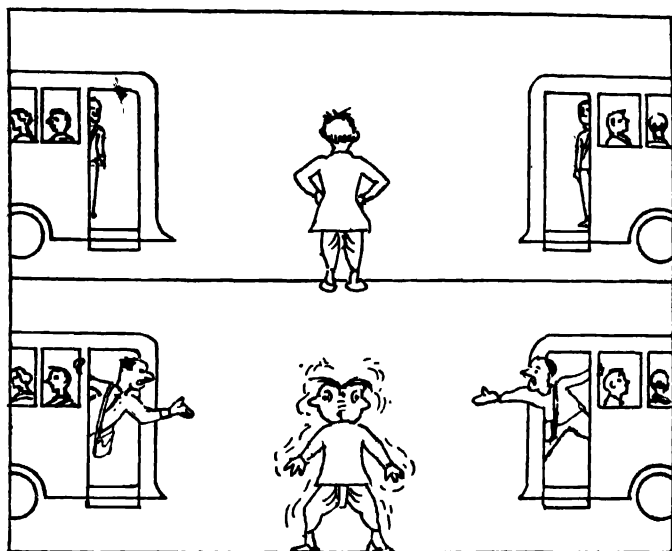
এদিকে কখনো ওদিকে সামান্য একটু হেললেও, একই স্থানে স্থির থাকে। তেমনি দার্শনিক বুড়িডানের গর্দভ সম্বন্ধে এ গল্প প্রচলিত আছে যে, এই গর্দভের দুই পাশে সমান লোভনীয় সমপরিমাণ খড়-বিচালির দুই বোঝা রাখাতে বেচারী 'দার্শনিক' গর্দভ কোন্ বোঝাটা আগে খাবে তা স্থির করতে না পেরে অগত্যা অনাহারেই প্রাণত্যাগ করল।[৪] এটা হাস্যকর অতিশয়োক্তি সন্দেহ নেই, কিন্তু মানুষের জীবনেও কি এমন ঘটে না? 'কাপুরুষ ও মহাপুরুষ' দেখতে যাবে, না বন্ধুর বিয়েতে যাবে—এই দোটানায় পড়ে হয়ত শেষ পর্যন্ত সাতটা বেজে গেল, কোথাও যাওয়া হল না। আবার যেখানে একদিকে আকর্ষণ আর এক দিকে বিকর্ষণ, সেখানে বস্তু আকর্ষণের শক্তির কাছেই সহজে আত্মসমর্পণ করে। মার কাছে গেলে বকুনি, আর বাবার কাছে গেলে আদর, ইস্কুল থেকে দেরিতে-ফেরা মেয়ের সামনে এই যদি প্রশ্ন দাঁড়ায় তবে সে বাবার কাছেই যাবে এতে আর সন্দেহ কি? এখানেও তার ব্যবহার জড়বিদ্যার মৌলিক নীতিই অনুসরণ করছে। আর দুই বিরুদ্ধ প্রবল শক্তি কোন বস্তুর ওপর ক্রিয়া

৪ C. E. M. Joad—Guide to Philosophy, p. 23

করলে সে বস্তু এ দুই শক্তির ক্রিয়ার পথ থেকে দূরে অন্য কোনখানে নিক্ষিপ্ত হবে। তেমনি ইস্কুল-থেকে-বাড়ীতে-দেরিতে-ফেরা মেয়ের সমস্যা যদি দাঁড়ায়, বাড়ীতে গেলে হয় বাবা মারবেন, না হয় মা বিষম বকুনি দেবেন, তবে সে মেয়ে হয়ত পাড়ার 'মাসী'র বাড়ীতে পালিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করবে।[৫] লিউয়িন্-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ডাঃ মেয়ার-ও সাদা ইঁদুরের ওপর অনুরূপ পরীক্ষা করে তার ফলাফল ছবি ও ফটোগ্রাফ দিয়ে অনুরূপ ভাবেই প্রমাণ করেছেন যে, বাধার সম্মুখীন হয়ে প্রাণীও জড়বস্তুর মতো বিভিন্ন অবস্থায় নির্দিষ্ট কতকগুলি মৌলিক নীতিই অনুসরণ করে।[৬] এ সমস্ত পরীক্ষা ও ব্যাখ্যা অভিনব এবং হৃদয়গ্রাহী সত্য, কিন্তু মানুষ ঠিক জড়বস্তু নয় এবং তার ইচ্ছা বিবেক বুদ্ধি থাকার জন্যে তার ব্যবহারকে জড়বস্তুর মতো যান্ত্রিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না—এ কথাটা যেন যথেষ্ট স্বীকৃত নয়।

বাধার ফলে মানুষের মনে যে সংঘাত সৃষ্টি হয় এবং কত বিভিন্নভাবে মানুষ তার সম্মুখীন হয় তা একটু আলোচনা করা যাক।

বাধামাত্রই বিরক্তিকর। আমার যখন কিছু আকাঙ্ক্ষা করি, তখন যত শীগগির সম্ভব আকাঙ্ক্ষার বস্তুকে আয়ত্ত করতে চাই। বাধা মানেই এমন অবস্থা যাতে আকাঙ্ক্ষা-পূরণ বিলম্বিত অথবা তার সম্ভাবনা দূরীভূত হচ্ছে। এ অবস্থায় মনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে বিরক্তি ও অধৈর্য। আমরা বাধাকে সাধ্য হলে দূর করতে চাই এবং যে অবস্থা বা ব্যক্তি বাধা সৃষ্টি করে তার ওপর রাগান্বিত হই। রাগটা কম হলে গালমন্দ করি, বেশী রেগে গেলে কুৎসিত ভাষা ব্যবহার করি, আরো মাত্রা ছাড়ালে মারধোর করি। এখানেই বিশেষ করে টের পাই—ইতর শ্রেণীর চেয়ে আমরা খুব বেশী তফাত নই। কুকুরের মুখের খাবার অন্য কুকুরে কেড়ে নিতে গেলে সে তেড়ে যাবে, আক্রমণ করবে, ঘেউ ঘেউ করে পাড়া মাথায় করবে। আমরাও প্রায় তাই করি। যেমন, লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে সিনেমার টিকিট পাবার আশায় দাঁড়িয়ে আছ। শেষ টিকিটখানা তুমি ন্যায্যভাবে পেতে পারতে—হঠাৎ পেছন থেকে একটি ছেলে তোমায় ল্যাং মেরে ফেলে দিয়ে টিকিটখানা ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। তুমি এতে ভীষণ চটে যাবে, হয়তো বা

---

৫ K. Lewin—Field theory and Experiment in Social Psychology, pp. 92-105

৬ Dr. N. R. J. Maier—Frustration, p. 127

খেউড়-খিস্তি করবে, গায়ের জোর থাকলে ছেলেটাকে মারধোরও করবে। মানুষ কুকুরের চেয়ে 'সভ্য'—কারণ তার 'ভাষা' আছে। মানুষ সভ্য হয়েছে বলে প্রকাশ্যভাবে শারীরিক ঝগড়া-কলহ করতে সে লজ্জাবোধ করে—কিন্তু ঝগড়াটা চালায় হয়তো বা খবরের কাগজে 'কড়া' চিঠি লিখে। যেখানে রাগের বস্তুটি অতি প্রবল, যেখানে তিনি বড়সাহেব বা মনিব, যেখানে রাগপ্রকাশটা প্রকাশ্যে বা গোপনে প্রকাশ করাটাও নিরাপদ নয়, সেখানে মনের ঝালটা হয়তো মেটাই অযথা অধীনস্থ কর্মচারীকে গালাগালি করে। আমাদের দেশে একটা কথা আছে—"দরবারে না পাইয়া ঠাঁই, ঘরে গিয়া মাগ কিলাই"—অর্থাৎ যে স্বামী দরবারে অসম্মান পেয়ে এসেছেন, তিনি তাঁর নিষ্ফল আক্রোশ প্রকাশ করেন ঘরের নিরীহ স্ত্রীর ওপর। এ কাপুরুষতার লক্ষণ সন্দেহ নেই, তবে এই কাপুরুষতার দোষে আমরা অনেকেই অপরাধী। এখানে উদ্দেশ্য-বস্তুর **স্থানচ্যুতি ও পরিবর্ত-গ্রহণ ঘটেছে (Transference and substitution)**।

এ পরিবর্ত-গ্রহণটা আরেকভাবেও ঘটতে পারে। শহুরে মেয়ে অণিমাকে ভালবাসি, তাকেই বিয়ে করবার জন্যে পাগল, কিন্তু তার বাবা-মা'র মত নেই। একদিন হয়তো তাঁরা অপমান করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন। রাগে-দুঃখে গাঁয়ের মেয়ে শ্যামলীকে বিয়ে করলাম। নিজের মনকেও বোঝালাম—'এই ভাল হল' (sweet pear mechanism)।

শিশুদের আকাঙ্ক্ষা-পূরণের পথে বারে বারে বিষম বিঘ্ন উপস্থিত হলে তাদের ব্যক্তিত্বের সহজ বিকাশ তো ক্ষুণ্ণ হয়ই, তা ছাড়া তাদের মনের অসুস্থ অবস্থা শুধু ঝগড়া-মারামারির মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায় না। মিথ্যা কথা বলা, চুরি করা ইত্যাদি গোপন অসামাজিক পথেও তাদের মানসিক সুস্থতার ভিত্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যাঁরা শিশু-অপরাধীদের নিয়ে আলোচনা করেন তাঁরা জানেন শিশুর স্বাভাবিক সুস্থ আকাঙ্ক্ষার পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার জন্যেই তারা অপরাধ করে—চুরি করে, মিথ্যা কথা বলে, নোংরামী ও কদর্য ব্যবহারের পথে বিকৃত তৃপ্তি খোঁজে। যে শিশুরা স্বাভাবিক স্নেহবঞ্চিত, যেখানে অতিরিক্ত শাসন তাদের স্বতোৎসারিত উদ্যমের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে, সেখানে প্রায়ই ভবিষ্যৎ সমাজ-বিরোধিতার পথ সৃষ্টি হয়। বর্তমানে ছাত্রসমাজের উচ্ছৃঙ্খলতার মূল এখানেই খুঁজতে হবে। আমাদের দরিদ্র, নির্বোধ ও অসুস্থ সমাজ-ব্যবস্থায় শিশু কিশোর ও যুবকদের খেলাধুলা ভ্রমণ আলোচনা প্রভৃতি সৃজনধর্মী আনন্দময়

আত্মবিকাশের কোন সুচিন্তিত ব্যবস্থাই নেই। পদে পদে এদের স্বাভাবিক উদ্যম ও সৃজনশক্তি বাধাপ্রাপ্ত। উদ্বাস্তু কলোনীর দুর্ভাগা ছেলেমেয়েরা যে হৈ-হল্লা, ট্রাম-পোড়ানো, পরীক্ষা পণ্ড করা, ধর্মঘট ইত্যাদি ব্যাপারে নেতৃত্ব গ্রহণ করে এটা আকস্মিক নয়। এ নিয়ে দেশের যুবকদের শুধু গাল দিলে এ সমস্যার সমাধান হবে না। রাশিয়া এ কথা জানে যে অপরাধের একটি মূল কারণ দারিদ্র্য ও সামাজিক কুব্যবস্থা। দেশের যুবশক্তির আত্মসম্ভ্রম জাগ্রত করতে পারলে এই প্রচণ্ড শক্তি দেশের কল্যাণেই নিয়োজিত হবে। অন্যান্য সব অগ্রসর দেশেই তাই চেষ্টা দেশের যুবকদের দেহ ও মনের সুস্থ বিকাশের জন্যে নানা সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়ে তাদের মন থেকে হতাশা ও হীনমন্যতা দূর করে দেওয়া। আমাদের দেশেও এ বিষয়ে কিছু কিছু সরকারী চেষ্টা চলছে। এ প্রশংসার কথা সন্দেহই নেই। কিন্তু দেশের জনমত জাগ্রত হয়ে এ বিষয়ে সহযোগিতা করতে এগিয়ে না এলে অতি সামান্যই ফল হবে।

যারা অক্ষম ও দুর্বল-চরিত্র, তারা আকাঙ্ক্ষিত বস্তুলাভে অসমর্থ হলে পরকে নিজেদের অসাফল্যের জন্যে দোষী করে। যে ছেলে পরীক্ষায় পাস করতে পারল না, সে উচ্চৈঃস্বরে শিক্ষকের অযোগ্যতার কথা প্রচার করে। যে মেয়ে আবৃত্তি প্রতিযোগিতার পুরস্কার পেল না, সে বলে বেড়াতে থাকে বিচারকের পক্ষপাতিত্বের কথা। এবং ছেলেমেয়েদের এই পরনিন্দায় আমরা অভিভাবকরা সানন্দে যোগ দিই। এ অতিপ্রচলিত অভ্যাস আমাদের জাতীয় চরিত্রের একটি দুর্বলতার দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করে। আমাদের সংবাদপত্রে সমস্বরে বাঙালী-দলনের অভিযোগ সর্বদা ধ্বনিত হতে থাকে, বাঙালীর বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতের ষড়যন্ত্রের এই অতিতীক্ষ্ণ প্রতিবাদের পেছনে সম্ভবত নৈরাশ্যক্ষুব্ধ দুর্বল মনের পরাজিতের মনোবৃত্তি কিছুটা প্রকাশ পাচ্ছে।

বারংবার নিরাশার লজ্জা থেকে অহংকে রক্ষার জন্যে যে সব চেতন ও অবচেতন কৌশল আমরা অবলম্বন করি তাদের ইংরেজীতে **Ego-defense mechanism** বলা হয়। এ নিয়ে অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

পরনিন্দা (Projection), আত্মদোষস্খালন (Rationalisation), দিবাস্বপ্ন ও কল্পনা (daydream and fantasy) ইত্যাদি কৌশলগুলির অধিকাংশই নিজেকে ফাঁকি দেওয়ার অপটু কৌশল। এর মধ্যে সান্ত্বনা থাকতে পারে, কিন্তু মহত্ত্ব ও পৌরুষ নেই। কিন্তু এর সব কৌশলগুলিই যে নিন্দনীয় তা নয়। কখনো কখনো এমন দেখা যায় যে বাইরের প্রতিকূলতাতেই হোক,

আর নিজ অক্ষমতার জন্যেই হোক্, কোন বিষয়ে সফলতা লাভ করতে পারলাম না। ভাল করে বিচার করে দেখলাম এ ক্ষেত্রে সফলতার আশা বৃথা, তাই সংকল্প করলাম অন্য কোন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে এবং সে চেষ্টায় সফল হয়ে মনের গ্লানি কিছুটা দূর করতে সক্ষম হলাম। একে বলে **অতিপ্রতিপূরণ (over-compensation)**। কোন কুরূপা মেয়ের বাঞ্ছিত পুরুষকে অন্য সুশ্রী মেয়ে দখল করে নিল। কিন্তু সে মেয়ে ভেঙে পড়ল না। শান্ত ধৈর্যের সঙ্গে সে লেখাপড়ায় মন দিল, ক্রমে সে বিদেশে গেল। বিদেশে গিয়ে সাংবাদিকতায় উঁচু ডিগ্রী পেয়ে দেশে ফিরে এসে প্রসিদ্ধ এক কাগজের সম্পাদিকা হয়ে তার লেখা দিয়ে দেশজোড়া নাম কিনল। এ মেয়ের অন্তরের তিক্ততা ও গ্লানি তাকে ব্যর্থ বিক্ষোভের পথে নিয়ে যায় নি। তাকে নতুন ভাবে জীবনে সার্থকতালাভের পথে উদ্বুদ্ধ করেছে। হয়তো যৌবনের প্রারম্ভে পরাজয়ের বেদনা সে স্নিগ্ধ ক্ষমায় মণ্ডিত করে তুলতে পারবে।

এ রকমই আর একটি মহৎ পথ হচ্ছে, ফ্রএড্ যাকে বলেছেন—বাসনার উদ্গতি (sublimation)। দৈহিক ভালবাসার পথ যেখানে ব্যর্থ হল, ভালবাসাকে অশ্রুজলে ধৌত করে, মহৎ মানব-প্রেমে পরিণত করবার কাহিনী বিরল নয়। দৈহিক প্রেমের এই দেহাতীত প্রেমে উত্তরণ মহৎ ধৈর্য ও বিপুল আত্মসংযমের পরিচায়ক।

নৈরাশ্য ও সংঘাত সম্পূর্ণ দূরীকরণ পুরোপুরি সম্ভব নয়, উচিতও নয়। জীবনে অসাফল্য আসবেই এবং সংঘাতও অনিবার্য। সুস্থ সবল জীবন গড়ে তুলতে এদের প্রয়োজন আছে। কিন্তু কিশোর ও তরুণদের জীবনে পৌনঃ-পুনিক ও যুক্তিহীন বাধা যুবশক্তির একান্ত অপচয় ঘটায় এবং দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তা বিষম বিপজ্জনক। নৈরাশ্য ও বাধা অতিক্রমের সহজ বাঁধাধরা কোন পথ নেই। যেখানে গুরুতর মানসিক বিকৃতির সম্ভাবনা সেখানে মানসিক চিকিৎসার সুব্যবস্থা অবশ্য প্রয়োজন। দেশের ও সমাজের সর্বক্ষেত্রে যে অস্বাভাবিক অসুস্থ অব্যবস্থা আমাদের তরুণ ও কিশোরদের জীবন অযথা ভারাক্রান্ত ও দুর্বিসহ করে তুলছে তার নিরসনে আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব আছে। আমাদের দেশের যুবকদের নৈরাশ্যবোধের সহস্র কারণ আছে। ভবিষ্যৎ জীবিকা সম্পর্কে অনিশ্চয়তা, পরীক্ষায় অস্বাভাবিক বেশী ফেলের হার তাদের লেখাপড়া সম্পর্কে বীতস্পৃহ করেছে। তাদের স্বাভাবিক জৈবশক্তিকে সৃজনমূলক ও কল্যাণকর পথে পরিচালনা করবার

উদ্যম উপায় ও বুদ্ধি না আছে অভিভাবকদের, না শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের। অন্যদিকে বরং তাদের এ প্রচণ্ড শক্তি আত্মক্ষয়কারী, অথচ তরল ও উত্তেজনাকারী নানা প্রলোভনের পথে (জুয়াখেলা, রক্‌বাজী) প্রবল ভাবে আকর্ষণ করে। রাজ-নৈতিক নেতাদের দায়িত্বও এ বিষয়ে সামান্য নয়। তাঁরা ছাত্রদের দলগত নানা আন্দোলনের পথে নিত্য আহ্বান করছেন। এ সব ক্ষেত্রে ছাত্রদল সহজে বাহবা পায়, তাদের বঞ্চিত অহংবুদ্ধি একটা সুলভ তৃপ্তিলাভের পথ পায়; তাদের চিন্তা ধ্বংসাত্মক পথেই ধাবিত হয়। তারা বিশ্বাস করতে শেখে তাদের দুর্দশার জন্য সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষক ও অভিভাবকই দায়ী। কিন্তু জীবনের সমস্ত দুঃখ, বেদনা নৈরাশ্যের জন্যে অন্যেই দায়ী—এ তিক্ত, যুক্তিহীন মনোভাব তরুণদের মধ্যে গড়ে উঠছে, এটা শুভ লক্ষণ নয়। দেশের তরুণরা এ কথা বিশ্বাস করুক,—মানুষ তার নিজ চেষ্টা, নিজ উদ্যম দ্বারাই পৃথিবীর নানা অব্যবস্থা, অবিচার ও অপূর্ণতার প্রতিকার করে। প্রতিকূল অবস্থাতেও আমরা হার মানব না, নিজেকে ফাঁকি দেব না, কেবলমাত্র অন্যের দোষ দেখব না—এমন মনোবৃত্তি, এমন বিশ্বাস গড়ে তুলতে হবে। দৃঢ় চরিত্রগঠনই নৈরাশ্য- ও সংঘাত-জয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। এ পথ ফাঁকির নয়। আত্মপরীক্ষা, ধৈর্য, শান্ত বিচারবুদ্ধি ও আত্মসংযম দ্বারাই জীবনে সত্যিকারের সাফল্যলাভ করা যায়। নান্যপন্থাঃ বিদ্যতে।

অষ্টম অধ্যায়

সংঘাত ও সঙ্গতিস্থাপনের কলকব্জা

ডারুইন্-এর ক্রমবিকাশবাদ জনপ্রিয়তা লাভ করবার পর থেকে 'জীবন-সংগ্রাম' কথাটা খুব চালু হয়েছে। এটা ঠিকই যে, জীবনের বহু ক্রিয়ারই পটভূমিকায় উপস্থিত থাকে কোন না কোন প্রকার বাধা, বৈপরীত্য, বাস্তব বা সম্ভাব্য সংঘর্ষ। একেই নাটকীয় ভাষায় বলা যেতে পারে 'সংগ্রাম'।

শর্মিষ্ঠার চা-এ লোভ আছে, কিন্তু মা তাকে কিছুতেই চা খেতে দেন না, কারণ নাকি চা খেলে নাকি লিভার খারাপ হয়। তবে মা কেন চা খায়, বাবা কেন দু'কাপ করে খান? বাপ্পি অন্যান্য ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মনের আনন্দে খেলা করছিল। মা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বাপ্পিকে হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন, "হতভাগা ছেলে, ইস্কুলের বেলা হয়ে গেছে, স্নান হল না, খাওয়া হল না, শুধু খেলা আর খেলা! ইস্কুলে যে যেতে হবে, সেদিকে ছেলের খেয়াল আছে?"

এ রকম 'সংগ্রাম' ও সংঘাত (conflict) শিশুদের জীবনেই কিছু কম নেই। বড়দের বেলায় বাধা ও সংঘাত আরো কত হাজারো রকমের। ঝড়জল আছে, বাজারে মাছের 'আকাল' আছে, অফিস-ফেরতা ট্রাম হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়া আছে। এগুলি তো বাহ্য পরিবেশগত বাধা। তেমনি সমাজজীবনেও তো পদে পদে বাধা ও সংঘাত। অফিসের বড়সাহেব তো খুঁত ধরবার তালেই আছেন, বাসবী নন্দিতাকে দেখিয়ে দেখিয়েই যেন নিত্যি নতুন শাড়ী পরে অফিসে আসে। অভিজিৎ বিয়ে করতে চায় তনিমাকে, কিন্তু অভিজিৎ-এর বাপ-মা ওই 'হা-ঘরে'র মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিতে রাজি নন। আবার বাধা ও সংঘাতের কারণ নিজের দুর্বলতা-ও অক্ষমতা-সঞ্জাতও হতে পারে। নবনীতার মা পরীক্ষার পর ধরাধরি করে ওপরের ক্লাসে মেয়েকে তুলেছেন। কিন্তু মেয়ে সব বিষয়েই কাঁচা, কাজেই ফাইন্যাল পরীক্ষার আগে দুদিন নবনীতা রাতে না ঘুমিয়ে, না খেয়ে, বমি করে, মাথা ঘুরে, আছড়ে পড়ে শয্যা নিল।

এ সবই জীবনের ছোট বড় নানা বাধা ও সংঘাতের উদাহরণ। সকলের

জীবনেই এ জাতীয় বাধা ও সংঘাত আসবেই। এর মধ্যে সবগুলিই সমান গুরুতর নয়। আবার, সকলের কাছে একই বস্তু বা অবস্থা বাধা বলে বিবেচিত হবে না। একজনে যেটাকে বাধা বলে মনে করে অথবা সংঘাতের বিষয় বলে মনে করে, অন্যের কাছে সেটা কোন সমস্যাই নয়।[১] কোন্‌টা বাধা তা ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর নির্ভর করে। আবার বাধার সম্মুখীন হওয়ার মনোবল বা মনোভাব সকলের ঠিক এক রকমের নয়। কেউ বা অল্প বাধাতেই নিরাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেয়, কেউ দৃঢ়সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যায়, কেউ কোন না কোন ভাবে আপস-রফা করে সংকট এড়ায়, আবার কেউ বা বিরুদ্ধ অবস্থার চাপে মানসিক স্থৈর্য হারিয়ে রুগ্‌ণ হয়ে পড়ে।

দুরতিক্রম্য বাধা ও সংঘাত

ব্যক্তির উদ্দেশ্যলাভের পথে যা অন্তরায়, তাকেই বলি বাধা। কিন্তু সব বাধা সমান প্রবল নয়। **বাইরের বাধা যদি এমন দুরতিক্রম্য হয় যে ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা-পরিতৃপ্তির কোন পথই থাকে না, তাহলে মনের যে দুঃসহ হতাশার অবস্থা ইংরেজীতে তাকে বলা হয় ফ্রাসট্রেশ্যান (Frustration)।** উৎসাহভরে নতুন বৌকে নিয়ে দার্জিলিং বেড়াতে যাবে; টিকিট কাটা, সীট্‌ রিজারভেসন্‌, মালপত্র বাঁধা সব হয়ে গেছে, স্টেশনে যাওয়ার পথে হঠাৎ বিষম এক দুর্ঘটনায় পড়ে গাড়ী চুরমার, মাথায় বিষম চোট লেগে বৌ অজ্ঞান হয়ে গেল, তাকে নিয়ে হাসপাতালে দৌড়োতে হল। দার্জিলিং যাওয়া পণ্ড হল। এমন দুঃখকর অসহায় অবস্থাকে বলা হবে ফ্রাসট্রেশ্যান্‌।

কিন্তু সংঘাতের (conflict) বেলায় একাধিক তীব্র আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তিকে আকর্ষণ করে। কিন্তু এ আকাঙ্ক্ষাগুলির সমন্বয় সম্ভব নয়, তাই ব্যক্তির এক দোদুল্যমান অস্থির অবস্থা। দুদিন বাদে পরীক্ষা, একটা জরুরী প্রশ্ন তৈরি না করলেই নয়। ওদিকে মাসতুতো বোন ডলি ফোন করল ওরা 'দ্য ইয়েলো রোলসরয়েস' দেখতে যাচ্ছে, একখানা টিকিট বাড়তি আছে, সমীর যেন অবিলম্বে চলে আসে। সমীরের মনের এই দোদুল্যমান অবস্থা—

---

[১] Psychologically speaking, such factors as we have mentioned are barriers when the individual has goals which are blocked by them and when he is aware of the fact that they impede progress toward these goals... *there is no psychological significance to barrier which the individual himself fails to recognize.* Snygg & Comb—Individual Behaviour, pp. 49-50

কাকে রাখি, কারে থুই—এ হল সংঘাত বা ইংরেজীতে বলা হয় **কনফ্লিক্ট** (conflict)। সংঘাতের ক্ষেত্রে যে বাধা সেটা সব সময় বাইরের থেকে আসে না, সেটা আন্তরিকও হতে পারে।

ফ্রাস্ট্রেশ্যান (দুরতিক্রম্য বাধ্যজনিত হতাশা) ও কনফ্লিক্ট (সংঘাত) সম্পূর্ণ পৃথক নয় এবং এই দুই এক জিনিসও নয়। বাস্তব জীবনে এই দুই অবস্থাই একসঙ্গে মিশে থাকতে পারে। যেখানে দুরতিক্রম্য বাধাজনিত হতাশা বিশেষ জটিল নয়, সেখানে ব্যক্তি অন্য কোন না কোনভাবে অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিসাধন করে নেয়। কিন্তু যেখানে সংঘাতের জন্যে মনের দোদুল্যমান অবস্থা, সেখানে একটা পথ বেছে নিলেও অস্বস্তি দূর হয় না।[২]

দুর্লঙ্ঘ্য বাধাজনিত হতাশার ফল

হতাশা বা সংঘাত কোনটাই মানুষের পক্ষে স্থায়ী স্বাভাবিক অবস্থা হতে পারে না। সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ তো বটেই, যারা মানসিক অসুস্থ তারাও একটা সুসঙ্গত সম্বন্ধস্থাপন করতেই চায়। মানসিক যারা অসুস্থ তাদের ব্যবহারের বিকৃতিও সংঘাত-মীমাংসার চেষ্টায় অসামর্থ্যের জন্যেই ঘটে।

হতাশার ফলাফল মানুষের ব্যবহারে কিভাবে প্রতিফলিত হয়, কি ভাবে এ অবস্থায় একটা সঙ্গতিস্থাপনে ব্যক্তি চেষ্টিত হয়, তা সাধারণ মানুষের জীবন থেকে, মনুষ্যেতর প্রাণীর ব্যবহার লক্ষ্য করে, হাসপাতালে রোগীদের অবস্থা

২ A frustration is an external circumstance or an act of another person that prevents the reduction of an aroused drive. An adolescent may want to use the family car to drive his girlfriend to a dance, but be frustrated because the automobile is out of order, or because his father forbids him to use it.

Conflict is somewhat different. A youngster may want to go to a dance because he must do what his friends do in order to be treated as a member of the group and to feel that he belongs. ···But the youth may be a clumsy dancer and sensitive to the real or imagined ridicule of his fellows. Therefore, he also has a motive to avoid the dance to escape humiliation. The boy is in a dilemma. Whether he goes to the dance or whether he stays away, he will experience unreduced tension. A conflict is the arousing of two or more antagonistic patterns of motivation that cannot be satisfied together. Frustrations and conflicts are not entirely separate, for many real-life situations involve both. The distinction is a useful one, however. Uncomplicated frustration ordinarily result in more constructive readjustment than do some of the common kinds of conflict. Shaffer & Shoben—The Psychology of Adjustment, p. 99

পর্যবেক্ষণ করে, এবং সীমিত ক্ষেত্রে পরীক্ষা (limited experiment) থেকেও জানা যায়।

যেখানে ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা-পূরণের পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা এসে উপস্থিত হয় সেখানে সাধারণত ব্যক্তি অন্য কোন উদ্দেশ্যপূরণের দ্বারা ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করে। সমীর অণিমাকে ভালবেসেছিল, খুব ইচ্ছে ছিল ওকে বিয়ে করবে। কিন্তু অণিমার বাবা মেয়ের অন্যত্র বিয়ে দিলেন। সমীর মনের দুঃখ ভুলতে চেষ্টা করল কবিতা লিখে, বা বিজ্ঞানচর্চায় মন দিয়ে, বা সিনেমা আর উচ্ছৃঙ্খল জীবনে গা ভাসিয়ে দিয়ে, বা সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করে, অথবা অন্য মেয়েকে বিয়ে করে। একে আমরা বলতে পারি, **বিকল্পের সাহায্যে আকাঙ্ক্ষা-পূরণের চেষ্টা** (Compensation বা substitution)। যখন আকাঙ্ক্ষার মোড় ফিরিয়ে তাকে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে বলে **উদ্গতি** (sublimation)। কে কোন্ ভাবে বাধাপ্রাপ্ত আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি খুঁজবে তা অনেকটা নির্ভর করে ব্যক্তি-চরিত্রের ওপরে।

সাধারণত এটা দেখা যায় আকাঙ্ক্ষা বাধাপ্রাপ্ত হলে তা তীব্রতর হয়। ব্যক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা-তৃপ্তির পথে বাধা তাকে সেই কাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রতি অধিকতর আকর্ষণ করে। তাই 'নিষিদ্ধ' প্রেমের আকর্ষণ এত তীব্র। বাধা দুরতিক্রম্য না হলে সামান্য কিছু বাধা আকাঙ্ক্ষার বস্তুকে অধিকতর আকর্ষণীয় করে তোলে। একটি মজার পরীক্ষা। এক হোটেলের পরিচারিকারা যখন খাদ্যপরিবেশন করবে তখন দুটি টেবিলে ঠিক একই রকম ফলফলাদি (desserts) কেটে সাজিয়ে রাখা হল। নিজেরা যখন তারা খেতে বসে তখন দেখা যায়, বেশীর ভাগ মেয়েই বরং একটু দূর টেবিল হতে খাদ্য নিতেই বেশী পছন্দ করে। খদ্দেরদের খাদ্য পরিবেশনের বেলায় কিন্তু তারা কাছের টেবিল থেকেই সাধারণত খাদ্য দিয়ে থাকে। দূরের টেবিলটা যদি বেশী দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে কিন্তু সামনের টেবিল থেকে খাদ্যসংগ্রহ করতেই তারা উদ্যত হয়। অর্থাৎ এ থেকে বোঝা যায়, অল্প বাধায় তীব্র আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্যের আকর্ষণ বাড়ে, কিন্তু বাধা প্রবল হলে আকর্ষণ কমে যায়।[৩]

৩ The stronger the motive, the more it was enhanced by a barrier. Too great frustration decreased the drive. Wright—The influence of barriers upon strength of motivation. Contr. Psychol. Theory. 1937, I, No. 3.

পরিচারিকাদের ওপরে যেমন পরীক্ষা হয়েছিল, অনুরূপ পরীক্ষা শিশুদের ওপরেও করে একই রকম ফলই লক্ষ্য করা গেছে। ঠিক একই লোভনীয় খেলনা খোলা টেবিলের ওপর, আবার একটি বন্ধ আলমারীর মধ্যে শিশুর সামনে রাখা হল। দেখা গেল শিশুর আলমারীর ভেতরের খেলনার প্রতি আকর্ষণই বেশী। আমাদের প্রতিযোগিতা-ভিত্তিক সমাজজীবনে বাধা জয় করে প্রভুত্বঅর্জনের মর্যাদা বেশী, তাই শিশুকাল থেকেই আমরা শিশুদের এই শিক্ষাই দিতে চাই যে বাধাকে জয় করার মধ্যে গৌরব ও বীরত্ব। অবশ্য আকাঙ্ক্ষার তাড়না যদি দুর্বল হয় এবং বাধাও যদি দুর্লঙ্ঘ্য হয় তবে উদ্যমও স্তিমিত হয়ে আসে।[৪]

দুর্লঙ্ঘ্য বাধা ও যুযুৎসা

বাধা পেলে তীব্র আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হয়। কাজেই এটা বোঝা কঠিন নয় যে আমাদের আকাঙ্ক্ষা-পূরণের পথে যে বস্তু বা ব্যক্তি বাধাস্বরূপ তার প্রতি আমরা বিরুদ্ধভাবাপন্ন হই—সম্ভব হলে সে বাধা যে বস্তু বা ব্যক্তি থেকে আসে, তাকে দৈহিক আঘাত করে অপসারণ করতে চাই বা ধ্বংস করতে চেষ্টা করি। ছোট শিশুদের মধ্যে এই **আক্রমণাত্মক ব্যবহার (aggressive behaviour)** সর্বদাই দেখা যায়। বড়রাও কখনো কখনো তাদের কাজে কেউ বাধা দিলে মারমুখী হয়ে ওঠে। তবে সামাজিক ভদ্রতার তাগিদে বয়স্ক মানুষরা যারা তাদের বাধা দেয়, নিন্দা কুৎসা ব্যঙ্গচিত্র ইত্যাদি সমাজ-সম্মত উপায়ে তাদের প্রতি বিরুদ্ধে মনোভাব প্রকাশ করে থাকে। কখনো কখনো রাগের বস্তুর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ব্যবহার বিপজ্জনক বা অসম্ভব হলে রাগটা অন্য কোন অসহায় ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঝাড়ে। এটা হল আক্রমণের বিষয়ের **স্থানচ্যুতি (displacement)**।[৫]

৪ If you learn that harder goals are more desirable, that people praise you for striving toward them, and that such goals may be attained by exerting efforts, then you tend to be challenged by barriers and difficulties. A frustration then evokes your socially learned motives for mastery and prestige. If the original drive is weak or if the barriers are insurmountable, frustration may decrease effort instead of increasing it. Shaffer & Shoben—The Psychology of Adjustment, p. 101

৫ The aggressions may be direct attacks against the frustrating persons, or may be displaced to innocent objects if the circumstances inhibit overt aggression. Ibid, p. 101

রাজনৈতিক- ও সমাজ-জীবনে অনেক সময়ই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আক্রমণাত্মক ব্যবহারের পশ্চাদ্‌পটে থাকে নানাপ্রকার বাধাজনিত স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার সুস্থ তৃপ্তির পথে বাধা। পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের ওপর উৎপীড়নের পশ্চাতে আছে কুশাসন ও বৈষম্যের ফলে জনসাধারণের মনে বিষম হতাশা। আমাদের ছাত্রদের মধ্যে উচ্ছৃংখলতা ও ধ্বংসাত্মক ব্যবহারের যে লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তারও পশ্চাদ্‌পটে আছে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক কুব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুবচিত্তের অন্ধ বিক্ষোভ। দেশের যুবকদের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যম সহজ ও স্বাভাবিকভাবে প্রকাশের যথেষ্ট উপায় নেই বলেই তা নানা অবাঞ্ছিত পথে আত্মপ্রকাশের পথ খোঁজে। জটিল সামাজিক ঘটনার এপ্রকার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা অনেক ক্ষেত্রে সন্তোষজনক হলেও সমস্ত আক্রমণাত্মক বা ধ্বংসাত্মক ব্যবহারের পশ্চাতেই পুনঃপুনঃ বাধাজনিত হতাশা থাকে এমন ব্যাখ্যা অতি-সরলীকরণ-দোষ-দুষ্ট (over-simplification)।[৬]

দুর্লঙ্ঘ্য বাধা ও পশ্চাদাবর্তন

ব্যক্তির উদ্যম বারে বারে বাধাপ্রাপ্ত হলে তার মানসজগতে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় সেটা তার পরবর্তী ব্যবহারে অনেক সময় সুস্পষ্ট প্রকাশ পায়। বয়স্ক ব্যক্তিরাও তখন অনেকটা বালকোচিত আচরণ করেন। একেই বলা হয় **পশ্চাদাবর্তন (regression)**। অবশ্য সুস্থ সাধারণ মানুষে এ অবস্থা দীর্ঘকালস্থায়ী হয় না। কিছুদিনের মধ্যেই ব্যক্তি অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয় এবং তার ব্যবহার যুক্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যমূলক এবং সুশৃঙ্খল হয়। কিন্তু মানসিক বিকারের অনেক ক্ষেত্রেই দীর্ঘকাল স্থায়ী পশ্চাদাবর্তন ও শিশুসুলভ ব্যবহারের লক্ষণ সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়।[৭]

শিশুদের ওপর দুর্লঙ্ঘ্য বাধাজনিত হতাশার ফলে তাদের ব্যবহারে যে বাল্যে পশ্চাদাবর্তের লক্ষণ সুস্পষ্ট দেখা যায়, বার্কার ডেম্বো ও লিউয়িন্‌-এর একটি সুন্দর পরীক্ষায় তা নিশ্চিত প্রমাণিত হয়েছে। তিন থেকে দশ বছর বয়সের

---

৬ Hovland & Sears—Minor studies of aggression, VI. Correlation of lynchings with economic indices. J. Psychol, 1940, 9, pp. 301-10

৭ Frustration can cause a person's behaviour to become less flexible, less constructive and less imaginative. In brief, behaviour under frustration is likely to become more primitive and less mature. Shaffer & Shoben—Psychology of Adjustment, p. 102

ত্রিশটি ছেলেমেয়েদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে সুন্দর সুন্দর খেলনা দিয়ে ইচ্ছামত খেলতে দেওয়া হল। এই স্বাধীন খেলায় তাদের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ যেমন পরিস্ফুট তেমনি শিশুদের স্বাভাবিক উপস্থিত বুদ্ধি ও রচনাত্মক কল্পনারও তেমনি পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ খেলার পর তাদের আর এক ঘরে নিয়ে যাওয়া হল, যেখানে খেলনাগুলি আরো সুন্দর আরো জীবন্ত। সেখানে একটি ছোট অগভীর জলাধারে কয়েকটি পুতুল হাঁস ও নৌকো ভাসছিল। ছেলেমেয়েদের সে খেলনাগুলি হাত দিয়ে ধরতে এবং সেগুলি নিয়ে খেলা করতে দেওয়া হল। ছেলেমেয়েদের আনন্দকোলাহল সহজেই অনুমেয়। অল্প কয়েকমিনিট পরেই সে ঘর থেকে ছেলেমেয়েদের সরিয়ে আনা হল এবং সেই ঘরের সামনে সূক্ষ্ম তারের জালের পর্দা এমনভাবে টাঙিয়ে দেওয়া হল যাতে খেলনাগুলি তারা দেখতে পাচ্ছিল কিন্তু সেগুলি হাত দিয়ে নাগাল পাচ্ছিল না। এবার তাদের পুরোনো খেলনাগুলি দিয়ে খেলতে দেওয়া হল। সব বয়সের সব কটি দলের ছেলেমেয়েদের মধ্যেই অসন্তোষ সুস্পষ্ট হল এবং তাদের খেলাধুলাগুলি এলোমেলো হতে লাগল। তারা তাদের বয়সের তুলনায় আরো ছেলেমানুষের নির্বোধ স্তরে যেন প্রত্যাবর্তন করল।[৮] বারে বারে বাধাপ্রাপ্ত হলে এবং হতাশা সৃষ্টি হলে, ছেলেমেয়েদের ব্যবহারে যে বালসুলভ অবনতি ঘটে, তা **আঙুলচোষা, বাক্যের জড়তা** (stuttering), **তোৎলামী** (stammering) এমনকি **শয্যামূত্র** (bed-wetting) -রূপ লজ্জাকর আচরণে প্রকাশ পায়। এই পশ্চাদাপসরণ এক ধরনের আত্মরক্ষার কৌশল।[৯] শিশু হলেই সকলের ক্ষমা, আদর, মনোযোগ সহজে আকর্ষণ করা যায় এবং বিফলতা ও হতাশার অগৌরব মুছে ফেলা যায়। অবচেতন মনে এমন চিন্তা, পশ্চাদাবর্তনের পিছনে ক্রিয়া করে।

সংবন্ধন

পশ্চাদপসরণ যেমন কতকটা নির্বোধ অপরিণত ব্যবহারে প্রকাশ পায়, তেমনি অনুরূপ আর একপ্রকার নির্বোধ অপরিণত ব্যবহার হচ্ছে **সংবন্ধন**

---

৮ Barker, Dembo & Lewin—Frustration & Regression: an experiment with young children. Univ. Iowa Stud. Child Welfare, 1941, 18, No. 1

৯ Regression literally means going back in time, doing six-year stuff when a child has failed to do what is appropriate to his age-level of nine

(Fixation)। বারে বারে বাধা পেলে ও হতাশাগ্রস্ত হলে শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিরা কতগুলি যান্ত্রিক পৌনঃপুনিক ক্রিয়াকে আশ্রয় করে (যেমন, বারে বারে চশমা মোছা)। এ জাতীয় ক্রিয়া উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে সহায়ক নয়, কিন্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ব্যক্তি এপ্রকার অর্থহীন ক্রিয়া পুনঃপুনঃ করে। মানসিক রোগগ্রস্তদের মধ্যে এ জাতীয় **ইচ্ছার বিরুদ্ধ অসঙ্গত ক্রিয়া** (**mal-adjustive compulsive acts**) প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে আমরা যার সঙ্গে পরিচিত সে হচ্ছে বয়স্কা বালবিধবাদের 'শুচিবাই'।[১০]

অলস কল্পনা ও দিবাস্বপ্ন

বাস্তবজগতে তার আকাঙ্ক্ষা-পূরণের সম্ভাবনা না থাকলে শিশু (অনেক বয়স্ক ব্যক্তিও) কল্পনা ও দিবাস্বপ্নের আশ্রয় নেয়। এটা দুর্বল ব্যক্তির সঙ্গতিস্থাপনের একপ্রকার অক্ষম প্রচেষ্টা। সকলের জীবনেই হয়তো এর কিছুটা প্রয়োজন আছে। বাস্তব জগতে প্রতিকূল পরিবেশ অথবা নিজ অক্ষমতার জন্যে যে সাফল্য বা তৃপ্তি আমরা আকাঙ্ক্ষা করেও মেটাতে পারি না, কল্পনায় তা মিটিয়ে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাই। এতে ব্যক্তির আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু সহজেই বোঝা যায় যে এ জাতীয় আত্মরক্ষার উপায় শিশু ও দুর্বলকেই শোভা পায় এবং এটা ব্যক্তির অভ্যস্ত প্রতিক্রিয়া হলে তা তার মানসিক অসুস্থতার পরিচায়ক।

অসহায় দুর্ভাবনা

যেখানে ব্যক্তি বাধা বা সংঘাত অতিক্রম করে, সঙ্গতিস্থাপনের কোন পথ খুঁজে পায় না, সেখানে সে **অসহায় দুশ্চিন্তায়** (**helpless anxiety**) ক্লিষ্ট হয়। এ অবস্থা ব্যক্তির পথে একেবারেই প্রীতিপ্রদ বা স্বাস্থ্যকর নয়; এ হল পরাজয়কে মেনে নিয়ে হাল ছেড়ে দেওয়া। মানসিক রোগগ্রস্তদের মধ্যে অকারণ দুশ্চিন্তা বা দুর্ভাবনা একটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। নীরব

---

years. Thumb-sucking, baby-talk, and even bed-wetting are sometimes observed in eight- or ten-year-old children who have been seriously frustrated. Woodworth & Marquis—Psychology, p. 379

১০ Maier—The role of frustration in social movement, Psychol. Rev. 1942, 49, 586-99

অশ্রুবিসর্জনই এখানে একমাত্র প্রতিক্রিয়া। এ অবস্থায় ব্যক্তি বাস্তবজগৎ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয় (withdrawal)।[১১]

সংঘাত- ও বাধা-অতিক্রমের কলকব্জা

বাধা উপস্থিত হলে, ব্যক্তি কি ভাবে তার সম্মুখীন হয়, কি ভাবে তা অতিক্রম করে সঙ্গতিস্থাপনের চেষ্টা করে, তার মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলি আমরা বুঝতে চেষ্টা করেছি।

লিউয়িন্ ব্যাপারটা খুব সহজ করে বাইরের দিক থেকে দেখতে চেষ্টা করেছেন, এবং বলবিদ্যার সূত্র দিয়ে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করবার যে চেষ্টা করেছেন, তা শিক্ষাপ্রদ এবং অত্যন্ত অভিনব।
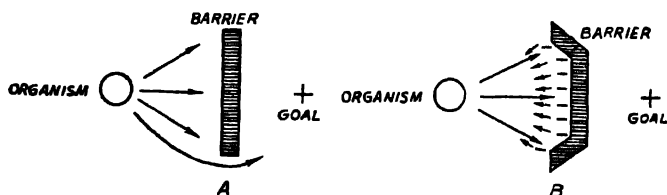
এখানে A চিত্রে O বা ব্যক্তির আকর্ষক বস্তু (Goal) প্রাপ্তির পথে বাধা (Barrier) এড়িয়ে সে ঘুরপথে লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছুতে চেষ্টা করছে। B চিত্রে ব্যক্তির আকর্ষক বস্তুর সামনে বাধা দুর্লঙ্ঘ্য। – চিহ্ন বোঝাচ্ছে ব্যক্তির উদ্যম প্রতিহত হচ্ছে, সুতরাং উদ্দেশ্য-বস্তু এখানে বিকর্ষক। B চিত্র দিয়ে Frustration বোঝান হচ্ছে।

[*Maier*-এর *Frustration* গ্রন্থের লেখ অনুসরণে]

তিনি বলেছেন আমাদের সমস্ত ক্রিয়ার পশ্চাতে দুটি শক্তি ক্রিয়া করে—একটি আকর্ষণ, আর একটি বিকর্ষণ। যা আমাদের আকর্ষণ করে আমরা সেই বস্তু বা অবস্থার নিকটবর্তী হতে চাই (approach), আর যে অবস্থা অপ্রীতিপদ বা বিকর্ষক,তার থেকে আমরা দূরে সরে যেতে চাই (avoidance)। আকর্ষণের বস্তুকে অস্তিবাচক (+) চিহ্ন দিয়ে এবং বিকর্ষণের বস্তুকে নেতিবাচক (–) চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা যায়। ব্যক্তির কোন মুহূর্তের ক্রিয়া হচ্ছে একটি

১১ Instead of temper, the child may have a fit of heart-broken crying and sobbing. So far again, he is not dealing with the environment. He seems to feel helpless, insecure, in need of comfort and support. In older people, too, the emotional state in frustration is often a state of anxiety and hopelessness, giving up, and withdrawing from the situation. Woodworth & Marquis—Psychology, p. 379

শক্তি (force) বা এই আকর্ষণ-বিকর্ষণের (+ ও − এর) **সম্মিলিত ফল** (vector)। আর barrier হচ্ছে ব্যক্তি ও বস্তুর মধ্যে **বাধাস্বরূপ কোন কিছুর অবস্থিতি**; এ অবস্থার পরিণাম সংঘাত। ব্যক্তির সামনে যেখানে একাধিক বস্তু বা অবস্থা উপস্থিত হয় সেখানে সে একটিকে গ্রহণ করে (approach), আর একটিকে ত্যাগ করে। এখানে ব্যক্তি একটি দ্রব্য বা অবস্থাকে বাছাই (choice) করে। কিন্তু কখনো কখনো আকর্ষণ-বিকর্ষণের শক্তির দোটানায় পড়ে ব্যক্তি দোদুল্যমান (vacillation), সে বুঝতে পারে না কোন্ পথ সে গ্রহণ করবে।* কখনো কখনো **দুটি দ্রব্যই আকর্ষক,** সেখানেও ব্যক্তির অস্থির সংঘাতের অবস্থা। একে সাফার বলেছেন Approach-Approach conflict। এখানে ব্যক্তি **যে বস্তু তার কাছে বেশী আকর্ষক** তা গ্রহণ করবে। যেখানে এমন স্পষ্ট মনস্থির করা সম্ভব নয়, সেখানে হয়তো দুইয়ের মধ্যে রফা করে সে একটা মাঝামাঝি পথ গ্রহণ করবে (compromise)।
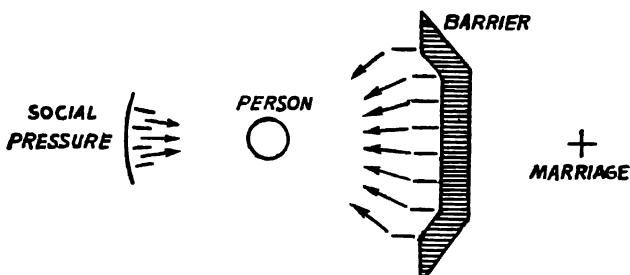
উপরের লেখ থেকে বোঝা যাচ্ছে ব্যক্তির ওপর সামাজিক চাপ আসছে কোন একটি মেয়েকে বিয়ে করবার জন্যে। ব্যক্তির কাছেও এই বিবাহ আকর্ষক। কিন্তু বাবার প্রচণ্ড বাধা এই বিবাহে। তিনি বিপুল অর্থবান এবং এই বিবাহ করলে ছেলেকে সম্পত্তিচ্যুত করবেন। কাজেই ছেলের কাছে এই বিবাহ বিকর্ষকও বটে। বিবাহ না করলে সমাজের নিন্দা, বিবাহ করলে সম্পত্তিচ্যুত হয়ে দারিদ্র্য। এ অবস্থায় দুর্বলচিত্ত ব্যক্তির বিষম মানসিক সংঘাত ও অব্যবস্থিততা।

[*Maier*-এর *Frustration* গ্রন্থের লেখ অনুসরণে]

আবার যেখানে সংঘাত হচ্ছে **আকর্ষক ও বিকর্ষক বস্তুর মধ্যে,** সেখানে হল Approach-Avoidance conflict। আবার দুটি বস্তুই হয়তো **ব্যক্তির কাছে বিকর্ষক**—কিন্তু কোন্‌টি বেশী অপ্রীতিকর বা বিপজ্জনক তা স্থির

* পূর্ব অধ্যায়ের ছবি দ্রষ্টব্য

করে ব্যক্তিকে কর্মপন্থা নির্দিষ্ট করতে হবে। এখানে হল Avoidance-Avoidance conflict। আবার এমনও হতে পারে যে দুটি বস্তুই ব্যক্তির কাছে কিছু পরিমাণে আকর্ষক আবার কিছু পরিমাণে বিকর্ষক ; সেখানেও ব্যক্তির দোদুল্যমান অবস্থা এবং সেখানেও ব্যক্তিকে রফা করতে হবে। যেখানে বাধা অতিমাত্রায় প্রবল বা অনতিক্রম্য সেখানে হল হতাশা (frustration) সর্বদাই মনে রাখতে হবে বস্তু বা অবস্থাকে যখন আকর্ষক বা বিকর্ষক বলা হচ্ছে তখন তা **ব্যক্তির দৃষ্টিতে** আকর্ষক বা বিকর্ষক। ব্যক্তিই স্থির করে কোন্‌টা আকর্ষক, কোন্‌টা বিকর্ষক। যদিও লিউয়িন্ সমস্ত ব্যাপারটাই ছবি দিয়ে বলবিদ্যার নিয়ম অনুযায়ী ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন, তথাপি একথা মনে করলে ভুল হবে যে বাইরের অবস্থা ব্যক্তির কর্মপন্থা নির্দিষ্ট করে দিচ্ছে। কর্মপন্থা ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছা-বিবেচনা দ্বারাই স্থির হয়।[১২]

ছবিতে সংঘাত, আকর্ষণ-বিকর্ষণ, দোদুল্যমানতা সমাধান ইত্যাদির প্রকাশ :

এ কয়টি চিহ্ন স্মরণ রাখলেই নিচের ছবিগুলির তাৎপর্য আমরা সহজেই বুঝতে পারব : O হচ্ছে ব্যক্তি, ☐ হচ্ছে উদ্দিষ্ট বস্তু, + বোঝায় আকর্ষণ, আর – বোঝায় বিকর্ষণ, → তীর চিহ্ন দিয়ে ব্যক্তির ইচ্ছা বা কর্মের দিক বোঝায়, আর বিন্দু বিন্দু চিহ্নিত রেখা ··· দিয়ে ইচ্ছা বা কর্মের গতি নির্দিষ্ট হয়।

এখানে-A তে ব্যক্তির সংঘাত হচ্ছে একটি আকর্ষক [+] ও একটি বিকর্ষক [–] বস্তুর মধ্যে (Approach-Avoidance conflict)। এখানে

১২ Professor Lewin's so-called "vector psychology" is responsible for the psychological concepts of valences and barriers. He regarded the outcome of situations like those presented here as the resultant (vector) for the attracting (+) and repelling (—) aspects of a situation, *as it is experienced by the behaving individual*. It is perhaps obvious that what repels one person may attract another and that an attractive (or repelling) situation may vary in the "magnitude" of its valence for different persons. Hence the "forces" concerned do not reside in the physical environment alone but in the environment as the individual perceives it. They are derived from its meaning for him. The "frame of reference" is, in other words, individualistic, or personal rather than physical. Munn—Psychology, p. 137-38 (footnote)

→ দিয়ে ব্যক্তির উত্তমের দিক সূচিত হচ্ছে। ব্যক্তি এক্ষেত্র কিভাবে সঙ্গতি স্থাপন করে উদ্দিষ্ট বস্তু লাভ করছে,…চিহ্ন দিয়ে তা বোঝানো হচ্ছে। B ছবিতে দুইটি বস্তুই বিকর্ষক (Avoidance-Avoidance conflict)। এখানেও
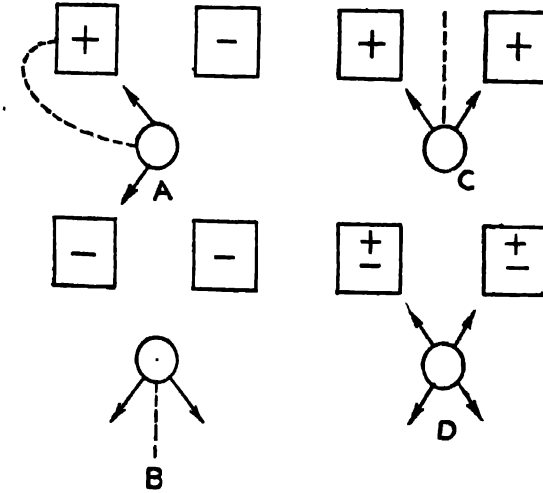
[*Woodworth & Marquis*-এর *Psychology* গ্রন্থে ব্যবহৃত লেখ অনুসরণে]

ব্যক্তির সংঘাত-সমাধানের পথ সূচিত হচ্ছে … চিহ্ন দিয়ে। C হচ্ছে বিকর্ষক দুই বস্তুর মধ্যে সংঘাত (Avoidance-Avoidance conflict)। D-তে সংঘাত হচ্ছে দুই বস্তুর মধ্যে যারা একাধারে আকর্ষক ও বিকর্ষক।

নবম অধ্যায়

অহঙ্কারের আত্মরক্ষা

ব্যক্তিসত্তার মূল শক্তিটি হল অহঙ্কার,—"আমি আছি", "আমি চাই"। শিশুকাল থেকেই এই অহংবোধ বিকশিত হতে থাকে। কিন্তু ব্যক্তি তো একটি নয়, বহু; এবং বহু 'আমি'র চাওয়া ও উদ্যমের মধ্যে সংঘর্ষ স্বাভাবিক। পৃথক ব্যক্তির চেয়ে সংঘবদ্ধ সমষ্টি প্রবলতর শক্তি। এই সমষ্টি বা সমাজের সঙ্গে সংঘর্ষে ব্যক্তির আত্মাভিমান প্রায়শ ক্ষুন্ন হয়। অথচ এই সমাজের সঙ্গে নিত্য বিরোধ করে ব্যক্তি বাঁচতে পারে না। তাই পদে পদে তাকে আপস (adjustment) করতে হয়, কখনো বা ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিতে হয়। সোজাসুজি হার মানতে কেউই চায় না। তাই আত্মাভিমানের অহঙ্কারের মুখরক্ষা করে কি ভাবে সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান ও নিজ উদ্দেশ্যসাধন করতে হবে, এ-ই ব্যক্তিজীবনের একটি প্রধান সমস্যা। সেজন্য ব্যক্তি কতকগুলি উপায় বা কৌশল অবলম্বন করে। প্রায় প্রত্যেক সুস্থ ব্যক্তিই কোন না কোন সময় এ উপায়গুলি অবলম্বন করে, তবে এদের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার অসুস্থ (abnormal) মনের পরিচায়ক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ কৌশলগুলি সমাজসম্মত, কিন্তু নিজ উদ্দেশ্যসাধনের আকাজ্ক্ষা অত্যন্ত প্রবল হলে কখনো কখনো অবাঞ্ছিত, অ-সামাজিক পথও ব্যক্তি অবলম্বন করতে পারে। ক্রো (Crow) লিখছেন, ব্যক্তি মূলত সৎ হলেও, সে আবিষ্কার করতে পারে যে, গোষ্ঠীর মধ্যে একটি প্রধান স্থান অধিকারের সংগ্রামে সে যথেষ্ট অগ্রসর হতে পারছে না। সুতরাং কার্য-সিদ্ধির জন্যে মিথ্যা প্রবঞ্চনা ইত্যাদির আশ্রয় নিতে পারে। কিন্তু স্বাভাবিক মানুষ অল্প দিনের মধ্যেই অনুভব করে, যে এ-সমস্ত পন্থা সমাজে নিন্দিত। অথচ সমাজের সমর্থন না পেলে তার চলে না। কাজেই সাধারণত এমন অভ্যাসই সে আয়ত্ত করে যাতে তাহার আকাজ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সমাজ-স্বীকৃত পথে হতে পারে। কিন্তু যদি ব্যক্তি দেখে, তার নিজ শক্তির ন্যূনতা অথবা বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিক অবস্থা তার আকাজ্ক্ষা চরিতার্থ করবার পথে বাধাস্বরূপ, তবে তার ভেতরের তীব্র আকাজ্ক্ষা অবাঞ্ছিত, অস্বাস্থ্যকর এবং

সমাজের হানিকর ও নিন্দনীয় পথে তাকে ঠেলে দিতে পারে।[১] সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করে নিজ কার্যসিদ্ধির জন্যে আমরা যে সব উপায় বা কৌশল অবলম্বন করি সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। এদের **অহঙ্কারের আত্মরক্ষা** (Ego-defense mechanism) বলা হয়।

১। **অচেতন অনুসরণ (Introjection)**—শিশু অচেতন ভাবেই তার গুরুজন বা পরিবেশ থেকে ব্যবহার- বা ভাব-সংগ্রহ করে থাকে। পিতামাতাকে অনুকরণ করে শিশু অজ্ঞাতসারেই জীবনের আদর্শ- বা দৃষ্টিভঙ্গী-গ্রহণ করে। অবশ্য জ্ঞানবুদ্ধি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এই আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হয় এবং নিজস্ব একটি মত বা আদর্শ গড়ে ওঠে। সমাজের অনুবর্তিতার এ-ই সহজ পথ এবং ব্যক্তি স্বভাবতই এ পথ অনুসরণ করে। এই অনুসরণ-প্রক্রিয়া অচেতন, কাজেই ব্যক্তিও জানে না সে কি করছে এবং কেন করছে। যাকে আমরা ভালবাসি তাকে সহজেই অনুসরণ করি, কিন্তু যার প্রতি মন বিরূপ তার পথে চলতে চাই না। এ প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুমেয়। এর দ্বারা সুফল পেতে হলে, অনুকরণ যাতে অন্ধ না হয়ে সুসঙ্গত (rational) ও বস্তু-নিষ্ঠ (objective) হয় তা দেখা দরকার। অন্যে আমাদের কি চোখে দেখে তা শান্তভাবে বোঝবার এবং তদনুযায়ী নিজ ব্যবহার গঠন করবার অভ্যাস আয়ত্ত হলে, সমাজস্বীকৃত পন্থায় নিজ উদ্দেশ্যসাধনে সহায়তা হয়।

২। **প্রতিপূরণ (Compensation)**—নিজেদের ত্রুটি সম্পর্কে আমরা সচেতন। তা আমাদের লজ্জা দেয়। এ ত্রুটি অন্যের নিকট থেকে তো বটেই, নিজের কাছ থেকেও লুকোতে চাই। প্রতিপূরণ এই আত্মরক্ষামূলক একটি প্রক্রিয়া বিশেষ (a defense mechanism)। আমরা আমাদের কোন এক বিষয়ে ত্রুটি অন্য কোন দিকে উৎকর্ষ -দ্বারা ঢাকতে চাই। ব্যক্তি তার বাড়তি অতিরিক্ত শক্তি কোন একদিকে ব্যবহার করে নিজের বাস্তব বা কল্পিত পরাজয়ের গ্লানি মুছতে চায়।

সহজ প্রতিপূরণ হচ্ছে যে বিষয়ে ব্যক্তির ত্রুটি তা ঢাকবার জন্যে সেই বিষয়েই সে অতিরিক্ত বাহাদুরি দেখায়। যে মেয়েটি ইংরেজীতে ফেল করেছে সে মেয়ে যত্রতত্র ইংরেজী ফট্‌ফট্ করে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অবিশ্বস্ত অপরাধী

১ Crow & Crow—Mental Hygiene, pp. 56-57

স্বামীই অতিরিক্ত উদ্বেগ প্রকাশ করে। যে খোঁড়া, সে নিজ অঙ্গহানির লজ্জা ঢাকবার জন্যে অন্যকে সাহায্য করতে জন্যে অগ্রসর হয়।

প্রতিপূরণ অন্য বা বিপরীত কোন ক্ষেত্রেও হতে পারে। লেখাপড়ায় যে ছেলে ভাল করতে পারল না—সে খেলাধুলায় অতিরিক্ত আগ্রহ -দ্বারা নিজ কৃতিত্ব প্রকাশ করতে চেষ্টা করে। অর্থসংগ্রহ বা সাংসারিক উন্নতি -বিষয়ে যে বন্ধুদের নিকট থেকে পিছিয়ে রইল সে হয়তো ডাকটিকিট-সংগ্রহে বন্ধুদের হারাতে চেষ্টা করবে।[২]

অনেক সময় পিতামাতারা নিজ জীবনে যে বিষয়ে সফল হতে পারেন নি সন্তানদের সেই বিষয়ে পারদর্শী করতে সচেষ্ট হন, এবং তাদের সাফল্যে নিজ নিজ পরাজয়ের গ্লানি ভুলে যান। অতুৎসাহী সংস্কারকরা অনেক সময় অন্যকে সেই পাপ থেকে রক্ষা করবার জন্যেই আগ্রহান্বিত, যে পাপ সম্বন্ধে তাঁদের আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল। যিনি নিজে চোর, তিনিই চৌর্যাপরাধের নিন্দায় পঞ্চমুখ।

৩।গ তাদাত্ম্য (Identification)—যাকে ভালবাসি তার সাফল্য বা গৌরবকে নিজের গৌরব বলে মনে করবার দুর্বলতা অনেকের মধ্যেই দেখা যায়। নিজের জীবনের অকিঞ্চিৎকরতা বা অসাফল্য আমাদের পীড়া দেয়, লজ্জা দেয়—তাদাত্ম্য -দ্বারা অসম্মানের সেই আঘাতকে আমরা লাঘব করি। তাই বড়লোক আত্মীয়ের পরিচয় দিয়ে নিজের মান বাড়াতে চাই। শিশুকালে পিতামাতাকে শিশু নিজে থেকেই প্রায় অভিন্ন করেই দেখে এবং পিতামাতার ব্যবহার তার চিন্তা ও কর্মকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। এ প্রক্রিয়া স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয়, কিন্তু এর অতি-ব্যবহার ব্যক্তির বিকাশের পক্ষে বিঘ্নকর। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সঙ্গতিবিধানের এটি প্রথম পদক্ষেপ, কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে ব্যক্তিত্বের নিজস্ব বিকাশই সমস্ত শিক্ষার শেষ উদ্দেশ্য। সুতরাং তাদাত্ম্য যাতে ব্যক্তির স্বাভাবিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত না করে, সে দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। অতিমাত্রায় এর আশ্রয়গ্রহণ সুস্থ মনের লক্ষণ নয় এবং এটি চিকিৎসাযোগ্য মানসিক রোগ বিশেষ। যে মেয়েকে বিয়ের পরেও নিজ বাপের বাড়ীর টানই বেশী টানে, সে স্বামীর সংসারে প্রিয় হয় না, নিজেও শান্তি পায় না। মনের দিক থেকে সে সুস্থ নয়।

২ Sherman—Basic Problems of Behaviour, p. 162

৪। **বিপরীত প্রক্রিয়া (Reaction formation)**—মনে পড়ে যখন কিশোর বয়স ছিল তখন নির্জন শ্মশানের পথ দিয়ে যেতে খুব উচ্চৈঃস্বরে গান করতে করতে যেতাম—ভাবখানা এই যে আমার ভয়-ডর নেই। বলাই বাহুল্য বাইরে এ বীরত্বের ঠাট বাস্তবিক পক্ষে মনের মধ্যের দুর্ভাবনা ঢাকবার কৌশল মাত্র। ভয় দুশ্চিন্তা বা অস্বস্তি গোপন করবার জন্যে বাইরে এই যে বিপরীত ব্যবহার তাকে ইংরেজীতে বলা হয় Reaction formation। যে সমস্ত মানুষ অপরিচিতের কাছে বেশী কথা বলে তারা হয়তো নিজেদের মনের অস্বস্তিবোধ বিপরীত ব্যবহার দিয়ে ঢাকতে চেষ্টা করছে। একটি মেয়ের অতিরিক্ত রুক্ষ ব্যবহার হয়তো তার গোপন অনুরোগের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার কৌশলমাত্র।[৩]

৫। **অন্যায় কার্য বা ত্রুটির সমর্থনে মিথ্যা যুক্তি (Rationalization)**—অন্যায় আমরা অনেক সময় করি, কিন্তু তা নিজের কাছেও স্বীকার করতে চাই না, এবং অন্যায় কার্যের সমর্থনে মিথ্যা যুক্তি দেখাই,—অর্থাৎ বোঝাতে চাই যে আমাদের কাজটি যুক্তিসঙ্গত ও সমাজের নৈতিক বুদ্ধি-বিরুদ্ধ নয়। যে কারণ থেকে কার্যটির উদ্ভব, তা গোপন করে অন্য কারণ দেখাই। কোন মেয়ের প্রতি অবৈধ আকর্ষণ ব্যক্তি এই বলে সমর্থন করে যে এ একটি দরিদ্র পিতৃমাতৃহীন অসহায়ার প্রতি করুণা-সঞ্জাত। আত্মরক্ষা প্রক্রিয়ার (defense mechanism) এ একটি প্রধান অস্ত্র। যে অফিসের টাকা চুরি করে, সে যুক্তি দেয় যে সৎকার্যে ব্যয়ের জন্যই সে এ-কাজ করে, ব্যক্তিগত লোভ এর কারণ নয়। নিজের ত্রুটি অন্যের ওপর চাপানো এই কৌশলের একটি উদাহরণ; "নাচতে না জানলে, উঠোন বাঁকা"—এ অনুরূপ ইংরেজী প্রবাদ হচ্ছে "A bad workman quarrels with his tools"। যে কাজ আমরা পারি না, আমরা ভান করি তা আমরা চাই না; এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ: "আঙ্গুর ফল টক্" (sour-grape mechanism) ঈশপ-বর্ণিত এই গল্পটি। স্টেট্ বাস কর্পোরেশন বলে যে, হিসাবের সুবিধের জন্য ভাড়া ১০, ১৫, ২০, ২৫, ৩০ পয়সা করা হল। এটা হল মিথ্যা যুক্তি—আসল মতলব হল ভাড়া-বাড়ানো।

আমাদের কথায় ও কাজে অসঙ্গতির কথা আমরা না বুঝি এমন নয়। কিন্তু এই সঙ্গতিসাধন কষ্টকর ও চেষ্টাসাপেক্ষ। অনেক সময়ই সে কষ্টস্বীকার

৩ Shaffer & Shoben—The Psychology of Adjustment, pp. 175-77

-না করে এই সহজ মিথ্যার আশ্রয় আমরা গ্রহণ করি। এ একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, কিন্তু এই মিথ্যা ভানের অভ্যাস চরিত্রবিকাশের পক্ষে বিষম বাধা। নিজের ত্রুটি সরলভাবে স্বীকার করে তার সংশোধনের সচেতন চেষ্টাতেই প্রকৃত পৌরুষ ও চরিত্রগঠনের গৌরব।[৪]

৬। **আরোপ (Projection)**—নিজের দোষত্রুটি অন্যতে আরোপের কৌশলটি পরিচিত। অসচ্চরিত্র স্বামী স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ প্রকাশ করে। যারা উচ্চৈঃস্বরে সর্বদা ঘোষণা করে 'সব শা—চোর' সম্ভবত তাদের চৌর্যাকাঙ্ক্ষা প্রবল। এ কৌশল অপরাধী বিবেকের আর্তনাদ,—নিজের দায়িত্ব এড়াবার একটি হীন উপায়। সে দিক দিয়ে এটি র‍্যাশন্যালাইজেশনের সমগোত্রীয়। এতে কঠোর বাস্তবতার অপ্রীতিকরতা থেকে পলায়নের কাপুরুষতা বিদ্যমান এবং সেই কারণেই এটা অবাঞ্ছনীয়। যোয়াকিম্ ফ্লেশার বলেন, নিজের মধ্যে যা অগ্রহণযোগ্য ও অবাঞ্ছনীয় তা বহির্জগতে অন্যত্র আরোপ করার নামই আরোপ। যা বিপজ্জনক বা অপরাধবোধ জাগ্রত করে তা-ই যে অন্যত্র আরোপ করা হয় এমন নয়। নিজের মধ্যে কোন তীব্র অনুভূতি বা কামাকাঙ্ক্ষা যাকে কেন্দ্র করে, সেই ব্যক্তিতেই এ অনুভূতি বা আকাঙ্ক্ষা আরোপিত হয়।[৫] যেমন কালো কুৎসিত মেয়ে পাশের বাড়ীর ছেলের নামে কুৎসা রটায় যে, সে-ছেলে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

৭। **উদ্গতি (Sublimation)**—অনেক সময় সমাজ উচ্চতর মূল্য দেয়, এমন পরিবর্তন -দ্বারা আমাদের অসাফল্যকে আমরা ভুলতে বা মুছে দিতে চেষ্টা করি। দেহগত কামজ প্রেমবস্তুকে না পেয়ে বহু ব্যর্থ প্রেমিক সমাজসেবা বা ধর্মের পথে আঘাত ভুলতে চেষ্টা করেছেন। অনুরাগ ও ঘৃণা মানুষের প্রবলতম দুটি প্রবৃত্তি; কিন্তু আমাদের জটিল সমাজব্যবস্থায় তাদের সহজ ও সম্পূর্ণ তৃপ্তি সম্ভব হয় না। তখন এই প্রবল শক্তিকে উন্নততর পথে পরিচালনা -দ্বারা সমাজ -কর্তৃক অনুমোদনযোগ্য অন্য কোন উপায়ে তৃপ্তিলাভের চেষ্টা করা হয়। সমাজের রীতিনীতি মেনে সমাজের শ্রদ্ধালাভ করে বাঁচতে হলে এ একটি উৎকৃষ্ট উপায়। প্রত্যেক শিশুই উৎসুক চঞ্চল ক্রিয়াশীল। এই ঔৎসুক্য চঞ্চলতা ও কর্মমুখীনতা যথোচিত

৪ Shaffer & Shoben—The Psychology of Adjustment, pp. 177-79

৫ Joachim Flescher—Mental Health and the Prevention of Neurosis, p. 350

ক্ষেত্র না পেলে তার স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হবে। তাই পিতামাতা শিক্ষককে দেখতে হবে শিশুর প্রাণচাঞ্চল্য ও উদ্যম যেন বাঞ্ছনীয় পথে চালিত হওয়ার সুযোগ পায়। শিশুর যুদ্ধ করবার স্পৃহা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মুষ্ট্যাঘাত (boxing) ক্রিয়ায় পরিবর্তন করা যেতে পারে। যুবকের এই যুযুৎসাকে ব্যবসায়-শিক্ষা বা অন্য কোন সমাজস্বীকৃত ক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা -রূপ ক্রিয়ায় পরিবর্তন করা যেতে পারে। প্রতি ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট বিধিনিয়ম -অনুযায়ী প্রবৃত্তিকে চালনা করতে হবে, এই হচ্ছে সভ্যতার অনুশাসন। প্রবৃত্তিকে বিধিনিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধাই প্রবৃত্তির উদ্গতি। আমাদের আদিম বন্য ক্রোধকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণায় পরিবর্তিত করা যেতে পারে। পাশবিক কামপ্রবৃত্তিকে সভ্য সুন্দর রোমান্টিক প্রেম ও দাম্পত্য-প্রণয়ে পরিণত করা সম্ভব, বর্বর নৃশংসতা ও পীড়নের প্রবৃত্তিকে নির্দোষ উপহাস, রসিকতা ও কৌতুকে পরিবর্তন করা যেতে পারে। এমনি করে আমাদের আদিম অ-মানুষিক প্রবৃত্তিগুলিকে সভ্যজীবনোচিত খেলাধুলা, কৌতুকে গতিপরিবর্তন করে উন্নয়ন করা যায়।[৬]

৮। **আত্মকেন্দ্রিকতা (Ego-centrism)**—অতিমাত্রায় আদর, প্রশ্রয় বা প্রশংসাতে যে শিশু অভ্যস্ত হয়, তার মনে এক ধরনের আত্মকেন্দ্রিকতা বদ্ধমূল হয়। সে শিশু সব সময় সকলের কাছেই 'নয়নের মণি' হবে, এই প্রত্যাশা করে। অন্য কোন বাইরের লোক এলে যদি বাবা-মা অনেকক্ষণ ধরে তাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং বাড়ীর সেই আদুরে খোকা বা খুকুটির প্রতি দৃষ্টি না দেন, তা হলে তার দারুণ অভিমান জন্মে, এবং নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে তার শিশু-বুদ্ধি-অনুযায়ী নানা কৌশল সে অবলম্বন করে—সে হয়তো ঘরের মধ্যে এসে মেঝেতে ডিগবাজী খাবে বা লাফ দিয়া বিছানা থেকে নামবে এবং কিছুতেই সফল না হলে নানাভাবে মেজাজ-মর্জি (temper-tantrums) দেখাবে বা উচ্চৈঃস্বরে কান্না জুড়ে দেবে। এ অভ্যাস অনেক সময়ই শিশুদের ভবিষ্যৎ জীবনে আঘাত ও দুঃখের কারণ হয়। সে নিজেকে সর্বদা বিশেষ সুবিধা বা বিবেচনার (special consideration) অধিকারী বলে মনে করে এবং অন্যের কাছে কেবল প্রশংসা বা আদর প্রত্যাশা করে। কিন্তু স্কুলে বা অন্যত্র যেখানে অন্য দশটি ছেলে একত্র হয়, সেখানে এ রকম দাবি তো গ্রাহ্য হয়ই না,

৬ W. S. Sadler—The Mind at Mischief, p. 117

বরং তা উপহাসের কারণ হয়। তখন হঠাৎ আঘাতে শিশুর মোহভঙ্গ হয় এবং সে নিজেকে অসহায় বোধ করে। অনেক সময় পিতামাতাই শিশুর মনের মধ্যে এই আত্মকেন্দ্রিক ভাব জাগাবার এবং এ-ভাব পুষ্ট করবার জন্যে দায়ী। তাঁরা দাবি করেন স্কুলের থিয়েটারে তাঁদের মেয়েটিকেই সবচেয়ে ভাল পার্টটি দিতে হবে, ক্লাসের পরীক্ষায় তাঁদের ছেলেটিকেই প্রথম বলে ঘোষণা করতে হবে। সহজেই বোঝা যায়, এই মনোভাব স্থায়ী হলে শিশু বাস্তবের রূঢ় আঘাত সইবার জন্যে অ-প্রস্তুত হয় এবং এই স্ফীত অহঙ্কারের অনিবার্য ফল, অন্তত দুর্বলচিত্তদের জন্য, পুনঃপুনঃ দুঃখ ও নৈরাশ্য। অবশ্য দৃঢ়চিত্তদের মনে এ-জাতীয় আঘাত অধিকতর উদ্যম ও প্রয়াস উদ্বুদ্ধ করে ব্যক্তিকে সাফল্যের পথে অগ্রসর করে দিতে পারে।

৯। **মনোযোগ-আকর্ষণ-কৌশল (Attention-getting)**—আত্ম-কেন্দ্রিকতা থেকেই উদ্ভূত এই কৌশল বা প্রক্রিয়া। পিতামাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে অনেক সময় শিশুরা দুষ্টুমী করে বা অবাধ্যতা দেখায়। যদি দেখা যায় কোন শিশু এই কৌশলটি অতিমাত্রায় ব্যবহার করছে সে ক্ষেত্রে শিশুর পিতামাতা বা শিক্ষকের উচিত শিশুকে উপেক্ষা করা। তা হলে সাধারণ বুদ্ধিমান শিশু সহজেই বুঝতে পারে যে এ উপায়ে স্বার্থসিদ্ধি হবে না, তখন সে সমাজ-দ্বারা গৃহীত অন্য পন্থা অবলম্বন করে।

১০। **পরের দোষ-দর্শন ও সমালোচনা (Criticism)**—পরের দোষ-দর্শনে আনন্দ পায় না এমন মানুষ পৃথিবীতে বিরল। আমাদের নিজেদের দোষ এত প্রচুর যে সেজন্যে আমরা নিজের কাছেও লজ্জিত থাকি, পরের মধ্যে সে রকম দোষ দেখলে আমরা উল্লাসে মুখর হয়ে উঠি। আমাদের মন যেন বলে, "আমরা এতটা খারাপ নই!" পরের দোষটা যদি সত্য বলে প্রমাণ করতে পারি, তা হলে খুশির আর সীমা থাকে না, তাতে একটা মস্ত আত্মতৃপ্তি আছে। সমালোচনা-দ্বারা অন্যকে লোকের কাছে হেয় করা হয়। এতে যেন নিজের সম্মান বাড়ে। ব্যক্তির সংশোধনের জন্যে সমাজের এ নিন্দার প্রয়োজন আছে। তবে সমালোচনা বস্তুনিষ্ঠ ও অসূয়াশূন্য হলেই তা বাস্তবিক মূল্যবান হয়। ন্যায্য সমালোচনার অভ্যাস বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধের ভিত্তি, এবং প্রকৃত শিক্ষার এটি একটি উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। গঠনাত্মক অসূয়াশূন্য ন্যায্য সমালোচনা পৃথিবীতে অতিশয় দুর্লভ।

১১। **পরের সহানুভূতি- বা করুণা-আকর্ষণের কৌশল (Sympathism)**—অনেক সময় কঠিন কাজ করবার প্রয়াসটুকু আমরা করতে চাই না,—সেই জন্যে মানুষের মন গলিয়ে সহজে সে ফলটি লাভ করতে চেষ্টা করি। পরীক্ষা ভাল হয় নি, তখন অধ্যাপকের দুয়ারে ধরনা দিয়ে বলি, 'অসুখ হয়েছিল, সেজন্যে পড়াশুনা করতে পারি নি' ইত্যাদি। 'কিউ'তে দাঁড়িয়ে টিকিট কেনবার কষ্টস্বীকার না করে সামনের কারও দয়ার উদ্রেক করে তাকে দিয়ে আগেভাগে টিকিট কাটাই।

এটি নিজ দায়িত্ব এড়াবার ও নিজের দুর্বলতা ঢাকবার একটি অপকৌশল। এ অভ্যাস বলিষ্ঠ চরিত্রগঠনের পথে বাধা। সমস্ত নিউরোটিক্ রোগীতে এ লক্ষণটি বিশেষ করে দেখা যায়।

১২। **দিবাস্বপ্ন ও অলস কল্পনা (Day-dreaming and Fantasy)** —অনেক সময় বাস্তব জগতে যে আনন্দ বা সাফল্য আমরা অর্জন করতে পারি না, স্বপ্ন ও কল্পনার সহজ পথে সে আনন্দ উপভোগের ব্যর্থ প্রয়াস করি—ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখি। এতে হয়তো দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো হয়। এটি একটি পলায়নী-মনোবৃত্তি (escapism)। সকলের জীবনেই হয়তো এই কৌশল কখনো কখনো ব্যবহারের প্রয়োজন হয়, তথাপি এর অতিরিক্ত ব্যবহার সবল চরিত্রগঠনের অন্তরায়, তা অবশ্য-স্বীকার্য। এ পৃথিবীতে সাফল্যের সঙ্গে বাঁচতে হলে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী চাই। কল্পনা যেন কর্মের স্থান অধিকার না করে। অতিমাত্রায় দিবাস্বপ্ন বা কল্পনাবিলাস ভবিষ্যৎ মানসিক বিকারের দ্যোতক হতে পারে। স্বাভাবিক স্নেহবঞ্চিত শিশু কল্পনার আশ্রয় নিয়ে তার জীবনের এই মৌলিক অভাব-পূরণের চেষ্টা করে। কলেজে-পড়া ছেলেমেয়েরা নিজেদের চিত্রজগতের তারকা কল্পনা করে সুখ পায়। শিশুর জীবনে কল্পনার স্থান সামান্য নয়, কিন্তু কল্পনার নিয়ন্ত্রণ সুশিক্ষার অঙ্গ। অলীক আকাশচারী কল্পনার মূল্য সামান্যই। শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে এ জাতীয় কল্পনাকে মন্তেসরী একেবারেই প্রশ্রয় দেন নি।

১৩। **অতিরিক্ত মূল্যদান (Idealization)**—কখনো কখনো কোন দ্রব্য বা মানুষকে অথবা কোন গুণ বা ধর্মকে আমরা তার বাস্তব মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্যদান করি। যেমন মনে করি, আমার ঘড়িটার মতো নির্ভুল সময় আর কোন ঘড়ি দেয় না। যারা প্রেমে পড়েছে তারা

প্রেম-পাত্র বা -পাত্রীকে 'মনের মাধুরী মিশায়ে' অপরূপ বলেই মনে করে। যেখানে গভীর অনুরাগ সেখানেই এই অন্ধতা। আমার ছোট মেয়ে সুমিত্রার আজই বিকালে-পাওয়া একখানা চিঠি এই অন্ধতার একটি সুন্দর উদাহরণ। সে তার বন্ধুকে লিখেছে, "আমার বাবার মতো ভাল বাবা আর কারও হয় না—তাঁহার চারিদিকে যেন একটি স্নেহ-প্রীতি ও শুচিতার পরিবেশ"। জীবনে এই মোহের স্থান আছে, মূল্য আছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মোহভঙ্গের দুঃখও অনিবার্য। জীবনে সফলতা-অর্জনের জন্যে উত্তমের পেছনে নিজের সম্বন্ধে কিছুটা অহমিকা কিছুটা মোহ থাকাই বোধ হয় ভাল। তবে অন্ধ দাম্ভিকতায় পরিণত হলে তা দুঃখের কারণ হতে পারে।

১৪। **অতৃপ্ত কামনা বা মানসিক আবেগকে দৈহিক উপসর্গে পরিবর্তন (Conversion)**—অনেক সময় অবচেতন মনের আকাঙ্ক্ষা সামাজিক বুদ্ধির প্রহরাভেদ করে সচেতন জীবনে তৃপ্তিকর প্রকাশ খুঁজে পায় না। এই দ্বন্দ্বের ফল অনেক সময় হিস্টিরিয়া ইত্যাদি শারীরিক বিক্ষেপের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। কোন দৈহিক কারণ -দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না এমন মাথাব্যথা, বমনেচ্ছা, পেটের অসুখ কখনো কখনো অবচেতন মনে অমীমাংসিত দ্বন্দ্বের ফলে হয়। মেয়েরা সামাজিক নিন্দাকে বেশী ভয় করে বা করতে বাধ্য হয়, তাই তাদের পক্ষে জৈব কামনার সুস্থ সহজ প্রকাশ অনেক বেশী কঠিন—কাজেই হিস্টিরিয়া-জাতীয় উপসর্গ তাদের মধ্যে বেশী দেখা যায়।

১৫। **কূর্মনীতি (Withdrawing)**—বাইরের আঘাত এড়াবার জন্যে কখনো কখনো আমরা ভয়ে-অভিমানে নিজের মধ্যেই নিজেকে গুটিয়ে নিই। যারা দুর্বল, অভিমানী ও আত্ম-অবিশ্বাস-পরায়ণ তারা এই উপায়েই আত্মরক্ষায় চেষ্টিত হয়। এরা শান্ত চুপচাপ থাকে বলেই পিতামাতা-শিক্ষকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়, কিন্তু এ অভ্যাস শিশুদের মধ্যে গড়ে উঠতে দেওয়া উচিত নয়। এ পৃথিবীতে বাঁচতে গেলে দ্বন্দ্ব-আঘাত এড়াবার উপায় নাই। অসাফল্য ও উপহাসের ভয়ে সমস্ত প্রতিযোগিতা থেকে নিজেকে সরিয়ে কূর্মের মতো নিজের খোলসের মধ্যে লুকিয়ে থাকলে সাময়িক আঘাত হয়তো এড়ানো যায়—কিন্তু পলায়নীবৃত্তি বাস্তবিকপক্ষে আমাদের রক্ষা করতে পারে না। এতে চরিত্রের ভিত্তিই দুর্বল হয়ে যায়। যে ছেলে জুজুর ভয়ে নিজের মধ্যেই লুকিয়ে বেড়ায়, সে ছেলে

স্বভাবতই অন্যের কাছে প্রাণ খুলে কথা বলতে পারে না। কোন ব্যাপারেই সে ভরসা পায় না। সাধারণত এ ছেলেরা দিবাস্বপ্ন ও অলীক কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করে। এ রকম কুনো-স্বভাব ছেলেদের অন্য দশজনের সঙ্গে মিলিয়ে জুজুর ভয় ভেঙ্গে দেওয়া দরকার।

১৬। **সর্ববিষয়ে অবাধ্যতা** (Negativism)—এটি কূর্মনীতিরই বাড়াবাড়ি অবস্থা। কোন কোন অতি-অভিমানী বালকের ব্যবহারে চরম একগুঁয়েমী দেখা যায়। তার রাগ ও অভিমান বা ভয় এত প্রবল যে কোনো প্রকার সহযোগিতা করতে সে অনিচ্ছুক। সে প্রশ্নের উত্তর দেবে না, খাবে না, খেলবে না। শাস্তি দিয়েও হয়তো সুফল পাওয়া যায় না—ঘাড় বাঁকা করে মার খায়। মিষ্টি কথা দিয়েও তাকে ভেজানো যায় না। তার মন মুখ বেঁকিয়ে কেবলই বলে, "না না না না!" হয়তো কতক্ষণ পরে নিজের ইচ্ছায়ই সে কাজটি করে, কিন্তু তাকে তা করতে বললে সে কিছুতেই তা করবে না। এ জাতীয় বিদ্রোহী ছেলেরা সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক। এদের মন সদা বিরক্ত, সদা বিষাক্ত। এরা শিক্ষক ও পিতামাতার পক্ষে বিষম সমস্যা। অনাথ-আশ্রমে শাস্তি ও পীড়নের পথে এদের সংশোধন হয় না। স্নেহপূর্ণ যুক্তিপূর্ণ দৃঢ় ব্যবহার দ্বারাই এদের সংশোধন সম্ভব। শিশুর শক্তি-সাধ্যের অতিরিক্ত এবং সম্পূর্ণ তার রুচি-বিরুদ্ধ কোন কাজ তাকে দিয়ে জোর করে করাতে গেলে জেদী ছেলেরা এরকম একগুঁয়েমী করতে পারে। এসব ছেলেদের এমন কাজ দিতে হবে যা তারা উৎসাহের সঙ্গে করতে পারে এবং দশ জনের সঙ্গে যাতে সহজে মিশতে পারে এমন খেলা ও কাজের মধ্যে তাদের টানতে হবে। কোন কোন বিষয়ে নিজের অক্ষমতার সম্বন্ধে হয়তো এমন ছেলের বাস্তবিক কিছু ভয় আছে, সেটা সে কিছুতেই স্বীকার করতে ইচ্ছুক নয় এবং তাহার সম্মুখীন হতেও সে সাহস পায় না। যাই হোক, শিক্ষক ও পিতামাতাকে তার মনের বিমুখতার কারণটি বুঝতে চেষ্টা করতে হবে এবং সহৃদয় অথচ প্রশ্রয়হীন ব্যবহার -দ্বারা—প্রয়োজন হলে সাহায্য করে—তাকে সুস্থ সহজ করে তুলতে চেষ্টা করতে হবে। কখনো কখনো এরকম জেদী ছেলেরা ভবিষ্যতে অসাধারণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হয় যেমন, বিদ্যাসাগর বা বিবেকানন্দ।

১৭। **পশ্চাদপসরণ** (Retrogression or Regression)—কখনো

কখনো প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়ে নিজের অক্ষমতার জন্যে অসফল হলে বালক পূর্ববর্তী শৈশবের কোন সুখকর অবস্থার ব্যবহারে ফিরে গিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। শিশুকালে পিতামাতার স্নেহচ্ছায়ায় ও আদরে শিশু নিশ্চিন্ত- ও নিরাপদ-বোধ করে। এ একটি পরম আরামদায়ক অবস্থা। বড় হয়ে শিশু হয়তো দেখল নতুন একটি ভাই বা বোন এসে তার স্থান অধিকার করেছে—তখন পিতামাতা আশা করেন সে নিজের কাজগুলি নিজেই করবে। এটা ক্লেশকর ও বিরক্তিকর, কিন্তু নিজের মূল্য কমে গেছে বোধ করে শিশু ক্ষুণ্নও হয়। তাই সে পূর্বের অসহায় অবস্থায়ই ফিরে যেতে চায়,—যখন কোলে করেই বাবা-মা তাকে রাস্তাটুকু পার করিয়ে দিতেন, কাপড়-জামা পরিয়ে দিতেন, খাইয়ে দিতেন। তাই হাঁটতে পারলেও হয়তো কাদার মধ্যে ইচ্ছে করে পড়ে গিয়ে সে কাঁদতে থাকবে,—যতক্ষণ না মা এসে তাকে কোলে করে তুলে ধুইয়ে মুছিয়ে নতুন জামা পরিয়ে আদর করেন। ফ্রএডীয়দের মতে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ কোন বিভ্রান্তিকর বা প্রতিকূল অভিজ্ঞতা -দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হলে এ প্রকার পশ্চাদপসরণ (regression) শিশুদের মধ্যে দেখা যায়। অধিকাংশ শিশুই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বর্ধিত শক্তির যথোচিত ব্যবহারের উপযুক্ত সুযোগ পায় এবং তাতে আনন্দও পায়। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই পশ্চাদপসরণ সাময়িক, এবং আপনিই এর সংশোধন ঘটে। অধিকাংশ বালক শৈশবের স্মৃতিতেই আনন্দলাভ করে, বাস্তবিক পক্ষে শৈশবের অসহায়তায় ফিরে যেতে চায় না। কিন্তু এই কৌশলের পুনঃপুনঃ ব্যবহার অসুস্থ মনের পরিচায়ক।

১৮। **অবদমন (Repression)**—সামাজিক নিন্দার ভয়ে অনেক সময় আমরা মনের আকাঙ্ক্ষা- বা আগ্রহ-দমন করি। যার স্মৃতি বেদনাদায়ক বা লজ্জাকর তা আমরা এড়িয়ে চলি বা তা থেকে দূরে থাকি। সাধারণত অপ্রীতিকর অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলার ক্ষমতা মোটা-মুটিভাবে আমাদের থাকে। কিন্তু অবদমনের অভ্যাসের ফলে আমাদের এই স্বাভাবিক ক্ষমতার সঙ্কোচন ঘটে। অনেক সময় এ অভ্যাসটি বাস্তবিক পক্ষে উদ্দেশ্যসাধনে সক্ষম হয় না। যে অশান্তি বা উদ্বেগ এড়াতে চাই, দমনের চেষ্টায় সে উদ্বেগই বেশী করে ভোগ করতে হয়। এখানে যে দমনের কথা বলা হল তা সচেতন ক্রিয়া। ফ্রএড্-পন্থীরা অবচেতন মনে অবাঞ্ছিত কামনা-অবদমনকে সমস্ত মানসিক বিকারের কারণ বলে মনে করেন।

১৯। মনের বিকারজনিত ব্যবহার (Neurotic behaviour)—স্বাভাবিক জীবনের অপ্রীতিকর বিভ্রান্তিকর অবস্থার সম্মুখীন হতে অক্ষম হলে আমাদের ব্যবহারে বিকার দেখা দেয়। পরীক্ষার পড়া তৈরী হয় নি, তখন ভয়ে-ত্রাসে গায়ে জ্বর আসে। বাস্তবিকই জ্বরের লক্ষণ শরীরে প্রকাশ পায়, যদিও ডাক্তারী পরীক্ষায় দেখা যায় সত্যিকার জ্বর হয় নি। কখনো কখনো সাময়িক বাক্‌রোধ, দৃষ্টিহীনতা, স্মৃতিলোপ ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়। শারীরিক রোগ না হলেও ক্লেশটা কিছু কম হয় না। এ সমস্ত রোগের লক্ষণ কখনো মানসিক কোন দ্বন্দ্ব বা অবদমিত আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। এটি অন্যকে এবং নিজেকেও প্রতারণার জন্যে ব্যবহৃত হয়। এ প্রক্রিয়াটি সচেতন মনের ক্রিয়া নয় এবং প্রতীকের তাৎপর্য-ব্যাখ্যার দ্বারা এর কারণ-নির্ণয় অনেক সময় সহজ হয়।

যে সব প্রক্রিয়া বা কৌশলের কথা আলোচনা করা হল সেগুলি ব্যক্তি যেখানে তার জীবনের সমস্যার সম্যক সমাধানে অক্ষম বোধ করে সেখানেই ব্যবহৃত হয়। এগুলি ব্যক্তির অহঙ্কারের আত্মরক্ষার নানা কৌশল। অল্পমাত্রায় এদের ব্যবহার দূষণীয় নয়, কিন্তু এতে অভ্যস্ত হলে ব্যক্তি-চরিত্র দুর্বল হয়, ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ সুস্থ বিকাশ ব্যাহত হয়। শিক্ষকের কর্তব্য শিশুর নিজ শক্তি সম্বন্ধে তাকে সচেতন করে তোলা,—'পারিব না' বলে যেন সে অল্পেই পিছিয়ে না পড়ে। দশজনের সঙ্গে মিলেমিশে খেলা বা কাজ করতে তাকে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। বাধা-অতিক্রম করতে, বিপদ-জয় করতে তাকে উৎসাহ দিতে হবে, তার পৌরুষ ও উদ্যম যাতে জাগ্রত হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে হবে। যে কাজ শিশুর শক্তিসাধ্যের বাইরে তেমন কাজ দিয়ে অসাফল্যের জন্য তাকে দোষী করা অথবা তাকে উপহাস করা অনুচিত। তার নিজ রুচি- ও প্রবৃত্তি-অনুযায়ী গঠনমূলক কাজে তাকে উৎসাহ দেওয়া কর্তব্য। ভীরু ও আত্ম-অবিশ্বাসী শিশুদের সঙ্গে স্নেহ ও বিবেচনার সঙ্গে ব্যবহার করা দরকার, কিন্তু তাদের দুর্বলতার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।[৭]

২০। যুযুৎসা অথবা আক্রমণাত্মক কৌশল (Aggression)—মানুষ নিজেকে সবচেয়ে ভালবাসে। তার অহঙ্কার প্রবল। অন্যের কাছে সে তাই হার মানতে চায় না। এমন কি নিজের কাছেও নিজের

[৭] Murphy, Murphy & Newcomb—Exp. Social Psychology, pp. 505-6

দৈহিক, মানসিক বা চারিত্রিক ত্রুটি- বা ন্যূনতা-স্বীকার করতে সে চায় না। এজন্যে অর্থাৎ নিজ ত্রুটি-আবরণের জন্যে বা সংশোধনের জন্যে সে নানা উপায় বা কৌশল অবলম্বন করে থাকে (Ego-defense mechanisms)। তার মধ্যে একটা হচ্ছে অন্যের প্রতি আক্রমণ অথবা আক্রমণাত্মক মনোভাব (Aggression)। যেখানে ব্যক্তি কঠিন প্রতিযোগিতামূলক এবং নৈরাশ্য-জনক অবস্থার সম্মুখীন, যেখানে ব্যক্তি নিজের শক্তি বা বুদ্ধি দিয়ে সমস্যার সমাধানে অক্ষম সেখানে কখনো কখনো এই কলহ বা আক্রমণের রীতিটি সে অবলম্বন করে নিজ ক্ষুণ্ণ অহঙ্কারকে রক্ষা করবার জন্যে।

এই যুদ্ধাত্মক কৌশলের কারণ সম্বন্ধে মনোবিদেরা বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। ম্যাক্‌ডুগ্যাল্ এক সময় এ কথা বিশ্বাস করেছিলেন যে যুদ্ধাত্মক ব্যবহার (pugnacity) মানুষের একটি সহজাত সংস্কার থেকে উদ্ভূত এবং এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক (natural) ও সার্বিক (universal)। এই সংস্কার সভ্যতার চাপে ক্রমে সমাজসম্মত রূপ পরিগ্রহণ করে। এমনভাবে তার প্রকাশ সংশোধিত হয় যে তখন তা আর নিন্দার্হ আচরণ বলে গণ্য হয় না। আবার অন্যান্য মনোবিদের মতে প্রত্যেক মানুষই স্বভাবত কোন না কোন উদ্দেশ্য-সিদ্ধিকারক তাড়না -দ্বারা চালিত এবং উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে বাধা অতিক্রম করতে হলেই আক্রমণাত্মক বা বাধাজয়কারী উদ্যোগী আচরণ নিতান্ত প্রয়োজন। কাজেই আক্রমণাত্মক ব্যবহার হচ্ছে বাধার বিরুদ্ধে প্রত্যেক মানুষের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। আবার অন্য সমাজ-মনোবিদ্‌দের মতে শিশু যতই বড় হতে থাকে ততই সমাজ -কর্তৃক স্বীকৃত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তার প্রবল হয়ে ওঠে। শিশুর পক্ষে বড়দের মনোযোগ আকর্ষণ করার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে—অবাধ্যতা বা ধ্বংসাত্মক ব্যবহার। এ দিয়েই শিশু সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠা বা স্বীকৃতি আদায় করে।[৮]

৮ McDougall believed at one time that aggression is a normal reaction which develops from the instinct of pugnacity. This instinct in time becomes socialized to the point where the individual's behaviour is either reconditioned or inhibited...Other psychologists believe that aggressive behaviour is the natural result of goal-seeking drives which exist in every person. Without aggression there would be little energetic activity and no individnal would attempt to achieve a difficult goal. According to some social psychologists, aggression arises as the child matures and as the process of socialization requires him to make attempts to obtain attention. Aggression is the simplest way of gaining attention, and thus this type of behaviour is universally seen. Sherman—Basic Problems of Behaviour, p. 170

মার্ফি এবং তাঁর সহকর্মীরা ভূয়োদর্শনের ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে শিশুর বয়স বৃদ্ধি ও সামাজিক অভিজ্ঞতা-বৃদ্ধি এবং নিজ কার্যের ফলাফলের জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে শিশুর আক্রমণাত্মক ব্যবহার বা দৌরাত্ম্যের নিকট সম্বন্ধ রয়েছে। তাঁরা দেখেছেন বিভিন্ন বয়সে শিশুদের দৌরাত্ম্য বাড়ে-কমে। তাঁদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে—

১। দু বছর বয়স পর্যন্ত শিশুরা মোটামুটি শান্ত, পিতামাতার ওপর নির্ভরশীল ও বাধ্যপ্রকৃতির।

২। তিন থেকে চার বছরের মধ্যে যখন শিশুরা প্রথম সামাজিক জীবনের সঙ্গে প্রথম যুক্ত হয় তখন তাদের নেতিবাচক ব্যবহার (করব না, খাব না, ইত্যাদি অবাধ্যতা—negativism) দেখা দেয়। যতই বড়রা তার কাজে বা স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা দেন ততই তাদের ধ্বংসাত্মক আক্রমণাত্মক ব্যবহার উগ্রতর হয়।

৩। পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে পিতামাতার সঙ্গে ব্যবহারে শিশুদের উভমুখীতা (ambivalence) দেখা দেয়। বাইরের দিক থেকে তাদের ব্যবহারে বাধ্যতা পরিলক্ষিত হলেও মনে মনে একটা বিরুদ্ধতার ভাব থাকে। এই কালের গোড়ার দিকটাতে অন্য শিশুদের প্রতি তাদের আচরণে একটা নিষ্ঠুরতা ও হিংস্রতা দেখা যায়। এবং শেষের দিকটায় এই উৎপাত ও উৎপীড়ন হয় দল বেঁধে।

৪। বারো থেকে কুড়ি বছরের মধ্যে শিশুরা নিজ শক্তি সামর্থ্য ও বুদ্ধি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে এবং নিজ স্বাধীন অধিকার-প্রতিষ্ঠার জন্যে তখন তারা মাঝে মাঝে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং তাদের আক্রমণাত্মক আচরণে তা স্পষ্ট রূপ নেয়।[৯]

৫। পূর্ণ যৌবনে উত্তীর্ণ হলে ব্যক্তি তখন ব্যবসায়গত ও ব্যক্তিগত নানা প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয় এবং জীবনে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা-লাভ করতে হলে ব্যক্তির পক্ষে কোনো কোনো সময় আক্রমণাত্মক ব্যবহার অবশ্যই প্রয়োজন এবং তা দেখা যায়ও।[১০]

গেসেল্ এবং তাঁর সহকর্মীরা বহু সহস্র শিশুর বিভিন্ন বয়সের ব্যবহার

৯ Murphy, Murphy & Newcomb—Exp. Social Psychology, p. 537

১০ Sherman—Basic Problems of Behaviour, pp. 168-69

সযত্নে লক্ষ্য করে যে সিদ্ধান্ত করেছেন, তা কিছুটা অন্যপ্রকার। তাঁরা মত প্রকাশ করেছেন যে, শিশুর আক্রমণাত্মক ব্যবহার একটানা বেড়ে চলে একথা ঠিক নয়। তাঁরা বলেছেন যে শিশুর দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বাড়ের গতিটা অসমান এবং তাতে হঠাৎ ঊর্ধ্বগতির চাড় (sprut) এবং স্থিতাবস্থার একটা মোটামুটি ছন্দ আছে। এক একটা বয়সে হঠাৎ দৈহিক বৃদ্ধির সময় শিশু কিছুটা অস্থিরতা বোধ করে এবং সে বয়সগুলিতে তার আক্রমণাত্মক ব্যবহার বিশেষ লক্ষ্য করা যায়।[১১]

স্কুলে যাবার বয়সের (৬ বছর) আগে শিশুদের আক্রমণাত্মক ব্যবহার অনেক সময়ই খোলাখুলি ভাবেই নগ্ন। নার্সারী স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহার লক্ষ্য করে গুডেনাফ্ দেখেছেন যে তাদের বন্য ব্যবহারের উগ্রতা ও তার প্রকাশে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে প্রভেদ আছে।[১২] আবার কোন ছেলেমেয়ের মধ্যে আক্রমণাত্মক ব্যবহার অনেক ঘন ঘন দেখা যায়, আর কারো কারো মধ্যে তা নয়। তবে এটা দেখা যায় স্কুলে শিক্ষিকাদের তিরস্কার শাসন বা উপদেশের ফলে আক্রমণাত্মক ব্যবহারটা সোজাসুজি না হয়ে ঘুরিয়ে হয়। তখন অন্য ছেলেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া বা চুল ধরে টানার পরিবর্তে তার বইটা ছিঁড়ে ফেলা, তার পুতুলটা ছুঁড়ে ফেলা -রূপ ভদ্রতর ব্যবহার দেখা দেয়। তিন-চার বছরের ছেলেমেয়েরা সোজাসুজিই হাতাহাতি মারামারি করে। কিন্তু বাপ-মা-শিক্ষিকার শাসনের ফলে ৫-৬ বছরের ছেলেমেয়েরা হাতাহাতির পরিবর্তে গালাগালি করে। তাতে বাধা দিলে হয়তো দূর থেকে লাথি দেখায়, কাঁচকলা দেখায়, ভেংচি কাটে।[১৩]

১১ ...we have observed thal two years of age, five years and ten years all constitute focal points at which behaviour seems to be in good equilibrium the child having relatively little difficulty within himself or with the world about him. Each of these relatively smooth and untroubled ages is followed by a brief period when behaviour appears to be very much broken up, disturbed and troubled and when the child shows himself to be in marked disequilibrium, Thus the smoothness of 2-year.old behaviour characteristically breaks up at two and a half; 5-year-old behaviour breaks up at five and a half to six; and ten break up at eleven, the 11-year-child characteristically showing himself to be at definite odds with his environment and with himself. The Gessell Institute's Child Behaviour, by F. Ilgg. and L. B. Ames, pp. 20-21

১২ F. Goodenough—Jour. of Juvenile Research, 1929, 13, 209-14

১৩ Foster—Mental Hygiene, 1927, 11, 53-77

আক্রমণাত্মক ব্যবহারের পরিবর্তনের আর একটা রূপ হচ্ছে হিংসা ও ঈর্ষা। সাধারণত পিঠোপিঠি ভাইবোনদের মধ্যেই এটা বেশী দেখা যায়। বাবা বা মার সম্পর্কে অধিকার নিয়েই বড়টি সাধারণত ছোটটিকে হিংসা করে। এ সব ক্ষেত্রে আক্রমণাত্মক ব্যবহার সোজাসুজি দৈহিক পীড়নের মধ্য দিয়ে প্রকাশের উপায় থাকে না, তাই ঈর্ষা ও অভিমানের ভেতর দিয়েই শিশু মনের ক্ষোভ প্রকাশ করে। একটা মজা দেখা যায় যে যেখানে অনেক-গুলি ভাইবোন সেখানে ঝগড়া-ঈর্ষা কম। আর দুজনের মধ্যে বয়সের প্রভেদটা আঠারো মাসের কম হলে ঈর্ষা কম দেখা যায়। কিন্তু যেখানে দুটি মাত্র ভাইবোন এবং তাদের মধ্যে প্রভেদ তিন থেকে চার বৎসরের মধ্যে, সেখানেই ঈর্ষাটা সব চেয়ে বেশী দেখা যায়।[১৪]

যার ওপরে রাগ তার ওপর ঝাল ঝাড়তে পারার হয়তো উপায় নেই, কারণ সে প্রবলতর বিপক্ষ; সে ক্ষেত্রে আক্রমণাত্মক ব্যবহারটা স্থানান্তরিত হয়ে এমন অন্য কারো বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয় যে দুর্বল, যার ওপর অত্যাচার করাটা নিরাপদ। পাড়ার শ্যামলদার ওপর রাগ, কিন্তু সে জোয়ান, তাই তার সঙ্গে পেরে ওঠার জো নেই। সেক্ষেত্রে তার রোগা ছোট বোনটাকে রাস্তায় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলাম। শিশুরাই শুধু নয়, বয়স্কদের মধ্যেও এমন কাপুরুষোচিত আচরণ প্রায়ই দেখা যায়। আমাদের দেশে একটি স্থূলরুচি প্রবাদ আছে যে, কর্তা কর্মস্থলে অপমান সহ্য করে বাড়িতে এসে অবলা স্ত্রীর ওপর মারধোর করেন।

অধুনা কোন কোন মনস্তত্ত্ববিদ্ সামাজিক বিদ্বেষ ও সংঘর্ষের ব্যাখ্যা হিসাবে বলেছেন যে, এ-ও একপ্রকার আক্রমণাত্মক ব্যবহারের স্থানান্তরণ। কোন ব্যক্তি অন্য কারো ওপরে বিরক্ত, কারণ সেই ব্যক্তিটি তার অশুভ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পক্ষে বাধাস্বরূপ। কিন্তু ভদ্রভাবে তাকে আক্রমণ করার কোন উপায় নেই, কারণ তিনি সৎ ও প্রভাবসম্পন্ন ব্যক্তি। তখন একটি বিরুদ্ধ দলের সঙ্গে যোগদান করে, কোন সামাজিক বা রাজনৈতিক সংস্কারের ছদ্মবেশে, প্রথম ব্যক্তি সমাজসম্মত আচরণের মধ্য দিয়ে (বিরুদ্ধ রাজনৈতিক প্রচার, বিপরীত পক্ষে ভোটদান ইত্যাদি) দ্বিতীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিজ ব্যক্তিগত আক্রোশ প্রকাশ করতে পারে।[১৫]

---

১৪ A study of the personality make-up and social setting of fifty jealous children.

১৫ Some investigators believe that all closely-knit political groups

কোন কোন সমাজতত্ত্ববিদ্ মনে করেন যে মানুষের আদিম বন্য যুদ্ধস্পৃহা সভ্যতার ফলে কিছুটা ভদ্র আবরণে আবৃত হয়েছে মাত্র; তার মূলোচ্ছেদ হয় নি, কোনদিন তা হবে কিনা সন্দেহ। তারই প্রকাশ আমরা দেখি সাধারণ মানুষের যুদ্ধ, খুনোখুনির গল্প বা ছবির প্রতি প্রবল আকর্ষণে। যুদ্ধপ্রিয়তা হিংস্রতা রয়েছে তার রক্তের মধ্যে, সভ্যতা তাকে একটু আবরণ দিয়েছে মাত্র। তার ফলে সমাজসম্মত অপেক্ষাকৃত ভদ্রভাবে আক্রমণের বিষয়ের পরিবর্তন (substitution) এবং স্থানান্তরণ (transference) ঘটেছে। স্পেনে ষাঁড়ের লড়াই, আমাদের দেশে মুরগীর লড়াই, আমেরিকায় মুষ্টিযুদ্ধ (boxing) খুবই জনপ্রিয় এবং এ লড়াইগুলি যত বেশী রক্তাক্ত হয় ততই তাদের আকর্ষণ বাড়ে। এখানে সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক কৌশল দেখতে মানুষের ততটা উৎসাহ নেই, যতটা উৎসাহ 'লড়াই'টা দেখতে।[১৬]

ফ্রএড্-অনুগামী অবচেতন মনস্তত্ত্বে বিশ্বাসীরা বলেন, সম্ভবত যেখানে প্রীতি বা অনুরাগের বাহ্যপ্রকাশটা বেশী সরব ও সাড়ম্বর সেখানে অনুমান করা যেতে পারে যে ব্যক্তির অবচেতন মনে আছে কঠিন একটা বিরূপতা অথবা গভীর কোন পাপবোধ। যে স্বামী স্থানে-অস্থানে স্ত্রীর গুণকীর্তন করে বেড়ান অথবা স্ত্রীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে অতিরিক্ত উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন, সম্ভবত তাঁর অবচেতন মনে আছে স্ত্রীকে আঘাত করবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা—তাকে বাধা দেবার জন্যেই তাঁর এ প্রকার অতিপ্রকাশ্য অনুরাগ। অথবা এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে স্বামীর মনের মধ্যে আছে গভীর অপরাধ-বোধ (হয়তো তিনি গোপনে অন্য নারীর প্রতি আসক্ত), তা তিনি নিজের কাছেও বাইরের বিপরীত ব্যবহারের মধ্য দিয়ে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করছেন।[১৭]

function primarily for the release of overt hostilities which can express themselves in socially acceptable behaviour...A dissatisfied, thwarted and disappointed individual who believes that he has been unfairly treated tends to join such groups, ostensibly for the purpose of social or political reform but primarily perhaps as a way of expressing his aggressions and hostilities which he could not do as an individual. Sherman—Basic Problems of Behaviour, p. 175

১৬ Only relatively few people would go to a prize fight for the purpose of seeing the scientific skill of the boxers but large numbers attend these fights to see the "fighting" rather than the boxing, Sherman—Basic Problems of Behaviour, p. 176

১৭ Morton Prince—The Unconscious, pp. 164-66

নিরাপত্তাবোধের অভাব অনেক সময় আক্রমণাত্মক ব্যবহারে প্রকাশ পায়। যে সব ছেলে অতিরিক্ত কলহপরায়ণ, বেশী চীৎকার বা বড়াই করে অনেক সময়ই তাদের ভেতরটা ফাঁপা। তারা জানে আক্রমণই আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় (Offensive is the best defence)। তারা মনে মনে নিজেদের অ-নিরাপদ বোধ করে বলেই বাইরে 'যুদ্ধং দেহি' ভাব দেখায়। এটা শুধু শিশুদের বেলায়ই নয়, বয়স্কদের বেলায়ও সত্য। যে সব লোক বেশী কথা বলে, বেশী বাহাদুরি দেখায়, অপরের সব কথারই প্রতিবাদ করে নিজের বিদ্যা জাহির করে, বুঝতে হবে তারা নিজেদের দুর্বলতা অক্ষমতা বা অজ্ঞানতা ঢাকবার জন্যই ক্ষমতার এই ভান করে (Reaction formation)।

সমাজজীবন সম্পর্কে যে সব মনোবিদ্‌রা অনুসন্ধান করেছেন তাঁরা সকলেই একমত যে, যে পরিবার বিধ্বস্ত (broken homes), যে পরিবারে পিতা বা মাতা মৃত, অথবা যেখানে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটেছে, অথবা স্বামী নিরুদ্দেশ বা স্ত্রী গৃহত্যাগিনী, সে সব পরিবারের ছেলেমেয়েরা সাধারণত কলহপরায়ণ ও প্রকাশ্যভাবে অবাধ্য হয়; তারা দুর্বল ছেলেমেয়েদের ওপর উৎপীড়ন করে নিষ্ঠুর আমোদ বোধ করে। এ সমস্ত ছেলেমেয়েরা বাস্তবিক পক্ষে স্নেহের কাঙাল এবং প্রকৃত স্নেহ ও সহানুভূতি পেলে, প্রশংসা পেলে এরা সংশোধিত হয়।

ডলার্ড (Dollard) এ বিষয়ে বহু অনুসন্ধান করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে নৈরাশ্য (frustration) বহু ক্ষেত্রে আক্রমণাত্মক আচরণের হেতু। বারে বারে চেষ্টা করে বিফল হলে, বাইরের থেকে ব্যক্তি শান্তভাবে অবস্থাটা গ্রহণ করেছে বলে মনে হলেও বাস্তবিক পক্ষে অনেক সময় মনের মধ্যে অসন্তোষের বাষ্প জমা হতে থাকে, অবশেষে সামান্য এক কারণকে অবলম্বন করে বিস্ফোরণ ঘটে। খুব বড় একটা বিফলতার থেকে ক্রোধ ও যুযুৎসার উদ্ভব বড় দেখা যায় না। কিন্তু যেখানে অনেকদিন ধরে ছোট ছোট বিফলতা বা নৈরাশ্য জমা হতে থাকে সেখানেই আক্রমণাত্মক আচরণ বেশী সুস্পষ্টভাবে লক্ষণীয়।[১৮]

কখনো কখনো শাস্তির আশঙ্কা করে তা এড়াবার জন্যে শিশুরা যুদ্ধাত্মক মনোভাব গোপন করে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ক্রোধটা জমা হয়। এবং যার কাছ থেকে শাস্তি আশঙ্কা করা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে ক্রোধ প্রকাশটা

১৮ Crow & Crow—Mental Hygiene, p. 291

দেখানোর উপায় থাকে না বলে, অন্যত্র এই আক্রমণটা স্থানান্তরিত হয়। রাজনীতিক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের ওপর উৎপীড়নের পেছনে যারা থাকে তারা সাধারণত অন্যত্র প্রবলতর কোন পক্ষের কাছ থেকে কোন অবিচার ও অত্যাচারের শোধ তুলতে চায় নিরীহ সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার করে।[১৯]

মানুষ শুধু অন্যকেই আঘাত করতে বা আক্রমণ করতে চায় না। কখনো কখনো সে নিজেকেও আঘাত করে। এরও মূলে থাকে অনেক সময় গভীর নৈরাশ্য এবং অসহ্য পাপবোধ। বহু মানসিক রোগের চিকিৎসকের স্থির সিদ্ধান্ত যে, এ-জাতীয় মানসিক রোগী অনেক সময়ই নানা দৈহিক রোগ নিজেই সৃষ্টি করে এবং সে রোগ অনেক ক্ষেত্রে নিজ অপরাধক্ষালনের উদ্দেশ্যে আত্মনিপীড়নের বাহ্য প্রকাশ। কোন কোন ব্যক্তি বারে বারে নানা দুর্ঘটনায় আহত হয়। তাদের মনোবিশ্লেষণ করে অবচেতনে বিশ্বাসী মনোবিদ্‌রা দেখেছেন যে তাদের অধিকাংশেরই অবচেতন মনে রয়েছে গভীর পাপবোধ ও আত্মহননের দ্বারা প্রায়শ্চিত্তের নির্বোধ আকাঙ্ক্ষা।[২০]

ফ্রএড্‌ আদিকামের মতো আত্মহননের আকাঙ্ক্ষাকেও একটি মৌল সংস্কার বলে মনে করেছেন। এবং কোন কোন ফ্রএড্‌-পন্থী মনঃসমীক্ষক এমন মত প্রকাশ করেছেন যে অনেক মানুষের যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা আত্মহননের প্রবৃত্তির একটা অসুস্থ সমষ্টিগত বা সামাজিক প্রকাশ। কিন্তু এ মত খুব সুশৃঙ্খল যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এ কথা বলা যায় না।

---

১৯ Dollard—Frustration and Aggression, p. 2

২০ The aggressions against minority religious or racial groups have been considered by some psychologists to be displacements of aggressive tendencies as the result of frustrations, the origins of which have little relation to the overt aggressions which are finally shown. Sherman—Basic Problems of Behaviour, p. 179

২১ এ বিষয়ে Griffith-এর An Introduction to Applied Psychology—Ch. XXIV, Viteles-এর Industrial Psychology—Ch.XIV, XVII ও XVIII এবং The Accident-prone Employee—The Metropolitan Life Insuruanee Co. ইত্যাদি পুস্তকে বিশদ আলোচনা আছে।

দশম অধ্যায়

শিশুর জীবনে অব্যবস্থিততা

একদিক থেকে মনে হতে পারে শিশুর জীবনে আবার সমস্যা কি? তাদের জীবনে আবার অব্যবস্থিততা (mal-adjustment) কি? তিন-চার বছর পর্যন্ত সে মা-বাবার কোলে-পিঠে আদরেযত্নে পালিত ও লালিত হয়। ভাইবোনেদের সঙ্গে বা সমবয়স্ক ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলাধুলা করে, সুখে-আনন্দে তার দিন কেটে যায়। পড়াশুনো বা পরীক্ষা পাসের চিন্তা তাদের করতে হয় না, জীবিকা উপার্জন বা পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব ও দুর্ভাবনা তাদের থাকে না। সমাজজীবনে দশজনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতায় নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবার উদ্যমে তার প্রয়োজন নেই। সমাজ ও রাষ্ট্রের হাজারো দাবি তাকে মেটাতে হয় না। লোক-লৌকিকতা, সুনাগরিকের কর্তব্য, আয়করের হিসাব-দাখিল, সমাজের নীতিবুদ্ধি বা রাষ্ট্রের মতবাদজনিত চাপ ইত্যাদি হাজারো ঝামেলা তাকে পোহাতে হয় না। শিশুর প্রয়োজন পূর্ণবয়স্কের তুলনায় অনেক কম। তার পৃথিবীটা অনেক ছোট। তার বুদ্ধি, তার অনুভূতি, তার দেহের শক্তি, তার নৈতিক চেতনা সবই ছোট মাপের এবং তাদের জটিলতাও অনেক কম। সে কারণেই পৃথিবী তার কাছে খুব বেশী কিছু দাবি করে না। তার কৌতূহল প্রচুর, কিন্তু জ্ঞানের নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল সে আস্বাদন করে নি, তাই "দৈবী অসন্তুষ্টির' (divine discontent) কালো পোকা তার রাত্রের ঘুমকে কুরে কুরে খায় না। তার কল্পনা প্রবল, তবুও মহাকাশ-যাত্রায় নভশ্চর হবার অথবা হিমালয়-শীর্ষে অভিযানের জন্যে তার ডাক পড়বে না। 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে' এ মূল্যবান তথ্য তার জন্যে নয় এবং মদনদেব তার জন্যে হৃদয়ভেদী শর অপব্যয় করেন না। সর্বত্র সে প্রীতি ও ক্ষমার পাত্র—অমৃতং বাল ভাষিতং, তার সাত খুন মাপ!

কিন্তু আর একদিক থেকে দেখতে গেলে শিশুর সামনে সমস্যা এমন পর্বতপ্রমাণ যে, ছোট শিশু যে বেঁচে থাকে ও বেড়ে ওঠে এটাই আশ্চর্য। মাতৃগর্ভের অন্ধকার কবোষ্ণ সম্পূর্ণ নিরাপদ আশ্রয় থেকে সে হঠাৎ এই

হাওয়া-আলো-কোলাহল -পূর্ণ অপরিচিত পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। সে সম্পূর্ণ অসহায় এবং তার জ্ঞানের ভাণ্ডার এত অকিঞ্চিৎকর, তার শক্তি এত সীমিত যে জন্মের পর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত পরিবেশের সঙ্গে তাকে রীতিমত সংগ্রাম করতে হয়। এমন কি ভূমিষ্ঠ হয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ অপোগণ্ড শিশুর পক্ষে মাতৃস্তন্য থেকে নিজ খাদ্য আহরণ -রূপ কাজটি শেখা বাস্তবিক খুব সহজ নয়, যদিও দেখতে মনে হয় এর চেয়ে সোজা কাজ কিছু নেই। এই সামান্য কাজটি সুসম্পন্ন করতে হলে কতগুলি পেশী, ইন্দ্রিয় ও অঙ্গের সামঞ্জস্য করতে হয়। অবশ্য দেহমনের বিকাশের স্বাভাবিক ধর্ম শিশুর পক্ষে এই শিক্ষার কাজটি সহজ করে দেয় সত্য, তথাপি অস্পষ্টভাবে হলেও শিশুকেও এই সঙ্গতিবিধানের জন্যে চেষ্টা করতে হয়। তেমনি, দুই চোখের দৃষ্টি একই বস্তুতে নিবদ্ধ করে সুস্পষ্ট করে দেখা, হাঁটতে শেখা, জামা পরতে শেখা, 'পটে' বসতে শেখা, কথা বলতে শেখা, নিজ হাতে খেতে শেখা, লিখতে শেখা, ইস্কুলে যাওয়া—এর প্রত্যেকটি কাজ শিখতে বহু চেষ্টা, বহু মনস্তাপ, বহু তিরস্কার, বহু শাস্তি, বহু বিভ্রান্তির মধ্য দিয়ে শিশুকে অগ্রসর হতে হয়। এগুলি শিশুর জীবনে সামান্য সমস্যা নয়! বহু কষ্টসাধ্য অনুশীলনের মধ্য দিয়ে, বহু গালাগাল সহ্য করে (কখনো কখনো দৈহিক পীড়নও) শিশুকে স্কুলের পড়া লেখা অঙ্ক তৈরি করতে হয়। শিশু ভোলানাথ প্রকৃতির বুকে অনাবৃত আকাশের মতো দিগ্‌বসনে ভূষিত হয়ে ধুলোমাটি নিয়ে খেলা করতেই ভালবাসে। কিন্তু তা তো হওয়ার উপায় নেই। তার প্রবল আপত্তি ও সশব্দ রোদন উপেক্ষা করে মা তাকে ধরে-বেঁধে সাবান-গামছা দিয়ে সাফ করবেন, নাওয়াবেন, পাউডার ঘসবেন, সাফ নাইলনের জামা পরাবেন, মোজা পরাবেন, জুতো পরিয়ে 'বাবু' সাজিয়ে আয়ার সঙ্গে বেড়াতে পাঠাবেন। "প্রকৃতির ডাকে" যদি তার জামা ভিজে যায়, তা হলে তার লাঞ্ছনার অন্ত থাকে না!

বাস্তবিক পক্ষে শিশুর জীবনের বহু সমস্যার মূলে হচ্ছে এই সত্যটি যে এই পৃথিবী বড়দের (it is an adult's world)। এই পৃথিবীতে বড়দের মতামত তাদের ইচ্ছা, তাদের রুচির সঙ্গে মানিয়ে শিশুদের চলতে হয়। এই সঙ্গতিসাধনের চেষ্টা শিশুর পক্ষে অনেক সময়ই বিভ্রান্তিকর—কখনো কখনো দস্তুরমত ক্লেশকর। বড়দের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ছোটদের কাছে দুর্বোধ্য, কখনো তা রীতিমত অন্যায়। তাদের মনে স্বাভাবিক কৌতূহল-

বশত নানা প্রশ্ন জাগে। অথচ বড়রা তাদের এই কৌতূহল তো মেটানই না বরঞ্চ এ প্রকার কৌতূহল প্রকাশের জন্যেই তারা কঠিন তিরস্কারলাভ করে!

পারিবারিক জীবন, বিদ্যালয়, খেলার মাঠ, উৎসবক্ষেত্র সর্বত্রই বাড়ন্ত শিশুর জন্যে বহু সমস্যা পুঞ্জিত হয়ে থাকে। দেখে-দেখে, শুনে-শুনে, ঠেকে-ঠেকে তাকে বাস্তব জীবনের সঙ্গে, পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে শিখতে হয়।

অবশ্যই তার জীবনের সমস্যা বড়দের সমস্যার মতো অত জটিল নয়, অত বহু বিচিত্রও নয়। কিন্তু এটা মনে করা নিতান্ত ভুল যে শিশুদের জীবনে কোন সমস্যা নেই। শিশুরা দেবদূত নয়, তারা শয়তানের বাচ্চাও নয়। ক্রোধ লোভ ভয় আকাঙ্ক্ষা তাদের জীবনেও কম নেই, যদিও সেগুলি পূর্ণবয়স্কদের মতো ঠিক একই ধরনের নয় এবং তত জটিল ও উগ্রও নয়।

অব্যবস্থিত শিশু—সমস্ত জীবিত প্রাণীই সমস্যার সম্মুখীন হলে কিছুটা অস্বস্তিবোধ করে এবং সেই সমস্যা-সমাধানের চেষ্টা করে অস্বস্তি দূর করে। সমস্ত সমস্যা সমাধানের মূল কথা হচ্ছে সঙ্গতিস্থাপন (adjustment)। এ নিয়ে পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি, মানুষ কি করে বিভিন্ন অবস্থায় সঙ্গতিবিধান করে। সঙ্গতিবিধান যেখানে সহজে করতে পারে না, সেখানে কি করে মনের নানা অসুস্থতা বা বিকার সৃষ্টি হয় তা-ও আমরা আলোচনা করেছি। শিশুদের বেলায়ও সেই কথাগুলি মোটামুটি ভাবে সত্য। যদিও শিশুর জীবনের সমস্যাগুলি বাইরের দিক থেকে, বড়দের দৃষ্টিভঙ্গীতে নিতান্ত তুচ্ছ, নিতান্ত সহজ, এমন কি হাস্যকর মনে হতে পারে, তথাপি শিশুদের নিজের দিক থেকে তাদের সমস্যা সামান্য নয় এবং অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিস্থাপনের চেষ্টা শিশুও আন্তরিক ভাবেই করে। অধিকাংশ মানুষই সঙ্গতিস্থাপন করে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সমস্যা-সমাধানে সমর্থ হয় এবং মনের দিক থেকে শান্ত থাকে। শিশুদের বেলায়ও এ কথা সত্য। কিন্তু যেখানে শিশু সঙ্গতিস্থাপনে সমর্থ নয়, সেখানে সে দিশাহারা হয়, উদ্বেগপ্রকাশ করে, নানা কৌশল অবলম্বন করে আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু সকলে, সব সময় তা পারে না, এর জন্যে তাদের নিজেদের অক্ষমতা বুদ্ধি ও নিপুণতার অভাব দায়ী হতে পারে অথবা বাইরের পরিবেশের প্রতিকূলতাও দায়ী হতে পারে। কোন বিশেষ একটি সমস্যার

সমাধানে অসমর্থ হলে অথবা বিশেষ একটি অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিসাধনে অপারগ হলেই যে সে অব্যবস্থিত এমন বলা যায় না। কিন্তু যদি দেখা যায় শিশু বিদ্যালয়ে কিছুতেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছে না, অঙ্কের 'আন্টি'র ক্লাস এলেই তার বমি আসতে থাকে, যদি পরীক্ষার সময় এলেই সে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তবে সে ছেলেমেয়েকে আমরা অব্যবস্থিত বলব। আরো কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক। একটি দু বছরের মেয়ে, তার একটি ছোট ভাই হল। প্রথমে সে খুশী হয়েছিল, ভেবেছিল এ তার একটি নূতন খেলনা হল। ভাইকে যে আদর করত, কোলে নিতে চেষ্টা করত। কিন্তু ক্রমে সে দেখতে পেল মা ভাইটিকেই কোলে নেন, রাত্রে ভাইটিকেই কাছে নিয়ে শোন এবং সে মার কোলে গিয়ে বসলে বা মার কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে শুতে গেলে মা তাকে সরিয়ে দেন, তাকে আর আগের মতো আদর করেন না। ফলে ভাইটির প্রতি তার হিংসে হল, সে ভাইটিকে সুযোগ পেলেই ব্যথা দিতে চেষ্টা করত। একদিন সে গোপনে ভাইটির গলা টিপে দিতে চেষ্টা করেছিল। মা দেখতে পেয়ে তাকে খুব বকুনী দেন এবং কদিন মেয়েকে তিনি দূরে দূরে সরিয়ে রাখতেন। তার পর থেকে সে কেমন সদা-উদ্বিগ্ন হয়ে গেল, পড়াশুনোয় আগে বেশ উৎসাহ ছিল, লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়ল এবং শুকিয়ে যেতে লাগল। এখানে অবশ্যই বলা চলবে যে মেয়েটির ব্যবহারে অব্যবস্থিততার লক্ষণ সুস্পষ্ট।

একটি দশ বছরের ছেলে। লাজুক ধরনের। সে সমবয়সী ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে খেলা করতে ভালবাসে না। বাপ-মাও পাড়ায় অন্য ছেলেদের সঙ্গে মেশা পছন্দ করেন না। দামী স্কুলে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এত কান্নাকাটি করে যে তাকে ছাড়িয়ে আনা হয়েছে। সে এখনও নিজে হাতে খেতে পারে না। নিজের জামাজুতো পরতে পারে না। মা নইলে তার এক মুহূর্ত চলে না। ঘুমোবার সময় মাকে তার চাই-ই। এই ছেলেও অব্যবস্থিত। এখানে ছেলের ব্যক্তিত্ব স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠে নি, এবং মার অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা ও স্নেহের প্রশ্রয়ে সে অতিমাত্রায় মায়ের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এটা মানসিক অসুস্থতারই লক্ষণ।

আর এক কানা ছেলে, পাড়ার সব ছেলের সঙ্গে তার ঝগড়া, কারো সঙ্গে তার ভাব নেই। অল্পবয়স্ক ছেলেদের সে অকারণ মারপিট করে। কুকুর বেড়াল গরু সমস্ত জন্তুকে অযথা সে লাঠি দিয়ে আঘাত করে। অতিশয়

নিষ্ঠুর, কলহপরায়ণ তার স্বভাব। অবশ্যই এ ছেলে অব্যবস্থিত—সাধারণ সুস্থ ছেলেমেয়েদের থেকে সে দুঃখজনক ব্যতিক্রম।

নমিতা একটি তেরো বছরের মেয়ে। বাড়ীর অবস্থা তার ভাল। তার পেছনে তার বাবা যথেষ্ট খরচ করেন, অথচ আশ্চর্য কথা, এ মেয়েটি বোর্ডিং-এর অন্য সহপাঠিনীদের চুলের ফিতে, সস্তা পাউডার, পেন্সিল, জেলী এসব জিনিস চুরি করে। কেন যে চুরি করে তা নিজেই সে বলতে পারে না। এ মেয়েও অব্যবস্থিত।

মোটামুটি একথা আমরা বলতে পারি, যারা স্বাভাবিক ভাবে পরিবেশের সঙ্গে বা নিজের সঙ্গে মিলিয়ে চলতে পারে না, যারা অল্পে অসন্তুষ্ট হয়, যারা অযথা উদ্বিগ্ন হয়, অল্প কারণে রাগ করে, যারা দায়িত্ব এড়িয়ে চলতে চায়, যারা স্বচ্ছন্দভাবে জীবনটাকে ভোগ করতে পারে না, যারা অন্যের সুখ দুঃখ অসুবিধার কথা চিন্তা করে না, যারা সদাই অপরাধবোধে বিমর্ষচিত্ত, যারা সহজে মনস্থির করতে পারে না, কুড়ি বছর পর্যন্ত বয়স্ক এমন সব মানুষকেই আমরা অব্যবস্থিত শিশু এই আখ্যা দেব। অবশ্য অব্যবস্থিততার সম্পূর্ণ দোষ বা দায়িত্ব শিশুরই এমন নয়। পরিবেশ এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে শিশুর মৌলিক প্রয়োজনগুলি সেখানে স্বাভাবিকভাবে মিটতে পারে।[১]

এই অব্যবস্থিততা -বিষয়ে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে বহু প্রভেদ আছে। একই অবস্থায় বিভিন্ন শিশু বিভিন্ন ব্যবহারের পরিচয় দেয়। একজনের কাছে যা উৎকণ্ঠার কারণ বা ভয়ের কারণ বা রাগের কারণ, অন্যের কাছে তা নয়। আবার এই অব্যবস্থিততার পরিমাণগত প্রভেদ যেমন আছে গুণগত পার্থক্যও তেমনি আছে।

সমস্ত অব্যবস্থিতারই কোন না কোন কারণ আছে। কোন্ কোন্ অবস্থায় কোন্ কোন্ কারণে এই অব্যবস্থিততা ঘটে, সে অনুযায়ী এদের আমরা শ্রেণী-বিভাগ করতে পারি। এই শ্রেণীগুলি পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এমন নয় (they are not water-tight compartments)। তবে আলোচনার সুবিধার জন্যে এভাবে আমরা বিভাগ করে থাকি।

শিশুর অব্যবস্থিততার শ্রেণীবিভাগ—সঙ্গতির অভাব, মিলিয়ে চলতে না পারাকেই আমরা বলেছি অব্যবস্থিততা (mal-adjusment)।

১ Gates, Jersild etc.—Educational Psychology, p. 616

সঙ্গতি ও অসঙ্গতি হয় ব্যক্তির সঙ্গে বাহ্যপরিবেশের (adjustment or mal-adjustment to the external environment), অথবা ব্যক্তির আন্তর পরিবেশের সঙ্গেই নিজের (adjustment to one's own inner environment)। যে ছেলে সমবয়স্ক অন্য ছেলেদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মিশতে পারে না তার অব্যবস্থিততা প্রথম দলের। আবার যে মেয়েটি অত্যন্ত ছোটখাটো বিষয়েও মনস্থির করতে পারে না, কেবলই অযথা উদ্বিগ্ন হয়, তার অব্যবস্থিততা হচ্ছে দ্বিতীয় দলের।

আবার আর একভাবে বলতে পারা যায় ব্যক্তিত্বের কোন উপাদান (বুদ্ধি, দৈহিক শক্তি, অনুভূতি, সঙ্কল্প ইত্যাদি) সুস্থভাবে বিকশিত না হলে অথবা বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান না হলে যে অসঙ্গতি, ব্যক্তির মিলিয়ে চলবার যে ক্ষমতার অভাব দেখা যায়, তাকে আমরা ব্যক্তিত্ব-ভিত্তিক অব্যবস্থিততা (Personality mal-adjustments) বলে থাকি। এই জাতীয় অব্যবস্থিততার মূল গভীর এবং এর সংশোধনও অনেক কঠিন। অলপোর্ট-এর সংজ্ঞানুযায়ী ব্যক্তিত্ব কতগুলি জন্মগত বিশিষ্ট গুণ বা ধাত এবং বাল্যকাল হতে অনুশীলিত কতকগুলি অভ্যাস-সঞ্জাত এমন কতগুলি প্রতিক্রিয়া যার সাহায্যে ব্যক্তি তার পরিবেশের সঙ্গে এক বিশেষভাবে সঙ্গতিস্থাপন করে এবং যে গুণ- বা অভ্যাস-সমষ্টি আমরা বিবেচনার জন্যে বেছে নিই এবং যা দিয়ে ব্যক্তিত্বে অন্য সকলের থেকে কোন ব্যক্তিকে পৃথক করে নেওয়া যায়।[২]

ব্যক্তিত্বের প্রধান কয়টি উপাদান, যেমন দৈহিক গড়ন, বুদ্ধি, মেজাজ, অনুভূতি ইত্যাদি জন্মগত হলেও এদের উপযুক্ত বিকাশ ও সামঞ্জস্যবিধান অভ্যাস- ও শিক্ষা-সাপেক্ষ। কোন ছেলেমেয়ে যদি নিজ পরিবার বা বিদ্যালয় বা সহপাঠীদের সঙ্গে সহজে মিলেমিশে কাজ ও আনন্দ না করতে পারে তাহলে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে তার ব্যক্তিত্ববিকাশ সুসঙ্গত হয় নি। এর জন্যে তার নিজস্ব ব্যক্তিত্বের উপাদান যেমন কতকটা দায়ী, তেমনি এর অনেকখানি দায় পিতা মাতা শিক্ষক ও সমাজ-পরিবেশকেও গ্রহণ করতে হবে। কোন ছেলের ব্যবহার সুসঙ্গত কিনা তা বিচার করতে গেলে তার

২ Personality is a group of characteristic reactions based upon the native constitution and systems of habit, and selected for observation as exhibiting the typical adjustments of the individual to his environment. Allport—Personality, p. 3

বিকাশের ধারাটি ও স্তরটি ভাল করে লক্ষ্য করতে হবে। এর সংশোধন করতে হলে কেন তার বিকাশ ব্যাহত বা বিকৃত হয়েছে তা বুঝতে হবে। ব্যক্তিত্ব-ভিত্তিক অব্যবস্থিততার মধ্যে আমরা নিম্নলিখিত অসঙ্গতিগুলি বিবেচনা করতে পারি : (ক) দৈহিক বিকলতাজনিত হীনমন্যতা, সমাজজীবন হতে অপসরণ (withdrawal), অকারণ নিষ্ঠুরতা। (খ) বুদ্ধির স্বল্পতা বা বিকৃতির জন্য সঙ্গতিস্থাপন -বিষয়ে নানা ত্রুটি। (গ) অনুভূতির জীবনের স্বাভাবিক ও সুস্থ বিকাশের অভাবজনিত সঙ্গতিস্থাপন -বিষয়ে অসুবিধা।

শিশুর অব্যবস্থিততা তার বাইরের বা প্রতিক্রিয়ার মধ্যদিয়ে প্রকাশিত হয়। কাজেই শিশুর অব্যবস্থিততা আর এক দিক থেকেও বিবেচনা করা হয়। শিশুর অব্যবস্থিত প্রতিক্রিয়া নিম্নলিখিত ক'দিক থেকে বিচার করা যায়—

(ক) খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার নিয়ে নানা যন্ত্রণা (Food problems)।

(খ) মেজাজ-মর্জি এবং সমস্ত আদেশ-উপদেশ -সম্পর্কে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া (temper-tantrums & negativism)।

(গ) পিতামাতার ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা বা বালসুলভ আচরণ।

(ঘ) লিঙ্গ ও দৈহিক ক্রিয়াগুলি -সম্পর্কে অতিরিক্ত কৌতূহল ইত্যাদি।

(ঙ) ঝগড়াঝাঁটি, মারধোর ইত্যাদি উৎপাত।

আরেকভাবেও শিশুর অব্যবস্থিততার শ্রেণীবিভাগ আমরা করতে পারি, তার অবাঞ্ছিত আচরণের ক্ষেত্র দিয়ে যেমন—

(ক) **গৃহে**—পরিবারে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে শিশুর ব্যবহার (পিতা-মাতাকে অতিরিক্ত ভয়, অথবা তাদের একজনের সম্পর্কে গোপন বিদ্বেষ, ঈর্ষা, ঝগড়াঝাঁটি ইত্যাদি)।

(খ) **বিদ্যালয়ে**—বিদ্যালয় -সম্পর্কে অতিরিক্ত ভয়, কোন শিক্ষক বা কোন বিষয় -সম্পর্কে বিরূপতা, অমনোযোগ, পিছিয়ে পড়া, স্কুলে অবাধ্যতা, জিনিসপত্র নষ্ট করা, স্কুল-পালানো, সহপাঠিদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি ইত্যাদি।

ব্যক্তিত্বঘটিত অব্যবস্থিততা—ইন্দ্রিয় বা কোন অঙ্গের বিকলতা- বা বিকৃতি-জনিত শিশুর ব্যবহারে যে নানা প্রকার অবাঞ্ছনীয় লক্ষণ দেখা দিতে পারে এবং বুদ্ধির স্বল্পতার জন্যে যে নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে তা আমরা 'ব্যতিক্রমের বিপদ' অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, অন্ধ, খঞ্জ, ইত্যাদি শিশুরা সাধারণত সমাজের কাছে উপহাস ও করুণার পাত্র

হয় এবং সমবয়স্কদের সঙ্গে সমানভাবে খেলাধুলা পড়াশুনো ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই নিজেদের অক্ষমতা তাদের মনকে পীড়িত করে। নিজের সম্বন্ধে হীনতা-বোধের জন্যে তারা সমাজজীবন থেকে নিজেদের অপসারণ করে নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। সঙ্গে সঙ্গেই সমাজের সুস্থ মানুষদের বিরুদ্ধে তাদের অক্ষম ক্ষোভ জমা হতে থাকে এবং তারা নানা গুপ্ত বা বক্র উপায়ে সমাজকে আঘাত করতে চেষ্টা করে। এতে তাদের ব্যক্তিত্বের সুস্থ বিকাশ সব দিক থেকেই বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং নানা প্রকার অন্যায় ও অবাঞ্ছিত আচরণের মধ্য দিয়ে তাদের অসুস্থ মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

অনুভূতির দিক থেকে সুস্থ স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হওয়ার ফলে শিশুর জীবনে যে অশান্তি ও অব্যবস্থিততা দেখা যায় সেগুলিই মনোবিদ্‌দের মনো-যোগ বেশী আকর্ষণ করেছে। এগুলিকে চারটি প্রধান অনুভূতি বা প্রক্ষোভের সঙ্গে যুক্ত হিসাবে আমরা বিবেচনা করতে পারি।

(১) বাধা বা নৈরাশ্যের সম্পর্কে শিশুর অব্যবস্থিততা সাধারণত রাগ-বিরক্তির মধ্য দিয়েই শিশু প্রকাশ করে। বাধা সকলের পক্ষেই অপ্রীতিকর। কিন্তু সাধারণ সুস্থ শিশুরা নিজের সাধ্য- ও বিবেচনা-মত, এবং প্রয়োজন হলে বড়দের পরামর্শ -অনুযায়ী সে বাধা অতিক্রম করতে চেষ্টা করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশুর সে চেষ্টা সফল হয়, কিন্তু বিফলতাও অনেক সময় স্বাভাবিক ভাবে আসে। সুস্থ ব্যবস্থিত শিশুরা তাতে দুঃখিত হলেও একে অনেকটা সহজে মেনে নেয়। কিন্তু যারা মানসিক অব্যবস্থিত, তারা বাধা বা নৈরাশ্যের সম্মুখীন হলে বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে (অবশ্যই তাদের বয়স অনুযায়ী তাদের বুদ্ধিও অপরিণত, শক্তিসাধ্যও পরিমিত) তার সমাধান না করে তারা অতিরিক্ত ক্রোধপ্রকাশ করে, চীৎকার করে, কান্নাকাটি করে, জিনিসপত্র ভেঙেচুরে তছ্‌নচ্‌ করে।[৩] কোন কোন শিশু যে এরকম বেশী রাগারাগি করে, তার কারণ জন্মগত দৈহিক-মানসিক গড়নের জন্যে হতে পারে, পিতা-মাতার অতিরিক্ত আবদারের ফলেও হতে পারে।

শিশুর ক্রোধ যে সব সময়ই অবাঞ্ছিত তা নয়, বরঞ্চ শিশুর স্বাধীন ব্যক্তিত্ববিকাশের সহায়ক। রাগের মধ্য দিয়ে শিশু তার স্বাধীনতার অধিকারই প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

৩ Gates, Jersild etc.—Educational Psychology, p. 92

গুডেনাফ্ শিশুর **ক্রোধোদ্রেককারী** চারটি **অবস্থার** কথা উল্লেখ করেছেন।[৪] (ক) **স্বাধীন অঙ্গসঞ্চালনে বাধা** অথবা বিপরীত ভাবে তার **ইচ্ছার বিরুদ্ধে কতকগুলি শারীরিক অভ্যাসগঠনের চেষ্টা।** প্রত্যেক প্রাণীই স্বাধীনভাবে অঙ্গসঞ্চালনে বাধা অপছন্দ করে। কিন্তু বাপ-মাকে সভ্য জীবনের প্রয়োজনে এবং কখনো কখনো শিশুকে রক্ষা করবার জন্যেই তার স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা দিতে হয়। শিশু হাত বাড়িয়ে আগুন ধরতে চাইবে, পুষ্করিণীতে নামতে চাইবে, বাবার ফাউণ্টেনপেন্ দিয়ে লিখতে চাইবে—তাতে বাধা দিতে হয়ই। আবার তাকে মুখ ধুতে, যথাস্থানে মলমূত্রত্যাগের অভ্যাস করতে, জুতা জামা পরে 'সাজুগুজু' করে বেড়াতে যেতে শেখাতে হয়। এ সবই তাকে শিখতে হয়, নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে। অধিকাংশ শিশুই এর জন্যে সাধ্যমত প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু বড়দের ইচ্ছার কাছে তাকে নতিস্বীকার করতে হয়। অধিকাংশ শিশুর জীবনে এ প্রকার বাধা এবং বাধার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ভবিষ্যৎ জীবনে কোন অশুভ প্রভাব বিস্তার করে না। যত বড় হয় শিশু ততই বুঝতে পারে পিতামাতা-শিক্ষক তার মঙ্গলের জন্যেই তাকে এমন ভাবে বাধা দেন। কিন্তু সাধারণভাবে এটা বলা যায় শিশুর সব কাজেই বাধা দেওয়া, বড়দের আদর্শ- ও দৃষ্টিভঙ্গী-অনুযায়ী জোর করেই শিশুকে ঢেলে সাজবার চেষ্টার ফল ভাল হয় না। অতিরিক্ত শাসন-নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলে শিশুর স্বাধীন ব্যক্তিত্বের বিকাশ রুদ্ধ হবে এবং হয় সে পিতামাতার ওপর অতিরিক্ত নির্ভরপরায়ণ হয়ে গড়ে উঠবে অথবা অবরুদ্ধ ক্ষোভের ভাব প্রকাশ করবে। ফ্রএড্ এবং তাঁর অনুগামীদের মতে অতি বাল্যকাল থেকেই মলমূত্র যথাস্থানে ত্যাগের জন্যে শিশুর ওপর চাপ দিলে তার ফল ভাল হয় না, বড় বেশী তাদের 'ভদ্র' ভাবে নিম্নাংশ ঢেকে রাখবার জন্যে জোর করলে তাদের কামবৃত্তির স্বাভাবিক সুস্থ প্রকাশের পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয় এবং যোনি ও পায়ু আর তাদের ক্রিয়া সম্বন্ধে শিশুদের অকালে কৌতূহলী করে তোলা হয়। শিশুর ব্যক্তিত্বের সুস্থ বিকাশে ক্রোধরূপ মৌলিক প্রক্ষোভের গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে, এটি স্বীকার করা প্রয়োজন। যথাস্থানে যথাকালে যথোপযুক্ত বিষয়ে যাতে সে ক্রোধ প্রকাশ করতে পারে সে দিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে। অপরিমিত, ধ্বংসাত্মক ক্রোধ অন্ধ ও বিচারহীন। এ জাতীয় নির্বোধ ক্রোধ ব্যক্তিত্বের বিকাশের নিম্নস্তরে স্বাভাবিক। কিন্তু বিকাশের নিয়ম-অনুযায়ীই

৪ Goodenough—Anger in Young Children, pp. 9-11

শিশু পাঁচ-ছয় বছরের চেয়ে বড় হলে তার রাগটা তেমন অন্ধ ও ধ্বংসাত্মক না হয়ে, বাধা কি করে দূর করা যায়, বিচার -দ্বারা তা নির্ধারণের এবং উপায়-উদ্ভাবনের চেষ্টা করে। সে পরীক্ষা করে-করে দেখে কি করে বাধা দূর করা যায়, সমস্যার সমাধান করা যায়। সুতরাং, বাধার সম্মুখীন হলে দশ বছরের ছেলের প্রতিক্রিয়া একেবারে ছোট শিশুর মতো নির্বোধ হওয়া উচিত নয়। কিন্তু বাধার সম্মুখীন হয়ে তার ব্যবহার যদি পাঁচ বছরের ছেলের মতো অবুঝ ও ধ্বংসাত্মক হয়, তবে সে ছেলের প্রতিক্রিয়াকে অব্যবস্থিত বলতে হবে। যত শিশু বড় হবে ততই সে বুঝতে পারবে যে এই প্রকার অন্ধ প্রতিক্রিয়া সমস্যা-সমাধানে সহায়ক নয়। তাই বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মিথ্যা রাগারাগি করার স্বভাব ক্রমে পরিবর্তিত হয়।

অনেক সময়ই শিশুর রাগের মূলে আছে নিজের অক্ষমতা -বিষয়ে চেতনা। শিশু যতই সফলভাবে নিজের সম্মুখের সমস্যার নিজে সমাধান করতে পারবে ততই তার আত্মপ্রত্যয় বাড়বে, এবং সে আর আগের মতো মিছামিছি রাগ করে মাটিতে গড়াগড়ি দেবে না অথবা ঘরের জিনিসপত্র ভাঙ্গাচোরা করবে না। কাজেই যে সব ছেলের মধ্যে এ প্রকার অব্যবস্থিততা দেখা যায়, তাদের এমন কাজ বা খেলনা দেওয়া দরকার, যার মধ্য দিয়ে নিজের সৃজনীক্ষমতা রচনাত্মক ভাবে সে প্রকাশ করতে পারে। বাগানের কাজ, বিল্‌ডিংব্লক্‌স্ বা বালি, কাদা দিয়ে ঘর-বাড়ী তৈরি করার কাজ, ছবি আঁকার কাজ এই জন্যেই বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের পক্ষে ভাল। যে সব খেলাধুলায় নিজের কৃতিত্ব সে দেখাতে পারে এমন খেলাধুলাও এ জাতীয় অব্যবস্থিত শিশুদের সংশোধনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

যে সমস্ত শিশুরা নিজেদের স্নেহবঞ্চিত বলে বোধ করে অনেক সময় তারা এ জাতীয় ব্যবহারের দ্বারা নিজেদের প্রতি পিতামাতার (বিশেষত মাতার) দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় (attention-getting)। ছোট হলেও শিশুরা অন্ধ রাগের নাটকীয় মূল্য (dramatic value) বেশ বোঝে। কান্নাকাটি রাগারাগি করলে কাজ আদায় হয় এটা যদি শিশু একবার বোঝে, তা হলে নির্বিচারেই এই অস্ত্রটি ব্যবহারে সে উৎসাহিত হবে। কাজেই পিতামাতার এ বিষয়ে সাবধান হতে হবে। যেখানে শিশুর নৈরাশ্য ও রাগের সঙ্গত হেতু আছে তা অবশ্যই দূর করতে হবে, কিন্তু কাজ আদায়ের মতলবে শিশু যদি এটা ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয় তবে পিতামাতাকে শক্ত হতে হবে।

অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই শিশু শেখে যে পৃথিবীতে যা-কিছু চাওয়া যায় তা সবই পাওয়া যায় না, সব বাধা কাঁদাকাটা রাগারাগি করলেই দূর হয়ে যায় না। পিতামাতা-শিক্ষককেও এই শিক্ষা দিতে হবে যে রাগ করে কাজ হাসিল করা একপ্রকারের কাপুরুষতা এবং পৃথিবীতে পৌরুষ -দ্বারাই, বুদ্ধিবিচার -দ্বারাই বাধা অতিক্রম করতে শিখতে হবে। সে পৌরুষের অঙ্গ হিসাবে ক্রোধেরও স্থান আছে, কিন্তু অন্ধ ক্রোধের নয়। এ কথাও শিশুকে শেখাতে হবে যে সব বাধা অতিক্রম করা যায় না—ধৈর্য ধরে সহ্য করতে হবেই।

(খ) **বেদনা, দুঃখ, সমালোচনা, শাস্তি -বিষয়ে অব্যবস্থিত প্রতিক্রিয়া** —শারীরিক আঘাত, বেদনা অপ্রীতিকর; শাস্তি, সমালোচনাও অপ্রীতিকর। এগুলি আমরা এড়াতে চাই (avoidance)। এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া ভয়। যা আমাদের আঘাত করে, যে আমাদের শাস্তি দেয়, সে প্রবল—কাজেই তাকে ভয় করি। প্রকৃতির শক্তিগুলি সম্পর্কে শিশুর ধারণা অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ, কাজেই অসভ্য গুহাবাসীদের মতো শিশুর কাছেও প্রকৃতির শক্তিগুলি রহস্যময়, ভীতিপ্রদ। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর অনেকগুলি ভয় কেটে যাবে। শিশু শিখবে প্রকৃতির শক্তিগুলিকে মানুষ নিজের প্রয়োজনে কাজে লাগাতে সক্ষম। তাদের প্রকৃতি জানা হয়ে গেলে তাদের সম্বন্ধে অহেতুক ভয়ও কেটে যায়। আবার শিশুর কাছে আগুন, জল, খোলা ইলেকট্রিক্ তার, ব্লেড্, সাপ ইত্যাদি স্বাভাবিক ভাবে কোন ভয় উদ্রেক করে না এবং শিশু তাদের এড়ায় না। কিন্তু এদের বিপদ সম্পর্কে শিশুকে শিক্ষা দিতে হয়, সাবধান করতে হয়।

ভয় আত্মরক্ষার একটি প্রধান উপায়। কাজেই ভয় মাত্রই নিন্দার নয়। কিন্তু অকারণ মিথ্যা ভয়, অতিরিক্ত আত্ম-অবিশ্বাস সুস্থ স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া নয়। অসুস্থ মনের এই অকারণ নানারকম ভয় (phobia) নিয়ে অন্যত্র আলোচনা করেছি। এ প্রকার অকারণ ভয় জীবনে সফলতার পথে মস্ত বাধা। ভয় জয় করতে শেখা সুশিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ। ভয়ের মস্ত দোষ তা ব্যক্তিত্বকে সঙ্কুচিত করে, ব্যক্তির আত্মপ্রত্যয়ের মূলকে শিথিল করে।

পিতামাতা-শিক্ষক আমাদের শাস্তি দেবার ক্ষমতা রাখেন, তাই তাঁদের আমরা ভয় করি। এটা স্বাভাবিক এবং সুস্থ ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পক্ষে এর প্রয়োজনও আছে। তেমনি সমাজে বাস করতে গেলে সমালোচনা এড়াবার উপায় নেই। যত অস্বস্তিকর বা বিরক্তিকর হোক্ শাস্তি বা সমালোচনা

সহ্য করবার কিছু শক্তি না থাকলে চলে না। যে শিশু অব্যবস্থিত, সে শাস্তি বা সমালোচনা তার প্রতি অকারণ ব্যক্তিগত আক্রোশজাত, এ কথা মনে করে ক্ষুব্ধ হয়। শাস্তি বা সমালোচনা তার নিজ ত্রুটির জন্যেই প্রাপ্য, এ কথা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে এ জাতীয় অব্যবস্থিত শিশুর নিজের মনের মধ্যে হীনতাবোধ থাকে বলেই সে নিন্দা বা সমালোচনায় অতিরিক্ত বিচলিত হয়। যারা গুরুতর অব্যবস্থিত, তারা শাস্তি বা নিন্দাকে বিশেষ কোন কর্ম বা ঘটনার সঙ্গে যুক্ত না করে সাধারণ ভাবে সমস্ত কর্তৃপক্ষ সম্পর্কেই বিদ্বিষ্ট হয়ে পড়ে (resentment against all authority)। এতে করে তাদের নিজেদের ত্রুটি -সম্পর্কে তারা অচেতন হয় এবং নিজের সংশোধনের পথে নিজেই বাধা সৃষ্টি করে। স্বচ্ছ বিচারবুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত করে ভয়ের বস্তু সম্পর্কে একটি যুক্তিসঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গী গঠন করতেই শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে।

স্বাভাবিক ভাবে শিশুর ভয়ের বস্তু বেশী নয়। কিন্তু কুশিক্ষার ফলে শিশুর মনে জুজুর ভয়, অন্ধকারের ভয় ইত্যাদি অকারণ ভয় বাসা বাঁধে।

ভয় আত্মরক্ষার একটি উপায় বটে কিন্তু ভয় ব্যক্তিত্ব-সঙ্কোচক এবং তা অতিরিক্ত হলে যুক্তিবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে এবং সুসমঞ্জস ও সফল পেশী-সঞ্চালন রুদ্ধ করে। ফলে তা আত্মরক্ষার পথ নির্দেশ না করে, বরং প্রাণীর আত্মরক্ষা -রূপ উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আধুনিক মানুষ তাই ভয়কে প্রশ্রয় দেওয়ার বিপক্ষে। ভয় অজ্ঞানতারই ফল। বিজ্ঞানের বলে মানুষ আজ প্রকৃতির রহস্যকে জেনেছে, প্রকৃতির শক্তিকে আজ তার নিজ প্রয়োজনে ভৃত্যের মতো ব্যবহার করতে শিখেছে। তাই মানুষ আজ ভয়কে কাপুরুষতা বলেই ঘৃণা করে। রাসেল্-এর মতে ভয়ই মানুষের বড় হওয়ার পথে শ্রেষ্ঠ বাধা। আজ প্রকৃতির শক্তিকে ভয় করবার তার কারণ নেই, কিন্তু বুদ্ধিহীন সমাজ ও অর্থনৈতিক কুব্যবস্থার ফলে অনেক কৃত্রিম কারণে আজ সে ভয়ের তাড়নায় ক্লিষ্ট। উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সুব্যবহার -দ্বারা মানুষ তার শ্রেষ্ঠ শত্রু ভয়কে অবশ্যই জয় করতে পারে এবং নির্ভীক সবল এক নতুন মনুষ্যসমাজ সৃষ্টি করতে পারে। তাঁর মতে শিশুদের মনে ভয় জয় করবার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে তার অহঙ্কার ও আত্মমর্যাদাকে জাগ্রত করা। তাঁর মতে শিশুর মনে ভয় দূর করতে হলে কিছুটা পরিমাণ নির্মমতা ও জোরজবরদস্তি অন্যায় নয়। সাঁতার শেখাতে হলে শিশুর জলে ডুবে যাওয়ার

ভয়কে কিছুটা নিষ্ঠুর হয়েই দূর করতে হবে। জলে ফেলে দিলে সে কিছু জল খাবে, অস্বস্তি বোধ করবে, তবু তাকে জলে হাবুডুবু খাইয়েও সাঁতার শেখাতে হবে। বেশী মমতা করলে শিশু কোনদিনই সাঁতার শিখবে না।[৫] রিভার্স মনে করেন যে ভয় অতিক্রম করবার একটি উপায় হচ্ছে নানাপ্রকার অঙ্গ-সঞ্চালন[৬] এবং রাসেল্ তাই ভয়জয়ের শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে ছোট বয়েস থেকেই যন্ত্রচালনা শিক্ষাদানের পক্ষপাতী। এতে শিশুর আত্মবিশ্বাস বর্ধিত হয়, তার ভয় দূর হয়। শিশুর মনের ভয় দূর করতে হলে পিতামাতা-শিক্ষককেও নির্ভয় হতে হবে।

ক্রোধ ও ভয় মৌলিক দুটি প্রক্ষোভ। সুতরাং এদের স্বাভাবিক প্রকাশেরও প্রয়োজন আছে। মনোবিদ্‌দের মতে এই দুইটি তীব্র প্রক্ষোভের স্বাভাবিক প্রকাশের পথ বারে-বারে রুদ্ধ হলে, অবদমন-জনিত নানা মানসিক ব্যাধি দেখা দিতে পারে। ক্রোধ-অবদমনের চেয়ে ভয়ের অবদমন মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অধিকতর হানিকর।

(গ) **প্রীতি-ভালবাসা -বিষয়ে অব্যবস্থিততা**—শিশুর জীবনের সুস্থ বিকাশের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় প্রয়োজন বুক দিয়ে ঢেকে-রাখা অপরিমেয় স্নেহ ও ভালবাসা। এর অভাবে শিশুর অনুভূতি ও বুদ্ধির জীবনে যতখানি অব্যবস্থিততা দেখা যায়, তেমন আর কিছুতে নয়। হ্যাড্‌ফিল্ড চমৎকার ভাবে দেখিয়েছেন, পিতা-মাতা-ভাই-বোন-আত্মীয়জনের ভালবাসা কি ভাবে তার জীবনের সর্বপ্রধান প্রয়োজনগুলি মেটায় এবং তার জীবনের বিভিন্ন দিকের সুস্থ সম্পূর্ণ বিকাশে সহায়ক হয়। যেখানে শিশু প্রচুর ভালবাসা পেয়ে তৃপ্ত সেখানে সে নিরাপদ বোধ করে, সেখানে সে নিশ্চিন্ত। এর অভাব ঘটলে সে উদ্বিগ্ন বোধ করে, এবং তার প্রকাশে মেজাজ-মর্জি, ঈর্ষা, নেতিবাচকতা (negativism) ইত্যাদি অব্যবস্থিত ব্যবহার দেখা যায়। **যেখানে শিশু**

৫ The use of force in education should be very rare. But for the conquest of fear, it is, I think, sometimes salutary. Where the fear is irrational and strong, the child, left to himself, will never have the experiences which show that there is no ground for apprehension···If the necessary experience can be secured without force, so much the better ; but if not, force may be better than the persistence of an unconquered fear. Russell—On Education, p. 88

৬ Dr Rivers—Instinct & the Unconscious, p. 54

যথোপযুক্ত স্নেহ-ভালবাসা পায় সেখানে সে আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ হয়। যে শিশু অতিরিক্ত প্রশ্রয় পেয়ে নষ্ট হল সে স্নেহের জন্যে নষ্ট হয় নি। সে প্রথমে পেয়েছে সুপ্রচুর স্নেহ। তাতে তার প্রত্যাশা গেছে বেড়ে। কিন্তু ভবিষ্যতে সে প্রত্যাশা পূরণ হয় নি এবং তার প্রাপ্য স্নেহের অভাব কল্পনা করেই তার এই মানসিক অশান্তি।[৭]

ফ্রএড্-এর মতে সমস্ত স্নেহ-ভালবাসাই কামজ, যৌন-কেন্দ্রিক। শিশুকে স্নেহ-ভালবাসার মধ্যেও চুমু খাওয়া, কোলে নেওয়া, আদর করা ইত্যাদি দৈহিক দিকটি খুবই সুস্পষ্ট। ফ্রএড্-এর উক্তি অর্ধ সত্য মাত্র। শিশুকে স্নেহ-ভালবাসার মধ্যে প্রধান দিক হচ্ছে অসহায়কে রক্ষা। শিশুর সুস্থ বিকাশের পক্ষে পিতামাতার স্নেহ-ভালবাসার এই দিকটাই প্রধান যে এর মধ্যে শিশুর নিরাপত্তাবোধ তৃপ্তিলাভ করে। এই নিরাপত্তাবোধ ধ্বংস বা বিঘ্নিত হয় বলেই শিশুর ব্যবহারে অব্যবস্থিততা দেখা দেয়। যৌনাকাঙ্ক্ষা তৃপ্তি বা অতৃপ্তির সঙ্গে এর যোগ নিতান্তই গৌণ।

বিভিন্ন প্রক্ষোভের অসামঞ্জস্যের পরস্পর যোগ

শিশুর জীবনের বিভিন্ন অনুভূতির বিকাশ পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত; শুধু তাই নয়, সমগ্র ব্যক্তিত্বই এক অবিভাজ্য সত্তা। কাজেই কোন এক অনুভূতির ক্ষেত্রে অব্যবস্থিততা সেই অনুভূতির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তা অন্যত্রও গোলযোগ সৃষ্টি করে। আবার সেই অব্যবস্থিততা অনুভূতির ক্ষেত্রকে অতিক্রম করে বুদ্ধি ও ইচ্ছাকেও আক্রমণ করে। যেমন ভালবাসা ও ক্রোধের মধ্যে সম্বন্ধে স্পষ্টই দেখা যায় যেখানে স্নেহ-ভালবাসার অপ্রাচুর্য, সেখানে শিশু তার বঞ্চিত হৃদয়ের পিপাসা মেটাবার জন্যে নানা কৌশল অবলম্বন করে (attention-getting devices)। তাতে সফল না হলে সে মেজাজ-মর্জি প্রকাশ করে, রাগারাগি-ঝগড়াঝাঁটি করে। আবার অতিরিক্ত স্নেহ-আদর দিলে শিশুর স্বাধীন ব্যক্তিত্ববিকাশ ব্যাহত হয়, সে অতিমাত্রায় পরনির্ভর হয়ে পড়ে। এতে তার চরিত্র দুর্বল হয়, সে বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিতে সমস্যাগুলি বিচার করতে শেখে না। তাতে তার বুদ্ধির বিকাশ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ভালবাসা ও নিরাপত্তাবোধের অভাব থেকে শিশুর মনে ভয় ও দুশ্চিন্তা বাসা বাঁধে। বিভিন্ন অনুভূতির মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকলে

৭ Adler—Individual Psychology, p. 203

ব্যক্তিত্বের সুসমঞ্জস ঐক্য বিঘ্নিত হয়। যে ছেলে মায়ের কাছে অতি আদর আর বাপের কাছে অতি গঞ্জনা লাভ করে, সে শিশু দিশেহারা হয়ে যায় এবং জীবন -সম্বন্ধে একটি সুসমঞ্জস দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সে বড় হয়ে উঠতে পারে না। যেখানে শিশু একদিকে পায় উৎসাহ আর অন্যদিক থেকে সর্বদা পায় বাধা, সেখানেও শিশু একটি সুসঙ্গত ব্যক্তিত্বে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে না।

(ঘ) যৌন-অনুভূতি -বিষয়ে অব্যবস্থিততা

যাঁরা ফ্রএডীয় মনঃসমীক্ষণে বিশ্বাসী, তাঁরা মনে করেন যৌনাকাঙ্ক্ষার পরিধি যথেষ্ট ব্যাপক এবং জীবনের সমস্ত উদ্যম ও আকাঙ্ক্ষার পশ্চাতে এই মৌলিক শক্তি ক্রিয়া করে। শিশুর স্তন্যপান -রূপ জীবনের প্রথম ক্রিয়াও আদিম কামাকাঙ্ক্ষারই একটি প্রকাশ। তাঁর মতে শিশুর যৌনাকাঙ্ক্ষার সহজ স্বাভাবিক পরিতৃপ্তি না ঘটলে, তার ভবিষ্যৎ জীবনে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থাকে। এই যৌনাকাঙ্ক্ষার বিকাশের কয়েকটি নির্দিষ্ট স্তর আছে। একেবারে বাল্যে এ স্তর সম্পূর্ণই দেহকেন্দ্রিক—মার স্তন্যপান, আলিঙ্গন, দোলানো, আদর এ সবই আদিম কামাকাঙ্ক্ষার রূপ। আর একটু বড় হলে সে শিশু নিজ দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পর্কে এবং প্রস্রাব মলত্যাগ ইত্যাদি ক্রিয়া সম্পর্কে কৌতূহলী হয়। এ স্তর সম্পূর্ণই দেহভিত্তিক। এ স্তরের সম্যক সুস্থ প্রকাশ না হলে, তৃপ্তির উপায় হিসাবে নিজ দেহের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তিকে (narcissism) সে আশ্রয় করে।[৮]

এর পরের স্তরে আমরা দেখতে পাই শিশু পিতা বা মাতাকে বেশী আঁকড়ে ধরতে চায়—তাঁদের সব রকমে অনুকরণ করতে চায়। শিশুর সমাজজীবন গঠনের পক্ষে এর প্রয়োজন আছে। এই স্তরে স্বভাবতই শিশু পিতামাতার পরিচালনা আকাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু যদি তাঁরা শিশুর স্বাধীন ব্যক্তিত্ব অস্বীকার করেন, তাকে সব ছোটখাট ব্যাপারেও পরিচালনা করতে চান, তা হলে শিশু বড় বেশী আঁচলধরা ও পরনির্ভর হয়ে পড়ে এবং বড় হয়েও

[৮] Narcissism: extreme self-love; regarded by psychoanalysts as an early phase of psycho-sexual development, where the sexual object is the self; in all cases of narcissism the excessive pre-occupation with oneself and one's own concerns is the essential characteristic. Drever—Dictionary of Psychology

এ ছেলে নিজের দায়িত্ব নিতে সক্ষম হয় না। এতে সবল ব্যক্তিত্ব গঠন ব্যাহত হয়। যেসব ছেলে স্বভাবত সবল প্রকৃতির, তারা পিতামাতার অতিরিক্ত শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, দৌরাত্ম্য-উৎপাত করে, তাদের নেতিবাচক ব্যবহার ও অবাধ্যতা দেখা যায়। এ স্তরে শিশুর যৌন-অনুভূতির সুস্থ পরিতৃপ্তির পথ না থাকলে ছেলে মার প্রতি অতিরিক্ত আসক্ত এবং পিতার প্রতি প্রচ্ছন্ন ভাবে বিদ্বিষ্ট হয়ে গড়ে ওঠে (Oedipus complex) আর মেয়ে পিতার প্রতি অতিরিক্ত আসক্ত এবং মাতার প্রতি গোপন বিদ্বেষ পোষণ করে (Electra complex)। এ প্রকারের মনোভাব সুস্থ মনের পরিচয় নয়। পিতামাতার পরস্পরের মধ্যে প্রীতি-ভালবাসার স্বাভাবিক সম্বন্ধের যেখানে অভাব, সেখানে শিশুর যৌন-অনুভূতিও বিকৃত হবার আশঙ্কা থাকে।

এর পরের স্তরে শিশু পশুপাখী ইত্যাদিকে ভালবাসতে শেখে এবং সমবয়স্ক অন্য শিশুদের সঙ্গে মিলেমিশে খেলা করতে ইচ্ছা করে। এ বয়সে অন্যান্য শিশুর সঙ্গ শিশুর সুস্থ বিকাশের পক্ষে প্রয়োজন। শিশু স্বভাবত আত্মকেন্দ্রিক—নিজেকে নিয়েই সে মত্ত। কিন্তু এই স্তরে সে নিজের খোলস ছেড়ে বাইরের বৃহত্তর জগতের সঙ্গে পরিচয় করতে চায়। তবে এ স্তরেও সে মূলত আত্মকেন্দ্রিক। সে বিনা লজ্জায় অন্য শিশুর বল খেলনা ইত্যাদি কেড়ে নিতে প্রস্তুত। এখানে অবশ্যই অন্য শিশু তাকে বাধা দেবে এবং কিছুটা কাড়াকাড়ি স্বাভাবিক। তবে সমাজজীবনের শিক্ষা এ বয়স থেকেই শুরু, তাই পিতামাতা তাকে 'অন্যের জিনিস ধরতে নেই' এই কথা শাসন-তাড়নার মধ্য দিয়েও বোঝাতে চেষ্টা করেন। আবার কোন কোন শিশু স্বভাবতই ভীরু, লাজুক ও অসামাজিক, তারা অন্য শিশুর সঙ্গে মিশতে চায় না। অনেক সময় এর জন্যে পিতামাতাও দায়ী। তাঁরা নিজের ছেলে-মেয়েদের, তারা নষ্ট হয়ে যাবে এই ভয়ে, অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশতে দেন না। এতে করে কিন্তু ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিক সুস্থ বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এর পরের স্তরে শিশু তখন যৌবনের প্রান্তে উপনীত হয়েছে সে ভিন্নলিঙ্গ ব্যক্তির প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে। এ সময় অনুভূতি ও যৌন-চেতনা প্রবল হতে আরম্ভ করে এবং বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন না করলে যথেষ্ট ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। এ বয়সে যৌন-আকর্ষণ স্বাভাবিক, কিন্তু সুস্থ সামাজিক

আদর্শ -দ্বারা এ বয়স থেকে এই আকর্ষণকে নিয়ন্ত্রণ করতে না শিখলে ব্যক্তি নিজের ও অন্যের সমূহ বিপদের কারণ হতে পারে। এ বয়সে যৌন -বিষয়ে অতিরিক্ত কৌতূহল এবং অতিরিক্ত উত্তেজনা ব্যক্তির সুস্থ সম্যক বিকাশের পক্ষে ক্ষয়কারক। অন্য দিকে যৌন-বিষয় -সম্পর্কে অতিরিক্ত গোপনতা এবং অতিরিক্ত শাসনের ফলও শুভ নয়। বাধা পেলে এ কৌতূহল বরং আরো প্রবল বিকৃত রূপ নেয়। সুতরাং পিতামাতাকে এ বিষয়ে কৌতূহল স্বাভাবিক বস্তুনিষ্ঠ ভাবে মেটাবার ব্যবস্থা যেমন করতে হবে, তেমনি অনিয়ন্ত্রিত যৌন-চেতনার বিপদ -সম্পর্কেও তাদের অবহিত করতে হবে। মনে রাখতে হবে এ বয়সে ব্যক্তির আত্মাভিমান প্রবল এবং নৈতিক আদর্শের প্রভাবও এই বয়সে গভীর। এই বয়সের এটাই রক্ষাকবচ। বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান এবং আত্মমর্যাদা ও শুচিতার আদর্শের আবেদন দিয়েই যৌবনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত কিশোরদের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়ে রক্ষা করা সম্ভব।

(ঙ) **যৌন-ব্যবহারে অসুস্থতা**—শিশুদের বেলায় যৌন অপরাধের (sexual offences) কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু আগেই দেখেছি তাদের যৌনজীবন আছে, যৌন-অনুভূতির বিকাশ আছে। যেখানে সেই বিকাশ স্বাভাবিক ভাবে হয় না, সেখানে নানা প্রকারের বিকার ঘটতে পারে।

পূর্বে যোনি-সম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপারই মানুষ অত্যন্ত গোপনীয় এবং কুৎসিত বলে মনে করত। কিন্তু আধুনিক মনোবিদ্ অনেকটা সংস্কার ও আবেগমুক্ত মন নিয়ে বস্তুনিষ্ঠভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করার পক্ষপাতী। তাঁদের মতে যোনি জীবনের একটি তীব্র উত্তেজনা ও তৃপ্তির কেন্দ্র। এই কেন্দ্র থেকে তৃপ্তি-আহরণ মানুষের পক্ষে সবচেয়ে সহজ। অধিকাংশ যৌন-অপরাধের মূলে আছে এই সহজ আদিম জৈব উপায়ে মানসিক উদ্বেগ, অশান্তি, হীনতাবোধ, সংঘাত-নিরসনের চেষ্টা (a tensional outlet)। সুতরাং এ জাতীয় অপরাধ -সম্পর্কে পূর্বে যে কঠোর নিন্দাত্মক নীতিগত বিচারের অভ্যাস ছিল, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী তার চেয়ে অনেকটা পৃথক। আধুনিক বিচারক এই জাতীয় অপরাধকে অন্য দশটি অপরাধ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে দেখেন না এবং এর বিচারে অপরাধীর মানসিক সংঘাতের প্রকৃতি বুঝতে চেষ্টা করে তা নিরসনের পক্ষপাতী।

শিশুদের যে যৌন-ব্যবহার পিতামাতাকে উদ্বিগ্ন করে তা হল এই যে শিশুরা কখনো কখনো নিজেদের লিঙ্গস্থানে হাত দিতে, তা নিয়ে নাড়াচাড়া

করতে এবং তা থেকে তৃপ্তিলাভ করতে চেষ্টা করে, একে বলা হয় হস্তমৈথুন (masturbation)। পিতামাতা এটা অত্যন্ত ঘৃণ্য ও লজ্জাকর ব্যবহার বলে মনে করেন এবং শিশুকে এ থেকে নিরস্ত করতে ব্যস্ত হন। কখনো কখনো এ ব্যাপার নিয়ে শিশুকে তাঁরা ধমকধামক করেন এবং এর ভয়ঙ্কর কুফলের সাংঘাতিক চিত্র শিশুর কল্পনার সামনে তুলে ধরেন। কিন্তু আধুনিক শিশু-মনোবিদ্ ও চিকিৎসকেরা মনে করেন যে এ অভ্যাস আঙ্গুল চোষার মতোই বিরক্তিকর হলেও বাস্তবিকপক্ষে সাংঘাতিক ক্ষতিকর নয়। এ অভ্যাস সার্বজনীন এবং শিশুর জীবনের অমীমাংসিত কোন সংঘাত বা অশান্তির দ্যোতক। এ নিয়ে শিশুকে তাড়না বা পীড়ন করলে এ অভাস বেড়েই যাবে এমন আশঙ্কা আছে। এটা লক্ষণীয় যখন 'শিশুর শান্ত নিরুত্তাপ জীবনে অনভ্যস্ত উত্তেজনা, বিরক্তি, অস্বস্তি আসে তখনই আঙ্গুল চোষা, শয্যামূত্র (enuresis) অথবা হস্তমৈথুন -রূপ ব্যবহারগুলি দেখা দেয়। জোর করে এ অভ্যাস বন্ধ করতে চেষ্টা করলে ফল ভাল হয় না। পিতামাতার উচিত এ ব্যাপার শান্ত বস্তুনিষ্ঠ অনুদ্বিগ্ন ভাবে দেখা এবং যে প্রতিকূল অবস্থাগুলির ফলে শিশুর এই কদভ্যাস দেখা দিয়েছে তা দূর করে শিশুকে শান্ত করা। চার-পাঁচ বছরের পর শিশুর নিজের চেষ্টাতেই এই অভ্যাস (সমাজ-নিন্দার চাপে এবং জীবনে আরো বহু বিষয়ে আগ্রহতৃপ্তির উপায় আয়ত্ত হওয়ার ফলে) সাধারণত দূর হয়। অবশ্যই পিতামাতার দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে এটি অভ্যাসে পরিণত না হয়। কৈশোরে, যৌবনাগমে, এমন কি বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যেও এ কদভ্যাস দেখা যায়, তখন এটি স্বেচ্ছাকৃত এক প্রকারের পলায়নপরতা। এর শারীরিক ফলাফল (যদি এ কদভ্যাস নিয়মিত হয়ে না দাঁড়ায়) খুব বেশী হানিকর নয়, কিন্তু এর সঙ্গে লজ্জা ও পাপবোধ জড়িত থাকে তা মানসিক সুস্থতার পক্ষে অবশ্যই হানিকর।[৯]

৯ এ বিষয়ে দুজন আধুনিক মনোবিদের মত উদ্ধৃত করা যাচ্ছে—"...I think of the relief of tension by masturbation in the same kind of way as thumb-sucking. In most cases it is quite unnecessary to check it, for the child himself will deal with it appropriately. But if at the age of four or five he still masturbates frequently in the presence of the parents, he is giving a signal of psychic distress and telling them that some difficulty has arisen which prevents him from using his energy in ordinary play. A change of nurse or house often sets up transient trouble of this sort which is relieved as the child finds new interests, so that a kitten or a tortoise in the nursery helps

যৌবনাগমে যৌনতার বিকৃতি—যৌবনাগমে যৌন-আকাঙ্ক্ষা ও বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ ব্যক্তি প্রথম সচেতনভাবে বোধ করে। উপযুক্ত পরিবেশ ও সহৃদয় অথচ বুদ্ধিদীপ্ত শাসনের অভাবে এ বয়সের কৈশোর-উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের নানা প্রকার বিকৃতি দেখা দিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে জন্মগত দৈহিক-স্নায়বিক-মানসিক ত্রুটি এ বিকারের জন্য দায়ী।

যৌবনাগমের পূর্বেই আট-দশ বছরের ছেলেমেয়েরা (বিশেষত ছেলেরা) লিঙ্গ-সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে ওঠে। এ সময় পিতামাতার সতর্ক শাসন না থাকলে এই নির্দোষ কৌতূহল বড় বিকৃতরুচি অন্য ছেলেদের প্ররোচনায় ও অনুকরণে বিলসনকাম (exhibitionism) এবং তদপেক্ষাও গুরুতর কদভ্যাস সমকামিতা (homosexuality) ও পায়ুকামিতায় (perverted sexuality, sodomy) পরিণত হতে পারে। সুখের বিষয় সামাজিক ও

some children through their difficult time and new supplies of plasticine or crayons help others.

Supposing that compulsive masturbation lasts over a long period, it is an indication that the child's fantasies are painful enough to cause him severe emotional strain...It seems sensible to think of prolonged masturbation as a disability and to offer the child alternative pleasures; if, however, he cannot relinquish any of his genital stimulation it is unprofitable to nag about it, and a system of rewards and punishments will only add to his fear about the fantasies associated with it. Middlemore—"The Uses of Sensuality" in On the Bringing up of Children by five Psychoanalysts, pp. 82-83

...A recent view is that masturbation not only does not do harm, but that excessive efforts on the part of parents to stop or prevent it actually may in themselves be harmful. We should like to quote Dr Redlich of Yale on this subject. He gives...the following possible arguments for ignoring this activity when it does occur...First there is no danger that our child will suffer physical harm from a limited amount of musturbation. The old wives tales about its causing blindness, insanity, bad complexion and what not, have been scientifically disproved, Secondly, there is the danger that an emotionally charged parental forbidding of the child's touching himself may result in such repression of the child's sexual urge that when grown up he may not be able to function normally in this respect. Thirdly, there is comparable danger that the child may develop terrible self-loathing and lack of confidence when he finds he cannot (when half-asleep) completely keep himself from doing what he has been so forcefully told is unnatural and vile. Fritz Redlich and June Bingham—The Inside Story—Psychiatry and Everyday Life, p. 145ff.

পারিবারিক কঠোরতর শাসন ও নিয়ন্ত্রণের ফলে মেয়েদের মধ্যে এই কুৎসিত অভ্যাসগুলি কমই দেখা যায়। আট-দশ বছরের পর হতেই ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে খেলাধুলা, বেড়ানো, ইত্যাদিতে স্বাভাবিকভাবে আনন্দলাভ করে। এই স্বাভাবিক ক্রিয়াগুলি সুস্থভাবে যাতে পরিচালিত হয় তা দেখা এবং কিশোরদের সুপরিচালনার দায়িত্ব পিতামাতা ও শিক্ষকের। এ বয়সের ছেলেমেয়েরা যাতে পড়াশোনা, গঠনাত্মক ক্রিয়া (বাগান করা, হাতের কাজ ইত্যাদি), খোলা মাঠে দৌড়ঝাঁপ, খেলাধুলা করবার যথেষ্ট সুযোগ পায় তা গুরুজনদের দেখতে হবে। তাদের সন্তানেরা যাতে বদমায়েস বড় ছেলে-মেয়েদের কুপ্রভাবে না পড়ে, সেদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতে হবে। যে সমস্ত ছেলেমেয়েদের মধ্যে যৌনতা -বিষয়ক কুৎসিত রুচি দেখা যায় তারা অনেকেই বুদ্ধির দিক দিয়ে হীন (mentally inferior) এবং এরা জন্মগত স্নায়বিক ও অনুভূতি -বিষয়ক অস্থিরতা-সম্পন্ন (congenital nervous and emotional instability)। এদের বিশেষজ্ঞ -দ্বারা চিকিৎসা প্রয়োজন।

সমকামিতার অপেক্ষাকৃত নির্দোষ রূপ—সমলিঙ্গ দুই ব্যক্তির পরস্পরের প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষণ,পরস্পর চুম্বন-আলিঙ্গন ইত্যাদি ব্যবহার। বারো-চৌদ্দ বছরের মেয়েদের মধ্যে—বিশেষত বোর্ডিং-হোস্টেলে—কখনো কখনো এটা দেখা যায়। এর থেকে বোঝা যায় তাদের স্নেহ-ভালবাসা পাবার আকাঙ্ক্ষা পরিবারে স্বাভাবিকভাবে তৃপ্ত হচ্ছে না। আর একটু বড় হলেই সাধারণত এ অভ্যাস দূর হয়, তার কারণ জীবনে তখন অন্য আগ্রহ ও আকর্ষণ আসে যার মধ্য দিয়ে তাদের স্নেহ-ভালবাসার পিপাসা তৃপ্ত হয়। তারা এটা বুঝতে চায় যে পৃথিবীতে অন্তত এক জনের কাছে তার দাম আছে।[১০] এই সমকামিতা অবশ্যই বয়স্ক নর-নারীর স্বাভাবিক প্রেমের পূর্বাভাষ এবং এ অবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। তবে যাদের ব্যবহারে পুনঃপুনঃ এ লক্ষণ দেখা যায়, অথবা যারা সহজে এই অ-স্বাভাবিক অবস্থাগুলি অতিক্রম করে আসতে পারে না, তাদের মধ্যে গুরুতর মানসিক অসঙ্গতি আছে বুঝতে হবে, এবং তা চিকিৎসা করানো প্রয়োজন।

[১০] চৌদ্দ বছরের মেয়ে ফ্র্যাঁসি নোলান চিঠিতে লিখেছে—"No! I don't want to need anybody. I want someone to need *me—I want someone to need me*".

She tore the sheet in half. She wept again, but not so hard this time. Betty Smith—A Tree Grows in Brooklyn, (St. Ed.), p. 409

কোন কোন দুর্বলচিত্ত ছেলের মধ্যে মেয়েদের অন্তর্বাস ইত্যাদি অকারণে চুরি করার (erotic kleptomania) লজ্জাকর প্রবৃত্তি দেখা যায়। সহজেই বোঝা যায়, এ সব ছেলেরা নিজেদের কামাকাঙ্ক্ষা-তৃপ্তি এ প্রকার বিকল্প চিহ্নের মধ্য দিয়ে খোঁজে (erotic satisfaction through certain substitute symbols)।

শিশুদের সমস্ত মানসিক বিকারের শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক—(১) পিতামাতার বিশুদ্ধ জীবনের আদর্শ, (২) সুস্থ গৃহ-পরিবেশ (৩) প্রচুর স্নেহ-ভালবাসা ও বিশ্বাস, (৪) শক্তি ও রুচির যথোচিত সুযোগ এবং বড়দের কাছ থেকে এ বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ এবং সতর্ক পরিচালনা।

যেখানে মানসিক বিকারের কারণ জন্মগত, সেখানে উপযুক্ত চিকিৎসা -দ্বারা কিছুটা সুফল ফলতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ সংশোধনের আশা কম।

গুরুতর যৌন-বিকৃতি

যৌবনাগমে যৌন-চেতনা তীব্র হয় এবং ব্যক্তি প্রকৃত যৌন-সংযোগ-স্থাপনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। যারা কতকগুলি দৈহিক-স্নায়বিক-মানসিক অসুস্থতা নিয়ে জন্মায়, অথবা যাদের গৃহপরিবেশ প্রতিকূল, যাদের স্বাভাবিক বিকাশ কোন না কোন কারণে বিঘ্নিত হয়েছে, যাদের জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলি বাল্যকালে স্বাভাবিক ভাবে মেটে নি, তাদের যৌন-জীবনে কখনো কখনো গুরুতর অব্যবস্থিততা দেখা যায়। এই অস্বাভাবিক বিকৃতির মধ্যে প্রধান হচ্ছে পশ্বাচার, বলাৎকার ও বেশ্যাবৃত্তি।

অত্যন্ত বিকৃতরুচি, হীনবুদ্ধি ও অনিয়ন্ত্রিত যৌন-অনুভূতিসম্পন্ন কৈশোরোত্তীর্ণ ব্যক্তি তীব্র কামাকাঙ্ক্ষা পশুদের ওপর তৃপ্ত করতে চেষ্টা করে। সুখের বিষয় সমাজের ঘৃণা এই বিকৃতি -সম্পর্কে অতিশয় স্পষ্ট ও তীব্র এবং এ জাতীয় অব্যবস্থিত ব্যক্তির সংখ্যা নগণ্য। এর সংশোধনের জন্য শাস্তি ও চিকিৎসা দুইই প্রয়োজন।

অজাচার, বা বলাৎকারের চেষ্টা অথবা কুৎসিত পীড়ন (sadism,—যথা, জোর করে উলঙ্গকরণ, লজ্জাস্থান-পীড়ন) এবং ধর্ষণের চেষ্টাও গুরুতর মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ। এই ব্যক্তিরা তাদের পৌরুষ ও শক্তি-সামর্থ্যকে এই এক পথেই মাত্র প্রকাশের কথা চিন্তা করে। এরা সমাজজীবনের সঙ্গে সুস্থ স্বাভাবিক সম্বন্ধ-স্থাপনে অসমর্থ হয়ে এই অস্বাভাবিক বিকারের মধ্য

দিয়ে জীবনে আনন্দ পেতে চেষ্টা করে। যারা এ রকম কুৎসিত বিকৃত ব্যবহারে রত হয় তাদের মধ্যে সকলেই যে জন্মগত বুদ্ধিহীনতা -সম্পন্ন তা নয়। কাউন্ট সাদ—যাঁর থেকে Sadism কথা এসেছে—ফ্রান্সের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন (1740-1814)। তিনি লেখাপড়া-জানা লোক ছিলেন। তিনি প্রেমলীলার সুন্দরী সঙ্গিনীদের নিজ সুসজ্জিত প্রাসাদে আমন্ত্রণ করে আনতেন। তাদের সঙ্গে কেলি প্রচলিত প্রথায় চলতো না। সাদ-এর আনন্দ ছিল রূপসীদের উলঙ্গ করে তাদের নানা দৈহিক পীড়ন করা। এই বিকৃত উপায়ে তিনি তাঁর কামাকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করতেন।[১১] সম্প্রতি ইংল্যাণ্ডের প্রফিউমো কেলেঙ্কারীর বিবরণ থেকে জানা যায় ডাঃ ওয়ার্ড-এর মতো তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান, সমাজে প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তিরাও প্রেমজীবনের এ প্রকার গুরুতর বিকৃতিসম্পন্ন। বাল্যকালে উপযুক্ত শাসন-পরিচালনার অভাবে বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদেরও এমন বিকার ঘটতে পারে যাতে তাদের নৈতিক চেতনা বিপর্যস্ত হয়। এই কারণেই সমাজ এই বিকার-গ্রস্তদের সম্পর্কে নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন থাকতে পারে না।

বেশ্যাবৃত্তিও এই একই কারণে সমাজের সামনে একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। এই বিকৃতি শুধু ব্যক্তির সুখ, স্বাস্থ্য, নৈতিক চেতনাকেই বিধ্বস্ত করে না, পারিবারিক জীবনের শুচিতা শান্তি এবং সমাজজীবনের নৈতিক ভিত্তিকেই তা বিপন্ন করে। এই জন্যেই বেশ্যাবৃত্তিকে নারীত্বের চূড়ান্ত অবমাননা (the sum of all degradations) বলা হয়েছে। এ দ্বারা নারীর শ্রী, হ্রী, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য ও সকলের চেয়ে যা মূল্যবান, সেই সম্ভ্রমবোধ ধূলিসাৎ হয়ে যায়। এ পাপ মাতৃত্বের পরম শত্রু। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে বেশ্যাবৃত্তিও জীবনের বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়া এবং স্বাভাবিক স্নেহ-ভালবাসা-শ্রদ্ধার অভাবজনিত অতৃপ্তিকে ভোলবার অতি বিকৃত হাহাকারপূর্ণ নিষ্ফল প্রয়াস।[১২]

১১ Sadism describes the fact that the infliction of pain on others is one substitute for the sexual urges. Griffith—An Introduction to Applied Psychology, p. 266

ধর্ষকামের (sadism) বিপরীত বিকৃতি হচ্ছে প্রেমপাত্রের নিকট হতে পীড়ন পাবার আকাঙ্ক্ষা বা মর্ষকাম (masochism)।

১২ এই হতভাগিনীদের কুৎসিত জীবনের তীব্র হাহাকার, নিষ্ফল আত্মপ্রবঞ্চনা, শঙ্কারজনক কদর্য পরিবেশের মধ্যেও এদের মানবিক গুণ, ইত্যাদির সহানুভূতিপূর্ণ ছবি The World of Suzie Wong এবং Yama the Pit গ্রন্থ দুখানাতে পাওয়া যায়।

এদের মধ্যে অনেকেই হীনবুদ্ধিসম্পন্ন, জন্মগত বিকৃতির অধিকারী, অনেকে অতি তীব্র অনিয়ন্ত্রিত যৌনাকাঙ্ক্ষার দ্বারা তাড়িত, কেউ বা দুষ্টমতি পুরুষের প্ররোচনায় একবার পদস্খলনের কঠিনমূল্য সারাজীবন ভরে দেবে। তা ছাড়া নিতান্ত পেটের দায়ে এ পথে পা বাড়িয়েছে এমন নারীও সংখ্যায় সামান্য নয়। কিন্তু বর্তমান কালের বিষম আশঙ্কার কারণ হচ্ছে শিক্ষিতা বুদ্ধিমতী নাগরিকারা নিজেদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও বিলাস-ব্যসনের আকাঙ্ক্ষাতৃপ্তির জন্যে এপথ বেছে নিচ্ছে। এরা বিজ্ঞানের নামে যৌন-শুচিতাবোধকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে পারিবারিক ও সমাজজীবনের মূল ভিত্তিকেই শিথিল করে দিচ্ছে। রাসেল এবং অন্যান্য সমাজতন্ত্রীদের মতে এ পাপ মধ্যবিত্তের রুচিবাগীশতা ও মালিকানাবাদেরই প্রত্যক্ষ ফল।[১৩] যে সমাজ-ব্যবস্থায় পেটের দায়ে নারীকে সম্ভ্রম বিক্রয় করতে হয়, যেখানে পিতামাতা দুমুঠো অন্নের জন্যে আপন কন্যাকে কামার্ত পশুদের হাতে বিলিয়ে দেয়, সে সমাজ-ব্যবস্থা সমস্ত বিবেকবান মানুষের তীব্রতম ঘৃণা ও ধিক্কারের যোগ্য।[১৪]

যে সমাজে অর্থই সমস্ত শক্তি ও সম্মানের একমাত্র মাপকাঠি, সেখানে মুষ্টিমেয় অর্থবানের জন্যই সমস্ত ভোগের উপকরণ, সেখানে নারী সৃজনমূলক কল্যাণকর্মে আপনাকে নিয়োজিত না করে এই আপাত-রমণীয় পথে স্বাধীনতা ও অর্থসংগ্রহে আগ্রহী হবে এতে আর অবাক হবার কি আছে?

রাসেল্ প্রশ্নটিকে দেখেছেন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কিন্তু মনোবিদের কাছে বেশ্যাবৃত্তির পশ্চাতে মানসিক কারণগুলি বিশ্লেষণই প্রধান কাজ। অন্য সমস্ত বিকৃতির মতো এই বিকৃতিরও মূল কারণ হল স্বাভাবিক জৈব আকাঙ্ক্ষাগুলির সুস্থ তৃপ্তির পথে বাধা। সেই বাধার ফলে দুর্বল-চরিত্র ব্যক্তি এই পাপের পথে সহজেই পদার্পণ করে। বহু পতিতা নারীর জীবনকাহিনী

১৩ Russell—Marriage and Morals, p. 95

১৪ Higgins—[revolted] Do you mean to say that you would sell your daughter for £ 50?

Doolittle—Not in a general way, I would not; but to oblige a gentleman like you I would do a great deal, I do assure you.

Pickering—Have you no morals, man?

Doolittle—[unabashed] Cant afford them Guvnor. Neither could you if you was as poor as me. Shaw—Pygmalion.

অনুসন্ধান করেই জানা যায় এদের বাল্যজীবন স্নেহবঞ্চিত, নিরাপত্তার অভাবে উদ্বেগপূর্ণ, কখনো কখনো কৈশোরে বা বাল্যে এরা বলাৎকৃত অথবা অনুরূপ কোন যৌন-অপরাধের স্মৃতিতে এদের জীবন বিড়ম্বিত (মেরীলিন মনরো-র জীবনেতিহাস স্মরণ করা যেতে পারে)। এদের উগ্র অসংযত জীবন গভীর পাপবোধকে ঢেকে দেবার এক প্রকার দুশ্চেষ্টা। উচ্ছৃঙ্খল জীবন দিয়ে এরা সমাজকে আঘাত করতে চায় এবং নিজেদের শক্তি এ সর্বনাশা পথে প্রকাশ করে বিকৃত আনন্দ লাভ করতে চেষ্টা করে। কাজেই এদের ব্যবহারকে escapism ও over-compensation-এর দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করা যায়। এ বিষয়ে সমাজের দায়িত্বও সামান্য নয়। রাশিয়াতে এই সুস্থ পরিবেশ-সৃষ্টির ওপরই বিশেষ জোর দেওয়া হয়। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, ব্যক্তির শক্তি সামর্থ্য রুচি প্রবণতা উপযুক্ত সমাজকল্যাণমূলক কার্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশের সুযোগ করে দিতে পারলে এবং রাষ্ট্র মানুষের খাওয়া-পরা, জীবিকা, শিক্ষা, চিকিৎসা ও নৈতিক উন্নতির সম্পূর্ণ ভার নিলে মানসিক বিকারের সম্ভাবনারই মূলোচ্ছেদ করা সম্ভব। অধিকাংশ বেশ্যাই সম্মানিত সমাজজীবনের সুযোগ পেলে উপযুক্ত পাত্র বিবাহ করে পাপপথ পরিত্যাগ করে সমাজের কল্যাণকামী সদস্যায় পরিণত হতে ইচ্ছুক।

যেখানে বিকারের মূল জন্মগত ও দেহগত, সেখানেও দৈহিক-স্নায়বিক চিকিৎসার দ্বারাই সুফল পাওয়া যেতে পারে। মনোবিকলন-পদ্ধতি সম্পর্কে রাশিয়া অনেকটা সন্দেহ পোষণ করে। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা ইত্যাদি দেশে পরিবেশগত কারণ অপেক্ষা জন্মগত ও মানসিক কারণকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সে দেশের পণ্ডিতদের মতে শিশুদের মানসিক বিকারের প্রতিকার নিম্নলিখিত উপায়ে করা সঙ্গত।

(ক) শিশু-পরিচালন চিকিৎসালয়ে (Child-guidance Clinics) মানসিক অসুস্থ শিশুদের পর্যবেক্ষণ, ও রোগনির্ণয়। (খ) সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য -অনুযায়ী বিশেষজ্ঞের নির্দেশ -অনুযায়ী পরিচালিত খেলাধুলার মধ্য দিয়ে শিশুদের অন্তরে রুদ্ধ ও অবদমিত আকাঙ্ক্ষাগুলির সানন্দ ও স্বাভাবিক রেচন বা মুক্তিদান (abreaction) (গ) মানসিক রুগ্‌ণ শিশুদের বিশেষ আবাসিক প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ও চিকিৎসা।

(ঘ) নানা সুপরিচালিত ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানসিক রুগ্‌ণদের নতুন শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গী গঠন।

(ঙ) বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত চিকিৎসকের নির্দেশ -অনুযায়ী কিছুদিন অব্যবস্থিত শিশুদের পরিচালন।

(চ) যেখানে প্রতিকূল পরিবেশ তাদের বিকৃতির জন্যে দায়ী সেখানে সমাজকর্মীরা (social workers) পিতামাতার সহযোগিতায় তার উন্নতি-সাধনে চেষ্টিত হবেন।

(ছ) যেখানে তা সম্ভব নয়, সেখানে শিশুদের প্রতিকূল পরিবার-পরিবেশ থেকে উদ্ধার করে সুস্থতর পরিবেশে, সহৃদয় অভিভাবকদের তত্ত্বাবধানে নতুন পরিবারে গ্রহণ (acceptance into healthy foster homes under the guidance of sympathetic foster parents)

শিশুদের ব্যবহারে অব্যবস্থিততা

শিশুরা যখন পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিস্থাপন করতে অসমর্থ হয় তখন তাদের ব্যবহারে সে অব্যবস্থিততা প্রকাশ পায়। **কাজেই 'ব্যক্তিত্বকেন্দ্রিক অব্যবস্থিতা' বলে যে অসঙ্গতিগুলি আমরা আলোচনা করলাম সেগুলিও অবশ্যই ব্যবহারকেন্দ্রিক অব্যবস্থিততা। কিন্তু ব্যবহার-কেন্দ্রিক অব্যবস্থিততা মাত্রই ব্যক্তিত্বের গঠনে অব্যবস্থিততার সূচক নয়।** মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে ব্যবহারকেন্দ্রিক অব্যবস্থিততার চেয়ে ব্যক্তিত্বকেন্দ্রিক অব্যবস্থিততার মূল গভীরতর। কিন্তু খুব সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণভাবে এ প্রভেদ করা সম্ভবপর নয়।[১৫] সাধারণত শিশুদের ব্যবহার -বিষয়ক অব্যবস্থিততা বলতে শিশুদের খাওয়া নিয়ে যন্ত্রণা করা, মলমূত্র ত্যাগ -বিষয়ে অনিয়মিততা, মিথ্যা কথা বলা, চুরিকরা, মেজাজ-মর্জি করা, স্কুল বা বাড়ী থেকে পালানো (truancy) এবং অবাধ্যতা বা অপরাধপ্রবণতা (delinquency) বোঝায়।

[১৫] ...it is obvious that it is difficult to distinguish between a personality and a behaviour problem. It is customary to characterize those problems which involve the individual himself in his own personal adjustment as personality difficulties and those which involve him in conflict with society as behaviour problems. Much overlapping occurs, however, because it is sometimes impossible to differentiate between a problem which involves the individual only, and one which involves others. Sherman—Basic Problems of Behaviour, p. 331

ব্যবহার -বিষয়ক অব্যবস্থিততা এবং অপরাধপ্রবণতার মধ্যে প্রভেদ পরিমাণগত ও আইনগত। অর্থাৎ শিশুর ব্যবহারে অব্যবস্থিততা যখন এতটা গুরুতর যে সমাজ তার বিরুদ্ধে শাস্তি- (বা সংশোধন-) মূলক আইনগত হস্তক্ষেপ করে তখন তাকেই অপরাধপ্রবণতা বা 'ডিলিনকোয়েন্সী' বলা হয়।[১৬]

ব্যবহার-গত অব্যবস্থিততার গুরুত্ব- ও প্রকৃতি-নির্ধারণ -কালে ব্যক্তির বয়স ও তার মানসিক ও নৈতিক বিকাশের স্তর এবং যে সমাজে সে ব্যক্তি বাস করে, তার আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন।

পাঁচ-ছয় বছরের ছেলে। না বলে কোন জিনিস নিলে, তাকে চুরির অপরাধে শাস্তি দেওয়া হয় না। কিন্তু চৌদ্দ-পনেরো বছরের ছেলেদের ব্যবহারে যদি সে অব্যবস্থিততা দেখা যায় (তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে চৌর্যাপরাধ) তা শাস্তিযোগ্য। ভারতে ৭-৮ বছরের ছেলেমেয়েরাও গ্রাম দেশে সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকে। সেটা সমাজের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় নয়। অ্যাকারসন্ পাঁচ হাজার শিশু অপরাধের কাহিনী-বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে চৌদ্দ থেকে পনেরো বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যেই অপরাধের সংখ্যা সর্বাধিক। অবশ্য এর জন্য সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীও দায়ী। আট-দশ বছর বয়সের ছেলেমেয়ের অসঙ্গত আচরণ সমাজ অনেকটা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে থাকে। কিন্তু তেরো-চৌদ্দ বছরের ছেলের অনুরূপ আচরণ সমাজের চোখে অমার্জনীয়।[১৭] ম্যালার নিউইয়র্ক নগরীর শিশু-অপরাধ সম্পর্কে যে রিপোর্ট তৈরি করেছেন তাতে দেখা যায় শতকরা সত্তর জন অপরাধীর বয়স তেরো থেকে ষোল বছরের মধ্যে এবং যে দুটি অব্যবস্থিত ব্যবহার সব চেয়ে বেশী দেখা যায় তা হচ্ছে উচ্ছৃংখল আচরণ ও চৌর্য। তিনি সযত্ন অনুসন্ধান করে দেখেছেন যে অপরাধীরা সাধারণত বৃহৎ পরিবার, বিধ্বস্ত গৃহ (পিতা বা মাতা মৃত অথবা তাদের সম্পর্ক ছিন্ন), দরিদ্র সংসার এবং বিদেশী পিতামাতার সন্তান।[১৮]

১৬ No line of demarcation can be drawn between behaviour disorders like lying, stealing, temper-tantrums etc. and juvenile delinquency. The underlying factors in both categories are identical. The division usually made depends on whether the behaviour disorders are of such a kind as to involve the child in court proceedings. Bowley—The Natural Development of the Child, p. 219

১৭ Luton Ackerson—Children's Behaviour Problems, p. 268

১৮ Maller—Juvenile Delinquency in New York City...Journal of Psychology, 1927, 3, pp. 1-25

শিশুদের মেজাজ-মর্জি

শিশুদের মেজাজ-মর্জির (temper-tantrums) নানা রূপ দেখতে পাওয়া যায়। অনেক সময় তারা খাওয়া-দাওয়া, মলমূত্রত্যাগ ইত্যাদি বিষয়ে পিতামাতার শাসন-পরিচালনার বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি জানায়। শিশুর সুস্থ স্বচ্ছন্দ বিকাশের সঙ্গে মেজাজ-মর্জির সম্পর্ক আছে। শিশুর বেড়ে ওঠাটা একটানা মসৃণ গতিতে হয় না। হঠাৎ এক একটা চাড় (spurt), আবার কিছুদিন একটা শান্ত স্থিতাবস্থা (a period of consolidation) দেখা যায়। যখন শিশুর দেহটার হঠাৎ বেড়ে ওঠার ঝোঁক দেখা যায় তখন শিশুর মধ্যে একটা অস্থিরতা-চঞ্চলতা দেখা যায়। এ সময়টাতে তার মেজাজ-মর্জি সাধারণত দেখা যায়। এ বিষয়ে গেসেল্ ইনস্টিট্যুটের শিশুমনোবিদেরা বহু বৎসরব্যাপী সযত্ন পর্যবেক্ষণ করে যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তা মূল্যবান। তাঁদের মতে দুই বছর বয়সের কাছাকাছি সময়ে শিশু তার নিজের সঙ্গে এবং পরিবেশের সঙ্গে একটা মোটামুটি শান্ত সুস্থির সম্পর্ক স্থাপন করে। তখন তার মেজাজ-মর্জি খুব কমই দেখা যায়। কিন্তু আড়াই বছর বয়সটা দেহের দিক থেকে হঠাৎ একটা 'বাড়ে'র বয়স এবং এ সময়টা শিশুর মেজাজ-মর্জি বেশ দেখা দেয়। তিন বছর বয়সে শিশু অপেক্ষাকৃত শান্ত, কিন্তু সাড়ে তিন বছরে নানান মেজাজ-মর্জির পালা। এ বয়সটাতে শিশুর অশান্ত চঞ্চলতা অন্য সমস্ত বয়সের তুলনায় সব চেয়ে বেশী। পাঁচ-ছয় বছর সাধারণত স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধির কাল এবং এ বয়সের শিশু বেশ আনন্দময়। সাতটা আবার অশান্তিময় বয়স—এ সময় শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে সঙ্গে থাকে মানসিক অতিরিক্ত চঞ্চলতা ও কৌতূহল। নয়-দশ বছরে শিশু নিজের শক্তি ও স্বাধীনতার স্বাদ শান্তভাবে উপভোগ করে। তের থেকে পনেরো বছর বয়সে তার গুরুজনদের শাসনের বিরুদ্ধে কিছুটা বিদ্রোহের ভাব দেখা যায়। এই স্তরগুলি ঠিক একই বয়সে সব শিশুদের মধ্যে দেখা দেয় না। এ বিষয়ে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে বহু পার্থক্য আছে, কিন্তু স্তরবিন্যাস বা পরিক্রমা সব শিশুতেই একই রকম।[১৯]

১৯ Frances Ilg & Louise B. Ames—The Gessell Institute—Child Behaviour, pp. 20-27

A brief and rather schematic tabular presentation of the age changes from two years on,...follows

2 yrs	5 yrs	10 yrs	Smooth, consolidated
2½ yrs	5½-6	11	Breaking up

মেজাজ-মর্জি অস্তিবাচক এবং নেতিবাচক এ দুরকমই হতে পারে। চীৎকার করা, হাত-পা ছোঁড়া, মাটিতে কেঁদে চীৎকার করে গড়াগড়ি দেওয়া, রাগে জিনিসপত্র ভেঙ্গেচুরে তছ্‌নচ্‌ করা, এ সবই অস্তিবাচক মেজাজ-মর্জির দৃষ্টান্ত। আর গোঁ ধরে বসে থাকা, অবাধ্যতা—করবো না, খাবো না,—এরকম জেদ করা এগুলি নেতিবাচক মেজাজ-মর্জির নমুনা। মেজাজ-মর্জির উগ্রতা দিয়েও আমরা তাদের শ্রেণীবিভাগ করতে পারি।

কেন শিশুরা মেজাজ-মর্জি করে?

স্বাধীন ইচ্ছা বা ক্রিয়ায় বাধা দিলে সমস্ত প্রাণীই রাগ করে এবং জোর করে সে বাধা দূর করতে চায়। এটা স্বাভাবিক এবং সবল ব্যক্তিত্ব-গঠনের পক্ষে প্রয়োজন। এটা শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের একটা অস্থায়ী অবস্থা (a passing phase) এবং এ নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই, যেহেতু সব শিশুই বড় হলে নিজের ক্রোধ, যুযুৎসা ইত্যাদি প্রতিক্রিয়া নিজেই দমন করতে শেখে। সমাজের শাসনও তাকে 'সভ্য' হতে বাধ্য করে। কিন্তু কোন শিশুর মেজাজ-মর্জি অতিরিক্ত প্রবল এবং পুনঃপুনঃ ঘটলে তা শিশুর জীবনে কোন অব্যবস্থিতা সূচনা করে।

যেসব শিশুরা বড় বেশী মেজাজ-মর্জি করে সম্ভবত তাদের জন্মগত স্নায়বিক অস্থিরতা রয়েছে (inherited instability of temper)। এ সমস্ত শিশুরা সামান্য প্রতিকূল অবস্থাতেই মানসিক স্থৈর্য হারিয়ে মেজাজ-মর্জির মধ্য দিয়ে অস্থিরতা থেকে মুক্তি খোঁজে (tensional outlet)।

পিতামাতার অতি-প্রশ্রয়ও কোন কোন শিশুকে 'মেজাজী' করে তোলে। এ সব আদুরে শিশুরা জানে যে মেজাজ-মর্জি করলেই তাদের মতলব হাসিল হবে। তাই তাদের আবদার না মেটালেই তারা হাতপা ছুঁড়ে চীৎকার কান্না ইত্যাদি উৎপাত সুরু করে দেয়। এসব শিশুর সংশোধন করতে হলে পিতামাতাকে কিছুটা কঠোর ও নির্মম হতে হবে। আসলে শিশুর পক্ষে এটা হচ্ছে মনোযোগ-আকর্ষণের এক দুষ্ট সস্তা কৌশল। এ সব ক্ষেত্রে দুদিন

3	6½	12	Rounded, balanced
3½	7	13	Inwardized
4	8	14	Vigorous, expansive
4½	9	15	Inwardized—outwardized, troubled, "neurotic"
5	10	16	Smooth, consolidated

যদি তাদের মেজাজ-মর্জিতে কেউ ভ্রূক্ষেপ না করে, তাহলে দেখা যায় তারা আর মেজাজ-মর্জি করছে না।

মেজাজ-মর্জির উত্তেজক মানসিক কারণও অনেক সময়ই থাকে। পারিবারিক জীবনে অশান্তি, পিতামাতার ভালবাসার অভাবে অনিরাপত্তা-বোধ, তীব্র আকাঙ্ক্ষার পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা, ঈর্ষা, বিরক্তি ইত্যাদি অবস্থায় শিশু পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করিয়ে নিতে না পারলে মেজাজ-মর্জির মধ্য দিয়ে নিজের অস্থিরতা প্রকাশ করে। সে সান্ত্বনা চায়, সে আদর চায়—সে চায়, এ কথা জানতে যে পিতামাতার কাছে তার দাম আছে, তাঁদের কাছে তার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার মূল্য আছে। নূতন একটি বোন সংসারে এলে সে বোধ করতে থাকে মায়ের স্নেহের একজন প্রবলতর অংশীদার জুটেছে, প্রতিকারের ক্ষমতা তার তো নেই, তাই কেঁদে-ককিয়ে মেজাজ-মর্জি করে মায়ের স্নেহ পুনরুদ্ধার করতে সে চেষ্টা করে। অক্ষমের হাতে এই তো একমাত্র অস্ত্র। কখনো কখনো সে যখন মেজাজ-মর্জি করে জিনিস ভেঙেচুরে তছ্‌নচ্‌ করে, তখন বুঝতে হবে কোন প্রবলের বিরুদ্ধে সে এইভাবে বালসুলভ প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করছে।

আধুনিক কোন কোন শিশু-মনোবিদের মতে মেজাজ-মর্জির প্রধান উত্তেজক কারণ (exciting cause) হচ্ছে ক্লান্তি (fatigue)। ঘুমোবার আগে অনেক শিশু ঘ্যানঘ্যান করে, কান্নাকাটি করে, মর্জি করে। এখানে কারণটা মূলত দৈহিক ক্লান্তি। এটাও দেখা যায় যে, শিশু যখন ক্লান্ত, অবসন্ন তখনই সে মেজাজ-মর্জি বেশী করে। দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সামনে নিরাশা (frustration), অথবা অনিরাপত্তা-বোধ মাত্রই শিশু মেজাজ-মর্জি দেখায় না। কিন্তু শিশু যদি ক্লান্ত থাকে তবে প্রতিকূল অবস্থায় সে সহজেই মেজাজ-মর্জি প্রকাশ করে।[২০]

মেজাজ-মর্জি শিশু কেন করে তা জানলে, তবেই তার প্রতিকার সম্ভব। যেখানে কারণটা জন্মগত ও বংশগত, সেখানে সুচিকিৎসা -দ্বারা কিছু সুফল পাওয়া যেতে পারে। পিতামাতা, ঠাকুরমার অতিরিক্ত প্রশ্রয় যেখানে কারণ,

২০ Temper-tantrums most often occur when the child is tired or when he is frustrated. Some frustration is inevitable and perhaps necessary as a child grows up, but frustration is most apt to end in tantrums when the child is tired. Drs. Ilg & Ames—Child Behaviour, pp. 144-45

সেখানে কঠোরতা অবলম্বনই একমাত্র পথ। যেখানে সাংসারিক কোন অশান্তি এবং প্রতিকারযোগ্য কোন প্রতিকূল অবস্থা কারণ, সেখানে তা দূর করতে চেষ্টা করাই সঙ্গত। এক পরিবারে বহু মানুষ। বাড়ী একেবারে ছোট। এর মধ্যে আরো অতিথি সমাগম হল। বাড়ীতে বিয়ে। খাওয়া-দাওয়া- শোওয়া সব বিষয়েই অসুবিধা, অনিয়মিততা চলতে লাগল। বাড়ীর ছোট ছেলেটি এমনিতে বেশ শান্ত। কিন্তু দুদিন বাদে সে বিষম মেজাজ-মর্জি শুরু করল। আরো দুদিন বাদে বিয়ের হাঙ্গামা চুকল— বাড়তি মানুষেরা চলে গেল। বাড়ী শান্ত হল। ছেলের বাবা বুদ্ধি করে বাড়ীর পেছনে কিছু জায়গা জঙ্গল সাফ করিয়ে বেড়া দিয়ে খোকনের জন্যে একটু খেলার জায়গা করে দিলেন, ছোট একটু ফুলের বাগান করে দিলেন। অশান্ত শিশুর মুখে ক'দিনের মধ্যেই হাসি ফুটল।

শিশুদের জীবনের সমস্ত বিভ্রান্তিকর অবস্থা, সমস্ত বাধা ও নিরাশার কারণ দূর করা সম্ভব নয়—উচিতও নয়। শিশুকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিয়ে যেমন মেজাজ-মর্জি সংশোধন হবে না, তেমন ধমক-ধামক-শাস্তি দিয়েও অবস্থার প্রতিকার হবে না। বরঞ্চ শাস্তি ও শাসনের ভয়ে শিশু তার সমস্ত অশান্তির প্রকাশ যদি অবদমন করতে বাধ্য হয়, তবে ভবিষ্যতে তার ফল শুভ হয় না।

মিথ্যা কথা বলা

ছোটরা অম্লান বদনে মিথ্যা কথা বলে, এ নিয়ে তাদের পিতামাতা অনেক সময় বিষম উদ্বেগ প্রকাশ করেন। মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস নিশ্চয়ই ভাল নয়, কিন্তু পাঁচ-ছয় বছরের ছেলেমেয়েরা যখন মিথ্যা কথা বলে, তখন তা নিয়ে বিশেষ উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই। সত্যমিথ্যার প্রভেদটা অনেক ক্ষেত্রেই আপেক্ষিক এবং এই প্রভেদ -সম্বন্ধে নীতি-বিচার শিক্ষাসাপেক্ষ। তা ছাড়া, শিশুর মানসিক বিকাশেরও এ বিচার অপেক্ষা রাখে। পাঁচ-ছয় বছরের ছেলেমেয়ের মানসিক বিকাশ এতটা হয় না যে সে সত্য-মিথ্যা ন্যায়-অন্যায়ের প্রভেদটা স্পষ্ট করে বুঝতে পারে। শিশুর কল্পনাশক্তি প্রবল এবং তার কাছে বাস্তব জগৎ ও কল্পনার সৃষ্টির মধ্যে প্রভেদটা মোটেই সুস্পষ্ট নয়। আমরা এখনই দেখব, বাহাদুরী নেবার ইচ্ছা, শাস্তি এড়াবার ভয়,

ইত্যাদি নানা কারণেই শিশু 'মিথ্যা কথা' বলতে পারে। বড়দের বুদ্ধি ও নৈতিক মান দিয়ে ছোট শিশুদের বিচার করলে অবশ্যই তা সুবিচার হয় না।

মনোবিদেরা নানাভাবে শিশুদের এই মিথ্যা কথা বলার শ্রেণীবিভাগ করেছেন। প্রসিদ্ধ মনোবিদ্ সিরিল্ বার্ট এই মিথ্যা কথা বলাকে সাতটি দলে ভাগ করেছেন: (১) **খেলাচ্ছলে মিথ্যা কথা (playful lie)**। শিশু কল্পনা করতে ভালবাসে, সে তাই "যেন-যেন" খেলা করে। তখন বেতের লাঠি হয় ঘোড়া, সে নিজে হয় 'কানাই মাস্টার' আর ছাত্র হয় বেড়াল ছানার দল ইত্যাদি। (২) **অস্পষ্ট ধারণা-জনিত মিথ্যা কথা (a lie of confusion)**। শিশুদের বুদ্ধি অপরিণত, অভিজ্ঞতা সামান্য, তাই তারা স্পষ্ট করে বিভিন্ন জিনিসের পার্থক্য বুঝতে না পেরে হয়তো বাঘকে বলে বেড়াল, পাথরের বাটিকে বলল কাঁচের বাটি। (৩) **অহঙ্কার বশত বাহাদুরী নেবার জন্যে মিথ্যা কথা (a lie of vanity)**। শিশু বড় হতে ভালবাসে, খুব অসম্ভব সাহসী কাজ করেছে বলে বানিয়ে মিছে কথা বলতে ভালবাসে—'বীরপুরুষ' কবিতা এর চমৎকার উদাহরণ। এ মিথ্যা কথাও শিশুর স্বাভাবিক কল্পনা-প্রবণতা থেকে উদ্ভূত। এ সমস্ত মিথ্যা শিশুদের পক্ষে (অতিমাত্রায় না হলে) দূষণীয় তো নয়ই বরঞ্চ তাদের সুস্থ ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক। (৪) **হিংসাত্মক মিথ্যা কথা (a lie of malevolence)** যার ওপর শিশুর রাগ তাকে বিপদে ফেলবার জন্যে, অথবা হেয় করবার জন্যে মিথ্যা কথা। (৫) **নিজের দোষস্খালনের উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা (exculpatory lie)**—শাস্তির ভয়ে এ জাতীয় মিথ্যা শিশুরা অনেক সময়ই বলে। (৬) **স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা (the selfish lie)**। আশু কোন লাভের আশায় শিশু (এমন কি বড়রাও) এমন মিথ্যা কথা হামেশাই বলে। বাবা বললেন, 'এক পৃষ্ঠা হাতের লেখা আর পাঁচটা অঙ্ক কষলে চকোলেট দেব।' শিশুর কাছে এ প্রলোভন সামান্য নয়। তার কাছে বর্তমানটাই একমাত্র সত্য, ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করা তার স্বভাব-বিরুদ্ধ। তাই পাঁচ মিনিট না যেতেই সে ঘুরে এসে মিছে করে বলে, যে হাতের লেখা আর অঙ্ক তার হয়ে গেছে। (৭) **দলের ছেলেকে বাঁচাবার জন্যে মিথ্যা কথা (lies of loyalty & convention)**। দশ বছরের পর থেকে শিশু দল বাঁধতে ভালবাসে, এবং দলের প্রতি আনুগত্য তার প্রবল হয়, তাই দলের

জন্য মিথ্যা কথা বলতে তার বাধে না।[২১] হিংসাত্মক মিথ্যা কথা, নিজ দোষস্খালনের জন্যে মিথ্যা কথা, আশু স্বার্থসিদ্ধির জন্যে মিথ্যা কথা—এই সব কয়প্রকার মিথ্যা কথাই নিন্দার্হ এবং সংশোধনযোগ্য। বড়ারাও অনেক সময় এ জাতীয় মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন এবং শিশুরা তাদের সমাজজীবন থেকেই এ কুশিক্ষা পেয়ে থাকে। সহজেই বোঝা যায় যে-সব ছেলেমেয়েদের আট-দশ বছর বয়স হয়েছে তারাই এ-জাতীয় মিথ্যার আশ্রয় নেয়। শিশু যাতে এ-জাতীয় মিথ্যায় অভ্যস্ত না হয়, সে শিক্ষাদানের দায়িত্ব পিতামাতা ও বিশেষ করে শিক্ষকের। তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন নির্ভীক ও আদর্শনিষ্ঠ হলে তবেই তাঁরা শিশুদের এই মিথ্যাচার থেকে রক্ষা করতে পারেন। দলের জন্য মিথ্যা কথা বলার মধ্যে প্রশংসনীয় কিছু আছে এবং এখানেও বড়দের কাছ থেকেই শিশুরা অনুকরণ -দ্বারা শিক্ষাগ্রহণ করে থাকে।

টিউডর ও হার্ট সমাজবিদ্যার দৃষ্টি থেকে মিথ্যা কথাকে স্বার্থবুদ্ধি-সঞ্জাত, (২) না-সামাজিক (a-social), (৩) সমাজবিরুদ্ধ (anti-social), (৪) সামাজিক (social), এবং (৫) বিদ্যালয়- বা শাসন-কর্তৃপক্ষ -সম্পর্কিত—এই পাঁচ দলে ভাগ করেছেন। যেখানে নিজের কোন বিপদ এড়াবার জন্যে অথবা স্বার্থরক্ষার খাতিরে মিথ্যা কথা বলা হয়, তা স্বার্থবুদ্ধি-সঞ্জাত। ব্যক্তি যেখানে অপ্রীতিকর ফলাফল এড়াবার জন্যে, অথবা কোন ব্যক্তিগত আশুলাভের আশায় মিথ্যা কথা বলে, তা হচ্ছে না-সামাজিক (a-social) মিথ্যা। অন্যকে দুঃখ দেবার উদ্দেশ্যে অথবা অন্যের কাছ থেকে অন্যায় সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে যে মিথ্যা কথা, তা সমাজবিরুদ্ধ। যে মিথ্যা অন্যের ভাল করবার উদ্দেশ্যে তা সামাজিক। আর যে মিথ্যা বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বা গুরুজনদের ফাঁকি দেবার উদ্দেশ্যে, তাকে তাঁরা বলেছেন school lies।

এটা সহজেই বোঝা যায় যে, সব মিথ্যা কথার তাৎপর্য বা গুরুত্ব সমান নয়। এবং এটাও বুঝতে হবে যে সমস্ত মিথ্যাই শিশুর মানসিক অব্যবস্থিততা সূচনা করে না। শিশুর সজীব কল্পনা মুক্তি পায় তাদের 'যেন-যেন' খেলায়। তারা রাজা সাজে, এঞ্জিন-চালক সাজে, 'বাবার মতো বড়ো' হতে চায় এবং এই ইচ্ছাপূরণের উপায় হিসাবে তারা নানা মিথ্যে গল্প বানায়। পূর্বেই

২১ Cyril Burt—The Young Delinquent, pp. 361-65

বলেছি এটা খুব নিন্দনীয় নয় এবং শিশুর সুস্থ সজীব ব্যক্তিত্ববিকাশের জন্যে এর প্রয়োজন আছে। কিন্তু যেখানে কোন শিশু বড় বেশী এ জাতীয় মিথ্যার আশ্রয়গ্রহণ করে, সেখানে সন্দেহ করা যেতে পারে যে শিশু তার বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারছে না। সে বাস্তবের জগৎ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে কল্পনার জগতের আশ্রয়গ্রহণ করে নিজের দুঃখ বা অশান্তি ভুলতে চাচ্ছে। এ সমস্ত শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য -সম্পর্কে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। হয়তো শিশু তার জীবনের কোন অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা এ ভাবে বিকল্পের সাহায্যে পূরণ করতে চেষ্টা করছে। সে অভাবটি কি, কেন সে বঞ্চিত বোধ করছে, তা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

কখনো কখনো বাহাদুরী নেবার জন্যে শিশুরা অনেক ঘটনা বাড়িয়ে বলে, অনেক ঘটনা যা ঘটে নি, তা বলে। এ উপায়ে তারা বড়দের মনোযোগ আকর্ষণ করতে (attention-getting) চেষ্টা করে। মাঝে মাঝে এটা কোন শিশুতে দেখা গেলে তার জন্যে দুশ্চিন্তা করবার হেতু নেই। কিন্তু এটা কোন শিশুতে অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেলে সে শিশুর মানসিক সুস্থতা -সম্পর্কে সন্দেহ করা যেতে পারে। এ সব ক্ষেত্রেও হয়তো শিশুর জীবনে স্নেহের অভাব, নিরাপত্তা-বোধের অভাব আছে, তাই সে বারে বারে পিতামাতার দৃষ্টি এই নাটকীয় ভাবে আকর্ষণ করতে চায়।

শিশুদের অনেক মিথ্যাই স্পষ্টত বিকল্পের সাহায্যে ইচ্ছাপূরণের (wish-fulfilment) চেষ্টা। 'বীরপুরুষ' এবং 'শিশু'র আরো বহু কবিতাতে রবীন্দ্রনাথ শিশুর এই কল্পনার খেলার সুন্দর সব ছবি এঁকেছেন। ফ্রএড্-পন্থীদের মতে এই ইচ্ছাপূরণের চেষ্টার পশ্চাতে রয়েছে অপরিপূরিত যৌন-কামনা। শিশু যখন 'বাবার মতো বড়' হওয়ার কথা কল্পনা করে তখন সে মায়ের অনুরাগের পাত্র হিসাবে পিতার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রত।

শারমান্ ফ্রএডীয় তত্ত্ব সম্পূর্ণ গ্রহণ না করলেও এই মতপ্রকাশ করেছেন যে চুরি করা এবং মিথ্যা কথা বলা সগোত্র। দুয়ের মধ্য দিয়েই রুদ্ধ বা বাধাপ্রাপ্ত অনুভূতি মুক্তিলাভ করে—দুয়ের মধ্য দিয়েই ব্যক্তির অমীমাংসিত অনুভূতিমূলক সংঘাত একটা মীমাংসার পথ খোঁজে। এ সংঘাত যৌনাকাঙ্ক্ষা -অবদমনজনিত এ কথা সত্য নয়। দুই-ই মনোযোগ-আকর্ষণের নাটকীয় কৌশলমাত্র। দুই-এর মধ্য দিয়েই শিশু তার সমপাঠীদের যে সম্পদ আছে সে -বিষয়ে সমান হতে চায়—সে এই উপায়ে (সহপাঠীর জিনিস চুরি করে, বা

তার নিজেরও বন্ধুদের চেয়ে ভাল জিনিস আছে, এমন বড়াই করে) তাদের কাছে পরাজয় এড়াতে চায়। কাজেই এ দুইকেই প্রতিকূল অবস্থায় অস্বাভাবিক উপায়ে সঙ্গতিস্থাপনের চেষ্টা (adjustment to difficulties) বলা চলে। শারমান্ এই সমস্ত ব্যবহারের মূলে পরিবেশগত অবস্থার ওপরই জোর দিয়েছেন।

বিরল হলেও মাঝে মাঝে কোন শিশুতে অদ্ভুত ব্যবহার দেখা যায় যে সে যে-অন্যায় করে নি তা সে স্বীকার করে শাস্তিগ্রহণ করছে। এ জাতীয় আচরণকে **অস্বাভাবিক মিথ্যাভাষণ** (pathological lying) বলা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে শিশু ভেবেচিন্তে মিথ্যে বলছে তা নয়। এখানে তার অবচেতন মনে কোন পাপ-বোধ তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই অথবা ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে তাকে এমন অপরাধ স্বীকার করতে বাধ্য করছে (a compulsive act) যা সে করে নি। এর ফলে সে শাস্তি পেতেও প্রস্তুত—এ শাস্তিকে যেন সে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে গ্রহণ করে। বার্টন হল্-এর মতে এজাতীয় মিথ্যা ব্যক্তির মানসজীবনে বিকৃতি ও বিশৃঙ্খলার পরিচায়ক (It is symptomatic of a group of disorders known as psychopathic states)।

সমস্ত মিথ্যাই নির্জ্ঞান মনে সংঘাত-মীমাংসার চেষ্টা, এমন ব্যাখ্যা গ্রহণ করা কঠিন। আমরা দেখেছি যে সাধারণত শিশু যে মিথ্যা কথা বলে তার দুটি প্রধান কারণ—শাস্তির ভয় আর বাহবা পাবার লোভ। যেখানে সামান্য অপরাধে গুরুতর শাস্তির ভয় থাকে, সেখানে শিশু মিথ্যে কথা বলে আত্মরক্ষা করতে চাইবে এটা খুবই স্বাভাবিক। এখানে শুধু নীতি-উপদেশ দিয়ে শিশুকে মিথ্যা থেকে বিরত করা যাবে না। যেখানে পিতামাতার সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক নিবিড় স্নেহ ও বিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেখানেই শিশু নির্ভয়ে নিজ অন্যায় স্বীকার করবে। আবার যে পরিবারে শিশু দেখে যে মিথ্যা বড়াই করে বাহবা পাওয়া যায়—যেখানে সে দেখে বাবা-মা গুরুজনেরা এমন মিথ্যা বড়াই সর্বদাই করে থাকেন—সেখানে শিশুকে নীতি-উপদেশ দিয়ে সত্যবাদী করে তোলায় চেষ্টা নিষ্ফল হতে বাধ্য। বাস্তবিক পক্ষে শিশুর সামনে যদি এমন দৃঢ়চরিত্র পিতা-মাতা-শিক্ষকের জলন্ত দৃষ্টান্ত থাকে যে তাঁরা বিষম বিপদ ও ক্ষতির সম্ভাবনা সত্ত্বেও মিথ্যার আশ্রয়গ্রহণ করেন না, মিথ্যা বড়াই করে হাততালি পেতে চেষ্টা করেন না, মিথ্যা বলে

পরম শত্রুকে হেয় করতে চান না—তবেই সন্তানেরা সত্যবাদী হতে উদ্বুদ্ধ হবে।

সামাজিক কুব্যবস্থার ফলে দেশের অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র—উন্নতির সুযোগ-সুবিধা মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানের করায়ত্ত। শিক্ষক পরানুগ্রহ-নির্ভর, আত্মসম্মান-বর্জিত, প্রতিবেশী ঈর্ষাপরায়ণ সহানুভূতিশূন্য—এই প্রতিকূল অবস্থার প্রতিকার না হলে শিশুরা শুধুমাত্র নীতি-উপদেশ -দ্বারা সত্যনিষ্ঠ হবে এ আশা করা যেতে পারে না। শাস্তি দিয়ে সংশোধনের আশাও খুব বেশী নেই।

বুদ্ধি ও অন্যান্য জন্মগত গুণের ওপরও চরিত্র ও নৈতিকতা কিছুটা নির্ভর করে। কিন্তু এর প্রতিকারের উপায় মানুষের আজও অনায়ত্ত। তবে যারা জন্মগত দুর্বলতা বা বিকৃতি নিয়েই জন্মেছে, সহানুভূতি ও সুশিক্ষা দিয়ে তাদেরও কিছুটা উন্নতিসাধন সম্ভব।

যেসব ছেলে বিনা কারণে অবিরত মিথ্যাকথা বলে তাদের নির্জ্ঞান মনে কি অমীমাংসিত বিরোধ রয়েছে, কি অতৃপ্ত অভাববোধ রয়েছে তা নির্ধারণের জন্যে বিশেষজ্ঞের সাহায্য প্রয়োজন হতে পারে। বিশেষজ্ঞের নির্দেশানুযায়ী উদ্দেশ্যমূলক খেলা, হাতের কাজ এবং আলোচনার মধ্য দিয়ে কখনো কখনো এজাতীয় শিশুদের মানসিক অস্থিরতা দূর করে, তাদের সুস্থ করে তোলা যায়। সদ্দৃষ্টান্ত, স্নেহ, সহানুভূতি, বিশ্বাস এবং বুদ্ধিদীপ্ত দৃঢ় পরিচালনা সর্বপ্রকার মানসিক বিকার সংশোধনের শ্রেষ্ঠ উপায়।

চুরি

চুরির মূল হল লোভ। আর লোভ হল মানুষের একটি আদিম রিপু। কিন্তু সমাজবদ্ধ মানুষ এই রিপুকে নানা শাসনে বেঁধে সংযত করে। শিশুর মনকে সমাজের সংস্কার যতদিন না স্পর্শ করে, ততদিন শিশু অসঙ্কোচেই লোভ করে এবং লোভ হলেই কেড়ে নিতে চেষ্টা করে। আপন ও পরের ভেদজ্ঞান এবং অধিকার -সম্বন্ধে বোধ শিশুর মনে জন্মে না, তাই 'চুরি করা' কথাটা তার কাছে অর্থহীন। কিন্তু সমাজপরিবেশে বর্ধিত হয়ে শিশু বুঝতে শেখে যে তার অধিকারের সীমা আছে। উপদেশ, শাসন ও শাস্তির মধ্য দিয়ে সে এই শিক্ষালাভ করে যে 'পরের' জিনিসে হাত দিতে নেই। গৃহে, প্রতিবেশীর আলয়ে এবং বিদ্যাস্থানে অল্পদিনেই সে পাকাপাকিভাবে এই শিক্ষালাভ করে

যে চুরি করা শাস্তিযোগ্য এবং বিষম লজ্জাকর অপরাধ। এবং অধিকাংশ শিশুই গৃহ ও সমাজের শিক্ষার ফলে বাহ্যত এ অপরাধে লিপ্ত হয় না, যদিও অন্তরে লোভ রিপুর উচ্ছেদ ঘটে না।

যে ছেলেমেয়েরা চুরি করে তাদের অপরাধ কতটা স্বেচ্ছাকৃত সে অনুযায়ী চার দলে ভাগ করা যেতে পারে।

(১) যাদের চুরিকর্মের জন্যে তাদের দায়ী করা যায় না। (ক) এদের মধ্যে আছে যারা বয়সে নিতান্ত ছোট এবং যাদের বুদ্ধি একেবারেই অপরিণত। (খ) যারা নিতান্ত ক্ষীণবুদ্ধি, যাদের নিজের ও পরের অধিকার -সম্বন্ধে পার্থক্য করবার ক্ষমতা জন্মে না। (গ) যারা জন্মাবধি নীতিবোধ-বর্জিত এবং পাপাচরণের অদম্য প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মেছে (morally defective persons—তবে অনেক আধুনিক মনোবিদের মতে এপ্রকার জন্মগত পাপাত্মা ব্যক্তি নেই)। (ঘ) মৃগী, জন্মগত সিফিলিস্, মস্তিষ্ক-প্রদাহ বা মস্তিষ্কে আঘাত বা আঘাতের ফলে মানসিক বিকৃতি -দ্বারা আক্রান্ত।

(২) যাদের চুরি করতে বাধ্য করা হয়। কখনো কখনো পিতামাতা বা দলের প্রয়োজন ও প্ররোচনায় শিশু চুরি করে।

(৩) যাদের চুরির জন্যে ব্যক্তিরও নিজস্ব কিছুটা দায়িত্ব আছে। যাদের বুদ্ধি কম এবং যারা অভিভাবন-প্রবণ (suggestible) তারা অনেক সময় দলের পরামর্শে চুরি করে।

(৪) যারা লোভের বশে, প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষায় অথবা হিংসাবশত চুরি করে—তারা অবশ্যই নিজ নিজ অপরাধের জন্য দায়ী।

ওপরের এই চারদল ছাড়াও আরো দুইদলের কথা উল্লেখ করা যায়, যাদের ক্রিয়া মনোবিদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বা তাৎপর্যপূর্ণ।

(৫) যারা বাহাদুরী নেবার জন্যে, নাটকীয়ভাবে মনোযোগ-আকর্ষণের জন্য চুরি করে। এজাতীয় চুরির নৈতিক হীনতা পূর্ববর্তী দলের তুলনায় কম হলেও এ দুষ্কর্মের দায়িত্ব তাদের বহন করতে হবে।

(৬) যারা নির্জ্ঞান মনে অমীমাংসিত সংঘাত থেকে মুক্তির পথ হিসাবে অনেক সময় নিজের ইচ্ছা -ব্যতিরেকে এমনকি ইচ্ছার বিরুদ্ধেই চুরি করে (Kleptomania)। এদের কর্ম-নীতির দিক থেকে বিচার না করে, এবং শাস্তি -দ্বারা সংশোধনের চেষ্টা না করে মানসিক বিকারের চিকিৎসা করা প্রয়োজন।

এই অপরাধ থেকে শিশুদের মুক্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুশিক্ষা- ও সুশাসন-সাপেক্ষ। পিতামাতা-শিক্ষকের সদ্দৃষ্টান্ত, নির্মল গৃহপরিবেশ, সহানুভূতিপূর্ণ অথচ দৃঢ় সুপরিচালনা (কখনো কখনো শাস্তি) -দ্বারা শিশুদের এই লজ্জাকর অভ্যাস থেকে দূরে রাখা সম্ভবপর। শিশুর মনের অভাববোধ ও অশান্তির কারণ দূর করলে এবং পরিবেশ ও সমাজ- বা পরিবার-ব্যবস্থার উপযুক্ত পরিবর্তন করতে পারলে চুরি করার কারণও আর থাকবে না। আধুনিক মনোবিদেরা এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই শিশুর সমস্ত অপরাধকে বুঝতে চেষ্টা করেন এবং সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে সংশোধনেরও চেষ্টা করেন। তারা প্রশ্ন করেন—কেন শিশু এ অপরাধ করছে? এই অপরাধের মধ্য দিয়ে শিশু তার কোন্ অভাব-বা অশান্তি-পরিপূরণের অক্ষম চেষ্টা করছে? কি স্বাভাবিক উপায়ে তার ন্যায্য আকাঙ্ক্ষাগুলির পূরণ সম্ভব? যে শিশুর নিতান্ত সঙ্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষাগুলি পূরণের ব্যবস্থা হল না, সে বড় হয়ে নিজের অজানিতেই সেই আকাঙ্ক্ষাগুলি নানা অসামাজিক উপায়ে পূরণের চেষ্টা করে—যদিও তখন বাস্তবিকপক্ষে এই অভাবগুলি তাকে পীড়া দেয় না। সুজান্ আইজ্যাক্স্ কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন, তাতে বোঝা যায় বাল্যে পিতামাতার স্নেহের অভাবজনিত ক্ষোভ এ চৌর্যাপরাধের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। বিবেচক মনোবিকলনে অভিজ্ঞ চিকিৎসক খেলাধুলা ও কাজের মধ্য দিয়ে শিশুর অবচেতন মনের অশান্তির মূল খুঁজে ব্যক্তির চেতন মনের সামনে তা তুলে ধরেন। তার সচেতন মনের যুক্তি, বুদ্ধি দিয়ে ব্যক্তি যখন নিজের অব্যবস্থিততার কারণ স্পষ্ট করে বিশ্লেষণ করতে পারে ও বুঝতে পারে তখন সে সহজেই নিজের সংশোধনে সমর্থ হয়।

গৃহ বা বিদ্যালয় থেকে পলায়ন

যা বিরক্তিকর বা বিপজ্জনক তার কাছ থেকে পলায়ন আত্মরক্ষার এক আদিম কৌশল। গৃহ বা বিদ্যালয় থেকে অনেক শিশু পালিয়ে যায় (truancy)। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। বাড়িতে বা বিদ্যালয়ে কিছু অপরাধ করে শাস্তির ভয়ে কোন ছেলে পালিয়ে যেতে পারে। এর জন্য দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই।

কিন্তু যদি দেখা যায় কোন শিশু পুনঃপুনঃ বাড়ি থেকে পালিয়ে বেড়ায়,

তা হলে বুঝতে হবে শিশুর মনে কোন গুরুতর অস্বাচ্ছন্দ্য, ভয় বা বিরক্তি রয়েছে, যা 'সে এড়াতে চাচ্ছে। একটি ছেলে প্রায়ই বিদ্যালয়ে অঙ্কের শিক্ষকের কাছে শাস্তির ভয়ে সে ক্লাসে আসতে চায় না। সে অঙ্কে কাঁচা, অঙ্ক ভুল করে, বা কষতে পারে না। শিক্ষক মহাশয় সহানুভূতি-সম্পন্ন হয়ে যদি তার অসুবিধাগুলি কোথায় বুঝতে চেষ্টা করতেন, তাকে অঙ্ক কষবার ঠিক পদ্ধতিটি বুঝিয়ে দিতেন, তা হলে এই ছেলের কাছে অঙ্ক এমন বিভীষিকা মনে হত না। অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষক অতিরিক্ত কঠোর এবং সহানুভূতি-শূন্য হলে, শিশুর সেই বিষয়টির প্রতিও বিরাগ জন্মায়।

যেখানে বাড়ি থেকে কোন ছেলে বারে বারে পালিয়ে যায়, সেখানে অনুসন্ধান করে প্রায়ই দেখা যায় যে দারিদ্র্য-হেতু শিশুর জীবনের মৌলিক অভাবগুলি পূরণের ব্যবস্থাও গৃহে নেই, সে একবেলা পেটভরে খেতে পায় না, শীতের রাত্রে গায়ের কোন আবরণ নেই, বর্ষায় ফুটো চাল দিয়ে জল পড়ে ঘর ভেসে যায়! কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা দারিদ্র্য-জনিত জৈব অভাব শিশুকে যত পীড়া দেয়, তার চেয়ে অনেক বেশী পীড়া দেয় স্নেহ ও সহানুভূতির অভাব। যে সব ছেলে ঘর থেকে বারে বারে পালিয়ে যায়, তাদের অনেকের ঘরেই রয়েছে নিষ্ঠুর বিমাতার নির্মম ব্যবহার। অথবা এমনও তো হতে পারে পারিবারিক অশান্তিতে গৃহ বিধ্বস্ত, শিশুর কাছে এই অশান্তিময় পরিবেশ অসহ্য। গৃহে খুব অভাব না থাকলেও এবং বিমাতার উৎপীড়ন না থাকলেও, যেখানে শিশু ঘর ছেড়ে বারে বারে পালিয়ে যেতে চায় সেখানে তার কারণ হতে পারে অজানা অ্যাড্‌ভেঞ্চারের রোমাঞ্চ কল্পনাপ্রবণ শিশুকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। এমন ছেলেরা যাত্রার দলের বা সার্কাসের দলের সঙ্গে সঙ্গে ঘর ছেড়ে দেশে-দেশে ঘুরে বেড়ায়। এমন ঘরছাড়া রোমাঞ্চ-পাগল ছেলের অনেক মনোরম ছবি রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ এবং দেশী-বিদেশী অনেক সাহিত্যে আছে। মনোবিদের চোখে এ ছবিগুলি সর্বাংশে সত্য নয়। এটা সম্ভব যে বৃহত্তর স্বাধীনতা এবং অজানার মোহও সব ছেলেদের এমন ভাবে আকর্ষণ করে। কিন্তু গৃহের পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিস্থাপন করতে পারছে না বলেই অশান্ত শিশু এমন করে গৃহের আপাত-নিরাপদ আশ্রয় ত্যাগ করে, এটাই সম্ভবত বাস্তবের দিক থেকে অধিকতর সত্য। আসল কথা এই সমস্ত শিশুর নিরাপত্তা-বোধ যে কোন কারণেই হোক্ বিঘ্নিত, তারা যে শুধু ঘর থেকেই পালিয়ে বেড়ায় এমন নয়, নিজেদের

কাছ থেকেও পালিয়ে বেড়ায়। এদের এই গভীর অশান্তির কারণ অবশ্যই অনুসন্ধানযোগ্য। কখনো কখনো এ অশান্তির মূল জন্মগত হতে পারে। জন্মগত দৈহিক স্নায়বিক মানসিক অস্থিরতা হয়তো তাদের এই যাযাবার-প্রবণতার জন্য কতকটা দায়ী। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর কারণ পরিবেশগত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিদ্যালয় বা গৃহের যে অভাব বা ত্রুটি শিশুদের এমন উদ্বিগ্ন করে তোলে, তা অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিবিধান-যোগ্য। গৃহ ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ প্রীতি ও সহানুভূতিপূর্ণ এবং আনন্দময় হলে, সেখানে শিশুর স্বাভাবিক সৃজনীশক্তি-বিকাশের উপযুক্ত সুযোগ থাকলে, শিশুর গভীর স্নেহাকাঙ্ক্ষা ও স্বাধীনতাস্পৃহা দুই-ই তৃপ্ত হবে এবং শিশু যখন বিশ্বাস করতে শিখবে যে তার সামান্য দোষত্রুটির জন্যে তাকে গুরুতর শাস্তি- ও নির্যাতন-ভোগ করতে হবে না তখন সে গৃহ বা বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক আশ্রয় ছেড়ে পালিয়ে যেতে চাইবে না। রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় স্থাপন করেন তখন তাঁর এই পরিকল্পনাই ছিল যে তিনি শিশুদের জন্য এমন মনোহারী বিদ্যালয় স্থাপন করবেন যা ছেড়ে শিশুরা বাড়ি যেতে চাইবে না—এমন বিদ্যালয় যেখানে শিশুর সৃজনীস্পৃহা ও সৌন্দর্যবুদ্ধি সম্যক বিকাশের নির্বাধ ক্ষেত্র পাবে। কিন্তু কবির সে কল্পনা আজও সার্থক হল কই?

শিশুর আরো কয়েকটি অনব্যবস্থিততা -সূচক ব্যবহার

বুড়ো আঙুল চোষা (Thumb-sucking)—চোষা (sucking) মানব-শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি। মাতৃস্তন্যপানে এই প্রবৃত্তির স্বাভাবিক পরিণতি। এতেই শিশু পায় তার জীবনপ্রদ খাদ্য ও গভীরতম তৃপ্তি। যেখানে মায়ের বুকে যথেষ্ট দুধ থাকে না, সেখানে শিশু বিকল্প সান্ত্বনা হিসাবে বুড়ো আঙুল চোষে। এ অভ্যাসটি এক বছর বয়সের মধ্যেই হয়।[২২] যে সব শিশু মাতৃস্তন্যে বঞ্চিত ও বোতলে দুধ খেতে অভ্যস্ত তাদের মধ্যে অভ্যাসটি বেশী দেখা যায়।[২৩]

২২ Skinner & Harriman—Child Psychology, p. 45

২৩ Dr. Benjamin Spock—Baby & Child Care, p. 234

এ অভ্যাসটি অল্পদিনের মধ্যেই গঠিত হয়ে যায় এবং অনেক শিশু রাত্রিতেও ঘুমের মধ্যে আঙ্গুল চোষে।

একেবারে ছোট শিশুর মধ্যে এ অভ্যাস চিন্তার কারণ নয়। বোধ হয় সমস্ত শিশুই মাঝে মাঝে মায়ের বুকের পরিবর্তে নিজের হাতের আঙ্গুল চোষে। এটা যে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে করে তা নয়। চোষার মধ্যেই সে কোন বিশেষ পরিতৃপ্তি পায়। মায়ের বুকের স্নেহময় স্পর্শ শিশু আকাঙ্ক্ষা করে—এটা তার অনুভূতির জীবনের একটি গভীর প্রয়োজন মেটায়। প্রথম ছ'মাস পর্যন্ত শিশু প্রত্যেকবার মায়ের দুধ (বা বোতল) অন্তত কুড়ি মিনিট চোষে।[২৪] মায়ের স্তনে দুধ যথেষ্ট না থাকলে স্বভাবতই শিশু অতৃপ্ত থাকে, আবার যদি মায়ের বুকে দুধ অতিরিক্ত থাকে বা বোতলের চুষির ফুটো বড় থাকে তা হলে অল্প সময়েই শিশুর পেট ভরে যায়, কিন্তু সে অতৃপ্ত থেকে যায়। এ অতৃপ্তির প্রকাশই অনেক সময়ে দেখা যায় আঙ্গুল চোষা -রূপ ক্রিয়ায়। প্রথম ছ'মাস যে সব শিশু মায়ের বুকের দুধ খেয়ে এবং আদর পেয়ে তৃপ্ত হয় তারা সাধারণত আঙ্গুল চোষার প্রয়োজন বোধ করে না। একবার অভ্যাসটি গঠিত হয়ে গেলে, যথেষ্ট খাদ্য পেলেও শিশু আঙ্গুল চোষে। খুব শৈশবে চোয়ালের হাড় নরম থাকে এবং আঙ্গুল চোষার অভ্যাস বেশী হলে শিশুর মুখ ছুঁচলো হয়ে যায়, দাঁতের মাড়িও সরে যায়।[২৫] অধিকাংশক্ষেত্রে দু'বছরের সময় ঐ অভ্যাস দূর হয়ে যায়। শিশু তখন অধিকতর খাদ্য পায়, তার মন অন্য নানা ক্রিয়ায় উৎসুক হয়। কাজেই সে আর আঙ্গুল চুষে সান্ত্বনা খোঁজে না।

তিন-চার বৎসর বা তার বেশী বয়সের ছেলেমেয়ে যারা আঙ্গুল চোষে তাদের দিকে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। **তাদের জীবনে অতৃপ্তি আছে এটা বোঝা যায়।** সম্ভবত মার আদর এ শিশু যথেষ্ট পায় নি। তাই অতি শৈশবের এ জৈব ক্রিয়ায় সে ফিরে যাচ্ছে এবং তার মধ্যে নিজের অতৃপ্তির সান্ত্বনা খুঁজছে। হঠাৎ বিভ্রান্তিকর অবস্থার সম্মুখীন হলে হতবুদ্ধি হয়ে অনেক কিশোর বালকই আঙ্গুল চুষতে শুরু করে। এটা পশ্চাদপসরণ (regression) -দ্বারা একটা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিস্থাপনের কৌশল। অনেক সময় মায়েরা এ সব শিশুদের বুড়ো আঙ্গুলে তেতো বা ঝাল মাখিয়ে

---

২৪ Skinner & Harriman—Child Psychology, p. 45

২৫ Bowley—The Natural Development of the Child, p. 23

দেন বা ধাতব আঙ্গুল-ঢাকা পরিয়ে এ অভ্যাস দূর করতে চেষ্টা করেন। এতে কখনো কখনো ফল হলেও ডাক্তার ও মনোবিজ্ঞানীরা এর বিরোধী।[২৬] এতে শিশুর অতৃপ্তি ও স্নায়বিক অস্বস্তি অনেক সময় বাড়িয়েই দেওয়া হয়। একেবারে শৈশবে এ অভ্যাস যাতে না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। একবার অভ্যাস হয়ে গেলে ছাড়ানো কষ্টকর। শিশুর পরিবেশ যাতে স্নেহপরিপূর্ণ হয়, মায়ের আদরে তার যেন কমতি না হয়, পেট ভরে যাতে সে দুধ পায় আর উপযুক্ত নানা বিষয়ে তার বিকাশ যাতে সুস্থ ও স্বাভাবিক ভাবে হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। যথাসম্ভব অনাবশ্যক উত্তেজনা ও মানসিক সংঘাতের কারণ থেকে শিশুকে রক্ষা করা উচিত।

তোতলামী (Stammering)—তোতলামী হচ্ছে কথা আটকে-আটকে যাওয়া। সাধারণত আট বছরের আগেই এ দোষটি দেখা দেয় এবং শতকরা নব্বুই বা তারো বেশী সংখ্যক শিশুদের তোতলামী বিনা চিকিৎসায়ই সেরে যায়। মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের মধ্যে এদোষটি বেশী দেখা যায়।[২৭]

এর বহু কারণ থাকতে পারে। এ দোষ সম্ভবত কিছুটা পরিমাণ বংশগত। মস্তিষ্কে বাক্য-উচ্চারণ-কেন্দ্রে কোন আঘাত বা অসুস্থতাও এর জন্যে দায়ী হতে পারে। ভারী জিহ্বা এর জন্যে দায়ী, এমন কথা কেউ কেউ বলেন। প্রসিদ্ধ বক্তা ডেমোস্থিনিস্ বাল্যে তোতলা ছিলেন। তিনি সংকল্প করলেন তোতলামী সারাতে হবে, তাই তিনি নাকি সর্বদা জিবের ওপর পাথরের নুড়ি রাখতেন। মস্তিষ্কের বাম গোলার্ধ (যা দেহের সমস্ত ডান দিকের অঙ্গাদি চালনা করে), দক্ষিণ গোলার্ধে তার আধিপত্য (dominance) -স্থাপনে সম্পূর্ণ সক্ষম না হলেও এটা হতে পারে।[২৮]

অধিকাংশ মনোবিদ্ একথা মনে করেন যে **শিশুর অনুভূতিগত কোন অস্বস্তি বা অশান্তি তার তোতলামীর একটা প্রধান হেতু।** এটা দেখা যায়, যে সব ছেলেরা ভীতু ও আত্মসচেতন তাদের মধ্যেই তোতলার সংখ্যা বেশী। ভয় পেলে, ক্ষেপে গেলে, ঘাবড়ে গেলে, তোতলামী বাড়ে।[২৯] তোতলার সব কথাই যে আটকে যায় তা নয়। এক একজন এক একটা

২৬ Speech Pathology in L. E. Travie's Handbook of Child Psychology
২৭ Skinner & Harriman—Child Psychology, p. 833
২৮ A. Bowley—The Natural Development of the Child, p. 136
২৯ Benjamin Spock—Baby & Child Care, p. 213

কথায় বেশী আটকে যায়। ডাঃ স্পক্-এর মতে দু'তিন বছর বয়সের সময়, যখন শিশু কিছু কিছু কথা শিখেছে অথচ সব মনের ভাব প্রকাশের পক্ষে তার ভাষার পুঁজি যথেষ্ট নয় তখন যে আকুলিবিকুলি, তা অনেক সময় তোতলামীর কারণ। তার পাওনা আদরে কম পড়ছে এমন **মানসিক অশান্তি বা ঈর্ষা শিশুর তোতলামীরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।** একটি ছোট শিশুর তোতলামী শুরু হল, যেদিন তার ছোট্ট নতুন আর একটি বোনকে নিয়ে মা হাসপাতাল থেকে ফিরে এলেন। বাবা বাড়ীতে হঠাৎ খুব ধমক-ধামক করেছেন, এর পরেই আর একটি শিশুর তোতলামী শুরু হল। মা হয়তো খুকুর বাহাদুরী দেখাবার জন্যে খুকুকে নূতন একদল অতিথির সামনে সদ্য-শেখা কবিতা আবৃত্তির জন্যে দাঁড় করিয়ে দিলেন, হয়তো তার পরেই শুরু হল খুকুর তোতলামী।[৩০] অনেক মনোবিজ্ঞানীর মতে বেঁয়ে বা ন্যাটা ছেলেদের জোর করে অভ্যাস পরিবর্তন করিয়ে ডান হাতে কাজ করাতে চেষ্টা করালে তোতলামী দেখা যায়। অনেকে মনে করেন বেঁয়ে হওয়ারই একটা প্রধান কারণ শিশুর জীবনে মানসিক অশান্তি বা স্নেহের অভাব।

যদিও এটা খুব মারাত্মক দোষ নয় তথাপি তোতলাকে বন্ধুবান্ধবেরা অনেক সময় ক্ষ্যাপায়। যারা অভিমানী তারা এর ফলে সমবয়সীদের সঙ্গ এড়ায়, বিমর্ষ হয়ে পড়ে, এটা তাদের ব্যক্তিত্বস্ফূরণের পরিপন্থী, এতে বুদ্ধির দিক থেকেও তারা কখনো কিছুটা পিছিয়ে পড়ে।

তোতলামীর লক্ষণ দেখা দিলেই পিতামাতার সতর্ক হওয়া উচিত। শিশুর শারীরিক কোন কারণে এটা হয়ে থাকলে, বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া দরকার হতে পারে। সর্বক্ষেত্রেই শিশুর পরিবেশে অশান্তি, উদ্বেগ ও উত্তেজনার কারণ-অনুসন্ধান করে তা দূর করা প্রয়োজন। পিতামাতা শিক্ষক ভাইবোন বন্ধুদের কাছে স্নেহ ও সহানুভূতি পেলে সহজেই এটা সেরে যেতে পারে। কিন্তু বাপ-মা এর জন্যে অতিরিক্ত চিন্তা-ভাবনা করলে তাও ভাল নয়। এটা শিশুর ওপর প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে। তার সঙ্গে স্বাভাবিক ব্যবহার করা দরকার, তার ত্রুটির জন্যে অতিরিক্ত দয়া দেখালেও শিশু মনে মনে বিরক্ত হয়। শিশুর দেহমনের সমস্ত বৈকল্যের চিকিৎসায়

৩০ A. W. Oates—Left-handedness in Relation to Speech Defects.

বেলায়ই পিতামাতা ও শিক্ষকের একথা স্মরণ রাখা ভাল যে স্বচ্ছবুদ্ধি-মার্জিত সহানুভূতি শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে সব চেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান।[৩১]

নখ কামড়ানো (Nail-biting)—স্কুলের নিচু ক্লাসে কোন কোন ছেলেমেয়ে দিশাহারা হলে নখ কামড়ায়। কখনো কখনো এর ফলে নখে ঘা হয়ে যায়। কোন কোন ছেলেমেয়ে বিষম রেগে গেলে বা ভয় পেলে মাথা ঠোকে (head-banging) বা নিজের গায়ের চামড়া খোঁটে। **এ সবই অনুভূতির জীবনে অস্বস্তি বা অসন্তোষের লক্ষণ।** হয়তো বাপ-মা বা শিক্ষক মারধোর করেন, জোরে গালাগালি করেন। এতে শিশু নিজের ওপর ভরসা হারিয়ে ফেলে, অসহায় বোধ করে। কখনো কখনো বদরাগী শিক্ষক বা পিতামাতার ওপর শোধ তোলবার আকাঙ্ক্ষাটা নিজের ওপর পীড়ন -দ্বারাই পরোক্ষভাবে মেটায়।[৩২] **কখনো কখনো এমনি করেই সে হয়তো দৃষ্টি-আকর্ষণ করতে চায়,** তার স্নেহবঞ্চিত হৃদয়ের অভিযোগ জানায়।

বোঝা শক্ত নয়, এর চিকিৎসা হচ্ছে শিশুর জীবনে ভয় রাগ বা অশান্তির কারণটি খোঁজ করা। শাস্তি দিয়ে তা দূর করার ফল বরং উল্টো হয়। যে সব ছেলের এ অভ্যাস আছে তাদের ভয়ের গল্প পড়তে না দেওয়া, ভয়ের ছবি না দেখতে দেওয়া উচিত। মেয়ের বেলায়, তাকে আদর করে সুন্দর নেইল পলিশ ইত্যাদির সেট্ উপহার দিলে উপকার হতে পারে। পলিশ দিলে তার হাত সুন্দর দেখায়, মানুষে প্রশংসা করে, এ দেখলে আর সে নখ কামড়ে হাতের চেহারা কুশ্রী করবে না।[৩৩]

শয্যামূত্র (Enuresis or bedwetting)—একেবারে বাচ্চারা দু'তিন বছর পর্যন্ত বিছানায় মোতেই। প্রস্রাবটা ধরে রাখাটাও (bladder control) শিক্ষা-সাপেক্ষ। ছোট শিশু সেটা আয়ত্ত করতে পারে না। তবে বিছানা ভিজে গেলে ঠাণ্ডা লাগে, শোবার আরাম নষ্ট হয়, মা বিরক্ত হন—এ কথা অস্পষ্টভাবে শিশু বোঝে। আর অনেক মা-ই ছোট বয়স থেকেই বিছানার বাইরে নির্দিষ্ট সময় পরে পরে শিশুকে প্রস্রাব করান। এ সব থেকে অভ্যাসটা অধিকাংশ শিশুই করে ফেলে আর একটু বড় হলে বিছানায় মুতলে সবাই

৩১ Skinner & Harriman—Child Psychology, p. 193
৩২ Bowley—The Natural Devplopment of the Child, pp. 64-65
৩৩ Dr. B. Spock—Baby & Child Care, p. 295

ঠাট্টা করে, বাবা-মা হয়তো শাস্তি দেন, মানুষের কাছে লজ্জা পেতে হয়, কাজেই অধিকাংশ শিশুই সতর্ক হয়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যায় ছয়-সাত বছর পর্যন্ত বিছানায় মোতার দৃষ্টান্ত কম নয়। কখনো কখনো দশ-বারো বৎসর পর্যন্তও এ বদভ্যাস দেখা যায়। এমন কি পরিণত বয়সেও বিছানা নষ্ট করে এমন মানুষ আছে।[৩৪]

কোন দৈহিক কারণ যথা মূত্রাশয়ের পেশীর দৌর্বল্য এর মূলে থাকতে পারে। শিশুকালে বিছানার বাইরে নিয়মিত সময়ে প্রস্রাব করবার অভ্যাসটির অভাবও এর কারণ হ'তে পারে। তবে **অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর পশ্চাতে মানসিক অশান্তি থাকে।** ভীতু অভিমানী ছেলেদের মধ্যে এ বদভ্যাস বেশী দেখা যায়।[৩৫]

নতুন একটি ভাই বা বোন জন্মালে অনেক শিশু বিছানায় মুততে শুরু করে। তার মায়ের স্নেহের অংশীদারকে শিশু খুশীর চোখে দেখে না। মার স্নেহ সে আর পাবে না এমন ভয় শিশুর মনে জাগে।[৩৬] মার ওপর তার রাগ ও অভিমান হয়। **সে তার নিজের দিকে দৃষ্টি-আকর্ষণ করতে চায় আর বাবা-মার ওপর রাগ (aggressive feeling) প্রকাশ করে। শয্যামূত্রের এও একটা প্রধান কারণ।**[৩৭] মা অল্পবয়সে মারা গেলে শিশুদের অনুভূতির জীবনে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে শয্যামূত্র দেখা যায়। মা-মরা অথবা পরিত্যক্ত শিশু, যারা নার্সারীতে মানুষ হচ্ছে তাদের মধ্যে এ অভ্যাস বেশী দেখা যায়। মায়ের স্নেহের অভাবে শিশুর কতরকমের যে বৈকল্য দেখা দেয়, তা বর্তমানের শিশু-মনোবিজ্ঞানীরা বহু পর্যবেক্ষণ -দ্বারা জানতে পেরেছেন।

এ রোগ সারাবার উপায়—শিশুর দৈহিক ত্রুটি আছে কিনা এটা পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজন হলে চিকিৎসা করানো উচিত। নিয়মিত সময় বিছানার বাইরে প্রস্রাব করানো অভ্যাসটির দিকে মার দৃষ্টি দেওয়া উচিত। তবে এ বিষয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করে শিশুকে উত্যক্ত ও উদ্বিগ্ন করে তুললে ফল অনেক সময় উল্টো হয়! রাত্রে শোবার আগে প্রস্রাব করানো উচিত।

৩৪ Bowley—The Natural Development of the Child, p. 140
৩৫ Dr. Benjamin Spock—Baby & Child Care, p. 406
৩৬ Bowley—The Natural Development of the Child, p. 49 & 130
৩৭ F. M. Tengaden—Child Psychology for Professional Workers, p. 117

রাত্রে জল কম খেতে দিলে অথবা গ্লুকোজ খেতে দিলে উপকার হতে পারে। কিন্তু সকলের থেকে বেশী প্রয়োজন তার মাতৃস্নেহের আকাঙ্ক্ষা মেটানো। তার মনে নতুন ভাই বা বোনের প্রতি ঈর্ষাটা যাতে প্রবল না হয় সে চেষ্টা করা দরকার। তাকে নানা খেলাধুলায় ভুলিয়ে রাখা দরকার। আর এ অপকর্মটি করে ফেললে তাকে বেশী লজ্জা দিলে ফল খারাপই হয়। তাকে স্বাভাবিক স্নেহের সঙ্গে এ অভ্যাসটি দূর করতে সাহায্য করলে উপকার বেশী হবার সম্ভাবনা।

শিশুর সমস্ত বৈকল্য-চিকিৎসার বেলায়ই এ উপদেশটি স্মরণ রাখা উচিত। "ভয় এবং তার সঙ্গী উদ্বেগ এ দুটি মৌলিক অনুভূতি শিশুর সুস্থ জীবনের সব চেয়ে বড় শত্রু, কাজেই পিতা, মাতা বা শিক্ষক যাঁর ওপরে শিশুপালনের দায়িত্ব ন্যস্ত আছে তাঁদের দেখতে হবে যাতে শিশুরা এ দুটি অনুভূতি -দ্বারা ঘন ঘন বা তীক্ষ্ণভাবে আক্রান্ত না হয়।"

একাদশ অধ্যায়

অবাধ্য শিশু

জটিল যান্ত্রিক সভ্যতার কুফল

বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার একটি অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ জীবনের জটিলতাবৃদ্ধি। যেখানেই জীবন জটিল সেখানেই ব্যক্তির পক্ষে এই সমস্যা-সঙ্কুল জটিল সমাজ ও পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলা চেষ্টাসাপেক্ষ এবং কষ্টসাধ্য। অধিকাংশের পক্ষে এই খাপ খাইয়ে নেওয়া মোটামুটিভাবে সম্ভব হয় বলেই সভ্যতার অগ্রগতিও অব্যাহত থাকে। কিন্তু কিছু সংখ্যক ব্যক্তি নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। এরা নিজেরাও সুখী হতে পারে না, অন্যকেও সুখে থাকতে দেয় না। সমাজের প্রচলিত রীতি ও বিধি তারা ভঙ্গ করে এবং সমাজ -কর্তৃক ধিক্কৃত হয়।

অপরাধী -সম্বন্ধে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী

পূর্বে সমাজ এদের বলত অপরাধী (criminals), আর বর্তমানে বলে কর্তব্যকর্মে ত্রুটিপরায়ণ (delinquent)। এই ভাষার পরিবর্তন দৃষ্টিভঙ্গীর একটি মৌলিক পরিবর্তন সূচনা করে।

পূর্বের দৃষ্টি ছিল সমাজের দিক থেকে। যারা সামাজিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে তারা দুষ্ট, কারণ তারা সমাজের ক্ষতি করেছে, সুতরাং সমাজ তাদের শাস্তি দেবার কথাই চিন্তা করত। কোন্ অপরাধে কোন্ শাস্তি দেওয়া বিধেয়, তা নির্ধারণ করাই ছিল বিবেচনার বিষয়। কিন্তু মনোবিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমান মানুষ অপরাধকে বিচার করে তার সামাজিক ফলাফলের দিক থেকে নয়,—অপরাধ যে করে তার দিক থেকে। কেন মানুষ অপরাধ করে? সে যে সমাজের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারল না—তার জন্যে তার নিজের ভেতরের এবং বাইরে সমাজের কোন্ কোন্ অবস্থা দায়ী? অর্থাৎ অতীতের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর উদ্দেশ্য ছিল অপরাধের বিচার ও শাস্তি, বর্তমানের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর উদ্দেশ্য হল এর কারণ-অনুসন্ধান

এবং সম্ভব হলে সে অবস্থা- দূরীকরণ -দ্বারা ব্যক্তির সংশোধন এবং অপরাধ-নিবারণ। টাউল্ (Towle) এই দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য ছোট একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা চমৎকার ভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন:—**আগেকার দিনে আমরা বলতাম, "এ চোর। চোরদের নিয়ে আমরা কি করব?" এখন বলি—"এ একজন মানুষ, এ চুরি করে। কেন চুরি করে তা আমাদের বুঝতে হবে।"**[১]

শিশু কেন অপরাধ করে?

অপরাধকে বুঝতে হলে ফলাফল -দ্বারা তা বোঝা যায় না। অপরাধ তো একটা কার্য, তার কারণটিকে জানলেই তার প্রকৃত বিচার সম্ভব হয়। শিশু কেন অপরাধ করে? এর মধ্য দিয়ে তার কোন অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হয় নিশ্চয়ই। তার সমাজপরিবেশের সঙ্গে কেন সে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারল না? সমাজশৃঙ্খলা ভঙ্গ করে সে সমাজকে আঘাত করতে চায় কেন? সমাজের কোন্ দাবি তার কাছে অসহনীয় হয়েছিল? সমাজের প্রতি তার বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর কারণ কি? বর্তমানের সমাজবিজ্ঞানী এই বিবিধ জটিল প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চান।

একটি দৃষ্টান্ত—

মা ফাল্গুন মাসের দুপুরের চন্‌চনে উজ্জ্বল রোদে তাঁর দামী শাড়ী-জামাগুলি মেলে দিয়েছেন। বারে বারে ছেলেমেয়েদের নিষেধ করেছেন যেন সেগুলিতে হাত না দেয়। ছোট খোকা সকাল থেকে মার পিছু পিছু ঘুরেছে, কত হাজারো প্রশ্ন তার মনে। কিন্তু মা আজ ব্যস্ত, কোন্ বিয়ে বাড়িতে আজ নিমন্ত্রণ, বাড়ির রান্নাখাওয়া আজ শীঘ্র সারতে হবে। কতবার খোকা মার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে, মা "সর্ সর্" করে সরিয়ে দিয়েছেন—শিশু ক্ষুব্ধ অভিমানে নিজের মধ্যে গুমরে মরছে। অন্য দিন মা দিনের মধ্যে কতবার আদর করেন, অন্তত একবার হলেও কোলে করে চুমু খান। আর আজ? সে যে আছে, তার যে ক্ষুধা পায়, তার মনের

[১] Yesterday we said, "This is a thief. What to do with thieves?" Today we say, "This is a person who steals" and try to understand why he steals.

মধ্যে যে হাজারো প্রশ্ন ঘুরে মরছে,—সে কথাই আজ সকলে যেন ভুলে গেছে! এরই মধ্যে বাবা অফিসে যাবেন,—মা তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে মাছের ঝোল নামালেন,—একটি বেগুন কেটে ভাজলেন,—ভাত বেড়ে পাখার হাওয়ায় গরম ভাত ঠাণ্ডা করে দিলেন,—সামনে বসে গল্প করে (সেই বিয়েবাড়ির নিমন্ত্রণের গল্প!) 'ওটা খাও', সেটা খাও' বলে বাবাকে সেধে খাওয়ালেন,—খাওয়া হলে আঁচাবার জন্যে ঘটি ভরে জল আগিয়ে দিলেন,—গামছা দিলেন,—আবার অফিসে যাওয়ার সময় দুটি পান বাবার হাতে দিলেন,—হেসে বললেন, "আজ শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর অফিস থেকে ফিরো।" এতক্ষণের মধ্যে খোকা কতবার বাবার কাছ দিয়ে হেঁটে গেছে (বাবা যা গম্ভীর!), কিন্তু কই, কেউই তো খোকাকে একবার কাছে ডাকলেন না।

খোকার মাথায় আগুন ছুটছে! সেও সকলকে দেখে নেবে। ওই তো বাবার টেবিলের ওপর দামী কালো কালির দোয়াতটা! সে বিদ্যুদ্বেগে ছুটে কালির দোয়াতটা হাতে নিয়ে বাইরে দৌড় দিল—সবটা কালি ঢেলে দিল মার সবচেয়ে জমকালো লাল বেনারসী শাড়ীখানার ওপরে। তারপর আছাড় দিয়ে দোয়াতটা ভেঙে ছুটে পালাল! 'বেশ হয়েছে—আক্কেল হয়েছে'।

শোর উঠল, "মা, মা ছাখোসে, ছোট খোকা কি সব্বোনাশ করেছে—তোমার লাল বেনারসী—।" মা ছুটে বার হলেন। দাদা, দিদি, পিসিমা, ঝির সম্মিলিত কলরব। "কি দস্যি ছেলে বাবা, বড় হলে এ ছেলে জেলে যাবে"; "কোথায় গেল লক্ষ্মীছাড়া, ওকে মেরে হাড়গোড় ভেঙ্গে দেব"; "বাবা এলে দেখো, ওর কি হাল করেন"; "অন্তত দেড়শ টাকার কমে ওরকম শাড়ী আজকাল হয় না"; "কি পরে আজ যাবে নিমন্ত্রণে?" "বাবু এলে তাঁকে কেউ বোলো না—যা হবার হয়েছে, কিন্তু কোথায় গেল লক্ষ্মীছাড়া ছেলে? ওরে, তোরা খোঁজ ওকে—সকাল থেকে ওই একটু দুধ-রুটি খেয়েছে—ওর নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে",—"ওতো এমন ছিল না—ওই পাশের বাড়ীর বজ্জাত মানুকের সাথে মিশে গোল্লায় গেল"—"খোকা! ও খোকা!"

খোকা সিঁড়ির নিচে অন্ধকারে লুকিয়েছে—সব কথাই সেখানে থেকে শোনা যায়—কেমন নাটকীয় ব্যাপার! বুক কাঁপছে ভয়ে—উত্তেজনা উবে গিয়ে, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে—কি মারটাই না জানি খেতে হবে! কান্না পাচ্ছে—ক্ষুধা পেয়েছে;—কিন্তু তবুও খোকাকে সকলে ভোলে নি—খোকা ফ্যালনা নয়—ওই তো মার ডাক—"খোকা! ও খোকা!"

নিশ্চিতই খোকার বিচার হবে, সে শাস্তি পাবে, দেড়শ টাকার শাড়ী নষ্ট করার জন্যে। কিন্তু এও অপরাধবিজ্ঞানীর দৃষ্টি এড়াবে না যে খোকার এ অপরাধ স্নেহবঞ্চিত হৃদয়ের ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ—নিজের ক্ষুণ্ণ আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করবার ছেলেমানুষি অদ্ভুত কৌশল।

অন্তর্দ্বন্দ্ব-মীমাংসার বিকৃত চেষ্টা—অপরাধ

সমাজবিজ্ঞানীর কাছে 'অপরাধ' অন্তর্দ্বন্দ্ব-মীমাংসার বিকৃত প্রচেষ্টা। এ একটি মানসিক অস্থিরতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে—সেই জন্যেই এর মূল্য। এ রোগ নয়—এ রোগের বহিঃপ্রকাশ। মেরিল (Merrill) সত্যিই বলেছেন: শিশুর অপরাধমূলক কাজ তার ভাবের আবেগ ও প্রচণ্ডতাকে বিশেষভাবে প্রকট করে। বস্তুত অপরাধ এই মানসিক অবস্থা থেকে উদ্ভব হয়। অপরাধ-পরায়ণ শিশুকে বোঝবার পক্ষে এর গুরুত্ব এই যে, এটা তার অন্তর্দ্বন্দ্বের, তার চারিত্রিক অসামঞ্জস্যের (maladjustment) লক্ষণ।[২]

ডিলিংকোয়েন্ট কে?

কর্তব্যকর্মে ত্রুটিপরায়ণ, অবাধ্য বা ডিলিংকোয়েন্ট কে? এ কি জন্মগত? যারা এরকম অবাধ্য তারা সাধারণ সুস্থ মানুষদের চেয়ে পৃথক কিসে? এই দুই শ্রেণীর মধ্যে গুণগত প্রভেদ আছে কি? দুই দলের মধ্যে সমাজ ও পরিবেশের প্রভাব, মানসিক গঠন, জীবনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ -সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গীর কি প্রভেদ? এ সমস্ত প্রশ্নের সর্বজনসম্মত উত্তর পাওয়া যায় নি। তবে ইয়োরোপ ও আমেরিকায় এ প্রশ্নগুলি গভীরভাবে ভূয়োদর্শন ও বিচিত্র পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিবেচিত হচ্ছে। বিশেষ করে সে সব দেশে শিশু-অপরাধীদের সম্পর্কে নিবিড়ভাবে চিন্তা শুরু হয়েছে—কারণ তাদের সমাজ-জীবনে এটি একটি বিষম সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের দেশে এ সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়েছে তা যৎসামান্য এবং এ সমস্যা-সমাধানের জন্য কোন চেষ্টাই প্রায় হয় নি বলা চলে। এমন কি, এ যে একটা 'সমস্যা'

২ The delinquent act has for the child a certain dramatic quality that highlights the emotional tensions and stresses of which the act is the resultant. In understanding the delinquent child, the delinquent act is important only as an indication of conflict, a symptom of maladjustment...

সে বোধই প্রায় জাগ্রত হয় নি। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের যে ভিত্তির ওপর এ সমস্যার আলোচনা এবং এর প্রতিকার হতে পারে, সে ভিত্তিই প্রায় এখনও রচিত হয় নি। তাই আমাদের সম্পূর্ণভাবেই বিদেশী লেখকদের ওপর নির্ভর করতে হয়।

অবাধ্য শিশুর সংজ্ঞা

অবাধ্য শিশু বা ডিলিংকোয়েণ্ট কাকে বলব? এ প্রশ্ন নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে—অনেক গবেষণা চলেছে, কিন্তু মতভেদও এ বিষয়ে প্রচুর। ঠিক কোন জাতীয় কার্যকে অবাধ্যতা বলা যাবে, কি এর বৈশিষ্ট্য, এর কারণই বা কি—এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। এ বিষয়ে সিরিল বার্ট (Cyril Burt)-এর মতটি উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর সংজ্ঞা অনেকে আলোচনার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে থাকেন। বার্ট বলেন: 'সেই শিশুকেই আইনগত অর্থে ডিলিংকোয়েণ্ট (বা অবাধ্য) বলা হবে যার মধ্যে এমন গুরুতর অসামাজিক মনোভাব বা ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যায় যার বিরুদ্ধে সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বা গ্রহণ করা উচিত।"[৩]

কিন্তু কোন্ ব্যবহার গুরুতররূপে সমাজবিরোধী তা নিয়ে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মত বর্তমান; একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। পরের বাগান থেকে ফুল চুরি করা, সকল অবস্থাতেই, বিলাত প্রভৃতি দেশে 'অসামাজিক ব্যবহার'। কিন্তু আমাদের দেশে সরস্বতী পূজোর আগের দিন রাত্রে ফুল চুরি অসামাজিক ব্যবহার তো নয়ই, বরং অত্যন্ত ধর্মকার্য বলে সমর্থিত।

অপরাধের গুরুত্ব-বিচার

সমাজবিরোধী ব্যবহারের বিচিত্রতাও একটা সমস্যা। ঘুমন্ত পণ্ডিত মশায়ের টিকির ডগা কেটে নেওয়া এবং দল বেঁধে রাত্রিতে মেয়ে-হস্টেলে হানা দিয়ে তাদের শাড়ী-জামা জোর করে কেড়ে আনা, দুইই অসামাজিক

৩ A child is to be regarded as technically delinquent when his anti-social tendencies appear so grave, that he be comes, or ought to become, the subject of official action. Cyril Burt—The Young Delinquent, p. 15

ব্যবহার—কিন্তু তাদের মধ্যে প্রভেদ কি শুধু পরিমাণগত? অসামাজিক আচরণেও কি জাতিগত ভেদ আছে?

অসামাজিক আচরণের বা অপরাধের গুরুত্বই শিশুকে বিচার করবার নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি নয়। পূর্বেই বলা হয়েছে শিশুর অপরাধটি এ-ই প্রমাণ করছে যে শিশু সমাজের রীতিনীতি ও দাবির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না। কিন্তু অপরাধের গুরুত্ব সমাজের সঙ্গে শিশুর অসঙ্গতির গুরুত্বজ্ঞাপক নয়। মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে অপরাধী শিশুকে তার সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের ও পরিবেশের পটভূমিকাতেই বুঝতে হবে।[৪]

দুটি ছেলে—অবনী ও ইয়াসিন—একত্র হয়ে দরিদ্র কাসেমের গাছ থেকে শীতের রাত্রে খেজুরের রস চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ল। অবনী নিচে ছিল, ইয়াসিন গাছে উঠেছিল। টের পেয়ে কাসেম বের হয়ে অবনীকে তাড়া করে, অবনী একখানা খোলা ছুরি দিয়ে কাসেমকে গুরুতর আঘাত করে। শোরগোল শুনে লোকজন জড় হয়ে অবনীকে ধরে ফেলে। ইয়াসিনও গাছ থেকে নেমে পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে। প্রচুর উত্তমমধ্যমের পর তাদের থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। বিচারে অবনীর ২০০৲ টাকা জরিমানা ও একমাস জেল এবং ইয়াসিন-এর ৫০৲ জরিমানা এবং জরিমানা অনাদায়ে ১৫ দিন জেল হয়। অবনীকে শেষ পর্যন্ত জেলে যেতে হয় নি। তার বাবা ৫০০৲ টাকা জরিমানা দিয়ে ছেলেকে ছাড়িয়ে আনেন।

বিচারকের বিচারে অবনীর অপরাধ বেশী গুরুতর, তার শাস্তিও তাই বেশী হল। কিন্তু একথা কি তাতে প্রমাণিত হল যে অবনী অধিকতর অপরাধপ্রবণ, অথবা সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে তার অসঙ্গতি ইয়াসিনের তুলনায় বেশী?

এ ঘটনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে মনোবিজ্ঞানে উৎসাহী দু'জন সমাজসেবী কর্মী যে তথ্য তাদের সম্বন্ধে সংগ্রহ করেন, তা এই :—

অবনীর বয়স প্রায় ১৪ বছর। পিতামাতার একমাত্র সন্তান। পিতা

৪ The seriousness of the offence is no wise a criterion of the extent of the social maladjustment of the offender. It is a commonsense observation that the delinquent act without the frame of reference of the total personality of the delinquent actor has little psychological meaning. Maud Merrill—Problems of Child Delinquency, p. 5

সরকারী চাকরি করেন। বদলির চাকরি। এখানে ছয় মাস আগে এসেছেন। বাপ-মা বাইরে অন্য কোন ছেলের সঙ্গে মিশতে দেন না অথবা বাইরের কেনা খাবার কখনো খেতে দেন না। চাপরাশী গিয়ে স্কুলে পৌছে দেয়, ছুটি হলে নিয়ে আসে। স্কুলের ছাত্রেরা 'খুকী' বলে ওকে ঠাট্টা করে। স্কুলে বা পাড়ায় কোন বন্ধুবান্ধব নেই। বাড়িতে অনেক বাংলা ডিটেকটিভ বই আছে, তা সে পড়ে। কোন প্রকার খেলাধুলায় উৎসাহ নেই। মা বৃহস্পতিবার 'লক্ষ্মীর আসন' দেন। তা ছাড়া বাড়িতে কোন ধর্মালোচনা হয় না। বাসায় রেডিও আছে। মাসে ৩।৪ দিন মার সঙ্গে সিনেমা দেখতে বাধা নেই।

সেদিন রবিবার সকালে বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়ে অবনী ইয়াসিনকে পরম আনন্দে খেজুরের রস কিনে খেতে দেখে। কিন্তু ভেতরে গিয়ে মার অনুমতি চাইতে গেলে তিনি নিষেধ করেন। যাই হোক্, বারান্দায় দাঁড়িয়ে ইয়াসিনের সঙ্গে আলাপ হয়—সে পাড়ারই ছেলে, বয়সে তার চেয়ে কিছু বড়। সে বলে, শীতের রাত্রে রস চুরি করে খাওয়া কি রকম মজা! কথায় কথায় পরামর্শ স্থির হয়। রাত্রে ৩টার সময় ইয়াসিন জানালায় এসে টোকা দেয়। অবনী ভয়ে ভয়ে দরজা খুলে বাইরে আসে। তার ভয় করতে থাকে। ইয়াসিন তাকে আশ্বস্ত করে এবং জামার পকেটে একটি ছুরি নিতে বলে।

ইয়াসিনের বয়স ষোল। এ পাড়ারই স্থায়ী বাসিন্দা। বাপ রাজমিস্ত্রী। সারাদিনই প্রায় বাড়ীর বাইরে থাকে। ঘরে বিমাতা। তাকে একেবারে দেখতে পারে না। তার সৎমা ও সৎভাই-বোনরা তাকে সর্বদাই গালাগালি করে, বাপের কাছে নালিশ করে তাকে মার খাওয়ায়। পড়াশুনা সামান্যই হয়েছে। এক বিড়ির দোকানে তার মতো এবং তার চেয়ে বয়স্ক বদলোকদের সঙ্গে বসে অশ্লীল গল্প করে বিড়ি পাকায়। বাসায় সে জলখাবার খেতে পায় না। তবে চুরি করে টাকা ঘরে নিলে তখন কিছু খাতির হয়। আর তারও অংশে বাবা-মা ভাগ বসায়। বাবা প্রায়ই তাড়ি খায়। ঘরে ঝগড়াঝাঁটি মারপিট লেগেই আছে। একটা বোনের বিবাহ হয়েছিল। স্বামী তালাক দিয়েছে। তারপর আর এক দর্জির সঙ্গে সিলেট পালিয়ে গিয়েছে। পাড়ায় তার ছোটখাটো একটি দল আছে। সে-ই সর্দার। নানা উৎপাত করে। তবে দরিদ্রের প্রতি মমতা আছে। কেউ তার সাহায্যপ্রার্থী হলে সাধ্যমত সাহায্য করে।

এ থেকে দেখা যাবে অপরাধের মাত্রা অনেক কম হলেও ইয়াসিনের 'রোগ' অনেক বেশী জটিল ও গুরুতর এবং তার সংশোধনও অনেক বেশী কষ্টসাধ্য। এই রকম অনুসন্ধানের ফলে আমরা অবাধ্য শিশুর অপরাধের পটভূমিকা বিশ্লেষণ করে তার মূল-অনুসন্ধান করতে পারি। শিশুর মনের ওপর সামাজিক কি কি প্রভাব ক্রিয়া করছে (social pressures), তার মনের গঠনটিই বা কেমন, তা জানলে তবেই 'অপরাধ'টির প্রকৃত মান-নির্ধারণ সম্ভব। এই কঠিন কাজটি সমাজসেবী মনোবিজ্ঞানীকে করতে হয়। আমাদের দেশে শিশুদের বিচারের জন্য আলাদা ব্যবস্থা (Juvenile court) নেই বললেই চলে। শিশুদের অপরাধের মনোবৈজ্ঞানিক সহৃদয় বিশ্লেষণ ও অভিভাবক ও শিক্ষকদের অবাধ্য শিশুদের সংশোধনের জন্যে উপদেশ দেওয়ার উপযুক্ত গবেষণাগার ও চিকিৎসালয় (Child-guidance Clinic) তো আমাদের দেশে আরও দুর্লভ।

॥ ২ ॥

অপরাধপ্রবণতা কি জন্মগত ?

এটি একটি প্রাচীন ধারণা যে অপরাধীরা একটা আলাদা 'জাত'। সুস্থ সুনীতিসম্পন্ন মানুষদের চেয়ে তারা আলাদা। জন্ম থেকেই এরা মানসিক কোন বিকৃতি নিয়ে জন্মে—যেমন দুর্ভাগা মানুষ জন্মে চক্ষুহীন, অঙ্গহীন হয়ে। আবার যাঁরা ধার্মিক তাঁরা বলবেন, এরা ভগবানের অভিশাপ—সমাজের কলঙ্ক। ভগবানই এদের এই কলঙ্কের ছাপ (stigmata) দিয়ে পাঠিয়েছেন।

বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে কতকটা এই জাতীয় মতবাদ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রমাণের চেষ্টা করেছেন লোম্ব্রোসো (Lombroso)। তাঁর মতে মানুষের প্রাচীন পূর্বপুরুষ হচ্ছে বন্য পশুরা। সুতরাং কখনও কখনও জন্মগত কোন কারণে পশ্চাদাবর্তন (atavism) ঘটে এবং তখন পশুর মতো দৈহিক গঠন ও মানসিক প্রবৃত্তিসম্পন্ন মানুষ জন্মগ্রহণ করে—এরাই হচ্ছে 'জাত অপরাধী' (criminal type)। লোম্ব্রোসো এদের জাতিবিভাগ করতে চেষ্টা করেছেন।

বর্তমানে এ মতবাদ অবৈজ্ঞানিক বলেই প্রমাণিত ও বর্জিত হয়েছে। উইলিয়াম হীলি (William Healy—ইনিই প্রথম মনোবৈজ্ঞানিক

চিকিৎসাগার স্থাপন করেছিলেন) বহু অনুসন্ধান করেও সম্পূর্ণ নীতিজ্ঞান-বিবর্জিত অথচ অন্য দশজনের মতো বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের খোঁজ পান নি।[৫]

কিন্তু কিছুটা সংশোধিত আকারে এই মত বিলাতে এখনও প্রবল এবং বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ট্রেডগোল্ড (Tredgold) কতক পরিমাণে এ মতের সমর্থক। এ বিষয়ে সিরিল বার্ট-এর মত বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'দি ইয়ং ডিলিংকোয়েণ্ট' এ বিশদভাবে এ প্রশ্নটি আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে অপরাধীর বংশানুক্রমিকতা-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই—এর কোন বংশগত প্রভাব থাকলে তা গৌণ। কিন্তু এই মতবাদ যে এখনও ইংল্যাণ্ডের চিন্তাকে প্রভাবান্বিত করছে তা তিনি স্বীকার করেন।[৬] ইংল্যাণ্ডের Mental Deficiency Act, 1913, জন্মগত নীতিজ্ঞান-বিবর্জিত মানুষের অস্তিত্ব স্বীকার করে—সে আইন বলে, "A moral imbecile is a person who from birth or from an early age displays some permanent mental defect, coupled with strong vicious or criminal propensities, on which punishment has little or no deterrent effect."

যদিও আমেরিকায় এ মতবাদ গ্রহণ করা হয় না তথাপি সাম্প্রতিক কালে হুটন ও গ্লুয়েক্স (Hooton and Gluecks—এঁরা স্বামীস্ত্রী) বহু অপরাধীর দৈহিক গঠন পরীক্ষা করে তারা যে সাধারণ সুস্থ মানুষদের চেয়ে এ বিষয়ে কিছুটা ব্যতিক্রম তা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন।[৭] গ্লুয়েক-দম্পতি দেখাতে চেষ্টা করেছেন এ অপরাধীদের মধ্যে একদল শাস্তি বা চিকিৎসার দ্বারা সংশোধিত হয়। এরা সাধারণ মানুষদের চেয়ে বেশী তফাত নয়। কিন্তু একদল আছে যারা বারে বারেই অপরাধ করে (recidivist) এবং যাদের শাস্তি দিয়েও সংশোধন করা যায় না। এ জাতীয় অপরাধীরা শারীরিক গঠনের দিক দিয়ে নিকৃষ্ট (biologically inferior) এবং যারা

৫ William Healy—The Individual Delinquent, p. 783

৬ Cyril Burt—The Young Delinquent, p. 56 and p. 43

৭ E. A. Hooton—The American Criminal—an anthropological study.

বাল্যকালে অপরাধপ্রবণ বলে প্রমাণিত হয়েছিল বড় হয়েও তারা অপরাধ করতেই থাকে।[৮]

এটা অনেক সময়ই আমরা ভুলে যাই যে সামাজিক মানানুগ ব্যবহার শিশুকে আয়াস ও চেষ্টা -দ্বারাই শিখতে হয়। এ জগতের ভালো-মন্দের মাপকাঠি বড়দের প্রয়োজনে তাদের দ্বারাই সৃষ্ট। এই বড়দের মানটা শিশুদের কাছে সহজ নয়। কাজেই এ ধারণাটা ভুল যে ভাল হওয়াটাই (অর্থাৎ বড়দের প্রবর্তিত ও প্রচলিত মান -অনুযায়ী ব্যবহারটা) শিশুদের পক্ষে স্বাভাবিক। আর তাই যে সব শিশু এ ব্যবহারে অভ্যস্ত হল না তাদের প্রতি আমরা বিরক্ত হয়ে ভাবি—এরা 'অদ্ভুত', এদের রক্তেই কোন দোষ আছে। এও শিশুর মানসিক বিকাশের ধারা -সম্বন্ধে আমাদের যে গভীর অজ্ঞতা আছে তাই প্রকাশ করে। বর্তমান কালের শিশু-মনোবিজ্ঞানীরা এই কথা বুঝতে শিখেছেন, শিশু জন্ম থেকেই সামাজিক রীতিনীতি-ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে জন্মে না। চোখ ও হাতের ব্যবহারের সঙ্গতিও ছোট শিশুর পক্ষে যথেষ্ট কঠিন। অনেক ভুল, অনেক তিরস্কার, অনেক ঠেকে শেখার মধ্য দিয়ে শিশু 'মানুষ' হয়। বিভিন্ন বয়সে শিশুরা বিভিন্ন সঙ্গতিতে (adjustment) অভ্যস্ত হয়। এ বিষয়ে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। তবে এই বিকাশের ধারা কতকগুলি সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করে।[৯] সমাজের সঙ্গে সঙ্গতির ব্যাপারটা শিশুর পক্ষে যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর। দুই-তিন বছর বয়সের শিশু পরিবারের সকলের আনন্দ ও মনোযোগের বস্তু—তার হাসিকান্না, হাত-নাড়া, আধো-আধো কথা সবই প্রশংসা পায়। কিন্তু পাঁচ-ছয় বছর বয়স হলেই তখন বাবা-মা শিশুকে মাঝে মাঝে ধমক দেন, অমন সব সময় পায়ে পায়ে ঘুরলে বা গায়ে লেগে থাকলে বিরক্ত হন। কখনো বা বুদ্ধিমানের মতো কথা বললে প্রশংসা পায়, আবার হয়তো পর মুহূর্তেই "পাকা পাকা কথা" বলবার জন্য কানমলা খায়। আবার আরো বড় হলে বাপমায়ের বাধ্য হয়ে কথা শুনে চললে প্রশংসা পাওয়া যায়—কিন্তু তাতে আবার ক্লাসের বন্ধুরা বলে

[৮] Sheldon Glueck and Eleanor Glueck—Juvenile Delinquents Grown Up

[৯] G. Murphy, L. B. Murphy & T. M. Newcomb—Experimental Social Psychology, p. 325

'কচিখুকী'। কাজেই শিশুর পক্ষে 'ভাল হওয়ার' পথ স্বাভাবিক তো নয়ই—সহজও নয়। ফ্রএড্‌পন্থীরা খুব জোর দিয়েই একথা বলেন, যে শিশু স্বভাবত আত্মকেন্দ্রিক ও অ-সামাজিক। এবং শিশুর সামাজিক সচেতনতা ক্লেশকর শিক্ষার ফল। তাই যথেষ্ট নাটকীয় ভঙ্গিতেই তাঁরা এ কথা বলেন, "শিশু যে সমাজ-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে অবাধ্য হয় এটা সমস্যা নয়,—সমস্যা হল কেন সমস্ত শিশুই অবাধ্য হয় না।" শিশুর কর্ম চিন্তা অনুভূতি কি করে বহু বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে সামাজিক প্রচলিত আদর্শের অনুবর্তী হয় পিয়াজে (Piaget) সে-সম্বন্ধে বিস্তৃত ও মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। তাতেও এই কথাই স্পষ্ট বোঝা যায় যে শিশু 'বাধ্য' বা 'অবাধ্য' হয়ে জন্মগ্রহণ করে না।

অবাধ্যতার কারণ-অনুসন্ধানরীতি

এ প্রশ্নের উত্তর নানা কারণেই অত্যন্ত কঠিন। কোন একটি মাত্র 'কারণে' শিশু অবাধ্য হয় না। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে অবাধ্যতার সূচনা হয়। একই শিশু সর্বদা একই কারণে সমাজরীতি ভঙ্গ করে না। ব্যক্তির জটিল মানসিক গঠন ও সামাজিক পরিবেশের অধিকতর জটিল ঘটনাসংস্থান—এই সবটা মিলিয়েই মানুষের প্রত্যেকটি কর্মের রূপ- ও প্রকৃতি-নির্ধারিত হয়। এ বিশ্লেষণ মানুষের বর্তমান জ্ঞানের দ্বারা এখনও সম্পূর্ণ সম্ভব নয়। কারণ যখন একটি মাত্র নয় তখন বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞানুসারে 'কারণ' -অনুসন্ধান করা চলে না। আমরা চেষ্টা করি যে সমস্ত মানসিক ও পারিবেশিক ঘটনাসংস্থানের (contributing factors) মধ্যে অধিকাংশ 'অবাধ্যতা'র ক্রিয়া (delinquent acts) দেখা যায়, তার অনুসন্ধান করতে। এর মধ্যে কোন্ অবস্থা (factor) মুখ্য ও কোন্‌টি গৌণ তা নির্ধারণও মোটেই সহজ নয়।

এটা মনে করা স্বাভাবিক যে যদি কোন অবস্থা বহু অবাধ্যতার ক্ষেত্রেই দেখা যায় তবে তা একটি মূল কারণ। কিন্তু এই বিচার বহু ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অনুরাগ, বিরাগ, ইচ্ছা (subjective bias) -দ্বারা বিকৃত হতে পারে। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। কুসংসর্গ শিশুর অবাধ্যতার একটি সম্ভাব্য কারণ। যদি অবাধ্য শিশুর পিতামাতার মতামত গ্রহণ করা যায় তা হলে দেখা যাবে যে, প্রায় প্রত্যেক পিতামাতাই কুসংসর্গকে তাঁদের সন্তানের

'নষ্ট' হবার প্রধান কারণ বলে নির্দেশ করবেন। অবশ্য এঁদের প্রত্যেকের মতে তাঁদের সন্তানটি বাস্তবিক নির্দোষ।[১০]

এমন কি বৈজ্ঞানিক ও নিরপেক্ষ মতামতও এ ক্ষেত্রে একই সিদ্ধান্তে পৌছতে পারে নি। যেমন, তিন হাজার অবাধ্য শিশুর অবস্থা- বিশ্লেষণ করে হীলি ও ব্রনার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, কুসংসর্গ অবাধ্যতার একটি মুখ্য অবস্থা, কারণ অবাধ্য শিশুদের শতকরা ৬২টির ক্ষেত্রে এ অবস্থা (factor) বিদ্যমান আছে।[১১] আবার সীরিল্ বার্ট অনুরূপ অনুসন্ধান করে এই সিদ্ধান্ত করছেন যে, কুসংসর্গ একটি গৌণ কারণ মাত্র—কারণ শতকরা মাত্র ১৮টি ক্ষেত্রে এই অবস্থা দেখা যায়।[১২]

তা ছাড়া অবাধ্যতার সঙ্গে কোন কোন অবস্থা প্রায়শ দেখা গেলেও সত্যই যে এ-দুটি বিষয়ের মধ্যে কার্য-কারণ-সম্বন্ধ বর্তমান আছে তাও নিশ্চিত ভাবে বলা হয় যায় না। তা কাকতালীয়-সম্বন্ধও (post hoc ergo propter hoc) হতে পারে। যেমন ধরা যাক, শিশুর অবাধ্যতা এবং বিধ্বস্ত-গৃহসম্বন্ধ (broken homes)—এই দুটি অবস্থা বহু ক্ষেত্রেই একত্র দেখা যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক রীতি -অনুযায়ী এ দুইএর মধ্যে কার্য-কারণ-সম্বন্ধ প্রমাণ করতে হলে দেখান দরকার যে এই দুটি অবস্থা যদি কোন নিবিড় সম্বন্ধযুক্ত না হত তা হলে দৈবাৎ এই দুটি অবস্থা একত্রে যতবার দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশীগুণ বার এই দুটি অবস্থাকে একত্র থাকতে দেখা যাচ্ছে। এও দেখানো দরকার যে অন্যান্য সমস্ত অবস্থাগুলিও অপরিবর্তিত রয়েছে। তা ছাড়া যারা অবাধ্য নয় এমন শিশুদের বেলাও বিধ্বস্ত-গৃহসম্বন্ধ অবস্থাটি অনেক সময় বর্তমান। কিন্তু যদি দেখা যায় যে তাদের বেলা অনেক কম ক্ষেত্রে এ অবস্থাটি বিদ্যমান থাকে তবেই অবাধ্যতা ও বিধ্বস্ত-গৃহসম্বন্ধের মধ্যে কার্য-কারণ-সম্বন্ধ অনেকটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হতে পারে। অর্থাৎ এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে ন্যায়শাস্ত্রের নীতি -অনুযায়ী সম্বন্ধ প্রমাণিত করতে হলে দেখতে হবে—

১০ Maud Merrill—Problems of Child Delinquency, p. 10

১১ Healy and Bronner—Delinquents and Criminals, Their Making and Unmaking, p. 179

১২ C. Burt—The Young Delinquent, p. 125

(১) বিধ্বস্ত-গৃহসম্বন্ধ ও অবাধ্যতা কত ক্ষেত্রে একত্র বিদ্যমান, (২) বিধ্বস্ত-গৃহসম্বন্ধ না থাকা সত্ত্বেও অবাধ্যতা কত ক্ষেত্রে বিদ্যমান, (৩) বিধ্বস্ত-গৃহসম্বন্ধ অথচ বাধ্যতা কত ক্ষেত্রে একত্র বিদ্যমান, (৪) বিধ্বস্ত-গৃহসম্বন্ধ না থাকা এবং বাধ্যতা কত ক্ষেত্রে বিদ্যমান।

অ্যাণ্ডারসন এবং আরো বহু মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী দেখিয়েছেন যে বিধ্বস্ত-গৃহসম্বন্ধ ও অবাধ্যতা অনেক বেশী ক্ষেত্রে একত্র দেখা যায়—যেমন দেখা যায় একত্র অনেক বেশী ক্ষেত্রে অ-বিধ্বস্ত-গৃহসম্বন্ধ ও বাধ্যতা। কাজেই এই দুটি বিষয়ের মধ্যে কার্য-কারণ-সম্বন্ধ বর্তমান—এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত। এই অনুসন্ধান অত্যন্তই কঠিন, কারণ প্রতিপদেই এমন দুটি দল পাওয়া দরকার যারা অন্য সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ সমবস্থ, শুধুমাত্র বাধ্যতা ও তার অভাবেই দুটি দল পৃথক। বাস্তব জীবনে এমন control group সংগ্রহ করা অত্যন্তই কঠিন। অথচ এই প্রকার control group-এর সঙ্গে তুলনা ব্যতীত নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে পৌছনো নিতান্তই অসম্ভব।[১৩]

এই কষ্টসাধ্য অনুসন্ধানের পরেও দেখা যায় যে যদিও অবাধ্য শিশুদের ক্ষেত্রে বাধ্য শিশুদের তুলনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে কয়েকটি অবস্থা দেখা যায়, তথাপি সেই অবস্থাগুলি বিদ্যমান থাকলেই শিশু অবাধ্য হবেই—এমন কথা বলা যায় না। যে অবস্থায় একটি ছেলে অপরাধ-প্রবণ হল মোটামুটি সেই অবস্থায় আর একটি ছেলে স্থির থাকে—এমন অনেক সময়ই দেখা যায়। ব্যক্তিত্বের এ রহস্য-উদ্ঘাটন করবার মতো উপায় আজও আমরা উদ্ভাবন করতে পারি নি তা স্বীকার করতেই হবে।

১৩ J. F. Anderson—The Methods of Child Psychology—In Handbook of Child Psychology. Ed. C. Murchison, p. 17

দ্বাদশ অধ্যায়

অবাধ্যতা ও সামাজিক পরিবেশ

শিশু অবাধ্য হয়েই জন্মে না। শিশুর ব্যক্তিত্বগঠনে তার বংশধারা উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু শুধুমাত্র বংশগত বা জন্মগত অবস্থা -দ্বারা ব্যক্তির ব্যবহারের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা মেলে না। ব্যক্তির প্রত্যেকটি ব্যবহার ও কর্মই তার নিজস্ব প্রবৃত্তি এবং সমাজপরিবেশের পারস্পরিক প্রভাবের ফল। মনোবিজ্ঞানীরা ক্রমশই সামাজিক পরিবেশের গুরুত্বের কথা উপলব্ধি করছেন। বিশেষ করে অবাধ্য শিশুদের সম্বন্ধে যতই আলোচনা ও অনুসন্ধান হচ্ছে ততই বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করছেন যে অবাধ্য শিশুদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কতকগুলি পরিবেশগত অবস্থা বর্তমান থাকে। এ অবস্থাগুলি বাধ্য শিশুদের ক্ষেত্রে থাকে না এমন নয়। কিন্তু এগুলি অবাধ্য শিশুদের ক্ষেত্রে অনেক বেশী পরিমাণে থাকে। অবশ্য এই পরিবেশগত অবস্থা মাত্র একটি নয়। এ নানা প্রকারের। এবং বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের মধ্যে এদের গুরুত্ব -সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। তথাপি একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে বর্তমান মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা পরিবেশের ভূমিকাকে পূর্বের চাইতে অনেক বেশী গুরুত্ব দিচ্ছেন। পুনরুক্তিদোষ ঘটলেও এ কথা স্মরণ রাখা দরকার যে আপাতদৃষ্টিতে পরিবেশ এক হলেও দুটি শিশু ঠিক একই ব্যবহার প্রকাশ করে না। পরিবেশের ঠিক কোন্ অবস্থাটি কোন্ শিশুকে কি ভাবে ও কি পরিমাণে প্রভাবিত করবে তা পূর্ব হতে নির্ধারণ করা প্রায় অসম্ভব। ব্যক্তিত্বের সেই রহস্য আজও আমরা সম্পূর্ণ উদ্ঘাটন করতে পারি নি।

তবুও সমাজপরিবেশ শিশুর ব্যবহারের গতি- ও প্রকৃতি-নির্ণয়ের সহায়ক, এই মূল কথাটি মেনে নিয়েই অনুসন্ধানকারী পণ্ডিতের দল অগ্রসর হচ্ছেন এবং সমাজপরিবেশের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে যে অবস্থাগুলির সম্বন্ধে বাধ্য ও অবাধ্য শিশুদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে সেইগুলি নির্ধারণ করে তাঁরা অবাধ্যতার কারণগুলি আবিষ্কার ও কিভাবে তার প্রতিকার সম্ভবপর সেই চিন্তা করছেন।

বস্টন-এর শিশু-মনোবিজ্ঞানী বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসক প্রথম তাঁর ভূয়োদর্শনের ফলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে শিশুর অপরাধপ্রবণতা ও অসামাজিক আচরণের মূল কারণ তার পরিবেশ ও সামাজিক অবস্থার মধ্যেই নিহিত।[১] শ এবং ম্যাক্‌কে বিশ বছর আমেরিকার একুশটি বিভিন্ন নগরে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করে নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্ত করেছেন যে, সমাজ-সম্বন্ধের শৈথিল্য বা বিকার—যথা লোকসংখ্যার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন, অপরিসর বা অস্বস্তিকর বাসব্যবস্থা, দারিদ্র্য, ঘন ঘন বাসস্থান-পরিবর্তন, বৃহৎ পরিবারসংখ্যা, বড়দের দুর্নীতিপূর্ণ ব্যবহার ইত্যাদি শিশু-অপরাধের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্বন্ধযুক্ত।[২] ভ্যারাসিউস্ মনে করেন দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে হতাশা এবং প্রতিকার অসম্ভব এই বোধজনিত নিরুপায় অবস্থা বহু ক্ষেত্রেই শিশু-অপরাধের জন্য দায়ী।[৩]

বহু বিজ্ঞানীর অনুসন্ধানেই দেখা যায়—অপরাধপ্রবণ শিশুদের পরিবারে দুর্নীতিপরায়ণতা বাধ্য শিশুদের তুলনায় বেশী, অবাধ্য শিশুদের পিতামাতার মধ্যে সম্বন্ধ অনেক ক্ষেত্রেই অসন্তোষজনক ও অপ্রীতিকর অনেক ক্ষেত্রেই অপরাধপ্রবণ শিশুদের পরিবারে লোকসংখ্যা বেশী। অনেক অপরাধী শিশুর পিতামাতা তুলনায় বেশী দরিদ্র। যাদের পিতা নিম্নশ্রেণীর কারিগর বা মুদি বা দোকানদার তাদের সন্তানদের মধ্যে অপরাধীর সংখ্যা বেশী। অনেক সময় দেখা যায় স্কুলের পড়াশুনায় অপরাধপ্রবণ শিশুরা বেশী পিছিয়ে পড়ে। সুতরাং এ সমস্ত অবস্থা শিশুর অবাধ্যতার সঙ্গে নিকট-সম্বন্ধযুক্ত এমন মনে করা অসঙ্গত নয়। কিন্তু এটাও লক্ষণীয় যে, এ সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সকল শিশুই অপরাধে প্রবৃত্ত হয় না। একই পরিবারের সমস্ত ছেলেমেয়ের সমাজপরিবেশ মোটামুটি এক হলেও হয়তো দেখা গেল সেই পরিবারের অন্যান্য শিশুরা শান্ত ও বাধ্য, কিন্তু একটি ছেলে অবাধ্য ও অপরাধপরায়ণ। অথবা বিপরীতভাবে 'দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ'ও দেখা যায়। সেজন্য রেক্‌লেস্ বলেছেন, "অবাধ্যতার কারণ হিসাবে পারিবারিক প্রভাব কি ভাবে কাজ করে তা নির্ধারণ করা

১ D. A. Thom—Sociological Changes Predisposing Toward Juvenile Delinquency, American. J. Psychiat. 1944, 100, pp. 452-455

২ Shaw, Mckay & others—Juvenile Delinquency and Urban Areas

৩ W. C, Kvaraceus—Juvenile Delinquency and Social Class, J. Educ. Social, 1944, pp. 18, 51-54

কঠিন। কারণ একই পিতামাতার সন্তানদের ওপর একই পারিবারিক ঘটনা একই রকম প্রভাব বিস্তার করে না। কাজেই এমন মনে করা অন্যায় নয় যে, কোন অবাধ্য শিশুর কাছে যে পারিবারিক অবস্থা বিষম অশান্তি ও উদ্বেগের কারণ হতে পারে, সেই শিশুর অন্যান্য ভাইবোনদের কাছে সেই একই অবস্থা হয়তো তেমন কিছু অশান্তির কারণ নয়।[৪] হিলি ও ব্রনার-ও এটা লক্ষ্য করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন যে বাধ্য ও অবাধ্য এই দুই দল ছেলে-মেয়েদের তুলনা করে দেখা যায় অবাধ্য ছেলেমেয়েরা পারিবারিক সাধারণ বিপত্তিকর পরিবর্তনে অনেক বেশী বিচলিত হয়, কিন্তু তাদের বাধ্য ভাইবোনেরা অপেক্ষাকৃত শান্ত থাকে।[৫]

পিয়েত্রো-র বয়স তেরো বছর। তার বাবা ব্যাঙ্কে ভাল চাকরি করেন। মা ভাল লেখা-পড়া, গান-বাজনা জানেন। পিয়েত্রো-র ছোট বোন টেরেসা। তার বয়স ১০ বছর। ছোট, সচ্ছল, সুস্থ ও সুখী পরিবার। কিন্তু হঠাৎ একদিন চুরির অপরাধে পিয়েত্রো-কে পুলিস ধরে নিল। আপাতদৃষ্টিতে সমাজ, পরিবেশ এবং বংশধারা কোন সূত্রেই এই ঘটনার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

অভিজ্ঞ মনোবিজ্ঞানীরা এ-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি জানতে পারলেন।

পিয়েত্রো সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে জন্মগ্রহণ করে। এখনও সে বেশ সুস্থ ও সবল। কিন্তু শিশুকালে তাকে খাওয়ানো নিয়ে মার হয়রানির একশেষ হত। বাচ্চা কিছুতেই বোতলে দুধ খাবে না। বিদুষী মা-ও বই দেখে, ঘড়ি ধরে, ওজন করে তাকে খাওয়াবেনই। এমনি করে শিশুকাল থেকেই মার জবরদস্তির কাছে শিশুর ব্যক্তিত্ব ক্ষুন্ন। বড় হয়েও মার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াবার জো নেই। কাপড়জামা পরা, খাওয়া, খেলা, শোওয়া সবই মায়ের হুকুমে করতে হয়। মনোবিজ্ঞানীদের মতে এতে শিশুর অবচেতন মনে মায়ের প্রতি একটি বিদ্বেষভাব সঞ্চিত হচ্ছিল অথচ তার কোন সঙ্গত ও স্বাভাবিক প্রকাশের উপায় ছিল না। অন্যদিকে মার মনেও অবচেতনভাবে বিরক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল। তাঁর সঙ্গীত ও অঙ্কনে বেশ

৪ W. C. Reckless—The Etiology of Delinquent and Criminal Behaviour

৫ Healy & Bronner—New Light on Delinquency and Its Treatment

পটুতা ছিল। কিন্তু ছেলে হওয়ার পর এ সবই তাঁকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। শিশুর প্রতি বিরূপতায় মায়ের অবচেতন মনেও একটি সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ অপরাধবোধ (guilt-consciousness) জাগ্রত ছিল। তার ধিক্কার থেকে নিজেকে রক্ষা করবার জন্যই (defense mechanism) তিনি শিশুর প্রতি অতিরিক্ত পরিমাণে যত্নশীলা হয়েছিলেন এবং বাস্তবিক পক্ষে নিজের অনেক সুখ ও আরাম বিসর্জন দিয়েছিলেন। মনোবিজ্ঞানীদের মতে কিন্তু মার স্বাভাবিক স্নেহের অভাব (rejection) শিশুর অবচেতন মনে বিষম উদ্বেগ ও নিরাপত্তার অভাববোধ (insecurity) জাগিয়ে তাকে অশান্ত করে তোলে।

দু বছর পর টেরেসা যখন পেটে আসে তখন মার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। এদিকে খরচ কমাবার জন্য তাঁর স্বামী অন্য এক ছোট শহরে অন্য চাকরি নিয়ে চলে আসেন। তাতে সামাজিক মর্যাদা ক্ষুন্ন হলেও আয় কিছু বাড়েই বরং। নষ্ট স্বাস্থ্যের জন্যে একটি ঝি রাখা হয়, মাকে সাহায্য করবার জন্য। টেরেসা রুগ্‌ণ হয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং মা বাধ্য হয়েই খাওয়ানো নিয়ে জবরদস্তি থেকে বিরত থাকেন। টেরেসা বোতলে দুধ খেতে আপত্তি করে নি। ক্রমে টেরেসা বেশ সুস্থ হাসিখুশী মেয়ে হয়ে বেড়ে উঠতে থাকে। পিয়েত্রো গম্ভীর প্রকৃতির, কতকটা মুখচোরা। কিন্তু হাসিখুশী টেরেসা-কে সকলেই বেশ ভালবাসতে থাকে। সেও সমবয়স্ক ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বেশ সহজভাবে মিশতে এবং সকলের প্রশংসা পেতে থাকে। স্কুলেও সে শিক্ষয়িত্রীদের স্নেহ-আকর্ষণ করে এবং প্রশংসা পেয়ে নানা বিষয়ে পটুতা লাভ করে। তার মাও তাঁর নষ্ট সামাজিক মর্যাদা-উদ্ধারের ইচ্ছায়ই যেন মেয়েকে নাচ গান অঙ্কনে যথেষ্ট উৎসাহ দিতে লাগলেন। তাঁর নিজের হারানো যৌবন ও সৃষ্টির আনন্দ যেন মেয়ের মধ্য দিয়েই চরিতার্থতা খুঁজছিল। টেরেসা পড়াশুনায় বেশ ভালো ছিল এবং পরীক্ষায়ও ভালো ফল করবার জন্য তাকে ডবল প্রমোশন দেওয়া হয়েছিল। সে ছিল যেন সংসারটির মধ্যমণি।

অন্যদিকে পিয়েত্রো বুদ্ধির মাপে (I. Q.) টেরেসার চেয়ে খাটো না হলেও ক্রমেই লেখাপড়ায় পিছিয়ে যেতে থাকে এবং যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সে-বছর সে ফেল করে নিচের ক্লাসেই থেকে যায় এবং নিচের ক্লাসের ছেলেদের সঙ্গে পড়তে স্বভাবতই তার মর্যাদাবোধ ক্ষুন্ন হয়। সে আগেও

মিশুক ছিল না এবং এর পর আরো সঙ্গীহীন ও স্ফূর্তিহীন ম্রিয়মাণ হয়ে থাকত। বাড়ীতে লোকজন এলে মা-বাবা টেরেসার গুণের কথাই বলতেন। অতিথিরা তার নাচ গান আঁকার প্রশংসা করতেন। তা ছাড়া প্রশংসাগৌরবে-গর্বিতা টেরেসা পিয়োত্রো-কে মাঝে মাঝে ঠাট্টাও করত। বিশেষ করে যেদিন সে চুরি করে সেদিন পিয়েত্রো-র মন খুবই খারাপ ছিল। স্কুলে সে মাস্টার মশায়ের বকুনি খায়। বাড়িতেও মার বকুনি। তাছাড়া টেরেসা ওর কয়েকটি বন্ধুর সামনে ওকে বেশ ঠাট্টা করে।

পুলিস এসে চুরির জন্যে ওকে খোঁজ করা মাত্র বাবা-মা, প্রতিবেশী, শিক্ষক, টেরেসা ও তার বন্ধুদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পিয়েত্রো সমর্থ হল। তার মন যেন বলল, "কেমন আমি নাকি কিছুই করতে পারি না?" তার অবজ্ঞাত শিশু-ব্যক্তিত্ব যেন এই নাটকীয় ব্যাপারের মধ্যেই এক অদ্ভুত তৃপ্তি খুঁজে পেল।

এ ঘটনার ব্যাখ্যায় মেরিল লিখছেন, মানুষের পরিবেশ এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে মানুষের সামাজিক আচরণ বুঝতে গেলে এটা বিবেচনা করা একান্ত আবশ্যক, কারণ সমাজ-পরিবেশই মানুষের ব্যবহারকে প্রভাবিত করে।[৬]

কিন্তু পরিবেশ মানুষের মন বা অবচেতনাকে কেন ও কিভাবে দোলা দেয় তা এখনও আমরা সম্পূর্ণ জানি না। শুধু এটা মাত্র বোঝা যায় আপাত-দৃষ্টিতে পরিবেশ এক হলেও প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে এ পরিবেশের তাৎপর্য ঠিক এক নয়।

ফ্রএডপন্থীরা এর ব্যাখ্যার জন্য অবচেতন মনের বিশ্লেষণের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন মনে করেন।

কিন্তু রাশিয়ার মনোবিজ্ঞানী বা শিক্ষাব্রতীরা ফ্রএড্-এর অবচেতন-তত্ত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। তাঁরা বলেন শিশুর অবাধ্যতার জন্য দায়ী, হয় তার দৈহিক কোন রোগ বা বিকার, অথবা তার পরিবেশগত কোন ত্রুটি। তাঁরা বলেন, অবাধ্য শিশু যদি রুগ্ণ হয় তা হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন সযত্ন পরীক্ষা -দ্বারা তার রোগনির্ণয় করা। যদি সে রুগ্ণ না হয় তা হলে

---

৬ So it is that our social frames of reference are so important that social behaviour can be understood only in relation to the interplay of dynamic factors within the person in relation to him effective environment. Maud. A. Merrill—Problems of Child Delinquency, pp. 60-63

বুঝতে হবে যে তার পরিবেশের মধ্যে এমন কোন ত্রুটি আছে যাতে তার নিজস্ব শক্তির উপযুক্ত সদ্ব্যবহার সে করতে পারছে না।

লেনিনগ্রাদের স্কুলের একটি ভীষণ অবাধ্য ছেলে। স্কুলে বাড়ীর কাজ প্রস্তুত করে আনে না। ক্লাসে শিক্ষকের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। একদিন সে শিক্ষককে পাথর ছুঁড়ে মারতে উদ্যত হল। ইতোপূর্বেও এ ছেলের ব্যবহার -সম্বন্ধে ক্লাসের কমিটিতে আলোচনা হয়েছিল। প্রধান শিক্ষকও ক্লাসের শিক্ষকের সঙ্গে এ ছেলের সংশোধনের বিষয় আলোচনা করেছিলেন। যখন দেখা গেল যে সংশোধন তো হয়ই নি বরং ছেলেটির অবনতিই ঘটছে, তখন স্কুলের কর্তৃপক্ষ অনুসন্ধান করে জানলেন যে শিক্ষকটি ছাত্রটিকে দেখতে পারেন না। ছাত্রটির আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হয় এমন গালাগালি করে থাকেন। অবশ্য ছেলেটির আরো অনেক দোষও ছিল। পরামর্শের পর ছেলেটিকে অবাধ্য ছাত্রদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয়ে পাঠানোই স্থির হল। সে দেশে এই সব বিশেষ স্কুলে ভর্তি করাটা যে 'শাস্তিমূলক' এরূপ ধারণা জন্মানো হয় না। ছেলেটিকেও বলা হল তাকে অন্য নতুন বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হবে, যেখানে তার বিরক্তিকর শিক্ষক থাকবেন না। সেই নতুন স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর কাছে পূর্বেই ছাত্রটির সম্পূর্ণ বিবরণ (record) পাঠানো হয়েছিল। সেই প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর অসামান্য সাফল্যের মূল কারণ ছিল যে তিনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন যে, প্রত্যেক অবাধ্য শিশুকেই তার নিজস্ব প্রকৃতিবিকাশের সুযোগ দিলে সংশোধন করা যায়। এ অবাধ্য ছেলেটিকে তার মা ভর্তি করাতে গিয়ে তাঁর ছেলের কুকীর্তির লম্বা ফিরিস্তি দিতে আরম্ভ করতেই প্রধানা শিক্ষয়িত্রী মাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলেন। তিনি ছেলেটির সঙ্গে দৃঢ়তার সঙ্গে অথচ অন্তরঙ্গতার সহিত আলাপ করলেন। তার হাতের কাজের প্রশংসা করলেন। ক্লাসে তাকে প্রথম নিয়ে গিয়ে অন্য ছাত্রদের সঙ্গে পরিচয় করাবার সময় তার অতীত দুষ্কৃতির কোন উল্লেখ তো করলেনই না, বরং বললেন—তার বাড়ী থেকে এই স্কুলটা কাছে হয় বলেই বছরের মাঝখানে সে আগের স্কুল থেকে এই স্কুলে বদলি হয়ে এসেছে। অল্পদিনের মধ্যেই নতুন স্কুলের উৎসাহকর পরিবেশে ছেলেটি বেশ ভাল হয়ে উঠল।[৭]

---

৭ Beatrice King—Russia Goes to School, pp. 34-35

পূর্বেই বলা হয়েছে শুধু পরিবেশ নয়, ব্যক্তির চরিত্রও বিবেচনা করতে হবে। ব্যক্তির চরিত্র ও তার পরিবেশ পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করে, গঠিত করে, পরিবর্তিত করে। কুসংসর্গের কথা পূর্বে বলা হয়েছে।

অনেকেই লক্ষ্য করেছেন যে অধিকাংশ অপরাধপ্রবণ শিশু দরিদ্র পরিবার থেকে আসে। কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে অপরাধপ্রবণদের মধ্যে দরিদ্রের সংখ্যা, বাধ্য সুস্থ শিশুদের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশী। এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। দারিদ্র্যের মধ্যে শুধু যে সাংসারিক নিতান্ত প্রয়োজনীয় সুখসুবিধা ও আরামের অভাব ঘটে তা নয়, তার মধ্যে অনেক সময়ই আছে গ্লানি ও অপমান। দারিদ্র্যের বদ্ধ আবহাওয়ায় ব্যক্তিত্বের সুস্থ স্বাভাবিক বিকাশ পদে পদেই বাধা পায়। কিন্তু তথাপি এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে দারিদ্র্যই মূল কথা নয়—দারিদ্র্য কোন বিশেষ ব্যক্তিকে হয়তো আহত ও ক্ষুব্ধ করে, তাকে তিক্ত ও বিদ্রোহী করে অপরাধের মুখে ঠেলে দেয়; আবার অনুরূপ অবস্থাতে অন্য আর এক ব্যক্তিকে হয়তো তা পরিশ্রম- ও বুদ্ধি-ব্যবহারের দ্বারা নিজ ও পরিবারের অবস্থার উন্নতি করতে উদ্বুদ্ধ করে। এই ব্যক্তির পক্ষে দারিদ্র্য একটি চ্যালেঞ্জ-স্বরূপ, এ তার ব্যক্তিত্বকে দৃঢ়তর ও সমুন্নত করে।

দেবেন্দ্র পাঁচ বছর পূর্বে বরিশাল থেকে বাস্তুহারা হয়ে এসেছে তার ছটি ছেলেমেয়ে নিয়ে। আগে দেশে থাকতে পৌরোহিত্য করে সংসার চালাত। বাস্তুহারা হয়ে আসা অবধি সে পুনর্বাসন কর্তৃপক্ষের প্রকাণ্ড মাথাব্যথা। সে এক ক্যাম্প হতে অন্য ক্যাম্পে গিয়েছে। সৎ-অসৎ নানা উপায়ে সাহায্য নিয়েছে, অন্যান্য বাস্তুহারাদের সঙ্গে বিবাদ করেছে, দুবার ক্যাম্প সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টকে মারপিট করেছে। সে ব্রাহ্মণ, এই অভিমান তার প্রচণ্ড। তা ছাড়া তার কোন পূর্ব-পুরুষ রাজা উপাধি লাভ করেছিলেন—এই সে প্রচার করে থাকে। খেটে খাওয়া তার পক্ষে অসম্মানজনক। তাই সরকার থেকে জমি পেয়েও সে কোন কাজে স্থায়ীভাবে বসে নি। তার পরিবারটি সদা অসন্তুষ্ট—সর্বদাই পরের নিন্দাপরায়ণ এবং আত্মপ্রশংসায় মুখর। বড় ছেলেটি কোন স্কুলে টিকে থেকে পড়াশুনা করে না, সুযোগ পেলেই চুরি করে। এতে বাপমায়ের বরং প্রশ্রয় আছে, যেদিন চুরি করে বেশি পয়সা আনে সেদিন বাড়ীতে ভাল খাওয়া হয়, আর সেদিন তাদের 'ফুটানী'তে পাড়া-প্রতিবেশী অতিষ্ঠ হয়। এ ছেলেকে কয়েকবার পুলিসে ধরেছে। কোর্টে

হাজির করলে পুলিস ও পুনর্বাসন বিভাগের প্রত্যেকটি লোক চোর, এ সে স্বীকার করে বলেছে। শেষে ধমক খেয়ে ও শাস্তির ভয়ে দোষস্বীকার করে, অল্প শাস্তি পেয়ে খালাস পেয়েছে। দারিদ্র্যই এই পরিবারের চরিত্রের কদর্য দিকটা ফুটিয়ে তুলেছে।

আর একটি প্রায় সমবস্থ পরিবারের ছবি। এরাও প্রায় একই সময়ে ত্রিপুরা জিলা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে। এই পরিবারের কর্তা কোন ঔষধের দোকানে সামান্য চাকরি করেন। ছেলেমেয়ে সাতটি। স্ত্রী রুগ্ণা। দুবার যক্ষ্মা-রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। বড় মেয়েটিকেও একবার এই বিষম রোগ আক্রমণ করেছিল। পিতার সামান্য আয়ে সংসার চলে না; চিকিৎসা ও ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া তো দূরের কথা। ভাগ্যক্রমে দূর-সম্পর্কীয় নিঃসন্তান এক শিক্ষক কয়েকটি ছেলেমেয়ের ভরণপোষণের ভার নিয়েছেন। অন্য দুটি মেয়েকে মহদন্তঃকরণ এক ডাক্তার পালন করেছেন, শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন এবং মা ও বড় মেয়েটিকে চিকিৎসার দ্বারা সুস্থ করেছেন। যাদবপুরে এক জবর-দখল কলোনীতে এরা একটু আশ্রয় নিতে পেরেছিল, কিন্তু এই কলোনী সরকার স্বীকার করে নেন নি এবং তাই উদ্বাস্তুদের অন্য সুবিধা এরা পায় নি। মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করলে কোন কোন সাহায্য নিশ্চয়ই মিলত, কিন্তু দরিদ্র হয়েও এরা আত্মসম্মান হারায় নি। এরাও ব্রাহ্মণ। কিন্তু ব্রাহ্মণ বলে খেটে খেতে লজ্জা বোধ করে নি। বড় মেয়েটি একটি রেফিউজী ক্যাম্পে শিক্ষকতা করে। বড় ছেলেটি রেলওয়েতে একটি কেরানীর কাজে ঢুকেছে। মেজো ছেলেটি আই. এস-সি পাস করে একটি ব্যবসায়ী ফার্মে কেরানীর কাজে সম্প্রতি ভর্তি হয়েছে। সে রাত্রিতে বি. কম্. পড়ে। ক্লেশ হলেও অন্যান্য বোনদের এরা পড়াচ্ছে। সংসারে দুঃখদারিদ্র্য অনটন রোগ ক্লান্তি দুশ্চিন্তা সবই আছে। কখনো কখনো হয়তো তিক্ততা আসে, বিশ্বাস হারায়—কখনো হয়তো অসহ্য অভাবে মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার পথে যাবার প্রলোভনও আসে। তবুও এ পরিবার নষ্ট হয়ে যায় নি—এদের প্রবল আত্মমর্যাদা-বোধ ও আদর্শবাদ এদের রক্ষা করেছে ও মহৎ প্রচেষ্টার পথে অগ্রসর করেছে।

দারিদ্র্য -সম্বন্ধে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী

পাশ্চাত্ত্য দেশ দারিদ্র্য মাত্রকেই হীনতা বলে ঘৃণা করেছে। তাই সে দেশে দরিদ্র হওয়া বড় লজ্জার কথা। তাই দারিদ্র্য সেখানে মনুষ্যত্বকে

ক্ষুণ্ণ করে। প্রাচীন ভারতের দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু ভিন্ন। সাংসারিক সমৃদ্ধিকে ভারতবর্ষ সর্বোচ্চ মূল্য দেয় নি। ব্রাহ্মণের তাই দরিদ্র হতে লজ্জা নেই। 'বুনো রামনাথ' মোটা ভাত ও তেঁতুলপাতার ঝোল তাঁর বিদ্যাচর্চার পথে যথেষ্ট বলে মনে করেছেন। তাঁর স্ত্রীর হাতের সামান্য মূল্যের লোহা ও মোটা বসন, রানীর স্বর্ণ-অলঙ্কার বসন-ভূষণের কাছে লজ্জা বোধ করে নি।

অবাধ্যতা ও শাসন-বিষয়ে শৈথিল্য

আর একটি অবস্থাও অবাধ্যতার সঙ্গে প্রায়শ একত্র দেখতে পাওয়া যায় —তা হচ্ছে গৃহে শাসনের শৈথিল্য বা আধিক্য। গ্লুয়েক্ (স্বামী-স্ত্রী)-এর বই থেকে তাঁদের পর্যবেক্ষণের ফল দেওয়া হল। প্রায় সমবস্থ ১৫৩টি অবাধ্য এবং ২৯৮টি বাধ্য ছেলে নিয়ে তাঁরা পরীক্ষা করেছেন। তাঁরা দেখেছেন, অবাধ্যদের বেলায় গৃহের শাসনের শৈথিল্য বা আধিক্য শতকরা ৯৫%, কিন্তু বাধ্যদের বেলায় এ ত্রুটি ৭%। আবার বাধ্যদের বেলায় দেখা যায় প্রায় শতকরা ৭০% ক্ষেত্রে পিতামাতার সুশাসন বর্তমান, কিন্তু অবাধ্যদের ক্ষেত্রে এর শতকরা হার মাত্র ১৫%।[৮]

গৃহের আকর্ষণ ও বাধ্যতা

শিশুর কাছে পিতামাতা ও পরিজনের প্রভাব অসামান্য। শিশুর জীবনের প্রধান দুটি প্রয়োজন স্নেহ ও নিরাপত্তা-বোধ। পারিবারিক সম্বন্ধ অপ্রীতিকর বা অস্বস্তিকর হলে শিশু দেহেমনে সুস্থ হয়ে গড়ে উঠতে পারে না। কাজেই যেখানে পিতামাতার মধ্যে সম্বন্ধ বিসংবাদের, অথবা যেখানে ঘরে বিমাতা বা বি-পিতার তাড়নায় শিশু স্বাভাবিক স্নেহবঞ্চিত ও নিরাপত্তার অভাববোধ করে, সেখানে তার ব্যক্তিত্ব বিকৃত হবার সম্ভাবনা থাকে। এ সব ক্ষেত্রে বাড়ীর প্রতি টান কম হওয়াই স্বাভাবিক।

দুটি পরীক্ষা

এ বিষয়ে দুটি পরীক্ষার উল্লেখ করা যাচ্ছে। দু' পক্ষেই ১০০টি ছেলে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল।

---

৮ S. Glueck & E. Glueck—One Thousand Juvenile Delinquents, pp. 186-87.

	অবাধ্য	বাধ্য
বাড়ীর প্রতি খুব অনুরক্ত		
গৃহ-কেন্দ্রিক আগ্রহ	১৭	১৭
বাড়ী বেশ ভাল লাগে—অবসর সময় বাড়ীতেও কাটায়, বাইরেও কাটায়	৩৪	৬৪
বাড়ীর সম্বন্ধে আগ্রহহীন—	২৪	১২
বাড়ীতে না থাকতেই পছন্দ করে, অধিকাংশ সময় বাইরেই কাটায়	১১	৬
বাড়ীতে থাকতেই বিরক্ত হয়—পারলে বাড়ীতে থাকতে চায় না	১২	১
অ-শ্রেণীবিভক্ত	২	১
	১০০	১০০

পিতা ও মাতা উভয়ের প্রতিই অনুরক্ত

	অবাধ্য	বাধ্য
পিতামাতার সঙ্গে বেশ হৃদ্যতা বিদ্যমান	৩০	৪১
পিতা বা মাতার প্রতি বিরূপতা, তবে হয়তো পিতা বা মাতার একজনকে বেশী ভালবাসে	৪৪	৪৭
পিতা বা মাতা বা দুজনের প্রতিই কিছুটা বিরূপ	১১	৯
পিতা বা মাতা একজনের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ এবং অন্যের প্রতি টান—মানসিক অস্থিরতা (conflicting attitude)	১১	২
অ-শ্রেণীবিভক্ত	৪	১
	১০০	১০০

শিশুর পক্ষে পিতামাতা শুধু স্নেহ ও আগ্রহের স্থল নন—তাঁদের হাতে আবার আছে শাসন-পীড়নের ভার। কাজেই পিতামাতার প্রতি শিশুর মনোভাবের মধ্যে একটা দ্বৈততা ও বিরোধ আছে। একদিকে সে বাপমাকে ভালবাসে; অন্যদিকে তাঁদের সে ভয় করে; কাজেই আকর্ষণ ও বিকর্ষণ দুই শক্তির মধ্যে

শিশুর মন দোলা খায়।[৯] অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই দুই বিরুদ্ধ মনোভাবের মধ্যে স্বাভাবিক সমন্বয় ঘটে, কিন্তু ফ্রএড্‌পন্থীদের মতে এই বিরোধ অনেক সময় শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের পথে বাধা জন্মায় এবং তার অবচেতন মানসে জটিলতার সৃষ্টি করে।

বিদ্যালয়-পরিবেশ ও অবাধ্যতা

স্কুলের নতুন পরিবেশে মানিয়ে চলা শিশুর পক্ষে আরও অনেকটা কঠিন। সেখানে স্নেহ ও শাসনপীড়নের বিরোধ গৃহ থেকে বরং আরও বেশী। শিক্ষক ও সমবয়স্ক সঙ্গীসাথী একদিকে তাকে আকর্ষণ করে, অন্যদিকে তাকে নানাভাবে আঘাত করে, বিব্রত করে। সাধারণত দেখা যায় অপরাধপ্রবণ অবাধ্য শিশুরা বাধ্য স্বাভাবিক শিশুদের তুলনায় নিজেদের কম খাপ খাওয়াতে পারে। তাই তারা ইস্কুলে বেশী মারামারি করে, ক্লাসে অমনোযোগী হয়, গোলমাল করে। এই সব অশিষ্ট ব্যবহারের দ্বারা তারা নিজেদের প্রতি শিক্ষক ও সহপাঠীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। ক্লাসে পড়াশুনায় পিছিয়ে পড়াতে তাদের আত্মসম্মান আহত হয়—আর এই অবাঞ্ছিতভাবে তারা সেই ক্ষতিপূরণ করতে চেষ্টা করে (over-compensation)।

স্কুলের প্রতি অবাধ্য ও বাধ্য দুদল ছাত্রের মনোভাব নিয়ে একটি পরীক্ষার ফল দেওয়া হল।[১০] ১০০টি অবাধ্য ছাত্র পরীক্ষা করা হল, তাদের মধ্যে ৩০ জন স্কুলে পড়ছে এবং ৭০ জন যারা স্কুল ছেড়ে দিয়েছে। অনুরূপভাবে ১০০টি বাধ্য ছাত্র পরীক্ষা করা হল, তাদের মধ্যে ৬৯ জন স্কুলে পড়ছে এবং ৩১ জন যারা স্কুল ছেড়ে গিয়েছে :—

৯ Katz লিখছেন—"the parents are, on the other hand......a source of security to the child and the main means of the satisfaction of his wants. Thus they become powerful, friendly beings with whom he identifies himself......on the other hand the father and the mother are also disciplinary agents who enforce rules and regulations which interfere with the child's egoistic pleasures. Boring, Langfeld and Weld—Effect of the family on Child personality; Introduction to Psychology, pp. 58-63

১০ Maud Merrill—Problems of Child Delinquency, p. 88

	অবাধ্য (শতকরা হার)				বাধ্য (শতকরা হার)			
	স্কুলে পড়েছে		স্কুল ছেড়েছে		স্কুলে পড়েছে		স্কুল ছেড়েছে	
স্কুল খুব ভাল লাগে	১১	৭১.৫%	৬	৪৪%	৬১	১৬%	১৪	৬৮%
স্কুল পছন্দ করে	৯		২৫		৫		৭	
স্কুল-সম্বন্ধে উদাসীন	৬	২৮.৫%	২২	৫৬%	১	৪%	৮	৩২%
স্কুল অপছন্দ করে	২		১১		২		২	
স্কুলের প্রতি ভয়ানক বিমুখ	—		৬		—		—	
অ-শ্রেণীবিভক্ত	২							
	৩০		৭০		৬৯		৩১	

শিশু নিজ বাড়ীতেও যেমন স্কুলেও তেমন স্নেহ ও নিরাপত্তার প্রত্যাশা করে। যদি স্কুলে বাড়ীর তুলনায় তার শিশুজীবনের এই মৌলিক প্রয়োজনগুলি মেটাবার সুযোগ পায় তা হলে স্কুল তার বাড়ীর চেয়ে ভালো লাগে। যদি এর বিপরীত হয়, তবে সে স্কুলে অস্বস্তি বোধ করে এবং অন্যত্র তার ক্ষুণ্ণ ব্যক্তিত্বের আঘাত সংশোধনের ক্ষেত্র খোঁজে। স্কুলে শিক্ষক বা শিক্ষিকার স্বাভাবিক স্নেহ- ও উৎসাহ-লাভ করতে পারলে শিশু নিজেকে ধন্য মনে করে এবং সে ক্ষেত্রে সে উৎসাহের সঙ্গে যা কিছু ভালো তার মধ্যে আছে তা ফুটিয়ে তুলে অধিকতর প্রশংসা অর্জন করতে চেষ্টিত হয়। আর যেখানে শিক্ষক বা সহপাঠীদের অবহেলা বা বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হয় সেখানে তার আত্মবিকাশের ধারা রুদ্ধ বা বিকৃত হয়। হয়তো স্কুলে আসবার আগেই শিশুর গৃহে তার নিরাপত্তা-বোধ বিপন্ন হয়েছে, স্কুলে এসেও তাই সে স্বস্তিবোধ করে না ও নিজেকে মানিয়ে চলতে পারে না।[১১]

১১ The child enters school with certain past social experiences in mind. He enters with a fixed emotional attitude compounded of success and failures at home. In school he encounters another circle of adults and children each capable of being a source of comfort or anxiety, School is to him another arena where he wins or loses approval of other human beings, thus adding self-esteem and enriching personality or deepening sense of guilt and inferiority. In school he carries his· ready-made 'rebellion and submission, fear of failure, dependence or self-reliance. These new adults, the teachers, are simply other parents rewarding, blaming, petting, loving or criticising according to their own mysterious standards.

সুতরাং শিক্ষক বা শিক্ষিকার দায়িত্ব অনেকখানি। তাঁর সহৃদয় ও সুবিচারপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা, উপযুক্ত উৎসাহ ও চালনা -দ্বারা তিনি শিশুর মধ্যের শ্রেষ্ঠ গুণগুলি বিকশিত করে তুলতে পারেন, অথবা তাঁর নির্মমতা ও স্বেচ্ছাচারিতা -দ্বারা তিনি শিশুর নিরাপত্তা-বোধ ক্ষুণ্ণ করে তার ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশকে পঙ্গু করে দিতে পারেন।

শিশুর স্বাধীনতার সীমা

শিশুর ব্যক্তিত্বের সম্যক বিকাশ সমস্ত শিক্ষানীতিরই উদ্দেশ্য। রুসো-র পর থেকে সমস্ত আধুনিক শিক্ষানীতিই শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর স্বাধীনতা স্বীকারের পক্ষপাতী। মন্তেসরী ও ড্যাল্‌টন্‌-এর শিক্ষাবিধিতে এর বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা হয়েছে। এর একটি ফল হয়েছে শিক্ষকের দায়িত্ব-হ্রাস। শিক্ষক যেন কতকটা নিষ্ক্রিয় দর্শকে পরিণত হয়েছেন। এর ফল কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আশানুরূপ হয় নি। সোভিয়েট রাশিয়ায় প্রথম দিকে শিক্ষা-সংস্কারের চেষ্টায় তাঁরা শিশুর স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করে যে পরীক্ষা করেছিলেন তার উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে শিশু কি পড়বে, কতটুকু পড়বে, কি ভাবে পড়বে, ক্লাসে অবাধ্য ছেলেদের শাসন কি হবে এই সমস্ত বিষয়েই তাঁরা স্বাধীনতা দিয়ে দেখলেন। কিন্তু কয়েক বৎসরের পরীক্ষার পর তাঁরা দেখলেন ফল সর্বত্র শুভ হয় নি। এ সব নতুন পরীক্ষার ফলে "ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ হ্রাস পেয়েছে, শিক্ষকের মর্যাদা ও সক্রিয়তা লোপ পেয়েছে এবং এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে প্রত্যেক ছাত্র কতটুকু অগ্রসর হচ্ছে সেদিকে প্রায় কোন দৃষ্টিই দেওয়া হচ্ছে না।"[১২] শিক্ষাব্রতীদের দেশব্যাপী পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ফলে তাঁরা স্থির সিদ্ধান্ত করলেন যে শিশুর অপরিণত মন তার নিজের পক্ষে কি ভালো, কি মন্দ তা বিচার করতে পারে না। শিক্ষকের ওপর, পিতামাতা-গুরুজনের ওপর, তারা স্বাভাবিক ভাবে নির্ভর করে, তাঁদের বিশ্বাস করে, তাঁদের দ্বারা পরিচালিত হতে, তাঁদের প্রশংসা পেতে তারা ভালোবাসে। সাধারণত এতেই তাদের কল্যাণ। শিশুর সুষ্ঠু বিকাশ তখনই সম্ভব হয়, যখন সমাজব্যবস্থাও সুশৃঙ্খল ও অবিচারমুক্ত হয়। শিশুকে ছোটসময় থেকেই ভদ্রতা, পরের প্রতি বিবেচনা ইত্যাদি সদ্‌গুণ শেখাতে হয়। এর জন্যে শিক্ষক ও পিতামাতার সক্রিয় চেষ্টা প্রয়োজন।[১৩]

১২ Decree of the Central Committee, C. P., 25th Aug. 1932

১৩ Beatrice King—Russia Goes to School, p. 32

আত্মবিকাশের সুযোগের অভাব ও অবাধ্যতা

অনেক মনোবিজ্ঞানীই মনে করেন শিশুর অবাধ্যতা বা অপরাধপ্রবণতার একটি প্রধান কারণ হচ্ছে, শিশুর আত্মবিকাশের সুযোগের অভাব ও অবসর সময়ে তৃপ্তিকর ও গঠনাত্মকভাবে আত্মনিয়োগের অসুবিধা। অধিকাংশ অবাধ্য ছেলেকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় "অবসর সময় কি করে কাটাও?" উত্তর পাওয়া যায়, "কি আর করব? ঘুরে বেড়াই।" হিসাব করে দেখা যায় বাধ্য ও স্বাভাবিক ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা, দল বেঁধে বেড়াতে যাওয়া, পিক্‌নিক্ ইত্যাদির সুযোগ-সুবিধা অবাধ্য বা অপরাধপ্রবণদের চেয়ে বেশী নেয়। কিন্তু অপরাধপ্রবণেরা অলস আমোদে বেশী সময় কাটায়। সপ্তাহে একবারের বেশী সিনেমা দেখতে যায় অপরাধপ্রবণেরা অনেক বেশী।[১৪] অবশ্য এ পরীক্ষা আমেরিকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে করা হয়েছিল।

রাশিয়ার উদাহরণ

শিশুরা যাতে তাদের অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার করতে পারে সে জন্য সে-সব দেশে যথেষ্ট ব্যবস্থা করা হয়। স্কুলে এবং স্কুলের বাইরে ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা, দেশভ্রমণ ইত্যাদির নানা ক্লাব আছে। বয়স্কাউট্ ইত্যাদি সংস্থায় আনন্দের সঙ্গে কুশলতালাভ ও শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে। রাশিয়া বোধ হয় এ বিষয়ে ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকার চেয়ে বেশী অগ্রসর। সেখানে অবসর-যাপনকেও দেশসেবা ও আত্মোন্নতির উদ্দেশ্যমুখী করবার চেষ্টা বেশী দেখা যায়। নানারকম লাইব্রেরী ও প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে ছেলেমেয়েরা অবসর সময়ে নিজ খুশীমত লেখাপড়া বা নানা শিল্পকর্ম শিক্ষা করতে পারে। ক্লাসে-শেখা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের হাতে-কলমে ব্যবহার যাতে তারা করতে পারে সে জন্যে নানা ল্যাবরেটরী বা বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করবার সুযোগ তারা পায়। ছুটির সময় দল বেঁধে গ্রামে গিয়ে তারা কৃষকদের শস্য কাটতে আনন্দের সঙ্গে সাহায্য করে, বদ্ধ জলা পরিষ্কার করে, রাস্তাঘাট বানায়। সে দেশের বড়রা ও ছোটরা সকলেই বিশ্বাস করতে শিখেছে যে "শ্রমই শৌর্য, শ্রমেই সম্মান ও সর্বোচ্চ সার্থকতা।" রাশিয়ায় ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধের পর দেশের উপর নানা বিপর্যয় দেখা দেয় এবং শিশুদের মধ্যে অপরাধ এত ভয়ানক বেড়ে গিয়াছিল যে সে-দেশের রাষ্ট্রপ্রধানেরা বিষম চিন্তিত হয়ে পড়েন। দেশব্যাপী

১৪ M. Merrill—Problems of Child Delinquency, pp. 90-91

এই সংকল্প দেখা দেয় যে এ-অবস্থা দূর করতেই হবে। ১৯২০ সাল থেকেই Commissariat of Justice এবং Commissariat of Education একযোগে এই কাজে ব্রতী হন এবং অবাধ্য শিশুদের জন্যে আলাদা Home বা Colony তৈরি করা হয়। অবাধ্য শিশুদের সুস্থ করবার কাজে অ্যান্টন ম্যাকারেংকো যে অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তার তুলনা নেই। ১৯৩৬ সালের মধ্যে রাশিয়ায় এ সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান তাঁরা করেছিলেন। এর জন্য অবশ্য দেশের লোকের ও বিশেষ করে সে-দেশের শিক্ষক ও সমাজকর্মীদের সহযোগিতাই দায়ী। আমাদের দেশেও আমরা এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। রাশিয়া বিশ্বাস করেছে, "জন্মগত অপরাধপ্রবণতা বলে কিছু নেই। কোন অপরাধপ্রবণ শিশুই এমন নয় যে তার সংস্কার হতেই পারে না। প্রধান কাজ প্রত্যেক শিশুর মধ্যে আত্মমর্যাদা-বোধ জাগ্রত করা। এর জন্য শিশুকে যথাযোগ্য সম্মান ও অনেকখানি স্বাধীনতা দিতে হবে। কাজ ও শ্রমই অবাধ্যতার শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক। শিশুর শ্রমকে দশের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। গঠনাত্মক কাজের মধ্য দিয়ে শিশুর শক্তিকে বিকশিত করে অপরাধ ও পাপের প্রলোভন দূর করতে হবে। গৃহ, বিদ্যালয় ও সমাজ-পরিবেশ বিশুদ্ধ ও উৎসাহপূর্ণ হলে শিশু অপরাধের পথে যায় না।"[১৫] এ সমস্ত সিদ্ধান্ত বহু বাস্তব পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এবং আমরা মনে করতে পারি এ-সিদ্ধান্ত সর্বদেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

১৫ Makarenko—Letters to the Parents, p. 5

ত্রয়োদশ অধ্যায়

অপরাধপরায়ণতার কারণ-অনুসন্ধান

বিগত পঞ্চাশ বছর যাবৎ শিশুর অপরাধের কারণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে নানা দিক থেকে চেষ্টা হচ্ছে। কেউ কেউ অপরাধের মূল কারণ বংশগত (hereditary) বলেই সিদ্ধান্ত করেছেন। দেহবিজ্ঞানীরা অপরাধীদের দৈহিক গঠনের মধ্যে এর মূল কারণ খুঁজেছেন। সমাজ-বিজ্ঞানীরা প্রতিকূল পরিবেশ ও সামাজিক অব্যবস্থাকে এর জন্যে দায়ী করেছেন।

অপরাধের মনস্তাত্ত্বিক কারণ : ফ্রএড্

কিন্তু অধুনাকালে অপরাধের মনস্তাত্ত্বিক কারণ নিয়ে গবেষণাই সর্বাধিক মনোযোগ-আকর্ষণ করেছে। বিশেষ করে ফ্রএড্‌পন্থীরা যথেষ্ট প্রমাণের ওপর নির্ভর করে এ সিদ্ধান্ত করেছেন যে শিশুর অপরাধ অবদমিত আকাঙ্ক্ষা থেকে উদ্ভূত অবচেতন মনে সংঘাত ও অশান্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে বিকৃত অসমাজিক প্রতিক্রিয়া। বহু অপরাধের মধ্যেই একটা অন্ধ অপ্রতিরোধ্যতা (compulsion) থাকে—অপরাধী কাজটি না করে পারে না।

ক্ষতিপূরণের কলকব্জা : অ্যাডলার

অ্যাড্‌লার অপরাধের ব্যাখ্যায় ব্যক্তিত্বগঠনে 'ক্ষতিপূরণের কলকব্জার' (mechanism of compensation) ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই রয়েছে গভীর হীনতা-বোধ অতিক্রম করে বড় হবার আদিম আকাঙ্ক্ষা। কতকগুলি প্রতিপূরণমূলক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি তার হীনতা-বোধ অতিক্রম করতে চেষ্টা করে, কখনো কখনো তার সে চেষ্টা সমাজের সমর্থনলাভ করে, কখনো আবার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তখন সমাজ ব্যক্তির ওপর চাপ দিতে থাকে। ব্যক্তি সে চাপ মেনে নিলে তখন তার ব্যবহার সমাজসঙ্গত বলে স্বীকৃত হয়। কিন্তু কখনো কখনো ব্যক্তি সে চাপ মেনে নেয় না। আকস্মিক অবস্থা, পারিবারিক অবস্থা, ব্যক্তির নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী এবং তার বড় হওয়ার আকাঙ্ক্ষার প্রাবল্য নির্ধারণ করে দেয় ব্যক্তি সমাজের চাপের কাছে নতিস্বীকার করবে কিনা। যদি

সে করে, সমাজ তখন তাকে প্রশংসা করে; আর যদি যে চাপের বিরুদ্ধে বাধা দেয় তখন তা হয় সমাজে নিন্দিত। তার সমাজনিন্দিত ব্যবহার যখন একটি অভ্যাসের স্থিততায় দাঁড়িয়ে যায়, তখন তাকেই বলা হয় অপরাধ। তখন সে ব্যবহার ব্যক্তির শাসনসংযমের আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। এবং তা অন্ধ অপ্রতিরোধ্য শক্তির মতো ব্যক্তিকে কতকগুলি কাজ করতে বাধ্য করে।[১]

অমীমাংসিত সংঘাত অপরাধের কারণ: হীলি

১৯১৭ সালে হীলি অপরাধীদের অসামাজিক ব্যবহারের পশ্চাতে ব্যক্তি-মানসে অমীমাংসিত সংঘাতের নিকটসম্বন্ধ বহু অপরাধীদের জীবনেতিহাস থেকে প্রমাণ করেন। তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে সামাজিক ও পরিবেশগত কারণ বলে যে অবস্থাগুলির উল্লেখ করা হয় সেগুলি বাস্তবিক পক্ষে অপরাধের যে মূল কারণ—ব্যক্তির মনে অমীমাংসিত সংঘাত—তাকে প্রকট করে তোলে মাত্র। সেগুলিকে উত্তেজক কারণ (exciting causes) বলা যেতে পারে। কিন্তু মূল কারণ হচ্ছে, ব্যক্তির মনে অতৃপ্ত কতকগুলি তীব্র আকাঙ্ক্ষা যেগুলি সে স্বাভাবিকভাবে তৃপ্ত করতে সক্ষম হচ্ছে না। বাস্তবিক পক্ষে অপরাধগুলি হচ্ছে বিকল্প তৃপ্তি-লাভের উপায় মাত্র। হীলি ফ্রএড্-এর মতোই বিশ্বাস করেন যে এই অতৃপ্ত তীব্র আকাঙ্ক্ষাগুলি প্রধানত যৌনিকেন্দ্রিক। সর্বদা এই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাগুলি অপরাধ-ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই যে আত্মপ্রকাশ করবে এমন কোন কথা নেই। তবে অপরাধ-ক্রিয়া এই তৃপ্তিলাভের একটা প্রধান

১ Alfred Adler who emphasized the mechanism of compensation as the most important factor in personality formation, believed that the drive to gain superiority and to attain a given status resulted in conduct disorders. Some forms of compensatory behaviour may be useful and socially approved; others may be socially undesirable. When an individual's compensatory behaviour begins to be socially undesirable, the pressure the society exerts in order to inhibit such behaviour may be a stimulating factor in exaggerating it...when anti-social behaviour develops and become fixated, the basic problems and conflicts may be repressed still further and the probabilities of a re-orientation decreased. The anti-social behaviour may then assume the form of compulsive-like activity which the individual cannot control. Sherman—Basic Problems of Behaviour, pp. 312-13

উপায় তাতে সন্দেহ নেই। কাজেই অপরাধ হচ্ছে অন্তরের মূল রোগের বাহ্য লক্ষণ মাত্র।[২]

দুর্লঙ্ঘ্য বাধা ও নিরাশা অপরাধের কারণ

এর পরে ব্রনার্-এর সহযোগিতায় আরো বহু অপরাধীর জীবনেতিহাস বিশ্লেষণ করে তাঁর পূর্বের সিদ্ধান্তেই হীলি অচল থাকেন এবং বলেন তীব্র আকাঙ্ক্ষার সম্মুখে দুর্লঙ্ঘ্য বাধাজনিত নিরাশা (frustration) অধিকাংশ অপরাধের মূল কারণ। অপরাধে যে শিশু সবসময়ই সচেতনভাবে প্রবৃত্ত হয় তা নয়। এবং নৈরাশ্যজনক অশান্তিপূর্ণ অবস্থায় শিশুর প্রতিক্রিয়া সর্বদাই অপরাধের রূপ নেবে তাও নয়। এবং অপরাধ -রূপ প্রতিক্রিয়াও অবস্থাভেদে বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। শিশুর অবচেতন মনে নৈরাশ্যজনক অনুভূতির যে জটিল সংঘাত জন্মে অপরাধের মধ্য দিয়ে শিশু তার থেকে মুক্তি খোঁজে। হীলি ও ব্রনার্-এর মতে শান্তিলাভ বা সংঘাত থেকে মুক্তির চেষ্টায় অপরাধের মধ্য দিয়ে যে সাত প্রকার ব্যবহার দেখা যায় তাদের নিম্নলিখিত সাত দলে ভাগ করা যায়—

সাত প্রকার অপরাধমূলক ব্যবহার

(১) পলায়ন -দ্বারা অপ্রীতিকর অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা; (২) কোন পরিবর্ত ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিকল্প তৃপ্তিলাভের চেষ্টা—দুঃসাহসিক, মনোযোগ আকর্ষণকারী ক্রিয়া কিংবা এমন দুষ্ক্রিয়া যাতে অপপ্রসিদ্ধি লাভ করা যায়; (৩) ব্যক্তির হীনতা-বোধ-আবরণের উদ্দেশ্যে কোন দুর্বৃত্তের দলের সঙ্গে তাদাত্ম্যতা -দ্বারা, সবল ব্যক্তিত্বের মর্যাদা- ও স্বীকৃতি-লাভের দুশ্চেষ্টা; (৪) পিতামাতা ইত্যাদি গুরুজনের বিরুদ্ধে অবচেতন মনে বিদ্বেষ—তাঁদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক বা প্রতিশোধমূলক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রকাশের চেষ্টা; (৫) আক্রমণাত্মক,শাসনভঙ্গকারী ক্রিয়ার (aggressive behaviour) সাহায্যে শাসন-কর্তৃপক্ষকে আঘাত করবার চেষ্টা; (৬) বাধাপ্রাপ্ত গভীর 'জৈব প্রেরণাগুলি'র অস্বাভাবিক উপায়ে তৃপ্তিলাভের চেষ্টা; (৭) গভীর পাপ-বোধ স্খালনের উদ্দেশ্যে শাস্তি পাবার আকাঙ্ক্ষা। অপরাধ করলে নিশ্চিত যে শাস্তি

---

২ Healy—Psychiatry & the Juvenile Delinquent, The American. J. of Psychiatry, 1935, 91, pp. 1311-26
Healy—Mental Conflicts & Misconduct, 1917, p. 333

অপরাধপরায়ণ তাদের মধ্যে অস্থিরতা ও মনোবিকারের লক্ষণ, সুস্থ স্বাভাবিক মানুষদের তুলনায় অনেক বেশী। কিন্তু এই দুইয়ের মধ্যে কার্য-কারণ-সম্বন্ধ বর্তমান, একথা জোর করে বলা যায় না। অনেক অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের বেলায় দেখা যায় যে তারা অকারণ ঘুরে বেড়ায় (vagabond behaviour) তবে এর কারণ এও হতে পারে যে ব্যক্তি প্রতিকূল সহানুভূতিহীন পরিবেশ থেকে পলায়ন করে আত্মরক্ষা করতে চায় এবং অপরাধপ্রবণ অন্যান্য শিশুদের দলে মিশে নিজের কৃতকর্মের অশুভ ফল থেকে নিজেকে বাঁচাতে চায়। এই বাউণ্ডুলে ভবঘুরে ভাব জন্মগত দৈহিক স্নায়বিক মানসিক অস্থির গঠনের সঙ্গে সম্ভবত:যুক্ত, কিন্তু এটাকে অপরাধের কারণ ঠিক বলা চলে না। এ জাতীয় অস্থিরতা-সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের গঠন অপরাধপ্রবণতার পক্ষে একটা অনুকূল অবস্থা একথা অনুমান করা যায়।

অপরাধীদের মধ্যে অনেকেই আত্মকেন্দ্রিক এবং অনুভূতির দিক থেকে অব্যবস্থিত (emotionally unstable) এটা বহু মনোবিদ্ই লক্ষ্য করেছেন। ব্রমবার্গ ও টমসন্ অপরাধপরায়ণদের ব্যক্তিত্বগঠনে বিকৃতি ও এই বিকারের প্রকৃতি নিয়ে বহু অনুসন্ধান করে দেখেছেন যে দশ হাজার শাস্তিপ্রাপ্ত অপরাধীদের মধ্যে শতকরা ১'৫ জন হচ্ছে গভীর মানসিক রোগাক্রান্ত বাতুল (psychotics), শতকরা ২'৪ জন মানসিক হীনতাসম্পন্ন (mentally deficient) আর শতকরা ৬'৯ জন হচ্ছে বিকারসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী (psychopathic personalities)। আর বাকী যারা মানসিক বিকার-সম্পন্ন নয় তাদেরও সুস্থ ব্যক্তিত্বের মান থেকে গুরুতর বিচ্যুতি দেখা যায়। এদের অধিকাংশের মধ্যেই হিংসাত্মক বা আক্রমণাত্মক ব্যবহারের প্রাবল্য দেখা যায়। অনেকের মধ্যে এই আক্রমণাত্মক ব্যবহার মদ্যপানের পরে বিশেষ ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। কারো আক্রমণাত্মক ব্যবহার নিজের হীনতাবোধ-আবরণের কৌশলমাত্র। এর মধ্যে অনেকেই অনুভূতির দিক থেকে অব্যবস্থিত। অনেকের মধ্যে দেখা যায় জোচ্চুরি করবার ও ঠকাবার স্বভাব (swindler type)। অনেকেরই নীতিবোধ অত্যন্ত শিথিল (unethical type), অনেকে বুদ্ধির দিক থেকে অপরিণত (immature), আত্মকেন্দ্রিক (introvert) ও পরের দ্বারা সহজেই অভিভাবনপ্রবণ (suggestible)।

সাধারণত দেখা যায় অপরাধীরা দৈহিক দিক হতে অধিকতর চঞ্চল ও সক্রিয়। এটা তাদের মানসিক অস্থিরতারই বহিঃপ্রকাশ। এদের জীবনে

সংঘাত সাধারণ সুস্থ মানুষদের তুলনায় অনেক বেশী। অর্থাৎ এরা পিতা, মাতা, ভাইবোন, সহপাঠী অথবা তাদের সমাজপরিবেশের সঙ্গে সুসঙ্গত সম্বন্ধ-স্থাপনে অসমর্থ। তবে এই মানসিক সংঘাত কি তাদের অপরাধের কারণ অথবা পিতামাতা-গুরুজনেরা তাদের যে বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখেন তার ফল, তা বলা মুস্কিল। যারা অপরাধপরায়ণ তাদের যে অনুভূতি -বিষয়ে অস্থিরতা দেখা যায় তার একটা কারণ এও বটে যে, যারা অপরাধী, তারা, যারা অপরাধী নয়, তাদের খুব প্রীতির চোখে দেখে না এবং যে ব্যক্তি বা যে শাসন-কর্তৃপক্ষ তাদের শাস্তি দেন, তাদের তারা স্বভাবতই বিদ্বেষের চোখে দেখে।

ব্যক্তিত্বসূচক কোন একটি গুণের বিপর্যয় বা বিকার অপরাধের কারণ একথা বলা যায় না। কারণ যাদের মধ্যে এমন বিপর্যয় বা বিকার দেখা যায়, তারা সকলেই অপরাধী হয় না, আর যারা অপরাধী তারা সবাই অনুভূতির দিক থেকে অব্যবস্থিত, তাও নয়। তবে এটা সত্য যে অনুভূতি -বিষয়ে অব্যবস্থিততা যাদের মধ্যে দেখা যায়, তারা যত সহজে প্রতিকূল পরিবেশের চাপে অপরাধের পথে পা বাড়ায় সুস্থ স্বাভাবিক মানুষেরা তা করে না।

যে সমস্ত শিশুরা অপরাধী তারা ব্যক্তিত্বের সাধারণ মান থেকে ঠিক কি কি বিষয়ে ব্যতিক্রম এর ভিত্তিতে অপরাধীদের শ্রেণীবিভাগের যথেষ্ট চেষ্টা হয় নি। অপরাধের মূলে যে অনুভূতি -বিষয়ে অব্যবস্থিততা তা বিভিন্ন শিশুর মধ্যে এতই পৃথক যে এর ভিত্তিতে কোন শ্রেণীবিভাগ করা মুস্কিল। তথাপি হীলি ও ব্রনার অপরাধের মূলে যে সমস্ত অনুভূতি -বিষয়ক অব্যবস্থিততা থাকে, তার ভিত্তিতে একটি শ্রেণীবিভাগের চেষ্টা করেছেন। তাঁরা যত অপরাধপরায়ণ শিশুকে পরীক্ষা করেছেন তাদের মধ্যে শতকরা ৯১ জনকেই দেখেছেন অসুখী, অসন্তুষ্ট অথবা অনুভূতি -বিষয়ে অব্যবস্থিত। আর কণ্ট্রোল গ্রুপের শতকরা ১৩ জনকে মাত্র তাঁরা অনুরূপভাবে অব্যবস্থিত দেখেছেন। তাঁরা অব্যবস্থিততার ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ করে অপরাধীদের নিম্নলিখিত কয়েকটি টাইপে ভাগ করেছেন :

(১) যারা তীব্রভাবে বোধ করে তারা অবাঞ্ছিত (rejected), বঞ্চিত (deprived) অ-নিরাপদ (insecure), যাদের মনের মধ্যে এ অভিযোগ গভীর যে তাদের পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন তাদের বোঝেন না, তাদের ভালবাসেন না, পূর্বে ভালবাসলেও এখন সে ভালবাসা প্রত্যাহার করেছেন—এরা হল শতকরা ৪৬ জন।

(২) যাদের মনে এই অনুযোগ বদ্ধমূল যে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা আত্ম-বিকাশের সমস্ত উদ্যমে বাধা দেওয়া হয়। এদের মধ্যে একদল আছে যাদের অভিযোগ হল আত্মবিকাশের পক্ষে প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা ও সুযোগ তারা পাচ্ছে না। আবার একদল আছে যারা বাল্যে অতিরিক্ত প্রশ্রয় পেয়েছিল, কিন্তু বড় হয়ে সে প্রশ্রয় না পেয়ে নিজেদের বঞ্চিত বোধ করে। আবার আর একদলের অভিযোগ হল, তাদের বয়স্ক ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তির পথ (যৌন-আকাঙ্ক্ষাও এর অন্তর্গত) গুরুজনদের অন্যায় শাসনে রুদ্ধ—এরা হল শতকরা ২৮ জন।

(৩) যাদের মনে এই বিশ্বাস রয়েছে (তা সত্যও হতে পারে, কাল্পনিকও হতে পারে) যে তাদের গৃহ বা বিদ্যালয়ের জীবন নিকৃষ্ট বা সঙ্গীসাথীহীন,—এরা হল শতকরা ২৮ জন।

(৪) পারিবারিক অশান্তি, পিতামাতার অপরাধপরায়ণতা, পরিবারে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে অপ্রীতিকর সম্বন্ধ অথবা শাসন ইত্যাদি -বিষয়ে পিতা-মাতার ত্রুটি সম্বন্ধে যাদের মনে তীক্ষ্ণ অস্বস্তিবোধ থাকে—শতকরা ৩৪ জন।

(৫) ভাইবোন কারো সম্বন্ধে বিষম হিংসা অথবা এই তিক্ত অভিযোগ যে, পরিবারে কেউ কেউ অতিরিক্ত প্রীতি ও ভালবাসা পায় অথচ সে তার প্রাপ্য ভালবাসা পাচ্ছে না—শতকরা ৩১ জন।

অপরাধপরায়ণতার পরিবেশগত কারণ

মনোবিদেরা যেমন শিশুর অপরাধপরায়ণতার কারণ তার ব্যক্তিত্বের বিকৃত গঠন বা মানসিক অস্থিরতা ও অমীমাংসিত সংঘাতজনিত মানসিক অব্যবস্থার মধ্যে খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন, তেমনি সমাজতত্ত্ববিদেরা অপরাধের পরিবেশগত কারণের ওপরই বেশী জোর দিয়েছেন। তাঁরা ব্যাপক অনুসন্ধান করে এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে অপরাধপ্রবণ শিশুদের পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ সুস্থ স্বাভাবিক ছেলেমেয়েদের পরিবেশ থেকে কতকগুলি বিষয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে পৃথক। তাঁরা দেখিয়েছেন যে শিশুদের সামাজিক ও সংস্কৃতিগত পরিবেশ তাদের আচরণের ওপর প্রবল প্রভাববিস্তার করে। দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও শাসন -বিষয়ে শিথিলতার সঙ্গে অপরাধের অতি নিকট সম্বন্ধ অনেকেই লক্ষ্য করেছেন। পরিবেশ যেখানে নানা অভাবের তাড়নায় বিড়ম্বিত, যেখানে স্নেহ-সহানুভূতির জীবনপ্রদ রস থেকে শিশুরা বঞ্চিত, যেখানে তাদের চারপাশে

তারা দেখতে পায় মিথ্যাচার, পাশবিকতা, রুচিহীন বর্বরতা, হিংসা, বঞ্চনা ও হীনতা সেখানে শিশুর মনে তার কুপ্রভাব পড়বেই এমন আশঙ্কা খুবই স্বাভাবিক। যে পরিবেশে শিশুদের খেলাধুলা স্বাভাবিক আনন্দ-কোলাহলের মধ্য দিয়ে সুস্থ স্বাভাবিক আত্ম-উন্মোচনের সুযোগ নেই, যেখানে বাসস্থানের কোন স্থিরতা নেই, নিরাপত্তাবোধ নেই (যেমন, রেফ্যুজী ক্যাম্প), খাওয়াপরা প্রভৃতি জীবনের মৌলিক প্রয়োজনগুলি স্বাভাবিকভাবে মেটাবার উপায় নেই, স্বাস্থ্যরক্ষার কোন সুব্যবস্থা নেই, পিতামাতা আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে প্রীতি-শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের আবহাওয়া নেই, যেখানে শিশুদের সামনে নৈতিক জীবনযাত্রার কোন জীবন্ত দৃষ্টান্ত নেই (বরঞ্চ বিপরীতই আছে), পিতামাতা-শিক্ষকের উৎসাহপূর্ণ সুপরিচালনা নেই, শাসনের কোন সুপ্রতিষ্ঠিত মান বা পদ্ধতি নেই, সেখানে শিশুরা সুস্থ সতেজ মন নিয়ে গড়ে উঠবে এটা আশা করা যাবে কি ভাবে? এই বিড়ম্বিত, সর্ববিষয়ে প্রতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও যে সে অঞ্চলের বহু ছেলেমেয়ে মোটামুটি সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করে, এতে মনুষ্যপ্রকৃতির মৌলিক মহত্ত্বেরই প্রমাণ পাওয়া যায়।

বিভিন্ন সমাজতত্ত্ববিদ্ অবশ্য সমাজপরিবেশের বিশৃঙ্খলার বিভিন্ন দিককে শিশুর অপরাধের জন্য দায়ী করেছেন। সাদারল্যাণ্ড-এর নাম ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। তিনি অ্যামেরিকার বিভিন্ন 'কারাগার এবং কিশোর-অপরাধীদের সংশোধনাগারে অনুসন্ধান করে কয়েকটি সিদ্ধান্ত করেন। সংক্ষেপে তাঁর কয়েকটি সিদ্ধান্ত এখানে বলছি :

১। মানসিক গঠনের দিক থেকে অপরাধী এবং অনপরাধী ব্যক্তিদের মধ্যে কোন মৌলিক প্রভেদ নেই। পরিবেশগত কারণেই অপরাধ সংঘটিত হয়।

২। অভ্যস্ত অপরাধক্রিয়ার মূল হচ্ছে অপরাধীদের সঙ্গ ও সাহচর্য। যে সব কিশোরেরা অপরাধপরায়ণ ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করতে অভ্যস্ত তারাই অপরাধের পথে পা বাড়ায়; আবার যারা সুস্থ স্বাভাবিক ছেলেদের সঙ্গেই মেশে তাদের আচরণও সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকে।

৩। অপরাধপ্রবণদের সঙ্গে মেলামেশা যত বেশী এবং যত অন্তরঙ্গ হবে, পাপ-আচরণের পরিমাণও ততই বাড়বে।

৪। বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সংস্কৃতিগত পার্থক্য ও সংঘাত বর্তমান থাকে। এবং সেই জন্যে কিশোরদের নিজ নিজ বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর মধ্যেই

মেলামেশা সীমাবদ্ধ থাকে। এই যে সাংস্কৃতিক বিরোধের ভিত্তিতে গঠিত, বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর সীমাবদ্ধ গণ্ডীতে সংকীর্ণ মেলামেশা, তাও অপরাধপ্রবণতার একটি কারণ।

৫। সামাজিক বিশৃঙ্খলা এবং কোন কোন গোষ্ঠীর বিকৃত নৈতিক মান কিশোরদের মধ্যে নৈতিক শিথিলতা সঞ্চার করে এবং অপরাধপ্রবণতা বাড়িয়ে দেয়। সামাজিক বিশৃঙ্খলা বলতে গোষ্ঠীর নৈতিক মানের নিম্নতা এবং শাসনের অভাবে কোন বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে অসামাজিক বিশৃঙ্খল আচরণের প্রাবল্য বোঝায়।[৫]

অর্থাৎ সাদারল্যাণ্ড কুসঙ্গ এবং শাসন -বিষয়ে শৈথিল্যকেই অপরাধের প্রধান কারণ বলে মনে করেন।

শ এবং ম্যাক্‌কে অ্যামেরিকার বিভিন্ন অঞ্চল যেখানে অপরাধের প্রাবল্য, সেখানে দীর্ঘকালব্যাপী অনুসন্ধান চালিয়ে সিদ্ধান্ত করেন যে ব্যক্তির বাসস্থান কোন্ এলাকায়, তা দিয়ে তার অপরাধপ্রবণতা অনেকটা নির্ধারিত হয়। তাঁদের হিসাব অনুযায়ী—

১। গভীর অবচেতন মনে অবদমিত অমীমাংসিত সংঘাত বা মানসিক দ্বন্দ্বের ফলে অনির্দেশ্য ও অস্পষ্ট অসুখী মনোভাব, ব্যক্তি নিজেও তার অশান্তির প্রকৃতি স্পষ্ট করে জানে না এবং এ মানসিক অশান্তি আপাত-যুক্তিহীন কতকগুলি অপরাধের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে—শতকরা ১৭ জন।

৫ Sutherland proposes seven principles in his theory: First, the processes which result in systematic criminal behaviour are fundamentally the same in form as the processes in systematic lawful behaviour. Second systematic criminal behaviour is determined in a process of association with those who commit crimes, just as systematic lawful behaviour is determined in a process of association with those who are law-abiding. Third, differential association is the specific causal process in the development of systematic criminal behaviour. Fourth, the chance that a person will participate in systematic criminal behaviour is determined roughly by the frequency and consistency of his contacts with patterns of criminal behaviour. Fifth, individual differences among people in respect to personal characteristics or social situations cause crime only as they affect differential association or frequency and consistency of contacts with criminal patterns. Sixth, cultural conflict is the underlying cause of differential association and therefore of systematic criminal behaviour. Seventh, social disorganization is the basic cause of systematic criminal behaviour. Sutherland—Principles of Criminology, pp. 4-5

২। পূর্বের কোন অপরাধ বা কৃতকর্মের জন্যে স্পষ্ট অথবা অবচেতন পাপবোধ। ব্যক্তি শাস্তিগ্রহণ -দ্বারা সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। সে জানে অপরাধক্রিয়ার অনিবার্য ফল শাস্তি এবং শাস্তি পাবার জন্যেই ব্যক্তি উন্মুখ—শতকরা ৯ জন।[৬]

হীলি ও ব্রনার ভূয়োদর্শন -দ্বারা এটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছেন যে অধিকাংশ অপরাধীর জীবনেই অনুভূতি -বিষয়ক নানা বিশৃঙ্খলা বা অস্থিরতা দেখা যায়। কিন্তু এই ব্যক্তিত্বগুণের বিচ্যুতিগুলিকেই কি অপরাধের হেতু বলা যায়? সব মানুষই কোন না কোন সময়ে এবং অধিকাংশ মানুষই অনেক সময় নানা অশান্তি ও অনুভূতি -বিষয়ক অব্যবস্থিততা ভোগ করে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষের মানসিক অশান্তি ও চাঞ্চল্য অপরাধের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে না। আবার এটাও খুবই সম্ভব যে অপরাধ করার ফলে মানসিক অশান্তি ও অনুভূতিগত অব্যবস্থিততা বৃদ্ধি পায়। নিজের অন্তরের পাপবোধ, পরিবার ও সমাজের নিন্দা ও ধিক্কার অপরাধপরায়ণ কিশোরকে অবশ্যই চঞ্চল করে তোলে এবং সেই অশান্তি ও অনুভূতিগত অব্যবস্থিততার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে সে হয়ত সহানুভূতিসম্পন্ন কোন দলভুক্ত হয়ে আবার নতুন অপরাধে প্রবৃত্ত হয়।[৭] কাজেই এ এক পাপচক্র। অনুভূতিগত মানসিক চঞ্চলতা অপরাধের প্রবণতা সৃষ্টি করে। আবার অপরাধের সাম্পদন অনুভূতিগত অব্যবস্থিততা বাড়িয়ে তোলে।

অপরাধের প্রকৃতি ওপরিমাণ তারবাসস্থানের ওপর নির্ভর করে। বৃহৎ নগরীর সর্বাপেক্ষা ঘনবসতিপূর্ণ ব্যবসাবাণিজ্যের অঞ্চলেই অপরাধের সংখ্যা সর্বাধিক। যতই শহরের কেন্দ্র থেকে আবাসিক অঞ্চলপূর্ণ (residential areas) অঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের দিকে যাওয়া যায় ততই অপরাধের সংখ্যা কমে যায়। শহরের ব্যবসাবাণিজ্য অঞ্চলে চুরি জাতীয় অপরাধের প্রাবল্য বেশী, কারণ, সেখানে চুরির সুযোগ বেশী, চোরাইমাল সহজে বিক্রী করা চলে, পলায়ন ও আত্মগোপনের সুযোগ বেশী। বন্দর অঞ্চলে মদ্যপান, হৈ-হল্লা এবং স্ত্রীলোকঘটিত অপরাধের

---

৬ Healy & Bronner—New Light on Delinquency and its Treatment, pp. 128-29

৭ সাদারল্যাণ্ড তাঁর Principles of Criminology-তে অন্য অপরাধীর সঙ্গ ও সমর্থন যে অপরাধের একটি মূল কারণ তা বিশেষভাবে নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেছেন—Systematic criminal behaviour is determined in a process of association with those who commit crimes, just as systematic lawful behaviour is determined in process of association with those who are law-abiding.

সংখ্যাধিক্য। শহরতলীর ঘনবসতিপূর্ণ শ্রমিক- ও দরিদ্র-অধ্যুষিত অঞ্চলে দল বেঁধে কিশোরদের নানা অপরাধ খুবই দেখা যায়। এসব অঞ্চলে বাসস্থানের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কাজেই ছেলেমেয়েরা ছোট ছোট দলে ঘরের বাইরে ঘুরতেই বেশী ভালবাসে। অধিবাসীরা দরিদ্র, কাজেই রাস্তা থেকে কুড়িয়ে বা চুরি করে খাদ্যদ্রব্যাদি ছেলেমেয়েরা ঘরে নিয়ে এলে বাপমায়েরা খুশীই হন। গৃহে শাসন বলে কিছু নেই। কোন ভালো বিদ্যালয়, সুপরিচালিত খেলাধুলা আনন্দ বা রচনাত্মক সাংস্কৃতিক ক্রিয়া, উৎসবের ব্যবস্থা নেই। নগদ টাকা হাতে পেয়ে শ্রমিকেরা সহজলভ্য মদ এবং অন্যান্য নেশার আড্ডায় ঢোকে, বাড়ীতে এসে বৌকে মারধোর করে। পাঁচমিশেলী গ্রাম্য জীবনের স্নিগ্ধ গৃহপরিবেশ থেকে উৎক্ষিপ্ত নানা জায়গা থেকে বিভিন্ন ধরনের লোক এইসব শহরতলী অঞ্চলে নিতান্ত জীবিকার প্রয়োজনে এসে একত্র হয়। এদের মধ্যে কোন সুস্থ সামাজিক বন্ধন বা সামাজিক শাসন-সংযম থাকে না। স্বভাবতই এদের নৈতিক মান শিথিল। এ বিভিন্ন জাতের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ও অপ্রীতির সম্বন্ধই সাধারণত দেখা যায়। কিশোরদের দল সহজেই অপরাধপ্রবণদের সুগঠিত দলে ভিড়ে যায়। কাজেই এসব অঞ্চলে কিশোর-কিশোরীরা বিশৃঙ্খল আচরণে সহজেই অভ্যস্ত হয়।[৮]

গৃহপরিবেশে বিশৃঙ্খলা অপরাধপরায়ণতার জন্য নিশ্চয়ই দায়ী। কিন্তু কতটা দায়ী তা স্থির করা অত্যন্ত কঠিন। এবিষয়ে সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের সিদ্ধান্তে

৮ The areas nearest the business districts of cities have the highest delinquency rates, and these rates...decrease as the distance from the business centre increases. The areas immediately surrounding business districts are usually populated by poor families. The living conditions are extremely undesirable and the social, recreational and school facilities are inferior. There is a high rate of migration and thus instability of living conditions. The children are generally poorly supervised and there are no organized cultural facilities. There is also a tradition of delinquency in these areas. Gangs of delinquent boys serve as agencies for the transmission of the traditions of delinquency. The parents almost expect their children to behave in ways which parents in other areas would not tolerate. Gangs are common and delinquency is to a large extent accepted. In many of these areas there are mixtures of racial and national groups with conflicting culture patterns. Shaw & Mckay—Social Factors in Juvenile Delinqnency, and Reports on Causes of Crime, Vol. 2, National Commission of Law Observance Enforcement, pp. 401 ff.

মতৈক্য নেই। যে গৃহে পিতা বা মাতা মৃত বা যেখানে তাদের বিবাহবিচ্ছেদ ঘটেছে, তাকে ইংরেজীতে broken home বা 'বিধ্বস্ত গৃহ' বলা হয়। এইপ্রকার গৃহের প্রভাব সন্তানদের ওপর প্রতিকূল, এটা সহজেই বুঝতে পারা যায়। পূর্বে অনেক সমাজতত্ত্ববিদ্ বাস্তব অবস্থা -সম্বন্ধে যথোপযুক্ত অনুসন্ধান না করে, 'বিধ্বস্ত গৃহ'কেই অপরাধের একটি প্রধান কারণ বলে উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে সতর্ক অনুসন্ধান করে দেখা যায় বিধ্বস্ত গৃহের ঘটনা জাতি ও সংস্কৃতিগত সমস্ত গোষ্ঠীতে সমান নয়। কোন কোন গোষ্ঠীতে এর সংখ্যা অন্য ভদ্র গোষ্ঠী অপেক্ষা প্রায় তিনগুণ বেশী। ১৭ বছর বয়সের ছেলেরা এই অবস্থা -দ্বারা যতটা মানসিক স্থৈর্য হারিয়ে অপরাধের দিকে ঝুঁকে পড়ে, ১০ বছর বয়সের ছেলেরা ততটা হয় না। অনুসন্ধানে দেখা গেছে ১৭ বৎসর বয়সের অপরাধীদের সংখ্যা, দশ বছর বয়সের অপরাধীদের সংখ্যার শতকরা ৪২ ভাগ বেশী। আবার, গৃহবিধ্বস্ত না হওয়া সত্ত্বেও যারা অপরাধপ্রবণ হয় সতেরো বছর বয়সে এমন ছেলেদের সংখ্যা, দশ বছর বয়সের শিশু-অপরাধীদের (যাদের গৃহ বিধ্বস্ত হয় নি) তুলনায় ৩৬ শতাংশ বেশী। কাজেই এটা বোঝা যায় 'বিধ্বস্ত গৃহ' পৃথকভাবে অপরাধপরায়ণতায় প্রধান কারণ নয়।

আসল কথা হচ্ছে গৃহের অশান্তিপূর্ণ পরিবেশই শিশুদের মানসিক অস্থিরতা ও নিরাপত্তাবোধের অভাবের মূল কারণ। বিবাহবিচ্ছেদ না হয়েও পিতামাতার মধ্যে যেখানে অপ্রীতি, অশ্রদ্ধা ও সন্দেহের সম্বন্ধ বর্তমান, সেখানেও স্বভাবত সে গৃহের সন্তানেরা অসুখী অনিরাপদ বোধ করবে এবং প্রতিবেশীদের চোখে তারা হেয় হবে। এই অপ্রীতিকর অবস্থায় তারা অপরাধের আপাত উত্তেজনার মধ্যে নিজেদের মানসিক অশান্তির মুক্তি খুঁজতে লুব্ধ হতে পারে।

কিশোরদের ব্যক্তিগত নানা সমস্যা বা অপূর্ণতা এবং পরিবেশের সঙ্গে তাদের অসঙ্গতির সাথে অপরাধের নিকট-সম্বন্ধ আছে এটা বহু সমাজ-তত্ত্ববিদই লক্ষ্য করেছেন। গ্লুয়েক্ দম্পতি এক সহস্র অপরাধপরায়ণ শিশুর জীবনেতিহাস সংগ্রহ করে, সতর্ক বিশ্লেষণের দ্বারা এটা দেখতে পেয়েছেন যে পিতামাতা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর অন্তর্গত হলে পরিবারে সংস্কৃতিগত সংঘাতের সম্ভাবনা যথেষ্ট থাকে এবং সন্তানদের ওপর তার কুপ্রভাব অনেক সময় দেখা যায়। ৭০ শতাংশ অপরাধী কিশোরের পিতা বা মাতা একজন বা তাদের পূর্বপুরুষ বিদেশ থেকে এসে অ্যামেরিকায় বসতি করেছিলেন এবং

তাঁরা স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে সুসঙ্গতি স্থাপন করতে পারেন নি। যারা অ্যামেরিকারই প্রাচীন বাসিন্দার পরিবারের সন্তান, অপরাধীদের মধ্যে তারা মাত্র ১৩ শতাংশ এবং অপরাধীদের ১৭ শতাংশ এমন, যাদের পিতামাতা দুই-ই বিদেশ থেকে আগত। এসব অনুসন্ধান থেকে দেখা যায় যে পিতামাতার সামাজিক আদর্শ, নৈতিক বিশ্বাস, ব্যক্তিগত আচরণের ধারার সঙ্গে সন্তানদের আদর্শ বিশ্বাস ও আচরণের সংঘাত বাধে এবং অশান্ত কিশোর সন্তানেরা অপরাধপরায়ণ দলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে নিরাপত্তা খুঁজে পায়, তাদের উত্তেজনার আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি খোঁজে। সন্তানেরা স্বভাবতই নিজেদের স্থানীয় অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক ধারার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চায়, কিন্তু পিতামাতার সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বাধে এবং এই অশান্তিপূর্ণ পরিবেশ থেকে কিশোরেরা অপরাধপরায়ণতার মধ্যে মুক্তি খোঁজে।[৯]

এই সমস্ত অনুসন্ধানই অ্যামেরিকায় হয়েছে। সে দেশের বিশেষ পটভূমিকাতেই উল্লিখিত পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু **সাধারণভাবে কতকগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অসঙ্গত নয়। এ সিদ্ধান্তগুলি সমস্ত দেশের বেলায়ই প্রয়োজ্য :**

(১) সাংস্কৃতিক সংঘর্ষপূর্ণ পরিবেশ, নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর শিথিলতা, শাসন-পরিচালনার অভাব অপরাধপরায়ণ ব্যবহারের পক্ষে অনুকূল অবস্থা।

(২) গৃহপরিবেশ প্রীতিশ্রদ্ধা ও বিশ্বাসপূর্ণ না হলে সন্তানেরা মানসিক অশান্তিতে পীড়িত হয়, অ-নিরাপদ বোধ করে। এ অবস্থায় অপরাধের মধ্য দিয়ে কিশোরেরা অনেক সময় মুক্তি খোঁজে।

(৩) দারিদ্র্য, অশিক্ষা, রুচিহীনতা -দ্বারা পরিবেশ যেখানে কলুষিত, সেখানে অপরাধের সম্ভাবনা যথেষ্ট।

(৪) পিতামাতা-শিক্ষকের সুপরিচালনার অভাব অপরাধের একটি নেতিবাচক প্রধান কারণ যারা অপরাধী নয়, তাদের তুলনায় যারা অপরাধী তাদের গৃহে এই শিথিলতা ছয় বা সাতগুণ বেশী। পিতামাতা যেখানে সন্তানদের সম্বন্ধে উদাসীন, যেখানে সন্তান পিতামাতার স্নেহ ও বিশ্বাস সম্বন্ধে আস্থাহীন, সেখানেই বিপদের সম্ভাবনা প্রচুর।

৯ Sheldon Glueck & Eleanor Glueck—One Thousand Juvenile Delinquents, pp. 341 ff

বাস্তবিকপক্ষে অপরাধের কারণ একটি নয়, বহু। শুধু মানসিক অস্থিরতা বা সমাজজীবনে বিশৃঙ্খলা দিয়ে সমস্ত অপরাধের ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। বলা হয় যে অধিকাংশ অপরাধীর মানসিক গঠনে বিশৃঙ্খলা দেখা যায় এটা জন্মগত ও ব্যক্তির প্রকৃতিগত কারণেও হতে পারে অথবা অনুভূতি-জীবনে অসঙ্গতি থেকেও হতে পারে। অপরাধী কিশোরদের মধ্যে তোতলামী, নখকামড়ানো, শয্যামূত্র ইত্যাদি অব্যবস্থিত ব্যবহার অনেক বেশী দেখা যায়। কিন্তু যাদের মধ্যে এই অব্যবস্থিত আচরণ দেখা যায় তারা সবাই তো অপরাধের পথে ঝুঁকে পড়ে না। যদি বলা হয় দারিদ্র্যই অপরাধের প্রধান কারণ, তা হলেও এটা দেখানো যাবে যে, সব দরিদ্র পরিবারের সন্তানেরা অপরাধপরায়ণ নয়। শাসন-সুপরিচালনার শিথিলতা বা অভাব অপরাধের মূল কারণ এটা বললেও দেখানো যায় যে সমস্ত শিথিলতার ক্ষেত্রেই পরিণামে অপরাধপরায়ণতা দেখা যায় না। এবং শাসন-সুপরিচালনা সত্ত্বেও কোন কোন ভদ্র পরিবারের ছেলেরা অপরাধপরায়ণ হয়। তাই **অপরাধের কারণ-নির্ণয় খুবই কঠিন। তার কারণ অপরাধ একটি অতিশয় জটিল মানব ব্যবহার।** তার মধ্যে বহু উপাদান জড়িত হয়েথাকে। এই উপাদানগুলি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন নয়। যাকে আমরা বলি মানসিক অস্থিরতার মূল কারণ তা বহুলাংশে পারিবারিক-সামাজিক প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুক্ত আর সামাজিক বা পারিবারিক প্রতিকূল অবস্থাও বহু ব্যক্তির অব্যবস্থিত মানসের যোগফল। মানসিক প্রকৃতির প্রতিকূলতা পৃথকভাবে অপরাধের কারণ নয়, আবার সামাজিক বা পরিবেশগত ত্রুটি বা বিশৃঙ্খলাকে স্বতন্ত্রভাবে অপরাধের কারণ বলা চলে না। মানসিক অস্থিরতা, পরিবেশগত অব্যবস্থায় সহজেই অপরাধের মধ্যদিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।[১০]

১০ Sherman—Basic Problems of Behaviour, pp. 326-29

চতুর্দশ অধ্যায়

অপরাধপ্রবণদের শ্রেণীবিভাগ

যিনি বিচারক তাঁর চোখে অপরাধপ্রবণতা হচ্ছে সমাজের শৃঙ্খলা-ভঙ্গ। বিচারক সমাজের ভৃত্য। যারা সমাজকে লঙ্ঘন করে তাদের ন্যায়-বিচার ও অবস্থা -অনুযায়ী শাস্তিবিধানই তাঁর কর্তব্য ও দায়িত্ব। অপরাধীকে শাস্তি দিয়ে তার স্বাধীনতা খর্ব করে তাকে আরো অন্যায় কার্য থেকে তিনি নিরস্ত করেন, সমাজকেও ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করেন। অপরাধকে তাই তিনি বাহ্ দৃষ্টিতে দেখতেই অভ্যস্ত। চোর যে, সে চৌর্য-অপরাধে দোষী, সুতরাং তার অপরাধের শাস্তি আইনের ধারা -অনুযায়ী তাকে দেওয়া হলেই বিচারকের কর্তব্য শেষ হয়ে গেল, একথা তিনি মনে করতে পারেন—অধিকাংশ সময়েই তিনি তাই মনে করেন। কিন্তু মনোবিজ্ঞানী বা সমাজ-বিজ্ঞানী যাঁরা, তাঁরা কিন্তু এই বহির্দৃষ্টি দিয়ে অপরাধকে দেখেন না। তাঁরা প্রশ্ন করেন, "কেন ছেলেটি চুরি করে? তার মনোজগতে বা সমাজ পরিবেশে কি কি শক্তি কাজ করে, যার শেষ ফলটি হচ্ছে চুরি রূপ দুষ্কার্যটি?" বহু পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার পর তাঁরা এ সিদ্ধান্ত করেন, যে চুরি মাত্রই চুরি নয়। অপরাধ মাত্রেরই নৈতিক মূল্য এক নয়। অপরাধের কারণ এক নয়, তার প্রকাশও বিভিন্ন এবং অপরাধের প্রতিকারের পথও বিভিন্ন।

অনেকেই মনে করেন, অপরাধ যারা করে, তারা জেনেশুনেই করে, কাজেই কৃতকর্মের ফল-স্বরূপ শাস্তিভোগ তাদের অবশ্য প্রাপ্য। আবার কেউ কেউ বলেন, অপরাধ একটা রোগবিশেষ। দৈহিক গঠনের অথবা দৈহিক উপাদানের অস্বাভাবিকতা বা বিকৃতি থেকেই অপরাধপ্রবণতা জন্মে। তাই অপরাধের প্রতিকার চিকিৎসায়। হয়তো দেখা যাবে অপরাধী ব্যক্তির থাইরয়েড্ গ্রন্থি থেকে রসক্ষরণ অতিরিক্ত বা অপরিমিত। উপযুক্ত চিকিৎসার দ্বারা এ ত্রুটির সংশোধন হলেই অপরাধেরও মূলোচ্ছেদ হবে। আবার ফ্রএড্পন্থী কোন কোন পণ্ডিত বলবেন, শিশুকালের অপ্রীতিকর ভীতিকর বা বীভৎস কোন অভিজ্ঞতা অবচেতন মনে অবদমনের ফলে জটিল গ্রন্থির (complexes) সৃষ্টি হয় এবং তাই সমস্ত অপরাধপ্রবণতার মূল কারণ।

সুতরাং তাঁদের মতে মনঃসমীক্ষণ (psycho-analysis) প্রণালী -দ্বারাই এ সব ক্ষেত্রে নিরাময় সম্ভবপর। কারো কারো মতে অপরাধের একমাত্র প্রতিকার উপযুক্ত কঠিন শাস্তি। কিন্তু এও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, শাস্তিতে অপরাধের সংশোধন হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে শাস্তির ফলে অপরাধপ্রবণতা বরং বেড়ে যায়।

এ সমস্ত মতের প্রত্যেকটির মধ্যেই কিছু সত্য নিহিত আছে, কিন্তু এর কোন মতই চূড়ান্তভাবে সত্য বলে গৃহীত হয় নি। অর্থাৎ যতই এই বিষয়ে অনুসন্ধান হচ্ছে ততই বোঝা যাচ্ছে, দৈহিক-মানসিক নানা বিভিন্ন কারণে অপরাধ সংঘটিত হয়,—তাদের প্রকাশ বিচিত্র এবং তাদের নিরাময়ের পন্থাও বিভিন্ন। সুতরাং অপরাধপ্রবণদের শ্রেণীবিভাগ নিতান্ত প্রয়োজন। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক্।

একটি ছেলে চুরি করেছে। এর কারণ হতে পারে ঃ—

১। ছেলেটি জন্মগতভাবেই দুর্বলচিত্ত (constitutionally feeble-minded)। তার ব্যক্তিত্বই রুগ্ণ, যার ফলে তার মনে সুস্থ নীতিবোধের অভাব, আত্মশাসনে সে অপারগ—কাজেই সুযোগ ও প্রলোভনের সামনে সে নিজেকে সামলে রাখতে পারে না। অথবা এমনও হতে পারে যে তার ঘুম-ঘুম ব্যারাম (sleeping sickness) আছে, যা মানুষকে দুর্বলচিত্ত ও নীতি-বোধহীন করে দেয়। বলাই বাহুল্য, শাসনপীড়ন -দ্বারা এই ছেলের সংশোধনের আশা সামান্যই। এর বাস্তবিকই প্রয়োজন সুচিকিৎসা।

২। ছেলেটি স্বভাবতই নীতিবোধহীন নয়। কিন্তু দুষ্ট পিতামাতার দৃষ্টান্তে অথবা তাদের প্রশ্রয়ে, অথবা কুসংসর্গে মিশে সে চুরি করতে শিখেছে। সে জানে চুরি করা অন্যায়, এবং সে নির্বোধও নয়, তাই যাতে ধরা না পড়ে সে জন্য সে যথেষ্ট সতর্ক। এ ক্ষেত্রে শারীরিক কোন বৈকল্য বা মানসিক কোন জটিলতা নেই। এখানে কোন অবদমনজনিত জটিল গ্রন্থির সৃষ্টি হয় নি। এক্ষেত্রে অপরাধীর সংশোধন অপেক্ষাকৃত সহজ। এর জন্য প্রয়োজন সুস্থ পরিবেশ ও স্নেহশীল অথচ অ-প্রশ্রয়হীন শাসন ও পরিচালনা। আদর্শচরিত্র শিক্ষকের সংসর্গে এবং ছেলেটির সৃজনীশক্তির সুষ্ঠু বিকাশের ব্যবস্থায় ও উৎসাহপূর্ণ পরিবেশে তার অপরাধপ্রবণতা দূর হবে।

৩। ছেলেটির চুরি, তার বাল্যের কোন প্রক্ষোভের সুস্থ ও সহজ প্রকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়া। ছেলেটির শারীরিক কোন

ত্রুটি নেই, নীতিবুদ্ধিও তার বিকশিত, অনুকূল সংসার-পরিবেশেই সে লালিত। তার পিতা, মাতা বা বন্ধুরা ভদ্র ও শিষ্ট। কিন্তু তার বয়স যখন দু বছরেরও কিছু কম, তখনই তার একটি ছোট বোন জন্মায়। তখন থেকেই মায়ের আদর তার ভাগে কিছু কম পড়তে থাকে। এতে তার শিশুমনে নিরাপত্তাবোধের অভাব ও নিজের সম্বন্ধে হীনতাবাধ সৃষ্টি হয়। এর সঙ্গে আসে পিতামাতার প্রতি দুর্জয় অভিমান। কিন্তু এই তীব্র অনুভূতির স্বচ্ছন্দ প্রকাশের পথ রুদ্ধ। সুতরাং তার মনে বিপরীত প্রতিক্রিয়া জাগে ছোট বোনটির প্রতি ঈর্ষার রূপে। অভিমানী শিশু, তার মনে মায়ের ভালবাসা আদরের তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে অবদমন করে, তার বিপরীত ভাব জাগে—"চাইনে তোমাদের ভালবাসা—কারুকে আমার দরকার নেই।" তার মনের এ বিক্ষোভ ও জ্বালা তাকে পিতামাতা ও সমাজের প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন করে তোলে এবং নিষিদ্ধ অপরাধ—চুরি করা—দিয়ে সে মনের ক্ষোভ মেটাতে চায়। যে জিনিস সে চুরি করল, তার প্রতি তার কোন লোভ নেই এবং অপরাধ-গোপনের জন্যেও সে খুব চেষ্টিত নয়। ধরা পড়ে শাস্তি সে নেয়, জিদ করে অননুতপ্তভাবে—"আমায় মেরে ফেল, তবু আমি কাঁদব না", এই তার ভাব। তার এই প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষভাবে তার পরিবেশের বিরুদ্ধে নয়, নিজেরই গোপন সুপ্ত অতৃপ্ত স্নেহাকাঙ্ক্ষারই বিরুদ্ধে। সহজেই বোঝা যায় শাস্তি দিয়ে এ সব ছেলের সংশোধন তো হয়ই না—বরং এরা আরও তিক্ত ও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সহানুভূতি দিয়েও এদের মন পাওয়া কঠিন, কারণ এই ছেলে প্রতিজ্ঞা করে বসেছে, "চাইনে তোমাদের আদর-ভালবাসা,—ওসব দেওগে ওই মেনীমুখা ছিঁচকাদুনী খুকুরাণীকে।"

৪। ছেলেটির চুরি তার সচেতন মনের ক্রিয়া নয়। তার অবচেতন মনের কোন অন্ধ শক্তি তাকে এই দুষ্কার্যে প্রবৃত্ত করায়। শারীরিক কোন ব্যাধি তার নেই, তার পরিবেশও প্রতিকূল নয়, তার নীতিবোধ সুবিকশিত। অথচ সে যে চুরি করছে তা সে নিজেই জানে না। যে জিনিস চুরি করল তার মূল্য হয়তো অকিঞ্চিৎকর, এবং সে জিনিসে তার কোন প্রয়োজন নেই, লোভও নেই। চুরি ঢাকবার জন্যে সে ব্যগ্র নয়। চুরি যখন ধরা পড়ল অন্য সকলে যেমন আশ্চর্য হল সে নিজেও তেমনি লজ্জিত হল। কারণ ভদ্র শান্ত ছেলে বলে তার খ্যাতি আছে।

এ দুষ্কার্যের জন্য সে বাস্তবিক অনুতপ্ত। অথাপি দেখা যায় সে এমনি অকারণে চুরি করে। তার অবচেতন মনে অবদমিত কোন আকাঙ্ক্ষা হঠাৎ আজ সুযোগ পেয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ জাতীয় অপরাধীকেই বলা হয় 'সাইকোনিউরোটিক্' (psychoneurotic)। শাস্তি দিয়ে এই অপরাধীর সংশোধন হয় না, কারণ এর অপরাধের মূলে আছে অবচেতন মনের জটিল গ্রন্থি। সেই গ্রন্থির মূলোচ্ছেদ করলে তবেই সুফল পাওয়া যেতে পারে।

এ আলোচনা থেকে বোঝা যাবে যে অপরাধের কারণ, তাদের প্রকাশ, এবং তাদের প্রতিকারের পদ্ধতির বিভিন্নতা-অনুযায়ী অপরাধীদের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা প্রয়োজন।

(১) প্রথমেই বলা যায়,কতকগুলো অপরাধ অসুস্থ দেহমনের পরিচায়ক নয়। এদের **স্বাভাবিক অপরাধী (benign delinquent)** বললে বোধ হয় দোষ হবে না। সমস্ত অপরাধই সামাজিক রীতিলঙ্ঘন-দোষদুষ্ট। সে জন্যে সব অপরাধীকেই সামাজিকতার মানে অসুস্থ (abnormal) বলা যায়। কিন্তু কতকগুলি রীতিলঙ্ঘন সুস্থ জৈব উৎসাহেরই প্রকাশ। যেমন, রৌদ্রকরোজ্জ্বল বসন্তের দ্বিপ্রহরে আলো ঝলমল বায়ু-হিল্লোলিত চিকণ সবুজ বনভূমি যদি বিদ্যালয়ের তরুণ বিদ্যার্থীকে হাতছানি দিয়ে ডাক দিয়ে উদাস করে তোলে, এবং যদি সে বিদ্যালয়ের নিয়মলঙ্ঘন করে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে বার হয়ে পড়ে, তবে শিক্ষকের চোখে সে অপরাধী সত্য, কিন্তু শিক্ষক যেদিন তরুণ ছিলেন সেদিন তিনিও কি অনুরূপ অপরাধ করেন নি? নষ্টচন্দ্রের রাত্রে পরের বাড়ীতে ঢিল না মেরেছে কে? কে না চুরি করেছে ফুল সরস্বতীপূজার আগের দিন রাত্রে? এ জাতীয় অপরাধকে আমরা তাই স্বাভাবিক অপরাধই বলব; এ অপরাধ শিশুর বাড়ন্ত দেহমনের বাড়তি শক্তিরই সুস্থ প্রকাশ (healthy outlet of surplus animal spirit)।

এ ধরনের অপরাধের প্রতিকার, সস্নেহ শাসন। এখানে ভিটামিন ট্যাবলেটেরও দরকার নেই, থাইরয়েড্ ইন্‌জেক্‌সনেরও দরকার নেই। সামাজিক ও নৈতিক বোধ-জাগরণের জন্যে সামান্য সস্নেহ উপদেশের প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু পরিবেশ-পরিবর্তনের মতো গুরুতর অপরাধ এ নয়। আর অবচেতন মনের কোন জটিল গ্রন্থি থেকে এ অপরাধের উদ্ভব নয়, কাজেই এ ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণ প্রক্রিয়া নিষ্ফল ও নিষ্প্রয়োজন।

(২) এবার **দুষ্ট অপরাধীদের** কথা বিবেচনা করা যাক। **(ক)** এদের মধ্যে একদল আছে যারা দৈহিক যন্ত্রাদির বিকৃতি বা অসুস্থ ক্রিয়ার (disordered physiological functioning) প্রভাবে অপরাধে লিপ্ত হয়। হ্যাভ্‌লক্ এলিস্ দেখিয়েছেন স্ত্রীলোক-অপরাধীরা মাসিক ঋতুর কাছাকাছি সময়ই বেশী অপরাধ করে থাকে। ফরাসী দেশে অন্তত একটি উদাহরণ আছে যেখানে নরহত্যার দোষে অপরাধী এক ব্যক্তি আদালতের বিচারে মুক্তি পায়, কারণ সে রক্তে শর্করার স্বল্পতা (low blood sugar) রোগে ভুগছিল, এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মতে এমন শারীরিক অবস্থা, অনুরূপ অপরাধের কারণ হতে পারে। জন্মগত বা শারীরিক বিকৃতির ফলে যারা অপরাধ করে, (temperamental delinquents) তাদের শাস্তি দিয়ে সংশোধনের চেষ্টা নির্বুদ্ধিতা শুধু নয়, নিষ্ঠুরতাও বটে। এদের সু-চিকিৎসা প্রয়োজন।

(খ) **সহজ অপরাধী** (simple delinquents)—এরা অপরাধ করে প্রতিকূল পরিবেশের প্রভাবে। এরা মূলত দুষ্ট নয়। গৃহে উপযুক্ত শাসনের অভাব, পিতামাতার অসদৃষ্টান্ত, বা তাদের মধ্যে সতত বিরোধ-কলহ, অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান, প্রতিকূল আর্থিক অবস্থা, কুসঙ্গ ইত্যাদিই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরাধের জন্যে দায়ী।

অবশ্য জন্মগত প্রবৃত্তির প্রবণতা না থাকলে, শুধুমাত্র পরিবেশের প্রভাবেই অপরাধী সৃষ্টি হয় কিনা সন্দেহ। পরিবেশ সুপ্ত প্রবণতাকে প্রকাশ করে।

যে ছেলে ঝগড়াটে বা রাগী ধাতের, শিশুকালে পিতামাতার কাছে আদর ও প্রশ্রয় পেয়ে সে ছেলে বড় হয়ে ক্লাসের দুর্বল ছেলেদের ওপর উৎপাত করবে এটা স্বাভাবিক। প্রশ্রয় (encouragement) সুপ্ত দুষ্ট প্রবৃত্তির প্রকাশের সহায়ক।

শিশুর চরিত্রের ওপর অভিভাবন (suggestibility) প্রভাব সামান্য নয়। মুখের কথায় যেটা আমরা প্রকাশ না করি, আমাদের চলন ধরন ও ব্যবহারে তার ইঙ্গিত থাকে। সে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আশ্চর্যভাবে শিশুরা বোঝে। আপনি বাপ,—ছেলেকে এড়াবার জন্যে মিথ্যাই তাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন "ওবেলা তোমাকে ঘোড়া কিনে দেব।" ছেলে আপনার ফাঁকি যে না বোঝে তা নয়, এর ফলে, ভবিষ্যতে সে আর আপনাকে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করবে না। শিক্ষার ক্ষেত্রে সোজাসুজি উপদেশের চেয়ে ইঙ্গিতের মূল্য অনেক বেশী। অভিভাবনও (suggestibility) অনেকক্ষেত্রে সুপ্ত প্রবৃত্তির পোষক। মা মুখে

উৎসাহ দিলেও, কঠিন রোগাক্রান্ত ছেলে বোঝে মার ভয় ও উদ্বেগ। এ ভয় ও উদ্বেগ তার মনেও সংক্রামিত হয়। পিতামাতা নিজেদের কুপ্রবৃত্তি সন্তানের কাছে গোপন করতে চেষ্টা করলেও, ইঙ্গিতে শিশু তা বুঝতে পারে এবং তার মধ্যে অনুরূপ প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়।

শিশু পিতামাতাকে শুধু অনুকরণ করে না—ঠিক তাদের একজন বলে নিজেকে কল্পনা করতে ভালবাসে (identification)। যেমন খোকা বাবা সেজে বলে মাকে, "ফুরায় যদি টাকা, ফুরায় খাবার,
যত চাই মা, এনে দেবো আবার।"

এ তাদাত্ম্যের (identification) ফল শিশুর পক্ষে শুভ, যদি যার সঙ্গে নিজেকে সে নিজেকে যুক্ত করে তাঁর চরিত্র বীরোচিত উন্নত ও নির্মল হয়। কিন্তু বিপরীত হলে ফল অশুভ হয়। যেমন, ছেলে যদি পকেটমার পিতাকে নিজ আদর্শ বলে মনে করে, তাকেই সব বিষয়ে অনুকরণ করে, তা হলে সম্ভবত সেও বড় হয়ে পাকা চোরই হবে।

অধিকাংশ অপরাধের প্রধান উত্তেজক কারণ (exciting cause) বিরূপ পরিবেশ। এর প্রতিকারও তাই অনুকূল পরিবেশ-স্থষ্টিতে। এ কাজটিতে পিতামাতা-শিক্ষক, সমাজ ও রাষ্ট্রের সহযোগিতা প্রয়োজন। ইংল্যাণ্ড ও অ্যামেরিকায় শিশু-অপরাধীদের বিচারের জন্য যুভেনাইল্ কোর্ট আছে। বিচারকের কাজে সাহায্য করবার জন্য সরকারী পরিদর্শক (inspectors) আছেন। এ সব ক্ষেত্রে তাঁরা অপরাধীর বাড়ী গিয়ে তার পরিবেশ -সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন এবং পিতামাতাকে উপদেশ দেন, কখনও কখনও তাঁদের সতর্ক করেন। বিচারক যদি মনে করেন শিশু-অপরাধীর পরিবেশ অতিশয় কদর্য এবং তা সংশোধনের উপায় নেই, তা হলে শিশুটিকে অন্য অভিভাবকের অধীনে রাখবার ব্যবস্থাও করতে পারেন। এ বিষয়ে সোভিয়েট রাশিয়ায় ম্যাকারেংকো বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করেছেন। রাশিয়ান সমাজবিজ্ঞানীদের মতে শিশু-অপরাধের মূল কারণ হয় দৈহিক, নয় পরিবেশ-গত। তাই প্রত্যেক অপরাধীকে সুযোগ্য চিকিৎসক পুংখানুপুংখরূপে পরীক্ষা করে দৈহিক রোগ বা বিকৃতি থাকলে তার সংশোধনের ব্যবস্থা করেন। যারা গুরুতর অপরাধে অপরাধী এবং যারা পুনঃ পুনঃ অপরাধ করে (recidivists) এবং দেশের সাধারণ বিদ্যালয়ে যাদের সংশোধন হয় না, তাদের অপরাধী শিশু-

দের জন্য স্থাপিত আদর্শ উপনিবেশে (ideal colonies) প্রেরণ করা হয়। ম্যাকারেংকো-র মতে অপরাধীর সংশোধনের প্রধান উপায় হল তার আত্ম-মর্যাদাবোধ জাগ্রত করা এবং আত্মবিশ্বাস ও সমাজ-কল্যাণ-বুদ্ধি উদ্বুদ্ধ করা। এ সব আদর্শ-বিদ্যালয় কঠিন শৃঙ্খলার সঙ্গে পরিচালিত হলেও, এগুলি জেল-খানা নয়। এখানে শারীরিক শাসন-পীড়ন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। প্রত্যেকটি ছেলেকে এখানে বিদ্যালয়ের জীবনের সঙ্গে জড়িত কোন কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়। প্রচুর এবং বিচিত্র গঠনাত্মক কাজে ছেলেদের ব্যাপৃত রাখা হয়। তাদের সৃজনীশক্তির বিকাশের নানা সুযোগ দেওয়া হয় এবং শিক্ষকেরা ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুভাবে মেশেন, তাদের যথেষ্ট উৎসাহ দেন, পরামর্শ দেন, পরিচালনা করেন। এখানে একটি বিশ্বাস, আশ্বাস, প্রীতি ও কর্মের আবহাওয়ায় শিশুদের মনের মেঘ কেটে যায়। নানা স্বাস্থ্যকর খেলাধুলা, ভ্রমণ, অনুসন্ধান, আশেপাশের গ্রামে বা শহরের খামার ও ফ্যাক্‌টরীর সঙ্গে পরিচয়, গ্রামোন্নয়নের নানা কাজে অংশগ্রহণ, এ রকম নানা ভাবে তাদের পৌরুষ, কুশলতা ও সেবাবুদ্ধি বিকশিত করে তাদের আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করা হয়। দেশের বহু নেতা ও কুশলী কর্মী এই সব উপনিবেশের প্রাক্তন সভ্য। বাস্তবিকপক্ষে, রাশিয়া দাবি করে যে, তাঁদের এই সাধারণ বুদ্ধির ওপর প্রতিষ্ঠিত স্বাস্থ্যপ্রদ পরীক্ষা-দ্বারা দেশ থেকে শিশু-অপরাধ সমস্যার তাঁরা মূলোচ্ছেদ করেছেন। সোভিয়েট রাশিয়া ফ্রএডীয় অবচেতন-তত্ত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করে এবং মানসিক জটিলতা থেকে অপরাধীর সৃষ্টি হয়, এ কথা বিশ্বাস করে না।

(গ) **প্রতিক্রিয়ামূলক অপরাধী (reaction delinqents)**—ফ্রএড্-পন্থীদের মতে এ জাতীয় অপরাধের মূল কারণ অবচেতন মনে জটিল গ্রন্থির সৃষ্টি। শিশুকালের দুঃখকর অভিজ্ঞতাপ্রসূত প্রক্ষোভ ও অনুভূতির সুস্থ সহজ প্রকাশের পথ রুদ্ধ হলে, সেই অবদমিত আকাঙ্ক্ষার বিপরীত একটি ভাব অচেতন মনে সঞ্জাত হয়। অপরাধটি সেই প্রতিক্রিয়ার ফল। এখানেও পরিবেশের বিরুদ্ধে শিশুর প্রতিক্রিয়া, কিন্তু এ পরিবেশ বাহ্য পরিবেশ নয়, এটা তার নিজ অন্তরের মধ্যেই, কাজেই এখানে নিজের বিরুদ্ধেই যেন নিজের বিদ্রোহ। সাধারণত শিশুকালে স্বাভাবিক স্নেহপ্রীতি-ভালবাসার অভাব থেকেই এ রকম জটিল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। শিশু চায় পিতামাতার অকুণ্ঠ আদর-ভালবাসা, তাঁদের আশ্রয়েই তার শ্রেষ্ঠ আনন্দ ও নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা-বোধ। কিন্তু হঠাৎ

কান কারণে (যেমন মা মরে গেলে, বা অল্পদিনের মধ্যে আর একটি ভাই বা বোন হলে) সে নিজেকে বঞ্চিত ও অসহায়-বোধ করে এবং এ থেকে তার মনে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশুর সজীব মন এই দুঃখ বেদনা ও বঞ্চনা-বোধ ঝেড়ে ফেলে সুস্থ হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু যেখানে এই আঘাত' অত্যন্ত গভীর হয় এবং অবচেতন মনে জটিল গ্রন্থির সৃষ্টি করে, সেখানে বড় হয়ে শিশু তিক্ত সমাজদ্রোহী হয়ে অপরাধের পথে নিজের মনের আক্রোশ মেটাতে চায়। এখানে অপরাধী নিজের অপরাধ-সম্পর্কে এতটুকুও অনুতপ্ত হয় না—বরং এতে এক বিকৃত আনন্দ বোধ করে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। একটি মেয়ে স্কুলে অত্যন্ত অবাধ্য ও দুর্বিনীত। সে অন্যান্য মেয়েদের জিনিস চুরি করে, শিক্ষিকার সঙ্গে মুখে-মুখে তর্ক করে। শাস্তি দিয়ে কোন ফল হয় না। বলে, "বেশ করেছি, একশোবার করব।" তাকে অভিজ্ঞ মনোবিজ্ঞানীর কাছে নিয়ে যাওয়া হল। প্রথমে সে কোন প্রশ্নেরই জবাব দিতে রাজি নয়। ক্রমে ক্রমে স্নেহশীল বিজ্ঞানীর সঙ্গে আলাপ করে সে অনেকটা সহজ হয়ে এল। অনুসন্ধানে জানা গেল যুদ্ধের সময় তার জন্ম হয়, বাপ তখন যুদ্ধ করতে বিদেশে গিয়েছেন। এ অবস্থায় মা-দিদিমা সবাই তাকে অতিরিক্ত আদর দিতেন। যখন তার বয়স তিন বছর তখন তার বাবা ফিরে এলেন। প্রথম ক'দিন বেশ আনন্দেই কাটল। কিন্তু ক্রমেই সে বুঝতে পারল তার আদর কমে গেছে—এখন বাবাই সংসারের সকলের লক্ষ্য ও প্রিয়। মা-ও বাবাকে খুশি করতেই ব্যস্ত। মার ওপর তার কঠিন অভিমান আর বাবার ওপর তীব্র রাগ হল। অথচ রাগপ্রকাশের উপায় নেই। বাবার সঙ্গে জোরে সে পারবে না। এর এক বছরের মধ্যেই তার একটি ভাই জন্মাল। তাকে আর কেউ আগের মতো আদর করে না। মনের মধ্যে রাগে সে ফুঁসতে লাগল,—"এটা বাবার আর এক নোংরা চালাকি।" তার মন ক্ষিপ্ত বিদ্রোহী হয়ে উঠল। অথচ সোজাসুজি করবার কিছু নেই। সে মনে মনে বলল, "মরুকগে সব, চাই নে ওদের ভালবাসা।" এরপর থেকে সে বাপ-মাকে এড়িয়ে চলত। তারপর একদিন বাবা-মার একত্র তোলা এক ফটোগ্রাফ সে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ধুলায় ফেলে দিল। খুব মার খেল বটে, কিন্তু এতটুকুও চোখের জল তার পড়ল না। তার এই ক্ষুব্ধ আক্রোশ স্কুলে গিয়েও দূর হল না।

এই সব অপরাধীর চিকিৎসা সবচেয়ে কঠিন। শাস্তি দিয়ে ফল বিপরীত হয়। স্নেহকেও এরা সন্দেহ ও বিদ্বেষের চোখে দেখে। তবে এদের বঞ্চিত স্নেহাকাঙ্ক্ষা-পূরণের উপযুক্ত পাত্র পেলে—যেমন ভালো বিবাহ হলে—অনেক সময় এরা সেরে যায়। ফ্রয়েড্‌পন্থীদের মতে মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতিতে এদের অবচেতন মনের রুদ্ধ আবেগের মুক্তির পথ করে দিতে পারলেই এরা বাস্তবিক শান্ত ও সুস্থ হতে পারে।

(ঘ) **রুগ্‌ণ মনের বিকারজনিত অপরাধ** (**Psycho-neurotic delinquents**)—এ সব অপরাধের ক্ষেত্রে অবদমিত ইচ্ছা ব্যক্তির অজ্ঞাতেই পুনঃ আত্মপ্রকাশ করে—অবশ্য অনেক সময়েই এটা ঘটে কোন প্রতীক (symbol) উপলক্ষ্য করে। এখানেও অনেক ক্ষেত্রেই মনের মধ্যে একটি রুদ্ধ আক্রোশের বাষ্প অবচেতন মনে জটিল গ্রন্থির সৃষ্টি করে।

যৌনাকাঙ্ক্ষার নগ্ন প্রকাশ সমাজে নিন্দনীয়। সুতরাং সভ্য মানুষ এ আকাঙ্ক্ষাকে সযত্নে সচেতন মন থেকে নির্বাসন দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু জীবনের এই আদিম শক্তি প্রচণ্ড, প্রবল—সে মরে না, অবচেতন মনে গোপনে আশ্রয় নেয়। সুযোগ পেলে এ আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নের মধ্যে অথবা সচেতন মনের অনেক ব্যবহারের মধ্যে ছদ্মবেশে তৃপ্তির পথ খোঁজে। ফ্রএড্‌-পন্থীদের মতে এ জাতীয় অবদমনের ফলে যে জটিল গ্রন্থির সৃষ্টি হয় তার তাড়নায় যে অপরাধ করা হয়, অপরাধী সে-সম্বন্ধে সচেতন নয়। বিনা প্রয়োজনে চুরি করার অভ্যাস (Kleptomania) এ জাতীয় অপরাধের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। চুরি -রূপ নিষিদ্ধ ক্রিয়া নিষিদ্ধ যৌনক্রিয়ারই প্রতীক। অনেক সময়েই দেখা যায় যারা এই জাতীয় অপরাধ করে থাকে তাদের চরিত্র এ শ্রেণীর অপরাধের সম্পূর্ণ বিপরীত। অত্যন্ত ভদ্র সুস্থ সম্ভ্রান্ত ঘরের ধর্মভীরু এক মেয়ের খাতায় দেখা গেল অশ্লীল কবিতা ও ছবিতে ভর্তি। এ জাতীয় অপরাধীরা নিজেদের অপরাধ গোপন করার জন্য যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করে না, এবং ধরা পড়লে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়। এক হিসাবে বলা যায় এরা নিজের স্বাধীন ইচ্ছার বশে অপরাধ করে না। কোন অন্ধ গোপন শক্তির দ্বারা চালিত হয়েই যেন এরা অপরাধে প্রবৃত্ত হয়।

ফ্রএড্‌পন্থীদের মতে উপযুক্ত মনঃসমীক্ষণ প্রক্রিয়ায় চিকিৎসা -দ্বারা এদের সম্পূর্ণ নিরাময় হওয়ার সম্ভাবনা সর্বাধিক। রোগী যদি নিজের অবদমিত ইচ্ছাটিকে সচেতনভাবে জানতে পারে এবং তার আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছার স্বাভাবিক তৃপ্তির যদি ব্যবস্থা করা যায়, তা হলে এরা সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

শিশুর অপরাধপ্রবণতা ও তার প্রতিকার

"আবার চুরি করেছিস? তোর জ্বালায় আমি কি গলায় দড়ি দেব? ছি, ছি, কি ঘেন্নার কথা!" মা অমলকে ধিক্কার দিয়ে কাঁদতে লাগলেন, পিসিমা ফোড়ন কাটলেন, "ওর রাক্ষসগণ—তখনি জানি ও বংশের নাম ডোবাবে। চুরি দিয়ে সবে শুরু, এর পর ডাকাতি ধরবে। তারপর জেলে, তারপর খুন-খারাবী, তারপর ফাঁসী—দেখো আমি বলে রাখলাম!" বাবা এসে 'হতভাগ্য' অমলকে জুতো দিয়ে পিটালেন, ঘাড় ধরে ঘর থেকে বের করে দিলেন। অমলের সেদিন খাওয়া বন্ধ। অমল এত মার খেয়েও কাঁদল না। ঘাড় বাঁকা করে বলল, "কখনও একটি পেন্সিল কিনতে পয়সা দিয়েছ? হেবো শূয়োর মিছিমিছি পণ্ডিত স্যারের কাছে মার খাওয়ালে, ওর পেনসিল নিয়েছি, বেশ করেছি, কত মারবে মারো না! আর বাবা যে সেদিন আফিস থেকে দুদিস্তে কাগজ ও চারটে পেনসিল আনল, সে বেলা কিছু নয়!" অমল ছুটে বের হয়ে গেল। ও পাড়ার সেরা বদ ছেলে ইস্‌মাইলের বাড়ী গিয়ে ওর সাথে এক মাটীর থালায় ভাত খেল (যাক আমার জাত যাক, বাসায় ওরা তো আর খেতে দেবে না!!), তারপর সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে নানা উৎপাত করে বেড়াল। সেদিন অমলের হাতেখড়ি হল বিড়ি খাওয়ার! সত্যি তার গোল্লায় যাওয়ার পথ তৈরী হল!

এমনি করে অনেক সময় অবাধ্য বা অপরাধপ্রবণ শিশু তৈরী হয়। আমরা হয়তো মনে করি অবাধ্য বা অপরাধপ্রবণতা জন্মগত—ওটা রক্তের দোষ! অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকের মতে এ ধারণাটা ভুল। দৈহিক বিকৃতি কখনো কখনো জন্মগত; বুদ্ধির উৎকর্ষও বংশগতির ওপর কতকটা নির্ভরশীল, কিন্তু কতকগুলো শিশু জন্ম থেকেই নীতি-বুদ্ধিহীন বদ্‌মাইস্ হয়ে জন্মে একথা মনে করবার সঙ্গত কারণ নেই।

আমাদের দেশে শিশুদের অপরাধ নিয়ে আমরা খুব বেশী চিন্তা করি না। কিন্তু অ্যামেরিকা, ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া প্রভৃতি অগ্রসর দেশে এ নিয়ে যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান হয়েছে ও হচ্ছে।

অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীর মতে শিশু অপরাধপ্রবণ হয়, তার মস্ত কারণ তার পরিবেশটি প্রতিকূল। তা তার স্বাভাবিক সুস্থ ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ। অনেক সময়ই একথা বলা চলে শিশুর স্নেহবঞ্চিত অবহেলিত হৃদয় অপরাধের মধ্য দিয়ে তৃপ্তি খোঁজে, সমাজকে আঘাত করে সে নিজের দিকে সকলের দৃষ্টি-আকর্ষণ করতে চায়। এর মধ্য দিয়ে সে তার আহত আত্মমর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। শিশুর অপরাধের বিচারে একথাটা মনে রাখা বিশেষ দরকার। আরো একটা কথা মনে রাখতে হবে। আমরা যে নৈতিক মান দিয়ে বিচার করি, সেটা শিশু বোঝে না। তাদের অপরিণত বুদ্ধির জন্য 'চুরি করা' 'মিথ্যা কথা বলা' 'মারামারি করা' ইত্যাদি ঘটনাকে তারা ঠিক বড়দের দৃষ্টিতে দেখতে পারে না।

শিশুর অবাধ্যতার কারণগুলোকে আমরা মোটামুটি ভাবে ব্যক্তিগত ও পরিবেশগত এই দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। এ কথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে ব্যক্তি ও পরিবেশ পরস্পর-বিচ্ছিন্ন তো নয়ই, বরং পরস্পর পরস্পরকে গঠিত ও প্রভাবিত করে।

শিশুর শারীরিক গঠন, তার রুচি চরিত্র বুদ্ধি ইত্যাদি নিয়েই তার ব্যক্তিত্ব। এ বিষয়ে প্রত্যেক শিশুই অন্য হতে পৃথক। শিশুর ব্যবহার বা অপরাধপ্রবণতা প্রত্যেক শিশুর ব্যক্তিত্ব ও পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত করে দেখেই বুঝতে হবে।

এবার ব্যক্তিগত কারণগুলো সম্বন্ধে কিছু বলা যাক। শিশুর দৈহিক কোন বিকার থাকলে তা অনেক সময় তার অপরাধের কারণ হতে পারে। যে ছেলের একটি পা খোঁড়া, সে তার সংসারে বাপ-মায়ের বিষম দুঃখের কারণ, স্কুলে ও বাইরে সমবয়স্ক বা বড়দের সে উপহাসের পাত্র। যারা বেশী কল্পনাপ্রবণ ও অভিমানী তারা অন্যের এই অতি-সহানুভূতি বা বিরূপতাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না আর অবাঞ্ছিত ব্যবহারের দ্বারা সমাজের ওপর প্রতিহিংসা নেয়। সুতরাং শিশু-অপরাধীর সংশোধন করতে হলে তার কোন চিকিৎসাযোগ্য ব্যাধি বা বিকার থাকলে তা দূর করতে চেষ্টা করা উচিত। আর যারা বিকলাঙ্গ তাদের সঙ্গে যতটা সম্ভব স্বাভাবিক ব্যবহার করলেই ভাল হয়।

অনেক শিশু-অপরাধী নির্বোধ বা জড়বুদ্ধি। এ জন্যই এদের অসৎপথে নেওয়া সহজ। এরা সাধারণত অন্য দুষ্ট লোকের দ্বারা চালিত হয়ে অপরাধ

করে, কখনো কখনো বাহাদুরি দেখিয়ে নিজের যোগ্যতা-প্রমাণের জন্যও এরা অন্যায় কাজ করে। এদের বিশেষ ধরনের শিক্ষা দেওয়া দরকার। যারা একেবারে খুব বোকা নয়, তাদের হাতের নানা কাজ শিখিয়ে এবং উৎসাহ দিয়ে অনেক সময়ই সংশোধন করা যায়। সুস্থ বুদ্ধিমান ছেলেদের বেলায়ও হাতের-কাজ শেখার মধ্য দিয়ে কুশলতা আয়ত্ত হয় এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ে, এতে দশজনে মিলেমিশে কাজ করবার অভ্যাসটিও গড়ে ওঠে এবং এরকম কাজ শিশুদের অপরাধ হতে দূরে রাখতে যথেষ্ট সাহায্য করে। যে সব শিশু-অপরাধীরা একেবারেই হাবা-বোকা, তাদের উপযুক্ত শিক্ষক বা পরিচালকের তত্ত্বাবধানে সুস্থ পরিবেশযুক্ত 'হোম্'-এ রাখাই সঙ্গত।

প্রত্যেক শিশুই কিছু না কিছু জিনিস সঞ্চয় করতে চায়। বড়দের কাছে শিশুর ভাঙ্গা পুতুল, ছেঁড়া রঙিন ন্যাকড়া, আধখানা কাঁচা পেয়ারা ইত্যাদি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হাস্যকর জঞ্জাল বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু শিশুর কাছে তার 'নিজস্ব' সঞ্চয়ের ভাবগত মূল্য (sentimental value) সামান্য নয়। তার এই স্বাভাবিক সঞ্চয়-স্পৃহাকে অযথা বাধা দিলে বা আহত করলে শিশু তাতে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হয় এবং অপমানিত বোধ করে। তার এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বিকাশে বাধা দিলে শিশু হয়তো চুরি করতে প্রবৃত্ত হবে, অথবা জিনিসপত্র ভেঙ্গেচুরে তার শোধ তুলবে, তাই প্রত্যেক শিশুকেই নিজ খুশীমত কিছু সঞ্চয় করবার স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। এর মধ্য দিয়ে যাতে তার সুরুচি ও দায়িত্ববোধ বিকাশ-লাভ করে সে দিকে দৃষ্টি রাখা বাপমায়ের কর্তব্য। রাশিয়াতে নিতান্ত দরিদ্র পরিবারেও বাড়ীতে শিশুদের জন্য স্বতন্ত্র একটি স্থান ছেড়ে দেওয়া হয়। সে জায়গাটুকু একেবারেই তাদের নিজস্ব। সে জায়গায় তাদের সঞ্চয়-সম্পত্তি তারা রাখে, সে জায়গাটুকু নিজেদের খেয়ালখুশীমত সাজায়, ফুলপাতা দিয়ে, কাগজ দিয়ে। এতে তাদের আত্মমর্যাদা-বোধ বিকশিত হয়, তারা বুঝতে শেখে সংসারে তাদেরও দাম আছে। আমাদের দেশেও এ-পরীক্ষাটি আমরা করতে পারি।

শিশুর পরিবেশের মধ্যে সবচেয়ে প্রথম ও সবচেয়ে প্রধান হচ্ছে তার মা, বাপ, ভাই, বোন, আত্মীয়স্বজন। মা-বাপের ভালবাসা শিশুর পক্ষে শুধু স্বাভাবিক নয়—এটা আলোবাতাস ও খাদ্যের মতো তার জীবনের সুস্থ বিকাশের পথে অপরিহার্য। যেখানে গৃহের পরিবেশ প্রীতিপূর্ণ নয়,

যেখানে পিতামাতার মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ সুস্থ নয়, যে পরিবারে ঝগড়াঝাঁটি, কলহ-বিসম্বাদে, দুর্নীতিপূর্ণ ব্যবহারে আবহাওয়া বিষাক্ত, সেখানে শিশুর অবচেতন মন অস্বস্তি-বোধ করে এবং যদিও আমরা মনে করি শিশুরা কিছুই বোঝে না, তবুও তারা খুব বেশী প্রভাবিত হয় এ কলুষ -দ্বারা। অপরাধী শিশুদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে জানা যায় তাদের অধিকাংশের পারিবারিক পরিবেশ অসন্তোষজনক। বাবা মদ্যপ, মা কলহপরায়ণা, ভাইবোনরা মিথ্যাবাদী, প্রতিবেশী উদাসীন—এমন অবস্থার মধ্যে সুস্থ স্বাভাবিক শিশু গঠিত হবে, এ আশা করাই অসম্ভব। অপরাধী শিশুর চিকিৎসা করতে হলে, গৃহপরিবেশের সংস্কার নিতান্ত প্রয়োজন। শিশুর সুশিক্ষার কথা যেমন আমরা ভাবি, অগ্রসর সভ্য দেশে পিতামাতার সুশিক্ষার কথাও তেমনি ভাবা হয়, সেখানে যে সব পিতামাতা ছেলেমেয়ের অযত্ন করে, তাদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করে, তাদের বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা আছে।

এর পরই শিশুর জীবনে প্রভাববিস্তার করে তার বিদ্যালয়, বন্ধু-বান্ধব, শিক্ষক। কুসঙ্গে মিশে অনেক ছেলেমেয়ে খারাপ হয় এটা সবাই জানে। বন্ধু ও সমবয়স্কদের কাছে বাহবা পেতে সবাই চায়। আর অনেক সময় বন্ধুদের মুখে 'ভালো' 'লক্ষ্মী-লক্ষ্মী' 'গো-বেচারা' এ সব হচ্ছে উপহাসের ভাষা। ঘুমন্ত পণ্ডিত মশাইয়ের টিকিটা কেটে আনতে পারলে বন্ধুদের কাছে খুব সাবাস বাহবা পাওয়া যায়। তার আকর্ষণ শিশুর কাছে সামান্য নয়। আর এসব অন্যায় কাজে যে বিপদ আছে তা শিশুচিত্তকে অনেক সময়ই উত্তেজিত করে, সে জন্যেই না ভেবেচিন্তেই ছোট ছেলেমেয়েরা অন্যায় করে থাকে। এটা বিশেষ করে যে সব ছেলেরা করে, তারা লেখাপড়ায় পিছিয়ে-পড়া, যারা শিক্ষকের কাছে প্রশংসা পায় না, যাদের কাছে স্কুলটা লাগে জেলখানার মতো। এসব ছেলেদের সম্পর্কে শিক্ষকের দায়িত্ব সমধিক। এদের সংশোধন করতে হলে দেখতে হবে কেন ইস্কুল এদের ভাল লাগে না। এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে এমন ছেলের বুদ্ধিসাধ্যের তুলনায় তার পড়াশোনার চাপ অনেক বেশী শক্ত, তাই হেরে গিয়ে তার আত্মসম্মান বারে বারে ক্ষুণ্ণ হয়। তাই সে এমন ক্ষেত্র খোঁজে যেখানে সে কিছু বাহবা পেতে পারে। এ কথাটা বিশেষ করেই শিক্ষকদের স্মরণ রাখা দরকার, যে শিক্ষকের স্নেহ-সহানুভূতি-উৎসাহের দাম শিশুর কাছে অসামান্য। এবং শিশু শিক্ষকের

কাছে একটি বৃহৎ জীবনের জীবন্ত আদর্শ খোঁজে। শিক্ষক আদর্শ-চরিত্র হলে শিশুকে নিজ বিশুদ্ধ জীবন দিয়ে তিনি উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু বিপরীত হলে শিশু অল্প বয়স থেকেই আদর্শে অবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। প্রত্যেক শিশুর রুচি ও শক্তি বিভিন্ন। তদনুযায়ী তাকে কাজ দিলে তার সুষ্ঠু আত্মবিকাশ ঘটে। তার রুচি ও শক্তি কোন্ দিকে সেটা আবিষ্কার করবার দায়িত্ব শিক্ষকের। নিজ রুচি -অনুযায়ী, শক্তি -অনুযায়ী কাজের সুযোগ পেলে উপযুক্ত প্রশংসা ও উৎসাহ পেলে শিশু অসামাজিক অন্যায় পথ গ্রহণ করে না। রাশিয়ার অ্যান্টন্ ম্যাকারেংকো-র নাম শিশুশিক্ষার জগতে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। অবাধ্য অপরাধপ্রবণ শিশুদের সংশোধনের ক্ষেত্রে তিনি যে সফলতা অর্জন করেছেন তা কাহিনীর মতো শোনায়। অপরাধপ্রবণ শিশুদের —যারা রাশিয়ার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সব চেয়ে 'পাজী' 'বজ্জাত'—সেসব ছাত্রদের সংশোধনের জন্যে তাঁর ঝারঝিনস্কি বিদ্যালয়ে পাঠানো হতো। তিনি প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সফলই হয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন এমন কোন ছেলেমেয়েই নেই যে সংশোধনের যোগ্য নয়। প্রথম কাজ হচ্ছে ছাত্রের আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাস পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা, তাকে সত্যি বিশ্বাস করা, তাকে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া। সঙ্গে সঙ্গেই দরকার তার শক্তি, প্রয়োজন, মনের গতি ও রুচি আবিষ্কার করা। সে অনুযায়ী কাজ দিয়ে দশের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দিতে হবে। তার রুদ্ধ আত্মাভিমানের খোলসটি ভেঙ্গে বহুর জীবনের সহজ স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে তাকে মুক্তি দিতে হবে। একটি ছেলের উদাহরণ দেওয়া যাক—ভীষণ বদছেলে, কোন স্কুলে টিকতে পারে নি, মারধোর করে, শিক্ষকের সঙ্গে বেয়াদবী করে; নিতান্ত অবাধ্য, বদ্-মেজাজী, স্কুলের টুল-বেঞ্চি কেটে তছ্‌নছ্‌ করে। নিরুপায় হয়ে এ ছেলেকে দেওয়া হয় ঝারঝিনস্কি বিদ্যালয়ে। প্রথম প্রথম সে অন্য ছেলেদের সঙ্গে মেশে না, শিক্ষকদের কথার উত্তর দেয় না। ভাবখানা এই, "আমি তোমাদের গ্রাহ্য করি না।" শিক্ষকরা কিন্তু ওর আগের স্কুলগুলিতে ওর দুষ্কৃতির কথা একটুও আলোচনা করলেন না। কোন প্রশ্ন করলেন না, গালমন্দ করলেন না। ছেলেরাও নিজেদের পড়া, হাতের কাজে, খেলাধুলা সব কিছুর মধ্যেই ওকে ডাকত, কিন্তু কোন জোরজবরদস্তি করত না। সেই ছেলেটি দেখল খাওয়ার ঘণ্টার সময় সকলের সাথে খেতে না গেলে খাওয়া মেলে না। খেলায় না গেলে নিজেকেই ঠকতে হয়। আর তা ছাড়া ছেলেরা কত

নানারকম হাতের কাজ করে। ক্রমেই ওর মন বিরক্তি ও ভয় কেটে স্বাভাবিক হতে আরম্ভ করল। শিক্ষক ওর লেখাপড়া কাজের দিকে দৃষ্টি রাখলেন। একদিন শিক্ষক লক্ষ্য করলেন, ছেলেটির একটি অ্যাকর্ডিয়ন (বাদ্যযন্ত্র) আছে, সেটি তার খুব প্রিয়। তিনি ছেলেটির সাথে বন্ধুভাবে আলাপ করলেন, তাদের স্কুলে একটি ভালো কনসার্ট পার্টি গড়ে তুললে কেমন হয়। ছেলেটি উৎসাহের সঙ্গে সাড়া দিল। তখন শিক্ষক এই ভার ওই ছেলেটির ওপরই দিলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই ছেলেটি স্কুলের আরও কয়েকটি ছেলেকে জুটিয়ে নানা বাদ্যযন্ত্র-সম্বলিত একটি বাজনা ও গানের ক্লাব গড়ে তুলল। তার পূর্বের অবাধ্যতা ইত্যাদি দূর হল। এ ছেলে ভবিষ্যতে একজন প্রসিদ্ধ নেতা হয়েছিল। এরকম উদাহরণ আরো অনেক আছে। রাশিয়া দেশে যদি এটা সম্ভব হয়ে থাকে, আমাদের দেশেও এটা হয় না কি ?

এর পরের কথা হচ্ছে সামাজিক পরিবেশ। ছেলেমেয়েদের মন যেমন গড়ে ওঠে পরিবার পরিজন শিক্ষক বন্ধুবান্ধবের প্রভাবে, তেমনি যে সমাজের মধ্যে শিশু জন্মগ্রহণ করে, বড় হয়, তার আচার-ব্যবহার ধর্ম দৃষ্টিভঙ্গী ও আর্থিক ব্যবস্থাও শিশুর মনকে প্রভাবান্বিত করে। দুর্নীতিপরায়ণ, অসংযত অজ্ঞ কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে শিশুর ব্যবহারও অনুরূপ হবে। অবমাননাপূর্ণ দারিদ্র্য অশিক্ষা ও অস্বাস্থ্য বহুক্ষেত্রেই শিশুর অপরাধের জন্য দায়ী, এ কথাটা বুঝতে কষ্ট হয় না। "দারিদ্র্যদোষো গুণ রাশি-নাশী"—এটা একটি প্রাচীন ও বহু-পরীক্ষিত সত্য। উদ্বাস্তু হয়ে যারা এসেছে—তাদের পরিবারের অনেক ছেলেমেয়ে নষ্ট হয়ে যায়, তার কারণ কি এই নয় যে, জীবিকা এদের অনিশ্চিত, প্রতিকূল ঘাতপ্রতিঘাতে এদের নীতিবোধ বিপর্যস্ত, প্রাচীন যে সমাজে তারা মানুষ সে সমাজের সুস্থ শাসনসংযম ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে। এদের সন্তানদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা দেখা দেয় এটা আশ্চর্যের কথা নয়, এটাই বরং আশ্চর্যের কথা আরো অধিক সংখ্যায় এরা অপরাধপ্রবণ হয় নি কেন। তার কারণ এদের অধিকাংশের দুঃসহ দুরবস্থা সত্ত্বেও ভদ্র মন এখনও মরে যায় নি, যাঁরা এখন প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও সুরুচি ও সততার আদর্শকে বাঁচিয়ে রেখেছেন তাঁরা প্রণম্য। আর প্রশংসা প্রাপ্য দেশের সরকারী বেসরকারী বহু কর্মচারী ও প্রতিষ্ঠানের যাঁরা অসাম্য দূর করে, দেশের লোকের ভদ্র জীবিকার উপায় করে, শিক্ষার বিস্তার

করে, অস্বাস্থ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, নতুন সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ- ও দেশ-গঠনের চেষ্টা করছেন। সুস্থ উৎসাহপূর্ণ সামাজিক পরিবেশ-সৃষ্টি শিশু-অপরাধ সংশোধনের একটি শ্রেষ্ঠ উপায়। এ কাজে আমাদের সকলেরই দায়িত্ব আছে।

ষোড়শ অধ্যায়

জীবনের বিভিন্ন স্তরে মনের স্বাস্থ্যনীতি

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়েছিল মানসিক রোগ ও বিকারের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার প্রয়োজন থেকে। দেহ-স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। প্রথমে রোগের নানা চিকিৎসার পদ্ধতি মানুষ অভিজ্ঞতা ও ঠেকে-শেখার (on the basis of experience & trial and error) ভিত্তিতে মানুষ আবিষ্কার করে। কিন্তু দেহের স্বাস্থ্যনীতি বৈজ্ঞানিক আলোচনা -দ্বারা মানুষ অনেক পরে স্থাপন করে।

কিন্তু কি দেহের রোগ, কি মনের রোগ দুয়ের পক্ষেই একথা সত্য যে রোগ-নিরাময়ের চেয়ে, রোগ-নিবারণ অনেক বেশী প্রয়োজন। রোগ হলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা তো করতেই হবে, কিন্তু তার চেয়ে অনেক সুবুদ্ধির কাজ রোগ যাতে না হয় তার জন্যে যত্নবান হওয়া। রোগ হলে তার চিকিৎসা সময়-সাপেক্ষ, ব্যয়-সাপেক্ষ। কিন্তু রোগ যাতে না হয় সে বিষয়ে সাবধান হলে বহু অপব্যয় ও দুশ্চিন্তা-দুর্ভোগ বাঁচে।

মানসিক রোগ -সম্বন্ধে একথা আরো অনেক বেশী সত্য। তার কারণ, মানসিক রোগের চিকিৎসা সময়-সাপেক্ষ, এবং দেহের রোগের তুলনায় তার চিকিৎসা অনেক বেশী সময়-সাপেক্ষ, ব্যয়সাধ্য এবং চিকিৎসার ফল অনেকটা অনিশ্চিত। তাছাড়া মানসিক রোগ এক হিসাবে সংক্রামক। মানসিক রোগে পীড়িত ব্যক্তি একা নিজেই কষ্ট পায় না—তার পরিবারে আরো অনেকেই তার জন্যে অতিরিক্ত উদ্বিগ্ন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন। এবং রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়ে পরিবারের অন্যদেরও মানসিক দিক থেকে পীড়িত করে তোলে। মানসিক রোগ -সম্পর্কে আমাদের ধারণা অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত হওয়ার ফলে সেই রোগ পরিবারের কোন ব্যক্তির হলে, অন্যান্যরাও অনেক বেশী বিব্রত হয় এবং অশান্তি ভোগ করে।[১]

---

১ ...the effects of personality disorders or instability are not confined to the unstable or maladjusted individuals themselves. Every unstable person affects the stability and efficiency of many others. The morale and social effectiveness of his immediate family are almost invariably severely diminished. Fisher--An Introduction to Abnormal Psychology, p. 495

তাই আজ মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে রোগ নিরাময়ের চেয়ে গঠনাত্মক কি কি উপায় অবলম্বন করলে মনের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে, তার বিকৃতি-নিবারণ করা যায় সে কথার আলোচনার ওপরই বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। মনঃস্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের এই দিকটাকেই বলা হয় গঠনাত্মক মনঃস্বাস্থ্যনীতি (Positive mental hygiene)।

আগুন লাগলে ফায়ার ব্রিগেড এসে আগুন তো নেবাতে চেষ্টা করবেই, কিন্তু সব গৃহস্থই যদি আগুন সম্বন্ধে অসাবধান হত তাহলে দেশের সব ফায়ার ব্রিগেড মিলেও একটি বড় শহরকে বাঁচিয়ে রাখতে পারত না। মানুষের সাধারণ বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতাই তাকে আগুন সাবধানে আগলে রাখবার উপায় শিখিয়ে তাকে সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচায়। তেমনি প্রত্যেক সমাজেই সাধারণ বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা মানুষকে দৈহিক রোগ ও মানসিক বিকৃতি থেকে অনেকখানি রক্ষা করে।

কিন্তু সাধারণ বুদ্ধি সদুদ্দেশ্য এবং ভূয়োদর্শনই (wide experience) মানুষকে দেহ ও মনের সমস্ত বিপর্যয় থেকে রক্ষা করবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাপদ্ধতি এবং স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠার পূর্বেও মানসিক রোগের নিবারণের জন্যে প্রত্যেক সমাজেই কিছু কিছু স্বাস্থ্যবিধি প্রচলিত ছিল। বুড়ো ঠাকুরমাদের অভিজ্ঞতা, সদিচ্ছা, সাধারণ বুদ্ধির ওপর সমাজের মানুষের আস্থা ছিল, তাদের উপদেশ -অনুযায়ী তারা চলত, অনেক সময় সুফলও পেত। সেই বুড়ো ঠাকুরমাদের উপদেশের মধ্যে অনেক কিছু ছিল যা যথেষ্ট মূল্যবান এবং যা মানবপ্রকৃতি -সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। কিন্তু একথাও সত্য যে, দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান -সম্বন্ধে প্রাচীন মানুষদের অনেক ধারণার ভিত্তি অপরীক্ষিত অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার। কোন কোন ক্ষেত্রে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছে যে তাঁদের উপদেশ শুধু ভ্রান্ত নয় বিপজ্জনকও বটে। প্রাচীনেরা বিশ্বাস করতেন, জোঁক লাগিয়ে রক্তমোক্ষণ, উচ্চ রক্তচাপ, দুর্ভাবনা ইত্যাদি দৈহিক ও মানসিক রোগের 'মোক্ষম ঔষধ'। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসাবিদ্ ও মনোবিদেরা এটা নিতান্তই ভ্রান্ত বলে মনে করেন, এবং তাঁরা বলেন, এতে বিপদেরও আশঙ্কা আছে। কাজেই বর্তমানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নির্ভুল জ্ঞানের ভিত্তিতে মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়েছে। আজ অবধি মানসিক রোগের প্রকৃতি, তাদের শ্রেণীবিভাগ, তাদের দৈহিক মনস্তাত্ত্বিক

বংশগত ও পরিবেশগত কারণ, কি করে মানসিক সুস্থ ও শান্ত থাকা যায়, কি করে মানসিক বিকার ও রোগের চিকিৎসা করা যায় এ নিয়ে বহু মূল্যবান জ্ঞান আহৃত হয়েছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত এ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নিতান্তই অযথেষ্ট। বিশেষ করে মানসিক রোগের চিকিৎসাক্ষেত্রে এটা খুব মনে রাখা দরকার যে প্রত্যেক ব্যক্তির রোগই পৃথক—এক সাধারণ ফর্মুলা দিয়ে কোন একজাতীয় মানসিক রোগের চিকিৎসা সম্ভব নয়। প্রত্যেক রোগীর ক্ষেত্রেই তার রোগের কারণটি নির্ধারণ করতে হলে কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিটির দৈহিক স্নায়বিক অবস্থা জানলেই চলে না—তার মানসিক গঠন, পারিবারিক অবস্থা, তার সমাজ-পরিবেশ, তার শিক্ষা, ধর্মবিশ্বাস, নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী, জীবনদর্শন ইত্যাদি হাজারো খুঁটিনাটি বিশেষ ধৈর্যের সঙ্গে বিশেষ যত্নের সঙ্গে অনুসন্ধান করে তবেই জানতে হয়। এ কাজটি সাধারণ মানুষের নয়, বিশেষজ্ঞের। এবং এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে, দেহের রোগের চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞের যে মর্যাদা ও বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতি আছে, মানসিক রোগের বিশেষজ্ঞের তা নেই। মানসিক রোগের চিকিৎসা -বিষয়ে বহু বিপরীত মত আছে, অনেক কিছু আছে যা সংশয়াচ্ছন্ন। আজও এই বিজ্ঞান দৈহিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের মতো নিশ্চিত দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়।[২]

তথাপি সাধারণ মানুষের পক্ষেও এই বিজ্ঞানের মূল তথ্য ও তত্ত্বগুলি জানবার প্রয়োজন আছে। মানসিক রোগের সাধারণ লক্ষণগুলি জানলে সে রোগ হবার পূর্বে সাবধান হতে পারে, আত্মীয়-বন্ধুজনকে সাবধান করে দিতে পারে। কি অবাঞ্ছিত অবস্থাগুলি মনের ওপর বিরূপ প্রভাব ও চাপ সৃষ্টি করে মানসিক রোগকে ত্বরান্বিত করে, তা পিতামাতা শিক্ষক সমাজসেবী সরকার সবারই জানা দরকার এবং সেগুলি দূরীকরণে সচেষ্ট হওয়া দরকার। সাধারণ মানসিক রোগের চিকিৎসার মূল সূত্রগুলি জানা থাকলে অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষও নিজ পরিবারে প্রাথমিক চিকিৎসার কাজে সূত্রপাত করতে পারে। রোগের চিকিৎসার ভার অবশ্যই বিশেষজ্ঞ মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসকই নেবেন কিন্তু মনঃস্বাস্থ্যবিজ্ঞানের মূল তত্ত্বগুলি জানা থাকলে আমাদের এই চিকিৎসা -সম্পর্কে ভয় ও বিহ্বলতার ভাব দূর হয়ে যাবে।

২ Eyesenck—Sense & Nonsense in Psychology, p. 203

আমরা তখন আর এই রোগ এবং তার চিকিৎসাকে "রহস্যময়" বলে মনে করব না।[৩]

চিকিৎসা অপেক্ষা বাল্যেই নিবারণ বেশী প্রয়োজন

সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তি সুস্থ সবল সুসঙ্গত হয়ে গড়ে উঠুক এটা সকলেরই কাম্য। যে ব্যক্তি দেহেমনে সুস্থ ও সুসঙ্গত, সে ব্যক্তিই তো সর্বাপেক্ষা কর্মক্ষম—এমন ব্যক্তিই তো সমাজে শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সেই ব্যক্তিই সমাজের সর্বোৎকৃষ্ট সেবা করতে সক্ষম এবং ব্যক্তি হিসাবে নিজেরও সম্পূর্ণ ও সুন্দর আত্মবিকাশে সমর্থ। তাই যেমন স্বাস্থ্যবিধি জানা ও মানায় সকলেরই স্বার্থ আছে, মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধেও একই কথা।

যদি একটি দামী গাছকে ইচ্ছানুরূপ সুস্থ সুন্দর করে বড় করে তুলতে চাই, অথবা দামী ঘোড়া বা কুকুর তৈরি করতে চাই, তা হলে একেবারে শৈশব থেকেই তাদের উপযুক্ত যত্ন করতে হবে, তাদের জন্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। শৈশবকালের গাছের ডাল থাকে নরম, তখনই তাদের ইচ্ছামত বাঁকানো যায়, হেলানো যায়। তখনই সবচেয়ে সহজে অনাবশ্যক রুগ্ণ ডালগুলি ছেঁটে ফেলা যায়। গাছ বড় হয়ে শক্ত হয়ে গেলে, তখন আর তাকে ইচ্ছামত নোয়ানো যায় না, বাঁকা হয়ে গড়ে উঠলে তখন আর তাকে সোজা করা যায় না। মানুষের বেলায়ও একথা সত্য। বাল্য ও শৈশব মানসিক স্বাস্থ্যবিধিসম্মত উপায়ে গড়ে তুললে ভবিষ্যতে সেই শিশুরা সুস্থ সমর্থ সুসঙ্গত সুসম্পূর্ণ চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে সমাজের শক্তি ও গৌরব বৃদ্ধি করবে। বাতুলতা, মৃগী, বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি গুরুতর মানসিক রোগ বর্তমানে দুরারোগ্য। কিন্তু এ সমস্ত মানসিক রোগ-সম্পর্কেই বলা যায় যে তাদের মূল বাল্য বা শৈশবের কোন বিপর্যয়কারী অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা এবং অসঙ্গতির জন্যে সেইসব অভিজ্ঞতার অবদমনে। এসমস্ত রোগের কারণ প্রতিরোধযোগ্য, এবং প্রথম আটদশ বছরের মধ্যে শিশুর পিতামাতা-শিক্ষক যত্নবান হলে অপেক্ষাকৃত অল্প চেষ্টায় এসব মানসিক রোগ বা বিকৃতির প্রতিকার সম্ভবপর। কিন্তু বাল্যে ও শৈশবে প্রতিকার না হলে উত্তরকালে এসব রোগ দুশ্চিকিৎস্য হয়ে দাঁড়ায়। অপরাধপ্রবণতা যৌনবিকার বেশ্যাবৃত্তি

[৩] Shaffer & Thoben—The Psychology of Adjustment, pp. 550-51

অভ্যস্ত হয়ে গেলে সমগ্র ব্যক্তিত্বেরই বিপর্যয় ঘটায়। তখন আর আরোগ্যের আশা থাকে না। সেইজন্য মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের একটা প্রধান অংশই শৈশবে মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা -বিষয়ে।[৪]

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু

সুসঙ্গত ব্যক্তিত্ব এবং সমাজের সঙ্গে সুসমঞ্জস সম্বন্ধে যুক্ত ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও গঠন এবং বিকৃতি-নিবারণের মূল সূত্রগুলির বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা এবং তাদের প্রয়োগের উপায় সম্বন্ধে যুক্তিসঙ্গত বিচারই মনঃস্বাস্থ্যবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। এই বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি দুর্বোধ্য বা রহস্যময় নয়। এই সূত্রগুলি কেবলমাত্র সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে আবিষ্কার করা যায় না। বিজ্ঞানসম্মত মনোবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, সমাজবিদ্যা, নীতিবিদ্যা, দর্শন ও ধর্ম ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা এবং চিন্তা থেকে এদের আহরণ করতে হয়। এই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ও প্রয়োগক্ষেত্র হচ্ছে: (১) জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং সুস্থ ব্যক্তিত্ববিকাশের বিধিসমূহের উপযুক্ত জ্ঞান দ্বারা মানসিক সর্বপ্রকার বিকৃতি-নিবারণ। (২) ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর মানসিক সুস্থ অবস্থার সংরক্ষণ, এবং (৩) মানসিক রোগ ও বিকৃতি প্রতিকার বা চিকিৎসার উপায় নির্ধারণ।[৫]

৪ If one wished to grow a tree in a particular manner, he would give special attention to it while the tree was young. For as a tree grows larger, it becoms increasingly difficult to alter its form and character. The undesirable branches would be pruned early and the nourishment which they had been receiving would thereby be addeed to that of the desirable parts...Many of the insanities, epilepsy, psychopathic personality and often the more severe cases of psychoneurosis are essentially incurable at the present time. Criminality, indolence, sexual perversions, and prostitution are difficult to correct, once they have become firmly established. But most of these conditions could be *prevented* through proper management of the individual's development during the first eight or ten years of life ...Hence mental hygiene finds and will continue to find its most effective application to the problems and development of the child. Fisher—An Introduction to Abnormal Psychology, pp. 495-96

৫ Mental Hygiene deals with these patterns of living which promote the development of wholesome and socially adequate personalities. It is an organised attempt to effect human adjustment through the application of the principles and practices of many allied sciences like biology, physiology, psychology, medicine and sociology etc...It has three major purposes

কাজেই তিনদিক থেকে এ বিজ্ঞান আলোচনা করা যায়: (ক) অনুকূল অবস্থা সৃষ্টির সাহায্যে সুসঙ্গতি স্থাপন করা এবং বিকৃতি-নিবারণ (the preventive approach), (খ) স্বাস্থ্যবিধিপালন -দ্বারা ব্যক্তির সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থা সংরক্ষণ (the preservative approach), (গ) মানসিক রোগ বা বিকৃতির সংশোধন বা চিকিৎসা (the curative approach)। যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রথম দিকটাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হলেও বাস্তবিকপক্ষে তৃতীয় দিকটি অর্থাৎ চিকিৎসার দিকটিই সর্বাপেক্ষা বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।[৬]

কিন্তু মানসিক বিজ্ঞান -বিষয়ে শিক্ষিত মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভূত পরিবর্তন সত্ত্বেও এখনও এ বিজ্ঞান -সম্বন্ধে প্রচুর কুসংস্কার ও অন্ধ বিরূপতা রয়ে গেছে। অ্যামেরিকার পাব্লিক হেলথ সার্ভিসের সার্জন-জেনারেল ডাঃ টমাস পার্‌রান্ এ নিয়ে দুঃখ করে লিখেছেন যে সিফিলিস্ রোগ সম্বন্ধে খোলাখুলি বৈজ্ঞানিক আলোচনার অভাব এবং এবিষয়ে গবেষণার জন্য অর্থাভাব অ্যামেরিকায় এই বিষম রোগের প্রসার এক ভয়াবহ সামাজিক বিপদের রূপ নিয়েছিল। মানসিক রোগ -সম্বন্ধেও বহু মানুষের রয়েছে অনুরূপ বিরূপতা। অনেকেরই এমন **ভুল ধারণা রয়েছে** যে সিফিলিসের সঙ্গে বেশ্যালয়েরই সম্বন্ধ আছে এবং **যারা মানসিক রোগে ভোগে, তারা সবাই অসংযত জীবনযাপনের জন্যই নিজেরা এই সর্বনাশ নিজেদের ওপর ডেকে আনে।** এমন ভুল ধারণা এই অতিপ্রয়োজনীয় সামাজিক সমস্যার বৈজ্ঞানিক ও নিরপেক্ষ আলোচনার পক্ষে মস্ত বাধা।[৭]

যদিও বাল্যের মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ

(1) The prevention of mental disorders through an understanding of the relationship that exists between wholesome personality development and life experiences; (2) The preservation of the mental health of the individual and of the group; and (3) The discovery and utilisation of therapeutic measures to cure mental illness. Crow & Crow—Mental Hygiene, p. 8

৬ Mental Hygiene is based on the principle that the best way to insure well-adjusted individuals is to surround them with environmental influences which will enable each person to develop his full potentialities to attain emotional stability, and to achieve personal and social adequacy. Kaplan & Baron—Mental Hygiene & Life, p. 6

৭ Dr. T. Parran—in an excellent article in a recent issue of the Survey Graphic.

তথাপিও জীবনের অন্যান্য স্তরেও সঙ্গতি ও অসঙ্গতির নানা সমস্যা দেখা দেয়। জীবনের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন সমস্যাগুলির পৃথক পৃথক আলোচনার প্রয়োজন আছে।

মাতৃগর্ভে শিশু ও মাতা -সম্বন্ধে মানসিক স্বাস্থ্যবিধি

আমাদের দেশে এই ধারণা বদ্ধমূল যে গর্ভিণীর শান্ত শুচি মানসিক প্রশান্তি সন্তানের সুস্থ দৈহিক মানসিক বিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক। সেজন্য ভারতীয় প্রাচীনপন্থী পরিবারে গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোককে বহু বিধিনিষেধ সংযম অভ্যাস করতে হয়। এর মধ্যে বহু নিয়ম বাস্তবিকপক্ষেই কল্যাণপ্রদ। ভবিষ্যতে যিনি মা হতে যাচ্ছেন তাঁকে সন্তানের মঙ্গলের জন্যে সাধনা করতে হবে। গর্ভিণীর পক্ষে ভয়, উদ্বেগ, অযথা উত্তেজনা, উপেক্ষা, অনাদর, তার নিজের পক্ষে এবং সন্তানের পক্ষে হানিকর। আমাদের দেশে (এবং অন্যত্রও) পুত্রসন্তানই পরিবারের সকলে কামনা করে এবং কন্যাসন্তানের জন্ম দুঃখজনক। কন্যাসন্তানের প্রতি মার বিরূপতা নবজাত সন্তানকে স্পর্শ করে। অনেক ক্ষেত্রে আর্থিক কারণে নতুন একটি সন্তানের আশঙ্কা পিতামাতাকে উদ্বিগ্ন ও বিষণ্ণ করে। এর ফল সন্তানের পক্ষে অশুভ বলেই আমাদের দেশে প্রাচীনদের ধারণা বিদেশী শারীরবিজ্ঞানী ও মনোবিদ্‌দের মধ্যে সোনটাগ (Sontag) গর্ভিণীর মানসিক স্বাস্থ্য ও ভ্রূণের ওপর তার প্রভাব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন এবং ভারতীয় প্রাচীনদের অনুরূপ মতই প্রকাশ করেছেন।

বাল্য-শৈশবের মানসিক স্বাস্থ্যবিধি

জন্ম থেকে এক বছর বয়স পর্যন্ত বাল্যকাল। এ কালটিতে শিশুর দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন সুখাদ্য (মাতৃস্তন্যই সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য)। উত্তাপ, আরাম, দরদী নিবিড় মানুষের স্পর্শ, অপরিমিত ভালবাসা ও আদর। মায়ের কোলের নিশ্চিন্ত নিরাপত্তাবোধ শিশুর পক্ষে সুখাদ্যের চেয়ে একটুও কম প্রয়োজন নয়। মাতৃপরিত্যক্ত অথবা মাতৃপিতৃহীন যে শিশুরা সুপরিচালিত অনাথ-আশ্রমে পালিত হয়, শারীরিক দিক থেকে তারা যথেষ্ট যত্ন পেলেও মায়ের বা আপন জনের আদর ও স্নেহের অভাবে তাদের অনুভূতির জীবন অপরিতৃপ্ত থেকে যায় এবং তাদের মনে নিরাপত্তাবোধের অভাবে তারা মানসিক দিক থেকে সুস্থ হয়ে গড়ে ওঠে না। তাদের দৈহিক বিকাশও

যথোপযুক্ত হয় না—তারা স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠে না এবং তাদের মধ্যে উৎসাহ-আনন্দের অভাব এবং অন্যান্য ব্যবহারের অসুস্থতা (behaviour abnormalities) প্রকাশ পায়। পরিবারের পরিবেশ কলহপূর্ণ, অশুচি, রুচিহীন ও উৎসাহহীন হলে তার প্রভাব শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর হয়। পিতামাতা (বিশেষ করে মাতা) স্নেহ ও সুবিবেচনা দিয়ে শিশুর নিয়মিত মলমূত্রত্যাগ, এক বছর পূর্ণ হলে মাতৃস্তন্যপান থেকে নিরস্তকরণ, যথাসময়ে খাদ্যগ্রহণ, আঙ্গুল না চোষা ইত্যাদি সুঅভ্যাস-গঠন ও কদভ্যাস-নিবারণ ইত্যাদি করবেন। শিশুর জীবনে এগুলি বাস্তব সমস্যা এবং অসহায় অবস্থায় পিতামাতার সস্নেহ সাহায্য ব্যতীত এ সমস্যাগুলির সুসমাধান কেবলমাত্র নিজের চেষ্টার দ্বারা সম্ভব হয় না। অথচ এ সব সুঅভ্যাসের ওপরে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য নির্ভর করে।[৮]

শৈশব—বিদ্যালয়-পূর্ব অবস্থায় মানসিক স্বাস্থ্যবিধি

দুই থেকে ছয় বছর পর্যন্ত শৈশবের এই স্তরে শিশুর দেহ ইন্দ্রিয় পেশী বুদ্ধি ভাষাজ্ঞান ইত্যাদি নিয়ে অন্যত্র আলোচনা করেছি।[৯] তার অনুভূতির বিকাশ -সম্বন্ধেও আলোচনা হয়েছে। আমরা দেখেছি এটা দ্রুত বৃদ্ধির বয়স এবং এ বৃদ্ধির গতি একটানা নয়। তার অনুভূতির বিকাশের মধ্যেও কখনো কখনো বৈপরীত্য ও সংঘর্ষ আছে। অন্য শিশুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার আকাঙ্ক্ষা যেমন প্রকাশ পায়, তেমনি হিংসা ঈর্ষা কলহের প্রবৃত্তিও দেখা দেয়। এ বয়সে শিশু যেমন প্রচুর স্নেহ-ভালবাসা চায়, তেমনি চায় কিছুটা স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য। তাই মাঝে মাঝে দেখা যায় জেদ অবাধ্যতা ও বদমেজাজও। এই বয়স থেকে শিশুর কৌতূহল জাগ্রত হয় এবং সে কেবলই প্রশ্ন করে, কেবলি জানতে চায়। এই বয়স থেকে বাহ্য জগৎ ও সমাজপরিবেশের সঙ্গে শিশুর পরিচয় শুরু হয়—সুতরাং সুসঙ্গতির (good adjustment) সমস্যাও দেখা দেয়। যাতে এই সুসঙ্গতির কাজটি সহজ হয়, যাতে এই বয়সে শিশু মানসিক দিক থেকে সুস্থ ও সজীব থাকতে পারে সে জন্য শিশুর পিতামাতা-পরিজনের কয়েকটি বিষয়ে যত্নবান হওয়া প্রয়োজন।

(১) এই বয়সেও শিশুর প্রয়োজন প্রচুর ভালবাসা, সম্পূর্ণ নিরাপত্তাবোধ

---

৮ Thorpe—Child Psychology & Development, p. 23

৯ গুহ ও দত্ত—শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েকপাতা-য় "জীবন পরিক্রমা" অধ্যায়

—এই নিশ্চিন্ত বোধ যে, পরিবারে তার একটি নিশ্চিত স্থান ও মর্যাদা আছে। সে একথা জানতে চায় যে সে অবাঞ্ছিত নয়, অনাদৃত নয়। এ বোধের যেখানে অভাব, সেখানেই শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই এ বয়সের শিশুদের বেশী ধমকধামক করলে কখনো কখনো শয্যামূত্র তোতলামী ইত্যাদি অসঙ্গতির (mal-adjustment) লক্ষণ দেখা যায়। আর একটি ছোট ভাইবোন সংসারে এলে শিশু যদি বোধ করে যে তার আদর কমে গেছে, পিতামাতা -দ্বারা সে পরিত্যক্ত (sense of rejectance), তা হ'লে তার মেজাজ-মর্জি, শয্যামূত্র (bed-wetting), আঙ্গুল চোষা ইত্যাদি বদভ্যাস দেখা দিতে পারে। এদিকে দৃষ্টি রাখলে শিশু মনের দিক থেকে সুস্থ হয়ে গড়ে ওঠে।

(২) শিশু এই বয়সে কিছুটা স্বাধীনতার স্বাদ চায়—নিজের বাহাদুরী দেখাতে চায়, নিজ শক্তি -সম্বন্ধে কিছুটা সচেতন হয়। এ বিষয়ে তাকে কিছুটা স্বাধীনতা না দিলে তার সুস্থ ব্যক্তিত্ববোধ গড়ে উঠতে পারে না। শুধু দেখতে হবে, সে যেন বাস্তবিক বিপদে না পড়ে। নিজ কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্যে এবং নিজ শক্তি পরীক্ষার জন্যে সে হয়তো কিছু জিনিস ভাঙাচোরা করবে, কিছু নষ্ট করবে বা অপচয় করবে, তথাপি শিশুকে তার দুঃসাহসিকতার মনোবৃত্তি-চর্চার সুযোগ দিতে হবে। এটা শিশুর পক্ষে সুস্থ স্বাভাবিক ও সুসঙ্গত থাকবার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন।

যে শিশু স্বাভাবিক ও সুস্থ সে কৌতূহলবশত নানা প্রশ্ন করবে, তার মধ্যে অনেক প্রশ্ন হাস্যকর, কিছু বা অসুবিধাজনক বা বিরক্তিকর, তবুও মনের দিক থেকে শিশুকে সজীব ও সুস্থ রাখতে হলে, সহানুভূতির সঙ্গে যথাসাধ্য তার প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।

(৩) শিশুর গঠন ও সৃজনের আকাঙ্ক্ষাকে উৎসাহিত করতে হবে, কিন্তু যে কাজ তার সাধ্যের অতীত তা দিয়ে তাকে বিব্রত বা লজ্জিত করা উচিত নয়। নিজের আত্মপ্রত্যয় অটুট রাখা, মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। খেলাধুলা, আবৃত্তি, গান, হাতের কাজের মধ্য দিয়ে শিশুর আত্ম-উন্মোচনে সাহায্য করতে হবে। সে সব সুযোগ তাকে দিতে হবে, এসব কাজে তাকে সর্বদা উৎসাহিত করতে হবে।

(৪) পারিবারিক পরিবেশ প্রীতিপূর্ণ নির্মল ও উৎসাহ-আনন্দপূর্ণ হলেই শিশু মানসিক দিক থেকে সুস্থ ও সজীব থাকবে। যেখানে পিতামাতার

মধ্যে সম্বন্ধ সংঘাতপূর্ণ, পরস্পর অশ্রদ্ধাসূচক, যেখানে ভাইবোন আত্মস্বজনেরা কলহপরায়ণ স্বার্থপর বিকৃতরুচি, সেখানে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কা যথেষ্ট।

(৫) সুন্দর সুস্থ পরিবারে স্নেহ যেমন থাকবে, তেমনি শাসন ও নিয়ন্ত্রণও থাকবে। শিশুর সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গী পিতামাতার সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গী এবং যুক্তিসঙ্গত পরিচালনার ওপর অনেকখানি নির্ভর করে। পিতামাতাকে এটা বুঝতে হবে যে শিশুর দোষত্রুটি অবাধ্যতা তার স্বাভাবিক বেড়ে ওঠারই অঙ্গ। তাকে ধৈর্য দিয়ে, ক্ষমা দিয়ে, অথচ দৃঢ় সুবিচারভিত্তিক পরিচালনা দিয়ে, সুস্থ সবল ও স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বে বিকশিত হয়ে উঠতে সাহায্য করতে হবে।

কিশোর বয়সে এবং বিদ্যালয়ে মানসিক স্বাস্থ্যবিধি

শিশুর সুস্থ বা অসুস্থ ব্যক্তিত্ব বিকাশের ব্যাপারে পরিবারের পরই সর্বাপেক্ষা প্রবল প্রভাব হচ্ছে বিদ্যালয়ের। ছয় থেকে বার বছরকে বলা যায় কৈশোরকাল। এ বয়সে শিশু দেহেমনে দ্রুত বেড়ে ওঠে। ইন্দ্রিয়-ব্যবহারে অধিকতর তীক্ষ্নতা, কুশলতা এবং পেশীসমূহের শক্তি ও সুসংবদ্ধতা বৃদ্ধির ফলে নানা কর্মে শিশুর আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। এ বয়সটায় সাধারণত প্রাণশক্তির প্রাচুর্যের ফলে অসুখবিসুখ কম হয় এবং এ বিষয়ে ধুলো-ময়লা জল-কাদা নিয়ে খেলা সুস্থ মনেরই বিকাশ। তাই এ বয়সটাকে বলা হয়েছে 'অপরিচ্ছন্নতার কাল' (the dirty age)। এ বয়সের ছেলেমেয়েরা জামাকাপড় -বিষয়ে উদাসীন—মাথায় তাদের চিরুনী পড়ে না, সাবান মাখতে তাদের ভীষণ আপত্তি।[১০] ক্ষুধা থাকে প্রচুর। খাদ্য -বিষয়ে বাছবিচারও বড় থাকে না। বিষম অস্থির ও চঞ্চল এবং কিছুটা বা জেদী। এ সবই মানসিক সুস্থতার লক্ষণ। এর ব্যতিক্রম দেখা গেলেই বরং আশঙ্কা করা যেতে পারে এ ছেলে মনের দিক থেকে সুস্থ নয়। এ বয়সে বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ে, বন্ধু-বান্ধব বাড়ে। প্রতিযোগিতা-সহযোগিতার মধ্য দিয়ে কিশোর-কিশোরীরা মোটামুটি একটা আনন্দময় সামঞ্জস্য সৃষ্টি করে স্বচ্ছন্দে বেড়ে ওঠে। এ বয়সে পৃথিবীকে তারা কতকটা চিনতে শেখে—বুঝতে শেখে আপন-পরের প্রভেদ। অস্পষ্টভাবে হলেও অধিকারের সীমা আছে যা লঙ্ঘন করা চলে না, এটাও এ

[১০] It is a mistake for parents to fume and fret because he comes from his adventures, dirty and dishevelled. Gordon, Harris & Rees—An Introduction to Psychological Medicine, p. 53

বয়সে বুঝতে শেখে। চাইলেই পাওয়া যায় না, এ কথাটা কতকটা তারা মেনে নেয়—নৈরাশ্যের দুঃখ কিছুটা সহ্য করতে শেখে। তবে ছেলেমানুষী জেদ-মর্জি-আবদার এ বয়সেও থাকে। এটা কতকটা বাঁধন কাটবার বয়স, তাই ঘরের বাইরে সমবয়স্কদের টানটা ক্রমে প্রবল হয়। কৈশোরের শেষ দিকটা হল 'দলে মেশবার', 'দল গড়বার' বয়স। তখন দলের টানে পিতা-মাতার আদেশ-উপদেশ অমান্য করবার প্রবণতা দেখা দেয় এবং বড়দের সঙ্গে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। একটা নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে এটা অস্বাভাবিক নয়, বরঞ্চ মানসিক সুস্থতারই প্রকাশ। কিন্তু এ বয়স সম্পর্কে পিতামাতা-শিক্ষক সাবধান সহানুভূতিপূর্ণ এবং কিশোরদের পরিচালনা -বিষয়ে বুদ্ধিমান না হলে, তাদের অনুভূতির ক্ষেত্রে তীব্র সংঘর্ষ এবং জীবনে নানা উদ্বেগকর অসঙ্গতিজনিত ব্যবহারের (mal-adjustive disorders) সূত্রপাত হতে পারে। কোন কোন মনোবিদের মতে দু বছর থেকে শুরু করে আট নয় বছর পর্যন্ত প্রত্যেক শিশুকেই কয়েক মাস অন্তর অন্তর মনঃস্বাস্থ্যবিষয়ক ক্লিনিকে নিয়ে অভিজ্ঞ শিশু মনোবিদ্‌দের দিয়ে পরীক্ষা করানো প্রয়োজন, যাতে গোড়া থেকেই শিশুর অসঙ্গত ব্যবহারের লক্ষণ (signs of mal-adjustive behaviour) লক্ষ্য করলে, তখনি প্রতিকারের ব্যবস্থা হতে পারে। গৃহের সঙ্গে বিদ্যালয়ের নিবিড় সহযোগিতা থাকলে শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য-বিষয়ে সুব্যবস্থা সবচেয়ে সহজ হয়। আদর্শ ব্যবস্থা হয়, মাঝে মাঝেই যদি পালা করে মায়েরা বিদ্যালয়ের কাজের ভার নেন এবং শিক্ষিকারা শিশুর গৃহ-পরিচালনার ভার নেন। অন্তত নিচু ক্লাসের সমস্ত শিক্ষিকারা শিশু মনোবিদ্যা ও মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে শিক্ষিতা হলে সবচেয়ে ভালো হয়। আর একটা বিষয়ে গুরুতর মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষিকাদের মানসিক স্বাস্থ্য স্বাভাবিক ও সুন্দর হলে তবেই তাঁরা শিশুদের সুস্থ করে গড়ে তুলতে পারবেন। তা না হলে এ আশঙ্কা সর্বদা থাকে যে, তাঁদের নিজেদের মনের বিকার তাঁরা শিশুদের মধ্যেও সংক্রামিত করে দেবেন। টেক্‌সাস্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক মনোবিদ্‌ সে অঞ্চলের কিছু সংখ্যক শিক্ষিকাদের সম্পর্কে অনুসন্ধান করে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন যে, শতকরা ৩৩ জন মানসিক দিক থেকে অসুস্থ।[১১]

[১১] Ideally, all parents (particularly mothers) should be teachers. Perhaps the time will come when mothers will alternate with teachers in the schoolroom, and teachers with mothers in the home ...Ideally, all school teachers, particularly those of the lower grades should be reasonably efficient

কিশোরদের মানসিক স্বাস্থ্যবিধির কয়েকটি নীতি

(১) কিশোরদেরও প্রয়োজন প্রচুর স্নেহ ও নিরাপত্তাবোধের। তাদের সমস্ত দোষত্রুটি সত্ত্বেও পিতামাতার কাছে তারা প্রিয় ও মূল্যবান, এ বোধ শিশুর মানসিক শান্তির পক্ষে অত্যাবশ্যক। এ বয়স থেকেই সুবিচার-বোধের ধারণা অস্পষ্টভাবে হলেও গড়ে উঠতে থাকে। তাই পিতামাতা যদি কোন ভাই বা বোনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন তা হলে সে ক্ষুণ্ণ হয়। "ও বাড়ীর তপন কেমন ভাল—তোমার মতো অবাধ্য নয়", "সুলেখা কেমন লক্ষ্মী মেয়ে, তোমার মতো এমন নোংরা থাকে না"—এমন সব প্রতিকূল তুলনা কিশোর-কিশোরীদের আত্মসম্মানে আঘাত দেয়। পিতামাতার দিক থেকে এ জাতীয় আচরণ কিশোরদের মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর।[১২] তাদের প্রাপ্যের চেয়েও বেশী প্রশংসা তাদের দিতে হবে।

(২) তার বাড়ন্ত দেহ, পেশী, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্রুত বিকাশের উপযুক্ত খাদ্য, পুষ্টি, যত্ন ও সুষম ব্যবহারের সুযোগ শিশুকে দিতে হবে। এ বয়সের সুস্থ বিকাশের পক্ষে প্রচুর খেলাধূলা, অঙ্গ সঞ্চালন নিতান্ত প্রয়োজন।

(৩) শিশু গৃহের নিশ্চিন্ত আরাম ও পরিচিত পরিবেশ থেকে যখন বিদ্যালয়ে প্রথম প্রবেশ করে তখন স্বভাবতই বিভ্রান্ত অ-নিরাপদ ও অসুখী বোধ করে। এখানে এসে তাকে বড়দের শাসনের এক নতুন রূপের সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। এখানের নিয়মকানুন আলাদা, মানুষগুলি অপরিচিত, এখানে তার স্বাধীন বিচরণের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত। এই নতুন ভীতিকর, বিহ্বলকর পরিবেশে যাতে সে সহজে অভ্যস্ত হতে পারে এবং নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে, সে জন্যে সদয় সহানুভূতিশীল শিক্ষক-শিক্ষিকার সস্নেহ সহায়তা বিশেষ প্রয়োজন। পিতামাতার দিক থেকেও কিছু করণীয় আছে। তাঁদের মনের ভাবটাও যেন এ রকম না হয় যে, দুষ্ট

child psychologists...teachers like parents go along exercising their own particular biases and personality quirks on the children they teach. A recent study of school teachers made by a psychologist at the university of Texas revealed emotional mal-adjustment in 33% of the group studied. Fisher—An Introduction to Abnormal Psychology, pp. 500-10

১২ They (parents) need to avoid favouritism and invidious comparisons and to appreciate the child in spite of his lack of nicety in manners, accidents and noisiness which are a part of development in this period. Crow & Crow —Mental Hygiene, p. 95

ছেলেটাকে স্কুলের খাঁচায় পুরে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল—ওখানে ওর সব বজ্জাতি 'শায়েস্তা' হয়ে যাবে। নতুন সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে সহজে মিশে যাওয়া, খেলাধুলা ও পড়াশুনার মধ্য দিয়ে তাদের সঙ্গে সুসঙ্গত সম্পর্কস্থাপন, এটা শিশু তার নিতান্ত অপরিণত বুদ্ধি ও অনুভূতি দিয়ে নিজের থেকে করে উঠতে পারে না। এ বিষয়ে শিক্ষক ও পিতামাতারও কিছুটা সাহায্য দরকার। অবশ্য শিশুর নিজের মধ্যেও স্বাভাবিকভাবেই সঙ্গতিস্থাপনের ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকে এবং অধিকাংশেরই এই ক্ষমতা থাকে। কিন্তু সব শিশু সহজে এ কাজটি পারে না। এ বিষয়ে তাকে সাহায্য না করলে শিশু আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, অকারণ ভয়ে সঙ্কুচিত হয়, নিজেকে সকলের থেকে গুটিয়ে রাখে, অথবা বিপরীতভাবে নিজের নিরাপত্তাবোধের অভাবকে আক্রমণাত্মক ব্যবহার দ্বারা ঢাকতে চায়, অবাধ্যতা ও নানাপ্রকার অবাঞ্ছিত আচরণের মধ্য দিয়ে দৃষ্টি-আকর্ষণ করতে চায়। এ সমস্তই শিশুর মানসিক অসুস্থ অবস্থা সূচনা করে। সহজেই বোঝা যায় সহানুভূতি ও সুবুদ্ধিপূর্ণ পরিচালনা দিয়ে এটা নিবারণ করা সম্ভব। এবং এ মানসিক অবস্থার গোড়াতে প্রতিবিধান না হলে, ভবিষ্যতে গুরুতর মানসিক অশান্তি ও অসঙ্গতি সৃষ্টি হতে পারে।

(৪) প্রত্যেক শিশুই স্বতন্ত্র ব্যক্তিকোরক। প্রত্যেকের মধ্যেই সম্ভাবনা রয়েছে এক একটি স্বাধীন, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বে বিকশিত হয়ে ওঠবার। কিন্তু তার জন্যে প্রয়োজন, অনুকূল উৎসাহপূর্ণ পরিবেশের। এ বিষয়ে শিক্ষক ও পিতামাতার সমান দায়িত্ব আছে। প্রত্যেক ছাত্রের ব্যক্তিগত ক্ষমতা, প্রবণতা, প্রয়োজন ও রুচি -অনুযায়ী বিকশিত হবার সুযোগ দিতে হবে, প্রত্যেককে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবে শ্রদ্ধা করতে হবে, প্রত্যেকের শক্তি ও প্রয়োজন অনুযায়ী পরিচালনা করতে হবে। শিক্ষকের পক্ষে এ কাজটি যথেষ্ট অসুবিধাজনক হতে পারে। কারণ, বিদ্যালয়ের পক্ষে রুটিন অনুযায়ী এক শ্রেণীর সব ছেলেমেয়েকে একই পাঠদানের ব্যবস্থা করাই প্রচলিত রীতিসম্মত। কিন্তু এ ব্যবস্থায় সব ছেলেমেয়ের প্রতি সুবিচার হতে পারে না। যে ছেলেমেয়ে বুদ্ধিতে বা আগ্রহে কোন এক বিষয়ে ক্লাসের থেকে পিছিয়ে আছে, সে অল্পদিনের মধ্যেই নিরুৎসাহ হয়ে পড়বে, অথবা আত্মগ্লানিতে পীড়িত হয়ে মানসিক শান্তি হারাবে এবং ক্ষতিপূরণ হিসাবে হয়তো নানা ধ্বংসাত্মক অসামাজিক কাজে রত হবে। আবার যে ছেলেমেয়ে সাধারণের চেয়ে তীক্ষ্ণতর বুদ্ধি ও ক্ষমতার অধিকারী, তার পক্ষে ক্লাসের পড়া বা কাজ-

বড় বেশী সহজ হতে পারে এবং তাতে তার আগ্রহ উৎসাহ নষ্ট হয়ে সে অলস হয়ে পড়তে পারে, অথবা ক্লাসের পড়া ভিন্ন অন্য দিকে অধিকতর মনোযোগ দিতে পারে। এ বয়সের ছাত্রদের সম্পর্কে এ বিষয়ে সাবধান না হলে, তাদের মানসিক স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হতে পারে।[১৩]

(৫) কিশোর বয়সে শুধু যে দৈহিক বিকাশের জন্যে খেলাধুলা, আর বুদ্ধি ও কৌতূহল বিকাশের জন্যে বই, লেখাপড়া প্রয়োজন আছে তাই নয়; এ বয়সের পক্ষে অনুভূতির উপযুক্ত প্রকাশ এবং নাচ, গান, আবৃত্তি অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সৌন্দর্যবোধের ও আত্ম-উন্মোচনের (self-expression) যথেষ্ট সুযোগও কিশোরদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যে প্রয়োজন। তাদের অনুভূতি প্রক্ষোভ ইত্যাদি সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে মুক্তি পেলেই মঙ্গল। মনোবিদ্‌দের মত— শৈশবের তীব্র অনুভূতি বা প্রক্ষোভ অবদমিত হয়েই উত্তরকালে নানা মানসিক বিকারের সৃষ্টি হয়। পিতামাতা বা শিক্ষকের অতিরিক্ত কঠোর শাসন, তাদের নিন্দা, ভৎর্সনা অথবা পরিহাস কৈশোরের অনুভূতির সহজ প্রকাশকে রুদ্ধ করে দেয়। তাতে শিশুরা সমাজ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে, নিজেদের আবরণের মধ্যে নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে (withdrawal) অবচেতন মনে নানা অমীমাংসিত 'গ্রন্থির' পথ প্রশস্ত করে। পিতামাতা এ বয়সের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সহজ বন্ধুভাবে মিশে, তাদের অনুভূতি-জগতের নানা অস্বস্তি দূরীকরণে সাহায্য করতে পারেন।

(৬) কৈশোরের শেষ দিকে ছেলেমেয়েরা স্বাভাবিকভাবেই দল গড়তে, বন্ধুত্বস্থাপন করতে আগ্রহী হয়। তাদের এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে দমন না করে, যাতে তারা বাঞ্ছিত বন্ধু গ্রহণ করতে পারে সে বিষয়েই পিতামাতাকে অবহিত হতে হবে। পরিবারের গণ্ডীর বাইরে প্রীতির সম্বন্ধস্থাপন কিশোরদের মানসিক সুস্থ বিকাশের পক্ষে প্রয়োজন। এ বয়সে পিতামাতার ও শিক্ষকের প্রতি কিছুটা বিরুদ্ধতা ও অবাধ্যতার জন্যেও পিতামাতা ও গুরুজনদের প্রস্তুত থাকতে হবে এবং সাবধানতা ও সহানুভূতির সঙ্গে এই বিরোধ-মীমাংসার ব্যবস্থা তাঁদেরই করতে হবে।

[১৩] An inflexible school curriculum which attempts to teach every child in these same way is not well-adapted to individual pupils. A minority of students may fail to learn what is taught by methods that are successful, or at least tolerable, for the majority. Shaffer & Shoben—The Psychology of Adjustment, p. 553

(৭) কিশোর বয়স থেকেই যাতে আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা গড়ে ওঠে সে বিষয়ে সচেষ্ট হতে হবে। হীনতাবোধ তাদের সুস্থ ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে বিষম বাধা। এ বয়সে তাদের এমন কাজ দিতে হবে যা তাদের শক্তি বা সাধ্যের অতীত নয়—যাতে এমন কাজ সফলভাবে করে, তারা নিজের শক্তি সম্বন্ধে আস্থাবান হয়ে উঠতে পারে। তাদের সর্বদা উৎসাহিত করতে হবে এবং তার সাফল্যের জন্যে, অথবা তার উদ্যমের জন্যে তাকে যথোচিত প্রশংসা করতে হবে। কিন্তু তাদের কাছে অতিরিক্ত প্রত্যাশা করে, তাদের উদ্বিগ্ন বা লজ্জিত করে তোলা অত্যন্ত ভুল।

উপরে উল্লিখিত স্বাস্থ্যবিধির নিয়ম বিষয়ে অসাবধান হলে কিশোরদের মধ্যে অযথা দুশ্চিন্তা, অতিরিক্ত লজ্জা, তোতলামী, পড়াশুনায় পিছিয়ে পড়া, নিরুৎসাহতা, বিষণ্ণতা, দিবাস্বপ্ন, অথবা অবাধ্যতা, অপরাধপ্রবণতা, ধ্বংসাত্মক ব্যবহার ইত্যাদি অসঙ্গতির উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক যে সমস্যাগুলি দেখা দেয়, তাদের কয়েকটি মূল কারণে ভাগ করা যেতে পারে—

(১) শিক্ষকের সঙ্গে বিরূপতার সম্পর্ক, (২) সহপাঠিদের সঙ্গে অপ্রীতির সম্পর্ক, (৩) বিদ্যালয়ের বিধিনিষেধের কড়াকড়ি এবং শাস্তির ভয়, (৪) কোন বিশেষ বিষয় সম্পর্কে আগ্রহের অভাব অথবা বিমুখতা, (৫) গৃহের বিরোধ ও অশান্তির কারণে ছাত্রের বিদ্যালয়ের শান্তির বিঘ্ন, (৬) ছাত্রদের সাফল্য সম্পর্কে পিতামাতা ও শিক্ষকের অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা।

এই সমস্ত কারণ-জনিত সমস্যাগুলির সমাধানে শ্রেণীর শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকদের অনেকখানি দায়িত্ব আছে। কোন না কোন কারণে কোন ছাত্রের সঙ্গে বিশেষ শিক্ষকের মধ্যে একটা বিরোধের সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। এ বিরোধ অসমানের মধ্যে বিরোধ এবং এতে ছাত্রেরই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। প্রধান শিক্ষককে এ বিষয়ে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করে, সুবিচারের ভিত্তিতে একটা সন্তোষজনক মীমাংসায় পৌছতে হবে। ছাত্রের মনে যদি এ ক্ষোভ বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, সে বিদ্যালয়ে সুবিচার পাচ্ছে না বা পাবে না, তা হলে তার অন্তরে একটা বিদ্রোহের ভাব তার নানা ব্যবহারের মধ্যে প্রকাশ পাবে। এসব ক্ষেত্রে অবদমনের ভয় যথেষ্ট আছে। এবং ছাত্রদের অন্তরে বিক্ষোভের বাষ্প পুঞ্জীভূত হতে থাকলে, তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা

থাকে। বিদ্যালয়ের নিয়ম-কানুন, শাস্তি ও পুরস্কারের ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছাত্রদের মঙ্গল। তাদের ব্যক্তিত্বের সুষম বিকাশের জন্যেই এই সব ব্যবস্থা। এখানেও দেখতে হবে এসব বিধিনিষেধের দ্বারা ছাত্রদের স্বাভাবিক সুস্থ বিকাশ বিঘ্নিত যেন না হয়। আইন-কানুন বিধি-নিষেধ ব্যক্তির ও সমাজের মঙ্গলের জন্য। আইন যেন মানুষের চেয়ে বড় না হয়ে ওঠে। শাস্তি ও পুরস্কার বিষয়ে এটা খুবই প্রয়োজন যে, ছাত্রদের মনে এ-ক্ষোভ জমে না ওঠে, যে বিদ্যালয়ে পক্ষপাতিত্ব আছে এবং সেখানে সুবিচার হয় না।

যেখানে অনেক ছাত্রই কোন এক বিষয়ে আগ্রহের অভাব দেখায় এবং সে বিষয়ে অগ্রগতি অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে কম হয়, সেখানে প্রধান শিক্ষককে দেখতে হবে যে সেই বিষয় শিক্ষাদানের পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ কিনা, অথবা শিক্ষকের ব্যক্তিত্বেই কোন বিকৃতি আছে কিনা। অনেক সময় এটা দেখা যায় যে শিক্ষকের প্রতি ছাত্রদের বিরূপতাই, তাদের কোন এক বিষয় সম্পর্কে বিরূপতার কারণ। অথবা এমনও হতে পারে কোন ছেলে এক বিষয়ে কিছু কাঁচা থাকার জন্যে শিক্ষক তাকে তাড়ন-পীড়ন করেছেন। ফলে, সে-বিষয় সম্বন্ধে ছাত্রটির ভয় আরো বেড়ে গেল, এবং সে আরো পিছিয়ে পড়ল। গৃহ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ থাকলে ছাত্রদের মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক অনেক সমস্যার সমাধানও সহজ হয়। গৃহে বিরোধের আবহাওয়া বিদ্যালয়ে ছাত্রের স্বচ্ছন্দ অগ্রগতি ব্যাহত করে, এর একটি সুন্দর উদাহরণ গেইট্স্ দিয়েছেন। মায়ের বিশেষ আগ্রহের ফলেই একটি ছেলেকে নতুন ধরনের প্রোগ্রেসিভ (প্রগতিশীল) স্কুলে ভর্তি করা হল। বাপ কিন্তু প্রাচীনপন্থী এবং তাঁর মোটেই এতে মত ছিল না। মায়ের উৎসাহ ও যত্নে ছেলেটি স্কুলে বেশ ভাল ফল করতে লাগল। কিন্তু বাবা মাঝে মাঝে নতুন বিদ্যালয়ের পদ্ধতি যে ভ্রান্ত ও ত্রুটিপূর্ণ তা প্রমাণ করবার জন্যে, ছেলেটিকে বিদ্যালয়ে অধীত বিষয় নিয়ে পরীক্ষা করতেন এবং তার অগ্রগতি যে সন্তোষজনক নয়, এটা দেখাতে চেষ্টা করতেন। মা প্রতিবাদ করতেন এবং বাবা যে সব 'দোষ' ধরেছেন তার সংশোধনের জন্যে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। ফলে, তার পড়াশুনা নিয়ে বাড়ীতে একটা বিরোধ, নিরানন্দ ও দুর্ভাবনার আবহাওয়া ছিল। তা ছেলেটিতেও সংক্রামিত হল এবং তার স্কুলের কাজ গুণের দিক থেকে অসমান (of uneven quality) আর তার অগ্রগতির ধারাও অনিশ্চিত হতে লাগল। সুখের বিষয় প্রধান

শিক্ষকের দৃষ্টি এ বিষয়টির প্রতি আকৃষ্ট হল এবং পিতামাতা দুজনের সঙ্গে এ ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করে তিনি তাদের মধ্যে বিরোধ-মীমাংসা করলেন। তার ফলে গৃহের আবহাওয়ার অনুকূল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটির লেখাপড়ার অগ্রগতি আবার বেশ সন্তোষজনক হয়ে উঠল।[১৪]

বিদ্যালয়ে সব ছেলেই সমান বুদ্ধিমান, সমান তৎপর বা কুশলী হতে পারে না। প্রত্যেক ক্লাসেই পড়াশুনা ও কাজ -বিষয়ে ভালো মন্দ মাঝারী থাকবেই। যারা ক্লাসের পড়াশুনায় বা কাজে কাঁচা বা পিছিয়ে আছে, তাদের মনের মধ্যে কিছুটা লজ্জা- বা হীনতা-বোধ খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু শিক্ষক যদি ছাত্রকে এজন্যে অতিরিক্ত তাড়ন-পীড়ন করেন, অথবা সহপাঠীরা এ নিয়ে যদি ঠাট্টা করে তা হলে সেই লজ্জা- ও হীনতা-বোধ আরো অনেক বেড়ে যায়। যে সব ছাত্রেরা দুর্বল, অন্তর্মুখী ও অভিমানী তারা এই অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা এড়াতে গিয়ে অতিশয় আত্মসচেতন (too self-conscious) হয়ে পড়ে এবং ক্লাসের ছাত্রদের থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়। পিতামাতা শিক্ষক কোন ছাত্রের পিছিয়ে-পড়া নিয়ে অতিরিক্ত উদ্বিগ্ন হয়ে বেশী তাড়া লাগালে ফল বরং বিপরীত হয়। আবার কখনো কখনো কোন কোন পিতামাতা বা শিক্ষক, ছাত্র যত পরিশ্রমই করুক না কেন এবং যত ভাল ফলই করুক না কেন, তবু তাঁরা সন্তুষ্ট নন। তাঁরা সর্বদাই বলেন "ভাল হত আরো ভালো হলে।" এতে করে ছাত্রের মনের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে এবং তাদের উৎসাহ ও আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়। বলাই বাহুল্য এতে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা থাকে।[১৫]

বিদ্যালয়ে পড়াশুনায় ভাল করা বিষয়ে কিছুটা দুশ্চিন্তা এবং আসাফল্যের লজ্জা, দৃঢ়চরিত্র ও বিবেকবান ছাত্রদের অধিকতর পরিশ্রমী ও মনোযোগী করে তুলতে পারে, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও দেখা যায় ছেলেটি এই একটি বিষয়ে ভাল করবার দৃঢ় সংকল্পের ফলে তার খেলাধুলা এবং অন্যান্য যে বিষয়ে তার

১৪ Gates—The Improvement of Reading, pp. 110-11

১৫ A parent's anxiety about a child, or a teacher's may evoke anxiety in the child himself. Ridicule and overt punishment increase rather than decrease the anxiety...Perfectionistic attitudes on the part of teachers or parents also produce anxiety. No matter how hard the child tries, he is always reproached for not doing well enough···The mother's constant inquiries about the progress of the child and her pressures upon him to work harder make the child doubt his own ability. A well-meaning but

স্বাভাবিক আগ্রহ আছে সে বিষয়গুলি অবহেলা করতে পারে। মোটের ওপর বলা যায়, শৈশব-কৈশোরে দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনার ফল শুভ নয়। যে বিষয়টা সম্বন্ধে বালকের ভয় বা বিষম দুশ্চিন্তা আছে, স্বভাবতই তাকে সে মনোযোগের কেন্দ্র থেকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করবে। অর্থাৎ সে বিষয়ে পাঠের সময় সে "অমনোযোগী" হবে। তখন তার অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা এড়াবার জন্যে সে সম্ভবত কল্পলোকের (realms of phantasy) আশ্রয় নেবে। যদি পরিবারের চাপে সে স্কুলে যেতে বাধ্য হয়, তা হলেও 'আন্‌মনা' এই ছেলেটির মনের মধ্যে থাকবে বিকর্ষণ-আকর্ষণের দ্বন্দ্ব এবং সে কখনোই পড়াশুনায় ভালো হবে না। হয়তো বারে বারে 'ফেল্' করে সে স্কুল থেকে বিতাড়িত হবে। তার অবচেতন মন তো এই স্কুলের কারাযন্ত্রণা থেকে মুক্তিই চেয়েছিল এবং লজ্জাকর পন্থায় হলেও তার মন যা চেয়েছিল তা সে আদায় করেছে।

সাধারণভাবে একথা বলা যায় যে, সহানুভূতি এবং বুদ্ধিমান পরিচালনা দিয়ে বিদ্যালয়ে ছাত্রদের মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সমস্যাগুলির সমাধান করা যায়। এই সমস্যাগুলি অবহেলিত হলে ভবিষ্যতে গুরুতর মানসিক বিকারের পথ প্রশস্ত করতে পারে।

যেখানে বিদ্যালয়ে কিশোরের নানা অস্বাচ্ছন্দ্যের সমস্যার সঙ্গে অন্য নানা প্রকার দুশ্চিন্তা ও সংঘাতও যুক্ত থাকে, সেখানে অভিজ্ঞ মানসিক রোগের চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়াই উচিত। অনেক মনঃসমীক্ষকের মতে একক এবং যৌথ নানা সুপরিচালিত খেলার মধ্য দিয়ে কিশোরদের মানসিক দুশ্চিন্তা, অতিরিক্ত লজ্জা, ভয় ইত্যাদি দূর করা সম্ভবপর এবং এর ফলে তাদের পড়াশুনা বিষয়ে যে সব অসুবিধা সেগুলিও অন্য কোন চিকিৎসা ব্যতিরেকেই দূর করা যেতে পারে।[১৬]

inexperienced teacher sometimes sees in a 'child' who has a little difficulty in learning to read as a challenge to her professional status. By showing her own anxiety and by going after the child with excessive zeal, she intimidates him instead of helping him. Shaffer & Shoben—The Psychology of Adjustment, pp. 553-54

১৬ Bills—Non-directive Play Therapy with Retarded Readers, I. Consult. Psy, 1950, 14, pp. 140-49

also Axline—Play Therapy, p. 549

প্রাক্-যৌবন স্তরে মানসিক স্বাস্থ্যবিধি

তেরো থেকে উনিশ (teenagers) বছর বয়স, ব্যক্তির দৈহিক-মানসিক-অনুভৌতিক-সামাজিক সমস্ত দিক থেকেই সংকটপূর্ণ অস্থিরতার কাল। যাদের বাল্য ও কৈশোর সুস্থ ও শান্ত পরিবেশে স্নেহময় ও বুদ্ধিমান পিতামাতা বা শিক্ষকের সাহচর্যে ও পরিচালনায় অতিবাহিত হয়েছে, তারা সহজেই একালের সমস্যাগুলির সুসমাধানে সমর্থ হয়। সেজন্যে দেখা যায়, পাশ্চাত্ত্য দেশে প্রাক্‌যৌবনের সংঘাত ও বিশৃঙ্খলার সমস্যা যতটা উদ্বেগকর, ভারতবর্ষে তা নয়।

মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে যে সমস্যাগুলি এ বয়সে দেখা দেয়, তার মূলে আছে এই সত্য যে, এ বয়সের ব্যক্তির সমাজে স্থান ও মর্যাদা অনিশ্চিত। সে বড়দের অধিকার দাবি করে অথচ পূর্ণবয়স্কের পরিণত শক্তি, বুদ্ধি-বিবেচনা তার এখনও আসে নি, তা সে নিজেও অনুভব করে। আবার, সমাজ দায়িত্ব ও সম্মান দেবার বেলায়, তাকে 'ছেলেমানুষ' বলে অবজ্ঞা করে, কিন্তু তার ত্রুটি বা অপরাধের বেলায় গাল দিতে হলে, তখন বলে, সে যথেষ্ট বড় হয়েছে।[১৭] এ বয়সের সমস্যা আরো, জটিল হওয়ার কারণ—এ বয়সেই প্রথম সুস্পষ্ট যৌন-চেতনা আত্মপ্রকাশ করে। এই যৌনচেতনা শুধু কাম নয়, আরো বহু প্রক্ষোভের ও সংঘাতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধে জড়িত। কাজেই সহজেই বোঝা যায় আত্মমর্যাদা- ও ব্যক্তিত্ব-ভিত্তিক মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক বহু সমস্যাই এ বয়সে তীব্র হয়ে ওঠে। নিম্নলিখিত, ক'টি বিষয়ে দৃষ্টি রাখলে প্রাক্‌যৌবন বা উত্তর- কৈশোর কালে মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে।

(১) বাল্য ও কৈশোরে ব্যক্তির স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাগুলির সুস্থ পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা থাকলে—স্নেহ ও স্বাধীনতা এই দুটি প্রধান প্রয়োজন মেটাবার সুব্যবস্থা থাকলে—এই কালটা বিষম সংকটময় কালে পরিণত হয় না। এই কালে ব্যক্তির মুখ্য প্রয়োজন স্বাধীনতা, কিন্তু স্নেহ ও নিরাপত্তাবোধও তার পক্ষে কম প্রয়োজন নয়।

[১৭] He has no status in society, nor does society seem to understand him. By some he is judged in terms of standards accepted for childhood years; by others, he is expected to conform to society's standards for adults. Neither set of standards fit him because he is no longer a child not yet an adult. Kaplan, Louis & Baron—Mental Hygiene & Life

(২) তার দৈহিক পরিবর্তন এবং ক্রিয়াগুলি যেন সে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে। এ নিয়ে যাতে সে লজ্জিত ও অতিরিক্ত বিব্রত না হয় সে শিক্ষা তাকে দিতে হবে। দেহের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাগুলি পাপবোধের সঙ্গে অযথা যুক্ত হয়ে, এই বিষয়ে নানা মানসিক বিকৃতির কারণ হয়ে ওঠে।

(৩) অনুভূতির দিক থেকে সে যেন পিতামাতার ওপর অতিনির্ভরতার মনোভাব থেকে সহজে মুক্ত হতে পারে, সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। তার স্বাধীন ব্যক্তিত্বের আকাঙ্ক্ষাকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হবে। পিতামাতার পক্ষেও এটা কঠিন পরীক্ষার সময়। এসময়ে পিতামাতা ও গুরুজনদের সঙ্গে সংঘর্ষের সম্ভাবনা তীব্র হয় এবং পিতামাতা সাবধান, ধৈর্যশীল ও বুদ্ধিমান না হলে, দুই পক্ষেরই মানসিক অশান্তি, গুরুতর স্থায়ী অসঙ্গতি ও বিচ্ছেদে পরিণত হতে পারে।

(৪) দেহের শক্তি অনুযায়ী প্রচুর পরিশ্রম এবং বুদ্ধির পরিণতি অনুযায়ী কঠিন কাজে নিযুক্ত থাকা, এ বয়সের ছেলেদের মানসিক সুস্থ রাখবার সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ উপায়। কঠিন কাজের মধ্য দিয়েই ব্যক্তির বড় হওয়ার ও স্বাধীন হওয়ার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার সুস্থ পরিতৃপ্তি ঘটে। ব্যক্তিকে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারাই প্রধান কাজ। তার বীরত্ব ও মহত্ত্বের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাকে পোষণ ও পুষ্ট করতে হবে।

(৫) মহৎ আদর্শ ও বীরত্বের গৌরব দিয়ে ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। একটি সুস্থ ও সবল জীবনদর্শন যাতে সে আয়ত্ত করে সে জন্যে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, মহাপুরুষ ও বীরদের ইতিহাস ও জীবন-কাহিনী -পাঠে উৎসাহিত করতে হবে এবং বীরত্বপূর্ণ সমাজসেবার কাজে যাতে সে স্বেচ্ছায় অগ্রসর হয় তেমন শিক্ষা দিতে হবে।

(৬) এ বয়সে কৌতূহল ও জ্ঞানস্পৃহা স্বাভাবিক। এই স্পৃহার চরিতার্থতা ব্যক্তির সুস্থ মানসিকতা গঠনের অনুকূল। এ বয়সের ছেলে-মেয়েরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রকৃতিকে জানবে, দুঃসাহসিক পরীক্ষা দ্বারা সত্যকে প্রমাণ করবে, এমনি করেই তাদের বিশ্লেষণ- ও বিচার-ক্ষমতা যেমন পরিণতিলাভ করবে, তেমনি আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে, কুসংস্কারের মোহ দূর হয়ে তারা সুস্থ সবল ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত হবে।

(৭) এ বয়সে গভীর প্রীতি ও সৌহার্দের আকাঙ্ক্ষাই দৃঢ় বন্ধুত্বে পরিণতি-লাভ করে। সুস্থ জীবনবিকাশ ও জীবনের আনন্দময় বিস্তারের পক্ষে এটি অপরিহার্য। সে যাতে উপযুক্ত সমমর্মী বন্ধু নির্বাচন করতে পারে সে দিকে পিতামাতা, অভিভাবকের দৃষ্টি রাখতে হবে—কিন্তু তার বন্ধুত্ব-গ্রহণের অধিকারকে স্বীকার করতে হবে, তার বন্ধুত্বের স্নেহ ও মর্যাদা দিতে হবে। সুবন্ধু যেমন মানসিক শান্তি ও স্বাস্থ্যের সহায়ক, দুষ্ট বন্ধু তেমনি অপরাধ-প্রবণতা ও অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করে দিতে পারে, একথা ব্যক্তি ও তার পিতামাতাকে জানতে হবে।

(৮) বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ এ বয়সের স্বাভাবিক ধর্ম। ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে কোন তরুণীর প্রতি পরিচ্ছন্ন আকর্ষণ বিশেষ সহায়ক। এতে পুরুষের যেমন পৌরুষ জাগ্রত হয়, তেমনি নারীরও স্বাভাবিক শ্রী, হ্রী ও হৃদয়ের কোমল বৃত্তির উপযুক্ত বিকাশ ঘটে। কিন্তু এই সম্পর্কের ভিত্তি নির্মল প্রীতি, সংযম ও সৌন্দর্যবুদ্ধি হ'লে এবং তা উৎসাহদ্যোতক শুভকর্মের উৎস হলে তবেই তা মঙ্গলদায়ক। তরুণ-তরুণীর মনে যদি সংযম, শালীনতা যৌনশুচিতাবোধ ও দায়িত্বজ্ঞান থাকে তবে এ সম্পর্ক ব্যক্তিত্ববিকাশের শ্রেষ্ঠ সহায়ক। এর বিপরীত হলে—যদি এই সম্পর্ক স্থূল জৈব তাড়না, সংযমহীন রুচিহীন ইন্দ্রিয়াকাঙ্ক্ষা-নির্ভর হয়, তবে তা ব্যক্তির জীবনে বিষময় অভিশাপ স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। একবার অসংযমের পথে পা বাড়ালে, তা যে আবর্জনা সৃষ্টি করবে, তাতে ব্যক্তির ভবিষ্যৎ মানসিক শান্তি নষ্ট হবার আশঙ্কা থাকবে। এ ব্যাপারে ভুল ও অসাবধানতা ভবিষ্যতে বহু যৌনবিকার (sexual perversions) ও মানসিক রোগের কারণ। এ বিষয়ে প্রধান প্রতিষেধক পিতামাতার মধ্যে প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্বন্ধ, পরিবারের নির্মল সুস্থ আবহাওয়া, নারীজাতি সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধাবোধ এবং যৌনতার দায়িত্ব ও বিপদ সম্পর্কে আবেগমুক্ত, নির্মল ও সত্য তথ্যভিত্তিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠন। এর গুরুত্ব এত বেশী এবং এর ফলাফল ব্যক্তি ও সমাজের পথে এত সুদূরপ্রসারী যে, এ ব্যাপারে পিতামাতা, শিক্ষক, সমাজসেবী ও সরকার সকলেরই বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। তরুণ-তরুণীরা মানসিক দিক থেকে সুস্থ হলে তা জাতির পক্ষে শ্রেষ্ঠ সম্পদ। গুরুতর মানসিক বিকারের প্রায় সমস্ত উদাহরণই পাওয়া যাবে অসংযত তরুণ-তরুণীদের মধ্যে।

পূর্ণবয়স্কদের বিষয়ে স্বাস্থ্যবিধি

পূর্ণবয়স্কদের মানসিক স্বাস্থ্যের প্রধান ভিত্তি, তাদের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে সুসঙ্গতি। যে ব্যক্তি দেহের দিক থেকে সুস্থ, যার পারিবারিক জীবন প্রীতি ও স্নেহপূর্ণ, যার আয় সংসারের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট, যার জীবিকা তৃপ্তিকর, যার সমাজে একটি সম্মানিত স্থান আছে তিনি মানসিক দিক থেকেও সাধারণত সুস্থ। অনেক মানুষের পক্ষেই সবগুলি অনুকূল অবস্থা বর্তমান থাকে না, তবুও অধিকাংশ মানুষই অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে, রফা ক'রে, মোটামুটি মানসিক শান্তিতে থাকে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে নিজের কোন ত্রুটি বা দুর্বলতার জন্যে, অথবা প্রতিকূল পরিবেশের চাপে, মানুষ মানসিক সুস্থতা হারিয়ে ফেলে। এ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রধান বিষয়, বয়স্কের মানসিক স্বাস্থ্যবিধির আলোচ্য।

এবয়সের ব্যক্তি দেহ, মন, বুদ্ধি, বিচারের দিক থেকে পরিণত। নিজের প্রয়োজন, শক্তি, দুর্বলতা এবং পরিবেশের অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা সম্বন্ধে বিচার করবার ক্ষমতা তার হয়েছে এবং কতকগুলি বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গী ও স্বাধীন ইচ্ছা দিয়ে, নিজের কর্ম সে অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কাজেই জীবনের দুঃখ দুর্দশা বঞ্চনা অপূর্ণতাকে সে অনেকটা শান্তচিত্তে গ্রহণ করতে পারে। তার জীবনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী সে কতগুলি অভ্যাস আয়ত্ত করেছে, কতগুলি আদর্শ ও মূল্যবোধ সে গ্রহণ করেছে। নিজের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে নিজ সাধ্য অনুযায়ী এবং সামাজিক স্বীকৃতির মান অনুযায়ী সে সংযত করতে শিখেছে। সে নিজের কাছে, অথবা পৃথিবীর কাছে অতিরিক্ত কিছু দাবি করে, নিজের দুঃখ বাড়ায় না। তাই বয়স্ক ব্যক্তিরা নিজেদের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে মানিয়ে নিতে পারে। কিন্তু তাই বলে, সমস্ত বয়স্কই কিছু মানসিক দিক থেকে সুস্থ ও শান্ত নয়। বয়স্কদের চারদিকে প্রতিকূল অবস্থার চাপ, নিজের অনিয়ন্ত্রিত, অসঙ্গত তীব্র বাসনা কামনার তাড়না এবং দুর্বল ইচ্ছাশক্তি তাকে নানা উদ্বেগকর বা অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিতে পারে। এবং নানা কারণেই তার মধ্যে উপযুক্ত দৃঢ়তার অভাবের জন্যে, সে এই জাতীয় অভিজ্ঞতার সম্মুখে দিশাহারা ও মানসিক অসুস্থ হতে পারে। বয়স্ক ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে নিচের কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন :

(১) যদিও যৌবনপ্রাপ্ত পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির বিশেষ মানসিক লক্ষণ হচ্ছে অহঙ্কার, তেজ, আত্মনির্ভরতা তবুও নবযুবক বা যুবতীরও জীবনে একটি

মস্ত প্রয়োজন হচ্ছে নিরাপত্তাবোধ। তারাও স্নেহ-ভালবাসা চায়, কোন প্রিয়জনের ওপর কিছু নির্ভর করতে চায়। প্রিয়জনের ভালবাসা তাদের অহংবোধকে তৃপ্ত করে। এতে যে গভীর তৃপ্তি, তা সুস্থ ব্যক্তিত্বেরই লক্ষণ। এতেই যুবক বা যুবতী বোধ করে পৃথিবীতে তার দাম আছে, পৃথিবীতে এমন ঠাঁই আছে যেখানে সে দুদণ্ড শক্তি ও সান্ত্বনা পেতে পারে। এতেই আসে নিরাপত্তা-বোধ (a sense of security)। এই নিরাপত্তা-বোধের প্রধান উৎস হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর প্রণয়, সন্তানের ভালবাসা, বন্ধুজনের প্রীতি, সহকর্মীদের প্রশংসা ও শ্রদ্ধা, সমাজজীবনে আনন্দময় দান-প্রতিদান।[১৮]

যৌবনপ্রাপ্ত ব্যক্তির মানসিক সুস্থতার একটি প্রধান ভিত্তি হচ্ছে সুখী ও আনন্দময় বিবাহিত জীবন। বিবাহিত জীবনের সাফল্য ব্যক্তিগত ও অবস্থাগত বহু কারণের ওপর নির্ভর করে। পারস্পরিক আনন্দময় যৌন সম্বন্ধের ওপর বিবাহিত জীবনের সুখ ও শান্তি অনেকখানি নির্ভর করে। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে গভীর ভালবাসা, বিশ্বাস, বোঝাবুঝি, এবং শ্রদ্ধা না থাকলে দৈহিক মিলনও আকর্ষণীয় হয় না। দৈহিক সম্ভোগই যে বিবাহের ভিত্তি, তা অল্পদিনেই অবসাদ ও অশ্রদ্ধার সৃষ্টি করে। মানবমনের এ একটা গভীর সংস্কার যে, যৌনক্রিয়াকে সে কখনো অবিমিশ্র শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারে না, এর তীব্র উন্মাদনা ও আনন্দ সত্ত্বেও এ ক্রিয়া মানুষের চোখে লজ্জাকর। তাই যার সঙ্গে যৌনসঙ্গম ঘটেছে, তাকে মানুষ উঁচু শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারে না। তাই ইন্দ্রিয়চালনা বিষয়ে সংযম ও সুবিবেচনা ব্যতিরেকে বিবাহবন্ধন শিথিল এবং অভ্যাসদ্বারা তা মলিন ও আকর্ষণহীন হয়ে দাঁড়ায়। স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকেই অন্যের বৈশিষ্ট্য, এমন কি তার ত্রুটি ও দুর্বলতাকে যদি শ্রদ্ধা ও ক্ষমার চোখে না দেখে, যদি নিজের প্রাপ্য ও দাবিকেই বড় করে তোলে, তবে সে বিবাহ সুখের হতে পারে না। এ সম্বন্ধ, বিশেষ করেই দেওয়া-নেওয়ার ও নিবিড় বোঝা-বুঝির সম্বন্ধ। স্বামী-স্ত্রীর পার্থক্য সত্ত্বেও, সন্তানে

১৮ The adult person's security is tied with his contentments and satisfactions. The simple pleasures and delights of his home, his family, his children; the reassuring contacts with his work associates; the stimulation of his job, his work-hour activities, his interests and hobbies, the pleasurableness of his identifications with social groups, the pride in his accomplishments, the flattering sureness of his friends' loyalty and understanding—these are the foundations of a person's security. Averill & Kempf—Psychology Applied to Nursing, p. 15

এসে তাদের আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষার সহজ ও স্বাভাবিক সামঞ্জস্য ঘটে। তা ছাড়াও, বিবাহ সফল হতে হলে, যত বেশী বিষয়ে স্বামী-স্ত্রীর সাধারণ ঔৎসুক্য ও আগ্রহ থাকে ততই মঙ্গল। বিবাহবন্ধনে নর-নারী একটি নতুন সংসারের সূচনা করল, গড়ে তুলল একটি নতুন ও স্বতন্ত্র সমাজজীবনের কেন্দ্র। এ সম্বন্ধকে সফল করে তুলতে হলে, স্বামী ও স্ত্রী দুজনেরই পিছু-টান, অতীতের দৃঢ় বন্ধনগুলি কিছুটা শিথিল করে, নতুন দৃঢ়তর বন্ধনের সৃষ্টি করতে হবে। পুরুষ ও নারী দুজনকেই তাদের পিতামাতার ওপর অতীত নির্ভরতার অভ্যাসকে শিথিল করতে হবে। বৌর 'বাপের বাড়ির টান' অতিরিক্ত হলে, অথবা ছেলে 'মায়ের আঁচলধরা' হয়ে থাকলে নানা ব্যাপার নিয়েই খিটিমিটি বাধে এবং অশান্তির সৃষ্টি হয়। অনেক সময় সমাজের বা গৃহের বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গী বিবাহ-সম্বন্ধ অসুন্দর ও অপ্রীতিকর করে তোলার জন্যে দায়ী। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে স্বাভাবিক, পারস্পরিক বিশ্বাসভিত্তিক, আনন্দময়, পাপবোধমুক্ত, দায়িত্বপূর্ণ সম্বন্ধ বলে দুই পক্ষ সহজে গ্রহণ করতে পারলে তবেই দাম্পত্যজীবন সফল ও সার্থক হতে পারে। ঈর্ষা স্বার্থপরতা বিবেচনাহীনতা সন্দেহ বিবাহজীবন বিষময় করে তোলে। এবং মানুষের এই যৌন সম্পর্কটি বিকৃত হলে, তার থেকে বহু মানসিক বিকারেরই উদ্ভব হতে পারে। আধুনিক যুগের সমাজে এটি সবচেয়ে উদ্বেগকর সমস্যা। সুখী বিবাহিত জীবন মানসিক রোগ ও বিকৃতির একটি সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য প্রতিষেধক। মানসিক হাসপাতালের প্রাপ্তযৌবন রোগী বা রোগিনীদের শতকরা ৮৩ জনই হয় অবিবাহিত, অথবা যাদের বিবাহিত জীবন বিপর্যস্ত। এরোপ্লেন- ও মোটর-চালনা ইত্যাদি দায়িত্বপূর্ণ ও বিপজ্জনক কাজে সুখী বিবাহিত ব্যক্তিরাই অধিকতর সতর্ক, নির্ভরযোগ্য এবং নিপুণ,—এটা দীর্ঘকালব্যাপী বহু ব্যক্তিকে পর্যবেক্ষণ দ্বারাই জানা গেছে।

জীবিকার ক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্যবিধি

সমস্ত বয়োপ্রাপ্ত ব্যক্তির জীবনের অনেকখানি গর্ব, আনন্দ ও উদ্বেগ তার জীবিকাকে কেন্দ্র করে। যেখানে জীবিকা থেকে আয় যথেষ্ট নয়, সেখানে সংসারেও নানা অশান্তি ও দুর্ভাবনা সৃষ্টি হয়। যারা অনেকদিন ধরে বেকার অথবা যাদের স্থায়ী আয়ের কোন ব্যবস্থা নেই, অথবা যারা আয়ের স্বল্পতার জন্তে ভদ্র ও স্বচ্ছন্দভাবে পরিবারের স্বাভাবিক আর্থিক দাবি মেটাতে পারে

না, তাদের মনের ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে, তাদের মর্যাদা ও পৌরুষ ক্ষুণ্ণ হয় এবং তারা সমাজব্যবস্থার প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে ওঠে। যেখানে ব্যক্তির এই আর্থিক দুরবস্থার জন্যে তার নিজের বিদ্যা বুদ্ধি নিপুণতা ও ক্ষমতার অভাবই দায়ী, সেখানেও মানুষ সহজে তা মেনে নিতে পারে না। অনেক সময় প্রতিকূল অবস্থা এবং উপযুক্ত সুযোগের অভাবও যে এর জন্যে দায়ী হতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ সব ক্ষেত্রেও ব্যক্তির মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী তিক্ত হওয়ারই সম্ভাবনা। এ সব অবস্থায় মনের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকা সম্ভব নয়।

যেখানে জীবিকা থেকে আয় যথেষ্ট, সেখানে অন্য কারণে মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। অধিকাংশ মানুষের পক্ষেই কর্মস্থল আনন্দের উৎস নয়। কাজ মানুষ করে—কর্তব্যের খাতিরে, পেটের দায়ে, কিন্তু কাজের মধ্যে তার আনন্দ নেই। কাজটি তার আনন্দময় ও উৎসাহপূর্ণ আত্ম-উন্মোচনের উপায় নয়। তাই অধিকাংশ মানুষই কাজে ফাঁকি দিতে পারলেই খুশী হয়। এবং কাজ ফাঁকি দেবার সমর্থনে নানা যুক্তি (rationalisation) সে মনের মধ্যে খাড়া করে। এটা সুস্থ মানসিকতার লক্ষণ নয়। আমরা দেখেছি যে যারা বায়ুরোগী (Neurotic) তারা অপ্রীতিকর কাজ এড়াবার অজুহাত হিসাবে নানা রোগ সৃষ্টি করে। যারা মানসিক রুগ্ণ, কর্মক্ষেত্রে তারা কখনও কর্মকুশলী হয়ে উঠতে পারে না। তাতে ব্যক্তি ও সমাজ দুইয়েরই ক্ষতি।

পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির সুখ ও আনন্দের আর একটি উৎস হচ্ছে সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠা। যেখানে মানুষ সম্মান পায়, শ্রদ্ধা পায়, বিশ্বাস ও ভালবাসা পায় সেখানে সে সহজে ফুলের মতো বিকশিত হয়ে উঠতে পারে। যেখানে মনের এই সহজ আনন্দ আছে, সেখানেই মনের সুস্থতা। তবে সামাজিক প্রতিষ্ঠা তো আপনিই আসে না। একে অর্জন করতে হয়। যারা মানসিক অসুস্থ, তারা কেবলই অভিযোগ করে, তাদের গুণের আদর হল না। তারা কেবলই অপরকে সন্দেহ করে, পরকে নিন্দা করে, কিন্তু প্রকৃত সেবা দ্বারা, গুণ অর্জন দ্বারা, পরিশ্রম দ্বারা সমাজে নিজের আসনটি করে নিতে অগ্রসর হয় না।

সমাজের সঙ্গে দান-প্রতিদানের সম্বন্ধ ছাড়াও ব্যক্তির নিজস্ব ব্যক্তিগত জীবন আছে—নিজের কাছে নিজের কর্তব্য আছে, আত্ম-উন্মোচনের দায় আছে। সে দায় হচ্ছে 'আমার পরাণ যাহা চায়', সেই আকাঙ্ক্ষা, সেই সৃজনী-শক্তির আনন্দের খেলা। সেই জন্যে নিজ কবিকল্পনা ও সৃষ্টিকে মুক্তি দেবার একটি খেলাঘর চাই। একেই বলে 'হবি' (hobby)। এখানে কোন

সাংসারিক প্রয়োজনের দাবি নেই। এখানে ব্যক্তির দায় তার নিজের কাছেই। ব্যস্ত বিরক্ত বিব্রত উদ্বিগ্ন মানুষের কাছে 'হবি' হচ্ছে সব চেয়ে প্রাণপ্রদ ও স্বাদু ভেষজ।

সর্বশেষ ও সর্বোপরি মানসিক সুস্থতার জন্যে প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে প্রয়োজন একটি সবল, সুস্থ, সুসঙ্গত জীবনদর্শন—জগৎ ও জীবন -সম্বন্ধে এবং বিশ্বজগতে ব্যক্তির অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে একটি চলমান ও উৎসাহদ্যোতক সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী (a dynamic and satisfying total view)।

প্রকৃতি ও মানুষ, মানুষ ও সমাজ, ব্যক্তির নিজ বুদ্ধি ও ইচ্ছার, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই সমস্তের সমন্বয় মানসিক স্বাস্থ্যের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ভিত্তি।[১৯]

বৃদ্ধ বয়সের স্বাস্থ্যবিধি

বৃদ্ধবয়স দেহের দিক থেকে যেমন শক্তি-হারক, মনের দিক থেকেও কোন কোন কারণে উদ্বেগকর ও অশান্তিকর। বৃদ্ধবয়সে ইন্দ্রিয় ও পেশীর সতেজতা ও সক্রিয়তা যেমন হ্রাস পায়, তেমনি স্মৃতি- এবং ধারণা-শক্তিও ক্ষীণ হয়। অথচ দীর্ঘকাল পুনঃপুনঃ করণের দ্বারা আহার মৈথুন বিশ্রাম ইত্যাদি বিষয়ে কতকগুলি অভ্যাস দৃঢ়বদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বার্ধক্যে এই প্রাচীন অভ্যাস-গুলির পরিবর্তন নিতান্ত প্রয়োজন। এই সত্য কথাটি বৃদ্ধ মানুষেরা সহজে স্বীকার করে, তদনুযায়ী জীবনযাত্রা সংশোধন করেন না। অর্থাৎ তাঁরা যে বৃদ্ধ হয়েছেন, ইন্দ্রিয়াদি শিথিল হয়েছে, পূর্বের মতো সব কাজ যে তাঁরা করতে পারেন না, বা সব কাজ যে তাঁদের মানায় না এটা তাঁরা ভুলে যান। শরীর- ও ইন্দ্রিয়-চর্চা বিষয়ে সংযম যে এখন অত্যাবশ্যক, এই সহজ সত্যটি নিজেরা স্বীকার করে নিয়ে, জীবনধারা পরিবর্তন করতে স্বেচ্ছায় ইচ্ছুক হন না, আবার বাইরের থেকে কেউ (যেমন পুত্র ও পুত্রবধূ) এ বিষয়ে শাসন করতে গেলে তাঁদের অভিমানে প্রবল আঘাত লাগে। এ বয়সে রোগ-প্রতিরোধ করা

১৯ The adult needs a dynamic philosophy of life to inspire him—a system of values and beliefs that attracts him to this world, that makes him accept the challenge of life, that makes him enjoy it and live it fully. The ideals should be spiritually uplifting, socially satisfying and worth pursuing. Bhatia & Craig—Elements of Psychology and Mental Health, p. 355

বিষয়ে দেহের যে স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকে তা হ্রাস হয়ে যায়, এবং বৃদ্ধ মানুষদের দেহের নানা ছোট-বড় রোগ ও ব্যথা বেদনা অস্বস্তি লেগেই থাকে। তা ছাড়া আসন্ন মৃত্যুর চিন্তা তাঁদের উদ্বিগ্ন করে তোলে। অধিকাংশ মানুষই মৃত্যু যে অবশ্যম্ভাবী ও অপ্রতিরোধ্য এই প্রাচীনতম নিদারুণ সত্যকে শান্তভাবে গ্রহণ করে নিতে পারেন না—কিমাশ্চর্যম্ অতঃপরম্।

বৃদ্ধবয়সের অন্য একটি অশান্তির উৎস হচ্ছে ক্রমশ পরিবারে নিজ কর্তৃত্বের সঙ্কোচ—কোথাও বা কর্তৃত্বের সম্পূর্ণ লোপ। বৃদ্ধবয়সে অবসর গ্রহণ করলে, তখন ব্যক্তির অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আর থাকে না। তখন ব্যক্তিকে নিজ গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যেও পুত্রবধূ বা অন্য কারো ওপর নির্ভর করতে হয়। অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব যার হাতে থাকে, সংসারের কর্তৃত্বও তারই হাতে। এতদিন যে ব্যক্তি ছিলেন পরিবারের কর্তা, যাঁর ইচ্ছায় পরিবার চালিত হত, বৃদ্ধ হলে এবং পরনির্ভর হলে, সে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব তাঁর হস্তচ্যুত হয় এবং অনেক সময় এ অবস্থা সুখকর নয়,—এমন কি, কোন কোন ক্ষেত্রে সম্মানজনকও নয়। এ অবস্থাকে সহজে শান্তভাবে গ্রহণ করতে পারেন না বলেই ব্যক্তি বিমর্ষ ও অক্ষম ক্ষোভের দুঃখে পীড়িত হন। যাদের ওপর তিনি নির্ভর করতে বাধ্য তাদের প্রতি ক্ষোভপ্রকাশ করবারও উপায় নেই। তাই বৃদ্ধ মানুষদের মনের মধ্যে অশান্তির জট পাকিয়ে ওঠে, প্রিয় পরিজনদের সঙ্গে তাঁর মানসিক কিছুটা অপ্রীতি ও বিচ্ছেদ ঘটে যায়।

অন্য একটি কারণ হচ্ছে—যতদিন তিনি কাজে ছিলেন, ততদিন কর্মস্থলে তাঁর একটা সম্মান ও আশ্রয় ছিল। হঠাৎ সে বন্ধন ছিন্ন হলে এক শূন্যতার সৃষ্টি হয় যার সঙ্গে নিজেকে তিনি মানিয়ে নিতে পারেন না। ল্যাম্-এর 'সুপার-অ্যানুয়েটেড ম্যান্'-এ এ-অবস্থার চমৎকার বর্ণনা আছে। অবসর-গ্রহণ করবার আগেই প্রত্যেক ব্যক্তির সেই ভবিষ্যৎ শূন্যতা কি করে পূর্ণ করবেন সে সম্বন্ধে সুচিন্তিত মানসিক প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন। তাঁর শক্তি অনুযায়ী, অনুভূতির দিক দিয়ে তৃপ্তিকর কোন রচনাত্মক কাজ বেছে নিতে পারলে ভালো হয়। যাদের তেমন কোন আগ্রহবস্তু (hobby) নেই, তাঁরা ধর্মচর্চা, তীর্থভ্রমণ ইত্যাদি করেই সময় কাটাবার চেষ্টা করেন।

পাশ্চাত্ত্য দেশে বৃদ্ধদের সমস্যা আমাদের দেশের তুলনায় অনেক বেশী। সে দেশের ছেলেরা বিয়ের পর নিজেরা আলাদা বাড়ী করে, বাপ-মার কাছ থেকে পৃথক হয়ে যায়। তার পর থেকে বাপমায়ের সঙ্গে এদের সম্বন্ধ খুবই

ক্ষীণ হয়। ফলে বুড়ো বাবা-মা ভয়ানক একাকী বোধ করেন। আমাদের দেশে বুড়ো-বুড়ীরা সাধারণত ছেলের সংসারেই থাকেন এবং সংসারে তাঁদের কিছুটা সম্মানের স্থান থাকে। তা ছাড়া বুড়োরা নাতি-নাতনীদের নাড়াচাড়া করে, স্নেহভালবাসার অভাব অনেকটা মেটাতে পারেন। কিন্তু ওদেশে তা হবার উপায় নেই। কারণ, নাতি-নাতনীদের সঙ্গে মেলামেশা করবার সুযোগ কমই হয় এবং ছেলেমেয়েদের লালন-পালন শিক্ষা -ব্যাপারে ঠাকুরদা-ঠাকুরমাদের প্রায় কোন কর্তৃত্ব থাকে না। বৃদ্ধদের পক্ষে এই একাকীত্ব এবং পারিবারিক স্নেহবন্ধনের অভাবই প্রধান সমস্যা। ওদেশে অবশ্য, বুড়ো মানুষদের রাষ্ট্র থেকেই ভরণপোষণের জন্যে মাসোহারা এবং যাদের কেউ নেই তাঁদের 'বৃদ্ধ মানুষদের জন্য সরকারী' আশ্রয়স্থল আছে, সেখানে বুড়োবুড়ীরা নিজেরা মিলে একরকমের সমাজজীবন গড়ে তোলে। আমাদের দেশে অবশ্য তেমন কোন ব্যবস্থা নেই।

• বিধবা বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদের সমস্যা আরো কঠিন। স্বামী বর্তমান থাকলে তবু তাঁদের নির্ভর করবার আপন একজন থাকেন। তাঁরা বাধ্য হয়েই পুত্র-পুত্রবধূর ওপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে বাধ্য হন এবং অতীতে যদি তিনি নতুন বিবাহিতা পুত্রবধূর প্রতি নির্দয় ব্যবহার করে থাকেন তবে বৃদ্ধবয়সে পুত্রবধূও তার শোধ তোলে। আমাদের দেশে বৃদ্ধা বিধবারা সংসারে বিনা বেতনের সেবাকারী একজন পরিচারিকা হিসাবেই স্থান পান। অনেক সময়ই এটা তাঁদের পক্ষে খুব সুখ ও সম্মানের অবস্থা নয়।

বৃদ্ধ বয়সের স্বাস্থ্যবিধি

ওপরের আলোচনা থেকেই বোঝা যাবে বার্ধক্যের বিভিন্ন সমস্যার সুসমাধানের জন্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় স্মরণ রাখা প্রয়োজন—

(১) খাদ্য ইত্যাদি -বিষয়ে সংযম-অভ্যাস নিতান্ত প্রয়োজন। লৌহ ও ক্যালসিয়ম (Iron and Calcium) -সমৃদ্ধ খাদ্য তাঁদের স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে আবশ্যক। তাঁদের পক্ষে দুধ ও ফলই সবচেয়ে ভাল খাদ্য।

লঘু এবং নিয়মিত পরিশ্রম, নিদ্রা, সকালে-বিকালে খোলা হাওয়ায় ভ্রমণ, যথেষ্ট বিশ্রাম, কিছু পড়াশুনা এবং যথাসময়ে নিদ্রা -দ্বারা তাঁরা দেহকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ রাখতে পারেন।

(২) বৃদ্ধ বয়সের পক্ষে স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক শক্তির হ্রাসকে, তাঁরা যত সহজে মেনে নিতে পারেন ততই মঙ্গল।

(৩) কর্তৃত্ব ছেড়ে দেওয়ার জন্যে মনকে প্রস্তুত করতে হবে। আঘাত এড়াবার প্রধান উপায়, মনকে ক্রমেই নিরাসক্ত করে তোলা।

(৪) শক্তি ও আগ্রহ-অনুযায়ী কোন কর্মকে (তা সমাজসেবা, ধর্মচর্চা, সাহিত্য-আলোচনা, ছবি আঁকা, বাগান করা যাই হোক না কোন) আশ্রয় করা নিতান্ত প্রয়োজন। বাগানের কাজ স্বাস্থ্যকর, লাভজনক এবং গঠনাত্মক প্রবৃত্তির পরিপোষক।

(৫) সমস্ত মানুষের মতো বৃদ্ধদেরও নিরাপত্তাবোধ প্রয়োজন। এর জন্যে কিছুটা আর্থিক সঙ্গতি ও স্বাধীনতা থাকলে ভাল হয়। তা ছাড়া প্রয়োজন সন্তান-সন্ততিদের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ভালবাসা এবং শিশু নাতি-নাতনীদের প্রীতিপূর্ণ সঙ্গ।

(৬) তাঁদের জীবনের শূন্যতা ও একাকীত্ববোধ যতটা সম্ভব স্নেহ, প্রীতি ও সামাজিক ক্রিয়ার মধ্যদিয়ে দূর করা যেতে পারে।

(৭) বার্ধক্য সত্ত্বেও তাঁদের জীবনের মূল্য আছে, তাদের মর্যাদা আছে সংসারে তাদের প্রয়োজন আছে, এ বোধটা তাদের মনে সঞ্চার করে দিতে হবে।

(৮) বার্ধক্যের সমস্যাগুলি কিভাবে শান্তভাবে গ্রহণ করা যায় সেজন্যে বৃদ্ধ ব্যক্তিদের কিছুটা শিক্ষারও প্রয়োজন আছে, এই শিক্ষাকে Preventive Geriatrics বলা যায়।

সপ্তদশ অধ্যায়

ব্যতিক্রমের বিপদ

এই পৃথিবীটা সাধারণদের। যাদের আমরা বলি 'দশজন', তারা সাধারণ মানুষ। কাজেই এ পৃথিবীর আইন-কানুন-ব্যবহার সবই সাধারণ মানুষের মাপে, তাদের প্রয়োজন ও রুচি -অনুযায়ী। সেই জন্যে যারা অ-সাধারণ—অর্থাৎ যারা সাধারণের ব্যতিক্রম, তাদের এই সাধারণের সমাজে নিজেদের মানিয়ে নিতে বেগ পেতে হয়। বর্তমান জগৎ সাধারণের জগৎ হলেও সাধারণদের এটুকু বুদ্ধি বা ঔদার্য আছে যে 'ব্যতিক্রম'দেরও এ পৃথিবীতে স্থান আছে, প্রয়োজন আছে, অধিকার আছে—এ সে স্বীকার করে। তাই, বর্তমান সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন মনোবিজ্ঞানী ব্যতিক্রমদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন, তাদের অসুবিধাগুলি বুঝতে চেষ্টা করেন এবং কি করে কতদূর সে অসুবিধাগুলি দূর করা যায়, সে বিষয়ে চিন্তা করেন।

'সাধারণ' কে? তার লক্ষণ কি—আর ব্যতিক্রমই বা কাকে বলব? যদিও এ প্রশ্ন অত্যন্ত সহজ, এমন কি অবান্তর মনে হতে পারে,—তথাপি এর উত্তর সোজা নয়। বাস্তবিকপক্ষে যে উত্তরই দেওয়া যাক না কেন, তার নির্গলিতার্থ দাঁড়ায় এই: 'যে অসাধারণ নয়, সেই সাধারণ; আর যে সাধারণ নয়, সেই ব্যতিক্রম।' বাস্তবিক পক্ষে 'সাধারণ'কে এর একটি মনগড়া সংজ্ঞাই কেবল দেওয়া যায়। জানি, আমাদের এ সংজ্ঞা চক্রক (Circular definition) -দোষযুক্ত। তথাপি আলোচনা আরম্ভ করবার মতো একটা মোটামুটি ধারণা নেওয়া যাক। 'সাধারণ' তাকেই বলি, যার সমস্ত ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বিদ্যমান, সক্রিয় ও মোটামুটি অবিকৃত; যার বুদ্ধি ও অন্যান্য মানস এবং সামাজিক গুণ ও বৃত্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ নয়, নিকৃষ্টও নয়,—যে তার দোষগুণ শক্তি আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যম নিয়ে অন্য দশজনের সঙ্গে মোটামুটি ভাবে মানিয়ে চলতে পারে, বা চলে থাকে। যাদের কোন ইন্দ্রিয় বিকল, যাদের কোন অঙ্গহানি ঘটেছে, যারা বুদ্ধিবৃত্তি বা অন্যান্য মানসিক ও সামাজিক গুণে ন্যূন অথবা বিশেষ উৎকর্ষসম্পন্ন, তাদেরই বলব অ-সাধারণ বা ব্যতিক্রম।

বাস্তবিকপক্ষে সম্পূর্ণ 'স্বাভাবিক' বা 'সাধারণ' বলে কেউ নেই।

প্রত্যেক মানুষই কোন না কোন ইন্দ্রিয়ের রোগে কখনো না কখনো ভোগে, কোন না কোন দোষে সে ন্যূন বা উৎকৃষ্ট। সুতরাং 'সাধারণ' মানুষ একটি কাল্পনিক আদর্শ। আগেই বলেছি, এ একটি মন-গড়া ও কাজ-চলা গোছের ধারণা।

যারা ব্যতিক্রম, তাদের সকলের সমস্যা এক নয়। যে বিষয়ে তারা ব্যতিক্রম সেখানেই তাদের অসুবিধা ও সমস্যা। তাদের ব্যতিক্রমের প্রকৃতি কি, দশজনের সঙ্গে একত্র চলতে কেন তারা অসুবিধা বোধ করে, এ না জানলে প্রতিকারের উপায়নির্দেশ করা সম্ভব হয় না। মোটামুটি ভাবে বলা যায় তাদের অক্ষমতা বা অতিরিক্ত ক্ষমতা অন্যান্যের কাছে উপহাস বা ঈর্ষার কারণ হয় এবং সমাজের এই প্রতিকূল ভাব তাদেরও বিদ্বিষ্ট করে তোলে। তাদের ব্যতিক্রমের প্রকৃতি -অনুযায়ী তাদের শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। তাদের ত্রুটি ও অক্ষমতা সম্বন্ধে তারা সচেতন, এবং অনেক সময়েই তাই তারা অন্যদের সাথে স্বাভাবিক ভাবে মিলতে পারে না। তাদের শিক্ষার প্রধান কাজই হল তাদের 'সহজ' করে তোলা,—যাতে তারা নিজ ব্যতিক্রম শান্তভাবে গ্রহণ করে নিজ শক্তি -অনুযায়ী কর্ম বা জীবিকা বেছে নিতে পারে এবং সমাজে নিজের স্থানটি করে নিয়ে সুখী ও সন্তুষ্ট হতে সে বিষয়ে তাদের সাহায্য করা।

ব্যতিক্রম বহু প্রকারে হতে পারে। সেগুলিকে দৈহিক ও মানসিক এই দুইটি প্রধান দলে ভাগ করা যায়। সমস্ত বৈকল্য বা ব্যতিক্রম আলোচনা সম্ভব নয়। প্রথমত দৈহিক ত্রুটি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

দৈহিক ত্রুটিজনিত সমস্যা (Problems of the physically handicapped)—যারা কোন ইন্দ্রিয় বা অঙ্গ হারিয়েছে তারা দুর্ভাগা। স্বভাবতই তাদের কর্ম ও উপভোগের পরিধি সঙ্কুচিত, তাদের জ্ঞান-আহরণের পথও সুগম নয়। এ দৈহিক ত্রুটি নানা প্রকারের, এবং বৈকল্যের পরিমাণগত প্রভেদও আছে। এই ত্রুটি অত্যন্ত গুরুতর থেকে শুরু করে সামান্য মাত্রও হতে পারে। এ ত্রুটি জন্মগত ও চিকিৎসার অযোগ্য হতে পারে। কোন গুরুতর ব্যাধি বা ছোঁয়াচ (infection), বা দুর্ঘটনা এর কারণ হতে পারে। আবার এ ত্রুটি সাময়িক ও চিকিৎসাযোগ্যও হতে পারে।

বর্তমান কালে চিকিৎসাশাস্ত্র শুধু রোগনিরাময় করেই ক্ষান্ত থাকে না।

যাতে রোগ না হতে পারে, অঙ্গ- বা ইন্দ্রিয়-হানি না ঘটে, সে বিষয়েও এ বিজ্ঞান উপযুক্ত উপদেশ দিয়ে আমাদিগকে সতর্ক করে। এ বিষয়ে ব্যক্তি বিদ্যালয় সমাজ ও রাষ্ট্র পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সচেতন হয়েছেন। যেমন অন্ধতা সম্বন্ধে চিকিৎসকদের অভিমত,—চক্ষুর উপযুক্ত ব্যবহার, স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী কতকগুলি অভ্যাস অনুসরণে (যথা সকালে-বিকালে নির্মল জলে চক্ষু প্রক্ষালন, ময়লা কাপড় বা রুমাল চক্ষু মোছবার জন্যে ব্যবহার না করা, বিনা প্রয়োজনে চশমা ব্যবহার না করা) এবং কতকগুলি সতর্কতা অবলম্বন -দ্বারা (যথা খুব কম আলোতে বই না পড়া, অতিরিক্ত আলো বা উত্তাপ চোখে না লাগানো, চোখ ব্যথা হওয়া মাত্র চোখের বিশ্রাম ইত্যাদি) কিছুটা পরিমাণে চক্ষুর ত্রুটি নিবারিত হতে পারে। অগ্রসর রাষ্ট্রসমূহে বিদ্যালয়ের ক্লাবঘরগুলি যাতে উপযুক্ত আলোকিত, হল এবং ব্ল্যাকবোর্ড-এর লেখা যাতে সমস্ত ছেলে স্পষ্টভাবে দেখতে পায়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখেন। উন্নত রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় রাস্তা-ঘাট দোকান স্টেশন সু-আলোকিত হয়, ফ্যাক্টরী-গুলিতে কর্মীদের চোখের ওপর যাতে অতিরিক্ত চাপ (eye-strain) না পড়ে, যন্ত্রাদি চালনাকালে যাতে অন্ধকারের জন্যে শ্রমিকরা আহত হতে না পারে, তেমনি আইন প্রণীত হয়।

যাদের অঙ্গ- বা ইন্দ্রিয়-হানির জন্যে দৈহিক ত্রুটি ঘটেছে তারা অন্য সব বিষয়ে সাধারণ সুস্থ মানুষের মতো, এ কথাটি মনে রাখা দরকার। অন্ধ বা বধির কোন ছাত্রের অন্যান্য ছাত্রদের মতোই কতকগুলি সাধারণ ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা প্রয়োজন ও রুচি আছে এবং তাদের স্বাভাবিক বিকাশের জন্যে সুস্থ অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে তারা যাতে সহজে মিশতে, খেলাধুলা-পড়াশুনা করতে পারে, সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। অবশ্য তাদের দৈহিক ত্রুটির জন্যে দৌড়ঝাঁপ বা অন্যান্য যে সব কষ্টসাধ্য কর্মে তাদের ক্ষতি হতে পারে, তা থেকে তাদের বিরত করতে হবে। এ জন্য তাদের মনে দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক। তাই তাদের অভাব তারা অন্য কোন বিকল্প ক্রিয়াদ্বারা কিছুটা পূর্ণ করতে পারে কিনা তা ভেবে দেখে, তেমন কাজের বা খেলার ব্যবস্থা তাদের জন্য করা প্রয়োজন। তাদের দৈহিক ত্রুটির জন্যে গালমন্দ করা বা উপহাস করা নির্বুদ্ধিতাই শুধু নয়, চরম নিষ্ঠুরতাও বটে। তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করা প্রয়োজন এবং তাদের ত্রুটির জন্যে যে সব বিশেষ সাহায্য দরকার তার ব্যবস্থা করতে হবে; কিন্তু তাদের অতিরিক্ত আদর দিয়ে

পরমুখাপেক্ষী করে তুললে ভবিষ্যতে দুঃখ বাড়ানোই হয়। প্রত্যেক ত্রুটি বা বিকৃতির আনুষঙ্গিক মানসিক প্রতিক্রিয়া বা আহত অনুভূতি থাকাই স্বাভাবিক। বিভিন্ন ত্রুটির বেলায় এ অনুভূতি বা প্রক্ষোভ বিভিন্ন হতে পারে। যাই হোক যারা অঙ্গ- বা ইন্দ্রিয়-হীন, তারা অনুভূতি ও আবেগের ক্ষেত্রে যাতে সঙ্গতিলাভ (adjustment) করতে পারে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা পিতামাতা ও শিক্ষকের একটি প্রধান কর্তব্য। অতিরিক্ত মাত্রায় আত্মসচেতন হলে, এরা নিজেদের ও অন্যের দুঃখ বরং বাড়িয়েই তোলে। কিন্তু যারা নিজের ত্রুটি শান্তভাবে মেনে নিয়ে এবং নিজ শক্তি -অনুযায়ী কাজ বেছে নিয়ে অন্যের সঙ্গে মিলেমিশে চলতে পারে, তারা খুব বেশী অসুখী হয় না।

বধির ও প্রায়-বধিরদের সমস্যা (Problems of the deaf or the near-deaf)—বধিরতা জন্মগত হতে পারে। নাক ও গলার রোগ থেকে এ হতে পারে, হাম ডিপথেরিয়া মাম্পস্ ইত্যাদি রোগ থেকে জন্মাতে পারে। কানে খৈল বেশী জমে বা কানপাকা থেকেও বধিরতা দেখা দেয়। জন্মগত কারণে সম্পূর্ণ যারা বধির চিকিৎসা -দ্বারা তাদের আরোগ্যসাধন সুকঠিন। কিন্তু সম্পূর্ণ বধির না হলে, এবং আকস্মিক কারণে হলে এ ত্রুটির চিকিৎসা ও উপশম সম্ভবপর। যারা কানে খাটো, তাঁরা অনেক সময় নিজেদের ত্রুটিটা স্বীকার করতে চান না! বরঞ্চ লোকে তাঁদের কিঞ্চিৎ নির্বোধ ভাবুক তাও ভালো। বাস্তবিক পক্ষে যারা কানে ভালো শোনে না, তাদের মুখে কখনো কখনো নির্বোধ অসহায়ত্বের ভাব ফুটে ওঠে। কাউকে কাউকে বিরক্ত, বিষণ্ণও দেখায়। যখন কেউ তাদের সঙ্গে কথা বলে, তখন তারা তার অঙ্গভঙ্গী, বিশেষ করে মুখের ভাব ও ওষ্ঠাধর-সঙ্কোচন লক্ষ্য করে। এই উপায়ে, যে কথা তারা শুনতে পায় না, তাও অনেকটা আন্দাজ করতে পারে।

পূর্বে যারা কানে খুবই কম শুনত, তারা রবারের নলের দুই মাথায় দুটি ধাতব মুখ লাগিয়ে কথাবার্তা চালাত। বধির লোক একটি কলকের মতো মাথা নিজ কানে লাগিয়ে নিত, অন্য মাথা মুখের কাছে এনে বক্তা কথা বলত। এ যন্ত্রটি খুব সহজ হলেও, এ নিয়ে চলাফেরা অসুবিধাজনক ছিল। বর্তমানে খুব ছোট ইলেকট্রিক ব্যাটারী-সংযুক্ত কানে আটকাবার যন্ত্র বের হয়েছে। তবে এর খরচ যথেষ্ট। সেদিন কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলাম ব্যাটারীহীন, একটি গাবের বীজের মতো ক্ষুদ্র যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে

যা কানে লাগিয়ে সব কথা স্পষ্ট শোনা যায়—যন্ত্রটি প্রায় চোখেই পড়ে না।

যা রা একেবারেই কানে শোনে না, তাদের বিশেষ বিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা না করে উপায় নেই। এদের বিশেষজ্ঞ শিক্ষকগণ হাতের অঙ্গুলি-সঙ্কেত বর্ণমালা (manual alphabet) শিক্ষা দেন, এবং ঠোঁটের নড়াচড়া লক্ষ্য করে কথা বুঝতে (lip reading) শেখান। যে সব ছেলেমেয়েরা কিছু কম শোনে, তারা অন্যান্য সুস্থ শিশুদের সঙ্গে একই বিদ্যালয়েই পাঠাভ্যাস করে। এ এক হিসাবে তাদের সুস্থ মানসিক বিকাশের দিক থেকে ভালো হলেও, এতে সন্দেহ নেই যে তাদের ত্রুটির জন্যে পাঠগ্রহণে তাদের ওপর বেশী চাপ (strain) পড়ে, এবং তারা পিছিয়ে পড়তে পারে। পূর্বেই বলেছি কখনো কখনো শিশুরা নিজের এই শারীরিক ত্রুটি অন্যের নিকট গোপন রাখতে চায়। তাই শিক্ষকের সতর্ক থাকা উচিত। যে ছেলেটি কানে খাটো, তাকে ক্লাসের সামনের বেঞ্চে,—যেখান থেকে শিক্ষকের কথা সব চেয়ে জোরে শোনা যায়, এবং শিক্ষকের মুখ দেখা যায়,—সেখানে বসবার ব্যবস্থা করা উচিত। অন্যান্য ছাত্ররাও যাতে তাকে যথোচিত সাহায্য করে সে বিষয়ে দেখতে হবে। কিন্তু ছাত্রটিকে নিজ ত্রুটি -সম্বন্ধে অতিরিক্ত মাত্রায় সচেতন করা উচিত নয়। উপহাস করা, লজ্জা দেওয়া তো খুবই অনুচিত। তবে অতিরিক্ত দয়া করে পরনির্ভর করাও মোটেই ঠিক নয়।

একেবারে বধির না হলে, জীবিকা অর্জনে এ জাতীয় ব্যক্তিদের খুব বেশী অসুবিধা হবার কথা নয়। যারা বেশী কম শোনে, তাদের পক্ষে গবেষণা বা হিসাব-পরীক্ষার কাজ উপযুক্ত। বধিরের পক্ষে কোলাহলশূন্য পরিবেশে কাজই ভাল। কখনো কখনো বধিরেরা বোবাও হয়। যারা জন্ম থেকেই একেবারেই বধির তাদের মধ্যেই এ দুর্ভাগ্য দেখা যায়। যারা জন্ম থেকে বধির, তারা কথা কইতেও শেখে না, যদিও তাদের কণ্ঠনালী সব সময় অসুস্থ নয়। এ সমস্ত শিশুদের জন্যে মূক-বধির বিদ্যালয়গুলির (Deaf and Dumb School) প্রতিষ্ঠা। এদের শিক্ষার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় এবং বিশেষ প্রণালী অবলম্বনে এদের অনেক কথা বুঝতে এবং কথায় উত্তর দিতে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়। তবে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষদের মতো কর্মক্ষম হওয়া এদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। কাজেই এদের সমস্যা যে কঠিনতর তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

বা প্রায়ান্ধদের সমস্যা (Problems of the blind or the near-blind)—অনেক ক্ষেত্রেই টাইফয়েড্, বসন্ত, হাম, স্কারলেট্ ফিভার ইত্যাদি ব্যাধি অন্ধত্বের কারণ। সিফিলিস্ থেকেও অন্ধত্ব ঘটে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পিতামাতার সিফিলিস্ রোগ-হেতু সন্তান অন্ধ হয়ে জন্মায়। বৃদ্ধ-বয়সে চোখে ছানি পড়ে, দৃষ্টিশক্তিহীনতা জন্মে। উপযুক্ত সময়ে ছানি কাটিয়ে ফেললে দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে। কিন্তু মস্তিষ্কে অর্বুদের (brain tumour) বা চক্ষুস্নায়ুর (eye nerves) শুষ্কতা বা রোগের জন্যে যে অন্ধতা তা দুশ্চিকিৎস্য। আঘাত ও দুর্ঘটনার ফলেও চোখ নষ্ট হতে পারে। অতিরিক্ত কড়া আলো অথবা দেখতে কষ্ট হয় এমন অল্প আলোতে দীর্ঘকাল কাজও অন্ধতার কারণ হতে পারে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সকল কারণ নিবারণ-যোগ্য। যে সব কারণ অন্ধতার জন্যে দায়ী, সেগুলির দূরীকরণেই প্রথম চেষ্টিত হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া দরকার। পিতামাতাদের উচিত শিশুদের চোখ কিছুদিন পর পর ভালো ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করানো। বিদ্যালয়, ফ্যাক্টরী এবং শ্রমিকেরা যেখানে কাজ করে,—বিশেষত রাত্রে—সেখানে আলোর ব্যবস্থা যাতে উপযুক্ত হয়, যাতে চোখের ওপর অতিরিক্ত চাপ না পড়ে, কর্তৃপক্ষের সে ব্যবস্থা অবশ্যই করণীয়।

যাঁরা অন্ধ তাঁরা নিজ অসহায় অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন। যারা সম্পূর্ণ অন্ধ নয়, তাঁরা নিজের অবস্থা অন্যের কাছ থেকে গোপন করে রাখতে সচেষ্ট হন। যে সব শিশু দৃষ্টিশক্তি একেবারে হারায় নি, তারা চোখ পিট্ পিট্ করে (blinking), ভ্রূকুটি করে (frowning), ঘন ঘন চোখ মোছে, মাথা বাঁকা করে অস্বাভাবিকভাবে তাকায়। কখনো কখনো তারা হঠাৎ রেগে ওঠে। কোন ছাত্রের মধ্যে এ রকম লক্ষণ দেখলে, শিক্ষকের উচিত এই ছেলেকে ভালো ডাক্তার দেখানো এবং তার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

শিক্ষার ক্ষেত্রে যারা সম্পূর্ণ অন্ধ, তাদের সম্মুখে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। চক্ষু হচ্ছে ইন্দ্রিয়দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ব্রেল-এর আবিষ্কারের ফলে অন্ধদের বই পড়া শিক্ষাসাপেক্ষ হলেও সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু সাধারণত নিচু ক্লাসের বইই ব্রেল-প্রথায় ছাপা হয়। উচ্চশিক্ষার জন্যে যে সব বই প্রয়োজন, তাদের মধ্যে অতি সামান্যই ব্রেলে ছাপানো পাওয়া যায়। একেবারে অন্ধদের জন্যে বিশেষ বিদ্যালয় আছে। সম্পূর্ণ অন্ধদের পক্ষে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে হলে চক্ষুষ্মান

একজন সঙ্গী নিতান্ত দরকার। এক স্থান হতে অন্যত্র যাতায়াত করতে হলে অন্ধদের অপরের ওপর নির্ভর করতে হয়। কিছুকাল আগে Reader's Digest পত্রিকায় দেখেছি অন্ধ মানুষদের যানবাহন-মুখর নগরের পথঘাট-প্রদর্শক বিশেষ শিক্ষিত কুকুর সঙ্গী পাওয়া যায়।

অন্ধ মানুষদের কাছে বই পড়ে অন্য কাউকে শোনাতে হয়। অন্ধ ব্যক্তিদের স্পর্শণ, শ্রবণ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় কখনো কখনো অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয়। এতে তারা এক ইন্দ্রিয়ের অভাব অন্যভাবে কতকটা পূর্ণ করে নেয়। অন্ধ ব্যক্তিদের জীবিকার পথও বধিরদের মতো একই কারণে অত্যন্ত সঙ্কুচিত। কলকারখানার কাজের পক্ষে এরা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। হাতের কাজে এরা অনেক সময় পটু হয় এবং এ দ্বারা তাদের জীবিকার্জনের ব্যবস্থা হতে পারে। কিন্তু যারা বুদ্ধিজীবি, সাধারণের চেয়ে যাদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণতর, তারা শুধু হাতের কাজের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ তৃপ্তি পেতে পারে না। ডিক্টাফোন যন্ত্রে কাজ এদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং অন্ধদের শিক্ষার কাজে এরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফল হন। অন্ধদের বিশেষ অসুবিধাগুলি কি এ তাঁরা জানেন, এবং চক্ষুষ্মানদের অপেক্ষা এঁরা অন্ধ ছাত্রদের শিক্ষাবিষয়ে অধিকতর উপযোগী।

উদ্যম ও অধ্যবসায় থাকলে অন্ধ ব্যক্তিরাও সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারেন। বহু বিখ্যাত গায়ক ও যন্ত্রশিল্পী এই শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অভাব সত্ত্বেও নিজ সাধনায় মগ্ন আছেন। বিখ্যাত কবি মিলটন্ দৃষ্টিশক্তি হারাবার পর তাঁর শ্রেষ্ঠ কয়টি কবিতা লেখেন। আমাদের দেশে ভক্ত কবি সুরদাস দুর্বার কামপ্রবৃত্তির প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ যৌবনেই নিজ দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করেন। দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে মিলটন-এর মনে কিঞ্চিত ক্ষোভ ছিল, কিন্তু সুরদাসের মনে ছিল পরম প্রশান্তি। নিজ দুর্ভাগ্যকে যাঁরা শান্তভাবে গ্রহণ করতে পারেন, তাঁরা নিজেও দুঃখ কম পান, অন্যকেও দুঃখ কম দেন। কিন্তু ধৈর্য উদ্যম এবং বৈজ্ঞানিক পরিচালনা -দ্বারা ইন্দ্রিয়ের বৈকল্যজনিত সমস্ত বাধা অতিক্রম করে, জীবনে প্রতিষ্ঠালাভের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত হচ্ছেন হেলেন কেলার। তিনি অতি শৈশব থেকেই অন্ধ, বধির ও মূক। কিন্তু কি করে, নিজ ধৈর্য ও চেষ্টায় এবং তার শিক্ষিকা ও সহচরী মিস্ সুলিভ্যান-এর সুপরিচালনায় তিনি লেখাপড়া শিখলেন, তার মনোজ্ঞ কাহিনী তিনি আত্মজীবনীতে বর্ণনা করেছেন। ইন্দ্রিয়-বৈকল্যজনিত দুঃখে যাঁরা দুঃখী, তাঁরা এ জীবন-কাহিনী পাঠে মনে বল পাবেন।

খঞ্জ, বিকলাঙ্গদের সমস্যা (Problems of the lame and the physically handicapped)—যারা ব্যাধি বা দুর্ঘটনার ফলে কোন অঙ্গ হারিয়েছে, অথবা যারা কোন বিকৃত বা বিকল অঙ্গ নিয়ে জন্মেছে, তাদের শিক্ষা ও জীবিকার্জনের পথে নানা বাধা অতিক্রম করতে হয়। অসাবধানতার ফলে এ বিকৃতি বা বিকলতা -বৃদ্ধি পেতে পারে। উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা কমানো যেতে পারে। আমাদের বর্তমান সভ্যতায় যন্ত্রের ব্যবহার ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং এ বিষয়ে সাবধানতার প্রয়োজনও পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে।

যারা এমন বিকলাঙ্গ, তাদের দৈহিক বৈকল্য সত্ত্বেও মানসিক ক্ষমতায় বা বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের দিক থেকে অন্যান্য সুস্থ মানুষের তুলনায় তারা হীন নয়। কখনো কখনো তারা অধিকতর বুদ্ধিসম্পন্ন। পড়াশুনার ব্যাপারে তারা অন্য দশটি সুস্থ সাধারণ ছেলের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে। তবে দৈহিক কোন অঙ্গের বৈকল্য মানসিক বিকাশের পথে বাধাস্বরূপ হবার সম্ভাবনা অবশ্যই থাকে। আমাদের শিক্ষা ব্যাপারটা শুধু মস্তিষ্কের ব্যাপার নয়। একটি সুস্থ সাধারণ ছেলে বা মেয়ে চলাফেরা, অঙ্গপ্রত্যাদির স্বচ্ছন্দ সঞ্চালন ইত্যাদি দেহের নানা ভাবের মধ্য দিয়ে সহজে শিক্ষালাভ করে। যার পা খোঁড়া সে সর্বত্র স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারে না, তাই তার পৃথিবীটা কতকটা সীমাবদ্ধ। তেমনি যার হাত বিকল তার চোখের সামনের জিনিস নাড়াচাড়া করা, লেখা, হাতের কাজ করা ইত্যাদি অনেকখানি শক্ত। বিশেষ করে ডান হাতটি বিকল হলে এ অসুবিধাগুলি অনেক বাড়ে। অবশ্য দেহের আত্মরক্ষার তাগিদেই এসব মানুষ বাঁ হাত দিয়ে এসব কাজ অনেকটা করতে শেখে। তবে তাতে সুস্থ মানুষের মতো সব বিষয়ে নৈপুণ্যলাভ করা নিশ্চয়ই শক্ত। বিকল অঙ্গে ব্যথা-যন্ত্রণা থাকলে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন-যাপনে বাধা হয়ই। সুতরাং এ জাতীয় বিকলাঙ্গ ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ায় পিছিয়ে পড়বে, এ স্বাভাবিক।

যারা বিকলাঙ্গ তাদের মনের ওপরও দৈহিক বৈকল্যজনিত বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। তাদের বিকল অঙ্গ অন্য মানুষের দৃষ্টি-আকর্ষণ করে। তাদের দিকে মানুষ করুণা বা উপহাস বা ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকায়—তাদের সম্বন্ধে কথা বলে। এতে তারা নিজ বৈকল্যের প্রতি অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে ওঠে এবং অস্বস্তি বোধ করে। হয়তো সহপাঠীরা তাদের ঠাট্টা

করে, এবং যেখানে করুণা বা উপহাস করে না, সেখানেও তারা অন্যের বিরূপতা কল্পনা করে তারা ব্যথিত হয়। তাছাড়া শারীরিক বৈকল্যের জন্যে নানা প্রকার খেলাধুলা বা কাজের সহজ আনন্দ হতে তারা কতকাংশে বঞ্চিত, তাই তাদের মনে মিথ্যা আত্মধিক্কার অথবা অপরের প্রতি তীব্র ঘৃণা জন্মাতে পারে। তারা তাই অন্য দশটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে সহজে মিশতে পারে না।

তাদের পিতামাতার মনেও সন্তানের অক্ষমতার জন্যে দুঃখ ও লজ্জাবোধ থাকে। তাঁরা সন্তানের অক্ষমতার জন্যে হয়তো বৃথাই নিজেদের অপরাধী মনে করেন। অথবা সম্পূর্ণ বিপরীত মনোভাবও তাঁদের হতে পারে— তাঁরা অক্ষম সন্তানটির প্রতি বিদ্বিষ্ট হতে পারেন। পিতামাতার মনে যদি অপরাধবোধ জাগে তবে তাঁরা হয়তো অক্ষম সন্তানটিকে অতিরিক্ত মমতা ও আদর দিয়ে ক্ষতিপূরণ করবার চেষ্টা করতে পারেন। এবং সন্তানের প্রতি তাঁদের অচেতন মনে বিদ্বেষ জাগলে, তাঁরা সন্তানটিকে বোঝা বলে মনে করে তাকে অবহেলা করতে পারেন। এ দুই প্রকার মনোভাবই বিকলাঙ্গ মানুষটির সুস্থ মানসিক বিকাশের পরিপন্থী। অতিরিক্ত আদর ও প্রশ্রয় পেলে সে আবদারে ও জেদী হয়ে উঠতে পারে, এবং তার মনে এ ধারণা জন্মাতে পারে যে, যেহেতু সে পঙ্গু বা অক্ষম, সুতরাং সকলের ওপর তার বিশেষ দাবি ও অধিকার আছে। এই মিথ্যা ধারণা তার ভবিষ্যৎ জীবনে বহু দুঃখের কারণ হয়ে উঠতে পারে, এবং পিতামাতার অবর্তমানে তার সহজ জীবনধারণ অসম্ভব হতে পারে।

এ সব অক্ষমদের অন্যান্য সুস্থ ভাইবোনদের সঙ্গে সম্বন্ধও সুস্থ ও সহজ হয় না। তারা এ অক্ষমটিকে আপনাদের ভাই বা বোন বলে স্বীকার করতে লজ্জাবোধ করতে পারে। এ অক্ষমটির জন্যে তাদের খেলাধুলা-আনন্দের ব্যাঘাত হলে তারা বিরক্ত হতে পারে। তাদের পিতামাতা এ অক্ষমটির প্রতি অতিরিক্ত মমতশীল হলে তাদের মনে ঈর্ষা জন্মানো খুবই স্বাভাবিক। এ জন্যে অক্ষম ও বিকলাঙ্গ যারা, তাদের সুস্থ মানসিক বিকাশ বড়ই কঠিন। প্রায়ই এরা অতিরিক্ত অভিমানী, নিষ্ঠুর বা জেদী, সন্দিগ্ধচিত্ত ও অস্থির হয়।

এদের পালন শিক্ষা এবং জীবিকার ব্যবস্থা বিভিন্ন সমস্যাপূর্ণ। এরা যাতে নিজ অক্ষমতার প্রকৃতিটি বুঝতে পারে এবং তা মেনে নিয়ে সহজ ও শান্ত হতে পারে, সে চেষ্টা করাই সর্বতোভাবে কর্তব্য। অন্য দশটি সুস্থ

স্বাভাবিক মানুষ যা পারে তা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, এ তাদের বুঝতে হবে। অনেক সময় এ না বুঝে অথবা না মেনে নিয়ে, যা তাদের দৈহিক সাধ্যের অতীত, অতিরিক্ত প্রয়াসের দ্বারা সে প্রকার কাজ করতে গিয়ে তারা বিপন্ন হতে পারে। আবার অন্যদিকে যতটুকু তাদের ক্ষমতার সীমার মধ্যে তা সুষ্ঠুভাবে করতে তাদের উৎসাহ দেওয়া উচিত। তাদের মনের মধ্যে হীনতাবোধ বা নিরাশা যাতে না আসে, সে চেষ্টা সকলের পক্ষেই করা উচিত। তারা যেন বুঝতে পারে দৈহিক অক্ষমতা সত্ত্বেও পৃথিবীতে তাদের জীবনেরও মূল্য আছে, তাদেরও মোটামুটি সুখী হয়ে বাঁচবার অধিকার আছে।

এদের শিক্ষার জন্যে বিশেষ চিন্তার প্রয়োজন আছে। এদের শারীরিক অক্ষমতার প্রকৃতি -অনুযায়ী এদের শিক্ষাব্যবস্থাও সর্বসাধারণের শিক্ষা থেকে কিছুটা পৃথক হওয়া প্রয়োজন। তবে যতটা সম্ভব অন্য দশটি ছেলের মতো এরা যাতে চলতে পারে, সে চেষ্টা করা উচিত। অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গ থেকে তাদের সম্পূর্ণ বিচ্যুত করে রাখলে, তারা নিজেদের অপাঙক্তেয় ও সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত ও অকর্মণ্য মনে করতে পারে। সহকর্মীদের উপহাস ঘৃণা ইত্যাদি থেকে তাকে সম্পূর্ণ রক্ষা করা সম্ভব নয়, এবং এ দুঃখময় আঘাতের দ্বারা হয়তো সে কিছুটা শক্ত, ও নিজের প্রতি নির্মম হতে পারবে। এর প্রয়োজন আছে। তবে শিক্ষক ও পিতামাতার অবশ্যই কর্তব্য হবে তাকে অযথা নিষ্ঠুর আঘাত থেকে যথাসম্ভব রক্ষা করা। তাদের এই ছেলে বা মেয়েটির সঙ্গে সহজভাবে ব্যবহার করা উচিত। তার প্রতি সতর্ক সহানুভূতিশীল দৃষ্টি থাকবে সত্য, কিন্তু অতিরিক্ত করুণা দেখালে বা অন্যায় প্রশ্রয় দিলে অক্ষম শিশুটির সুস্থ মানসিক বিকাশের পথে বাধাই দেওয়া হয়। ভগবান যে আঘাত দেন, মানুষ তার সম্পূর্ণ প্রতিবিধান কখনই করতে পারে না, এমন কি পিতামাতাও না। তাই তা যথাসম্ভব শান্তভাবে গ্রহণ করা ভিন্ন উপায় নেই।

এদের জীবিকার ক্ষেত্র স্বভাবতই সঙ্কুচিত। যেখানে দৈহিক বল ও দ্রুত অঙ্গসঞ্চালন প্রয়োজন সে সব কাজ এই পঙ্গু বা বিকলাঙ্গের দ্বারা সম্ভব নয়। কিন্তু যে সব কাজে দৌড়ঝাঁপ করবার প্রয়োজন নেই,—যে সব কাজ মোটামুটি ঘরে বসে করা যায়, তাতে এসব মানুষ সাফল্য-অর্জন করতে পারে। পড়াশোনার কাজে এদের বেশী অসুবিধা হবার কথা নয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় (যে সব ক্ষেত্রে অত্যন্ত জটিল ও বিপজ্জনক যন্ত্রপাতি ব্যবহার প্রয়োজন হয় না) অথবা সাহিত্য-চর্চায় বিকলাঙ্গ মানুষের যশ ও কৃতিত্ব-অর্জন সম্পূর্ণ

অজানিত নয়। সকলের থেকে বড় কথা, এদের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন অসাধারণ সাহস ও দৃঢ় মনোবল। বিকলাঙ্গদের জন্য বিশেষ শিক্ষা এবং জীবিকা-উপার্জন-ব্যাপারে নানাভাবে সহায়তার ব্যবস্থা অগ্রসর দেশগুলিতে আছে। আমাদের দেশে এ সব ব্যবস্থা খুব বেশী নেই। এখানে বিকলাঙ্গ ব্যক্তিকে নিজের বা আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের চেষ্টায়ই নিজ গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে হয়। এমন হৃদয়হীন অমানুষও আমাদের দেশে আছে যারা এই রকম হতভাগ্যদের দিয়ে ভিক্ষা করিয়ে তার ভাগ নিয়ে থাকে।

দিল্লীতে বিকল ও অবশাঙ্গদের বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে চিকিৎসার (Occupational therapy) ব্যবস্থা আছে। এতে বহু পঙ্গু, বিকলাঙ্গ ও অকর্মণ্য ব্যক্তি জীবনে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পাচ্ছে।

বাক্য-উচ্চারণ-ব্যাপারে ত্রুটি (Problems of those who have speech defects)—তোতলামী, অস্পষ্ট উচ্চারণ, স্বরভঙ্গ, শিশুর মতো আধো আধো কথা ইত্যাদি দোষগুলি খুব গুরুতর না হলেও ব্যক্তির সাফল্য ও তার সুস্থ সম্পূর্ণ বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করে। স্বরযন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন না কোন অংশের ত্রুটিপূর্ণ গঠন, অথবা কোন রোগ এসবের জন্য দায়ী হতে পারে। কোন কোন ত্রুটি জন্মগত ও বংশগত হতে পারে, আকস্মিকও হতে পারে। কোন কোন ব্যক্তির জন্মাবধি ওপরের ঠোঁট কাটা (harelipped), তালু বিভক্ত (cleft palate), জিহ্বা ভারী, কণ্ঠনালী রুগ্ণ হতে পারে এবং এ সব যে কোন কারণের জন্যেই তোতলামি বা উচ্চারণে অস্পষ্টতা আসতে পারে। সামনের দাঁতের ফাঁক বেশী হলে অথবা দাঁতের অন্য দোষও এজন্যে দায়ী হতে পারে। এর মধ্যে কোন কোন ত্রুটি শিশুকালেই অস্ত্রোপচার বা অন্য চিকিৎসার দ্বারা সংশোধিত হতে পারে। অনেক সময় মনে করা হয় জিহ্বা বেশী ভারী হলে তার জন্য তোতলামী দেখা দেয়। কিংবদন্তী আছে, গ্রীসদেশের শ্রেষ্ঠ বাগ্মী ডেমস্থিনিস্ বাল্যকালে অত্যন্ত তোতলা ছিলেন। এজন্য তিনি জিহ্বার ওপরে একটি ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড স্থাপন করে নদীর পারে গিয়ে বক্তৃতা দেওয়া অভ্যাস করতেন। তোতলা শিশুদের শতকরা নব্বই জন বা আরো বেশী, বিনা চিকিৎসাই আপনা থেকেই সেরে যায়। মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের মধ্যে তোতলামী বেশী দেখা যায়। বাক্য-উচ্চারণের সমস্ত ত্রুটিই চিকিৎসার দ্বারা সংশোধনযোগ্য নয়। মস্তিষ্কের বাক্য-উচ্চারণ-কেন্দ্রে কোন আঘাত বা রোগের জন্য উচ্চারণে ত্রুটি দেখা দিলে তার চিকিৎসা দুঃসাধ্য।

কিন্তু মনোবিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান করে দেখিয়েছেন এসব ত্রুটির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন না কোন মনস্তাত্ত্বিক কারণও বর্তমান থাকে। বড়দের অনুকরণ করে শিশু ভাষাশিক্ষা করে। যদি পিতামাতা, শিক্ষক, আত্মীয়-গুরুজনদের উচ্চারণ খারাপ হয় তবে তাদের দেখাদেখি শিশুদেরও খারাপ উচ্চারণের অভ্যাস দাঁড়িয়ে যায়। শিশুদের আধো-আধো উচ্চারণ শুনতে খুব আমোদ লাগে। সেজন্যে শিশুদের এই অস্পষ্ট উচ্চারণকে আমরা প্রশ্রয় দিই এবং অনেক সময় তাতে উৎসাহই দিই। শিশুর আধো-আধো উচ্চারণ অবশ্যই তার বাগযন্ত্রের অপরিণত বিকাশের ফল। তাই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবতই এ অস্পষ্ট উচ্চারণের ত্রুটি সেরে যায়। কিন্তু শিশুদের এই অস্পষ্ট উচ্চারণে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিলে বড় হয়েও হয়তো তাদের ন্যাকা-ন্যাকা উচ্চারণের অভ্যাস দূর হয় না। শুনতে পাই উঁচু ঘরের মেয়েদের মধ্যে এই আধো আধো শিশুসুলভ উচ্চারণ (baby-talk) নাকি কখনো কখনো ফ্যাসান বলেই গণ্য হয়।

শিশু আট-দশ বছরের হলেই তার স্পষ্ট উচ্চারণের অভ্যাস জন্মায়। তোতলামি বা উচ্চারণের ত্রুটি অন্যের বিরূপ দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং তাতে তারা নিজেদের ত্রুটি সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে ওঠে, ফলে তাদের তোতলামি বা উচ্চারণের বিশেষ ত্রুটিটি বরং বেড়েই যায়। শিক্ষক এ জন্য বেশী ধমকধামক করলে সে নিজেকে বিষম অসহায় বোধ করে এবং আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। এতে সে লেখাপড়ায় পিছিয়ে যেতে পারে এবং অন্য বিষয়েও তার উৎসাহ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বন্ধুবান্ধব বা সঙ্গীসাথীরা তাকে বেশী খ্যাপালে তার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হয়, তার ফলে সে তাদের সঙ্গত্যাগ করে 'কুনো' হয়ে যেতে পারে অথবা সংযম হারিয়ে মারধর করতে (aggression) উদ্যত হতে পারে, বদমেজাজী ও খিট্‌খিটে হয়ে উঠতে পারে।

শিশুর অনুভূতির জীবন শান্ত, স্নিগ্ধ, উৎসাহ ও সহানুভূতিপূর্ণ হলে এ ত্রুটিগুলি কমই দেখা যায়। কিন্তু যেখানে শিশু নিজেকে অসহায় ও বিপন্ন -বোধ করে, সেখানে তার ক্ষুদ্র শক্তি তার অনুভূতির তীব্রতাকে বশে রাখতে পারে না। তখন তোতলামি বা উচ্চারণের ত্রুটির মধ্য দিয়ে তার অস্থির মানসিক সংঘাত আত্মপ্রকাশলাভ করে। এ দেখা যায়, যে ছেলেরা ভীরু, অভিমানী, আত্ম-সচেতন, তাদের মধ্যেই তোতলার সংখ্যা বেশী। ভয় পেলে খেপে গেলে, ঘাবড়ে গেলে, তোতলামী বাড়ে। ডাঃ স্পক্‌ (Dr B. Spock)

-এর মতে ছোট অল্পবয়স্ক শিশু যখন কিছু কিছু কথা শিখেছে অথচ সব মনের ভাব প্রকাশের পক্ষে তার ভাষার পুঁজি যথেষ্ট নয়, তখন তার যে আকুলি-বিকুলি তা অনেক সময় তার তোতলামির কারণ। তার প্রাপ্য ভালবাসা হতে বঞ্চিত হয়েছে এমন অশান্তি বা ঈর্ষাও শিশুর তোতলামী -রূপে দেখা দিতে পারে। যেদিন তার মা হাসপাতাল থেকে আর একটি ছোট নতুন বোনকে নিয়ে বাড়ী এলেন, সেদিন একটি শিশুর তোতলামি শুরু হল। আর একটি শিশুর বেলায় দেখা গেল, বাবা বাড়ীতে ভয়ানক রেগে খুব ধমক-ধামক করছেন, তাতে ভীষণ ভয় পেয়ে সে তোতলাতে আরম্ভ করল। মা হয়তো খুকুর বাহাদুরী দেখাবার জন্য একদল অতিথির সামনে সদ্য শেখা কবিতা আবৃত্তির জন্যে দাঁড় করিয়ে দিলেন, তার পরই শুরু হল খুকুর তোতলামি। অনেক মনোবিজ্ঞানীর মতে বেঁয়ে বা ন্যাটা ছেলেমেয়েদের জোর করে ডান হাতে কাজ করাতে চেষ্টা করলে তোতলামি দেখা যায়। অনেক মনে করেন ন্যাটা হওয়ারই একটা কারণ, শিশুর জীবনে মানসিক অশান্তি বা স্নেহের অভাব।

যদিও এটা খুব মারাত্মক দোষ নয়, তথাপি শিশুর তোতলামির লক্ষণ দেখা দিলে পিতামাতা ও শিক্ষকের সতর্ক হওয়া উচিত। শারীরিক ও চিকিৎসা-যোগ্য কারণে এ সব ত্রুটি হয়ে থাকলে, অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া দরকার। সর্বক্ষেত্রেই শিশুর অনুভূতির জীবনে অশান্তি, উদ্বেগ ও উত্তেজনার কারণ অনুসন্ধান করে তা দূর করা প্রয়োজন। পিতামাতা, শিক্ষক ভাইবোন বন্ধুদের কাছে স্বাভাবিক স্নেহ-ভালবাসা পেলে এসব ত্রুটি সহজেই সেরে যেতে পারে। কিন্তু বাপ-মা এর জন্যে অতিরিক্ত চিন্তা-ভাবনা করলে তার প্রতিক্রিয়াও শিশুর মনের ওপর ভালো হয় না। শিশুর সঙ্গে সহজ স্বাভাবিক ব্যবহার করাই দরকার। তার ত্রুটির জন্যে অতিরিক্ত দয়া দেখালেও শিশু মনে মনে বিরক্ত হয় বা ভয় পেয়ে যায়। শিশুর দেহ-মনের সব বৈকল্যের চিকিৎসার বেলায়ই পিতা-মাতা ও শিক্ষকের একথা স্মরণ রাখা ভালো, যে স্বচ্ছ-বুদ্ধি-মার্জিত ও সহজ স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসাই শিশুর শিক্ষার শ্রেষ্ঠ উপাদান।

ব্যতিক্রমের বিপদ—মানসিক

মানসিক শক্তির উৎকর্ষ-, ন্যূনতা- বা বিকৃতি-জনিত সমস্যা

ইতিপূর্বে আমরা ইন্দ্রিয়াদির স্বাভাবিক ক্ষমতার দিক দিয়ে যারা ব্যতিক্রম—শিক্ষা ও জীবিকার ক্ষেত্রে, তাদের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এবার আমরা আলোচনা করব—মানসিক ক্ষমতার দিক থেকে যারা ব্যতিক্রম তাদের সম্পর্কে।

সমস্ত রকম মানসিক ক্ষমতা বৈজ্ঞানিকভাবে পরিমাপ করবার উপায় এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। তবে স্বাভাবিক জীবনযাত্রানির্বাহ ও জ্ঞান-আহরণ—এ দুয়ের জন্যে প্রয়োজন যে মানসিক ক্ষমতা,—যাকে আমরা বলি বুদ্ধি,—তার তারতম্য-বিচারের বৈজ্ঞানিক উপায় নির্ণীত হয়েছে। বুদ্ধি যাদের অতিরিক্ত বা বুদ্ধি খুব কম, অথবা যাদের মানসিক শক্তির বৈকল্য ঘটেছে, তাদের সম্বন্ধে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হয়। মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা এ বিষয় নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন।

বুদ্ধি অতিরিক্ত বা ন্যূন বা বিকৃত—তা কি করে বোঝা যায়? এ বিষয়ে সূক্ষ্ম বা গভীর আলোচনার মধ্যে না গিয়ে মোটামুটিভাবে বলা যায়, যে ছেলে বা মেয়ের মানসিক পরিণতি তার বয়সের তুলনায় সমমাত্রায় অগ্রসর হয়েছে, তাকে সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ধরা হয়। যে ছেলের মানসিক বিকাশ বা মানসিক বয়স (Mental Age) ৭, তার বাস্তবিক বয়সও (Chronological Age) যদি ৭ হয়, তবে তার বুদ্ধির মাপ (Intelligence Quotient) হল $\frac{\text{৭ বছর M.A}}{\text{৭ বছর C.A}} = ১\cdot০০$ অথবা দশমিক চিহ্ন বাদ দিলে ১০০। যে ছেলের মানসিক পরিণতি ৯ বছরের ছেলের সমান, অথচ বাস্তবিক বয়স আট, তার বুদ্ধির মাপ হল $\frac{৯}{৮}$—১.১২, অথবা দশমিক বাদ দিয়ে ১১২। অর্থাৎ মানসিক বয়সকে বাস্তবিক বয়স দিয়ে ভাগ করে দশমিক চিহ্ন বাদ দিলে কোন ব্যক্তির বুদ্ধির বৈজ্ঞানিক মাপ (I.Q) পাওয়া যায়। প্রথমে বিনে (Binet) ১৯০৫ সালে মানসিক বয়স মাপবার বৈজ্ঞানিক রীতি আবিষ্কার করেন। তার পরে টারম্যান্ মানসিক বয়সের অঙ্কে বাস্তবিক বয়স সংযুক্ত করে বর্তমানে প্রচলিত বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির মাপক-

(Intelligence Test) -এর প্রচলন করেন। এ থেকে বোঝা যাবে—যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১০০ বা তার কাছাকাছি তাদের সাধারণ বা মাঝারি (Average) বুদ্ধি বলে ধরা হয়। মাঝারী বুদ্ধিমান লোকের সংখ্যা অর্ধেকের বেশী। এবং ক্রমে ক্রমে বুদ্ধির পরিমাণ বেড়ে আমরা পৌছাই প্রতিভাসম্পন্নদের কোঠায়,—যাদের বুদ্ধি ১৪০ বা তারও বেশী। আবার অনুরূপভাবে বুদ্ধির পরিমাণ ক্রমশ কমে কমে আমরা ক্ষীণবুদ্ধি (যাদের I.Q. ৫০ বা আরো কম) অথবা জড়বুদ্ধি বা একেবারে 'হাবা'দের দল পৌছাই (যাদের I.Q. ২৫-এর কম)।

বুদ্ধির ন্যূনতাজনিত সমস্যা—বুদ্ধিতে যারা খাটো, লেখাপড়া বিষয়ে বা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তারা খুব সফল হবে—এমন আশা কম। বর্তমান জগতে প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতা অত্যন্ত প্রবল এবং যারা বুদ্ধিমান ও উদ্যোগী, তারাই সাধারণত সাফল্য-অর্জন করে। কিন্তু এই পৃথিবীতে অধিকাংশ মানুষই সাধারণের দলে (average) এবং তারা মোটামুটিভাবে স্বচ্ছন্দ জীবিকা-অর্জন করে থাকে এবং সমাজে অন্য দশজনের সঙ্গে মিলেমিশে সুখেই জীবনযাপন করে। তাই যাদের বুদ্ধি সাধারণ হতে খুব নিচু স্তরের নয় (I. Q. ৮০ হতে ৭০-এর মধ্যে), তারা খুব উঁচুদরের সাফল্য অর্জন করতে না পারলেও জীবিকা-উপার্জনে অক্ষম হয় না। যে সব যন্ত্রের কাজ খুব বেশী জটিল বা সূক্ষ্ম নয় এমন কাজ (unskilled work), ছোটখাট ব্যবসা (small trades), নিচু স্তরের কেরানীর কাজ ইত্যাদিতে এরা অসফল হয় না। লেখাপড়ার ব্যাপারে অবশ্যই এরা খুব সাফল্য-অর্জন করতে পারে না। যাদের I. Q. ৬০-এর কোঠায়, তারা আরও ক্ষীণবুদ্ধি, যদিও একেবারেই নির্বোধ নয়; এরা মাঝে মাঝে ফেল করে, স্কুলের গণ্ডী সব সময় পার হতে পারে না। এ সমস্ত ছাত্রদের পক্ষে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর শিক্ষা-লাভের প্রয়াস অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পণ্ডশ্রম মাত্র। অবশ্য, এ কথা বলবার উদ্দেশ্য এই নয় যে, যারা স্কুলে বারে বারে ফেল করে, তারা সকলেই বুদ্ধির দিক দিয়ে খাটো। অনেক সময় এ পিছিয়ে পড়ার কারণ অ-স্বাস্থ্য, কোন ইন্দ্রিয় বা অঙ্গের বিশেষ রুগ্ণতা, প্রতিকূল সাংসারিক পরিবেশ, শিক্ষক ও সতীর্থদের প্রীতি ও সহানুভূতির অভাব ইত্যাদি।

যারা বুদ্ধির দিক দিয়ে কিছু খাটো, তারা অন্যদের তুলনায় নিজেদের হীন বিবেচনা করে কিছুটা লজ্জা বোধ করতে (a feeling of inferiority)

পারে। এজন্যে সকলের সঙ্গে এরা স্বচ্ছন্দে মেলামেশা করতে পারে না এবং কিছুটা অসামাজিক প্রকৃতির (unsocial) হয়। কিন্তু এই হীনতাবোধ সম্পূর্ণ বিপরীতভাবেও আত্মপ্রকাশ করতে পারে। নিজেদের হীনতা ঢাকবার জন্য এরা অনেক সময় অতিমাত্রায় বাহাদুরী দেখাতে যায়; নানা বিষয়ে মিথ্যা. বড়াই করে তারা যে কারও চেয়ে ছোট নয়—এ সর্বদা প্রমাণ করতে চায়। এদের বোকামি সহজেই মানুষের কাছে ধরা পড়ে এবং বেশী বাহাদুরী করতে গিয়ে এরা কখনো কখনো বিপদেও পড়ে। বুদ্ধির উপযুক্ত শাসন ও পরিচালনার অভাব থাকাতে এদের অনুভূতির জীবন সুষম নয়। বুদ্ধি-বিবেচনার অভাবে এরা সহজেই প্রবল ও বিচ্ছিন্ন ভাবাবেগ দ্বারা চালিত হয়—কাজেই ধর্মঘট হরতাল ইত্যাদি উত্তেজক ও ধ্বংসাত্মক কার্যে এরা সহজেই আকৃষ্ট হয়। এ সকল ধ্বংসাত্মক কার্যের মধ্য দিয়ে এরা নিজেদের 'শক্তি' জাহির করবার সুযোগ পায়, এতে তাদের মনেও বেশ একটা তৃপ্তি ও ধারণা জন্মে যে 'আমরা সামান্য নই'। এবং অনেক সময় রাজনৈতিক বা বৈপ্লবিক নেতারা এদের দ্বারা কার্য-উদ্ধারের জন্য সাময়িকভাবে এদের পিঠ চাপড়িয়ে উৎসাহিত করেন। এই মিথ্যা বাহাদুরীর পথেই এরা অনেক সময় অসামাজিক অপরাধে (যেমন—ট্রাম পোড়ানো, ঢিল ছোঁড়া, জুয়া খেলা, গুণ্ডামী, চুরি করা, মেয়েদের ইতর ইঙ্গিত করা, রকে বা চায়ের দোকানে বসে অসংযত ভাষায় দেশের নেতাদের গালাগালি করা ইত্যাদি) গভীরভাবে লিপ্ত হয় (delinquency)। বিপদের কথা এই যে, বুদ্ধির অল্পতার জন্যে এরা নিজেদের ব্যবহার বা কাজ যে অন্যায়, তা বিচার করে দেখতে পারে না, কাজেই এ সব অন্যায় কাজের জন্যে তাদের নিজের মনের মধ্যেও কোন অপরাধ-বোধ নেই, কোন অনুশোচনাও নেই। বুদ্ধির অভাবেই এদের ভাবাবেগ অসংযত; তাই ঝোঁকের মাথায় হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হয়ে এরা কাজ করে বসে এবং এজন্য কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ (যেমন—পুলিস বা বিচারক বা হেডমাস্টার) তাদের শাস্তি দিলে তারা কিছুতেই তা শান্তভাবে গ্রহণ করতে পারে না; বরং ভবিষ্যতে এর প্রতিশোধ নেবার জন্যেই মনকে আরো বিদ্বিষ্ট করে রাখে। সে জন্য এ জাতীয় অল্পবুদ্ধি মানুষেরা সমাজের পক্ষে বিপদ। কিন্তু, মূলত এ মানুষগুলি হিংস্র অপরাধী নয়। এদের অনেকের মধ্যেই একটা শিশুসুলভ সরলতা, দৃঢ় মহত্ব, বন্ধুপ্রীতি, আদর্শনিষ্ঠা ইত্যাদি মহৎগুণের বীজ লুক্কায়িত আছে। এদের মনের মধ্যে, চিন্তার মধ্যে, কর্মের মধ্যে খুব জটিলতা

নেই। তাই যাকে তারা নেতা বলে মানে, তার কথায় এরা প্রাণবিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। এরা যুদ্ধের সময় দেশরক্ষার জন্যে সর্বপ্রথম এগিয়ে যায়, এরা সর্বত্র মুক্তি-আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক হয়ে পুলিস ও সৈন্যবাহিনীর লাঠি ও গুলি মাথা পেতে বুক পেতে নেয়, এরা ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে জীবনের জয়গান গেয়ে হাসিমুখে পৃথিবীর বুক হতে বিদায় নেয়। এদের মধ্যে খুঁজলে পাওয়া যায় দস্যু রত্নাকর, পাপিষ্ঠ জগাই-মাধাই, ভিন্দ মোরেণার দুর্ধর্ষ ডাকাতের দল। আবার বিনোবা ভাবেজীর মতো উপযুক্ত নেতৃত্ব পেলে, এরাই ঋষি, ভক্ত ও সমাজরক্ষকে পরিণত হতে পারে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, সমস্ত বৈপ্লবিক কর্মী, দেশপ্রেমিক নির্ভীক মানুষ অল্পবুদ্ধি-ব্যক্তি।

কাজেই বুদ্ধির দিক দিয়ে যারা কিছু খাটো তাদের সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন আছে। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদের জন্যে আলাদা শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। তার ফলে অন্য ছেলেদের সঙ্গে সমান তালে এরা অগ্রসর হতে পারে না। এতে তাদের লেখাপড়ার বিষয়গুলি অনুরাগের বিষয় হয়ে ওঠে না। ক্রমেই তারা আরো পিছিয়ে পড়ে। এর ওপর শিক্ষক বা সহকর্মীরা তাদের বুদ্ধির স্বল্পতার জন্যে তাদের ওপর বিরক্ত হলে অথবা তাদের অবহেলা করলে, তারা লেখাপড়া ও ইস্কুল -সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে পড়ে। ফলে হয়তো এরা ইস্কুল পালিয়ে 'দলে' মেশে এবং সস্তা উত্তেজনার পথে অন্তরের অশান্তি দূর করতে প্রয়াসী হয়। এতে তাদের ভবিষ্যৎ সর্বনাশের পথ প্রশস্ত হয়। কোন ক্লাসে এ রকম স্বল্পবুদ্ধি ছেলের সংখ্যা বেশী হলে, সম্পূর্ণ ক্লাসটিরই লেখাপড়ায় অগ্রগতি শ্লথ হয়। এ সব ছেলেরা ক্লাসের কাজে রস পায় না বলেই অমনোযোগী হয়, ক্লাসে গোলমাল করে এবং এ অমনোযোগ ও বিশৃঙ্খলা অন্যান্য ছাত্রদের মধ্যে সংক্রামিত হয়। কাজেই এ সব ছেলেদের বুদ্ধির স্বল্পতা তাদের নিজেদেরও ক্ষতির কারণ, অন্যের পক্ষেও তাই। এতে শিক্ষকের উদ্যম ও বিদ্যাবত্তারও বৃথা অপচয় ঘটে।

এ সব কথা বিবেচনা করলে, যারা বুদ্ধির দিক দিয়ে কিছু খাটো তাদের নিয়ে আলাদা ইস্কুল বা ক্লাসের ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল হয়। তাদের পাঠ্যতালিকাও সাধারণ ছাত্রদের তুলনায় সহজ করা দরকার। এদের শিক্ষার ব্যবস্থা এমন হওয়া দরকার, যাতে উচ্চতর শিক্ষার

পথে না গিয়েও এরা জীবিকা-উপার্জন করতে পারে। কাজেই এ জাতীয় ছেলেদের কারিগরী শিক্ষার ওপর ঝোঁক দেওয়াই উচিত। এদের জন্য দেশে যথেষ্ট Technical ও Industrial School স্থাপন করা প্রয়োজন। এরা মগজে খাটো হলেও হাতের কাজের নিপুণতায় অনেক সময়ই ন্যূন নয়। বরং এ রকম কাজ যদি সফলভাবে তারা করতে পারে, তবে তাতে তারা আনন্দই পায় এবং নিজেদের সম্বন্ধে গর্ববোধ সার্থকভাবেই পোষকতা লাভ করে।

সমস্ত ছাত্রদের শিক্ষার ক্ষেত্রেই বুদ্ধিমান স্নেহশীল মহচ্চরিত্র শিক্ষকের প্রয়োজন। বিশেষ করে স্বল্পবুদ্ধি ছাত্রদের শিক্ষার ক্ষেত্রে এ আরো বেশী সত্য। পূর্বেই বলেছি এ সমস্ত ছাত্রদের মনটা অনেকটা নির্বোধ শিশুর মতো সরল। এরা অক্ষম বলেই স্নেহের কাঙ্গাল। যে শিক্ষক মায়ের মতো ক্ষমাশীল এবং ধরিত্রীর মতো ধৈর্যশীল তিনি তাঁর মহৎ হৃদয়ের স্পর্শ দিয়ে কল্যাণের পথে এদের অসংযত স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে পরিচালিত করে এদের নতুন মানুষ করে গড়ে তুলতে পারেন। **কঠোর ও নির্মম শাস্তি বা অবজ্ঞা, এদের অবজ্ঞেয় করে তোলবার পথই প্রশস্ত করে।** বলা বাহুল্য, এ সব সন্তানদের সম্বন্ধে পিতামাতার দায়িত্বও বুদ্ধিমান সন্তানদের তুলনায় গুরুতর।

ক্ষীণবুদ্ধি ও জড়বুদ্ধিদের সম্বন্ধে সমস্যা

যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৬০ হতে ৫০-এর মধ্যে তারা নিশ্চিতই ক্ষীণবুদ্ধি। এদের চেহারায় ও কথাবার্তায় বুদ্ধিহীনতার ছাপ সুস্পষ্ট। এদের হাঁটা-চলাও পরিচ্ছন্ন নয় (clumsy gait)। এদের ইংরেজীতে 'morons' বলা হয়। এরা কাজকর্ম গুছিয়ে করতে পারে না। নিজে বুদ্ধি খরচ করে কোন সমস্যার সমাধান করতে পারে না। এই ক্ষীণবুদ্ধির কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জন্মগত। এদের মস্তিষ্ক সুগঠিত নয়—স্নায়ুকেন্দ্র এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ উপযুক্ত পরিণতি লাভ করে নি। অনেক সময়ই রসক্ষরা গ্রন্থি বা হর্মোনের ত্রুটিপূর্ণ কার্য এদের মধ্যে দেখা যায়। একথা স্বীকৃত যে মানুষের বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের পরিণতির ওপর থাইরয়েড্ (thyroid) গ্রন্থির প্রভাব অসামান্য। স্যাণ্ডিফোর্ড বলেন—"সমস্ত দেহের ওপর এর নিয়ামক ক্রিয়া (regulator) বর্তমান। এই থাইরয়েডের স্বাভাবিক ক্রিয়ার ওপর সমস্ত

দেহের ও মনের স্বাভাবিক বিকাশ নির্ভর করে ; কাজেই মানব-ব্যবহারের ওপর এর প্রভাব সহজেই অনুমেয়।” উড্ওয়ার্থ-এর মতে এই হর্মোনের ক্ষরণে ন্যূনতা ঘটলে ব্যক্তির দেহের চামড়া শিথিল, চক্ষু নিষ্প্রভ ও আকার ক্ষুদ্র হয়ে যায়। এ সব ব্যক্তি উৎসাহহীন, অলস ও নির্বোধ হয়। এই ন্যূনতার জন্যে যে সব রোগ হয় তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে মাইক্সিডিমা (myxoedima) ও ক্রেটিনিজম্ (cretinism)। আবার এর ক্ষরণ অতিরিক্ত হলে শারীরিক বৃদ্ধি হয় অস্বাভাবিক, এবং দেহের বৃদ্ধিটাও হয় অতি দ্রুত। এ রকম ব্যক্তি চঞ্চল অসন্তুষ্ট অস্থিরচিত্ত হয়ে থাকে। তার বুদ্ধিটা কিন্তু বাড়ে না। সাম্প্রতিক কালে পল্ ডি ক্রুইফ্ (Paul de Kruif) এই হর্মোনদের সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করেছেন। মনোবিজ্ঞানী, শিক্ষাব্রতী, শিক্ষক সকলের কাছেই এ সব তথ্য অত্যন্ত মূল্যবান বলে বিবেচিত হচ্ছে। পূর্বে এ সব শারীরিক ও মানসিক ত্রুটি চিকিৎসার অযোগ্য মনে করা হত। কিন্তু এখন জানা গিয়েছে হর্মোনের অভাবের ক্ষেত্রে মেষের থাইরয়েড খেতে দিলে কিছুটা উপকার হয়। এই হর্মোন এখন কৃত্রিম উপায়ে তৈরী হচ্ছে এবং থাইরয়েড-ঘটিত নানা ইন্‌জেক্‌সন ও খাওয়ার ওষুধও আবিষ্কৃত হয়েছে।

এদের জন্যে আলাদা শিক্ষার ব্যবস্থা না করে উপায় নেই। এদের ধৃতিশক্তি (power of comprehension) যেমন দুর্বল, স্মৃতিশক্তিও তেমনি অপ্রখর। জটিল ও বিমূর্ত চিন্তা (abstract thinking) এদের সাধ্যের বাইরে। এদের বুদ্ধি কখনও ৬।৭ বছরের ছেলেদের চেয়ে বেশী পরিণতি-লাভ করে না। বিশেষ (particular) ও মূর্ত (concrete) বিষয় এরা বুঝতে পারে, বারে বারে মুখস্থ দ্বারা এরা সহজ পাঠ মনে রাখতে পারে। হাতের কাজ ও সহজ যান্ত্রিক কাজগুলি (simple, mechanical and repetitive) এরা মোটামুটি আয়ত্ত করতে পারে। সহজ হাতের কাজের মধ্য দিয়ে এদের কিছুটা শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। কাজেই বাঁশের বা বেতের কাজ, সহজ চামড়ার কাজ, বিড়ি পাকানো, শিশিতে লেবেল লাগানো—এ সমস্ত কাজে এদের লাগানো যেতে পারে। মন্তেসরী প্রথমে এই জাতীয় অল্পবুদ্ধি ও ক্ষীণবুদ্ধি বালকবালিকাদের শিক্ষার ভার নিয়ে নানা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে দেখলেন, শিশুদের শিক্ষা দেবার সহজ উপায় হচ্ছে খেলাধুলা ও হাতের কাজ। এরা বুদ্ধি করে অনভ্যস্ত নূতন অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে

পারে না। তবে গাড়ীঘোড়া সাম্‌লে রাস্তাঘাট চলতে পারে, কাপড়-চোপড় নিজেরা পরতে পারে, জীবনের মৌল স্থূল কাজগুলি মোটামুটি চালাতে পারে। কাজেই সর্বদা এদের নিজের ওপর ছেড়ে দেওয়া চলে না এবং কারো তত্ত্বাবধানেই এরা কাজ করতে পারে।

এদের ইন্দ্রিয় ও পেশী অপরিণত এবং এদের জ্ঞান ও কর্মের পরিধি সীমাবদ্ধ। এরা অব্যবস্থিতচিত্ত এবং এদের মনোযোগ বেশীক্ষণ এক বিষয়ে থাকে না। এদের অনুভূতির জীবনও বিশৃঙ্খল ও অনিয়ন্ত্রিত। আদিম বন্য সংস্কার (instincts) -দ্বারা এরা চালিত। শুভাশুভ বুদ্ধি, বা কাজের ফলাফল বিবেচনা করে দেখতে এরা অক্ষম। সদুপদেশ দ্বারা এদের সংশোধন হওয়া কঠিন। অনেক সময় শাসনের দ্বারা এদের সংযমে রাখতে হয়। তবে এরাও সহজে স্নেহ ও মমতার দ্বারা বশীভূত হয়। এদের মনের মধ্যে নিরাপত্তাবোধের অভাব। এরা সন্দিগ্ধচিত্ত ও নিষ্ঠুর হতে পারে। তবে যাঁরা ধৈর্য ও ভালবাসা দিয়ে এদের হৃদয় জয় করতে পারেন, এরা তাঁদের সম্পূর্ণ বশ হয়। সাধারণ মানুষকে যে মান দিয়ে বিচার করা হয়, এদের ক্ষেত্রে সে মান ব্যবহার করলে ভুল হবে। অন্যায় এরা ভেবে করে না, অন্যায়বোধই এদের অপরিণত। সমাজের জটিল সম্বন্ধ ও নীতিবুদ্ধি এদের আয়ত্তের বাইরে এবং পরের সম্বন্ধে বিবেচনা করতে এরা শিশুর মতোই অক্ষম।

অনেক সময়ই এরা নিজেরা নিজেদের জীবিকার ব্যবস্থা করতে সক্ষম নয়। দায়িত্বশীল কারও তত্ত্বাবধানে এদের দিয়ে বাগানের কাজ, কুটির-শিল্পের নানাপ্রকার কাজ করানো যেতে পারে। কলকারখানার কাজ বা যেখানে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা আছে এ রকম যন্ত্রাদির কাজে এদের কদাচ দেওয়া উচিত নয়।

জড়বুদ্ধি ও একেবারে নির্বোধদের সমস্যা

যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৫০-এর নিচে ২৫ পর্যন্ত, তারা জড়বুদ্ধি (imbecile)। যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ২৫-এরও নিচে তারা একেবারে নির্বোধ (idiots)। এ দুর্ভাগ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জন্মগত—পিতামাতার অতিরিক্ত মদ্যাসক্তি বা ধাতুরোগ সন্তানের দুরবস্থার জন্যে দায়ী হতে পারে। পলিও (polio), মেনিঞ্জাইটিস্ (meningitis) ইত্যাদি রোগের ফলেও মস্তিষ্কের বোধ- ও কর্ম-কেন্দ্র বা তাদের

সংযোগ রোগগ্রস্ত হয়ে বুদ্ধির এই বিষম হ্রাস জন্মাতে পারে। রসক্ষরা গ্রন্থির ক্ষরণের ব্যতিক্রমের সঙ্গে বুদ্ধির বিপর্যয়ের সম্বন্ধ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। পলিও ইত্যাদি রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে নানা প্রকার গবেষণা চলছে। একেবারে প্রথম অবস্থায় ভিন্ন, চিকিৎসার দ্বারা খুব সন্তোষজনক ফল এখনও পাওয়া যায় নি। এমন সন্তান পিতামাতার চিরকালের দুঃখ ও দুশ্চিন্তার কারণ। তবে এরা প্রায়ই স্বল্পায়ু হয়ে থাকে।

জড়বুদ্ধি বা নির্বোধেরা বাস্তবিক পক্ষে মনুষ্যেতর জন্তু বা ছোট শিশুর মতো অপরিণত। এদের জিব দিয়ে লালা গড়িয়ে পড়ে, চোখের কোণে পিচুটি লেগে থাকে। দেহের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলিও এরা নিজ চেষ্টায় মেটাতে পারে না। অনেক সময় অবশেই মাথা নাড়ে, চক্ষু ঘোরায়। হা হা করে অর্থহীন ভাবে হাসে, সঙ্গত কারণ ব্যতীতই কাঁদে। এরা সহজ স্বচ্ছন্দভাবে হাঁটা-চলাও করতে পারে না। এদের কারও মস্তিষ্কের আকার অতি ক্ষুদ্র (microcephalic) বা অতি বৃহৎ, জলে পরিপূর্ণ (hydrocephalic)। এরা একান্তই পরনির্ভর এবং বিপদ সম্পর্কে সচেতন নয়। তাই এদের সম্বন্ধে পিতামাতা বা আত্মীয়স্বজনদের সর্বদা শঙ্কিত থাকতে হয়। জল আগুন গাড়ী ঘোড়া ইত্যাদি বিপদ থেকে এদের সতর্কে রক্ষা করতে হয়। এদের লেখাপড়া শেখানো বা জীবিকার জন্য কাজ শেখানো প্রায় অসম্ভব। মৃত্যু পর্যন্ত এই হতভাগ্য ব্যতিক্রমদের দায় পিতামাতা বা সমাজকে বহন করতে হয়। উপযুক্ত যত্ন, চিকিৎসা ও অসীম ধৈর্যের সঙ্গে স্নেহশীল ব্যবহার দ্বারা এদের কিছু পরিমাণে স্বাবলম্বী করে তুলতে পারাই যথেষ্ট। এরা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক জীবনযাপনে সক্ষম হবে এমন আশা করা যায় না।

যে সব শিশুদের নিয়ে মহা যন্ত্রণা (Problem children)

শিশুর শিক্ষা ও লালনপালন কখনোই খুব সহজ ব্যাপার নয়। প্রত্যেক শিশুই এক একটি পৃথক ব্যক্তি-কোরক। একেবারে ধরাবাঁধা নিয়ম দিয়ে শিশুদের মানুষ করে তুলতে পারা যায় না। তবুও সাধারণত বাপ-মা এবং শিক্ষক আনন্দের মধ্যেই তাদের গড়ে তোলেন। কিন্তু অনেক শিশু আছে, যারা নানা কারণে, পিতা-মাতা শিক্ষকের পক্ষে মহা দুশ্চিন্তার কারণ। এ দুশ্চিন্তার কারণ বিভিন্ন। কোন কোন ছেলে আছে যারা শারীরিক রুগ্ণতা,

অঙ্গহীনতা, ইন্দ্রিয়ের বিকার, বুদ্ধির ক্ষীণতা, ইত্যাদি কারণে পড়াশুনায় পিছিয়ে পড়ে, খেলায় ধুলায় কাজে অন্য দশটি সমবয়স্ক ছেলেমেয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে এরা পারে না। আবার অন্য কিছু ছেলে আছে যারা বুদ্ধিহীন বা অঙ্গহীন নয় অথচ যারা অবাধ্য, একগুঁয়ে, সর্বদা ঝগড়াঝাঁটি করে, বাড়ীতে বা বিদ্যালয়ে কোন নিয়ম মেনে চলতে রাজী নয়, চীৎকার করে, মারামারি করে অশান্তির কারণ হয়। আবার কোন কোন ছেলে বেপরোয়া মিছে কথা বলে, চুরি করে, নোংরা গালাগালি করে, স্কুল থেকে পালায়, ঘরে আগুন দেয়, কথনো কথনো বা জঘন্য যৌন-অপরাধে লিপ্ত। এই সমস্ত শিশু যারা অব্যবস্থিত, হিংসুটে, অবাধ্য, ক্ষীণবুদ্ধি বা অপরাধপরায়ণ—যারা পিতা-মাতা, শিক্ষক, প্রতিবেশী, সহপাঠীর কাছে 'সমস্যা'-স্বরূপ—তাদেরই সাধারণ নাম হচ্ছে Problem Children। এটি কোন নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক তাৎপর্যবিশিষ্ট পদ নয়। এর কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ এ জাতীয় শিশুরা একটা আলাদা জাত নয়।

এ শিশুরা 'সমস্যা'র পাপ নিয়েই জন্মে নি। আমরা দেখেছি জন্মগত, বংশগত বা পরিবেশগত নানা কারণে এরা অব্যবস্থিত বেমানান অবাধ্য। এদের শারীরিক মানসিক শক্তির অভাব বা বিকারের জন্য, অথবা কুদৃষ্টান্ত, কুশাসন, স্নেহপ্রীতি-সহানুভূতির অভাবে তারা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরা নিজের সঙ্গে বা দশের সঙ্গে সমান তালে চলতে পারছে না—এদের কাছে জীবনটা সহজ নয়—এরা সমস্যার ভারে জর্জরিত। এরা সকলের কাছে মহা যন্ত্রণার কারণ, সেজন্যে দোষটা অনেক ক্ষেত্রেই তাদের নয়। সুজান্ আইজ্যাক্স্ তাই চমৎকার করে বলেছেন—there is no problem child; only there is a child with problems. এই শিশুর প্রাপ্য, শাসন ও শাস্তি নয়—সহানুভূতি, সুপরিচালন ও শিক্ষা!

এদের সমস্যাগুলি বিভিন্ন ধরণের—এবং সেই অনুযায়ী এদের বিভিন্ন দলে ভাগ করা যায়।

(১) যারা অঙ্গহীন, ইন্দ্রিয়ের অভাব বা বিকারযুক্ত অক্ষম (handicapped children)

(২) যারা জন্মগত ও বংশগত কারণে রোগ- বা বিকার-গ্রস্ত (cretins, microcephalic, hydrocephalic, mongols etc.)

(৩) যারা বুদ্ধির ন্যূনতা বা হীনতা নিয়ে জন্মেছে (idiots, morons)

(৪) যারা জন্মগত অস্থিরচিত্ততা বা নীতিবুদ্ধির ন্যূনতা নিয়ে জন্মেছে (constitutional mental and moral imbalance)

(৫) অতিরিক্ত উদ্বিগ্ন, বিষণ্ন, ভীরু, পলায়নপরায়ণ, সমাজবিমুখ, অন্তর্মুখী (withdrawn, introvert)

যারা জন্মগত ও বংশগত কারণে রোগ- বা বিকার-গ্রস্ত: microcephalic—এদের মস্তিষ্ক ছোট, মুখ এদের ছুঁচলো; hydrocephalic—এদের মাথাটা বড়, কিন্তু চুলে ভর্তি, চোখ ছোট; mongols—এদের চীনাদের মতো গোল মুখ, চোখ বড় ছোট, এরা সবাই বুদ্ধিহীন [Tredgold অনুসরণে]

(৬) আক্রমণাত্মক ও ধ্বংসাত্মক ব্যবহার-যুক্ত (aggressive and destructive), দুর্বিনীত, অবাধ্য, একগুঁয়ে, অতিরিক্ত বহির্মুখী

(৭) চুরি, যৌন-অপরাধ ইত্যাদি গুরুতর বিকৃত ব্যবহার যাদের মধ্যে দেখা যায় (grave criminal behaviour)

এসব দলগুলি তীক্ষ্ণভাবে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এদের অব্যবস্থিততা ও সমস্যা সম্পর্কে অন্যত্র ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

তীক্ষ্ণধী ও প্রতিভাবানদের সমস্যা

মানুষ প্রকৃতির সন্তান—কিন্তু সে অশান্ত অবাধ্য সন্তান। মনুষ্যেতর প্রাণীদের জীবন, প্রকৃতি -দ্বারাই পরিচালিত। ইন্দ্রিয়ের বোধ, পেশীর কর্মক্ষমতা প্রকৃতিদত্ত অন্ধ আবেগ ও সংস্কার (instincts) দ্বারা, অন্য প্রাণীর মতো মানুষ তাদের জীবনযাত্রা অনেকটা নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন করে। মনুষ্যেতর প্রাণীরা প্রকৃতির উদ্দেশ্য কি, প্রাকৃতিক শক্তিগুলির স্বরূপ কি, তা জানে না, এবং সে শক্তিগুলিকে নিজস্ব উদ্দেশ্যে সচেতনভাবে ব্যবহার করে নিজ জীবনের গতি-

নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তাদের নেই। মানুষ অন্যান্য প্রাণীদের চেয়ে উন্নততর জীব, কারণ সে প্রকৃতির দাস নয়। প্রাকৃতিক শক্তির স্বরূপ কি, তা জেনে, নিজের উদ্দেশ্যে তাদের ব্যবহার করতে মানুষ সর্বদাই চেষ্টিত। মানুষের এ সদাজাগ্রত ঔৎসুক্য, উদ্যম ও কর্মপ্রচেষ্টার মূলে আছে মানুষের বুদ্ধি। মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস বুদ্ধির জয়যাত্রার ইতিহাস।

কাজেই মানুষ বুদ্ধিকে দাম দেয়। যার বুদ্ধি আছে সে জটিল সমস্যার সমাধান করতে পরে, সে নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারে, নতুন আবিষ্কার করতে পারে,—উন্নতির নতুন পথস্থচনা করতে পারে। তাই মানুষের সমাজে যাদের বুদ্ধি আছে, তাদের সম্মান আছে। আমরা বুদ্ধিমান ছেলেমেয়ে চাই, বুদ্ধিমান দেশনেতা চাই, বুদ্ধিমান জজ, ম্যাজিষ্ট্রে এন্‌জীনিয়ার, শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও কারিগর চাই (চাই না, শুধু অতি-বুদ্ধিমতী স্ত্রী বা অতিবুদ্ধিমান চাকর!) একথা আমরা বিশ্বাস করি, এই তীব্র প্রতি-যোগিতাপূর্ণ জগতে বুদ্ধিই সাফল্যের মূল। মোটামুটিভাবে এ কথা সত্য।

আমরা পূর্বে বলেছি একেবারে ঠিক ঠিক সাধারণের বুদ্ধ্যঙ্ক (I.Q.) হচ্ছে ১০০। বুদ্ধ্যঙ্ক যাদের ১১০ হতে ৯০ পর্যন্ত, তাদেরই সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন বলে ধরা হয়। যাঁদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১২০-এর কোঠায়, তাঁরা তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন এবং যাঁদের ১৪০ বা তারও বেশী বুদ্ধ্যঙ্ক, তাঁরা প্রতিভাবান্ বলে বিবেচিত হন। শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সেনাপতি, শিল্পী যাঁরা পৃথিবীর নেতৃত্বস্থান অধিকার করেছেন, যাঁরা মানুষের জ্ঞান ও কর্মের পরিধি বিস্তৃততর করেছেন তাঁদের অনেকেরই বুদ্ধ্যঙ্ক পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে তা সাধারণের বুদ্ধ্যঙ্ক ১০০-র অনেকটা ওপরে। সমস্ত সভ্যদেশেই এই অসাধারণদের আবিষ্কার করবার ও পুরস্কৃত করবার চেষ্টা হয়। সে জন্যেই নোবেল প্রাইজ, পুলিট্জার্ প্রাইজ, লেনিন্ প্রাইজ, পদ্মশ্রী ইত্যাদি ভূষণের ব্যবস্থা। এ রকম অসাধারণ ব্যক্তি যে সমাজে যত বেশী জন্মগ্রহণ করেন ততই কল্যাণ। এঁরা দেশ ও সমাজের অমূল্য সম্পদ।

যাঁরা প্রতিভাবান তাঁদের পিতামাতা প্রতিভাবান্ না হতে পারেন। তবে প্রতিভার মূল বহুলাংশে জন্মগত, এমন বিশ্বাস করবার কারণ আছে। সাধারণত প্রতিভাবানদের পারিবারিক পরিবেশ অনুকূল। মনীষী জন্‌সনের সংজ্ঞামতে প্রতিভা পরিশ্রম করবার অসীম ক্ষমতা (Genius is the capacity for taking infinite pains)। একথা সত্য যে প্রতিভাবান

ব্যক্তিরা সাধারণের তুলনায় অনেক বেশী পরিশ্রম করতে পারেন। এর কারণ কিছুটা পরিমাণ শারীরিক হতে পারে। কোন কোন মনোবিজ্ঞানীর মতে, এঁদের স্বাস্থ্য ও ইন্দ্রিয়াদির তীক্ষ্ণতা সাধারণ মানুষের তুলনায় অনেকটা বেশী। তাঁদের মানসিক শক্তির পুঁজি অন্য মানুষের চেয়ে অনেক ভারী। কিন্তু সাধারণের চেয়ে তাঁদের প্রভেদ শুধুমাত্র শক্তির প্রাচুর্যে নয়,—তা শুধুমাত্র পরিমাণগত প্রভেদ নয়, মূলত গুণগত। যাঁরা প্রতিভাবান তাঁরা বাইরের কোলাহল ও প্রতিকূলতাকে অনেক সহজে উপেক্ষা ও অতিক্রম করতে পারেন। তাঁরা অনেক বেশী আত্মস্থ—চিন্তা ও কর্মের বস্তুতে তাঁরা সম্পূর্ণ নিবিষ্ট হয়ে তদ্‌গতচিত্ত হতে পারেন। তাঁদের মানসিক ক্ষমতার উৎকর্ষের জন্যেই সাধারণে যা দেখতে পায়, তার চেয়ে তাঁরা অনেক বেশী এবং অনেক বেশী দূর দেখতে পারেন। একেই প্রাচীন ভারতে ঋষিদৃষ্টি বলা হত। প্রতিভাবানদের আবেগ আকাঙ্ক্ষা অনুভূতি অনেক বেশী সুসংযত, তাই দুঃখের দিনে এরা অতিমাত্রায় উদ্বিগ্ন হন না, সুখেও তাঁরা প্রমত্ত হন না। দৃঢ় মনোবলের জন্যে তাঁরা চতুর্দিকের বিপদ বাধা প্রতিকূলতার মধ্যে একাগ্র হয়ে নিজ সাধনায় স্থির থাকতে পারেন। কিন্তু প্রতিভার উৎকর্ষের জন্যে কঠিন মূল্য দিতে হয়। প্রতিভাবানদের জীবন সহজ আরামের জীবন নয়। তাঁদের সম্পর্কেও তাই 'সমস্যা'র কথা আসে।

এই সাধারণের পৃথিবীতে প্রতিভাবানরা নিতান্তই সংখ্যালঘু, এবং সংখ্যা-গরিষ্ঠতা দিয়েই যেখানে সমস্ত বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়, সেখানে মুষ্টিমেয় প্রতিভাবানদের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা মতামতের উপযুক্ত মূল্য না-ও দেওয়া হতে পারে। তাই প্রতিভাবানরা সব সময় এ পৃথিবীতে খুব সুখী হন না। অনেক সময় তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণের 'জনতা'র সঙ্গে সুর মিলিয়ে চলতে পারেন না। যাঁদের বুদ্ধি কম, তাঁরা অতি-বুদ্ধিমানদের সব সময় খুব সুনজরে দেখেন না। তাঁরা অনেকের ঈর্ষার পাত্র। তাঁদের নিজের মনেও কমবুদ্ধি সাধারণ মানুষদের সম্পর্কে কিছুটা অবজ্ঞা ও অবহেলা থাকতে পারে এবং সে জন্যে মানুষের সঙ্গে সহজভাবে তাঁরা মিশতে পারেন না। সাধারণ মানুষেরাও তাঁদের সন্দেহের চোখে দেখে। গ্রীস দেশের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত সক্রেটিসকে তাই জনতার বিচারে ধর্মদ্রোহী ও সমাজের শত্রু বলে চরম শাস্তি গ্রহণ করতে হয়েছিল। সাধারণ মানুষের মতো সাংসারিক বুদ্ধি থাকলে তিনি ক্ষমা

প্রার্থনা করে নিষ্কৃতি পেতে পারতেন, অথবা কারারক্ষীদের ঘুষ দিয়ে পালাতে পারতেন। কিন্তু তাঁর প্রতিভা ও আদর্শনিষ্ঠাই তাঁর কাল হল। স্বেচ্ছায় হেমলক্ বিষপানে তিনি নিজ জীবন বলি দিলেন।

যে সব শিশু বাল্যকালেই প্রখর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয় তাদের পিতামাতাদের তাদের সম্পর্কে গর্ব থাকা স্বাভাবিক। সকলের কাছে নিজ সন্তানের বুদ্ধি প্রমাণ করবার জন্যে পিতামাতা অতিমাত্রায় ব্যগ্র হতে পারে। এর ফল সব সময় শুভ নয়। শিশু তাতে অল্প বয়সেই গর্বিত এবং নিজ বুদ্ধি -সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠতে পারে এবং তার মনে এই বিপজ্জনক ধারণা জন্মাতে পারে যে তার পরিশ্রম করে লেখাপড়া শেখবার প্রয়োজন নেই। বর্তমান সময়ে যারা সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করে অথবা যে সমস্ত ছোট ছেলেমেয়েরা অল্প বয়সেই নাচে গানে আবৃত্তিতে প্রতিভার লক্ষণ দেখায়, খবরের কাগজে তাদের ছবি ও পরিচয় সাড়ম্বরে প্রচারিত হয় এবং প্রকাশ্য সভা-সমিতিতে এদের সংবর্ধনা জানানো হয়। সাফল্যের জন্যে কিছুটা প্রশংসা ও পুরস্কার ভালোই, কিন্তু অপরিণত মনের পক্ষে এত প্রশংসার ফল অনেক সময়ই শুভ হয় না। এতে পুরস্কারপ্রাপ্তরা নিজেদের 'কেউ-কেটা' বলে ভাবতে শেখে এবং কম-বুদ্ধিমানদের সম্বন্ধে অবজ্ঞাশীল হয়। সংসারের মধ্যে যে ছেলে প্রখর বুদ্ধিমান, পিতামাতা তাকে অতিমাত্রায় প্রশ্রয় দিলে সংসারেও অশান্তির সৃষ্টি হয়। সে 'ভালো ছেলে' বলেই হয়তো পরিবারের অন্যান্য ছেলেমেয়েদের যে সব প্রয়োজনীয় ও পরিশ্রমসাধ্য কাজ করতে হয়, তা থেকে তাকে রেহাই দেওয়া হয়। তাতে এ ছেলের অন্যান্য ভাইবোনেরা ভাবতে শেখে, "ওর তো সাতখুন মাপ—ও তো বাবা-মার আদুরে ছেলে।" এতে তারা এই অতিরিক্ত বুদ্ধিসম্পন্ন ভাইটির প্রতি বিদ্বিষ্ট না হয়েই পারে না। তার ওপর যদি বাবা-মা অন্যান্য সন্তানদের ওই ভালো ছেলেটির সঙ্গে তুলনা করে পদে পদে খোঁটা দেন, তবে তাদের বিদ্বেষ তীব্র ঘৃণায় পরিণত হওয়া কিছুই অসম্ভব নয়।

অথবা বিপরীতও হতে পারে। পিতামাতা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান ছেলেকে 'বেশী পাকা', 'সবজান্তা' ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করে, তার সুস্থ কৌতূহলের মূলোচ্ছেদ করে তার বুদ্ধির বিকাশ রুদ্ধ করতে পারেন। তার বুদ্ধি আছে বলে যদি গুরুজন, ভাইবোন সকলে তাকে বারেবারেই উপহাস বা তিরস্কার করেন, তবে সে নিজের মধ্যেই লুকিয়ে থাকতে চাইবে—তার স্বাভাবিক

শক্তির চর্চায় নিরস্ত হবে। সে অন্যের সঙ্গে ভালোভাবে মিশতে চাইবে না এবং সর্বদা ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে থাকবে। এতে শিশুর জীবনের সুস্থ বিকাশের প্রধান প্রয়োজন যে নিরাপত্তা-বোধ (sense of security) তা বিঘ্নিত হবে, এবং এরকম শিশু ভবিষ্যৎ জীবনে ভীতু, আত্ম-অবিশ্বাসী ও অসুখী হবে।[২০]

বিশেষ করে বয়ঃসন্ধিকালে এ সব ছেলেদের সংসারের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে চলা কঠিন হয়। সাধারণত দেহের দিক দিয়েও এদের বিকাশ সাধারণ ছেলেদের চেয়ে বেশী এবং অনেক সময়ই তারা তাদের চেয়ে বেশী বয়সের ছেলেদের সঙ্গে মিশতেই ভালবাসে। তার বয়সের ছেলেদের পক্ষে পরিবারের যে শাসন স্বাভাবিক, তাকে সে নিজ স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ বলে মনে করে বিরক্ত হয়। বেশী বাধা দিলে বা গালমন্দ করলে সে বিদ্রোহ করতে পারে। তার ব্যবহারে বেয়াদবি প্রকাশ পায়; সে ক্রোধপ্রকাশ করে, অন্যান্য ভাইবোন বা ছোটদের মারধর (aggression) করে তার অবরুদ্ধ অনুভূতির মুক্তি দিতে চেষ্টা করতে পারে। দেহ ও বুদ্ধির দিক দিয়ে পরিণত হলেও তার অনুভূতি ও সামাজিক শিক্ষা অপরিণত; কাজেই তার চেয়ে বেশী বয়সের ছেলেদের সঙ্গে মিশে তাদের অনুরূপ ব্যবহার ও স্বাধীনতার দাবি করে, সে নিজের স্বাভাবিক বিকাশের ধারাকে অতি দ্রুত করতে গিয়ে, নিজের বিপদ ও সংসারে অশান্তি ডেকে আনতে পারে। বড়দের বেলায় যে অভিজ্ঞতা স্বাভাবিক ও শোভন, তার পক্ষে তা অশোভন ও বিপজ্জনক হতে পারে। কাজেই প্রতিভাবান ছেলেদের সম্বন্ধে পিতামাতার দায়িত্ব সমধিক। একদিকে দেখা দরকার, এদের শক্তির প্রাচুর্য, উচ্ছল প্রাণশক্তি যেন পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ পায়; তাই এ সব ছেলেকে অন্যদের তুলনায় বেশী স্বাধীনতা দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু অন্য দিকে তার প্রাণপ্রাচুর্য যাতে অবাঞ্ছিত ধারায় বহমান হয়ে অপচিত না হয়, তার জীবনের সুস্থ বিকাশের ধারা যাতে সুসঙ্গত পরিণতিতে পৌছতে পারে, সে জন্যে উপযুক্ত শাসন ও পরিচালনও প্রয়োজন। তার শক্তি সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন ও মদমত্ত হলে তার পতন অবশ্যম্ভাবী। যাতে সে

---

২০ Crow & Crow বলেছেন, "If the family resents his superiority, he will try not to show it, to withdraw within himself and stifle his self-expression and natural development. He may attempt to compensate for the feeling of insecurity and frustration by directing his energies in merely intellectual channels. If again, he is over-indulged, he may become self-opinionated, aggressive and emotionally uncontrolled."

অন্য দশটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে সহজভাবে ও আনন্দের সঙ্গে মিশে বেড়ে উঠতে পারে—অনুভূতি ও প্রক্ষোভের প্রবল ঝড়ঝাপ্‌টা হতে যাতে সে রক্ষিত হতে পারে, সে দিকে পিতামাতারই বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।

এ সমস্ত ছেলেদের সম্বন্ধে সমস্যা শুধু পরিবারের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ নয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রেও নানা সমস্যা দেখা দেয়। সাধারণত এ সব ছেলেদের জন্যে আলাদা শিক্ষার কোন ব্যবস্থা থাকে না। ক্লাসের আর দশটি সাধারণ ছেলের সঙ্গেই এরা একই পড়াশুনা করে। কিন্তু এদের বোধশক্তি তীক্ষ্ণতর এবং স্মৃতিও প্রখরতর, সুতরাং যে পড়া অন্যান্য ছেলেরা তিন ঘণ্টায় শেখে, তা আয়ত্ত করতে তার আধঘণ্টার বেশী লাগে না। কাজেই ক্লাসের পড়া তার বুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ (challenge) করে না। তাতে বুদ্ধির ধার মরে যায়। ক্লাসের পড়াশোনার গতি সাধারণ ছেলেদের বুদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে চলে। প্রতিভাসম্পন্ন ছেলে তাই ক্লাসের পড়ায় যথেষ্ট রস পায় না। তার বুদ্ধি 'কঠিন' সমস্যার সমাধান করতে উদগ্রীব, কিন্তু তার পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে তেমন 'শক্ত' বস্তু না থাকাতে সে অলস ও অমনোযোগী হয়ে পড়ে। তার 'বাড়তি শক্তি' (surplus energy) উপযুক্ত মুক্তির পথ খোঁজে। তা স্বাভাবিকভাবে পথ না পেলেই বিরক্তি আসে। ক্লাসের কাজে তার প্রচুর প্রাণ শক্তির উপযুক্ত ব্যবহার হয় না বলেই হয়তো তার মন অন্যদিকে ধাবিত হয়; হয়তো নানা দুষ্টামীর ফন্দি (যেমন পণ্ডিতমশাইর টিকিটা কাটা, পাশের ছেলের পকেটে একটা জ্যান্ত ব্যাং রেখে দেওয়া) মনের মধ্যে খেলতে থাকে। ক্লাসের কাজে যথেষ্ট রস পায় না বলেই সে পাশের ছেলের সঙ্গে গল্প করে অথবা আপন মনে ছবি আঁকে। এতে তারও বুদ্ধির উপযুক্ত উন্নতি হয় না—কখনো কখনো ক্লাসের কাজেরও ব্যাঘাত হয়। তার কুদৃষ্টান্ত অন্য ছেলেদেরও নষ্ট করে।

শিক্ষক সাধারণত বুদ্ধিমান ছেলেদের পছন্দ করেন। তারা আলোচিত বিষয় সহজে বোঝে, তাতে রস পায়। যেখানে ছাত্রের মন উন্মুখ ও গ্রহণেচ্ছু সেখানে শিক্ষকও কাজ করে আনন্দ পান। তাঁর বিদ্যাবত্তা হতে ছাত্র উপকৃত হলে, তিনি নিজ সার্থকতা খুঁজে পান। সুশিক্ষকের সকলের চেয়ে বড় গৌরব যে তিনি তরুণ আগ্রহী মনগুলিকে নতুন আলোর পথে, নতুন জিজ্ঞাসার পথে উৎসুক করে তুলতে পারেন। কিন্তু অনেক সময় বুদ্ধিমান ছেলেদের সম্বন্ধে শিক্ষকের স্নেহের পক্ষপাতিত্ব থাকে। অন্যে যে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল

না, তা বুদ্ধিমান ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করেন এবং সে যদি মোটামুটি সদুত্তর দিতে পারে, তখন তিনি তাঁর এই প্রিয় ছাত্রটিকে ক্লাসের অন্যান্য ছেলের কাছে তুলে ধরেন। তার সাফল্যে তাঁর নিজের কৃতিত্বই যেন অনুভব করেন। তিনি অবশ্য এ প্রকার প্রশংসা -দ্বারা বুদ্ধিমান ছেলেটিকে উৎসাহই দিতে চান। কিন্তু যাকে উৎসাহ দেওয়া হল, সে সম্ভবত এতে বিব্রত বোধ করে। অথবা হয়তো এ অতি-প্রশংসা দ্বারা তার মাথাটি খাওয়া হয়, সে নিজের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করতে আরম্ভ করে এবং মনে করে তার আর পরিশ্রম করবার প্রয়োজন নেই, কেবলমাত্র প্রতিভার জোরেই সমস্ত বিষয় সে অধিগত করতে পারবে। প্রতিভার সঙ্গে যেখানে কঠিন পরিশ্রম নেই, সেখানে প্রতিভার বিকাশ রুদ্ধ হয়। প্রতিভা সম্ভাবনা মাত্র (potentiality), তার বাস্তব রূপায়ণ সাধনা-সাপেক্ষ। যেমন গৃহে, তেমনি বিদ্যালয়েও বুদ্ধিমান ছেলের সাথে অন্যান্য সতীর্থদের সম্বন্ধ অনেক সময়ই সহজ ও আনন্দময় হয় না। অন্যান্য ছেলেরা তাকে 'ভালো ছেলে' বলে এড়িয়ে চলে। তাকে ঈর্ষা করে। বিশেষত, এ ছেলেটির নিজের মনেও যদি 'হামবড়া' ভাব থাকে, তবে সে অন্যান্যদের বিদ্বেষ ও উপহাসের পাত্র হয়, এবং হয়ত তাকে গোপনে তারা 'বিদ্যাসাগর', 'দিগ্‌গজ' ইত্যাদি নামে ঠাট্টা করে ডাকে। সমস্ত শিশু,—শুধু শিশু কেন, সমস্ত মানুষই,—আপন দলের কাছে প্রীতি ও বন্ধুত্ব চায়—সকলেই অন্যের কাছে, অন্তত অল্প কয়েকজন অন্তরঙ্গের কাছে, 'গ্রহণীয়' (acceptance by the group) হতে আকাঙ্ক্ষা করে। সুস্থ ব্যক্তিত্ববিকাশের পক্ষে এ অত্যাবশ্যক। কিন্তু প্রতিভাবান ছাত্রদের ক্ষেত্রে অনেক সময় এর অভাব ঘটে, এবং কখনো কখনো দেখা যায় সতীর্থদের প্রীতির আশায় এ রকম বুদ্ধিমান ছেলে নিজের 'ভালো ছেলে' নাম ঘোচাবার আগ্রহে, নিজেকে অন্যদের সমান প্রমাণ করবার আশায়, সিগারেট খাওয়া, ক্লাসে গোলমাল করা, অশ্লীল কথা বলা ইত্যাদি অবাঞ্ছিত ব্যবহারে উৎসাহ প্রকাশ করে। এসব অভ্যাসে দাঁড়ালে অবশ্যই গুরুতর ক্ষতির কারণ।

সব সময়ই শিক্ষক যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান ছেলেদের পছন্দ করেন, তা না-ও হতে পারে। শিক্ষককে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী শেষ করতে হয়। তাঁর দৃষ্টি থাকে যাতে সব চেয়ে বেশী পরিমাণ সাধারণ ছাত্র সব চেয়ে বেশী সংখ্যায় পাস করে যেতে পারে। কাজেই মোটা মোটা দরকারী (important) প্রশ্নগুলিই তিনি ক্লাসে আলোচনা করেন। কোন বিষয়ের

গভীরে প্রবেশ করবার উৎসাহ তাঁর বড় একটা হয় না। কিন্তু তীক্ষ্ণধী ছাত্রের মন এ 'ফাঁকি' পড়ায় ভরে না। সে প্রশ্ন করতে চায়, তর্ক করতে চায়, বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করতে চায়। সাধারণ ছেলেরা বইয়ের ছাপার অক্ষরে লেখা কথা বা শিক্ষক মহাশয়ের কথা সহজেই মেনে নেয়। তাতে মনের পরিশ্রম করবার কষ্ট বাঁচে। কিন্তু যাদের বুদ্ধি শানিত এবং বিশ্লেষণশক্তি প্রবল, তাদের সন্দেহ ও বিচার করবার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। কিন্তু তাতে শিক্ষক মহাশয়ের কাজে ব্যাঘাত হয়, অন্যান্য ছাত্রও হয়তো বিরক্ত হয়। তাছাড়া ছাত্র তর্ক করলে বা সন্দেহ করলে, শিক্ষকের মনে হতে পারে ছাত্র তাঁর বিদ্যাবত্তার প্রতি কটাক্ষ করছে। তাই তীক্ষ্ণধী ছাত্রের স্বাভাবিক ঔৎসুক্যকে তিনি 'জ্যাঠামি' 'পাকামি' ইত্যাদি বলে তিরস্কৃত করতে পারেন। এর ফলে বুদ্ধিমান ছাত্র নিরুৎসাহ হয়। উপযুক্ত উৎসাহের অভাবে ছেলেটির তীক্ষ্ণ বুদ্ধির স্ফূরণ ও বিকাশ ব্যাহত হয়। রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভাবানেরা এসব প্রতিকূলতার জন্যেই সাধারণ বিদ্যালয় সম্বন্ধে বীতস্পৃহ হন। তাঁদের সমৃদ্ধ ও সদাকৌতূহলী মনের উপযুক্ত খোরাক বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা যোগাতে পারে না।

কোন কোন বিদ্যালয়ে তাই খুব সেরা ছাত্রদের 'ডবল প্রমোশন' দিয়ে দুই ক্লাস ওপরে উঠবার সুযোগ দেওয়া হয়। মনে করা হয়, দুই ক্লাস ওপরের কঠিন পড়া তার তীক্ষ্ণবুদ্ধির উপযুক্ত স্ফূরণে সহায়ক হবে। এ কতকটা সত্য হলেও, বর্তমান মনোবিজ্ঞানীরা এই রীতি সমর্থন করেন না, এবং এখন এ প্রথা অধিকাংশ স্থানেই রহিত হয়েছে। অল্প বয়সের ছেলে হঠাৎ দুই ক্লাস ওপরে উঠে অথৈ জলে পড়তে পারে। হয়ত নিচের ক্লাসে সে সবেমাত্র যোগ-বিয়োগ-পূরণ-ভাগ শিখেছে। দুই ক্লাস ওপরে গিয়ে সে দেখল সেখানে ভগ্নাংশের অঙ্ক করানো হচ্ছে। খুব ভালো শিক্ষকের সহায়তা না পেলে তার পক্ষে এই ফাঁকটা নির্বিঘ্নে অতিক্রম করা শুধুমাত্র নিজের চেষ্টায় সহজ নয়। এতে তার মনের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে, যার ফল সব সময় শুভ হয় না। তা ছাড়া দুই ক্লাস ওপরের সঙ্গীসাথীরা বয়সে সকলেই তার চেয়ে বড়, খেলাধুলায় তাদের সঙ্গে সে হয়তো এঁটে উঠতে না পেরে নিরুৎসাহ হয়ে পড়বে। বড় ছেলেরা অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার দিক দিয়েও উপযুক্ত সঙ্গী নয়। কাঁচা কাঁঠালকে কিলিয়ে দ্রুত পাকালে তা সুস্বাদু হয় না। মনেরও নিজস্ব পরিণতির একটা স্বাভাবিক ধারা ও ছন্দ আছে, তা

ভুলে দ্রুত ফল পাবার আশায় অতিরিক্ত তাড়া দিলে, উলটা বরং ক্ষতির সম্ভাবনাই থাকে।

এ সমস্ত ছাত্রদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা খুব সহজ নয়। কোন কোন দেশে এবং আমাদের দেশের ভালো স্কুলে বাছাই করে ভালো ছেলে নেওয়া হয়। এ ব্যবস্থা ভালো কারণ, এখানে সুস্থ প্রতিযোগিতা দ্বারা ভালো ছেলেরা নিজেদের উন্নতি করবার সুযোগ ও উপায় পায়, এবং এ সব ছেলেদের বয়সও সকলের প্রায় সমান। এরকমের ভালো ছেলেদের বুদ্ধি অনুযায়ী উচ্চতর মানের লেখাপড়া ও কাজের ব্যবস্থা করা সহজ। কিন্তু মনে রাখতে হবে সমস্ত ভালো ছেলের বুদ্ধির উৎকর্ষ একই বিষয়ে নয়। প্রতিভার মধ্যে একাকীত্ব আছে। দল বেঁধে প্রতিভার চর্চা হয় না। তাই এ বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া দরকার, যাতে এ সব ছেলেরা নিজ নিজ প্রতিভা-বিকাশের উপযুক্ত সুযোগ ও স্বাধীনতা পায়। তীক্ষ্ণধী ছাত্রদের বুদ্ধিই শুধু বেশী এমন নয়, এদের প্রাণশক্তিও সাধারণত অন্যদের তুলনায় প্রচুরতর। সুতরাং এরা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রস পায়, এবং বিভিন্ন প্রকারের আলোচনা, কর্ম, খেলাধুলা, সামাজিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এরা জীবনের পরিপূর্ণ ও সুষম আত্মবিকাশের পথ খোঁজে। যাতে এই প্রচুর ও সমৃদ্ধ প্রাণশক্তির অপচয় না ঘটে, সে জন্য শিক্ষক পিতামাতা সমাজ-কল্যাণকামী প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব রয়েছে। উপযুক্ত সুযোগ পেলে এবং শিক্ষক ও সতীর্থদের প্রীতিপূর্ণ সহযোগিতা পেলে এদের মধ্য থেকেই দেশের অগ্রগতির সর্বক্ষেত্রে উপযুক্ত নেতার আবির্ভাব হয়।

তীক্ষ্ণধী ছাত্রদের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ইত্যাদি নানা গুণ, তাদের অসুবিধা, তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে পরিণতি সম্পর্কে অন্তত তিনটি মূল্যবান অনুসন্ধান হয়েছে—

(১) Terman—Genetic Studies of Genius; Mental and Physical Traits of a Thousand Gifted Children.

(২) Hollingworth—Children above 180 I. Q.

(৩) Garrison—The Psychology of Exceptional Children.

টারম্যান এক হাজার তীক্ষ্ণধী ছাত্রদের স্কুলের বয়স থেকে শুরু করে, তাদের যৌবন অবধি দীর্ঘকালব্যাপী (১৯২১—'৪৬ খ্রীঃ অঃ) অনুসন্ধান করে কতকগুলি সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌছান : (১) এ সমস্ত তীক্ষ্ণধী ছাত্ররা গড়ে

সাধারণ ছেলেদের তুলনায় দৈহিক দিক দিয়েও উৎকৃষ্ট। তাদের বুদ্ধির বিকাশের হারও দ্রুততর। (২) স্কুলের পাঠ্য-বিষয়ে তারা অন্যান্য ছাত্রদের সহজেই পেছনে ফেলে যায়। এদের অধিকাংশ উচ্চতর শিক্ষার জন্যে কলেজে বা য়্যুনিভার্সিটিতে যোগ দেয় এবং সেখানেও তাদের মানসিক উৎকর্ষ সুস্পষ্ট। (৩) সামাজিক গুণের বিকাশও এদের মধ্যে অধিকতর। জীবনের নানা ক্ষেত্রে এরা নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এসব ছেলেরা সাধারণত তাদের চেয়ে বেশী বয়সের ছেলেদের সঙ্গেই মেশে। (৪) চরিত্রের দিক দিয়েও তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখা যায়। সততা, বিশ্বস্ততা, অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা ইত্যাদি নৈতিক গুণও এদের মধ্যে বেশী। (৫) এ সব ছেলেদের পারিবারিক পটভূমিকা সাধারণত অনুকূল। তাদের পিতামাতা তীক্ষ্ণধী না হলেও তাঁদের দুজনেরই, না হয় অন্তত একজনের মধ্যে, স্নেহ বুদ্ধি সংকল্প স্থৈর্য ঈশ্বরানুরাগ ইত্যাদি নৈতিক ও সামাজিক গুণ সাধারণ অপেক্ষা বেশী দেখা যায়। বহু মনীষী ব্যক্তিই তাঁদের মহত্ত্বের জন্যে মাতা ও পিতার কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন। (৬) উত্তর-জীবনে তীক্ষ্ণধী ব্যক্তিরা সব সময়ই সফল হন এমন নয়, তবে মোটামুটি তাঁরা জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। তবে মানসিক বিকৃতি এদের মধ্যে সাধারণের তুলনায় কম নয়।

হলিংওয়ার্থ বুদ্ধ্যঙ্ক ১৮০ বা তারও বেশী, এ রকম ৩১টি ছেলের জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। তাঁর সিদ্ধান্ত এই যে এরা শিশুকালে অনেক আগে কথা বলতে শেখে, শব্দ ও বাক্যের উপর দখল এদের বেশী হয়। এরা সাধারণের চেয়ে অনেক আগে এবং অনেক বেশী বিমূর্ত চিন্তা (abstract thinking) ও শুদ্ধ প্রতীক (abstract symbols) ব্যবহারে পারদর্শী হয়। কিন্তু এরা খুব ভাল মিশুক হয় না। হলিংওয়ার্থ-এর মতে এরা অনেক সময়ই তাদের সমাজের সঙ্গে নিজেকে ভাল করে মানিয়ে চলতে পারে না, এবং ভবিষ্যৎ জীবনে সুখী হয় না। তাঁর মতে আমাদের পৃথিবীর বর্তমান সামাজিক অবস্থায় যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১২৫ থেকে ১৫৫, তাদেরই সুস্থ ও সুসমঞ্জস ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সম্ভাবনা আছে। এর চেয়ে যাঁরা বেশী বুদ্ধিমান সংসারে ও সমাজে তাদের সুখী হওয়ার সম্ভাবনা কম।

যাঁরা তীক্ষ্ণধী, তাঁদের জীবনে বুদ্ধিই প্রবল। এর ভালো ও মন্দ দুইই আছে। এঁরা বুদ্ধিমান বলেই সহজে হুজুগে মাতেন না। যে কোন আন্দোলন

বা মতবাদকে এঁরা স্বচ্ছ বুদ্ধির আলোতে বিশ্লেষণ করে, বিচার করে দেখেন। কাজেই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফাঁকিটা এদের চোখে সহজে ধরা পড়ে। কিন্তু বিশুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান হয় না। শুধু মাত্র মস্তিষ্কের দ্বারা জীবনকে সুপরিচালিত করা যায় না। জীবনে হৃদয়াবেগের মস্ত বড় স্থান আছে এবং হৃদয়াবেগ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিঞ্চিৎ মোহাচ্ছন্ন। এই মোহের অঞ্জন কিছুটা চোখে না মাখলে বুঝি জীবনে সুখ বা আনন্দ পরিপূর্ণ হয় না। তাই যারা বেশী বোঝে, তাদের পক্ষে সুখী হওয়া কঠিন। ইংরেজী প্রবাদ বলে—Where ignorance is bliss, it is folly to be wise. যে হতভাগ্য প্রতিভাধর, প্রেয়সীর চোখের প্রেমের আলোটিকে, অধিগোলক, শ্বেতমণ্ডল, কৃষ্ণমণ্ডল, অচ্ছোদপটল, অধিপট, স্নায়ুশিরা, পেশী ইত্যাদির সমবায় মাত্র বলে জ্ঞান করেন তাঁর জীবনে সুখ কোথায়? বাস্তবিক পক্ষে অনেক প্রতিভাবান শিল্পী সাহিত্যিক বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের দাম্পত্যজীবন সুখের নয়। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, জ্ঞান অনুভূতি ইচ্ছা এই ত্রিধারার সম্মিলনে আমাদের মন। এই মনের শক্তির একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। এর মধ্যে কোন একটি ধারা অতি প্রবল হলে অন্য দুটি ধারা ক্ষীণ হতে বাধ্য। তাই যেখানে বুদ্ধির প্রাধান্য, সেখানে অনুভূতি ও ইচ্ছা দুর্বল। সেজন্য মনীষী ব্যক্তিরা অনেক সময় 'নির্মম' হন। তাঁরা নিজের চিন্তার জগতে নিমগ্ন হয়ে থাকেন। হয়তো কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। প্রতিভা নিঃসঙ্গ একাকী আত্মকেন্দ্রিক। সাধারণের কাছে মনীষীর চিন্তার জগতের দ্বার নিরুদ্ধ। কবি বলেছেন, প্রত্যেক মানুষ অশ্রুর লবণাম্বুবেষ্টিত দ্বীপ। মনীষীদের পক্ষে এ কথা আরো অনেক বেশী সত্য। তাই মানুষ এদের সহজেই ভুল বোঝে, নিন্দা করে। অন্তরঙ্গ বন্ধু এঁরা কমই লাভ করে থাকেন।

কিন্তু এ সমস্ত নিঃসঙ্গ মনীষীরা নিজের চিন্তা ও কাজের মধ্যে নিশ্চয়ই নিবিড় আনন্দ পান, যাহার ফলে নিঃসঙ্গতা তাঁদের তেমন দুঃখ দেয় না। সৃষ্টির আনন্দে, অজানাকে জানার আনন্দে, প্রকৃতির বহু বিচিত্রতার মধ্যে একটি একতার সূত্র আবিষ্কারের আনন্দে তাঁরা তন্ময় হয়ে থাকেন। সামাজিক জীবনের আনন্দ বুঝিবা এ অপার্থিব আনন্দের তুলনায় তুচ্ছ। তাঁদের নিস্পৃহতার ফলে হয়তো স্বজন-পরিবার দুঃখ পায়, কিন্তু পৃথিবীকে মহৎ কিছু দান করতে হলে হয়তো এ বলিদান অনিবার্য। অবশ্য পৃথিবীর সমস্ত মনীষী ব্যক্তিই পরিবার ও প্রিয়জনের দুঃখের কারণ হন না। তাঁদের মধ্যে কেউ

কেউ ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও পরিবারের দাবি এ দুয়েরই সামঞ্জস্য করতে পারেন (true to the kindred points of heaven and home)। তবে এ সমস্ত ক্ষেত্রেই স্নেহময়ী স্ত্রীর ক্ষমা ও ধৈর্য এবং অনুরক্ত সন্তানদের সহযোগিতা ও সহানুভূতি থাকে বলেই তা সম্ভব হয়।

। শুধু মাত্র বুদ্ধির প্রাচুর্যই জীবনকে আকাঙ্ক্ষিত শোভন পরিণতির পথে নিয়ে যেতে পারে না। বুদ্ধির শক্তিকে কল্যাণের পথে চালিত করতে হবে। তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন নরঘাতক দস্যু, অর্থলুণ্ঠনকারী তস্কর, কোটিপতি অসৎ ব্যবসায়ীর পৃথিবীতে অভাব নেই। তাদের প্রতিভা ও শক্তি অসৎপথে নিয়োজিত হয়ে সমাজের ও রাষ্ট্রের অকল্যাণ ডেকে আনে, ব্যক্তিগত সুখও এ পথে মেলে না। তা ছাড়া জীবনের সকল পরিপূর্ণতার মূল হল, সমস্ত শক্তির সুষম সমন্বয়। গীতার মতে তিনিই প্রাজ্ঞ, যিনি জ্ঞান, ধর্ম ও ভক্তির সমন্বয় করতে পেরেছেন। আধুনিক মনস্তত্ত্বের ভাষায় আমরা বলব তিনিই তিনিই বাস্তবিক প্রতিভাধর, যাঁর মধ্যে বুদ্ধি, অনুভূতি ও ইচ্ছার সুসমন্বয় ঘটেছে। যাঁর দৃষ্টি স্বচ্ছ, বুদ্ধি অনাচ্ছন্ন, যাঁর অনুভূতি নিবিড় ও বহুব্যাপী, যিনি তাঁর কর্মশক্তি, মার্জিতবুদ্ধি, এবং অনাত্মকেন্দ্রিক সহানুভূতিকে বহুজন সুখায়, কল্যাণ-আদর্শসাধনে ব্যবহার করতে পারেন, তিনিই বাস্তবিক সুখী, তাঁর জীবনই ধন্য।

অষ্টাদশ অধ্যায়

মনের রোগের প্রকারভেদ

সম্পূর্ণ মানসিক সুস্থ কোন মানুষ আছে কিনা সন্দেহ। আর মানসিক রোগ মাত্রই বিপজ্জনক এবং দুশ্চিকিৎস্য নয়। মানসিক রুগ্‌ণতার প্রকারভেদ ও পরিমাণভেদ আছে। বাস্তবিক পক্ষে মানসিক রুগ্‌ণতা একটা আপেক্ষিক অবস্থা। মানসিক সুস্থতার একটা মাপকাঠি আমরা ধরে নিয়েছি। সেই মাপকাঠিতে পৃথিবীর অধিকাংশ সাধারণ মানুষই সুস্থ। এই সুস্থতার মানের থেকে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম যদি কিছুটা দীর্ঘস্থায়ী হয়, তা হলেই তাকে আমরা মানসিক রোগ আখ্যা দেব। সুস্থতার আদর্শ মান থেকে কিছু না কিছু ব্যতিক্রম সব মানুষেই কোন না কোন সময়ে দেখা যায়। সাধারণ অধিকাংশ মানুষেরই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও মানসিক সাম্য ও শান্ত অবস্থা-রক্ষার স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকে (a wide margin of safety) এবং মাঝে মাঝে বিষণ্ণতা, অস্থিরতা, পরিবেশের সঙ্গে অসামঞ্জস্য, অন্যের প্রতি অযথা অবিশ্বাস, নিজের জীবন সম্বন্ধে ধিক্কার প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কিছু সময়ের জন্যে দেখা দিলে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই।[১] ব্যক্তি সহজেই তা কাটিয়ে ওঠে। কিন্তু যেখানে রুগ্‌ণতার ফলে ব্যক্তি তার প্রাত্যহিক জীবনের সমস্যাগুলির সম্মুখীন হতে পারে না এবং বাস্তবজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, সে অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হলে অবশ্যই তা দুশ্চিন্তার কারণ; সেক্ষেত্রে মানসিক রুগণ্‌তা গুরুতর বলে আশঙ্কা করা যেতে পারে। এ সব ক্ষেত্রে (যেমন উন্মাদরোগ) সাধারণ চিকিৎসায় ফল হয় না। দীর্ঘকাল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে সুচিকিৎসা -ব্যতীত নিরাময়ের আশা থাকে না। মানসিক রোগকে প্রকার -অনুযায়ী এবং গুরুত্বের পরিমাণ -অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করা যায়।

১ ...the oddness in behaviour can be seen even in a normally functioning individual at one time or the other. The normally functioning individual manifests these behaviours, however, in a very moderate degree. Moreover, he shows this behaviour occasionally. For example, a normal person has feelings of depression and elation, he withdraws from the reality situation, sometime, he may suspect others, and have ideas of importance or greatness, or he may feel compelled to do certain things. But when these feelings and reactions become intensified, they prevent the adequate functioning of the individual in daily life. Crow and Crow—Mental Hygiene, p. 94

গুরুত্ব-অনুযায়ী ও বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী-অনুযায়ী মানসিক অসুস্থতাগুলিকে চারটি প্রধান দলে ভাগ করা হয়।

(ক) **সাইকো-নিউরোসিস্** (Psycho-neurosis)—অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা, বিষম বিষণ্ণতা, মূর্ছা ও আক্ষেপ (হিস্টিরিয়া), কোন অঙ্গ বা ইন্দ্রিয়ের সাময়িক ক্রিয়ালোপ (নিউরাস্থেনিয়া), সাময়িক স্মৃতিবিভ্রম (সাইকাস্থেনিয়া) ইত্যাদি এই দলের অন্তর্গত। এই জাতীয় রুগ্ণতা সাময়িক এবং তা খুব গুরুতর নয়। এসব ক্ষেত্রে বাহ্য বা আন্তরিক কোন বিষম সংঘাতের চাপে ব্যক্তি সাময়িক ভাবে ব্যক্তিত্বের সাম্যাবস্থা হারিয়ে ফেলে এবং সমগ্র ব্যক্তিত্ব এসব ক্ষেত্রে বিপন্ন হয় না।[২]

(খ) **সাইকোসিস্** (Psychosis)—এদের আবার দুই দলে ভাগ করা হয়—অর্গ্যানিক্ ও ফাংসনাল্।

এই মানসিক রোগগুলি গুরুতর এবং মানসিক রোগের হাসপাতাল বা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্য ভিন্ন এসব ক্ষেত্রে প্রতিকারের আশা কম। সাধারণত এ রোগীদেরই উন্মাদ বা বাতুল (insane) বলা হয়। এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তি বাস্তব জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজস্ব মনগড়া জগতে বাস করে। এখানে সমগ্র ব্যক্তিত্বই রাহুগ্রস্ত।

উন্মত্ততার কারণ হিসাবে এই জাতীয় ব্যক্তিদের দুটি প্রধান উপাদানে ভাগ করা হয়।

সমগ্র দেহগত গুরুতর বিষক্রিয়ার ফলে যে উন্মত্ততা (যথা, সিফিলিস্ জীবাণু-দ্বারা যেখানে মস্তিষ্ক গুরুতর ভাবে আক্রান্ত) তার নাম **অর্গ্যানিক সাইকোসিস্** (Organic Psychosis)।

আর যেখানে প্রতিকূল বংশগতি, প্রতিকূল মানসিক গঠন, বিষম ও বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা এবং গুরুতর অমীমাংসিত সংঘাত-জনিত অবচেতন

২ "Neurotic" (as distinct from "psychotic") does not mean "insane". The neurotic patient is failing to adjust to reality, but he has not lost touch with it completely. The psychotic, on the other hand, usually has some form of delusion and hallucination, and is not living mentally in the real world. Rex and Margaret Knight—A Modern Introduction to Psychology, p. 44

মনে জটিল গ্রন্থি ইত্যাদি কারণে উন্মত্ততার উৎপত্তি, তাকে **ফাংসন্যাল্ সাইকোসিস্** (Functional Psychosis) বলা হয়।[৩]

ব্যক্তিত্বের এই দুইটি প্রধান বিপর্যয় ছাড়াও মানসিক অসুস্থতার আরো কোন কোন রূপ আছে, যাদের ওপরের দুই দলের কোন দলে ঠিক ঠিক ভাবে ফেলা যায় না। এদের নানা রকম বাতিক থাকে, অদ্ভুত অভ্যাস থাকে, সাধারণ থেকে পৃথক জীবনযাত্রা থাকে। এসব অসুস্থতার কিছু কারণ দেহগত এবং কিছু বা মানসিক সংঘাত- ও অস্বস্তি-জনিত।[৪] যা হোক্ এই অবস্থাগুলিকে নিচের দুই দলে মোটামুটি ভাবে ভাগ করা যায়:

(গ) **সাইকোপ্যাথিক স্টেট্স্** (Psychopathic states) ও

(ঘ) **সাইকোসোম্যাটিক্ ডিস্অর্ডারস্** (Psychosomatic disorders)।

---

[৩] There are two large groups of personality disorders, with subdivisions in each group. The psychoneuroses, often improperly called the neuroses, comprise the less serious, non-institutional, human ills of psychogenic origin. The principal syndromes in this group are neurasthenia, anxiety neurosis, phobias, obsessions and compulsions, hysteria and most sexual perversions. The second major class of personality disorders is the psychoses or insanities. Of these there are two general causative or etiological varieties: the functional psychoses or those of psychogenic origin and the organic psychoses in which the chief causative factor is organic or physical. Fisher—An Introduction to Abnormal Psychology, p. 149

[৪] In addition to these two main groups of personality disorders there is a number of mental distortions, aberration, perversions etc. which do not belong properly to either division. There are the neurotic personality, the psychopathic personality or constitutionally inferior, the hermit, the miser, and other queer folk some of whom stand between normality and psychoneurosis and others of whom fall between psychoneurosis and insanity.

...psychosomatic disorders are due in large part, not to such causes as infections or organic lesion, but to processes in the brain, the autonomic nervous system, and the ductless glands...This does not imply that all illnesses involving the ductless glands are psychosomatic. Rex and Margaret Knight—A Modern Introduction to Psychology, p. 228

উনবিংশ অধ্যায়

বায়ুরোগ

এমন কিছু লোক আছে যারা কিছুটা স্নায়বিক দৌর্বল্য নিয়ে জন্মায়। তারা বিরূপ অবস্থার সম্মুখীন হয়ে নিজেদের স্থির রাখতে পারে না, অল্পেতেই অতিরিক্ত অস্থির হয়ে পড়ে, তাদের হাত-পা কাঁপতে থাকে, নিজেদের ওপর শাসন হারিয়ে ফেলে এবং অবস্থার সঙ্গে নিজেদের সঙ্গতিবিধানে অসমর্থ হয়। এদের ডাক্তাররা অনেক সময় বলেন 'নিউরোটিক্' (neurotic)—বায়ুরোগাক্রান্ত। বাস্তবিকপক্ষে এদের দুর্বলতা শুধুমাত্র স্নায়ুঘটিত নয়—এর সঙ্গে মানসিক দুর্বলতা ও অস্থিরতাও থাকে। কাজেই মানসিক অসুস্থতার এই অবস্থাগুলিকে শুধু নিউরোসিস্ না বলে সাইকোনিউরোসিস্ (psycho-neurosis) বলাই সঙ্গত।

বায়ুরোগ গুরুতর মানসিক ব্যাধি না হলেও এ ব্যাধি ব্যক্তিত্বের বিপর্যয়-নির্দেশক (personality disorder)। যেখানে **ব্যক্তিত্বের বিপর্যয়, সেখানে নিম্নলিখিত অবস্থা তিনটির কোন না কোনটি অবশ্যই উপস্থিত থাকে:**

(১) ব্যক্তির চিন্তা, কর্ম ও আগ্রহ বাল্যকালের স্তরে প্রত্যাবৃত্ত (regression) হয়। অর্থাৎ সে বয়স্কের উপযুক্ত ব্যবহার করে না—তার আচরণে কেমন 'ছেলেমানুষী' প্রকাশ পায়।

(২) বাস্তব জগতের অবস্থার সম্মুখীন না হয়ে এমন ব্যক্তি এক কাল্পনিক নিজসৃষ্ট জগতে বাস করে (phantasy)।

(৩) তার প্রেষণা বা উদ্দেশ্যের মধ্যে কিছু পরিমাণ অসমতা বা অস্থিরতা লক্ষ্য করা যায় (quantitative unbalance of basic motives)।

সাধারণত একথা বলা যায়, বাতুলতা-রূপ গুরুতর ব্যক্তিত্ব-বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে (insanity or psychosis) প্রথম দুটি অবস্থা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। বায়ুরোগ বা সাইকোনিউরোসিসে মানসিক বিকার বা ব্যক্তিত্বের বিপর্যয় খুব গুরুতর নয় এবং এ জাতীয় অসুস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে

পাঠানো দরকার হয় না এবং এই ব ...দের বেলায় তৃতীয় অবস্থা; যৌন প্রেষণা- বা উদ্দেশ্য-বিষয়ে পরিমাণগত অসাম্য, বিশেষ ভাবে দেখা যায়।[১]

'নিউরোটিক্' কে ?

যখন কোন ব্যক্তি তীব্র বা দীর্ঘকালস্থায়ী মানসিক সংঘাতের সন্তোষজনক বাস্তব সমাধানে অসমর্থ হয়ে মাথাধরা, দুর্বলতা, ইত্যাদি রোগের লক্ষণ প্রকাশ করে, অস্বস্তিকর অবস্থার সম্মুখীন হবার দায়িত্ব এড়াতে চায়, তখন চিকিৎসক বলেন যে ব্যক্তির ব্যবহার নিউরোটিক্। যখন এ প্রকার ব্যবহার ব্যক্তির অভ্যস্ত ব্যবহারে পরিণত হয়, যখন ব্যক্তি এই দুর্বল শিশুসুলভ দায়িত্ব এড়াবার পথকেই আঁকড়ে ধরে, তখন সে ব্যক্তিকে বলা হয় নিউরোটিক্। ব্যক্তি নিজেই জানে যে তার ব্যবহার বয়স্ক মানুষের উপযুক্ত নয়, কিন্তু অস্বাভাবিক ভয় এবং আত্ম-অবিশ্বাসে সে এমনই অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যে, অস্বস্তিকর বা ক্লেশকর অবস্থার সম্মুখীন হবার শক্তিই সে স্থায়ীভাবে হারিয়ে ফেলে। বাস্তবিকপক্ষে তার শারীরিক রোগের লক্ষণগুলিকে সে ঝেড়ে ফেলতে চায় না, কারণ সে বেশ জানে এই 'রোগগুলিই' তার পক্ষে দায়িত্ব এড়াবার সবচেয়ে ভালো অজুহাত। এতে করে নিজের কাছেও তার আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ থাকে। সুতরাং এ হচ্ছে অহং-এর আত্মরক্ষার কৌশল (defence mechanism)। এর মধ্য দিয়ে সে অন্যের সহানুভূতি- এবং মনোযোগ-আকর্ষণ করতেও সমর্থ হয়।

সব মানুষেরই প্রায় কোন না কোন সময়ে এমন নিউরোটিক্ ব্যবহার দেখা যায়। স্কুলের অঙ্ক তৈরি না হলে মেয়ের মাথা ধরে বা ছেলের পেট-ব্যথা শুরু হয়,—এতো প্রাত্যহিক ঘটনা। কিন্তু অসুবিধাজনক অবস্থা দেখা দিলেই

১ From a subjective or strictly psychological point of view a personality disorder, whether it be a psychoneurosis or psychosis, is intrinsically always one of three conditions:

(1) It is either a matter of regression with energy expenditure on infantile levels of thought, feeling and interests, or (2) it is a substitution of ideas for objective facts giving rise to a world of phantasy which supplants the world of objective reality, or (3) it is a condition of quantitative motive unbalance...To this third category belong most psychoneurotics, while the first two categories are emphasized, though by no means exclusively, in the insanities. Fisher—An Introduction to Abnormal Psychology, p. 151

যে ব্যক্তির মাথা ধরে, মাথা ঘোরে বা অন্য কোন দৈহিক অসুস্থতার লক্ষণ দেখা দেয়, সেই দুর্বল ব্যক্তিকেই নিউরোটিক্ বলতে হবে।[২]

যে ব্যক্তি নিউরোটিক্ সে কেবল নিজের দৈহিক উপসর্গগুলির কথাই বলে। নিজ অসুস্থতার মূল যে নিজের দুর্বল ইচ্ছাশক্তির মধ্যেই নিহিত আছে, তা সে স্বীকার করতে চায় না। সে ছোট আদুরে ছেলের মতো দায়িত্ব এড়িয়ে পালিয়ে বেড়ায় এবং সে চায় যে তার প্রতি সকলে মনোযোগ দিক, তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করুক। সে অতি মাত্রায় অভিমানী এবং নিজের ত্রুটিস্বীকার করতে অনিচ্ছুক। সে নিজের 'দুর্ভাগ্য'কে নিয়ে সর্বদা নিজের মধ্যে জল্পনা করতে ভালবাসে এবং চায় সবাই তার 'রোগ' ও 'দুর্ভাগ্য' নিয়ে হা-হুতাশ করুক। বাস্তবিক সে নিজ রুগ্ণ অবস্থার অবসান চায় না; মায়ের আঁচলধরা আদুরে দুলাল হয়েই দিন কাটাতে চায়। আপাত-বাধ্যতা ও অসহায়তার অভিনয়ে সে অভ্যস্ত হলেও সে প্রায়ই খুব জেদী হয় এবং নিজ মতলব কখনো ছাড়তে চায় না। অনুভূতির ক্ষেত্রে তার মধ্যে সাম্য ও

২ Neurotic behaviour results from the attempt to solve intense long-standing mental conflicts by one or more symptoms of some physical illness, anxiety, fear, or compulsive and obsessive behaviour...*The symptoms* at first vary from time to time but *finally become patterned and fixed*. The patient cannot discard them, although he constantly expresses a desire to be normal. Indeed, he unconsciously guards against discarding his symptoms because of the fear of facing his basic conflicts.

Normal persons may have various symptoms which are neurotic in character...A headache may be an excuse for temporarily evading an unpleasant situation. Gastro-intestinal disturbances in children are not infrequent on occasions when they wish to evade school. Although these temporary symptoms may be the origin of a later systematized pattern of neurotic behaviour, they are usually not considered to be abnormal because they disappear as soon as the individual is able to readjust to his difficulty or solve the problem which give rise to the symptoms.

...Neurotic behaviour is usually interpreted as an attempt of the individual to escape from the frustrations of reality by means of symptoms of some illness or disease. The symptoms are a means of evading difficulties and frustrations and also serve as a justification for some real or imagined failure. The neurotic patient in addition to justifying his real or imagined failure and evading reality, is also able to obtain sympathy and attention, which he was unable to obtain previously. Sherman—Basic Problems of Behaviour, pp. 349-51

শান্তির অভাব। তার দুঃখ ও আনন্দ দুইই অতিরিক্ত। তার দৃষ্টি বাস্তবাভিমুখী নয় (extrovert) অন্তর্মুখী (introvert)। সে নিতান্ত আত্ম-সুখ-পরায়ণ। নিজের দেহ-ঘটিত সমস্ত উপসর্গ আর 'রোগ' নিয়েই সে অতিমাত্রায় ব্যস্ত। খাওয়া সম্পর্কে তার বাছবিচারের অন্ত নেই। মায়ের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা এবং আত্মবিশ্বাসের অভাবের জন্যে এসব মানুষ সাধারণত বিবাহে সুখী হতে পারে না।[৩]

নিউরোটিকেরা বুদ্ধির অভীক্ষার মাপে সাধারণত হীন নয়, কিন্তু তারা অত্যন্ত অস্থিরচিত্ত। বেশীক্ষণ কোন বিষয়েই তাদের মনোযোগ থাকে না।

অ্যাড্‌লার্‌-এর মতে, ব্যক্তির নিজ সম্বন্ধে অতিরিক্ত উচ্চ ধারণা এবং বাস্তবিক পক্ষে নিজের বুদ্ধি বা শক্তির অভাবজনিত মানসিক সংঘাত এবং পরাজয়ের আশঙ্কা নিউরোটিক অবস্থার মূল কারণ। সে নিজের কাছেও এই পরাজয়ের হীনতা ঢাকতে চায় কতকগুলি দৈহিক রোগের ছদ্ম আবরণে। তার আন্তরিক সংঘাত, পরাজয় এড়াবার জন্য বাস্তব চেষ্টার অভাব, অবচেতন মনে নিজ হীনতা সম্বন্ধে স্বীকৃতি, অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা, অপরাধবোধ তার রোগের লক্ষণগুলিকে আরো বাড়িয়ে তোলে। নিউরোটিক্ রোগীর চিকিৎসা অত্যন্ত

৩ ...the behaviour of every neurotic presents features which are more or less characteristic of the child, more particularly what is known as the spoilt child. The neurotic is generally sensitive, very often extermely so. He is inordinately attached to his family, more particularly the mother, craves more than his share of attention and devotion, likes to exhibit his merits or even his failings and wants people to talk about him or his illness. He is generally introspective, likes to indulge in phantasy, and because of his subjective attitude to life seems to be unable to make objective contact with facts of reality. He is emotionally unstable, oscillates apparently without reason between elation and depression, is either afraid to be alone, or is impetuous in his ways, and is shy or bold in turns...Despite apparent docility and helplessness he does not easily brook interference, is sometimes querulous, always wants to have his own way...He is intensely preoccupied with himself...so that he usually gives the impression of being selfish...He is inordinately ceremonious, particularly about food, and is generally preoccupied with his bodily functions. He usually has decided likes and dislikes...His dependence upon and undue attachment to his family interfere with his making close friendships or keeping friends he has made, and stand in his way of falling in love or being happy in marriage. Weschler—The Neuroses, pp. 89-126

কঠিন, কারণ ব্যক্তির নিজের দিক থেকে তার রুগ্ণ অবস্থার বাস্তব কারণ-বিশ্লেষণ এবং নিজ ত্রুটি ও দুর্বলতা অতিক্রম করে বাস্তব অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে রোগমুক্ত করবার আন্তরিক চেষ্টার অভাব থাকে। সে রোগের কতকগুলি বাহ্য উপসর্গ ও লক্ষণের ছদ্ম আবরণের পশ্চাতে নিজ ত্রুটিকে ঢেকে রাখতেই চায়।[৪]

ম্যাক্‌ডুগ্যাল্‌-এর এই মত যে, নিউরোটিক্‌ রোগী নিজেও জানে না যে তার রোগের লক্ষণগুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে তার নিজের অবচেতন মনে অবদমিত বিক্ষোভগুলিকে আড়াল করে রাখা। রোগের লক্ষণগুলির মধ্য দিয়ে বাস্তব অস্বস্তিকর অবস্থার মুখোমুখি হবার দায়িত্ব এড়িয়ে যেতেই যে সে চেষ্টা করছে, এটা রোগী নিজের কাছেও স্বীকার করতে চায় না। এখানে রোগের লক্ষণগুলি তার ব্যক্তিত্বের মূল ঐক্যের বিচ্ছিন্নতা ঘটিয়ে পৃথক একটি চেতনার কেন্দ্র সৃষ্টি করছে। নিউরোটিক্‌ ব্যক্তির মধ্যে সুসংহত সবল ব্যক্তিত্বের অভাব আছে এবং বিরূপ অবস্থার সম্মুখীন হয়ে নিজ অন্তর্গত সংঘাতের ফলে তার ব্যক্তিত্বের ঐক্য সহজেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।[৫]

ফ্রএডীয় মনঃসমীক্ষকদের মতে নিউরোসিস্‌-এর লক্ষণগুলি আদিম কামের প্রকাশের বিকার (distortions of libidinal expressions)। তাঁরা মনে করেন যে ব্যক্তির অচেতন আদিম যৌন আকাঙ্ক্ষা ও সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে তার সচেতন ব্যক্তিগত আদর্শের সংঘাত যেখানে ঘটে, সেখানে ব্যক্তি সমাজনিন্দিত আদিম আকাঙ্ক্ষাগুলিকে অবদমন করতে চেষ্টা করে। ব্যক্তির যে দৈহিক রুগ্ণতার লক্ষণগুলি দেখা যায় তার মূলগত কারণ হচ্ছে

৪ ...the individual's goal of superiority, originating in experiences of inferiority is the determining factor in a neurosis. The fear of defeat arouses the neurotic symptoms which effectively aid him in escaping from reality. Adler—Problems of Neurosis, p. 244

৫ The purpose of the neurotic reaction may not be known to the patient and he is therefore unable to understand the basis of his behaviour. The individual represses his conflicts and is thus unaware of his problems, and the "flight into illness" which he achieves may be the result of a dissociative process. ...a neurotic disorder is a manifestation of a disintegration of the basic personality pattern. The neurotic individual lacks adequate personality integration and under the influence of repressed conflicts a disorganized pattern of personality is created which manifests itself in neurotic characteristics. McDougall—Outlines of Abnormal Psychology, pp. 30-31

ব্যক্তির যৌন জৈব আকাঙ্ক্ষাগুলির পরিতৃপ্তির পথে ব্যক্তিগত আদর্শবোধ বাধা দেয়। কাজেই রোগের যে লক্ষণগুলি দেখা দেয় সেগুলি হল, ব্যক্তির গভীর মগ্ন চৈতন্যে যে আদিম ও অসংস্কৃত কামাকাঙ্ক্ষা তার বিরুদ্ধে ব্যক্তির অবচেতন মনের আত্মরক্ষার চেষ্টা। নিষিদ্ধ আকাঙ্ক্ষাগুলির সম্বন্ধে ব্যক্তির মনে যে অপরাধবোধ থাকে, দৈহিক রুগ্ণতার লক্ষণগুলিকে তার পাপের জন্য শাস্তিগ্রহণ বলে মনে করা যেতে পারে। ব্যক্তির আদিম কামেচ্ছার অবদমন এবং তার পরিতৃপ্তির জন্য পরিবর্ত-কল্পনার আশ্রয়গ্রহণ, শৈশব অবস্থায় ফিরে গিয়ে মায়ের আঁচলের নিচে লুকিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টাও বলা যেতে পারে। এই পশ্চাদপসরণের প্রবণতার পরিমাণ দিয়ে রোগের গুরুত্ব পরিমাপ করা যেতে পারে। যেখানে এ প্রবণতা বেশী, সেখানে ব্যক্তিত্বের স্পষ্ট বিচ্ছিন্নতা ঘটবার বিশেষ আশঙ্কা থাকে। যেখানে এ বিচ্ছিন্নতার পরিমাণ বেশী, সেখানে ব্যক্তির দৈহিক উপসর্গ সম্বন্ধে অতিরিক্ত সচেতনতা থাকে। হিস্টিরিয়াতে আমরা ব্যক্তিত্বের গুরুতর বিচ্ছিন্নতার পরিচয় পাই এবং সেখানে দৈহিক রুগ্ণতার লক্ষণগুলিও অতিশয় সুস্পষ্ট ও তীব্র।[৬] অনেক নিউরোসিসের পশ্চাতে অবচেতন যৌন-অপরাধবোধ ক্রিয়া করে, এ কথা সত্য। এর প্রকাশ পায় অতিরিক্ত শুচিতাবোধে (শুচিবাই)। এরই আর এক রকমফের হচ্ছে জীবাণু-সংক্রমণ-দ্বারা রোগ সম্পর্কে অতিরিক্ত আশঙ্কা। স্ত্রীলোকদের মধ্যে এ জাতীয় 'বাই' বেশী দেখা যায়। তার কারণ তাদের সীমাবদ্ধ সামাজিক জীবন ও স্ত্রীলোকের যৌন-শুচিতা সম্বন্ধে সমাজের

৬ Psychoanalysts believe a neurosis to result from a repression of instincts and sentiments in the conflict between the conscious ego and the unconscious id. Supposedly, the neurotic person devoleps symptoms because the ego-ideal frustrates gratification of wishes. The symptoms are, therefore, a defense against the demands of the libido. To some degree the symptoms are also a punishment for the symbolic fulfilment of tabooed desires. Because of the various substitutes and repressions the neurotic condition represents a repetition of infantile conditions. Aooording to psychoanalysts, the degree of regression determines to some extent the kind of symptoms the neurotic develops and their patterning. Every type of neurotic condition therefore represents some dissociation. The greater the dissociation the greater the fixation upon bodily symptoms. Thus in hysteria the dissociation is severe and the involvement in bodily symptoms is much more general than in other forms of neuroses. Sherman—Basic Problems of Behaviour, p. 364

অতিরিক্ত কঠোর শাসনের ফলে তাদের মগ্নচৈতন্যে যৌনাকাঙ্ক্ষা সম্পর্কিত সংঘাত, পাপবোধ এবং অবদমনের চেষ্টা পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশী। সেইজন্যই স্ত্রীলোকদের নিউরোসিসে দৈহিক রোগের লক্ষণগুলি অনেক বেশী ব্যাপক এবং অনেক বেশী তীব্র।[৭]

বায়ুরোগের কারণ সম্বন্ধে মতভেদ

ফ্রয়েড্ সমস্ত নিউরোসিস্‌কেই যৌনাকাঙ্ক্ষা-ভিত্তিক বলে সিদ্ধান্ত করলেও সমস্ত মনোবিদ্ তাঁর এ মতকে গ্রহণ করেন না। এমন কি তাঁর অনুগামীদের মধ্যে অ্যাডলার ও য়ুং মনে করেন যে সর্বক্ষেত্রেই যৌনাকাঙ্ক্ষার অবদমন নিউরোসিসের কারণ নয়। অ্যাডলার-এর মতে মানুষের অন্তরে অনেক সময়েই এক **হীনতাবোধের গ্রন্থি (inferiority complex)** ক্রিয়া করে। তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনেক সময় নিজের শক্তি বা বুদ্ধির অভাবে পূর্ণ হতে পারে না। অথচ মানুষ নিজের কাছেও নিজের ত্রুটি বা দুর্বলতা স্বীকার করতে চায় না। **সে তখন এমন একটা জীবনধারা (style of life) গঠন করে, অথবা দৈহিক কতকগুলি রোগের উপসর্গ সৃষ্টি করে, যাতে সে নিজেও নিজেকে ভোলাতে সক্ষম হয় যে দৈহিক অসুখ-বিসুখ অথবা প্রতিকূল বাহ্য অবস্থার জন্যেই সে জীবনে সফল হতে পারল না।** পুরুষদের অনেক নিউরোসিসের মূলে আছে ব্যবসায়, জীবিকা বা সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ে অসাফল্য-জনিত হীনতাবোধকে আবরণ করবার চেষ্টা। এ সমস্ত রোগীরা তাই অন্য মানুষের বিরূপ মতামত সম্পর্কে অতি মাত্রায় স্পর্শকাতর (over-sensitive)। আর পরের কাছে নিজেদের

[৭] The sense of guilt which is frequently found in the neurotic person arises...because of intense sex conflicts. It is for this reason that neurotic persons are often particularly sensitive about dirt and about cleanliness. The conflicts regarding morality are symbolized in their anxieties regarding dirt and infection,..her handwashing was a way of cleansing herself of dirt, symbolic of cleansing herself of immorality...Neurotic women are more likely to show symptoms of bodily disease...Women are more frequently concerned with personal problems in more circumscribed areas. Their conflicts in consequence may result in greater frequency of bodily symptoms. Ibid—p. 366

জাহির করবার জন্যে তারা অতিমাত্রায় ব্যগ্র।[৮] নিউরোটিক্ ব্যক্তি সাফল্য ও অসাফল্যের ভিত্তিতে নিজের জীবনকে বিচার করে এবং নিজের গোপন হীনতাবোধের জন্যে সে খুব সহজ ভাবে অন্যের সঙ্গে মিশতে পারে না। সে নিজের অসাফল্যের জন্য অন্য মানুষকে দায়ী করে, অন্য মানুষকে সংশয়ের চোখে দেখে, এবং কল্পনা করে অন্যেরা আড়ালে তার নিন্দা করে। তাই এসব লোকের আন্তরিক বন্ধুত্ব প্রায় কারো সঙ্গেই হয় না এবং নিজের অসাফল্য-জনিত হীনতাবোধ থেকে অন্যের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণেও তারা কখনো কখনো প্রবৃত্ত হয়। এ সব মানুষ সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের বৃহৎ অহমিকা এবং ক্ষুদ্র আত্মরতির খোলসের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে নিজের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং পরিবেশের সঙ্গে অসঙ্গতি বাড়িয়েই তোলে।[৯]

নিউরোটিক্ উপসর্গগুলি সাধারণত ধীরে ধীরে বহুদিন ধরে সঞ্চিত হয়। অনেকগুলি অবচেতন সংঘাত একত্র যুক্ত হয়ে যেন এক একটি প্যাটার্ন গড়ে ওঠে। কিন্তু কখনো কখনো দেখা যায় হঠাৎ কোন তীব্র বিহ্বলকর অভিজ্ঞতা এই নিউরোসিসের প্যাটার্ন-গঠন ত্বরান্বিত করে, এবং হঠাৎ অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে নিউরোসিসের সমগ্র দৈহিক উপসর্গগুলি (syndromes) আত্মপ্রকাশ করে। যুদ্ধের সময় কামানের গোলার আঘাত এবং অন্যান্য ভীতিকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়ে বহু সৈনিক হঠাৎ তীব্র নিউরোসিসে অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে এমন অনেক উদাহরণ ফ্যারার যত্নের সঙ্গে সংগ্রহ করে যুদ্ধ-নিউরোসিস -সম্পর্কে বহু

---

৮ ...neurotic behaviour is determined to a great extent by various cultural pressures and demands and the inability of the individual to adapt himself to social competition. Competition is nearly always the center of the neurotic conflict and may involve a variety of aspects of one's life... Neurotic behaviour may be the result of an anxiety which is caused by the conflicts between the individual's desires and the social restrictions placed upon them. Horney—Culture Neuroses, p. 36

৯ The neurotic person usually does not free himself from a sense of blame although his illness is in part an attempt to justify himself and therefore to remove personal blame. As a result, he may be constantly disturbed and continually introspective. He frequently isolates himself socially and thus further increases his introspective activity. As a result he is rarely at ease either with himself or in social situations. He is likely to project his self-criticism into the attitude of his friends and acquaintances. Thus he exaggerates the criticism of others, becomes doubtful about the sincerity of his friends, and frequently develops persecutory-like ideas. Henderson and Gillespie—Textbook of Psychiatry, p. 98

মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর মতে এসব বহু ব্যক্তিই হঠাৎ এমন উত্তেজক ও বিহ্বলকর অবস্থার সম্মুখীন না হলে মানসিক স্থৈর্য হারিয়ে নিউরোসিস্-রোগাক্রান্ত হত না।[১০]

নিউরোটিক্ রোগীদের বংশগতির ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে এক একটা পরিবারে এই প্রবণতা বেশী। কাজেই **নিউরোসিসের সঙ্গে প্রতিকূল বংশগতির সম্পর্ক আছে এমন সন্দেহ করা হয়।** কিন্তু বংশগতির মূল উপাদান ক্রোমোজোম বা জীনদের মধ্যে কোন্ কোন্টি এ জন্যে দায়ী তা এখনও নির্ধারিত হয় নি। দৈহিক দুর্বলতাবোধ সমস্ত নিউরোটিক্ রোগীরই সাধারণ লক্ষণ হলেও দৈহিক গঠনের দিক থেকে নিউরোটিকেরা সাধারণ সুস্থ মানুষদের তুলনায় হীন, এমন সিদ্ধান্ত করবার মতো উপযুক্ত সাক্ষ্য পাওয়া যায় নি। নিউরোসিসের দুর্বলতার পশ্চাতে আছে, অনুভূতির জীবনে অস্থিরতা (emotional imbalance) এবং অবচেতন মনে সংঘাত। মানসিক কারণে দুর্বলতা দৈহিক শ্রান্তির চেয়ে অনেক বেশী ক্লান্তিকর। এসব রোগীর কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র অথবা অনুষঙ্গী স্নায়ুতন্ত্রের (sympathetic nervous system) কোন বৈকল্য নিউরোসিসের কারণ, এমন কথাও জোর করে বলা যায় না। তবে তাদের উপাদান বা গঠনে কোন ত্রুটি নির্ণীত না হলেও তাদের ক্রিয়ায় অনিয়মিততা (functional disturbance) অবশ্যই লক্ষণীয়।[১১] রসক্ষরা অনালী গ্রন্থিগুলির ক্ষরণের সঙ্গে নিউরোসিসের কোন গভীর ও অচ্ছেদ্য যোগও আবিষ্কৃত হয় নি।

আধুনিক বহু মনোবিদ্ই **নিউরোসিসের দৈহিক বা স্নায়বিক কারণের চেয়ে অনুভূতিগত অস্থিরতা এবং অবচেতন মনে সংঘাতকেই নিউরোসিসের মূল কারণ বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।**[১২]

বায়ুরোগের সাধারণ বাহ্য লক্ষণ

বায়ুরোগের বৈশিষ্ট্যগুলি এবং তার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এখন তার বাহ্য লক্ষণগুলি কিছু আলোচনা করা যাক। এরপর বায়ুরোগের

১০ Farrar—War and Neuroris, American J. of Insanity, 1917, 73, pp. 693-717

১১ Hollingworth—Abnormal Psychology: Its Concepts & Theories, pp. 218-22

১২ Myerson—Neuroses and Psychoneuroses, pp. 269-301

শ্রেণীবিভাগ করে পৃথক পৃথক ভাবে তাদের সম্বন্ধে বলা হবে। তবে কতকগুলি সাধারণ দৈহিক রোগ বা অস্বাচ্ছন্দ্যের উপসর্গ অধিকাংশ নিউরোটিক্ রোগীর মধ্যেই প্রকাশ পায়।

শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য

এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে মাথাধরা, অতিরিক্ত ক্লান্তি, অস্থিরতা, বিবমিষা, ব্যথা-বেদনা, বুক ধড়ফড় করা, অতিরিক্ত দুর্বলতা, শ্বাসকষ্ট, মাথাঘোরা।

মিথ্যা ভয় ও দুশ্চিন্তা

সব নিউরোটিক্ রোগীরই মানসিক মিথ্যা ভয় ও দুশ্চিন্তার কিছু না কিছু লক্ষণ দেখা যায়। এরা সবাই প্রায় বলে যে ঘুম ভালো হয় না, অল্পেতে চমকে ওঠে, তীব্র শব্দ বা আলো সহ্য করতে পারে না, অল্পেতেই অস্থির হয়ে পড়ে, অল্পেতে উত্তেজিত হয়। এদের মধ্যে অকস্মাৎ স্মৃতিলোপ, বিফলতা বা মৃত্যু সম্বন্ধে অযথা ভীতি দেখা যায়। এরা কোন বিষয়ে দীর্ঘকাল মন দিতে পারে না।

ইচ্ছার বিরুদ্ধেই কতকগুলি ক্রিয়ার প্রবণতা

নিউরোটিক্ রোগী কতকগুলি ব্যবহার -বিষয়ে একটা প্রবল অনিবার্য প্রবণতাবোধ করে। নিজেদের তারা সামলাতে পারে না। একটি রোগী একজন নির্দিষ্ট মানুষকে দেখলেই কুৎসিত গালাগাল দেবার ইচ্ছা কিছুতেই সংবরণ করতে পারে না। কোন কোন ক্ষেত্রে এমন দেখা গেছে যে রোগী পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ করে বলছে, "দয়া করে আমাকে আটকে রাখুন, নইলে আমি অমুক মানুষকে হয়তো খুন করে ফেলব, আমি নিজেকে দমন করতে পারব না। কে যেন আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।" এরকম একটা ঝোঁক যখন কোন মানুষকে পেয়ে বসে যখন সে বোধ করে একটা কাজ সে না করেই পারে না। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সে বিশেষ কোন ব্যবহার -বিষয়ে প্রবণতাবোধ করে, এই অবস্থাকে বলে **আবেশ** (obsession)।[১৩] আমরা দেখেছি শুচিবাইগ্রস্ত মেয়ে দিনের মধ্যে

[১৩] Obsession: a persistent or recurrent idea, usually strongly tinged with emotion, and frequently involving an urge towards some form of action, the whole mental situation being pathological.

পাঁচশোবার হাত ধুচ্ছে, তার কেবলই ভয় হাতে নোংরা লেগে আছে। আর একটি রোগী ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, কারণ তার ভয় তার শ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। এ জাতীয় ইচ্ছা -ব্যতীতও পুনঃ পুনঃ ক্রিয়া হচ্ছে **অনুকর্ষী ক্রিয়া (com pulsion)**।[১৪] আবেশ ও অনুকর্ষী ক্রিয়া দুইই সচেতন ইচ্ছার তাড়না -ব্যতীত ক্রিয়া। দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ হচ্ছে আবেশে ভাব ও চিন্তাটির ওপর জোর, আর অনুকর্ষী ক্রিয়াতে কার্যটির ওপর জোর।[১৫] সাধারণ মানুষেরও কখনো কখনো হয়তো একটা সুর মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে, ইচ্ছা করেও একটা চিন্তা ঝেড়ে ফেলতে পারে না। এটা অতিরিক্ত হলেই বলা যাবে তা মানসিক রোগ। এরকম **অস্বাভাবিক চুরি করবার ইচ্ছাকে বলে kleptomania**। তেমনি **ঘরে আগুন দেবার অদম্য ইচ্ছাকে বলে pyromania**।

বিষণ্ণতা

প্রায় সমস্ত বায়ুরোগীর লক্ষণীয় উপসর্গ হচ্ছে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলা, আত্মকরুণা (self-pity) ও অকারণ বা অতিরিক্ত বিষন্নতা। দুনিয়ার সম্বন্ধে তাদের অভিযোগের অন্ত নেই।

১৪ Compulsion: An irresistible urge to perform some act, such as stealing, lighting fires, or repeating a ritual. Munn—Psychology, Glossary, p. 461

১৫ The interpretation which we gave of obsessions holds true of compulsions in all essential respects. In the case of compulsions we are perhaps usually dealing with an individual who is more inclined to motor activity. The differentiating factor often appears to reside, however, in the opportunity or lack of opportunity for the overt expression of the conflict. Fisher—An Introduction to Abnormal Psychology, p. 223

Morton Prince কিছু ব্যাপকতর অর্থে obsession কথাটি ব্যবহার করেছেন এবং নিম্নলিখিতভাবে তাদের চার দলে ভাগ করেছেন—(a) Those cases in which there is some manifestation of emotion often vague and poorly defined without the individual's experiencing emotion. (b) Those cases inwhich the individual both experienees and manifests emotions but without any perception of the cause of the emotion. (c) The true phobias—here the individual is aware of the emotion, expresses it in his actions and is cognizant of the stimulus or situation which arouses it. The stimulus is not a rationally adequate cause, however, of the emotion. (d) Those cases in which the emotion is experienced, expressed and is in harmony with the apparent stimulus or situation which arouses it. M. Prince—The Unconscious, Ch. XI & XII

সমস্ত নিউরোটিক্‌ রোগীই তার পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য সমান ভাবে হারায় না। কেউ কেউ **ক্ষতিপূরণমূলক পরিবর্ত-ব্যবহার** (compensatory substitute behaviour) -দ্বারা পরিবেশের সঙ্গে একটা অলীক সঙ্গতিস্থাপন করে নিতে সমর্থ হয় এবং কিছু দীর্ঘদিন মনোযোগের সঙ্গে এদের লক্ষ্য না করলে, এরা যে নিউরোটিক্‌ তা বাইরে থেকে সহজে বোঝা যায় না। কিন্তু কোন কোন রোগী সহজেই সঙ্গতি হারিয়ে ফেলে এবং তাদের অস্বাভাবিক ব্যবহার সহজেই ধরা পড়ে। যারা প্রথম দলের তাদের চিকিৎসা কঠিন, কারণ তারা নিজের মধ্যে নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে একটা কাল্পনিক জগতে বাস করে। তারা যে বায়ুরোগগ্রস্ত তা তারা নিজেদের কাছেও স্বীকার করতে অনিচ্ছুক। যাদের বাইরে অন্য দশটা বিষয়ে আগ্রহ আছে (extrovert), তারা সহজেই মানসিক এই দুর্বলতার সাময়িক অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারে। যে ক্ষেত্রে তারা হেরে যাচ্ছে, অথবা হেরে যাবে বলে আশঙ্কায় তারা আত্মবিশ্বাস হারিয়েছে, সেখানে তাদের অন্য আগ্রহের দিকে মানাসক শক্তি চালিত করে দিতে পারলে শীঘ্রই তারা ভাল হয়ে ওঠে। শিশুরা বায়ুরোগগ্রস্ত হলে তার সহজেই দিশাহারা হয়ে পড়ে, সমাজের সঙ্গে সঙ্গতি হারিয়ে ফেলে এবং তাদের বাহ্য ব্যবহারে সে অসঙ্গতি স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। তারা নিজেদের রোগের প্রকৃতি ও কারণ বুঝতে পারে না এবং নিজের চেষ্টায় মানসিক শক্তিকে অন্যদিকে প্রবাহিত করে দিতেও তারা পারে না।[১৬] চিকিৎসককেই সেই কাজটি করে দিতে হয়। সমস্ত বায়ুরোগের চিকিৎসা

১৬ Adults frequently find adequate outlets for their conflicts whereas children are unable to inhibit or redirect their emotional disturbances. Therefore neurotic children show their difficulties more overtly than adults. They usually do not understand the significance of their overt behaviour in relation to the attitudes of others and are not fully aware of the importance of social approval and disapproval. Adults sometimes partially solve their major difficulties by a variety of identifications which are impossible for children. The neurotic adult is able to release his emotional energy by identifying himself with his work or with some social or political cause or with intellectual and emotional issues which are of current importance. Children on the other hand, are unable to make such identifications and their experiential and intellectual limitations do not allow them to release their energies in socially approved ways. Sherman—Basic Problems of Behaviour, pp. 357-58

সম্বন্ধেই একথা সত্য যে রোগীর মনকে তার খোলসের থেকে বের করে এনে বাহ্যজগতের সঙ্গে একটা সক্রিয় ও সুস্থ সম্বন্ধে যোগ করে দেওয়া প্রয়োজন।

বায়ুরোগের বিভিন্ন শ্রেণী

নিউর‍্যাস্‌থেনিয়া (Neurasthenia)—সমস্ত বায়ুরোগের মধ্যে যা সব চেয়ে বেশী সাধারণ এবং যেটা স্বাভাবিক মানুষ থেকে খুব বেশী পৃথক নয়, সে হচ্ছে নিউর‍্যাস্‌থেনিয়া। এরা হচ্ছে তেমন বাতিকগ্রস্ত বায়ুরোগী, যারা নিজের নানা দৈহিক উপসর্গ নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত এবং যারা মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে অনিচ্ছুক। মায়ার্সন-এর মতে সমগ্র বয়স্ক জনসংখ্যার শতকরা সাত থেকে আট জন এই নিউর‍্যাস্‌থেনিয়ার লক্ষণাক্রান্ত।[১৭]

নিউর‍্যাস্‌থেনিয়া কথার মূলগত অর্থ হচ্ছে স্নায়বিক অবসন্নতা অথবা স্নায়বিক শক্তিহ্রাস (Neurasthenia literally means diminished nervous energy or nervous exhaustion)। বাস্তবিকপক্ষে এই রোগীরা যে দৈহিক কষ্টটির কথা সবচেয়ে বেশী বলে, সে হচ্ছে **অবসন্নতা (sensation of fatigue)**। সাধারণ সুস্থ মানুষ গুরুতর পরিশ্রম করলে অবশ্যই ক্লান্ত হয়। কিন্তু নিউর‍্যাস্‌থেনিয়ার যে ক্লান্তি তা অতিরিক্ত এবং অস্বাভাবিক। সাধারণ বিশ্রামের সঙ্গে এই ক্লান্তি-দূরীকরণের কোন সম্বন্ধ নেই। বরঞ্চ রোগী রাত্রিতে অপেক্ষা সকালবেলা ঘুম হতে উঠে অধিক ক্লান্তবোধ করে। হারটেন্‌বার্গ এই ক্লান্তির স্নায়বিক কারণ-নির্ধারণের জন্যে এক বিশেষ যন্ত্র ব্যবহার করে এক পরীক্ষার ফলে এই সিদ্ধান্ত করলেন যে, এটা কেন্দ্রীয় স্নায়ুসূত্রের কোন গোলযোগঘটিত—প্রান্তীয় স্নায়ুসূত্রের সঙ্গে এর কোন যোগ নেই (peripheral nerves cannot be correlated with it)।[১৮]

আর একটি অতি সাধারণ উপসর্গ হচ্ছে **মাথাধরা**। এর সঙ্গে অনেক সময় যুক্ত থাকে চক্ষুর ক্লান্তি এবং **দৃষ্টি -বিষয়ে অস্পষ্টতা (blurred vision)**। এই মাথাধরা প্রায় সব সময়ই থাকে এবং মাঝে মাঝে মাথায় অসহ্য ব্যথাবোধ থাকে। শুধু মাথার ব্যথা নয়, দেহের নানা অঙ্গেও ব্যথা-বেদনার কথা রোগী

১৭ Myerson—The Psychology of Mental Disorder, p. 59

১৮ Hartenberg—Treatment of Neurasthenia, Ch. 3

বলে। পিঠেই এ ব্যথা বেশী এবং কখনো কখনো এ ব্যথা বাতের ব্যথার মতো গাঁটে গাঁটে হয়।

এ সব রোগীদের সকলেরই প্রায় পেটের নানা অসুখ লেগেই থাকে—কোষ্ঠবদ্ধতার কষ্টের কথা অধিকাংশ রোগী বলে। কারো কারো বিষম **বমির ভাব** থাকে। পেটে **হজমের গোলযোগজনিত ব্যথা (gastric pains)** এবং কোন কোন ক্ষেত্রে **তলপেটে খিঁচুনী (abdominal cramps)** দেখা যায়। ক্ষুধাবোধ অনেকেরই থাকে না এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় **খাওয়া -সম্বন্ধে অতিরিক্ত বাছবিচার**। কোন্ খাদ্য তার হজম হয় না, কেন এ খাদ্য তার সহ্য হয় না, তার মায়ের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে এ রোগ সে পেয়েছে, এরকম নিজের সম্পর্কে আক্ষেপ-বিলাপ করতে সে ভালবাসে।

অনিদ্রা প্রায় সমস্ত নিউরোটিক্ রোগীর একটি ক্লেশকর সাধারণ উপসর্গ। তারা ভালো ঘুমোতে পারে না। আর যখন ঘুম হয়ও তখনও তা নানা দুঃস্বপ্নপূর্ণ। কাজেই ঘুমের মধ্য দিয়ে শরীরের যে স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর ক্লান্তি-অপনোদন তা তাদের হয় না। একটা জিনিস লক্ষণীয় যে তারা তাদের অনিদ্রা বা অন্যান্য শারীরিক উপসর্গ নিয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলতে ভালবাসে। বাস্তবিক পক্ষে তাদের আগ্রহের পরিধি নিজ দেহের সীমার মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং নিজের দেহের নানা কষ্ট ও দুর্গতি নিয়ে হা-হুতাশ করে মানুষের করুণা-উদ্রেক করার চেষ্টায় তারা এক অস্বাভাবিক তৃপ্তিবোধ (morbid satisfaction) করে। কোন কোন রোগী বলে, **কানের মধ্যে শব্দ** শুনতে পায় (ringing and buzzing sounds—akoasms)।

অনেক নিউর‍্যাস্থেনিয়ার রোগীই তীব্র আলো বা শব্দ সহ্য করতে পারে না। ভীড়, গোলমাল, পাশের বাড়ীর রেডিও, বাথরুমে চৌবাচ্চার জল পড়ে যাচ্ছে, সূর্যের আলো বড় প্রখর, এসব নিয়ে নালিশ (general hyperaesthia) এসব রোগীরা হামেশাই করে। এর থেকেই সাধারণ লোকের ধারণা এ রোগ হচ্ছে স্নায়বিক; স্নায়বিক দুর্বলতা ও অতি সহজে স্নায়ুমণ্ডলী চঞ্চল হয়ে ওঠাই সমস্ত বায়ুরোগের কারণ। এর মধ্যে এটুকু সত্য আছে সমস্ত বায়ু-রোগের সঙ্গে স্নায়বিক দুর্বলতার যোগ আছে এবং সমস্ত বায়ুরোগীতে সবল ইচ্ছার যে শাসন-দ্বারা নিজেকে সম্পূর্ণ পরিচালনা এবং আত্মদমন করা যায়, মস্তিকের সেই উচ্চতম সংযোগ-কেন্দ্রগুলির ক্ষমতা ব্যাহত হয়। তাই এই

সমস্ত ব্যাধিকেই **ব্যক্তিত্বের বিকৃতি** (personality disorders) বলা হয়। তাদের **মনঃসংযমের ক্ষমতা দুর্বল** হয়ে যায় বলেই যে-সব শব্দ বা গোলমাল বা আলো সাধারণ মানুষ উপেক্ষা করতে পারে, এসব দুর্বলচিত্ত মানুষেরা তা পারে না। এরা অল্প শব্দ, ক্ষীণ আলোতেও অস্থিরতা প্রকাশ করে; তা থেকে কেউ কেউ এ সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে এ ব্যক্তিদের ইন্দ্রিয়ের চেতনা অতিরিক্ত (hyper-acuity of vision or audition)। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত সম্ভবত সত্য নয়। সুস্থ ব্যক্তিত্বের প্রবল ইচ্ছাশক্তি এদের থাকে না বলেই এদের মনোযোগ অতি সহজে বিচলিত হয়।[১৯]

সাধারণত দেখা যায় নিউর‍্যাস্থেনিয়ার রোগীরা **রুক্ষমেজাজ**, অল্পতেই **নিরুৎসাহ** এবং অতিমাত্রায় **বিষণ্ণতাপরায়ণ**। এই বিষণ্ণতার সঙ্গে নিজ স্বাস্থ্য -সম্বন্ধে অতিরিক্ত দুর্ভাবনা দেখা যায়। এ জাতীয় অবস্থাকে **hypochondria** বলা হয়।[২০] অথচ বাস্তবিক পক্ষে রোগীর স্বাস্থ্য বিত্ত জীবিকা অথবা আত্মীয়-স্বজনদের সম্পর্কে চিন্তিত হবার সত্যই কোন কারণ নেই।

ওপরের উপসর্গগুলি সবই যে একই ব্যক্তিতে উপস্থিত থাকবে এমন কোন কথা নেই। তবে এই উপসর্গগুলি সব মিলিয়ে আমরা রোগীর অসঙ্গত ব্যবহারের একটি সমগ্র চিত্র পাই (we have a fairly complete non-adjustive reaction-picture or syndrome of neurasthenia)। এ বিষয়ে বহু উদাহরণের উল্লেখ Crow & Crow, Sherman, Pressey & Pressey, Dorcus & Shaffer, Gillespie প্রমুখ মনোবিদের মানসিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক রোগের চিকিৎসা -বিষয়ক অনেক গ্রন্থে পাওয়া যাবে।

নিউর‍্যাস্থেনিয়া খুব গুরুতর মানসিক রোগ নয়। এ সব ক্ষেত্রে রোগী সমাজজীবনের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে সঙ্গতিপূর্ণ ব্যবহারে সমর্থ না হলেও, সে তার ব্যক্তিত্বের ঐক্য সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলে না। এ কথা বলা যায় যে

১৯ There is no positive evidence, however, that the neurasthenic actually possesses a hyperacuity of vision or audition, that he can actually hear better or see better than the normal person. Rather it is a matter of increased distractability; those patients find it extremely difficult to concentrate their attention and correspondingly difficult to ignore relatively insignificant stimuli. Fisher—An Introduction to Abnormal Psychology, p. 156

২০ Hypochondria: exaggerated or obsessive attention to and anxiety about one's health. Drever—Dictionary of Psychology

তার আত্মবিশ্বাস শিথিল হয়ে গেছে। তার হীনতাবোধের জন্যেই সে নিজেকে সমাজজীবনের সুস্থ সক্রিয় আনন্দময় পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, খোলসের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে ফেলে আত্মরক্ষা করতে চেষ্টিত। ফিশার্‌ নিউর্যাস্‌থেনিক ব্যক্তিদের সম্পর্কে আলোচনা করে, তাদের সম্বন্ধে দশটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

(১) সম্ভবত তার বংশগত অনুরক্তি ও বংশগতির প্রতি আসক্তি অতি মাত্রায় প্রবল। সে নিজ পরিবারের মধ্যে নিজেকে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে রাখতেই বেশী ভালবাসে। সুতরাং সে আত্মীয়স্বজনের ওপর বড় বেশী নির্ভরশীল এবং তাদের আনুগত্য ও অনুরাগ বড় বেশী দাবি করে। আত্মীয়-স্বজনের মতামতকে ও অনুরাগ-বিরাগকে সে বড় বেশী দাম দেয়। তার নিজের মধ্যে অনেক হীনতাবোধ আছে বলেই সে বড় বেশী জড়িয়ে ধরতে চায়। তার যৌন ও অনুরাগের জীবনে মাত্রাধিক্য ও অতৃপ্তি লক্ষণীয়। নিউর্যাস্‌থেনিয়ার রোগীর লক্ষণগুলিকে তার বংশ-পরিবারের প্রতি অত্যধিক আকর্ষণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার উপায় বলে মনে করা যেতে পারে। তার আপাত আত্মকেন্দ্রিকতা বাস্তবিক পক্ষে বংশ বা পরিবারের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতারই বিপরীত প্রতিক্রিয়া।

(২) নিউর্যাস্‌থেনিক রোগীর নিজের স্বাস্থ্য বা খাদ্য -সম্বন্ধে অতিমাত্রার খুঁৎখুতে ভাব অনেকটা শিশুসুলভ প্রত্যাবৃত্তি মনে হলেও, মোটের ওপর তার আগ্রহ-উৎসাহ সাবালক মানুষেরই উপযুক্ত।

(৩) নিউর্যাস্‌থেনিক রোগীর মনের মধ্যে আছে হীনতাবোধ। এর কারণ সে নিজেকে পরিবার বা সংসার থেকে নিজেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র করে দেখতে শেখে নি। তার মধ্যে আত্মপ্রত্যয়ের অস্তিবাচক অবস্থা দুর্বল (he will be found to possess negative ego-identification)।

(৪) বায়ুরোগী সাফল্য ও ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠালাভের জন্যে অতিমাত্রায় উদ্বিগ্ন। তার নিজ শক্তি সম্বন্ধে অনাস্থার জন্যে সে তাই কর্তব্যের মুখোমুখি হয়ে স্বস্তিবোধ করে না।[২১]

২১ The Neurasthenic reactions themselves are in large part defenses against the individual's capacity for, and liability to, unselfish responses. Fisher—An Introduction to Abnormal Psychology, p. 171

(৫) বায়ুরোগী অসুখী। সে নিজের অবস্থাকে যথাসাধ্য কালো রংয়ে চিত্রিত করে দেখতে অভ্যস্ত। নিজের দেহের নানা উপসর্গের ক্লেশকর কারাগারে সে স্বেচ্ছাবন্দী।

(৬) অনেকে বায়ুরোগীকে দুর্বল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি বলে করুণা করে। তাঁরা মনে করেন তার রোগের উপসর্গগুলি কাল্পনিক, রোগী ইচ্ছা করলেই সেগুলি ঝেড়ে ফেলতে পারে। কিন্তু বায়ুরোগীর ক্লেশ ও দুর্ভোগ মিথ্যা নয়। শারীরিক কষ্টগুলির বাস্তব কারণ না থাকলেও সে-কষ্টগুলি সে সত্যই ভোগ করে।

(৭) বায়ুরোগীর হীনতাবোধের জন্যেই সে স্বেচ্ছায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে ভয় পায়। সে ছোটখাট সমস্ত ব্যাপারকেই অতি বড় করে দেখে। তার মনের চোখে যেন স্থায়ীভাবে অণুবীক্ষণ যন্ত্র লাগানো।

(৮) বায়ুরোগী অত্যন্ত অন্তঃকেন্দ্রিক (introverted)। তার অভিমান প্রবল। তার অনুভূতি তীক্ষ্ণ এবং তাদের সে সংযত ও শান্ত করতে পারে না। এর থেকেই তার নানা সমস্যার উদ্ভব। তার মধ্যে হাস্যরস ও কৌতুক-বোধের আপাত অভাব।

(৯) তার এই অতি তীব্র অনুভূতি ও অন্তঃকেন্দ্রিকতা তার দৈহিক-স্নায়বিক গঠনে মজ্জাগত এবং সম্ভবত তা কিছুটা বংশগতও বটে।

(১০) জীবনের সমস্যাগুলির যুক্তিসঙ্গত সমাধানে সে অক্ষম। তার প্রধান আত্মরক্ষামূলক প্রতিক্রিয়াগুলি হল, বিকল্পের সাহায্যে ক্ষতিপূরণ (compensation), নেতিবাচকতা (negativism), অতিরিক্ত অন্তর্বিশ্লেষণ এবং নিজের যুক্তিহীন চিন্তা ও কর্মের সমর্থনে মিথ্যা যুক্তির আশ্রয়গ্রহণ (rationalization)।

২২ The neurasthenic always is over-oriented toward future ends. He is one of those persons who tends to take accomplishment too seriously and to feel that it is incumbent upon him to achieve certain results. Ibid—p. 178

বিংশ অধ্যায়

দুর্ভাবনা-বায়ু

অতিরিক্ত বা অহেতুক দুশ্চিন্তা বা দুর্ভাবনা প্রায় প্রত্যেক বায়ুরোগীর প্রত্যক্ষ লক্ষণ। অনেক সময়ই এই দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা কোন বিশেষ ঘটনা বা অভিজ্ঞতা নিয়ে নয়, কারণ বাইরে থেকে অন্য সুস্থ মানুষের বিচারে রোগীর দুশ্চিন্তার কোন বাস্তব কারণ নেই। কিন্তু সামান্য কোন ঘটনা বা অভিজ্ঞতার ধাক্কায় অনিশ্চিত অস্পষ্ট দুর্ভাবনাটা কতকগুলি নির্দিষ্ট এবং অসুস্থ দৈহিক লক্ষণের মধ্যে স্ফুট হয়ে ওঠে। তখন রোগী তার দুশ্চিন্তার একটা স্পষ্ট বা নির্দিষ্ট কারণ কল্পনা করে, অতিমাত্রায় বিচলিত হয়ে পড়ে।[১] এক দুশ্চিন্তার কল্পনা আরো দশটা দুর্ভাবনার জন্ম দেবে। ক্রমে এই দুশ্চিন্তা একটা স্থায়ী বাতিকে দাঁড়িয়ে যায়। দুর্ভাবনার তীব্র ও প্রাথমিক অবস্থায় অতি দ্রুত হৃদস্পন্দন (tachycardia), হজমের গোলযোগ, ইন্দ্রিয়-চেতনায় বিশৃঙ্খলা (যেমন ঘোলা-ঘোলা দেখা, কান ভোঁ-ভোঁ করা) এবং তীব্র অসুস্থতাবোধ ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়। পরে দুর্ভাবনার ভাবটা স্থায়ী বাতিকে পরিণত হলে রোগীর বাহ্য দৈহিক উপসর্গগুলি হ্রাস পায়, কিন্তু চিন্তা ও কল্পনার বিশৃঙ্খলা লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত দুর্ভাবনার অনুষঙ্গী থাকে প্রবল হীনতা-বোধ বা অপরাধ-বোধ। ব্যক্তি নিজের ত্রুটি বা দুর্বলতা নিয়ে আত্মগ্লানি বোধ করে নিজেকে সমস্ত দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী মনে করে। আবার কখনো বা পরের ওপর সে সব দোষ চাপিয়ে অভিমানে সকলের কাছ থেকে সরে যায়।

১ Descriptively or symptomatically it is customary to distinguish two forms of neurotic anxiety. The first is called "free floating." The individual is anxious but he has no idea of the unapproachable inner difficulty to which he is reacting in this manner. He suffers from waves of anxiety without apparent cause...In the second form the anxiety becomes attached to some fact which the individual regards as the cause. In one case, the individual will attribute his daily anxiety to his "poor health" which gives us a condition of hypochondria; in another instance his anxiety he thinks, is due to financial matters. Fisher—An Introduction to Abnormal Psychology, p. 177

এই রোগীরা বলে, তারা কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করতে পারে না। সর্বদাই অস্থিরতা বোধ করে, সহজে ঘুমিয়ে পড়তে পারে না, ভালো হজম হয় না এবং অল্পেতেই বিষম ক্লান্ত বোধ করে।[২]

ভয় ও দুর্ভাবনা

ভয় একটি মৌলিক এবং অতি প্রয়োজনীয় অনুভূতি বা প্রক্ষোভ। আর দুর্ভাবনা বা দুশ্চিন্তা ভয়েরই এক অনির্দেশ্য রূপ। আদিম মানুষের জীবন ছিল সদা ভয়সঙ্কুল। সভ্যতার ক্রমবিকাশের ফলে মানুষ তার সেই সদা ভয়-বিহ্বলতার অবস্থা উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে। জীবনের বিরুদ্ধে যে স্থূল প্রতিকূল অবস্থাগুলি তা মানুষ ক্রমে জয় করেছে। আজ সভ্য মানুষ বন্য জন্তু বা হিংস্র শত্রুর অতর্কিত আক্রমণের ভয়ে ভীত নয়। সে ভূতের ভয় করে না, বজ্রগর্জন, ঝড়কে সে অনেকটা উপেক্ষা করতে শিখেছে। কিন্তু সভ্যতা তাকে এনে দিয়েছে নতুন নতুন ভয়—জীবিকানাশের ভয়, সামাজিক প্রতিষ্ঠায় প্রতিযোগিতায় পরাজয়ের ভয়, তার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, তার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য হারাবার ভয়।

বর্তমান সভ্য মানুষ ভয়ের প্রকাশকে কাপুরুষতার লক্ষণ বলে মনে করে। এটা সভ্য মানুষের প্রবলতর আত্মাভিমানের লক্ষণ। আধুনিক সভ্য মানুষ সাহসকে উচ্চ মূল্য দেয়। কিন্তু সাহসী মানুষের ভয়ের অনুভূতি লুপ্ত হয়েছে এটা মনে করা ভুল। আধুনিক সভ্য মানুষ ভয়ের প্রকাশকে দমন করতে শিখেছে। কিন্তু ভয় মাত্রই নিন্দনীয় নয়। যা বিপজ্জনক, তাকে ভয় করাটাই স্বাভাবিক। সভ্যতার বিকাশে, মানুষের উচ্চতর ক্রম-পরিণতিতে ভয়ের স্থান নগণ্য নয়। বিপদের বিরুদ্ধে যুক্তিসঙ্গত সংগ্রামের জন্যে ভয় প্রবল প্রেরণার কাজ করে। ভয় আত্মরক্ষা ও জাতিরক্ষার জন্যে

২ Frequently anxious persons may have a strong sense of guilt regarding some real or imagined moral transgression. The resulting anxiety is based partly upon a fear of expressing himself in the manner which he believes will result in social disapproval...the acute attacks of anxiety are generally accompanied by many physical symptoms, such as heart palpitation, gastric disturbances, sensory disturbances, and a feeling of acute illness. The chronic anxieties involve less intense physical disturbances, and are accompanied by ideational rather than bodily symptoms. Sherman—Basic Problems of Behaviour, p. 371

একান্ত প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক বৃত্তি। ঘরে যখন আগুন লেগেছে তখন ভীত হয়ে বাইরে পালিয়ে প্রাণরক্ষা কাপুরুষতা নয়। তবে ভয়ে দিশাহারা হয়ে শিশু এবং অসহায়দের রক্ষার কথা চিন্তা না করে নিজের জীবন নিয়ে পলায়ন অবশ্যই কাপুরুষতা। ক্যানন্ প্রমুখ মনোবিদ্‌রা ভয়কে হেয় করেন নি। তাঁরা একে বলেছেন emergency motive—অকস্মাৎ বিপদের মুখে আত্ম-রক্ষার প্রবলতম স্বাভাবিক প্রেষণা। অবশ্য ভয়ে বিহ্বল হলে মানুষ বিচারবুদ্ধি-ভ্রংশ হয়। সেই দিশাহারা অ-শাসিত অন্ধকার ভয় মানুষের আত্মরক্ষার পক্ষেও মস্ত বিঘ্ন হয়ে দাঁড়ায়। এক হিসাবে বলা যায় কাম ঔৎসুক্য সহানুভূতি ইত্যাদি আত্মকেন্দ্রিক প্রধান অন্যান্য অনুভূতির পথ ভয় রুদ্ধ করে দেয়।

ভয় ও দুশ্চিন্তা: দুশ্চিন্তা ও অন্যান্য মেজাজ

দুশ্চিন্তা মাত্রই মানসিক রোগের লক্ষণ নয়। দুশ্চিন্তার পশ্চাৎপটে থাকে ভয় এবং সে ভয় সম্পূর্ণ সঙ্গত হতে পারে। বর্তমান কোন বিপজ্জনক বস্তু বা ঘটনা যার মুখোমুখি হয়ে, তাকে জয় করবার আশা যখন করতে পারি না—তার সম্বন্ধে আমাদের হয় ভয়। তাই বাঘকে ভয় করি, আগুনকে ভয় করি। কিন্তু ভবিষ্যৎ বিপজ্জনক বস্তু বা ঘটনা সম্বন্ধে মনে জাগে দুশ্চিন্তা। আমার ছেলে যদি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে, তা হলে দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা খুবই স্বাভাবিক ও সঙ্গত। দুশ্চিন্তা হচ্ছে অনুভূতির একটি তীব্র ও কিছুটা স্থায়ী অথচ অস্পষ্ট অবস্থা (anxiety is an emotional mood)। যখন আমাদের সামনে এমন অবস্থার উদ্ভব হয় যার সমাধান আমার সাধ্যের বাইরে এবং তার ফলে একটি অমীমাংসিত সংঘাতের সৃষ্টি হয়, ক্ষতি বা নিন্দার আশঙ্কা থাকে, তখন দুর্ভাবনা -রূপ একটি অনুভূতির অস্পষ্ট বাষ্প জমে ওঠে। এরকম আরো কয়েকটি মেজাজ বা mood আছে। তাদের মধ্যে প্রধান কটির মধ্যে পার্থক্য করা যেতে পারে। নিশ্চিন্ততা (elation) হচ্ছে সংঘাত বা সমস্যার সমাধানের পর মনের প্রফুল্ল অবস্থা। মনটা দমে যাওয়ার মেজাজ (despondency) দেখা দেয়, যখন ব্যক্তি মনে করে যে সমস্যা- বা সংঘাত-সমাধানের কোন আশাই নেই; আর ঔদাসীন্য (apathy) হচ্ছে যখন সমস্যার চূড়ান্ত

সমাধান হয়ে গেছে এবং এ ব্যাপারে ব্যক্তির আর বিন্দুমাত্রও আগ্রহ নেই।[৩]

যেখানে অবস্থার আশু প্রতিকারের সম্ভাবনা বা শক্তি নেই সেখানে ব্যক্তির স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে দুর্ভাবনা। এ অবস্থা এড়াবারও উপায় নেই অথচ এর সমাধানও ব্যক্তির সাধ্যাতীত। ছেলে কঠিন রোগে আক্রান্ত। পিতা সাধ্যমত ডাক্তার দেখাচ্ছেন কিন্তু রোগের উপশম হচ্ছে না—এ অবস্থায় দুর্ভাবনা নিতান্তই স্বাভাবিক।[৪]

দুশ্চিন্তার দৈহিক প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট জটিল। দুশ্চিন্তায় পেশীগুলির—বিশেষত মুখের পেশীগুলির—একটা আড়ষ্ট অথচ অস্থির অবস্থা দেখা যায়, অন্ত্রের ক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়, নাড়ী চঞ্চল হয়, হৃদস্পন্দন দ্রুততর হয়, রসক্ষরা গ্রন্থির ক্ষরণে পরিবর্তন দেখা যায়। উদ্বিগ্ন অবস্থার সম্মুখীন হয়ে ব্যক্তি অবস্থার প্রতিকারের জন্যে উদ্যমে প্রবৃত্ত হতে ইচ্ছুক, অথচ কোন সফল ক্রিয়ার পথ রুদ্ধ। দীর্ঘকাল এ দুশ্চিন্তার অবস্থা মনের উপরও যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করে। শেষে অবস্থাটা গা-সওয়া হয়ে যায়। তার অর্থ, দুর্ভাবনার মানসিক অস্থিরতা আপাত প্রশমিত হয়ে তার বাহ্য প্রকাশটা হয়তো আর দৃষ্টি-আকর্ষণ করে না। এবং সম্ভবত তখন পেশী বা অন্ত্রের কতকগুলি লক্ষণে অস্থিরতা স্থানচ্যুত হয়ে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে তা আত্মপ্রকাশ করে। হাত-পা কাঁপা, স্বরভঙ্গ ইত্যাদি অনেক সময়ই দমিত মানসিক দুর্ভাবনার বাহ্য প্রকাশ।

স্বাভাবিক দুশ্চিন্তার বাহ্য বাস্তব কারণ থাকে। কিন্তু বায়ুরোগীর যে দুর্ভাবনা তার মূলে বাহ্য ও বাস্তব যথেষ্ট কারণ নেই। এই অসুস্থ দুশ্চিন্তা ব্যক্তির নিজের মনের সৃষ্টি—এটা তার অন্তরে অমীমাংসিত কোন সংঘাতের

৩ Anxiety is a mood···A mood is a relatively enduring feeling-emotion state which does not incline the individual towards any recognisable goal, or feasible line of activity, whereby he might rid himself of the tension. Among the more common moods are anxiety, despondency, apathy, elation and irritability. Anxiety is a reaction to an unsolved conflict which results from any kind of inadequacy; elation is a reaction to a solved conflict; depression (despondency) to an unsolvable conflict; and apathy to the competent solution of a conflict. Harris--Anxiety—Its Nature & Treatment, Jour of Ment. Science, Vol. 80, 1934, pp. 482-512

৪ Normal anxiety is a reaction to an unapproachable difficulty which the individual is unable to avoid. Fisher—An Introduction to Abnormal Psychology, p. 175

ফল। এই সংঘর্ষ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন নৈতিক সমস্যার সুসমাধানে অক্ষমতাজনিত অপরাধবোধ থেকে আসে। সেটা সত্যি করে খুব বড় কোন অপরাধ না হতে পারে, কিন্তু তার মনের মনে ওই 'পাপ' সম্বন্ধে অত্যন্ত গভীর লজ্জা ও আত্মধিক্কার আছে।[৫] কিন্তু ব্যক্তি তা স্পষ্টভাবে স্বীকার করে নৈতিক সমস্যাটির সুসঙ্গত সমাধান করতে ইচ্ছুক নয়। সে সেই সমস্যাকে এড়িয়ে যেতে চায় এবং তার দুর্ভাবনা-বায়ুর প্রকৃত কারণের পরিবর্তে সে অন্য সব আপাত-যুক্তিসঙ্গত কারণ-নির্দেশ করে নিজ লজ্জাবোধ থেকে নিস্তার পেতে চায়। তার দুর্ভাবনা তাই কতকগুলি দৈহিক উপসর্গে স্থানান্তরিত (displaced) হয়। তার দুশ্চিন্তার 'কারণ' বলে যা সে নির্দেশ করে, তা যে যুক্তিসঙ্গত, এটাই সে নিজেকেও বোঝাতে চায়।[৬]

একটি মেয়ে বিবাহের পূর্বে পুরুষ-সংসর্গের ফলে অন্তঃসত্ত্বা হয়। তার মার প্ররোচনায় ও সাহায্যে সন্তানটিকে নষ্ট করে ফেলা হয়। তার কয়েক বৎসর পর তার বিয়ে হয় এবং দু'বছর পর তার আর একটি মেয়ে হয়। তার স্বামীকে তার অতীত জীবনের অপরাধের কথা সে জানায় নি। কিন্তু অল্পদিন পরেই তার অস্বাভাবিক ও অসুস্থ দুর্ভাবনার লক্ষণ দেখা দিল। স্বামী হঠাৎ ঘরে এলে সে চমকে উঠত। স্বামী তার টেবিলের ড্রয়ার খুললে

৫ When a person continually feels anxiety for which there is no adequate objective justification, two things are fairly certain. First, the real cause of his anxiety is not what he is temporarily worrying about, but something more fundamental, which has been repressed. Secondly, the repressed anxiety contains an element of guilt-feeling...It is a paradoxical fact that the people most subject to guilt-feeling, and so to anxiety, are usually the people who objectively, have least to feel guilty about. The sufferer from anxiety neurosis is usually a highly conscientious person with strong moral sentiments. He is constantly falling short of his own standards, but this is not because his behaviour is worse than other people's but because his standards are higher. Rex & Margaret Knight—A Modern Introduction to Psychology, p. 233

৬ Attached anxiety (as distinct from the "free floating type") follows a sort of rationalization process. The individual is unaware of the cause of his anxiety but is inclined to account for it. He casts about for a possible explanation and sooner or later hits upon a probable cause. Thereafter his anxiety and its rationalized cause become more and more associated in his thinking. As time goes on, he gradually magnifies the importance of the "cause" till it is brought into consonance with his degree of anxiety. Fisher—An Introduction to Abnormal Psychology, p. 178

বিষম অস্থিরতা প্রকাশ করত এবং তার নতুন মেয়েটি নিয়ে সর্বদাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হত। সে বলত, মেয়েটি বড় রোগা—সব সময়ই তার ভয়, মেয়ের অসুখ করবে, মেয়ে বুঝি গাড়ীচাপা পড়বে। ফলে মেয়েকে সে সর্বদা চোখে-চোখে রাখত, ঝিয়ের সঙ্গে বাইরে যেতে দিত না।

এখানে বোঝা কঠিন নয় যে, মেয়ের সম্পর্কে তার দুর্ভাবনার প্রকৃত কারণ, তার অতীত জীবনের অপরাধবোধ। মেয়ের সম্পর্কে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা নিজের অতীত পাপক্ষালনের চেষ্টা মাত্র।

দুর্ভাবনা-বায়ুর কয়েকটি সাধারণ লক্ষণ

(১) দুর্ভাবনা-বায়ুরোগীদের মনের পশ্চাতে থাকে, কোন না কোন কারণে নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে বিশ্বাসের অভাব, অথবা কোন অপরাধ-বোধ। একজন যুবক অধ্যাপক তাঁর ক্লাসে পড়ানো সম্পর্কে অতিমাত্রায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তিনি ছাত্র হিসাবে কৃতী ছাত্রই ছিলেন। প্রতিদিনের পড়া তৈরির বিষয়ে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করে থাকেন। কিন্তু তথাপি একই পড়া তিনবার-চারবার তিনি তৈরি করেন, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখস্থ করেন, তবু তাঁর মনে ভয় থেকে যায় ক্লাসে বক্তৃতার সময় হয়তো তিনি কোন ভুল করে বসবেন। এ দুর্ভাবনা অহেতুক এবং যে হীনতা-বোধ থেকে এ অসুস্থ দুর্ভাবনা তা জয় না করতে পারলে তিনি কখনই অধ্যাপনায় সাফল্যলাভ করতে পারবেন না। এটা দুর্বল ইচ্ছাশক্তি বা রুগ্‌ণ ব্যক্তিত্বের লক্ষণ।[৭]

এ হীনতাবোধ যার মধ্যে থাকে, সে অনেক সময়ই অতিমাত্রায় সন্ত্রস্ত থাকে, অন্যে বুঝি তার দুর্বলতা ধরে ফেলেছে। সে সর্বদাই সন্দেহ করতে থাকে অপরে বুঝি তাকে উপহাস করছে, বা অসম্মান করছে। তাই কারো সঙ্গে সে মন খুলে মিশতে পারে না, কাউকে খুব বিশ্বাস করতে পারে না এবং কোন প্রকারের সমালোচনা সহ্য করতে পারে না।[৮]

(২) এই রোগীরা সাধারণত বড় খিটখিটে-মেজাজ হয়, অন্যের সঙ্গে সামান্য কারণ নিয়ে ঝগড়া করে। এরও পশ্চাতে আছে হীনতা-বোধ বা অপরাধ-বোধ। তাদের আক্রমণাত্মক আচরণ, নিজের ত্রুটি ঢাকবারই

৭ Shaffer & Shoben—The Psychology of Adjustment, p. 6

৮ Sherman—Basic Problems of Behaviour, p. 372

অক্ষম চেষ্টা। যে সব কিশোর-কিশোরী যৌবনের প্রান্তে পৌঁছেচে, তাদের অন্তরের অনিরাপত্তা-বোধ ও হীনতা-বোধই তাদের অনেক সময় উদ্বিগ্ন ও রুক্ষ-মেজাজ করে তোলে।[৯]

(৩) দুর্ভাবনা-বায়ু যাদের থাকে তাদের ব্যবহারে প্রকাশ পায় অস্থির-চিত্ততা। তারা মনস্থির করতে পারে না। ছোটখাটো সামান্য ব্যাপারেও তারা সংকল্প-পরিবর্তন করে। বাস্তবিক সংকল্প করবার মতো দৃঢ়চিত্ততারই তাদের অভাব। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই অস্থিরচিত্ততা সাময়িক। কিন্তু বায়ুরোগের গুরুতর ক্ষেত্রে এই অস্থিরচিত্ততাই ব্যক্তির স্থায়ী স্বভাবে দাঁড়িয়ে যায়।

(৪) এই দুর্ভাবনা-বায়ুর সঙ্গে কতকগুলি দৈহিক অস্থিরতার লক্ষণও প্রায়শ দেখা যায়—হাত-পা কাঁপা (tremors), কোন অঙ্গ বা পেশীর বারে বারে স্পন্দন (tics) -রূপ বাতিক, দ্রুত এবং অনিয়মিত হৃদস্পন্দন (tachycardia), চোখে ঝাপসা দেখা, কানে নানা রকম শব্দ শোনা (akoasms), শিরোঘূর্ণন, অস্বাভাবিক ঘাম (neurotic perspiring), এবং তোতলামী (stuttering) ইত্যাদি লক্ষণ অনেক সময়ই দেখা যায়। গুরুতর ক্ষেত্রে পুরুষেরা স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গমের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে (impotency) এবং নারী-সঙ্গমেচ্ছা হারিয়ে পাথর হয়ে যায় (sexual frigidity)। এ বিষয়ে ফিশার তাঁর বইয়ে কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন।[১০] এ সব রোগীর অঙ্গসঞ্চালনে ও মুখের চেহারায় দুর্ভাবনা ও অস্থিরতার (bodily and facial tension) লক্ষণ সুস্পষ্ট। এরা অল্পেতেই চমকে ওঠে, সহজে ঘুমিয়ে পড়তে পারে না, ঘুমিয়ে উঠেও ক্লান্ত বোধ করে।

(৫) এ সব রোগীর মনের মধ্যে অনির্দেশ্য বিষম ভয় থাকে। এরা বলে, "ভয় হচ্ছে মাথায় বুঝি আকাশ ভেঙে পড়বে।"[১১]

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় নিউর‍্যাস্থেনিয়া ও দুর্ভাবনা-বায়ুর (anxiety neurosis) বহু লক্ষণই একরকম। এর থেকে এটা বোঝা যায় যে এ রোগগুলিকে সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক শ্রেণীবিভক্ত করা সম্ভব নয়।

৯ Griffith—An Introduction to Applied Psychology, pp. 304-5
১০ Fisher—An Introduction to Abnormal Psychology, pp. 180-192
১১ Sherman—Basic Problems of Behaviour, p. 373

দুর্ভাবনা-বায়ুর ব্যাখ্যা বা কারণ-নির্ণয়

এক কথায় বলা যায়, দুর্ভাবনা-বায়ু ব্যক্তিত্বের বা ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতা থেকে উদ্ভূত। সম্ভবত বাল্যকালের কোন অপ্রীতিকর অথবা বিহ্বলকর অভিজ্ঞতা এসব রোগীর ব্যক্তিত্বের ঐক্যকে শিথিল করে দিয়েছে। এই দুর্বলতার জন্মগত কারণও কিছু সাধারণত থাকে। তবে উত্তেজক কোন অভিজ্ঞতা অন্তরস্থ দুর্বলতাকে (inherent weakness) প্রকট করে তোলে। তখন রোগী একটি স্থায়ী ব্যক্তিত্বের আশ্রয় হারিয়ে কতকটা দিশাহারা হয়ে যায়। অন্তরের দুর্ভাবনা বা দুশ্চিন্তাকে অবদমনের চেষ্টায়ই দৈহিক লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। এ সব ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ঐক্য একেবারে ধ্বংস হয় না বলে এরা সংসারে মোটামুটি চলে-ফিরে কাজ করে বেড়াতে পারে। কোন একটি বা কয়েকটা বিষয়েই তারা অস্বাভাবিক। তাই তাদের হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করতে হয় না। তবে বিশেষজ্ঞ মনোবিদেরা তাদের উদ্বেগের মূল যে হীনতা-বোধ বা পাপ-বোধ তাকে ব্যক্তির সচেতন মনের সামনে পূর্ণ চেতনায় টেনে এনে যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে তার সঙ্গে মোকাবিলা করবার সাহস জুগিয়ে দিতে পারলে তারা রোগমুক্ত হতে পারে। ফ্রএডীয় মনোবিদেরা সমস্ত দুর্ভাবনার পশ্চাতেই কোন যৌন ইচ্ছার অবদমনজনিত বিশৃঙ্খলার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। অ্যাড্‌লার এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁর মতে হীনমন্যতা এবং তাকে অতিক্রম করার চেষ্টাই সমস্ত উদ্যমের মূল।[১২] সমস্ত বায়ুরোগের মতো দুর্ভাবনা-বায়ুতেও ব্যক্তি নিজের হীনতা- বা পাপ-বোধ ঢাকবার জন্যে দৈহিক কতকগুলি উপসর্গের আশ্রয় নিচ্ছে। এও একপ্রকার আত্মরক্ষার কৌশল।

১২ ফিশার এ বিষয়ে ফ্রএডীয় ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "A predisposition to anxiety neurosis resides for the most part in three sets of factors: (1) A lack of adequate positive ego-identifications (2) inverted ego-identifications and (3) fear and anxiety during childhood...In every case of anxiety neurosis the individual *might have become homosexual*...the anxiety neurotic is partially disoriented...the anxiety neurotic's symptom serves the purpose either of keeping the individual at a distance from others and from serious undertakings or of keeping his attention on himself or both...His first and greatest concern in life is to preserve what little sense of identity he has and he is therefore ready to become anxious upon the slightest frustration or upon his being forced or induced to make definite decisions and undertake a specific line of activity. Fisher—An Introduction to Abnormal Psychology, p. 192

একবিংশ অধ্যায়

অকারণ অসুস্থ ভয়

অনেক সময়ই দেখা যায় মানসিক যারা অসুস্থ তারা অকারণে অথবা অতি সামান্য কারণে ভয় পায়। ইতিপূর্বে ভয় ও দুর্ভাবনার মধ্যে সম্বন্ধ ও প্রভেদ -সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছি এবং জীবনের সুস্থ বিকাশের পক্ষে ভয়েরও যে একটা বিশেষ স্থান আছে তাও বলেছি। কিন্তু সুস্থ মানুষের যে ভয়, তার যথেষ্ট ও উপযুক্ত কারণ আছে এবং সে ভয় কিছু লজ্জা বা উদ্বেগের বিষয় নয়। কিন্তু অনেক সময় এমন অকারণ ভয়ে মানুষ আড়ষ্ট হয়ে যায় যার নির্দিষ্ট বা যথেষ্ট কারণ সে নির্দেশ করতে পারে না। এমন অকারণ ভয় কখনো কখনো সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষেও দেখা যেতে পারে। কিন্তু যদি এটা পুনঃ পুনঃ ঘটে এবং যদি দেখা যায় কতকগুলি নির্দিষ্ট অবস্থায় এ ভয় আত্মপ্রকাশ করছে, তবে সন্দেহ করতে হবে, সেই ব্যক্তি মানসিক সম্পূর্ণ সুস্থ নয়। এ রকম তিনটি অতি পরিচিত ভয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে—বদ্ধ স্থানের ভয় (claustrophobia), উঁচু জায়গা সম্বন্ধে ভয় (acrophobia) এবং খোলা জায়গা সম্বন্ধে ভয় (agoraphobia)। আরো কিছু অকারণ ভয়ের কথা পরে আলোচনা করব। একটি আধুনিক চিকিৎসাবিষয়ক অভিধানে ৩৪৪ রকম অকারণ ভয় বা phobia-র নাম দেওয়া হয়েছে।[১] সাধারণত বলা যায় বাল্যকালের কোন ভীতিকর অভিজ্ঞতা কোন কারণে অবদমিত হয়ে বয়স্ক জীবনে এই অকারণ ভয়সৃষ্টি করে। এই অবদমনের মূলে থাকে অনেক ক্ষেত্রেই কিছু অপরাধবোধ।[২]

১ ...in the more typical phobias, the object or situation that is feared is in no sense dangerous, though it arouses an inexplicable dread in the patient. Freud gives a list of some of the commoner phobias—remarking that they sound like the ten plagues of Egypt, except that there are far more than ten of them. They include darkness, open air, open space, cats, spiders, caterpillars, mice, thunder, blood, enclosed places, crowds, isolation, crossing bridges, and travelling by land or sea. Freud—Introductory Lectures on Psychoanalysis.

২ Many phobias are the result of childhood experiences that have been repressed...This is true in a sense; but where such cases are investigated, it is usually found that the childhood experience was more than simply

আবদ্ধ স্থানের ভয়ের একটি বিখ্যাত উদাহরণ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে একজন সাহসী মেডিক্যাল অফিসারের আবদ্ধ স্থানের অহেতুক ভয়ের উদাহরণ উল্লেখ করেছেন রিভার্স। এই সাহসী মানুষটির আবদ্ধ স্থানের ভয় এত অসম্ভব ছিল যে, যুদ্ধক্ষেত্রে গোলাগুলির মধ্যেও তিনি পরিখায় আশ্রয়গ্রহণ করতে পারতেন না—খোলা মাঠের মধ্যেই রাত্রে তিনি ঘুমাতেন। তাঁর এই অতিরিক্ত অকারণ ভয় মনঃসমীক্ষক চিকিৎসকদের দৃষ্টি-আকর্ষণ করে। তাঁর সহায়তায় মেডিক্যাল অফিসারটি বাল্যজীবনের কোন ভীতিকর অভিজ্ঞতা স্মরণ করতে চেষ্টা করেন। প্রথমে তিনি এমন কোন অভিজ্ঞতার কথা কিছুতেই স্মরণ করতে পারেন না। অবশেষে তিনি বলেন যে, বাল্যকাল থেকেই তাঁর এ রকম ভয় ছিল। এবং এ কথাও তাঁর মনে পড়ে যে, যখন তাঁরা বয়স তিন থেকে চারের মধ্যে, তখন তিনি পিতা-মাতার নিষেধ অমান্য করে এক সরু বদ্ধমুখ গলিতে ঢুকেছিলেন। তখন এক কুকুর ঘেউ ঘেউ করে তাঁকে তাড়া করে এবং সেই বদ্ধ গলিতে আটকা পড়ে তিনি ভীষণ ভয় পান। তিরস্কারের ভয়ে তিনি বাপ-মাকে এই ভীতিকর অভিজ্ঞতার কথা বলেন নি। এবং কিছুদিনের মধ্যে তিনি ঘটনাটা সম্পূর্ণ ভুলে যান। এ সব কথা স্মৃতিতে উদয় হওয়ার পর এবং খোলাখুলি এ বিষয়ে আলোচনার পর মেডিক্যাল অফিসারটির এই অকারণ অসুস্থ ভয় দূর হয়ে যায়।[৩]

মিল্‌ড্রেড্ নামে একটি মেয়ের 'মানুষের চোখ' সম্বন্ধে অদ্ভুত ও 'অস্বাভাবিক ভয়ের' উদাহরণ লিখেছেন শাফার্। মেয়েটি কোন মানুষের চোখের দিকে তাকালেই ভয়ে কাঠ হয়ে যেত। ক্রমে তার ভয়টা এতটা বেড়ে গেল যে সে স্বপ্নে দেখত ভীষণ-দর্শন কোন মানুষ তার দিকে ড্যাব্ ড্যাব্ করে তাকিয়ে আছে। সে এ রকম দুঃস্বপ্ন দেখে ভয়ে চীৎকার করে জেগে যেত। যত দিন যেতে লাগল ততই আরো নানা দুশ্চিন্তা তাকে পেয়ে বসতে লাগল। অবশেষে সে প্রায় অকর্মণ্য হয়ে পড়ল। সে কোন বিষয়ে মন দিতে পারত না, বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা করা ছেড়ে দিল, এবং পূর্বে বেশ ভাল ছাত্রী হলেও পড়াশুনায় একেবারে পিছিয়ে পড়ল।

terrifying. It also involved an element of guilt-feeling: otherwise it would not have been repressed. Rex & Margaret Knight—A Modern Introduction to Psychology, pp. 284-35

৩ Rivers—Instinct & The Unconscious, p.220

শেষে তার অভিভাবকেরা এক অভিজ্ঞ মনঃসমীক্ষক চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলেন। তিনি মিল্‌ড্রেড্‌কে তার অতীত বাল্যজীবনের মানুষের চোখ -সম্পর্কিত কোন ভীতিকর বা লজ্জাকর বা বিষম অপ্রীতিকর কোন অভিজ্ঞতা কোনদিন ঘটেছিল কি না তা জিজ্ঞাসা করলেন। সে কিছুতেই এমন কোন অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করতে পারল না। কিছুদিন চেষ্টার পর মিল্‌ড্রেডের মনে পড়ল যে বার বছর বয়সে সে একটা পাগলের বিষম কাণ্ড সিনেমায় দেখে খুব ভয় পেয়েছিল এবং বলল সেই পাগলের ভয়ঙ্কর চোখগুলিই সে অনেক সময় স্বপ্নে দেখে থাকে। ছবিতে দেখানো হয়েছিল, একজন পাগল, যাত্রীদের অজান্তে একটি এরোপ্লেনের চালক হয়ে, তাদের ভীষণ বিপদে ফেলেছিল এবং অল্পের জন্যে যাত্রীরা মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচেছিল। চিকিৎসক বুঝলেন এই ভীতিপ্রদ ছবিটা রোগিণীর অবস্থার সঙ্গে কিছুটা যুক্ত থাকলেও অন্য কোন গভীরতর ভীতিপ্রদ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই এর মূলে আছে। আরো এক সপ্তাহ চেষ্টার পরে মিল্‌ড্রেডের মনে পড়ল, প্রায় সাত বছর বয়সে সে বাবার সঙ্গে এক পিসির বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিল। সে পিসি ছিলেন অন্ধ। তাঁর বাড়ীটা বেশ পুরানো ও বড় ছিল। বালসুলভ কৌতূহলের বশে মিল্‌ড্রেড্‌ বাড়ীটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। কাজটা অন্যায় হচ্ছে জেনেও সে পিসির জিনিসপত্র ঘেঁটে ঘেঁটে দেখতে লাগল। হঠাৎ একটা অন্ধকার ঘরে টেবিলের টানা খুলে সে দেখতে পেল দুটি পাথরের চোখ। তার অন্ধ পিসিমা পূর্বে কখনো কখনো এগুলি ব্যবহার করতেন। চোখ দুটি যেন তার দিকে তাকিয়ে তার অন্যায় কৌতূহলের জন্যে তাকে ভৎর্সনা করছিল। সে ভীষণ ভয় পেয়ে টানাটা বন্ধ করে পালিয়ে এল এবং বাবা তাকে শাস্তি দেবেন এই ভয়ে কথাটা বাবার কাছেও গোপন করল। এবং শেষে এই কথাটা সে একেবারে ভুলেই গিয়েছিল। সে স্বীকার করল পূর্বে কাকেও সে একথা বলে নি। চিকিৎসক লক্ষ্য করলেন যে এ ঘটনাটি স্মরণ করে যখন সে বলছিল, তখনও সে যেন ভয়ে কাঁপছিল। কিন্তু কয়েকবার এই ঘটনাটি বর্ণনা করার পর এবং ব্যাপারটা খোলাখুলি আলোচনা করার পর, তার ভয়টা কেটে গেল এবং মিলড্রেড্‌ ক্রমে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল। চিকিৎসক আরো খোঁজ নিয়ে জানলেন যে, বর্তমানে তার বাবার আর্থিক অবস্থার অবনতি হয়েছিল এবং তাঁর চাকুরিটি হারাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। তার বাবাকে মিলড্রেড্‌ খুব ভালবাসতো এবং স্বভাবতই তাঁর জন্যে সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

সেই ধাক্কার ফলেই তার পুরোনো অকারণ ভয়টা খুব বেশী বেড়ে যায়। আশ্চর্যের কথা এই যে, যখন সে তার বাল্যজীবনের ভয় ও কল্পিত অপরাধের কাহিনী স্পষ্টভাবে স্মরণ করে খোলাখুলি তা নিয়ে আলোচনা করতে পারল তখনই তার অকারণ ভয় কেটে গেল এবং সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল। এই রকম আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ করে শাফার এই অসুস্থ ভয়গুলি সম্পর্কে কতকগুলি সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌছলেন। সেই সিদ্ধান্তগুলি হচ্ছে :

(১) সাধারণত বাল্যকালে দশ বছর বয়সের পূর্বে কোন ভীতি-উৎপাদক ঘটনার পর থেকে এই অকারণ ভয় শুরু হয়।

(২) কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে ব্যক্তি বাল্যকালের সেই ভীতিজনক অভিজ্ঞতা ভুলে যায়। অর্থাৎ এ অভিজ্ঞতাটি **অবদমিত** হয়। বড় হয়ে অন্যের সাহায্য বা মনঃসমীক্ষণের বিশেষ পদ্ধতি -ব্যতীত ব্যক্তি সহজে বাল্যের বিরূপ অভিজ্ঞতা মনের সামনে আনতে পারে না।

(৩) বাল্যকালের ভয়-উৎপাদক ঘটনাটির সঙ্গে আরো কিছু অবস্থা যুক্ত থাকে, যা তৎকালে শিশুর লজ্জা, অপরাধবোধ বা উদ্বেগও সৃষ্টি করে। কিন্তু শিশু তার ক্ষুদ্র ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে এই লজ্জা- বা অপরাধ-বোধ সহজে জয় করতে পারে না। এ জন্যেই এ অভিজ্ঞতা শিশু ভুলে যায়। সে এ অভিজ্ঞতার কথা কাউকে বলে না, নিজের মনেও কখনো আলোচনা করে না। এরই নাম অবদমন। কোন কোন ক্ষেত্রে এই লজ্জা- বা অপরাধ-বোধের অস্তিত্ব ঘটনার ইতিহাসেই সুস্পষ্ট থাকে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এটা অনুমান করে জানতে পারা যায়।

(৪) পরবর্তী কালে যদি বিস্মৃত ঘটনাটি রোগী সম্পূর্ণ স্মরণ করতে পারে এবং খোলাখুলি তা আলোচনা করে, তা হলে সে অকারণ ভয়ের পাপ থেকে মুক্ত হয়। বয়স্ক অভিজ্ঞতা দিয়ে ব্যক্তি তখন বাল্যের ঘটনাটির প্রকৃত তাৎপর্য-বিচার করতে সমর্থ হয় এবং তার সঙ্গে সহজেই জীবনের সঙ্গতি-বিধানও সমর্থ হয়। তাই সেই বাল্যের অভিজ্ঞতা তাকে আর তখন অযথা ভয়বিহ্বল করে না।

একথা বলা যেতে পারে যে, ভীতিজনক কোন না কোন অভিজ্ঞতা সব শিশুর জীবনেই প্রায় ঘটে। তাই বলে সবাই ভবিষ্যৎ জীবনে অহেতুক ভয়ে কষ্ট পায় না। এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, সব মানুষের জন্মগত শারীরিক-স্নায়বিক-মানসিক গঠন একরকম নয়। তাই একই অভিজ্ঞতা সকলকে

সমান ভাবে বিচলিত করে না। দ্বিতীয়ত যেখানে শৈশবের ভীতিকর অভিজ্ঞতার সঙ্গে লজ্জা- ও অপরাধ-বোধ জড়িত থাকে এবং যেখানে মূল অভিজ্ঞতাটি অবদমিত হয়, সেখানেই কেবল ভবিষ্যতে অকারণ অসুস্থ ভয় (phobia) -উৎপত্তির আশঙ্কা থাকে।[৪]

কোন কোন ক্ষেত্রে অকারণ ভয়ের মূলে আছে স্থানচ্যুত দুর্ভাবনা

পূর্বের উদাহরণগুলিতে দেখা যায় যে মূল বস্তু বা অভিজ্ঞতা (মানুষের চোখ, বদ্ধ স্থান) বাল্যে ভয়-উৎপাদন করেছিল, সেই উদ্দীপকই ভবিষ্যৎ বয়স্ক জীবনে অকারণ ভয় সৃষ্টি করছে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে মূল বস্তু বা অভিজ্ঞতার পরিবর্তে সেই মূল অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত কোন চিহ্ন অকারণ ভীতি-উৎপাদন করে।

মর্টন প্রিন্স একটি প্রসিদ্ধ উদাহরণ দিয়াছেন। বিশ বৎসরের একটি যুবতী মেয়ের গীর্জার চূড়া দেখলে বা গীর্জার ঘণ্টা শুনলে অকারণ অসম্ভব ভয় হত। এর কোন কারণ-নির্দেশ না করতে পেরে, মেয়েটি একজন মানসিক রোগের চিকিৎসকের (psychiatrist) শরণাপন্ন হয়। অনেকদিন চেষ্টার পরে মেয়েটির মনে একটি স্মৃতির উদয় হয়। বাল্যকালে এ মেয়েটির মা গুরুতর অসুস্থ হন এবং রোগ-নিরাময়ের উদ্দেশ্যে তাঁর ওপর কঠিন অস্ত্রোপচার করা হয়। মায়ের সেবায় মেয়েটির কিছুটা শৈথিল্য ছিল। একদিন মেয়েটি একটি হোটেলে গিয়েছিল। তার মনটা মার অবস্থার কথা ভেবে খুবই উদ্বিগ্ন ও বিষণ্ন ছিল। সেই সময়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে তার চোখে পড়ল অদূরে এক গীর্জার চূড়া এবং কানে এল গীর্জার ঘণ্টাধ্বনি। বাড়ী ফিরে এসে দেখল মার মৃত্যু হয়েছে। এতে তার মনে গভীর অনুশোচনা হল যে, তার অযত্নের ফলেই তার মা মারা গেলেন। কিছুদিন পরে সে ঘটনাটি ভুলে গেল। বহুদিন চিকিৎসার পর যখন মেয়েটি স্পষ্ট বুঝতে পারল যে তার মায়ের মৃত্যু অনিবার্য ছিল, মাতার মৃত্যুর কারণ তার অবহেলা নয়,

৪ It may be objected, that many children have fearful experiences that do not give rise to phobias. Some congenital factors seem to be involved... Moreover phobias seems more likely to arise when the fear-conditioning episode is followed by repression. Shaffer & Shoben—The Psychology of Adjustment, p. 223

বুদ্ধি-বিচার ও ডাক্তারের সঙ্গে খোলাখুলি আলাপ করে যখন সে নিশ্চিত জানল যে তার অযত্নের জন্য মার মৃত্যু ঘটে নি তখনই সে রোগমুক্ত হতে পারল।[৫]

ম্যাসারম্যান্ থেকে আর একটা উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে। অ্যানি নামে একটি আঠারো বছরের মেয়ের ভয় কুকুর বিড়াল ইত্যাদি ছোট ছোট পোষা জন্তুকে। সেই সঙ্গে অকারণ উদ্বেগ ও অশান্তির (tension and anxiety) কিছু উপসর্গও ছিল। অনুসন্ধানে জানা যায় যে অ্যানির যখন বয়স চার বছর, তখন তার একটি ভাই হয়। প্রথমে সে ভাইটিকে বেশ ভালই বাসত, কিন্তু ক্রমেই সে বুঝতে পারল যে ভাইটিই বাপ-মার স্নেহ কেড়ে নিচ্ছে। তাতে সে ভাইটিকে খুব হিংসে করত, তাকে ব্যথা দিতে চেষ্টা করত। ফলে তার বাপ-মার স্নেহ অ্যানি আরো বেশী হারাল। তারপর থেকে ভাইটিকে সোজাসুজি আক্রমণ না করে, সে ভাইয়ের জামা-কাপড় ছিঁড়ে দিত বা তার পুতুল ভেঙে দিত। এ সময় অ্যানির বাবা-মা ওকে একটা বিড়ালের বাচ্চা উপহার দিলেন। তাঁদের আশা ছিল এই অসহায় ছোট নরম তুলতুলে প্রাণীকে অ্যানি সহজেই ভালবাসতে পারবে এবং তার পরে ভাইটিকে ভালবাসাও ওর পক্ষে কঠিন হবে না। প্রথমে বিড়াল ছানাটিকে অ্যানি বেশ আদর করত। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই বাচ্চাটির ওপর নানা অত্যাচার শুরু করল। ফলে বাচ্চাটা কদিন বাদেই মরে গেল। তার বাবা-মা এর জন্যে তাকে কঠোর শাস্তি দিলেন এবং আর কিছুদিন পর থেকেই অ্যানির অকারণ ভয় ও দুশ্চিন্তার লক্ষণ প্রকট হয়ে উঠল।[৬]

এখানে বিড়াল যে অ্যানির ছোট ভাইটির প্রতীক, এটা বোঝা কঠিন নয়। ভাইয়ের সম্পর্কে ভয়টা বিড়ালে স্থানান্তরিত হয়েছে।

ফ্রএড্ ১৯০৯ সালে অকারণ ভয়ের একটি উদাহরণ নিয়ে প্রথম এ জাতীয় ঘটনা সম্পর্কে মনঃসমীক্ষণসম্মত ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন। এ ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাব ভয়ের পাত্র কি করে স্থানান্তরিত হয়েছে। পাঁচ বছরের ছেলে ছোট হ্যানসের বিষম ভয় ঘোড়ার। ফ্রএড-এর ব্যাখ্যা হল যে ঘোড়াটা বাস্তবিক পক্ষে হ্যানসের কাছে তার পিতার পরিবর্ত-প্রতীক। হ্যানসের জীবনেতিহাস থেকেই জানা যায় যে সে তার বাপকে বিষম ডরায়।

৫ Morton Prince—The Unconscious, p. 223

৬ Masserman—Principles of Dynamic Psychiatry, pp. 222-2

অথচ শৈশবে পিতার ওপর নির্ভরতা তো অনিবার্য, তাই তাঁর বিরুদ্ধে কোন মনোভাব প্রকাশ অসম্ভব। তাই বিরুদ্ধ মনোভাবটা স্থানান্তরিত হল ঘোড়ায়। এই স্থানান্তরণও অকারণ নয়, (১) ঘোড়ার প্রলম্বিত চোয়াল ও কালো নাক হ্যানসের বাবার কালো গোঁফজোড়া স্মরণ করিয়ে দেয়, (২) হ্যানসের বাবা কখনো কখনো ঘোড়া সেজে তাকে পিঠে চড়ান, (৩) একদিন ঘোড়াটাকে রাস্তায় পড়ে গিয়ে, বিষম কষ্ট করে উঠে দাঁড়াতে দেখে হ্যানসের খুব ভয় হয়েছিল। তার বাবাও একদিন মদ খেয়ে রাস্তায় গড়াগড়ি খেয়েছিল এবং টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়েছিল। এসব থেকেই বোঝা যায়, কি করে হ্যানসের কাছে ঘোড়াটা তার পিতার পরিবর্ত-প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[৭]

অকারণ ভয় কখনো কখনো আত্মরক্ষার উপায়

অকারণ ভয় বিহ্বলকর এবং এতে ব্যক্তির ভীতিকর অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি তো ঘটেই না বরং জীবনের অন্য ক্ষেত্রে ব্যক্তি কর্মদক্ষতা হ্রাস পায়। কিন্তু আশ্চর্যজনক মনে হলেও এই অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা, ব্যক্তি তার আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে কখনো কখনো ব্যবহার করে।

ম্যাস্‌লো ও মিট্টেল্‌ম্যান্‌ পঁচিশ বছরের একটি মেয়ের উদাহরণ দিয়েছেন। এই মেয়েটি বাড়িতে একা থাকতে বিষম ভয় পায়, আবার একা একা বাড়ী থেকে বেশী দূরে যেতেও ভয়ে আড়ষ্ট হয়। অথচ ডাক্তারী পরীক্ষায় তার কোন রোগ দেখা যায় না এবং তার ভয়ের কোন সঙ্গত কারণও নেই। অনুসন্ধান করে জানা গেল মেয়েটির মা কিছুদিন আগে মারা গেছেন এবং বাপের প্রতি মেয়ের টানটা বেশী। কিন্তু বাপ দ্বিতীয় বার বিয়ে করবেন বলে ভাবছিলেন। মেয়ের এই বিষম ভয়ের জন্যে বাবা ওকে একা বাড়ীতে রেখে বেশীক্ষণ বাইরে থাকতে পারেন না এবং মেয়ে বাইরে বেরোতে হলেও বাপকে সঙ্গে যেতে হয়। এতে করে, বাপের বিয়ে করার মতলব ত্যাগ করতে হয়।[৮]

সংসারে আমরা অনেক সময়েই দেখি যে, যারা মানসিক রোগগ্রস্ত যারা

---

৭ Freud—Collected papers (1908), Vol. III, pp. 149-289

৮ Maslow & Mittelmann—Principles of Abnormal Psychology, (Rev. ed.), p. 227

অল্পে ভয় পায়, মানুষ তাদের করুণা করে, তারা মানুষের সহানুভূতি ও মনোযোগ সহজে আকর্ষণ করতে পারে। কাজেই এটাও যে একরকম আত্মরক্ষার কৌশল, সেটা বোঝা কঠিন নয়।[১]

সমস্ত অকারণ ভয়ের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, মূল অপ্রীতিকর বা লজ্জাকর অভিজ্ঞতাটি ব্যক্তি বিস্মৃত হয়। এর কারণ হচ্ছে অবদমন (repression)। যা অপ্রীতিকর বা লজ্জাকর তা ব্যক্তি যে ভুলে যায় তার কারণ এটা আত্মরক্ষার অতি পরিচিত একটি কৌশল। কতকগুলি মানসিক রোগে দুর্ভাবনা ও ভয় এড়াবার জন্যে ব্যক্তির কি করে অদ্ভুত ভাবে স্মৃতিলোপ হয়, তার কিছু উদাহরণ পরে আলোচনা করব।

১ Numerous cases of phobias show the same features, often in less transparent form. A person affected by a phobia sometimes secures a direct and aggressive satisfaction by getting attention and sympathy from other people and by controlling their actions for his own benefit. A similar characteristic in found in some psychologic determined illnesses. Shaffer & Shoben—The Psychology of Adjustment, p. 224

দ্বাবিংশ অধ্যায়

মনোদৌর্বল্য

সাইকাস্‌থেনিয়া কথাটির মূলগত অর্থ হচ্ছে মানসিক শক্তির বা ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতা। এই দুর্বলতার লক্ষণ হচ্ছে, ব্যক্তি নিজের ওপর নিজের সম্পূর্ণ শাসন হারিয়ে ফেলে। সে যেন অন্য কোন অদৃশ্য শক্তি দ্বারা চালিত হয়ে কোন বিশেষ কাজ করে—কেউ যেন ঘাড়ে ধরে তাকে দিয়ে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিয়ে নিচ্ছে। এই কারণে একে অব্‌সেসিভ্‌ বা কম্পাল্‌সিভ্‌ নিউরোসিস্‌-ও বলা হয়। বাস্তবিক পক্ষে, যাকে মনোদৌর্বল্য বা সাইকাসথেনিয়া বলা হয় তা বায়ুরোগ বা নিউর‍্যাস্‌থেনিয়ার থেকে মূলত ভিন্ন কোন ব্যাধি নয়—শুধু মাত্র এতে মানসিক দিকটার ওপরই জোর দেওয়া হয়েছে। এর প্রকাশ হচ্ছে আবেশ (obsessions) বা অনুকর্ষী ক্রিয়া (compulsions), অকারণ ভয় (phobias) এবং বিভিন্ন রকমের বাতিকে (manias)। অনেক ছেলেমেয়ে (এমন কি বয়স্ক ব্যক্তিও) অযথা চুরি করে—প্রয়োজন নেই তবু চুরি করে, এমন কি ইচ্ছার বিরুদ্ধে চুরি করে। এ জাতীয় মানসিক বিকারকে বলে Kleptomania। আবার কেউ কেউ আছে, তারা ঘরে আগুন দেবার এক অদম্য ইচ্ছা দ্বারা তাড়িত হয় বা কুৎসিত গালি দেবার, এমন কি নরহত্যার জন্য এক বিষম তাড়া বোধ করে (homicidal mania)। বাস্তবিক পক্ষে এই ম্যানিয়াগুলি সবই আবেশ বা অনুকর্ষী বায়ুরোগ।[১] এ সবগুলি মনোবিকারের কথাই পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি।

ম্যানিয়া কথার মূলগত অর্থ হল অতিরিক্ত অসংযত উত্তেজিত মানসিক অবস্থা।[২] পূর্বে মনে করা হত ম্যানিয়ার বিপরীত হল গভীর বিষণ্ণতা (melancholia)। এবং এ দুটি মানসিক অস্বাভাবিক দুটি পৃথক অবস্থা।

১ Compulsive acts generally follow obsessive ideas...Even the impulse to set fire to things or Kleptomania (impulse to steal) are examples of compulsions. Stecker & Ebaugh—Clinical Psychiatry, Ch. VI

২ Mania: mental disorder, manifesting itself in high, uncontrolled excitement.

কিন্তু ক্রেপেলিন-এর মতে এই দুটি অবস্থা একই মানসিক রোগের দুটি দিক। একই মানসিক রোগীতে উত্তেজনার অবস্থাটা প্রধান, আবার অন্য কোন ক্ষেত্রে বিষণ্ণতার অবস্থাই দীর্ঘতর; একটির পর অন্য অবস্থাটি যে নিয়মিতভাবে পর্যায়ক্রমে আসবে এমনও নয়।[৩] যাই হোক বর্তমানে বহু মনোবিদই এই দুই অবস্থাকে এক মানসিক রোগ—manic-depressive psychosis—বলেই গণ্য করার পক্ষপাতী। প্রেসী এই দ্বৈত অবস্থাকে 'দুই সম্পূর্ণ বিপরীত মানসিক রুগ্ণতা' বলেছেন।[৪]

বর্তমানে বহু অভিজ্ঞ মনোবিদ সাইকোনিউরোসিস্ অপেক্ষা গুরুতর সাইকোসিস্ (বাতুলতা) -এর অন্তর্ভুক্ত করে এই মানসিক বিকারকে (ম্যানিয়া) আলোচনার পক্ষপাতী।

কিছুদিন পূর্বেও মনোদৌর্বল্য বলতে বিষম অকারণ ভয়, আবেশ, অনুকর্ষী, বায়ু (ম্যানিয়া) এ কয়টি মানসিক বিকারকে বোঝাত। বর্তমানে অনেক পণ্ডিতই নিউর‍্যাসথেনিয়া (স্নায়বিক অবসাদ) এবং সাইক্যাসথেনিয়া (মনোদৌর্বল্য) এই দুই শ্রেণীর মধ্যে প্রভেদ স্বীকার করেন না। বাস্তবিকপক্ষে মনোদৌর্বল্যকে (সাইক্যাসথেনিয়া) পৃথক করে স্বীকার করলে মানতে হয় যে, মন বলে বুঝি একটা রহস্যময় পদার্থ আছে, যা মানুষের দেহ ও স্নায়ুর ব্যবহার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ব্যবহারবাদীরা বলবেন, মন বলে কোন পদার্থ নেই, ব্যক্তির দেহ ইন্দ্রিয়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও স্নায়ুর ব্যবহার- বা প্রতিক্রিয়া-সমষ্টির নামই হচ্ছে মন।[৫]

৩ The term *manic-depressive psychosis*...has largely supplanted the older terms *mania* and *melancholia*. It was formerly believed that mania and melancholia were two distinct mental disorders. But Kraepelin observed that the two conditions are frequently found together in the same patient, and moreover it became gradually clear that the two disorders were really opposite forms of manifestation of the basic factors. Hence Kraepelin suggested as more adequate the single term manic-depressive psychosis. The degree of excitement and of depression, however, varies greatly with different patients, and likewise, there are actually but relatively few patients in whom states of depression alternate with states of excitement in a strictly regular manner. More frequently the patient manifests only one of the two phases or else the phases alternate in an irregular or mixed order. Fisher—An Introduction to Abnormal Psychology, pp. 282-83

৪ Pressey & Pressey—Mental Abnormality & Deficiency, p. 165

৫ The term "psychasthenia" formerly had wide use to designate severe phobias, obsessions and compulsions. These have already been discussed under psychoneuroses. Since these conditions are now understood more thoroughly, the usefulness of the word "psychasthenia" has almost declined to zero. Shaffer & Shoben—The Psychology of Adjustment, p. 247

মানসিক বিকার বা বৈকল্যগুলিকে কোন ব্যধি বলে চিহ্নিত করা প্রাচীন রীতি অনুযায়ী বটে এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে এ রীতি সঙ্গত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মানসিক বিকারকে এ ভাবে কোন নাম দিয়ে চিহ্নিত করা সমীচীন নয়। দেহের যে রোগ, যেমন চোখের অসুখ, দাঁতের অসুখ এগুলি দেহের কোন ইন্দ্রিয় বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অসুস্থ অবস্থা। কিন্তু মানসিক যে বিকার, তা তো ব্যক্তির বিশেষ কোন অঙ্গ বা ইন্দ্রিয়ের বিকৃতি নয়—এতে সমস্ত ব্যক্তিত্বেরই রুগ্ণতা সৃষ্টি হয়।[৭]

সাইকোনিউরোসিস্ ও সাইকোসিস্ এই দুই-ই হচ্ছে ব্যক্তির সঙ্গতি-সাধনে অক্ষমতার জন্যে মানসিক অশান্তি ও বিকার। এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করে বলা হয় যে বায়ুরোগের (সাইকোনিউরোসিস্) চেয়ে বাতুলতা (সাইকোসিস্) অধিকতর মানসিক বিকৃতি এবং ব্যক্তির ঐক্যের অধিকতর ধ্বংস সূচনা করে। কিন্তু প্রভেদটা গুণগত নয় পরিমাণগত। সেই জন্যে কোন কোন পণ্ডিত বলেন, সাইকোনিউরোসিস্ এবং সাইকোসিসের মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট কোন ভেদরেখা টানা যায় না।

৬ If psychasthenia means that there is a kind of mental stuff or mental energy which can be stored up in larger cr smaller amounts, one has committed one's self to the doctrine that mind stuff is different from body stuff...In other words, one has committed one's self to a doubtful theory. It is clear morever that psychasthenia must manifest itself in failures of adjustment, just as neurasthenia does. We may then describe the psychasthenic patient in terms of the cluster of symptoms that distinguish him from a normal person. Griffith—An Introduction to Applied Psychology, p. 305

৭ The practice of giving names to the various psychoneuroses is a part of the medical tradition. To identify and name a physical disease is a geniunely constructive step in medical science, and it is easy to see how the custom has been carried over to the psychoneuroses, because most cases are treated by physicians. There is much doubt, however, that the practice of "naming diseases" is applicable to the psychological and social adjustments of whole persons. Ibid—p. 247

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

গুরুতর মানসিক রোগ

মূর্ছারোগ বা হিস্টিরিয়া

মূর্ছারোগ বা হিষ্টিরিয়া গুরুতর মানসিক বিকার—কারণ এখানে ব্যক্তিত্বের ঐক্য ধ্বংসোন্মুখ। কিন্তু এই বিকারের অবস্থাকে কোন্ দলে ফেলা হবে, তা নিয়ে মতভেদ আছে। অনেকেই একে নিউর‍্যাস্থেনিয়া থেকে পৃথক এক শ্রেণী হিসাবে আলোচনা করেছেন। কেউ কেউ (শাফার, ফিশার) আবার একে নিউর‍্যাস্থেনিয়া দলের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এর উপসর্গগুলি এত বিচিত্র ও ব্যাপক যে, কোন্ মানসিক বিকারের অবস্থাকে হিষ্টিরিয়া রোগের লক্ষণ বলা হবে তা বিশেষ বিবেচনার বিষয়।[১] শরীরের নির্দিষ্ট স্থানে ব্যথা-বেদনা, কোন ইন্দ্রিয় বা অঙ্গ অসাড় হয়ে যাওয়া, অঙ্গসঞ্চালনে অসমতা, খিঁচুনী এসবই সম্পূর্ণ শারীরিক কারণেও ঘটতে পারে। কিন্তু অভিজ্ঞ চিকিৎসক যখন তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করে বাস্তবিক দৈহিক কারণ খুঁজে পান না, তখনই কেবল সন্দেহ করা যেতে পারে, যে লক্ষণগুলি গুরুতর মানসিক অসঙ্গতি থেকে ঘটছে। যেখানে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় যে, ব্যক্তিত্বের ঐক্য ধ্বংসোন্মুখ,—ব্যক্তির অনুভূতির ক্ষেত্রে শৈশবের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার (regression) লক্ষণ সুস্পষ্ট। যেখানে লক্ষ্য করা যায় যে রোগী অতিমাত্রায় অভিভাবন-প্রবণ (extermely suggestible) অর্থাৎ যেখানে দেখা যায়, রোগীর উপসর্গগুলি রোগী অন্য কোন ব্যক্তিতে দেখে, বা অন্য কারো কাছ থেকে শুনে নিজের মধ্যে অতি সহজে আরোপ করে, সেখানেই বলা উচিত যে ব্যক্তিটি হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত। কোন ব্যক্তির লক্ষণগুলি প্রকৃতই হিষ্টিরিয়া কিনা তা বিশেষজ্ঞ মনোবিদ ভিন্ন সাধারণ লোকের বলা অসম্ভব।[২]

১ Symptoms of hysteria are usually manifested in localized sensory or motor disturbances. The symptoms may simutate those of any disease entity. In most cases it can be shown that the patient has known some person having symptoms like his. In other cases the patient has learned in some other way of a group of symptoms which he simulates though not consciously or intentionally. This has led some psychiatrists to believe that

হিস্টিরিয়া সম্পর্কে কিছু ভ্রান্ত ধারণা

হিস্টিরিয়া একটি গ্রীক্ শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ হল জরায়ু (uterus)। প্রাচীনদের ধারণা ছিল জরায়ু স্ত্রীদেহে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করলে নানা দৈহিক-মানসিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তারই নাম মূর্ছারোগ বা হিস্টিরিয়া।[২] কাজেই এরোগ নিতান্তই স্ত্রী-রোগ। অবশ্য হিস্টিরিয়া মেয়েদের মধ্যেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে শারকো (Charcot), ঝানে (Janet) প্রমুখ শারীরবিজ্ঞানে শিক্ষিত মনোবিদের পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার ফলে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, জরায়ুর সঙ্গে হিস্টিরিয়ার কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই। অবশ্য ফ্রএড-এর মতে এই মানসিক বিকারের কারণ হচ্ছে গভীর যৌনাকাঙ্ক্ষার সবলে অবদমন এবং হিস্টিরিয়া তাই পুরুষ ও নারী দুইয়েরই হতে পারে।[৩]

সাধারণ মানুষের ধারণা হিস্টিরিয়া হচ্ছে এমন হাসি বা কান্নার উচ্ছ্বাস যা ব্যক্তি থামাতে পারে না। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত ও অকারণ হাসিকান্না যাদের মধ্যে দেখা যায় তারা হিস্টিরিয়াগ্রস্ত। অবশ্য এ লক্ষণ হিস্টিরিয়াগ্রস্তদের মধ্যে দেখা যেতে পারে, কিন্তু এটাই হিস্টিরিয়ার একমাত্র বা প্রধান লক্ষণ নয়। সাধারণত বলা যায়, ব্যক্তি যেখানে কোন মানসিক অবস্থাকে নিজ আয়ত্তাধীনে আনবার অক্ষমতাকে কতকগুলি দৈহিক রোগের লক্ষণ দিয়ে ঢাকতে চায়, তখন তাকে বলা হবে হিস্টিরিয়া। এ হচ্ছে দায়িত্ব এড়াবার

the hysterical patient is a neurotic who is extremely suggestible...Emotional regression is an invariable accompaniment of a hysterical condition.

Psychiatrists usually hesitate to make a diagnosis of hysteria until every means has been exhausted to make out the persence of an organic condition ···It is only the most expertly trained psychiatrist who has an extensive knowledge of medical and neurological diseases is in a position to diagnose a patient as hysterical. Sherman—Basic Problems of Behaviour, pp, 374-75

২ Hysteria is derived from the Greek word for uterus. An ancient and medieval theory held that hysteria was caused by the uterus wandering about in the body. Shaffer & Shoben—The Psychology of Adjustment, p. 248

৩ It has since been learnt there is no specific causal connection between uterus and the hysterical disorders. According to Freud hysteria is due to sex maladjustment and even men can suffer from it. Fisher—An Introduction to Abnormal Psychology, p. 232

এবং অহঙ্কারের আত্মরক্ষার অস্বাভাবিক এক কৌশল। এখানে ব্যক্তি তার অক্ষমতাকে ভদ্রভাবে ঢাকবার জন্যে কতকগুলি দৈহিক রোগের লক্ষণ নিজের ওপর ডেকে আনে। এটা অবশ্য ব্যক্তি সচেতনভাবে করে না। এর মূলে আছে কোন উদ্বেগকর বা লজ্জাকর অনুভূতির ক্ষেত্রে সংঘাত, এবং অবাস্তব দৈহিক রোগের লক্ষণগুলি হচ্ছে সেই অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে মুক্তির অসন্তোষজনক উপায়। এখানে ব্যক্তি তার মানসিক অস্বস্তিকর অবস্থাকে দৈহিক রোগের অবস্থায় অবচেতন ইচ্ছা দ্বারা পরিবর্তন করে নিচ্ছে। এজন্যে এ জাতীয় মানসিক ভানকে Conversion hysteria-ও বলা হয়। এতে ব্যক্তির অহঙ্কার অক্ষুণ্ণ থাকছে এবং অপরের সহানুভূতি ও মনোযোগও আকর্ষণ করা যাচ্ছে। কখনো কখনো একে 'সাইকো-সোমাটিক ইল্‌নেস'-ও (Psychosomatic illness) বলা হয়। এর অর্থ হচ্ছে সাইকি বা মনের (অবচেতন) ইচ্ছার ফলে, যেখানে 'সোমা' বা দেহে রোগ লক্ষণ দেখা যায়। হয়তো কোন ব্যক্তি তার কাজটায় আনন্দ পায় না। সে ক্লান্ত- ও বিব্রত-বোধ করে। বাস্তবিক পক্ষে সে এই কাজের উপযুক্ত নয়। তাই মনে মনে এ কাজটা সে ছেড়ে পালাতে পারলে বাঁচে। কিন্তু তার ঘাড়ে আছে সংসারের দায়িত্ব। তাই তার অবচেতন মনে এক অস্বস্তিকর সংঘাতের বাষ্প জমে উঠছে। একদিকে মন বলছে, 'কাজটা ছেড়ে-ছুড়ে পালিয়ে গেলে বাঁচি', আবার অন্যদিকে কর্তব্য-বুদ্ধি বলছে, 'ছি, কাজ ছাড়লে তোমার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার খাবে কি?' কিছুদিন ধরে চলল এই অস্বস্তিকর সংগ্রাম। ওদিকে দুষ্ট শনি কানে কানে মন্ত্র দিল, 'ডান হাতের পক্ষাঘাত হলে তো আর মানুষ কাজ করতে পারে না, অসুখের ওপর তো মানুষের কোন হাত নেই।' বাস্তবিক পক্ষে, একদিন এ ব্যক্তি অফিসে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। জ্ঞান হলে দেখা গেল তাঁর ডান হাতটি অসাড় হয়ে গেছে— তিনি আর কলম ধরতে পারছেন না, লিখতে পারছেন না। ডাক্তার বললেন সম্ভবত স্ট্রোক্ হয়েছে। অফিসের বন্ধুরা সবাই দুঃখ করে বলল, "আহা বেচারা, এই বয়সে অকর্মণ্য হয়ে পড়ল, ওর পরিবার চলবে কি করে?" এর ফলে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করতে তিনি বাধ্য হলেন। কিন্তু বড় ডাক্তাররা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলেন যে বাস্তবিক পক্ষে তাঁর স্ট্রোক্ হয় নি, এবং হাতটা সম্পূর্ণ অসাড়ও হয়ে যায় নি। এটা পক্ষাঘাত নয়। কারণ তিনি ডান হাত দিয়ে অন্য অনেক

কাজ মোটামুটি করতে পারেন। পারেন না শুধু কলম ধরে লিখতে। এ অসুখ হয়ে তিনি অফিস যাওয়া থেকে বাঁচলেন এবং নিজের বিবেকের দংশনও তাঁকে সহ্য করতে হল না। কিন্তু তাঁর মনে শান্তি হল না। তাঁর গভীর মগ্ন-চৈতন্যে তিনি ঠিকই জানেন যে এই অসুখের মধ্যে 'ভান' আছে।

তবে ইচ্ছে করেই তিনি অসুস্থ হয়েছেন—অসুখটা তাঁর ভান মাত্র (malingering), এটা আংশিক সত্য, সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ অসুখটা তাঁর সচেতন ইচ্ছার ফল নয়। আর অসুখটা তাঁর শুধুই 'মনের কল্পনা' নয়। তাঁর দৈহিক কষ্টটা বাস্তবিক সত্য, সেটা বাস্তবিক তাঁকে ভোগ করতে হচ্ছে। তার কারণটা মানসিক এটা ঠিক, কিন্তু দেহের কষ্ট ও ভোগটা মিথ্যা নয়।[৪]

সাধারণ মানুষের জীবনে মানসিক কারণে দৈহিক রোগ—

যখন কোন অবস্থা আমার পক্ষে অস্বস্তিকর—যখন সমস্যার সুসমাধানে আমার ক্ষমতা যথেষ্ট নয়, অথচ অন্য সকলে প্রত্যাশা করে যে আমারই সমস্যার মুখোমুখী হয়ে এর সমাধান করা উচিত, এবং সে ক্ষমতা আমার আছে,—তখন আমি অসুখের ভান করে অস্বস্তিজনক

৪ The distinguishing feature of conversion hysteria is that it is subconsciously motivated: the illness is not merely a result of emotional conflict, but provides a means (though an unsatisfactory one) of resolving or evading it. The term "conversion hysteria"...is used to denote the conversion of a mental conflict into a physical symptom.

This does not mean, however, that the conversion hysteric is a malingerer ...he is in fact ill and his condition differs from organic illness only in its cause. It is a complete mistake to think that the conversion hysteric is not genuinely ill, or that he does not really feel pain. Pain is no less painful for being due to emotional, rather than to organic causes.

It is true in one sense that the conversion hysteric *wants* to be ill. But he wants to be ill in the sense in which we "want" to stand in a cinema queue as an undesired means to a desired end...Among the commonest causes of conversion hysteria is the *desire to escape* from a situation which has become intolerable to the patient...Another common cause of conversion hysteria is desire for sympathy and attention, Rex & Margaret Knight—A Modern Introduction to Psychology, pp. 228-29

অবস্থা এড়াতে চাই। এই অভিজ্ঞতা প্রায় সকলেরই বোধ হয় আছে। কিন্তু অসুখের ভান করেই দায়িত্ব এড়ানো নয়—সত্যই মানসিক কারণে মানুষ অসুস্থ হয়। ছোট ছেলে-মেয়েদের ইস্কুলটা হয়তো ভাল লাগে না, তাই ইস্কুলে যাবার সময় হলেই ছেলের মাথা ধরে, পেট ব্যথা করে। যদি সত্যিই তাকে ইস্কুলে যেতে না নয়, তা হলে দেখা যায় অল্পক্ষণ পরেই তার অসুখটা সেরে যায়। তখন সে দিব্যি সুস্থ হয়ে খেলাধুলা করে। ডাক্তারেরা আজকাল মনে করেন, নানাপ্রকার পেটের গোলযোগ, শরীরের নানা স্থানের ব্যথা-বেদনার মূল কারণ, অনেক সময়ই দৈহিক নয়, মানসিক।[৫] বর্তমান সভ্য সমাজে 'পেপ্‌টিক্ আলসার'-এর (হজমের গোলযোগসহ অন্ত্রক্ষত) ব্যাপক বিস্তার নানা দুশ্চিন্তা ও অমীমাংসিত সংঘাতের জন্যেই ঘটছে, এটা শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের মত। মানসিক কারণে শারীরিক রোগ কি করে হয়, তার সম্পূর্ণ সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে না পারলেও, রোগ যে হয় এটা আজ সম্পূর্ণ স্বীকৃত। হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি গুরুতর মানসিক রোগের পিছনেও সেই কারণগুলিই ক্রিয়া করে, যেগুলি সাধারণ জীবনে ছেলেমেয়েদের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই। বাস্তবিক পক্ষে এই সমস্ত মানসিক বিকারের পেছনেও 'ছেলেমানুষী' মনোভাব ক্রিয়া করে। এটাকেই বলা হয়েছে প্রত্যাবৃত্তি (Regression)। সাধারণ মানুষের জীবনের সংঘাত এড়াবার চেষ্টা এবং মানসিক বিকারের ক্ষেত্রে সংঘাত সমাধানের মানসিক কলকব্‌জা মূলত একই।[৬] তবে হিষ্টিরিয়া ইত্যাদির বেলায় সংঘাত অনেক বেশী জটিল এবং

৫ The mechanism of conversion hysteria is not rare; it is about as common as any other form of adjustment...The "nine o'clock headache" is frequent in children who escape school by being ill, only to recover with surprising rapidity as soon as it is too late to go. A frustrating or conflict-arousing school situation, often not overtly recognized by the child himself, may be at the bottom of such reactions. Adults often fall into petty illnesses that serve to get them out of distressing situations. The symptoms such as gastric upsets or headaches may first arise as physiological results by emotion, and then may be intensified and prolonged because they serve some adjustive end. Shaffer & Shoben—Psychology of Adjustment, p. 251

৬ Every neurotic person shows some regression. "It is common observation that the behaviour of every neurotic presents features which are more or less characteristic of the child, more particularly what is known at the spoiled child. Wechler—The Neuroses, p. 92

সংঘাত অমীমাংসিত অথবা অসম্পূর্ণভাবে মীমাংসিত হওয়ার ফলে অস্বস্তি ও বিকার দীর্ঘকালস্থায়ী ও ব্যক্তিত্বের ঐক্য বিপন্ন।[৭]

হিস্টিরিয়ার লক্ষণ

কেউ কেউ হিস্টিরিয়ার লক্ষণগুলিকে দৈহিক ও মানসিক এই দুই দলে ভাগ করেন। এ বিভাগ খুব সন্তোষজনক নয় এবং হিস্টিরিয়া-রূপ মানসিক বিকার বোঝবার পক্ষে এ খুব সহায়কও নয়। শারকো, ফ্রএড, মর্টন প্রিন্স সকলেই মানসিক বিকার চিকিৎসার গোড়াতে হিস্টিরিয়া রোগীদের দিকেই দৃষ্টি দিয়েছিলেন। গোড়াতে এদের চিকিৎসায় সাফল্যের ভিত্তিতেই মানসিক বিকারের ব্যাখ্যায় অবচেতন সংঘাত ও অবদমনের ধারণায় তাঁরা পৌছেন, এবং প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তবে তাঁরা সকলে একই ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করেন নি। ঝানে হিস্টিরিয়ার লক্ষণগুলিকে দুটি দলে ভাগ করেছেন : (১) কতকগুলি উপসর্গ হচ্ছে দীর্ঘকালস্থায়ী—সহজে তাদের দূর করা যায় না। এদের তিনি বলেছেন ষ্টিগ্‌মাটা (Stigmata) ; আবার কতকগুলি উপসর্গ হচ্ছে সবিরাম ও স্বল্পকালস্থায়ী—এদের তিনি বলেন—অ্যাকসিডেন্স্‌। তাঁর মতে ষ্টিগ্‌মাটা বা প্রধান লক্ষণগুলি হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের শক্তিলোপ (anesthesia), অঙ্গের অসাড়তা বা পক্ষাঘাত (paralyses), কোন বিশেষ অঙ্গের অবিরাম কম্পন অথবা সমস্ত দেহেরই বিশৃঙ্খল স্পন্দন (tics and choreas), সাময়িক স্মৃতিলোপ (amnesia), অতিরিক্ত অভিভাবন-প্রবণতা (increased suggestibility), আত্মকেন্দ্রিকতা (ego-centricity), অনুভূতির ক্ষেত্রে অস্থিরতা (emotional unstability) এবং ব্যক্তিত্বের একাধিক পরিবর্ত্তন (alternation of personality)। অপ্রধান লক্ষণগুলির মধ্যে অতিমাত্রায় সাময়িক উল্লাস- বা শোক-প্রবণতা (extremes in mood), বমনেচ্ছা (nausea), শিরোঘূর্ণন (dizziness), অস্বাভাবিক অমনোযোগ (extreme absent-mindeness) এবং কথনো তন্দ্রাচ্ছন্নতা (trance states)।[৮]

৭ The symptoms of illness which children may assume as a way of escaping from an unpleasant situation cannot properly be called hysterical. Such symptoms disappear relatively quickly when the underlying difficulty is removed. In hysteria the basic difficulty is of long duration, and the removal of the immediate problem usually results only in a temporary improvement. Sherman—Basic problems of Behaviour, p. 374

৮ Janet—The Major Symptoms of Hysteria, p. 93

এ লক্ষণগুলির পৃথক পৃথক আলোচনার পূর্বে হিষ্টিরিয়ার ব্যাখ্যা হিসাবে বিভিন্ন মত উল্লেখ করা যাচ্ছে।

(১) ঝানে-র সিদ্ধান্ত এই যে, হিষ্টিরিয়া-অবস্থার পশ্চাতে জন্মগত কিছু কারণ ক্রিয়া করে এবং অনুভূতির ক্ষেত্রে সংঘাত ও বিশৃঙ্খলার চাপে ব্যক্তির বিভিন্ন ক্রিয়ার মধ্যে স্বাভাবিক যে সুসংবদ্ধতা থাকে, তা বিঘ্নিত হয়।[৯]

(২) ব্যাবিন্স্কি-র মতে হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত ব্যক্তিদের সবল ব্যক্তিত্বের অভাব, তাদের অতিশয় অভিভাবন-প্রবণতায় প্রতিফলিত হয়। সুস্থ সাধারণ মানুষেরা বিভিন্ন বিষয়ে ধীরভাবে বিবেচনা করে, তারপর কোন একটি কর্মপন্থা বেছে নেয়। কিন্তু যারা হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত তারা তাদের সামনে যে কোন অভিভাবন (suggestion) উপস্থিত হলেই, তা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সেই দিকে ঝুঁকে পড়ে।[১০]

(২) ফ্রএড্‌পন্থীদের মতে, সমস্ত হিষ্টিরিয়ার মূলে আছে অবদমিত প্রবল যৌনাকাঙ্ক্ষা। একদিকে প্রবল আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে প্রবল বাধা। এক্ষেত্রে, আকাঙ্ক্ষার সম্পূর্ণ বিলোপ সম্ভব নয়। এবং হিষ্টিরিয়ার বিভিন্ন লক্ষণের মধ্য দিয়ে গোপন যৌনাকাঙ্ক্ষা ছদ্মবেশে পরিতৃপ্তির পথ খোঁজে। কিন্তু এ পরিতৃপ্তির পথ নিতান্ত অসন্তোষজনক। তাই হিষ্টিরিয়া একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা।[১১]

ইন্দ্রিয়ের অসাড়তা

হিষ্টিরিয়ার একটি প্রধান লক্ষণ—সাধারণত দৃষ্টি ও স্পর্শেন্দ্রিয় সম্পর্কে এই সাময়িক (কখনো কখনো দীর্ঘকালস্থায়ী) অসাড়তা—বিশেষ লক্ষ্য করা যায়। এই অসাড়তা যে বাস্তবিক দৈহিক কারণ থেকে নয়, তা এ কয়েকটি বিষয় থেকে বোঝা যায়। (১) রোগী দেহের যে ইন্দ্রিয় বা অঙ্গ -সম্বন্ধে অসাড়তার

৯ Ibid, p. 101

১০ ...a hysteric patient is highly subject to suggestion for...suggestion means the ready acceptance of a stimulus to action without any attempt to integrate either the stimulus pattern or the response to other patterns and responses. Hysteria, thus, might be described as a state of increased suggestibility. Babinsky—My Conception of Hysteria & Hypnotism—Alienist & Neurol, 1908, 19, 1-30

১১ Freud—Selected Papers on Hysteria & Other Psychoneuroses, Nerv. and Ment. Dis. Monog, 1930 (No. 4)

কথা বলে, সে স্থানের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যাবর্ত ক্রিয়া (reflexes) কিন্তু অক্ষুণ্ণ থাকে। (২) অসাড় স্থানগুলি অনেক সময় অনির্দিষ্ট এবং পরিবর্তনশীল। (৩) অসাড় স্থানগুলির সঙ্গে দেহসংস্থানগত স্নায়ুমণ্ডলীর অবস্থানের মিল নেই (The anesthetic area does not conform to the anatomical distribution of nerves)।[১২] দৃষ্টিশক্তির যে অসাড়তা হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীদের মধ্যে দেখা যায়, তা সত্যিকারের অন্ধতা নয়। তাদের চোখের কোন কোন অংশে হয়তো এই অন্ধতা দেখা যায়—কোন কোন রং সম্বন্ধেও হয়তো অন্ধতা দেখা যেতে পারে এবং এই অন্ধতার এলাকা পরিবর্তনশীল হতে পারে। হেড্ এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ইন্দ্রিয়ের গঠনগত কারণে এ অন্ধতা নয় (not due to any organic cause)। এর কারণ হচ্ছে মানসিক বিশৃঙ্খলার ফলে স্নায়বিক সংযোগের বিচ্ছিন্নতা,—এটা ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারে কিছু গোলযোগ (a functional disorder)।[১৩]

বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের স্নায়বিক সংযোগের বিচ্ছিন্নতার জন্যে যেমন কোন ইন্দ্রিয় বা তার কোন অংশের অসাড়তা বা বিকলতা দেখা যেতে পারে, তেমনি কোন একটি বিশেষ পেশী বা অঙ্গের সঞ্চালন-শক্তিও লোপ পেতে পারে (monoplegia); কখনও বা একটা দিকের পেশীগুলি নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে পারে (hemiplegia); নিম্নাঙ্গের অবশতাকে বলে (paraplegia); সমস্ত দেহের অবশতা হল diplegia; হিষ্টিরিয়া-জনিত এই অবশতা কিন্তু বাস্তবিক শারীরিক কারণে যে পক্ষাঘাত (paralysis) ঘটে তার মতো দেখতে হলেও তার থেকে পৃথক। হিষ্টিরিয়া-জনিত অবশতায় পেশীর সঙ্গে যুক্ত প্রত্যাবর্ত ক্রিয়া (reflexes) লোপ পায় না এবং বিদ্যুৎ-তরঙ্গের আঘাত দ্বারা তাদের সক্রিয় করা যায়। সাধারণ সুস্থ মানুষের বেলায় কোন অঙ্গ কোন

১২ Fisher—An Introduction to Abnormal Psychology, p. 232

১৩ In the field of vision...objects focussed upon a given half of the retina may excite no response. One eye may remain functionally blind or the whole field of vision may be definitely narrowed. It is even possible for the patient to become functionally blind to certain colours or to certain kinds of objects. Since these functional disturbances may wander freely from one part of the body to the other, it seems fairly clear that they are the product of dissociation in neural function rather than an expression of a truly organic ailment. Head—Studies in Neurology, p. 120

একদিকে ক্রিয়াশীল হতেই, অন্য অঙ্গগুলিতে তার বিপরীত ক্রিয়া বন্ধ হয়, কাজেই দেহের ক্রিয়াগুলির মধ্যে একটা ছন্দ ও সামঞ্জস্য থাকে। কিন্তু হিষ্টিরিয়া-গ্রস্তদের বেলায় এই বিপরীত ক্রিয়া-প্রবণতাগুলির সামঞ্জস্যবিধান ঘটে না এবং একটি ক্রিয়ার প্রবণতা, বিপরীত ক্রিয়া-প্রবণতার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে একটা আপাত অসাড়তা বা অবশতার সৃষ্টি হয়। তা ছাড়া, যে গোপন মানসিক সংঘাত হিষ্টিরিয়ার মূল কারণ, তার সুসমাধান হয়ে গেলে ইন্দ্রিয়ের অবশতা অথবা অঙ্গের অসাড়তা আপনিই দূর হয়ে যায়।[১৪] সাধারণত কোন তীব্র অপ্রীতিকর অনুভূতির আঘাতের পরেই এরকম অবশতা বা অসাড়তা আত্মপ্রকাশ করে। ম্যাকডুগ্যাল্ একটি সৈনিকের উদাহরণ দিয়েছেন। এই শিথিল-চরিত্র অথচ সাহসী যুবকটির গ্যালিপোলীর যুদ্ধে যাওয়ার পথে তীব্র কামানের শব্দ কানে যাওয়ার কিছু পরে হঠাৎ নিম্নাঙ্গের সম্পূর্ণ অবশতা দেখা গেল। ইতিপূর্বে তার গলায় ঘা ছিল। ডাক্তারেরা মনে করলেন সম্ভবত ডিপ্থিরীয়ার জীবাণু আক্রমণের ফলে এই পক্ষাঘাত দেখা দিয়েছে। কিন্তু ম্যাক্‌ডুগ্যাল-এর সন্দেহ হল এই রোগের কারণ দৈহিক নয়, মানসিক। তিনি প্রথমে সংবেশন (hypnosis) দ্বারা রোগের মূল উৎপাটনের চেষ্টা করে কিছুটা সফল হলেও সম্পূর্ণ নিরাময় করতে পারলেন না। তিনি তারপর ধীরে ধীরে যুবকটির গোপন মানসিক সংঘাতের স্বরূপটি প্রকাশ্যে তার সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করলেন এবং জাগ্রত অবস্থায় অভিভাবন (waking suggestion) দ্বারা ধীরে ধীরে তার অবশতা দূর করে তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলতে সক্ষম হলেন।[১৫] ঝানে হিষ্টিরিয়া-জনিত অন্ধত্ব এবং তাদের পুনরায় দৃষ্টিলাভের কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন, তার মধ্যে একটি সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাচ্ছে।

মেরী নামে কলেজে-পড়ুয়া অল্পবয়সী একটি মেয়ে মাসীর সঙ্গে সমুদ্রস্নানে গিয়েছিল। সমুদ্রে স্নান করে তীরে মাসীর কাছে ফিরে আসার সময় ওর চোখ দুটি হঠাৎ একেবারে শক্ত হয়ে বুজে গেল। কিছুতেই চোখ খোলা গেল না। হাসপাতালে ডাক্তারেরা সন্দেহ করলেন, মস্তিষ্কে একাধিক কেন্দ্র থেকে রক্তক্ষরণের জন্যে মেয়েটি সম্ভবত চিরকালের জন্য অন্ধ হয়ে যাবে। মেরী

১৪ Sidis—Symptomology, Psychogenesis, and Diagnosis of Psychopathic Diseases, pp. 329-38

১৫ McDougall—Outlines of Abnormal Psychology, p. 245

বিছানায় শুয়ে ছটফট করত, আর ভাবত কলেজ খুললে কি করে ক্লাসে যাবে। এগার দিনের দিন ছটফট করতে করতে মেয়েটি বিছানার থেকে নিচে পড়ে যায়। আশ্চর্যের কথা, এই আঘাতের পরে হঠাৎ তার চোখ দুটি আবার খুলে গেল। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সে একজন অভিজ্ঞ মানসিক রোগে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল।[১৬]

ফিশার হিস্টিরিয়াগ্রস্তদের, তাদের দেহের লক্ষণগুলির সাহায্যে দৃষ্টি-আকর্ষণ (attention-getting) ও সহানুভূতি-লাভের (ego-centricity) চেষ্টা নিয়ে কিছু আলোচনা করেছেন। আমরা বায়ুরোগগ্রস্তদের (neurotic) মধ্যেও এ লক্ষণ দেখেছি। কিন্তু ঐ দুইয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে প্রভেদ আছে। নিউরোটিক রোগীরা তাদের দৈহিক রোগলক্ষণগুলিকে যেন লালন করতেই ভালবাসেন—এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে বা মানুষের সঙ্গে কথা বলতেই ভালবাসেন। কিন্তু হিস্টিরিয়া রোগী অনেকটা নৈর্ব্যক্তিকভাবে এ লক্ষণগুলিকে দেখেন এবং অনেকটা নির্মম ভাবেই এ লক্ষণগুলি সম্পর্কে আলোচনা করেন। অবশ অঙ্গটা কেটে বাদ দিলে কেমন হয়, তা ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা করতে এ রোগীরা ভয় পায় না।[১৭]

স্বপ্নাবেশ ও স্বপ্নচারিতা

হিস্টিরিয়াগ্রস্ত ব্যক্তি হঠাৎ স্বপ্নাবেশে অতীত জীবনের কোন দুঃখপূর্ণ বা ভীতিপ্রদ ঘটনা সম্পূর্ণ অবচেতনভাবে পুনরভিনয় করে। অনেক সময় এই নাটকীয় পুনরভিনয়ের পরে রোগী অবসন্ন হয়ে পড়ে এবং এই কথা সে সম্পূর্ণ ভুলে যায়। ঝানে বিশ বৎসর বয়স আইরীন্ নামে একটি মেয়ের অদ্ভুত

১৬ Janet—The Major Symptoms of Hysteria, p. 192

১৭ It seems quite obvious that he may tend to use his symptoms as a means of gaining attention and yet he has a very peculiar impersonal attitude toward his symptoms. They do not distress him as the neurasthenic's symptoms do; ...In his general attitude the hysteric is very much like the child; he is open and frank in his bids for attention; the subtlety of the neurasthenic is largely lacking. His attitude is typically extroverted and consequently, since his symptoms are manifestations of dissociated mental systems, he is able to take a peculiarly impersonal attitude toward them. Fisher—An Introduction to Abnormal Psychology, pp. 240-41

উদাহরণ দিয়েছেন। এই মেয়েটির মা যক্ষ্মারোগগ্রস্তা ছিলেন। দীর্ঘকাল রোগভোগের পর, বিষম ক্লেশকর ও বীভৎস অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। আইরীন্ শেষ দুইমাস তাঁকে বিশ্রাম ও নিদ্রা ত্যাগ করে দৈহিক শ্রান্তি-ক্লান্তি উপেক্ষা করে সেবা করেছিল। মাতার মৃত্যুর পর থেকে আইরীনের মধ্যে স্বপ্নচারিতার (somnumbulism) অদ্ভুত লক্ষণগুলি দেখা দিল। অকস্মাৎ তার পরিবেশ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে সে মার মৃত্যুর পূর্বের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতাগুলি পুনরভিনয় করত, মার সঙ্গে কথা বলত, শীঘ্রই মাকে অনুসরণ করে সেও আত্মহত্যা করবে এমন সঙ্কল্প প্রকাশ করত, যেন চলন্ত ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে তার মৃত্যু হল, এমন অভিনয় করত। এই স্বপ্নাবিষ্ট অবস্থা কয়েকদিনও চলত এবং পুনঃ পুনঃ সে ওই দুঃখজনক ক'টি দিনের কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করত। তারপর সে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ত এবং ঘুম ভাঙ্গলে দেখা যেত সে সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ এবং গত কয়দিনের অভিজ্ঞতার কোন স্মৃতি তার মনে থাকত না।[১৮]

ব্যক্তিত্বের বিচ্ছিন্নতা—বহু-ব্যক্তিত্ব

আর. এল. স্টীভেন্‌সন্-এর হৃদয়গ্রাহী উপন্যাস 'ডাঃ জেকিল অ্যাণ্ড মিঃ হাইড্' প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে ব্যক্তিত্বের বিচ্ছিন্নতা এবং একই ব্যক্তির বহু ব্যক্তিতে বিভক্ত হওয়ায় ঘটনা গল্পের বইয়ে এবং ছবিতে খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এটা খুব রহস্যময় কোন ব্যাপার নয়। আমরা প্রত্যেক মানুষই এক হিসাবে, বিভিন্ন বয়স, বিভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। যে সমীর অফিসের সময় হুড়োহুড়ি করে, ট্রামে বাসে বাদুড়-ঝোলা হয়ে যাতায়াত করছে, আর যে সমীর সন্ধ্যার পরে তার 'ভাব-করা' মেয়েটির সঙ্গে নিরালা জায়গায় বসে প্রেম করছে, মেজাজ কর্মকুশলতা অনুভূতি ভাষা ইত্যাদির দিক থেকে সে নিশ্চয়ই পৃথক। আবার অফিসে বড় সাহেবের সামনে তার ব্যবহার এবং নিম্নতর কর্মচারীর সঙ্গে তার ব্যবহারে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। ঘরে সমীরের এক চেহারা, বাইরে তা সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমীরের বিভিন্ন পরিচয়ের মধ্যে একই ব্যক্তিত্বের অচ্ছেদ্য যোগসূত্র আছে। কিন্তু মানসিক অসুস্থতার জন্যে (যেমন হিস্টিরিয়ার বেলায়)

১৮ Janet—The Major Symptoms of Hysteria, pp. 29-31

এই বিভিন্ন ব্যক্তি-চরিত্রগুলি বাস্তবিক পক্ষেই পৃথক পৃথক হয়ে যায়—তাদের মধ্যে যোগসূত্রের ঐক্য থাকে না।[১৯] এমন কি ব্যক্তির সেই বিভিন্ন চরিত্রগুলি পরস্পর বিপরীত হতে পারে এবং ব্যক্তির এক অবস্থার কোন স্মৃতি অন্য অবস্থায় থাকে না। অনেক সময় এই বিচ্ছিন্নতার অবস্থা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় না। কিন্তু বিরূপ অনুভূতির চাপে আবার হয়তো বিচ্ছিন্নতার লক্ষণ দেখা দেয়। সাধারণ সুস্থ মানুষের ভেতরে এমন একটি চেতনার সবল শক্তি থাকে, যা তার বিপরীত রুচি প্রকৃতি ইচ্ছাকে একটি সমগ্র ঐক্যের বন্ধনে বেঁধে রাখতে পারে। কিন্তু মানসিক যারা অসুস্থ, তাদের চেতনা বা ইচ্ছার এই শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। একথা বিশ্বাস করার হেতু আছে যে, হিষ্টিরিয়া রোগীমাত্রই বহির্মুখী (extrovert) ব্যক্তি এবং এসব ব্যক্তিত্বে চেতনারূপ মানসিক গুণ সাধারণের চেয়ে স্বল্পতর পরিমাণে থাকে।[২০] সাধারণভাবে একথা বলা যায় যে বায়ুরোগগ্রস্তরা অধিকাংশই অন্তর্মুখী প্রকৃতির (introverts), কিন্তু হিষ্টিরিয়া রোগীরা অধিকাংশই হচ্ছে বহির্মুখী প্রকৃতির (extroverts)।

এ ব্যক্তিত্ব-বিচ্ছিন্নতা ও একই ব্যক্তির বহু ব্যক্তিতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার

১৯ The reader must not suppose that all multiplications of personality are truly hysterical or abnormal, for even a casual inspection of his own daily life will show that he may display in a less extreme form the same sort of dissociation which appears in the hysterical patient. It not infrequently happens that a normal individual is one kind of a person in his office and quite another on the golf links. Dissociation of this kind are most frequent with respect to opinions and beliefs. It is quite easy, for example, for one and the same person to be highly generous and sociable in his personal dealings with his neighbours but exceedingly antisocial and ungenerous in the conduct of his business. Griffith—An Introduction to Applied Psychology, p. 311

২০ ...the quality of consciousness···has a cementing effect or influence upon the individual's different psychophysical functions and systems. It tends to bind them together within the individual's total organization of voluntary reaction patterns. And since the strongly extroverted person is deficient in amount or degree of consciousness he is prone to dissociation ...And this deficiency is his tendency to dissociation under stress, albeit on the other hand, his facility for turning from one fact to another, for passing from one reaction pattern (of thought, feeling or overt activity) to another with an enviable ease. Fisher—An Introduction to Abnormal Psychology, pp. 259-269

আশ্চর্য একটি উদাহরণ দিয়েছেন মর্টন প্রিন্স। এ উদাহরণটি প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। বোশাম্প (Beauchamp) নামে একটি মেয়ের জীবনে এই ঘটনা ঘটে। কিছু বিভ্রান্তিকর ও ক্লেশকর অভিজ্ঞতার ধাক্কায় মেয়েটির ব্যক্তিত্ব ক্রমে ক্রমে পাঁচটি বিভিন্ন-চরিত্র ব্যক্তিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

বোশাম্প একটি অভিভাবনপ্রবণ (impressionable), অল্পেতে অস্থির (nervous) প্রকৃতির মেয়ে। তার পিতামাতার সম্পর্ক প্রীতিকর ছিল না। তার মা নিষ্ঠুর প্রকৃতির স্ত্রীলোক ছিলেন এবং বোশাম্প সম্পর্কে তিনি উদাসীন ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বোশাম্প তার মার প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত ছিল। বোশাম্পের তেরো বছর বয়সে তার মার মৃত্যু হয় এবং বোশাম্প এতে মনে খুব আঘাত পায়। এর পর তিন বৎসর তার নানা অশান্তিতে কাটে। ষোল বছর বয়সে সে তার নিরানন্দময় গৃহ পরিত্যাগ করে। ১৮ বছর বয়সে সে এক হাসপাতালে চাকুরি নেয় এবং একটি যুবকের প্রতি সে অনুরক্ত হয়। কিন্তু এই ভালবাসায় তার দৈহিক মিলনের চিন্তা ছিল না। একদিন সন্ধার পর সেই যুবকটি নাটকীয় অবস্থায় মেয়েটির কাছে আসে এবং বোশাম্প পরিষ্কার করে না বললেও একথা তার বিবরণ থেকে মনে হয়, ছেলেটি তাকে জোর করে চুমু খায়। এতে বোশাম্পের নৈতিক চেতনা বিষম আঘাত পায় এবং তার মনে গভীর পাপবোধ জন্মে। এর পর ক'দিনই সে বিষম উত্তেজিত অবস্থায় কাটায় এবং তার প্রকৃতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। তার চরিত্রের অদ্ভুত দিকগুলি অত্যন্ত পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। সে অত্যন্ত অশান্ত, অতিরিক্ত ধর্মপরায়ণ হয়ে পড়ে এবং কোন বিষয়েই স্থির সিদ্ধান্ত করা অথবা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে (she became unstable and developed aboulia)।

এই নতুন ব্যক্তিত্বের অবস্থা ছয় বছর স্থায়ী হয়েছিল। এই ব্যক্তিটিকে মর্টন প্রিন্স বলেছেন B_1। এটি একটি নতুন ব্যক্তিত্ব এবং এ ব্যক্তিত্ব যেন বোশাম্পের চরিত্র থেকে কিছু উপাদান বর্জন করে সৃষ্ট। এ সময় B_1 বেশ সক্রিয় জীবন যাপন করছিল এবং কলেজে ভর্তি হয়েছিল। তার স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল না এবং মাঝে মাঝে স্যালী (Sally) নামে আর একটি নতুন ব্যক্তিত্ব মাঝে মাঝে এই দেহকে যেন ভর করত। স্যালী ছিল দুষ্টবুদ্ধিপরায়ণা, বালিকা-স্বভাবা, চঞ্চলা, অ-ধার্মিকা এবং সাধারণ ভাবে সে B_1 সম্বন্ধে উপহাসের সঙ্গে কথা বলত। স্যালী-রূপ নতুন ব্যক্তিত্বের পরিচয় মর্টন্ প্রিন্স

B_1-এর সংবেশিত অবস্থায় (under the hypnotic condition of B_1) জানতে পারেন। স্যালী কিন্তু সর্বদাই নিজেকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলেই দাবি করত এবং তার বুদ্ধি স্মৃতি ইচ্ছা ইত্যাদি সবই B_1 থেকে পৃথক ছিল। B_1-এর সংবেশিত অবস্থাকে প্রিন্স বলেছেন B_2। স্যালী B_1 এবং B_2 দুয়ের থেকেই চরিত্রে পৃথক ছিল। সে কিন্তু একটানা বোশাম্পের দেহকে ভর করে থাকত না, কিন্তু যখন সে প্রকট হত তখন B_1 স্তিমিত হয়ে যেত এবং স্যালী (সে নিজেকে এই নামেই পরিচয় দিত) তাচ্ছিল্যের সঙ্গে B_1-এর কথা বলত। স্যালী মাঝে মাঝে দেখা দিত, আবার কিছুদিন বাদে B_1 নিজ চরিত্রে প্রকাশ পেত। প্রিন্স-এর চিকিৎসাধীনে থাকবার শেষদিকে আবার এক অনুভূতিগত আঘাতের (emotional shock) ফলে আর এক নতুন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হল। সে হল B_4। কিন্তু, গত ছয় বছরে বোশাম্পের জীবনের কোন ঘটনার স্মৃতি B_4-এর ছিল না। বোশাম্পের জীবনের প্রথম অনুভূতিগত আঘাত পর্যন্ত সব স্মৃতি কিন্তু তার ছিল। এর পর B_1 এবং B_4 পর্যায়ক্রমে দেখা দিতে লাগল। B_1 ছিল বিনয়ী, রুগ্ণা, দুর্বল, অভিভাবনপরায়ণা, লাজুক, ধার্মিক, ধৈর্যশীলা, পরোপকার-পরায়ণা, শিশু এবং বৃদ্ধের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্না। কিন্তু B_4 ছিল অনেকদিক থেকে B_1-এর বিপরীত। B_4 ছিল কর্মঠ, দেহ-সঞ্চালনে পটু, অহঙ্কারী, অল্পেতেই ক্রুদ্ধা, কলহপরায়ণা, মানুষের সঙ্গে মিশতে অনিচ্ছুক, শিশু ও বৃদ্ধদের প্রতি সহানুভূতিহীনা। B_1 যা কিছু পছন্দ করত, B_4 তার অধিকাংশই অপছন্দ করত। স্যালীর সঙ্গে B_4-এর কিছু কিছু মিল ছিল। কিন্তু স্যালী সর্বদাই নিজেকে সম্পূর্ণ পৃথক ব্যক্তি বলে পরিচয় দিত। B_1-এর সংবেশিত অবস্থায় B_2 আত্মপ্রকাশ করত এবং B_2-টির কোন সম্পূর্ণ পৃথক ব্যক্তিত্ব ছিল না। স্যালী সংবেশিত অবস্থার পরেই B_2 দেখা দিত; কখনো B_2 ও স্যালী যেন একসঙ্গেই দেখা দিত এবং অনেক সময় B_2 স্যালীতে এবং স্যালী B_2-তে পরিবর্তিত হত। স্যালীর বিশেষ বিরোধ ছিল B_1-এর সঙ্গে। B_1-এর নীতি-বোধ, ধার্মিকতাকে আঘাত করতে সে চেষ্টা করত এবং তার দুষ্টামী (যেমন মিথ্যা কথা বলা) এবং ইন্দ্রিয় ও পেশীর অনিচ্ছাকৃত যান্ত্রিক কোন কোন ক্রিয়া (certain sensory & motor automatisms) B_1-এর ওপর যেন সে জোর করে চাপিয়ে দিত। এর মধ্যে একটি ছিল বন্ধ চোখের পাতা বারেবারে কচলানো! মর্টন প্রিন্স বুঝেছিলেন যে সংবেশ ক্রিয়া ও অভিভাবন (hypnotic suggestion) দ্বারা বোশাম্পের

বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বকে ঐক্যবদ্ধ চেষ্টায় তিনি তখনও সফল হচ্ছিলেন না, বরং বোশাম্পের চরিত্রের বিভিন্ন এবং বিপরীত দিকগুলি স্যালীর আক্রমণে পৃথক পৃথক খণ্ড-ব্যক্তিত্বে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছিল। এবার অতি গভীর সংবেশ ক্রিয়া এবং অভিভাবন দ্বারা প্রিন্স এই বিভক্ত ব্যক্তিত্বগুলিকে (B_1 , B_4 ও স্যালী) একটি সুস্থ সমগ্র ঐক্যবদ্ধ করতে উদ্যত হলেন এবং তাতে সফলও হলেন। বিশেষ করে এই সুস্থ হয়ে ওঠা বোশাম্প, B এবং B_4-এর বিপরীত প্রবৃত্তিগুলি এবং তাদের পৃথক স্মৃতিগুলি পুনরায় ঐক্য-সম্বন্ধে যুক্ত হয়ে যেন এক নতুন সমৃদ্ধতর শান্ত সুসমঞ্জস ব্যক্তিত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত হল। এমন কি, স্যালীও তার তীক্ষ্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি হারিয়ে এই সমগ্র সুসমঞ্জস ব্যক্তিসত্তায় নিজেকে হারিয়ে ফেলল।[২১]

এ কাহিনীটি বাস্তবিকই বিস্ময়কর। তবে ফিশার এখানে বোশাম্পের চরিত্রের বিচ্ছিন্নতাকে এবং তার খণ্ড খণ্ড অংশগুলিকে (episodes) সম্পূর্ণ পৃথক ব্যক্তিত্ব হিসাবে স্বীকার করতে ইচ্ছুক নন। তিনি বলেন, এখানে বিভিন্ন খণ্ড ব্যক্তিত্বগুলি একই ব্যক্তিত্বের মধ্যে সহঅবস্থানকারী ঐক্যবদ্ধ চেতনার জটিলতা, অথবা পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে একই ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন

২১ ...A fifth period was initiated by inducing deep hypnosis, when a personality appeared which commanded all the memories of both B_1 and B_4 and seemed to be, in respect of character also, a fusion of the two personalities B_1 & B_4. "She has lost the reserve, the depression, the emotionality and the idealism of B_1; but she had lost also the quick temper, the lack of faith, the resentment and the egoism of B_4. She was a person of even temperament, frank and open in address—one who seemed to be natural and simple in her modes of thought and manner. Yet she more closely resembled B_1 restored to wholeness by synthesis of B, a condition of healthy mindedness." This personality who seemed to be essentially the normal personality Beauchamp, restored to wholeness by synthesis of B_1 and B_4, her two halves could not at first be maintained, owing in the main to the opposition of Sally...Towards the end of the fifth period, Sally who had fought for her life valiantly and successfully, began to show signs of discouragement under the combined efforts to suppress her of B_4 and of Dr Prince. She described herself as feeling "squeezed" during her sub-conscious phases. When the normal personality was restored as a stable synthesis of B_1 and B_4 Sally seemed to be deprived of her power, both her power of controlling the primary personality inhibiting her actions or forcing upon her "automatic" actions and hallucinations and also her power to secure dominance of the organism. McDougall—Outline of Abnormal Psychology, pp. 497-501

দিকের একটির পর একটির ক্রমপ্রকাশ। একই দেহে দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক ব্যক্তিত্বের অবস্থান সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে ব্যক্তিত্বের ঐক্য ও বিচ্ছিন্নতার সূত্র দিয়ে এ প্রকার আপাত-রহস্যময় ঘটনার ব্যাখ্যা করা সম্পূর্ণ সম্ভব।[২২]

হিস্টিরিয়ার ব্যাখ্যা

(১) সাধারণভাবে এ কথা বলা যায় সে হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত ব্যক্তিরা বহির্মুখী প্রকৃতির (extroverts)।

(২) এ জাতীয় ব্যক্তিদের চেতনা গুণগতভাবে অগভীর। অর্থাৎ এরা খুব ভেবে-চিন্তে কাজ করে না। কোন চিন্তা মনে উদয় হওয়া মাত্রই তা কাজে পরিণত হয় (he is ideomotor in his reaction patterns)।

(৩) চেতনার অগভীরতার জন্যেই হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত ব্যক্তিদের বিভিন্ন ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা প্রবৃত্তি উদ্যম ইত্যাদির মধ্যে ঐক্যের বন্ধন-সূত্রটি শিথিল। সেই জন্যেই এ জাতীয় ব্যক্তিদের ব্যক্তিত্বে বিচ্ছিন্নতা (dissociation) ঘটার প্রবণতা দেখা যায়। অপ্রীতিকর বা বিভ্রান্তিতর অনুভূতির চাপে এদের ব্যক্তিত্বের ঐক্যসূত্রটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, এই ভয় থাকে।

(৪) এ জাতীয় ব্যক্তিরা কোন নিকট আত্মীয়ের (মা, বোন, ভাই ইত্যাদি) প্রতি অতিমাত্রায় অনুরক্ত বা নির্ভরশীল (a narrow system of ego-identifications)।

২২ This case illustrates both alternating and co-existing types of multiple personality...obviously it is impossible for two personalities to have complete control of the mechanisms of the individual at the same moment; and no such case has ever been reported or could conceivably exist. On the other hand, it is entirely conceivable that *one personality* (organization of motives) may dominate most of the mechanisms (motor and intellective patterns) of the individual, while a second personality controls the rest, resulting in subconscious (autosomatic) acts, hallucinations etc. And it is quite conceivable that both personalities might be conscious of a given fact at the same moment just as two individuals might be. In brief, there appears to be nothing about the phenomenon of multiple personality which cannot be adequately described in terms of the concepts of integration and dissociation (disintegretion). Fisher—An Introduction to Abnormal Psychology, p. 258

(৫) হিস্টিরিয়াগ্রস্তদের কোন তীব্র আকাঙ্ক্ষা অবদমিত হয়ে তার অবচেতন মনে জটিল গ্রন্থি সৃষ্টি করে। ফ্রএড্‌পন্থীরা মনে করেন এই আকাঙ্ক্ষা সর্বদাই যোনিকেন্দ্রিক। এই অবদমনের ফলে, এ জাতীয় ব্যক্তি আত্মরক্ষার জন্যে, আকাঙ্ক্ষার বস্তু থেকে দূরে সরে থাকবার উপযুক্ত অচেতন বিপরীত প্রতিক্রিয়ার (reaction formations) আশ্রয় গ্রহণ করে; অথবা তার নৈতিক আদর্শের প্রতীক কোন ব্যক্তির সঙ্গে তাদাত্ম্য দ্বারা তার পশ্চাতে আশ্রয়গ্রহণের চেষ্টা করে। এ চেষ্টায় তার অন্তরের সংঘাতের নিরসন হয় না এবং ব্যক্তি তার যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে অবশতা অসাড়তা স্মৃতিলোপ ইত্যাদি দৈহিক-মানসিক রোগকে আশ্রয় করে। এসব রোগ কিন্তু বাস্তবিক দেহগত কোন বৈকল্য থেকে উদ্ভূত নয় (not organic), এই অসাড়তা ইত্যাদি ইন্দ্রিয় বা অঙ্গের সঞ্চালন-সম্বন্ধীয় (functional in nature)।

(৬) হিস্টিরিয়াগ্রস্ত ব্যক্তিরা অত্যন্ত অভিভাবন-প্রবণ (amenable to suggestion) এবং তাদের রোগ-লক্ষণগুলি তারা সাধারণত অন্যের অনুকরণে নিজের দেহে আরোপ করে।[২৩]

এখানে আরো দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে।

একটি মেয়ে তার মায়ের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত ছিল। মা কঠিন অসুখে পড়েন। মেয়েটি তাঁকে সেবা করত। যে ডাক্তার মাকে চিকিৎসা করতেন, মেয়েটি তাঁর প্রতি মনে মনে আকৃষ্ট হয়। একদিন মার অবস্থা খুব খারাপ হয়। মাকে যখন ডাক্তার পরীক্ষা করছিলেন, তখন দৈবাৎ ডাক্তারের

২৩ ...There are other and equally important factors which are essential to the development of hysteria. Perhaps the most prominent feature of the potential hysteric's predisposition to mental illness is his over-developed racial motives, particularly suggestibility. And next to this is his shallow, inadequate and narrow system of ego-identifications or personal values. Finally we have an exaggerated propensity to make over-identifications.

The hysteric or the potential hysteric is troubled by an excessively strong motive complex compounded of sex-affection, sympathy and suggestibility. Freud has contended that this complex which is easily detected in all hysterias is of a distinctly sexual character. In the writer's opinion suggestibility is more its chief component. To offset the weight of this complex of powerful motives, the hysteric has only an inadequate set of ego-identifications. Fisher—An Introduction to Abnormal Psychology, p. 260

জানু মেয়েটির জঙ্ঘা স্পর্শ করে। তাতে মেয়েটির তীব্র কামাকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। কিছুদিনের মধ্যেই মা মারা যান। তাতে মেয়েটির মনে গভীর আঘাত লাগে। সেই সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির মনে বিষম অনুতাপ-বোধের উদ্রেক হয়। অল্পদিনের মধ্যেই তার দুই পায়েই অবশতার লক্ষণ (astasia—abasia) দেখা দিল। এই রোগ-লক্ষণ হল, একটা অবচেতন বিপরীত প্রতিক্রিয়া (reaction formation),যার সাহায্যে ব্যক্তি গোপন আগ্রহের বস্তু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে আত্মরক্ষার জন্যে চেষ্টিত হয়। তার পা দুটি অবশ হওয়ার তাৎপর্য হচ্ছে, সে তার গোপন প্রেমপাত্র ডাক্তারের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চায়। এই সঙ্গে তার আর আর একটা লক্ষণও দেখা দিল, যেটা তার মায়েরও ছিল—তা হল, তার চোখের পাতাগুলি ঝুলে পড়ে (drooping eyelids)। ডাক্তার মেয়েটিকে বলেছিল যে—তার মার চোখের সঙ্গে তার মিল আছে। এ কথাটিই এ ক্ষেত্রে অভিভাবন হিসাবে ক্রিয়া করেছে। তাছাড়া, মায়ের চোখের পাতা যেমন করে ঝুলে পড়ত, তারও সেই লক্ষণ অবচেতন ভাবে গ্রহণের মানে হচ্ছে, সে মায়ের দৃঢ় নৈতিক চরিত্রের সঙ্গে নিজের তাদাত্ম্য স্থাপন করে মেয়েটি নিজের প্রলোভনের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে।[২৪]

২৪ The drooping eyelid expressed an over-identification with her mother and the over-identification was indicative of an effort on the part of the girl to strengthen her resistances to going in search of her lover. By becoming like the very moral and proper mother who would not have dreamed of running after a man she would be strengthening the wavering ego-ideals of chastity and propriety. Shaffer & Shoben—Psychology of Adjustment, p. 252

চতুর্বিংশ অধ্যায়

সর্বাপেক্ষা গুরুতর মানসিক বিকার—বাতুলতা, উন্মাদরোগ

কখনো বা হাসছে, কখনো বা হাহাকার করে কাঁদছে, কথাবার্তায় মধ্যে শৃঙ্খলা নেই, পোষাক-পরিধেয়ের দিকে দৃষ্টি নেই, বিষম অনিয়ন্ত্রিত ক্রোধ, কখনো বিষম উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করছে, কখনো বিড়্ বিড়্ করে কি যেন বলছে, আবার কখনো বা ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক ঠায় চুপ করে বসে আছে, কারো সঙ্গে কোন কথাই বলছে না; আর একজন হয়তো বৃত্তাকারে ঘুরছে তো ঘুরছেই; আর একজনের সন্দেহ সবাই তাকে বিষ দিচ্ছে; কারো ধারণা সে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর; কেউ জিনিসপত্র ভেঙেচুরে তছনছ করছে, মানুষকে দা নিয়ে কাটতে যাচ্ছে। এ সমস্ত মানুষকেই বলা হয় পাগল, উন্মাদ, বাতুল। এরা সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের থেকে সর্বাপেক্ষা ব্যতিক্রম। এদের অন্য মানুষ বিষম ভয় বা বিস্ময়ের চোখে দেখে। কেন এদের পাগল বা উন্মাদ বলা হয়? ওপরে যে ব্যবহারের উদাহরণগুলি দেওয়া হল, সেগুলি সুস্থ স্বাভাবিক মানুষেও তো কখনো কখনো দেখা যায়। কিন্তু এমন বিশৃঙ্খল ব্যবহার দেখা যায় সাময়িক ভাবে—বিচ্ছিন্নভাবে। তাই এসব লক্ষণ কোন মানুষে দেখা গেলেই সে পাগল বলে গণ্য হয় না। একজন মানুষকে তখনই পাগল বলা হবে, যখন দেখা যাবে স্থায়ীভাবে বা দীর্ঘকালের জন্যে তার ব্যক্তিত্বের ঐক্য বিধ্বস্ত হয়েছে—তার ইচ্ছাশক্তি স্ববশে নেই—সে জন্যেই তার ব্যবহারে বিশৃঙ্খলা, সমাজজীবনের সঙ্গে অসঙ্গতি, অনুভূতি ইচ্ছা বা কর্মের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও মাত্রাবোধের অভাব। পাগল উলঙ্গ হয়ে রাস্তায় ছুটতে পারে, নিঃসঙ্কোচে বিষ্ঠা সারা অঙ্গে লেপন করতে পারে, বিনা দ্বিধায় একটা ছোট শিশুর গলা টিপে মেরে ফেলতে পারে; পাগল এমন সব কাজ করতে পারে, তার কারণ, তার লজ্জা, ঘৃণা নেই। আর তারও কারণ তার বিচার-বুদ্ধি নেই—যা দিয়ে মানুষের চিন্তা অনুভূতি কর্ম আচরণের মধ্যে সঙ্গতিসাধন হয়। ব্যক্তিত্বই মানুষের এইসব দিকের মধ্যে এবং ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সংযোগ-স্থাপন করে, সুশৃঙ্খলা আনয়ন করে। ইতর পশুদের মধ্যে এই সংযোগের

ঐক্য নেই, দূর ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্য দ্বারা তার বর্তমান মুহূর্তের আচরণকে সে নিয়ন্ত্রণ করে না। পশু মুহূর্ত থেকে মুহূর্ত বিচ্ছিন্নভাবে, শৃঙ্খলাহীন ভাবে বাঁচে (The beast lives only from moment to moment)। বর্তমান মুহূর্তের উদ্দীপকই (stimulus) তার প্রতিক্রিয়াকে (response) সম্পূর্ণভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়। ছোট শিশুর জীবনও এমন বিশৃঙ্খল,—দূর উদ্দেশ্যের নিয়ন্ত্রণশূন্য। তাই পশু বা শিশুদের সম্বন্ধে 'ব্যক্তিত্ব' কেউ দাবি করে না। পশুর জীবনে ব্যক্তিত্বের সম্ভাবনাই নেই, কিন্তু শিশুর বাল্যকালে ব্যক্তিত্ব প্রকট না হলেও তার বিকাশ ও পরিণতির বীজ রয়েছে তার মধ্যে। আর যে বাতুল বা উন্মাদ, তার ব্যক্তিত্বের ঐক্য চূর্ণ হয়েছে। সে আস্ত, পুরো মানুষ নয়—অনেকগুলি টুকরো টুকরো খণ্ডিত মুহূর্তদ্বারা সীমিত অভিজ্ঞতার সমষ্টি। একেই ঝানে (Janet) বলেছেন, বিষঙ্গ (dissociation)। প্রত্যেক মানসিক বিকারেই **বাস্তব থেকে এই বিচ্যুতি** বা বিষঙ্গ লক্ষণীয়। এমন ব্যক্তির এক একটি অভিজ্ঞতা-খণ্ড সমগ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক একটি পৃথক শক্তি, ও বিশৃঙ্খল অনুভূতি-ইচ্ছা-ক্রিয়ার কেন্দ্রে পরিণত হয়। ব্যক্তি তখন নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নেয়—বাহ্যপরিবেশ ও সমাজ-পরিবেশের সঙ্গে তখন তার সামঞ্জস্যের অভাব ঘটে। সবচেয়ে গুরুতর মানসিক বিকার—যাকে উন্মাদ রোগ বা বাতুলতা বলা হয়—সেখানে এই ঐক্যহীন বিশৃঙ্খলা, এই বিষঙ্গের চূড়ান্ত অবস্থা।

বায়ুরোগ ও বাতুলতা

বর্তমানে উন্মাদরোগ (Insanity) কথাটা মনোবিদেরা পরিত্যাগের পক্ষপাতী। পরিবর্তে তাঁরা সর্বাপেক্ষা গুরুতর মানসিক অব্যবস্থাকে বাতুলতা (Psychosis) নামে চিহ্নিত করার পক্ষপাতী। তার কারণ হচ্ছে 'উন্মাদ' কথাটির একটি সমাজ-গৃহীত (এবং আইনত স্বীকৃত) তাৎপর্য আছে—এবং এই ভাবটিও আছে যে উন্মাদ ব্যক্তির নিজের ওপর কোন শাসন-সংযমের ক্ষমতা নেই এবং সমাজজীবনের সঙ্গে সঙ্গতিস্থাপনে সে অসমর্থ, সামাজিক কর্তব্যপালনে সে অপারগ—সে ভয় ও করুণার পাত্র।[১] এবং তাকে সর্বদা অন্যের সতর্ক

[১] The term insanity is rapidly disappearing from usage within psychiatric and psychological circles. It has a fairly definite medico-legal and sociological connotation, implying a more or less permanent loss of ability as a result of severe mental disturbance to make an adequate social adjustment and to assume social responsibilities, and therefore the necessity of commitment. Fisher—An Introduction to Abnormal Psychology, p. 28

রক্ষণাধীনে রাখতে হবে। পূর্বে তাদের লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হত। উন্মাদ কথাটির মধ্যে এই ভাবটিও থাকে যে সমাজজীবনে হিসাবের খাতায় তার নাম খারিজ করা হয়ে গেছে—তার আর কোন আশা নেই।

একটি প্রাচীন উন্মাদাগারের দৃশ্য

আইনত সে সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত—কোন কর্তব্যের দায় তার আর নেই। সমাজজীবনে সে মৃতেরই সামিল। মানসিক রোগের চিকিৎসকেরা এই চূড়ান্ত নিরাশার ভাবে হার মেনে যেতে রাজি নন এবং রোগীর মধ্যে এই হতাশার ভাব সঞ্চার করতেও এঁরা ইচ্ছুক নন।

১৯৩৩ সালে অ্যামেরিকান্ সাইকিয়াট্রিক্ অ্যাসোসিয়েশ্যন মানসিক বিকার-গুলিকে ২৪টি দলে ভাগ করেছেন; এতে সামান্য মানসিক গোলযোগ থেকে শুরু করে সবচেয়ে গুরুতর বাতুলতা—যেখানে সিফিলিস্ জীবাণুর আক্রমণে কেন্দ্রীয় মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্র ধ্বংস হয়ে গেছে—পর্যন্ত, বিকারের গুরুত্ব অনুযায়ী সাজানো হয়েছে।[২] এই তালিকা থেকে এই ধারণা হতে পারে যে এই

২ Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general paresis)
Psychoses with other forms of syphilis of the central nervous system
Psychoses with epidemic encephalitis
Psychoses with other infectious diseases
Alcoholic psychoses
Psychoses due to drugs or other exogenous poisons

সমস্ত বিকারের লক্ষণ ও মূল এবং মানসিক কলকব্জার বিকলতা, মোটামুটি এক—যা প্রভেদ, তা শুধু বিকারের পরিমাণে। সাধারণ মানুষের সামান্য মানসিক বিকার বা ব্যবহারের বৈকল্য এবং হিষ্টিরিয়া পর্যন্ত গুরুতর বায়ুরোগের প্রভেদ অনেকটাই বিকারের পরিমাণে এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সম্ভবত যে অবস্থাগুলিকে বাতুলতা (psychoses) বলা হয়েছে, সেগুলি শুধুই যে বিকৃতির পরিমাণেই পৃথক এমন নয়; সম্ভবত লক্ষণের দিক থেকে এবং রোগের মূলের দিক থেকেও তাদের গুণগত পার্থক্য আছে। অবশ্য লক্ষণ-অনুযায়ী মানসিক বিকৃতির শ্রেণীবিভাগ করা খুবই কঠিন, কারণ এদের অনেকের মধ্যেই একই ধরনের লক্ষণ দেখা যায় এবং লক্ষণগুলিও অনেক সময় পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। তথাপি সম্ভবত এ কথা বলা যেতে পারে যে বাতুলতা যেখানে কেন্দ্রীয় মস্তিষ্কের কেন্দ্রীয় স্নায়ুকেন্দ্রের ধ্বংস হওয়ার জন্যে (organic psychosis) নয়, সেখানে রোগের মূল কারণ মানসিক (psychogenic)। এইসব গুরুতর বৈকল্যের পেছনে জন্মগত (constitutional) এবং বংশগত (hereditary) কারণ অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। কারো কারো মতে সমস্ত বাতুলতার মূলেই আছে কেন্দ্রীয় মস্তিষ্কের স্নায়ু-পদার্থের গুরুতর বিকৃতি বা ধ্বংস। অবশ্য বর্তমানে মস্তিষ্কের স্নায়ুপদার্থের

Traumatic psychoses
Psychoses with cerebral arteriosclerosis
Psychoses with other disturbances of circulation
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy)
Senile psychoses
Involutional psychoses
Psychoses due to (other) metabolic diseases
Psychoses due to new growth
Psychoses associated with organic changes of the nervous system
Psychoneuroses
Manic depressive psychoses
Dementia praecox (schizophrenia)
Paranoia with paranoid conditions
Psychoses with psychoyathic personality
Psychoses with mental deficiency
Undiagnosed psychoses without psychoses, including epilepsy, alcoholism, drug addiction and mental deficiency
Primary behaviour disorders.

পরীক্ষার যত উপায় জানা আছে, তাতে সর্বক্ষেত্রেই মস্তিষ্ক-স্নায়ুকেন্দ্রে কোন ক্ষত (lesion) আবিষ্কার করা যায় নি, কিন্তু বহুক্ষেত্রেই রোগীর মধ্যে স্নায়বিক অস্থিরতা এবং বিকার-প্রবণতা লক্ষণীয়। কিন্তু এগুলিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গীতে নিশ্চিত কারণ বলে নির্দেশ করা কঠিন। তবে একথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে সুস্থ সাধারণ মানুষ ব্যক্তিগত বা সামাজিক অশান্তি ও অব্যবস্থায় বিচলিত হলেও বাতুলদের মতো ব্যক্তিত্বের ঐক্য হারিয়ে ফেলে না। এবং শেষোক্ত ব্যক্তিরা অত্যন্ত সামান্য অপ্রীতিকর অবস্থায়ই অব্যবস্থিত হয়ে পড়ে।[৩] এর থেকে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে এই কারণ ব্যক্তির জন্মগত গঠনের মধ্যেই আছে।

কতকগুলি প্রান্তবর্তী অবস্থা

যদিও অনেক রোগের চিকিৎসকেরা বায়ুরোগ (psycho-neurosis) এবং বাতুলতার (psychosis) মধ্যে একটা গুণগত পার্থক্য স্বীকার করেছেন—তথাপি এই দুই-এর মধ্যে সীমারেখাটা নির্ধারণ করা শক্ত। এবং এই দুই শ্রেণীর মধ্যবর্তী—প্রান্তীয়—কতকগুলি মানসিক বিকৃতির (border-line condition) অবস্থা স্বীকার করতে হয়।[৪]

'সাইকোপ্যাথিক্ পারসোনালিটি' বলতে বোঝা যায় এমন সব ব্যক্তি যারা জন্মগতভাবে মানসিক স্থিরতা বিষয়ে হীনতা-সম্পন্ন (constitutional psychopathic personality)। এদের অনুভূতির জীবনে অস্থিরতা লক্ষণীয়। এরা যে বুদ্ধি বা নিপুণতায় হীন তা নয়, কিন্তু এদের সমস্ত ভালবাসা, আগ্রহ নিতান্তই নিকট ও বর্তমানকে কেন্দ্র করে। ভবিষ্যতের সম্পর্কে এদের অদ্ভুত অনাগ্রহ। সুস্থ সাধারণ মানুষ ভবিষ্যৎ কোন উদ্দেশ্যপ্রাপ্তির সঙ্গে বর্তমানের উপায় ও আয়োজনকে যুক্ত করে জীবনের মধ্যে একটা ঐক্য-

৩ Sherman—Basic Problems of Behaviour, pp. 388-394

৪ ...there is a continuum in terms of symptomatology, perhaps on the basis of specific psychogenic influences, between the normally well-adjusted person and the unadjusted psychoneurosis. The dichotomy begins at this point, that is the *psychoses represent a different type of conditions*, a disease entity whose symptoms logically and etiologically is only indirectly related to normal and neurotic conditions. Sherman—Problems of Behaviour, p. 388

স্থাপন করে। কিন্তু এ জাতীয় ব্যক্তিদের কাছে বর্তমানই সমস্ত আগ্রহ-উদ্যমের কেন্দ্র। অতীত ও ভবিষ্যৎকে সে নিজ বর্তমান আগ্রহ ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত করে না। সে হিসাবে তার মনের গড়নটা পশু বা শিশুর মতো—যারা শুধু বর্তমান নিয়েই সন্তুষ্ট।[৫]

তাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর আর একটা লক্ষণ হচ্ছে তাদের বিভিন্ন অনুভূতির মধ্যে কোন সংযোগ বা সামঞ্জস্য থাকে না—একটা বিশেষ মুহূর্তের একটি অনুভূতি বা আকাঙ্ক্ষা দ্বারাই ব্যক্তি যেন কতকটা অন্ধভাবে চালিত হয়। এতে বোঝা যায় তাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে ঐক্যসাধনের শক্তির ন্যূনতা আছে। তার ব্যবহারের মধ্যে যেন একটা দায়িত্বজ্ঞানশূন্য হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় চলবার প্রবণতা আছে।[৬]

এ জাতীয় ব্যক্তিরা তাদের বাইরের পরিবেশের সঙ্গে একটি নিবিড় অনুভূতির তাদাত্ম্য-বন্ধনে হতে যুক্ত পারে না। বুদ্ধি দিয়ে নিজেদের সামাজিক কর্তব্য ও দায়িত্ব তারা বোঝে সত্য, কিন্তু তাতে তাদের হৃদয়ের আত্মীয়তা-বন্ধনের নিবিড় উত্তাপের অভাব। এরা নিজ একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষার সীমিত গণ্ডীর মধ্যে স্বেচ্ছাবন্দী।[৭] বিনা কারণে মিথ্যা কথা বলবার

৫ If the writer were asked to mention the most outstanding feature of the psychopathic personality he would unhesitatingly say a *pathologically inadequate devotion to future objectives*. Like the near-sighted individual the psychopath's horizon is foreshortened...the individual lives in a world of im mediate and momentary interests. There is no integration of or connection between his interests of today and those of tomorrow. Fisher—An Introduction of Abnormal Psychology, p. 263

৬ This results in or is expressed as an irresponsible impulsiveness. This is his emotional instability. And not only are his interests confined to immediate objectives but even within this limited realm of striving he is characterized by a pathologically narrow perspective. Usually one impulse, motive or interest is present at one time; and until the objective belonging to this motive in attained all other interests or considerations remain in abeyance. Fisher—An Introduction to Abnormal Psychology, p. 264

৭ The indi vidual of psychopathic personality is empathetically deficient. Empathy is a capacity for feeling oneself into a situation or circumstance. It appears to consist of an imaginative feeling process; it is really a spontaneous identification. Now the psychopath comes to know of social values and standards and perspectives but they never become true feeling entities with him; he acquires them intellectually. Ibid, p. 264

প্রবণতা নিয়ে যারা জন্মায়, তারা জানে যে তাদের এই স্বভাব দ্বারা সমাজে তারা উপহসিত, অথচ এর থেকে নিজেদের সংযত করতে তারা পারে না। এমন বিকৃতস্বভাব নারী আছে, যারা বহু পুরুষের সঙ্গে যৌনক্রিয়ায় রত হয়, কারণ এই ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ছাড়া তার ভালবাসার আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয় না। এরা নিজেদের শান্ত বিচার দিয়ে সংযত করতে পারে না এবং সমাজের বিচারের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করতে পারে না।[৮]

জন্মগত অনুভূতি বিষয়ে অসংযত ব্যক্তিত্বসম্পন্নদের শ্রেণীবিভাগ

এই জাতীয় অনুভূতি বিষয়ে হীন ব্যক্তিত্বসম্পন্নদের, বিবরণের দিক দিয়ে নানা দলে ভাগ করা গেলেও, এদের সকলেরই কতকগুলি বিষয়ে মিল লক্ষ্য করা যায়: (১) বর্তমান মুহূর্তের আগ্রহের দ্বারাই এরা সম্পূর্ণভাবে চালিত; (২) এরা ঝোঁকের মাথায় কাজ করে এবং এদের মধ্যে ধৈর্যের অভাব; (৩) এদের বিচার-বুদ্ধি অস্বচ্ছ, বর্তমান মুহূর্তের অনুভূতি এদের শান্ত যুক্তি-বিচারের ক্ষমতাকে আচ্ছন্ন করেছে; (৪) এরা অস্থির ও চঞ্চল; (৪) তীব্র ও অসংযত অনুভূতি-পরায়ণ ও (৬) মুহূর্তের ক্ষণস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল উৎসাহের ঝোঁকে এরা চলতে অভ্যস্ত। অনুভূতির ক্ষেত্রে এরা অ-নির্ভরযোগ্য, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই বুদ্ধির দিক থেকে এরা সাধারণের চেয়ে উৎকৃষ্ট।

নিম্নলিখিত ভাবে এদের শ্রেণীবিভক্ত করা হয়েছে:

প্যারানয়েড্ পার্সোনালিটি

এরা সন্দিগ্ধ-প্রকৃতি, জেদী, অপরের সম্পর্কে সহানুভূতিহীন, গোপনস্বভাব, তর্কপ্রিয় এবং আত্মকেন্দ্রিক। এর পরে বাতুলতা (psychoses) আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা প্যারানয়েড্ সিজোফ্রেনিয়ার বিবরণ দেব। ব্যক্তিত্বের দিক দিয়ে এই দুই দলেরই এক ধরনের গঠন দেখা যায়। তবে সিজোফ্রেনিয়ার রোগীদের মধ্যে সতত ভ্রান্তির (delusion) যে লক্ষণ

৮ Thus the young woman psychopath may know enough of the disfavour with which others regard sexual promiscuity but she is incapable of achieving any feeling identity of herself with the social attitude. Ibid, p. 264

দেখা যায়, এদের মধ্যে সেটা নেই। সে লক্ষণ দ্বারাই বোঝা যায় প্যারানয়েড্ সিজোফ্রেনিয়া অনেক বেশী গুরুতর।

এক্সাইটেবল্ পার্সোনালিটি

এরা অতি সহজে উত্তেজিত। এদের রাগ, বিদ্বেষ, ঈর্ষা ও সন্দেহের প্রকাশ অপরিমিত। এদের মধ্যে আত্মসংযমের নিতান্ত অভাব। বিপরীত লিঙ্গ ব্যক্তিদের সঙ্গে এদের সম্বন্ধ বিঘ্ন-সংকুল ও অশান্ত।

প্যাথোলজিক্যাল্ লায়ারস্

এরা কারণে-অকারণে মিছে কথা বলে। সাধারণ মানুষ ভয়ে বা কোন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে মিছে কথা বলে। কিন্তু এই বিকৃত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষেরা মিছেই মিথ্যা কথা বলে। এদের মনের গড়নই এমন বিকৃত যে মিথ্যা কথা না বলেই এরা পারে না (the psychopath's lying is compulsive and pathological)। কিছুদিন পরে তার অভ্যাস এমনই বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, সে সত্য-মিথ্যার পার্থক্যও যেন আর করতে পারে না।

অ্যান্টিসোশ্যাল্ পার্সোনালিটি

এমন বিকৃত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষেরা অপরের সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে বিবেচনাশূন্য, দায়িত্বজ্ঞানহীন, প্রবঞ্চনা-পরায়ণ, অসামাজিক এবং অনেক ক্ষেত্রেই নিষ্ঠুরপ্রকৃতি। চুরি ডাকাতি রাহাজানী গুণ্ডাবাজী অর্থাৎ সমস্ত প্রকার সমাজবিরুদ্ধ কাজে এদের আনন্দ। এ জাতীয় ব্যক্তিদের নীতিবোধই যেন বিধ্বস্ত। পূর্বে এ জাতীয় ব্যক্তিদেরই নৈতিক দিক থেকে সম্পূর্ণ নির্বোধ (moral imbeciles) বলা হত। মনের এ জাতীয় বিকৃত গঠন সাধারণত জন্মগত ও বংশগত বলে বিবেচনা করা হয়। তবে জন্মগতভাবে সম্পূর্ণ নীতিজ্ঞান-বিবর্জিত ব্যক্তি বাস্তবিকই আছে কিনা, এ বিষয়ে আধুনিক মনোবিদদের অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

নোমাডিক্ পার্সোনালিটি

এরা জন্মগতভাবে অস্থিরচিত্ত ও অশান্ত। কোন এক স্থানেই বেশীদিন থাকতে এরা অস্বস্তি বোধ করে। সংসারের যে নানা স্নেহ-সহানুভূতি-কর্তব্যের

বন্ধন সাধারণ মানুষকে গৃহ ও সমাজের সঙ্গে যুক্ত করে রাখে, এদের মধ্যে সেই আকর্ষণগুলির নিতান্ত অভাব দেখা যায়। এরা সংসার-বিরক্ত ভবঘুরে। এ সম্বন্ধেও অনেক মনোবিদের মত, এ অস্থিরতা জন্মগত নয়।

সেক্সুয়াল্ সাইকোপ্যাথস্

এদের রুচি ও মনের গঠন জন্মগতভাবেই এমন বিকৃত যে, যৌনক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ভিন্ন এরা অন্য কোনভাবে জীবনের আনন্দ ও মূল্যবোধ করতে অসমর্থ। এদের কাছে যৌনক্রিয়াই একমাত্র শক্তি ও জয়ের প্রতীক। এই বিকৃত মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা ধর্ষণ পশ্বাচার ইত্যাদি নানাপ্রকার নিষ্ঠুর ও অস্বাভাবিক যৌনক্রিয়ার প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করে। এরা সমাজের দৃষ্টিতে বিষম বিপদ।

ওপরের যে শ্রেণীবিভাগ করা হল তা নিতান্তই বিবরণাত্মক। এই দলগুলি পরস্পর থেকে পৃথক নয়, বরঞ্চ এই জাতীয় বিকৃত ও হীন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষদের ওপরে উল্লিখিত একাধিক লক্ষণ একসঙ্গে থাকে। নিতান্ত আলোচনার সুবিধার জন্যই এই শ্রেণীবিভাগ। এ দলের মধ্য থেকেই উদ্ভূত হয় অধিকাংশ অপরাধী, দাগী চোর, বদমায়েস্, লম্পট, প্রবঞ্চক ও ভবঘুরে।[১]

হীনতাগ্রস্ত ব্যক্তিত্বের কারণ

অধিকাংশ ব্রিটিশ ও অ্যামেরিকান্ শিক্ষাবিদের মত এই যে হীনতাগ্রস্ত বা বিকৃত ব্যক্তিত্বের মূল জন্মগত অনুভূতি বিষয়ে সংকীর্ণতা (constitutional deficiency in the affective capacities)। কিন্তু বর্তমানে অনেক মনোবিদ্ এর পরিবেশগত কারণকেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। এ প্রকার হীনব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষেরা আট-দশ বছর বয়সের সময়েই অনুভূতি বিষয়ে তীব্র অথচ অসম্পূর্ণ ও অনির্দিষ্ট তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে পিতা বা মাতার সঙ্গে যুক্ত হয়। তাদাত্ম্য-সম্বন্ধটা যে ঠিক পিতা-মাতার সঙ্গে তা নয়, বরঞ্চ তাঁদের পরিবারে

১ Fisher An Introduction to Abnormal Psychology, pp: 264-266
তিনি তাঁর বইতে জর্জ নামে একটি ছাব্বিশ বৎসরের পুরুষের দৃষ্টান্ত এবং তার চেয়ে অদ্ভুত হ্যারিয়েট নামে ষোল-সতেরো বৎসরের একটি কলেজের মেয়ের বিবরণ দিয়েছেন। দুজনই বুদ্ধির দিক থেকে সাধারণের চেয়ে অনেক পরিমাণে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু অনুভূতি ও নীতিবুদ্ধির দিক থেকে আশ্চর্য রকমে হীন। pp. 266-68

স্থান সম্বন্ধে। অর্থাৎ কিশোর নিজেকে পিতার স্থলাভিষিক্ত বলে ভাবতে শেখে। কিন্তু এই অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করে দেয় না। বরঞ্চ তারা নিজেদের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলে এবং এরা অনুভূতির জীবনে আট-দশ বছরের অপরিণত অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারে না। তারা জোর করেই বাবার মতো বড় হয়ে উঠতে চায়। ফলে, সে এমন সব কৃত্রিম ব্যবহার, পাকামী, ভঙ্গী, আচরণের ঢং আয়ত্ত করতে চায়, যেটা তার বয়সের একেবারেই উপযুক্ত নয়। সে নিজেকে বড় বলে প্রমাণ করতে অতিমাত্রায় প্রয়াসী বলেই হয়তো যথেচ্ছ মিথ্যা কথা বলে। বড় হয়েও সে নিজের সমবয়স্কদের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে মিশতে পারে না। তার ব্যবহারের মধ্যে তাই অতিমাত্রায় চাঞ্চল্য, অস্থিরতা, অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করবার প্রবণতা দেখা যায়। তার জীবনের নিজস্ব কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য না থাকাতেই সে সুস্থভাবে গড়ে উঠতে পারে না। সে নিজের কল্পনায় সৃষ্ট জগতে বন্দী। সে সন্দিগ্ধ, সঙ্গীহীন, গৃহপরিবেশে অসুখী এবং সামাজিক শিক্ষাগ্রহণে অসমর্থ বলে, সমাজের নৈতিক আদর্শের সংযম যে স্বীকার করে না। সে জীবনে নিজের জন্যে একটি নির্দিষ্ট স্থান খুঁজে নিতে অক্ষম, কারণ তার অপরিণত অনুভূতি-জীবন ও অসংযত ব্যবহারের জন্যে সে সমাজ-জীবনের সঙ্গে অব্যবস্থিত।[১০]

১০ ...very frequently the psychopath is one who acquired a very strong but very vague and indefinite ego-identification fairly early in life. Most commonly the identification will be found with the parent of like sex. In other words the history of psychopathic men often reveal the significant fact that they "stepped into their father's shoes" at the age of nine or ten. But the identification is not with the parent strictly speaking; it is with the position of the parent. Now an identification of this sort at an early age rarely results in a specifiic orientation. Rather it conduces to disorientation to a vagueness of personal identity. And furthermore it effectually blocks emotional development. The individual tends to remain at the emotional level at which his identification occurred...He may easily turn to lying as a means of suddenly becoming an adult. And when he becomes an adult he is restless and uncertain because he lacks a definite orientation. He consequently tends to overdo his efforts to gain a sense of completeness and maturity from activities and exploits of a childish nature. He lies or swindles to a fanatic degree, or he dwells in a world of unrestrained phantasy or he grows sullen, hostile and unappoachable, or he wanders about from place to place in a vain search for his particular niche in life, for a feeling of rapport which he never achieves. Fisher—An Introduction to Abnormal Psychology, p. 270

মৃগী রোগ (Epilepsy)

মৃগী রোগের সঙ্গে আমরা সকলেই প্রায় পরিচিত। হঠাৎ মূর্ছা ও পতন, হাত-পায়ের খিঁচুনী, মুখ দিয়ে ফেনা ওঠা, দাঁতে দাঁত লেগে যাওয়া, কখনো বিকট চীৎকার, এসব মৃগী রোগের সুস্পষ্ট লক্ষণ। হঠাৎই এ রোগের আক্রমণ হয়, কাজেই পথে চলতে চলতে বা পুষ্করিণীতে স্নান করার কালে এই মূর্ছার আক্রমণ হলে তা বিষম বিপজ্জনক। এসব রোগীদের সম্বন্ধে তাই বিশেষ সাবধান হতে হয়। কোন কোন রোগীর মধ্যে মূর্ছার আক্রমণের পূর্বে বিষণ্ণতা, অস্থিরতা, হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় কিছু করবার প্রবণতা, বিরক্তি, খিটিমিটি ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়। এর কারণ সম্বন্ধে চিকিৎসকদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে। তবে সকলেই প্রায় মানেন যে, এটার মূল, ব্যক্তিত্বের গঠনেই কিছু জন্মগত বিকৃতি। শারকো (Charcot) লক্ষণের গুরুত্ব-অনুযায়ী মৃগী রোগকে দুটি দলে,—বড় ও ছোটতে (grand mal and petit mal)—ভাগ করেছিলেন। Epilepsy রোগের মূলগত অর্থ হচ্ছে 'ভর করা' (a seizure or laying hold of)। প্রাচীনেরা মনে করতেন কোন অশুভ শক্তি রোগীর দেহে এসে 'ভর' করে। কখনো কখনো এর সঙ্গে সাময়িক স্মৃতিলোপ, বাক্যের জড়তা, ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা হ্রাস (sense acuity), নানাপ্রকার বিভ্রম (hallucination), দীর্ঘকালব্যাপী স্বপ্নের ঘোর, চিন্তার ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা, অনুভূতির নানা প্রকার বিকার, আত্মকেন্দ্রিকতা, প্রবল বিরক্তি ও অসুস্থ যৌন-আকাঙ্ক্ষা, আত্মহত্যা বা অন্যকে গুরুতর আঘাত বা হত্যার ঝোঁক দেখা যায়।[১১]

সাধারণত বাল্যকালেই এ রোগের প্রাবল্য দেখা যায়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এ রোগীর সংখ্যা কমে যায়।[১২] এ রোগীদের বুদ্ধি ক্রমশই হ্রাস পায়। এবং সাধারণত এরা স্বল্পায়ু হয়।

মৃগীরোগের কারণ

এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ বর্তমান। জন্মগত কারণ যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই

১১ Neyes—Textbook of Psychiatry, p. 152

১২ Spraling found that 38·5% occurred before the age of ten, 43% between the ages of ten and twenty and 9% between the ages of twenty and twentynine. According to Gower, 76% of epileptics develop symptoms before the age of twenty.

বিদ্যমান, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সে কারণটি প্রকৃত পক্ষে কি, তা এখনও নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নি। সম্ভবত মস্তিষ্কের স্নায়ু-কেন্দ্রে বিশৃঙ্খল সংযোগ বা রুগ্ণতা একটি প্রধান কারণ। রোজানফ্ এ বিষয়ে বহু অনুসন্ধান করেছেন। তিনি ১০৭ জোড়া যমজ সন্তানদের পরীক্ষা করেন। এই জোড়ার অন্তত একটি মৃগীরোগগ্রস্ত। তিনি দেখেছেন, এসব ক্ষেত্রে অন্য সন্তানটিতেও বহু ক্ষেত্রেই মানসিক গোলযোগ লক্ষণীয়। তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে মৃগীরোগের পশ্চাতে অবশ্যই জন্মগত ও বংশগত কারণ থাকে, কিন্তু তিনি জন্মকালে শিশুর মস্তকে আঘাতকে (birth traumata) অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।[১৩]

কিন্তু ফ্রএড্‌পন্থীরা এর মানসিক কারণের ওপরই অধিকতর গুরুত্ব স্থাপন করেন। তাঁদের মতে হিষ্টিরিয়ার মতো মৃগীও অপ্রীতিকর অবস্থায় দায়িত্ব এড়াবার এক প্রকার পলায়নী কৌশল (an escape mechanism)। বাস্তব জগতের অস্বস্তিকর অবস্থার সম্মুখীন হতে ব্যক্তি অপারগ ও অনিচ্ছুক এবং চেতনার বিলুপ্তি ও অন্যান্য নাটকীয় রোগ-লক্ষণ দ্বারা ব্যক্তি দায়িত্ব এড়াবার উপযুক্ত অজুহাত সৃষ্টি করে এবং নিজের প্রতি অন্যের দৃষ্টি মনোযোগ ও সহানুভূতি আকর্ষণে সমর্থ হয়। এ জাতীয় ব্যক্তিরা অশান্তিকর অবস্থায় ধাক্কা সহ্য করতে প্রায় অক্ষম, কাজেই মানসিক কারণও কিছুটা এ রোগের জন্যে দায়ী।[১৪]

বাতুলতার প্রধান শ্রেণীবিভাগ

বাতুলতা (psychosis) হচ্ছে সর্বাপেক্ষা গুরুতর মানসিক বিকৃতি। সাধারণ মানুষ এদের বলে উন্মাদ বা পাগল (insane)। বাতুলতার প্রধান দুটি ভাগ হচ্ছে, অর্গানিক্ সাইকোসিস্ ও ফাংশনাল্ সাইকোসিস্।

১৩ He (Rosanoff) points out that identicalness of manifestation even in monozygotic is the exception rather than the rule. He favours birth traumata as the most essential factor, believing that it is not so much the severity or extent of the injury as it is the localization and the nature of the resulting inflammatory condition. Rosanoff and Rosanoff—Etiology of Epilepsy, Arch. of Neurol. and Psychial, Vol. 31, 1934, pp. 1165-93

১৪ On the other hand other authorities regard epilepsy as primarily of psychogenic origin and see in the compulsions an escape mechanism; the patient withdraws from a reality to which he is incapable of adjusting. The fact that emotional disturbances are often sufficient to precipitate a seizure lends some support to such a view. Fisher—An Introduction to Abnormal Psychology, p. 275

অর্গানিক্ সাইকোসিসে মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্তু সিফিলিস্ জীবাণুর আক্রমণে বিধ্বস্ত অথবা অতিরিক্ত মদ্যপান বা অন্য কোন বিষক্রিয়ার ফলে পীড়িত হয় এবং তা ব্যক্তির ব্যবহারে গুরুতর বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবেই আত্মপ্রকাশ করে। ফাংশনাল্ সাইকোসিসেও ব্যক্তিত্বের বিষম বিপর্যয় লক্ষ্যণীয়, কিন্তু এই মানসিক বিকৃতির মূল প্রত্যক্ষভাবে মস্তিষ্কের স্নায়ুপদার্থের ধ্বংস বা রুগ্‌ণতার জন্যে নয়—তার কারণ মূলত মানসিক। ফাংশনাল্ সাইকোসিসেও অবশ্যই মস্তিষ্কের স্নায়ুপদার্থের অথবা দেহের অন্যান্য উপাদানে বিকৃতি থাকেই, এটা অনুমান করা যেতে পারে, কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেহ- ও স্নায়ু-সম্পর্কিত জ্ঞান অত্যন্ত অসম্পূর্ণ এবং স্নায়ুপদার্থের রুগ্‌ণতা বা ধ্বংস পরীক্ষা করবার জন্যে যে সব উপায় জানা আছে, তাতে ফাংশনাল্ সাইকোসিসের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে কোন ক্ষত বা রুগ্‌ণতা লক্ষ্য করা যায় না। আবার অর্গানিক্ সাইকোসিসের ক্ষেত্রেও রোগীর ক্রিয়া ও ব্যবহারে (function) অসঙ্গতি ও বিশৃঙ্খলা অবশ্যই দেখা দেবে। কাজেই এই প্রভেদটা খুব পাকাপাকি নয়। তার কারণ দেহ ও মনের সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ যে তাদের প্রভাব পৃথক করে দেখা অসম্ভব। তবে আলোচনার সুবিধার জন্যে এই ভাগটা করা হচ্ছে। তা ছাড়া কারণের দিক থেকে অর্গানিক সাইকোসিসে রোগের দৈহিক বা স্নায়বিক কারণের ওপরই আমরা জোর দিয়ে থাকি, আর ফাংশনাল্ সাইকোসিসে রোগের মানসিক কারণটাকেই বেশী স্পষ্ট করে তুলে ধরি। অর্গানিক সাইকোসিসের বেলায় কোন মানসিক প্রক্রিয়া দ্বারা (আবেশ, মনঃসমীক্ষণ ইত্যাদি) রোগের চিকিৎসা বা উপশম হতে পারে না। অস্ত্রোপচার (যদি কোন টিউমার বা অর্বুদের জন্যে স্নায়ুপদার্থ ধ্বংস হয়ে থাকে) বা বাহ্য ঔষধগ্রহণ দ্বারাই কেবলমাত্র কিছু উপকার হতে পারে। ফাংশনাল্ সাইকোসিসের চিকিৎসার বেলায়ও ঔষধপত্র (tranquilizers) ব্যবহারে উপকার হতে পারে, তবে মানসিক চিকিৎসার ওপরই বেশী নির্ভর করতে হয়।[১৫]

[১৫] There are no psychological methods which may be used either to delay the onset of these ailments or to effect any kind of cure in them. On the contrary, treatment must always be surgical or pharmacological. In some cases, for example brain tumours may be removed. Griffith—An Introduction to Applied Psychology, p. 301

অর্গানিক্ সাইকোসিস্‌কে সাধারণ ভাবে প্যারেসিস্ (paresis or dementia paralytica) বলা হয়। এ রোগের গোড়ার দিকে এ লক্ষণগুলি
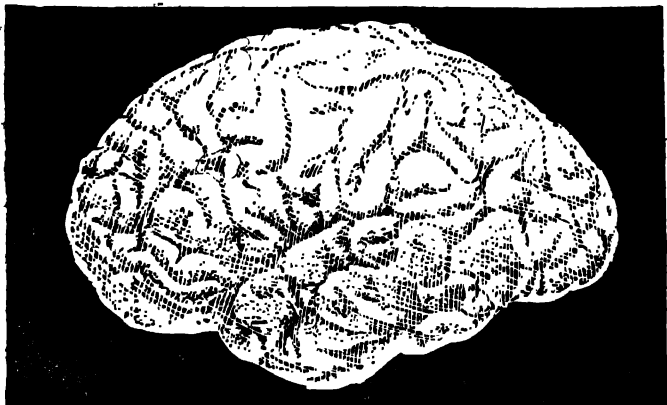
সুস্থ মস্তিষ্ক

রুগ্ণ মস্তিষ্ক (paresis)

দেখা যায়: কাপড়জামা বিষয়ে অপরিচ্ছন্নতা (slovenliness), মাথাধরা, ক্ষুধামান্দ্য, অস্বাভাবিক দুর্বলতা, অস্থিরতা, অল্পেতে বিরক্তিবোধ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কম্পন, স্মৃতিশক্তিহ্রাস, বুদ্ধিবিবেচনা দ্বারা সমস্যার সমাধানের ক্ষমতালোপ, নির্বুদ্ধিতা ইত্যাদি। ক্রমে ক্রমে সমস্ত মানসিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রেই বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং শক্তি হ্রাস হতে থাকে। ব্যক্তিত্বের প্রকাশক সমস্ত

গুণগুলিই ক্রমশ লোপ পেতে থাকে এবং অবশেষে রোগী প্রায় সম্পূর্ণ অকর্মণ্য বুদ্ধিবিবেচনা-শূন্য জড় পদার্থে পরিণত হয়।[১৬] সিফিলিস্ দ্বারা আক্রান্ত হলেই এ প্রকার সাংঘাতিক অবস্থা হয় না। প্রথম অবস্থায় পেনিসিলিন্ ইত্যাদি শক্তিশালী ঔষধ ব্যবহার করলে এ বিষ দেহ হতে সম্পূর্ণ নির্মূল করা সম্ভব হয়। কিন্তু প্রথম দিকে অসতর্ক হলে এবং উপযুক্ত চিকিৎসা না করালে এই ভয়ঙ্কর পরিণাম দাঁড়াতে পারে। এই জীবাণু অত্যন্ত ধীরে ধীরে ক্রিয়া করে এবং চিকিৎসায় এ রোগের বহির্লক্ষণগুলি দূরীভূত হলেও এই জীবাণুগুলি সম্পূর্ণ নির্মূল না হলে, ধীরে অবশেষে মস্তিষ্কের তন্তু আক্রমণ করে এবং তখন প্যারেসিস্-এর সংকটজনক অবস্থা দেখা দেয়। এমনও দেখা গেছে যে, সিফিলিস্ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার তেরো বছর পর মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্তু বিনষ্ট হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রথম দিকে চিকিৎসায় অবহেলা হয়েছে। পরে চিকিৎসার ফলে রোগের বাইরের লক্ষণগুলি দূর হলেও ভিতরে ভিতরে সর্বনাশা বিষক্রিয়া মস্তিষ্কের স্নায়ুপদার্থকে জীর্ণ করে ফেলে। এ সব রোগীর নানা ভ্রান্তির লক্ষণ (delusions) দেখা যায়। তারা মিথ্যা বড়াই করে এবং অকারণে সন্দেহ করে। মস্তিষ্ক আক্রান্ত হওয়ার পরও ম্যালেরিয়ার জীবাণু অনুপ্রবেশ করিয়ে এবং দীর্ঘকাল অ্যান্টিবায়োটিক্ দ্বারা চিকিৎসা করে কোন কোন ক্ষেত্রে উপকার পাওয়া গেছে। মস্তিষ্কের কোন কোন বোধকেন্দ্র ও ক্রিয়াকেন্দ্র বিনষ্ট হওয়ার ফলে তাদের কোন কোন বোধ ও ক্রিয়ার ক্ষেত্রে

১৬ Paresis is the general name given to a group of psychological symptoms created through gradual degeneration in the cortex of the brain, This degeneration is most frequently attributable to syphilitic infection. The symptoms...consist at first of slovenliness, headache, loss of appetite, a general feeling of fatigue, tendency towards nervous irritability, and increasing bodily tremor. As the deterioration of the cortex continues, the patient fatigues more and more readily, his memory becomes seriously impaired and he is unable to carry out the rational solutions of problems. Gradually, the symptoms spread to all the psychological functions and especially to personality traits. Towards the end of the disease the patient will lapse into a state of complete helplessness, this means that most of the psychological functions have become so impired that the patient is reduced to a vegetative level of living. Campbell—Nature of Dementia in Dementia Paralytica, Psych. Bull, 1916, 9 (No. 8), pp. 316-22

অবশতা বা অক্ষমতা দেখা দেয়। কিন্তু ধৈর্যের সঙ্গে উপযুক্ত শিক্ষাদ্বারা পরিবর্ত কোন কেন্দ্রকে সক্রিয় করে তুলে রোগীকে প্রায় নিরাময় করাও সম্ভব।[১৭]

সেনাইল্ প্যারেসিস্

বৃদ্ধ বয়সে দেহের সর্ব অঙ্গেরই ক্ষমতা হ্রাস পায়। সমস্ত ইন্দ্রিয় ও পেশী ক্ষীণ ও শিথিল হয়। তার কারণ মস্তিষ্কের স্নায়ুপদার্থ ক্রমশ বিধ্বস্ত ও রুগ্ণ হতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ স্মৃতি চিন্তা বিচার প্রভৃতি মানসিক শক্তিও হ্রাস পায়, এবং ভ্রান্তি (delusion), অমূল-প্রত্যক্ষ (hallucination), অকারণ ভয়, দুশ্চিন্তা ইত্যাদি বৈকল্যও প্রকট হতে থাকে। বুড়ো মানুষদের স্থান ও কালের জ্ঞানে বিশৃঙ্খলা (disorientation) দেখা যায়। অনেক সময় এদের জেদ বাড়ে ও মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। মস্তিষ্কের স্নায়ুপদার্থের ধ্বংস বা বিকৃতির সঙ্গে মানসিক নানা বিপর্যয়ের সম্বন্ধ কি ভাবে কাজ করে, তা এখনও জানা না গেলেও এ সম্বন্ধ যে অত্যন্ত নিবিড় এতে আর কোন সন্দেহ নেই। বৃদ্ধ বয়সের শারীরিক-স্নায়বিক-মানসিক শক্তিহ্রাস ও বিকার এবং তার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে নানা গবেষণা চলছে। কিন্তু এখনো এ বিষয়ে নিশ্চিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যথেষ্ট নয়।[১৮]

অ্যাল্কোহলিক্ সাইকোসিস্

অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলেও মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্র ধ্বংস বা বিকারগ্রস্ত হতে পারে। পূর্বের দুই প্রকার প্যারেসিসের অনুরূপ নানা শারীরিক-মানসিক বিকার এ ক্ষেত্রেও দেখা যায়। এই জাতীয় রোগীর মধ্যে জ্বরবিকারের অনুরূপ নানা দুঃস্বপ্ন ও অসংলগ্ন কথাবার্তার (delirium tremens) লক্ষণ বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট। প্যারানয়েড্ সিজোফ্রেনিয়ার (পরে আলোচিত হবে) কোন কোন লক্ষণও এদের মধ্যে দেখা যায়।[১৯]

ফাংশনাল্ সাইকোসিস্

এই সব গুরুতর মানসিক রোগে মস্তিষ্কের স্নায়ুপদার্থের ধ্বংস অথবা দেহের কোন অভ্যন্তরীণ প্রধান যন্ত্রের কোন বৈকল্য লক্ষ্য করা যায় না। এই মানসিক রোগগুলিকে মানসিক ক্রিয়ার গুরুতর বিশৃঙ্খলা (functional

১৭ Munn—Psychology. p. 189

১৮ Sherrington—Integrative Action of the Nervous System. also, Franz—Nervous & Mental Re-education, 1923

১৯ Miles—Age & Human Ability, Psychol. Rev., 1933, 40, 99-123. also Hall—Senescence: The Last Half of Life

psychosis) বলা হয়। সম্ভবত এগুলির সঙ্গে অনালী রসক্ষরা গ্রন্থির রসক্ষরণের ত্রুটির যোগ আছে।

ফাংশ্নাল্ সাইকোসিসের প্রধান দুটি দল হচ্ছে—ম্যানিক্-ডিপ্রেসিভ্ সাইকোসিস্ (manic-depressive psychosis) ও সিজোফ্রেনিয়া (পূর্বে এদের বলা হত ডিমেন্‌সিয়া প্রিকক্স্—dementia praecox—এর মানে হ'ল যৌবনকালের উন্মত্ততা)।

ম্যানিক্-ডিপ্রেসিভ্ সাইকোসিস্

এ ব্যক্তিরা কখনো অতিমাত্রায় উল্লসিত (manic), আবার কখনো বা অতিরিক্ত বিষণ্ণ (depressive)। এজন্য এই মানসিক রোগকে "প্রক্ষোভের চূড়ান্ত বৈপরীত্যের" উদাহরণ বলে প্রেসী (Pressey) বর্ণনা করেছেন। ব্যাগ্‌বি-ও (Bagby) তাই করেছেন।[২০] অনুভূতির সমর্থক চিন্তা, স্মৃতি, এমন কি বিভ্রমও (illusions) সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়। অর্থাৎ এ প্রকারের রোগী যখন উৎসাহিত অবস্থায় (manic state) থাকে, তখন তার বাক্য রূপকল্প ব্যবহার দৃষ্টিভঙ্গী চরম আশাবাদের রঙে রঞ্জিত। সে তখন রাস্তায় এক অপরিচিত ব্যক্তিকেও জড়িয়ে ধরে আনন্দে চীৎকার করতে থাকে, যে তার হারানো ছেলেকে খুঁজে পেয়েছে। সে তখন নিজ শক্তি সম্বন্ধে অতিমাত্রায় উৎফুল্ল, নব নব আবিষ্কারের আনন্দে সে পাগল—তার ধারণা তার আবিষ্কার পৃথিবীতে এক যুগান্তর আনয়ন করবে। এ সবই অবশ্য কল্পনা, বাস্তবের সঙ্গে এই ধারণার কোন মিল নেই। এ সময় অপরিমিত চীৎকার, কুৎসিত গালাগালি, যৌনবিষয়ক স্পষ্ট ইঙ্গিত প্রায়ই দেখা যায়।[২১] আবার তার পরেই আসে, বিপরীত বিষণ্ণতা ও বিষম নিষ্ক্রিয়তার অবস্থা (depressive state)। তখন হয়তো রোগী ঘণ্টার পর ঘণ্টা কারো সঙ্গে কথা বলে না, অশ্রুপাত করে, কল্পনা করে পাপের জন্যে তার নরকবাস হবে—সে অপরিচিত

২০ Manic depressive psychosis has been aptly characterisedby Pressey as the "psychosis of emotional extremes", the patient swings periodically back and forth between high joy and deep depression. Griffith—An Introduction to Applied Psychology, p. 311

২১ In the manic state the individual may be extremely happy, singing at the top of his voice, dancing round, working on inventions that will "shake the world to its foundations". He may also be so obstreperous that he must be kept under restraint of some kind. Delusions and hallucinations are often present. In both men and women, vile language, curses, sexuallusions and sexual displays are common. Munn—Psychology, p. 169

মানুষ দেখে ডাকাত বলে বিষম ভয় পায়।[২২] পূর্বে মনে করা হত, অতিরিক্ত উৎসাহ-আনন্দ (mania) এবং অতিরিক্ত বিষণ্ণতা (melancholia) উন্মত্ততার পৃথক দুটি রূপ। কিন্তু ক্রেপেলিন্ (Kraepelin) বহু পর্যবেক্ষণের পর নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করেছেন যে, এ দুটি পৃথক রোগ নয়—একই রোগের পর্যায়ক্রমে দুই অবস্থা। সাধারণত অতিরিক্ত আনন্দ-উৎসাহের অবস্থার পর বিষম নিরানন্দ বিষণ্ণতার অবস্থা দেখা গেলেও এ পর্যায়ক্রমতা নিয়মিত নয়। এক একটা অবস্থা কতক্ষণ স্থায়ী হবে তাও নির্দিষ্ট নয়, এবং উল্লাস ও বিষাদের মাত্রা সম্বন্ধেও ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে বহু প্রভেদ আছে।[২৩] বুদ্ধির দিক দিয়ে এ রোগীরা হীন নয়। এরা কেউ কেউ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে। ভাল হয়ে নিজেদের অতীত মানসিক দুরবস্থার অবস্থা তাঁদের মধ্যে দু'জন সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। এঁরা হলেন ক্লিফোর্ড বীয়ার্স ও জেন্ হিল্যের—তাঁদের বই দুখানার নাম যথাক্রমে—A Mind That Found Itself এবং Reluctantly Told।

রোগের মূল কারণ

প্রেসী দৃঢ়ভাবেই এই মত পোষণ করেন যে, এর মূল জন্মগত ও বংশগত। এক সমীক্ষার ফলে দেখা যায় যে এই রোগীদের শতকরা আশী জনের ক্ষেত্রেই রোগীদের পরিবারে অতি-নিকট আত্মীয়দের মধ্যেই অনেকের নানা প্রকার মানসিক বিকার আছে।[২৪] মেয়েদের মধ্যেই এই রোগের প্রাবল্য বেশী দেখা যায়, এবং সাধারণত চল্লিশ বছরের ঊর্ধ্বে ঋতুবন্ধ হওয়ার কালে (menopause) এ রোগ বেশী আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং অনুমান করা হয় যে, হর্মোন-ঘটিত গোলযোগের সঙ্গে এর যোগ আছে। এ রোগ জন্মগত ও বংশগত অধিকাংশ মনোবিদের এই মত হলেও, ফিশার এই মতের খুব বেশী মূল্য দেন না।[২৫]

---

২২ It frequently happens. that the melancholy periods of manic-depressive insanity are associated with some sense of deep guilt. A patient may assume, for example, that he has committed an unpardonable sin or that he has been solely responsible for some major disaster. Beers—A Mind That Found Itself, 1908

২৩ The degree of excitement and of depression...varies greatly with different patients, and, likewise, there are actually but relatively few patients in whom states of depression alternate with states of excitement in a strictly regular manner. Fisher—An Introduction to Abnormal Psychology, p. 283

২৪ Pressey & Pressey—Mental Abnormality & Deficiency

২৫ Fisher—An Introduction to Abnormal Psychology, p. 296

চিকিৎসা

মনোবিকলন-প্রণালীর সঙ্গে সঙ্গে নানা হাতের কাজ, বাগানের কাজ দিয়ে (occupational therapy) কখনো কখনো উপকার পাওয়া যায়। গুরুতর ক্ষেত্রে মস্তিষ্কে তড়িতাঘাত (Electric shock therapy) -দ্বারা চিকিৎসায় সুফল পাওয়া যায়।

সিজোফ্রেনিয়া বা ডিমেন্‌সিয়া প্রিকক্স্

গুরুতর মানসিক রোগীদের প্রধান অংশ এই দলে পড়ে। এ রোগ বিশেষ করে যৌবনাগমেই বেশী দেখা যায়, কাজেই এই রোগকে যৌবনকালের উন্মত্ততা (dementia praecox) বলা হয়। এ রোগে ব্যক্তিত্বের বিষঙ্গ (dissociation of personality) এবং অন্যান্য মানসিক বিকার দেখা যায়, কিন্তু সর্বাপেক্ষা প্রধান লক্ষণ হচ্ছে অনুভূতি-বিষয়ে বিষম নিরুৎসাহতা। এ রোগীদের সমস্ত বিষয়ে রুচি বা আগ্রহ নষ্ট হয়ে যায় এবং চরম আলস্য ও কর্মহীনতা তাদের প্রায় জড় বস্তুতে পরিণত করে। এ রোগীরা সম্পূর্ণ নির্জনতা পছন্দ করে, কারো সঙ্গে সহজে কথা বলতে চায় না, কোন প্রশ্ন করলে তার জবাব দেয় না। ক্রমশ বুদ্ধির দিক দিয়েও এদের অবনতি ঘটে। আচরণ শিশুসুলভ ও অসহায় হয়ে পড়ে।

শ্রেণীবিভাগ

সাধারণত চার জাতীয় সিজোফ্রেনিয়ার প্রভেদ করা হয়, কিন্তু এই বিভিন্ন দলের লক্ষণগুলিকে বিচ্ছিন্ন করা প্রায় অসম্ভব। কাজেই শ্রেণীবিভাগটি নিতান্তই মোটামুটি বলে ধরতে হবে।

১। সাধারণ সিজোফ্রেনিয়া

এতে মানসিক স্থবিরতা দেখা যায়। এসব রোগীদের কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে না। মানুষের সঙ্গে মিশতে অনিচ্ছা, নিজেকে সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের মধ্যে লুকিয়ে থাকা (introverted), সমস্ত বিষয়ে নিরুৎসাহতা বা নিরাসক্তি এ বিকারের লক্ষণ। সাধারণত এরা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে না।

২। হেবিফ্রেনিক্ সিজোফ্রেনিয়া

এরা বোকার মতো হাসে, কাঁদে, কাপড়চোপড় খুলে ফেলে। এদের কাজগুলির মধ্যে সঙ্গতি ও বিবেচনার অভাব দেখা যায়। হাসপাতালে এ

জাতীয় এক রোগিণী পুরুষদের স্নানের ঘরে ঢুকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে নিজের পরিচ্ছদ কাচছিল। তাকে এ নিয়ে তিরস্কার করাতে সে এটাকে সম্পূর্ণ ঠাট্টা বলে মনে করল। যদি সংবাদ দেওয়া হয়, "তোমার মা মারা গেছে", তা হলে হয়তো সে হি হি করে হাসতে থাকবে।

৩। ক্যাটাটোনিক সিজোফ্রেনিয়া

এদের মধ্যে অদ্ভুত গতিহীনতা ও আড়ষ্টতা দেখা দেয়। এদের দেহ বা

ক্যাটাটোনিক সিজোফ্রেনিয়া
[Munn-এর Psychology অনুসরণে—Courtesy St. Elizabeth's Hospital]

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন মোম নিয়ে তৈরী (waxy inflexbility)। একভাবে বসে আছে তো বসেই আছে, হাতখানা একভাবে বাঁকিয়ে দিলে সে ভাবেই থাকবে

ঘণ্টার পর ঘণ্টা। হয়তো কথাই বলে না বহু বছর ধরে। এদের সমস্ত ব্যবহারই নেতিবাচক (negativism)। হয়তো নিজের সঙ্গে বিড় বিড় করে কথা বলে, বা একটুখানি হাসে। বাইরের জগৎ এদের কাছে প্রায় সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ত, নিজের মধ্যে এরা সম্পূর্ণভাবে নিরুদ্ধ হয়ে থাকে (shut-in, encapsulated, insulated)। বয়সেন নামে এজাতীয় একজন রোগী সুস্থ হয়ে নিজের মানসিক বিকারের অবস্থা ও তার ব্যাখ্যা নিয়ে Exploration Of The Inner World নামে সুন্দর বই লেখেন।

৪। **প্যারানয়েড সিজোফ্রেনিয়া**

এরা সব চেয়ে বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করছে মনোবিজ্ঞানীদের। **এরা নিজেদের সৃষ্ট ভ্রান্তির** (delusion) **জগতে বাস করে।** কেউ ভাবছে, সে লক্ষ টাকার মালিক (delusions of grandeur), কেউ ভাবছে তাকে সবাই বিষ দিতে চেষ্টা করছে (delusions of persecution), কেউ ভাবছে সবাই তার কথাই বলাবলি করছে (delusions of reference), কেউ ভাবছে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রবার দিয়ে তৈরী, কেউ ভাবছে দেহে তাদের রক্ত নেই। এ ভ্রান্তিগুলির মধ্যে অন্যে অপকার করতে চেষ্টা করছে, এটাই বেশী দেখা যায়। আমি বড়, আমি শ্রেষ্ঠ এই ভ্রান্তি পূর্বোক্ত ভ্রান্তিরই পরিপোষক।[২৬] রোগী নিজের মনের মধ্যে কাল্পনিক যুক্তি দিয়ে নিজেকে বোঝায় আমি বড়, আমার অনেক টাকা আছে, তাই সকলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। সাধারণ মানুষের জীবনে র‍্যাশন্যালইজেশন্ ও প্রজেকশন, অহং-এর আত্মরক্ষার উপায়—মানসিক অসুস্থদের অনুরূপ কৌশল হল ভ্রান্তি।[২৭] তাদের ভ্রান্তির বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়ে হয়তো তারা স্বাভাবিক মানুষের মতোই ব্যবহার করে। এদের ইনসুলিন, মেট্রাজোল্, ইলেকট্রিক শক-থেরাপী দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। অনেক সময় সারেও। কখনো কখনো গুরুমস্তিষ্কের সামনের অংশের রুগ্ণ স্নায়ুতন্তু অস্ত্রোপচার-দ্বারা কেটে বাদ দিয়ে (psychosurgery) অথবা সে অংশের সঙ্গে মস্তিষ্কের অন্যান্য স্নায়ুতন্তুর যোগসূত্র ছিন্ন করে আশ্চর্য সুফল পাওয়া গেছে। কিন্তু এ চিকিৎসা অত্যন্ত কঠিন।

কোন কোন মনোবিদ্ প্যারানোইয়া (paranoia) এবং ভ্রান্তিপ্রবণতা (paranoid condition) থেকে সিজোফ্রেনিয়াকে প্রভেদ করেছেন এবং

২৬ Fisher—An Introduction to Abnormal Psychology, p. 298

২৭ Boring, Langfeld, Weld—Foundations of Psychology, p. 584

ভ্রান্তির বিষয় অনুসারে এই রোগীদের পারসিকিউটেড্ প্যারানোইয়া, এক্জল্টেড প্যারানোইয়া, রিলিজিয়াস্ প্যারানোইয়া, অ্যামোরাস প্যারানোইয়া, জীলাস্

মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের পূর্বে অস্ত্রোপচারের পরে

[Freeman & Watts—Psychology: Springfield: Thomas-অনুসরণে]

প্যারানোইয়া ও হাইপোকন্ড্রিয়াক্যাল্ প্যারানোইয়া এই কয় দলে ভাগ করেছেন। স্টডার্ট (Stoddart) এ বিভিন্ন দলের ভ্রান্তির নিম্নলিখিত ফ্রএডীয় ব্যাখ্যা দিয়েছেন—রোগীটি এখানে পুরুষ বলে কল্পিত হয়েছে :

(a) *Persecuted paranoia*—"I love the man"—an intolerable idea, therefore becoming repressed and replaced in consciousness by "I do not love him; I hate him". This by projection becomes "He hates me", "I am persecuted by him".

(b) *Exalted paranoia*—"I love him"—again an intolerable idea, therefore, "I do not love him, I love myself". This by projection becomes "Everybody loves us", "I am a great person".

(c) *Religious paranoia*—"I love him" being intolerable, becomes "I love Him" (sport with a capital H) meaning "I love God", this by projection becomes "God loves me", "I am the chosen one of God".

(d) *Amorous paranoia*—the intolerable "I love him" becomes "I do not love *him*, I love *her*", this by projection becomes, "She loves me".

(e) *Jealous paronoia*—"I love him" as usual, is replaced by "I do not love him, She loves him".

(f) *Hypochondriacal paranoia* is somewhat like exalted paranoia, "I love myself" being replaced by "I must take care of myself". Stoddart—**Mind and Its Disorders, pp. 312-13**

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

ফ্রএড, প্রসঙ্গে

চুল বাঁধবার যেমন, শাড়ী-ব্লাউজেরও তেমনি এক একটি 'ফ্যাসান' এক-এক সময় চালু হয়। তখন সব মেয়েরই সেই 'ফ্যাসানে' চুল বাঁধা চাই, আর সাধ্য হলে তেমনি শাড়ী-ব্লাউজ সংগ্রহ করাও চাই। তা না হলে 'গেঁয়ো বাঙাল' বলে গাল খেতে হবে। 'ফ্যাসান' মানেই হচ্ছে নতুনের হুজুগ। তা দু'দিনেই পুরনো হয়ে যায়। আজ 'কাঞ্জীভরম্' শাড়ী জোর গরম ফ্যাসান—এটা নিশ্চিত করেই বলা যায়, আগামী পুজোর বাজারে 'কাঞ্জীভরম' অচল হয়ে যাবে।

চিন্তার জগতেও তেমনি এক একটি 'ফ্যাসান' আসে। সবজান্তা সাংবাদিকদের কল্যাণে তখন সে ফ্যাশান দেশব্যাপী চালু হয়ে যায়—সবাই তা নিয়ে কথা বলে, তর্ক করে, বিশেষজ্ঞের মতো মন্তব্য করে এ কথা জানাতে চায় যে, সে 'আপ-টু-ডেট্'—সে পেছিয়ে নেই। জানে যে যত কম, জাহির করে সে নিজেকে তত বেশী। এখন স্পুট্নিক আর রকেট নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হচ্ছে, আলোচনা চলছে—তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শোরগোলটা যত বেশী, সার পদার্থ ততটা বড় থাকে না। আমাদের একটা ভাসা-ভাসা ধারণা জন্মেছে—তাকে মূলধন করেই আমরা বাজার গরম করছি। জ্ঞানের প্রসার ডিমোক্র্যাটিক যুগে নিতান্তই বাঞ্ছনীয়; তবে অনেক সময় তার বিপদ হচ্ছে—এ রকম 'পপুলার' জ্ঞানের প্রসার বিষয়ের গভীর জ্ঞানের পথে বাধা।

ফ্রএড্ সম্পর্কে আমাদের চিন্তা (না কোলাহল?) সম্বন্ধে এ কথা বেশী সত্য। বিগত মহাযুদ্ধের পর থেকে ফ্রএড-এর চিন্তা জগতে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করে। মানুষের মূল প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা প্রচলিত মনস্তত্ত্বকে এমন বিষম নাড়া দেয় এবং তাঁর চিন্তার তাৎপর্য এতই সুদূরপ্রসারী যে, স্বভাবতই তা বিরোধ ও বিতর্কের সৃষ্টি করে। আবার তাঁর মতবাদ এমন অভিনব এবং বৈপ্লবিক ছিল বলেই একদল তরুণ ও উৎসাহী সমর্থকও জুটে যায়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দুই পক্ষই অন্ধ আবেগ দ্বারাই চালিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ফ্রএড-এর মতবাদের গভীরে প্রবেশ করেন নি—তাঁর চিন্তার

প্রকৃত তাৎপর্য-অনুধাবন করতে পারেন নি। তা'ছাড়া সত্যনিষ্ঠ এই জ্ঞান-তপস্বীর চিন্তা একটি অনড়, অচল কাঠামোর মধ্যে বন্দী হয়ে থাকে নি। তিনি খাঁটি বিজ্ঞানী, তাই সারা জীবন ভরে কেবলই পর্যবেক্ষণ করেছেন, পরীক্ষা-বিশ্লেষণ করেছেন, সূত্রানুসন্ধান করেছেন; আবার সিদ্ধান্তকে নতুন করে যাচাই করেছেন—নতুনতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা দিয়ে। তার ফলে তাঁর পুরনো সিদ্ধান্তের আংশিক বা মৌলিক পরিবর্তনও কখনো কখনো ঘটেছে। তাতে তাঁর অনুবর্তীরা হয়তো বিস্মিত বা বিব্রত হয়েছেন, কিন্তু নিজের ভুল-স্বীকার বা -সংশোধন করতে কখনো তিনি লজ্জিত হন নি। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর শ্রমশীলতা ও সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে ডারুইন্-এর তুলনা দেওয়া চলে। এই বৈজ্ঞানিক সত্যনিষ্ঠাও তাঁকে বোঝবার পথে কতকটা অন্তরায়। দীর্ঘ আয়ু তিনি পেয়েছিলেন (১৮৫৬-১৯৩৯) এবং যৌবনের প্রারম্ভ থেকে মৃত্যুর শেষদিন পর্যন্ত তিনি তাঁর সদাজাগ্রত সতেজ মন নিয়ে একাগ্রভাবে বিজ্ঞানের সাধনায় রত ছিলেন। সাংসারিক ঝড়-ঝঞ্ঝা, রাজনৈতিক প্রতিকূলতা, সামাজিক নিন্দা, সহকর্মীদের বিরুদ্ধতা, কিছুই তাঁকে তাঁর সাধনার ক্ষেত্র থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। তাঁর এ সাধনার ইতিহাস ছাত্রসমাজের কাছে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রচারিত হওয়া একান্ত কর্তব্য। তাঁর মতামত আমরা গ্রহণ করি বা না-ই করি, তাঁর একাগ্রতা সত্যনিষ্ঠা বিচারবুদ্ধি শ্রমশীলতা চিন্তার সততা স্বতই আমাদের শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। কোন সিদ্ধান্তে পৌছতে তিনি শুদ্ধ যুক্তি-বুদ্ধি-বিচারের ওপরই নির্ভর করেছেন, আবেগের দ্বারা চালিত হন নি। তিনি ছিলেন বিজ্ঞানের নির্মম সাধক।

জিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েড্ জন্মেছিলেন (১৮৫৬) অষ্ট্রিয়ার অন্তর্গত মোরাভিয়ার ফ্রাইবার্গ-এ। আর তাঁর মৃত্যু ইংল্যাণ্ডে (১৯৩৯)। নাৎসীরা যখন অষ্ট্রিয়া দখল করে নেয় তখন তাঁদের ইহুদীবিদ্বেষের নিষ্ঠুর দৃষ্টান্ত দেখে তিনি ১৯৩৭ সালে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে আশ্রয় নেন। সেখানেই দু'বছর পরে তিনি মারা যান। কিন্তু জীবনের অধিকাংশ তিনি কাটিয়েছেন ভিয়েনায়, ভিয়েনাই তাঁর কর্মজীবনের পীঠস্থান।

ফ্রএড-এর দীর্ঘ জীবনকাল বিজ্ঞানের অগ্রগতির স্বর্ণযুগ। তিনি এবং আরো বহু প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী এই যুগের মানসক্ষেত্রকে উর্বরা করেছেন এবং এই যুগের চিন্তার গতি তাঁদের মনকেও প্রভূতভাবে প্রভাবিত ও উদ্বুদ্ধ করেছিল,

সন্দেহ নেই। ১৮৫৯ সালে ফ্রএড-এর বয়স যখন মাত্র ৩ বছর, তখন ডারুইন-এর যুগান্তকারী পুস্তক 'Origin of the Species' প্রকাশিত হয়। ডারুইন-এর পূর্বে এই ধারণাই প্রচলিত ছিল যে, মানুষ অন্যান্য প্রাণীর থেকে পৃথক,—তার আত্মা আছে, অন্যান্য প্রাণীদের তা নেই। কাজেই মানুষের একটি বিশেষ মর্যাদা আছে। কিন্তু ডারুইন প্রমাণ করলেন, মানুষের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীর মূলত কোন প্রভেদ নেই, ক্রমবিকাশের ধারায় এক-কোষবিশিষ্ট অ্যামিবা থেকে জটিল থেকে জটিলতর দেহযন্ত্রসম্পন্ন প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে, মানুষ এই ক্রমোন্নতির ধারার শেষ ফল ও জটিলতম পরিণতি। সুতরাং মানুষ প্রকৃতিরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং বলা যায়, ডারুইন-এর পর থেকেই মানুষ প্রকৃত বৈজ্ঞানিক আলোচনার বিষয়ীভূত হল।

১৮৬০ সালে গুস্টাভ্ ফেক্নার সংবেদন ইত্যাদি চেতনক্রিয়া পরিমাপের উপায় উদ্ভাবন করে এ কথা প্রমাণ করলেন, মানুষের মন কোন ভৌতিক বা অপ্রাকৃত পদার্থ নয়। অর্থাৎ অন্যান্য বিজ্ঞানের মতো মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রেও পরিমাণগত মাপনের পদ্ধতি প্রচলিত হল। আধুনিক মনোবিদ্যার গোড়াপত্তন হল।

এই দুই বৈজ্ঞানিকের চিন্তা তরুণ ফ্রএড-এর চিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল। এ সময় থেকে ইউরোপের শিক্ষিত সমাজ প্রাণীবিদ্যা ও মনোবিদ্যার দিকে অধিকতর পরিমাণে আকৃষ্ট হতে থাকে। লুই পাস্তুর, রবার্ট কক্ ও লিস্টার-এর গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার চিকিৎসাক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করে। এঁরা প্রমাণ করলেন, অধিকাংশ ব্যাধির মূলেই আছে জীবন্ত জীবাণুর আক্রমণ। তাদের খালি চোখে দেখা না গেলেও লিউয়েন্হোয়েক্-এর আবিষ্কৃত অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহই রইল না। জীবাণুতত্ত্ব নামে এক নতুন বিজ্ঞানের সৃষ্টি হল। এ সময়েই এক পাদ্রী—গ্রীগর মেণ্ডেল —তাঁর বাগানে মটরদানা নিয়ে বহু পরীক্ষা করে বংশগতির (heredity) মূলসূত্র আবিষ্কার করলেন।

এ সব নতুন বিজ্ঞানই ফ্রএড-এর সজীব মনকে আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু সম্ভবত সবচেয়ে বেশী তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন পদার্থবিদ্যার অগ্রগমনে। হেলম্হোলৎস্ এ সময়ে শক্তির নিত্যতার তত্ত্ব (Theory of conservation of energy) প্রমাণ করেন। এ কথা প্রমাণিত হল যে শক্তি স্থান থেকে

স্থানান্তরে যেতে পারে, শক্তির রূপও পরিবর্তিত হতে পারে, কিন্তু সমগ্র বিশ্বে শক্তির পরিমাণের হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না। কাপের গরম-চায়ের উত্তাপটা কাপে এবং আশেপাশে বাতাসে ছড়িয়ে যায়, কিন্তু সে উত্তাপশক্তিটা সম্পূর্ণ হারিয়ে যায় না।

এই যে জগৎব্যাপী শক্তির লীলা ও গতি এবং সর্বত্র নির্দিষ্ট নিয়মানুসরণ—এ কথাটা ফ্রএড-কে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। মানুষের মন যদি প্রকৃতিরই অঙ্গ হয়, তাহলে সেখানেও চলছে এই লীলা এবং এই নিয়মানুসরণ। সেই শক্তির প্রকৃতি কি, কি তার গতির নিয়ম, মানুষের মনের বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে তা-ই তিনি খুঁজেছেন। মানুষের মনের যে সব সচেতন ক্রিয়া নিতান্ত অর্থহীন মনে হয়, তারাও কোন সূক্ষ্মতর শক্তিরই প্রকাশ মাত্র, এই বিশ্বাস ক্রমশ তাঁর মনে বদ্ধমূল হল। পাস্তুর যেমন করে ব্যাধির পশ্চাতে অদৃশ্য জীবাণু আবিষ্কার করেছিলেন, তিনিও তেমনি চাইলেন চেতন মনের বিকারের পশ্চাতে অদৃশ্য গোপন অবচেতনার স্বরূপ-নির্ণয় করতে। এটা অবশ্য অনেক পরের কথা।

১৮৭৩ সালে ফ্রএড্‌ ডাক্তারী পড়বার জন্যে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে শারীরবিদ্যা-সম্পর্কিত গবেষণাগারের ডাইরেক্টর ছিলেন আরনেস্ট ব্রুকে (Brucke)। ১৮৭৪ সালে ব্রুকে-র প্রসিদ্ধ গ্রন্থ Lectures on Physiology প্রকাশিত হয়। তাতে ব্রুকে সাহসের সঙ্গে এই মত প্রচার করেন যে, প্রাণীদেহ জীবনী-শক্তি সমবায়ের কেন্দ্রস্থল এবং জৈবশক্তিও মূলত রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার নিয়মই অনুসরণ করে থাকে। ব্রুকে-র মতামত তাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল, এ কথা ফ্রএড্‌ নিজেই অসঙ্কোচে স্বীকার করেছেন। জগদ্ব্যাপী শক্তির এই গতিশীল বিকাশ ও ক্রিয়ায় ফ্রএড-ও অসংশয়ে বিশ্বাসী এবং এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে মানব-ব্যক্তিত্বের পশ্চাতে সেই শক্তির অনুসন্ধান তিনি করেছিলেন। দীর্ঘ বিশ বছর গবেষণার পর তিনি এই তিনি দৃঢ় সিদ্ধান্তকে স্থাপন করতে সক্ষম হন যে, মানব-ব্যক্তিত্বের মূল সক্রিয় শক্তি সচেতন মনের পশ্চাতে অদৃশ্যভাবে ক্রিয়া করে এবং সে অবচেতন মনের ক্রিয়া আকস্মিক নয়। বাস্তবিক পক্ষে, মনোজগতের প্রত্যেকটি পরিবর্তন অর্থপূর্ণ। মনোজগতের ক্ষেত্রে তাঁর এ আবিষ্কার বাস্তবিকই যুগান্তকারী এবং এর তাৎপর্যও সুদূর-প্রসারী।

১৮৮১ সালে ফ্রএড্ ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিদ্যার পাঠ-সমাপন করে ডিগ্রী লাভ করেন। কিন্তু তাঁর ডাক্তারী করার ইচ্ছা ছিল না; তাঁর বরাবরই ইচ্ছে ছিল তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় রত হবেন। পাস করার পরও বহু বছর তিনি মানবমস্তিষ্ক নিয়ে গবেষণা করেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রায় কখনো অর্থকরী হয় না। তা ছাড়া, বৃহৎ ছিল ফ্রএড-এর সংসার, নিজেরই ছয়টি ছেলেমেয়ে, আরো পোষ্য ও আগন্তুকের ভরণপোষণের ভার ছিল তাঁর ওপরে। সে সময় থেকেই ইহুদীবিদ্বেষের বিষ অষ্ট্রিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরিতে উন্নতির আশা ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে ব্রুকে-র পরামর্শমতো তিনি ডাক্তারী শুরু করলেন। এতদিন দেহবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে তিনি রোগের কারণ জেনেছিলেন দেহে, কিন্তু এবার বাস্তবক্ষেত্রে রোগীদের চিকিৎসায় রত হয়ে তাঁর দৃষ্টি পড়ল তাদের মনের বিকারের দিকে।

ক্রমশ তিনি মনোবিকারের চিকিৎসায় পারদর্শিতা লাভ করতে মনস্থ করলেন। এতদিন পর্যন্ত মনের রোগের চিকিৎসা অনেকটা আন্দাজের ওপরই চলত এবং এ রোগ 'মাথার ব্যামো' এটাই ছিল ধারণা। তাই মাথা ঠাণ্ডা রাখার নানা ব্যবস্থাই ছিল মনের রোগের চিকিৎসার উপায়। এ সময়ে জ্যাঁ শারকো (Jean Charcot) নামে এক চিকিৎসক এক সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করে মানসিক রোগের চিকিৎসায় কিছুটা কৃতিত্ব অর্জন করেন। শারকো এ রকম রোগীদের সম্মোহিত (hypnotise) করে অভিভাবনের (suggestions) সাহায্যে ও চিকিৎসকের ইচ্ছাশক্তি (will force) -প্রয়োগে, রোগীকে অনেক সময় নিরাময় করে তুলতেন। ফ্রএড্ এ নূতন চিকিৎসাপদ্ধতি শিক্ষার জন্যে এক বৎসর শারকো-র অধীনে কাজ করেন (১৮৮৫-৮৬)। তিনি ফিরে এসে নতুন পদ্ধতি-প্রয়োগে চিকিৎসা করতে লাগলেন। কিন্তু তিনি কিছু দিনের মধ্যেই দেখতে পেলেন যে, এ প্রণালীতে নিরাময় সম্পূর্ণ হয় না; সাময়িক উপশম হলেও রোগ আবার দেখা দেয়। এ ছাড়া তাঁর বৈজ্ঞানিক মন এ অন্ধ চিকিৎসা-প্রণালীতে সন্তুষ্ট হল না। তিনি এ পদ্ধতিতে এ প্রশ্নের জবাব পেলেন না—মানসিক রোগের মূল কারণ কি? এবং কি করেই বা তার মূলোচ্ছেদ হতে পারে? সম্মোহন-প্রণালীতে রোগের যদি আপাত-উপশম হয়, তা-ই বা কেন হয়? অবশ্য একদিন ছাত্রদের সঙ্গে শারকো-র কথোপকথনের সূত্রে ফ্রএড্ একটা মৌলিক তত্ত্বের ইঙ্গিত পান—যেটা তাঁর

নতুন দর্শনের ভিত্তি হয়েছিল। একদিন একটি হিষ্টিরিয়া রোগিণীর সম্বন্ধে শারকো-র ছাত্ররা আলোচনা করছিলেন এবং তাঁদের একজন শারকো-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কেন বিশেষ কতকগুলি উপসর্গ এসব ক্ষেত্রে দেখা দেয়? শারকো বেশ উত্তেজিতভাবে উত্তর দেন—এ জাতীয় উপসর্গের মূল সর্বদাই কোনপ্রকার যৌন আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি। একটু থেমে, তিনি খুব জোর দিয়ে বললেন—'সর্বদা, সর্বদা, সর্বদাই!' ফ্রএড-এর মনে এ ধারণা দানা বেঁধে উঠছিল যে, সমস্ত মানসিক রোগের মূলে কোন অদৃশ্য অবচেতন শক্তি ক্রিয়া করে। ফ্রএড-এর সহপাঠী ঝানে (Janet) এ সম্বন্ধে অনুরূপ একটা ধারণা করেছিলেন। ঝানে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌচেছিলেন, যে, মন একটা অবিচ্ছিন্ন স্রোত নয়, তার মধ্যে কখনো কখনো একাধিক পরস্পর-বিচ্ছিন্ন স্রোত চলতে থাকে। মানসিক দুর্বলতার জন্যে ব্যক্তির চেতনমানস এই বিচ্ছিন্ন স্রোতগুলিকে একত্র করতে না পারলেই মানসিক বিকার ঘটে। এ ঘটনাকে ঝানে বলেছেন 'ডিসোসিয়েস্থান্' বা বিষঙ্গ। এ ডিসোসিয়েস্থান্-তত্ত্ব ফ্রয়েড-এর দর্শনে ভবিষ্যতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। কিন্তু ঝানে ও ফ্রয়েড-এর মধ্যে এ বিষয়ে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ঝানে-ই প্রথম ডিসোসিয়েস্থান্-তত্ত্ব আবিষ্কার করেন সত্য, কিন্তু কেন মনের কোন একটি অভিজ্ঞতা সমগ্র চেতন-মানস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অবচেতন মনে বিস্মৃতির অন্ধকারে আত্মগোপন করে, এবং কিভাবে সেশক্তি ক্রিয়া করে, তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা তিনি দেন নি। ফ্রএড এই ডিসোসিয়েস্থানের 'কেন'র উত্তর দিতে গিয়েই তাঁর বহু বিচিত্র দর্শনহর্ম্যের ভিত্তিমূলের সন্ধান পান। ফ্রএড্ বললেন যে মনের কোন আকাঙ্ক্ষা বা অভিজ্ঞতা মূল মানসস্রোত থেকে তখনই বিচ্ছিন্ন হয়, যখন তা ব্যক্তির সমগ্র চেতন-মানসের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে বিরোধী এবং এ বিরোধের প্রধান কারণ হল যে, সে অভিজ্ঞতা বা আকাঙ্ক্ষা সমাজের দৃষ্টিতে দূষণীয়। ফ্রএড্ এই সিদ্ধান্তে পৌচেছিলেন অনেক গবেষণার পর, অনেকদিন বাদে।

ভিয়েনার আর একজন ডাক্তার ব্রয়ার-এর (Breuer) সহযোগী হয়ে তিনি নূতনতর আর একটি চিকিৎসা-পদ্ধতি পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। এ হচ্ছে যেন মানসিক 'রেচক' (catharsis)। ব্রয়ার্ দেখেছিলেন—রাগ দুঃখ ইত্যাদি তীব্র আবেগ প্রকাশ হয়ে গেলে মন হালকা হয়। তেমনি মানসিক রোগে

যারা ভুগছে তাদের সম্মোহিত না করে আরাম কেদারায় স্বচ্ছন্দে শুইয়ে দিলে এবং মনে যা আসে তাই অনর্গল বলে যেতে দিলে তাদের মনও হালকা হয়ে তাদের রোগ সেরে যায়। ব্রুয়ার্ কতগুলি কারণে এ চিকিৎসা-পদ্ধতি ছেড়ে দিলেন, কিন্তু ফ্রএড-এর মনে এ বিশ্বাস দৃঢ় হল যে মানুষের মনের বিকারের মূল কারণ এ পদ্ধতিতেই পাওয়া সম্ভব। এ পদ্ধতির সংস্কার ও শোধন করেই তিনি মুক্ত অনুষঙ্গ পদ্ধতি (free association method) বা মনোবিকলন (psycho-analysis)-প্রণালী প্রচলন করলেন। তিনি বুঝলেন মানুষের চেতন মন তার সমগ্র মনের সামান্য একটু বাহ্য প্রকাশ মাত্র। মানুষের মানসক্রিয়ার প্রকৃত কলকাঠি লুকিয়ে আছে তার কতকগুলি মৌলিক জৈব আকাঙ্ক্ষার মধ্যে। সে আকাঙ্ক্ষাগুলি প্রবল, স্থূল ও যৌনিকেন্দ্রিক। 'সভ্য' মানুষের চেতনায় তাদের প্রকাশ পদে পদে বাধা-কণ্টকিত। তাই মানুষের আদিম অসভ্য প্রকৃতি এবং তার সভ্য সামাজিক মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে। কিন্তু যেহেতু বর্তমান মানুষ সামাজিক জীব, কাজেই আদিম বর্বর আত্মভোগলিপ্সা, অবচেতন মনের অন্ধকার গহ্বরে শৃঙ্খলিত হয়ে মুখ লুকিয়ে থাকতে বাধ্য হয়। এবং যেখানেই সেই অন্ধ আবেগের স্বাভাবিক প্রকাশের পথ রুদ্ধ হয়, সেখানেই ঘটে কোন না কোন প্রকার মানসিক বিকার বা উদ্বেগ। মুক্ত অনুষঙ্গ প্রণালী দ্বারা, অসতর্ক মুহূর্তে তারা রোগীর চেতন-মানসে ছাড়া পেয়ে বাঁচে। সেই অবরুদ্ধ বিষের রেচনেই ঘটে রোগীর মনের শাপমুক্তি—তার কল্যাণ নিরাময়।

ফ্রএড্ একনিষ্ঠ কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে শত শত রোগীর অবচেতন মনের স্বরূপটি অনুধাবন করতে চেষ্টা করতে লাগলেন—মনের গভীর থেকে গভীরতর আদিম স্তরের সন্ধান পেতে লাগলেন। এই অনলস পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণের পথেই তিনি অবচেতন মনের স্বরূপ-বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হলেন এবং ধীরে ধীরে সেই রাজ্যের নিয়ম ও সূত্র আবিষ্কার করতে লাগলেন। মনোবিদ্যায় একটি নতুন অধ্যায়ের যোজনা হল।

॥ দুই ॥

১৮৯০ সালের কাছাকাছি ফ্রএড্ নিজের মনের গভীরে অবগাহন করে তার আবিষ্কারের সত্যতা যাচাই করতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে আরো বহু

সহস্র রোগীর মনোবিকলনের ফল সংগ্রহ করে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে মানুষের ব্যক্তিত্বের ভিত্তি রয়েছে অবচেতন মনের আবেগ-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে। এর পর থেকে তাঁর সমগ্র জীবন মানব-ব্যক্তিত্বের রহস্য পূর্ণতরভাবে উদ্ঘাটনের চেষ্টাতেই ব্যয়িত হয়েছে। তিনি পরবর্তীকালে লিখেছিলেন, "আমার সমগ্র জীবন ভরে এই একটি উদ্দেশ্য অনুসরণ করেছি,—আমি জানতে চেয়েছি মানুষের মনের গঠনটি কি—এর কলকব্জা কেমন এবং কি কি শক্তি এখানে সমবেতভাবে বা পরস্পর-বিরুদ্ধভাবে ক্রিয়া করে।"

১৯০০ সালে তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ "The Interpretation of Dreams" প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে ফ্রএড্ দেখান যে স্বপ্ন একটা আকস্মিক অদ্ভুত ব্যাপার নয়। স্বপ্নের মধ্যে ছদ্মবেশী কতকগুলি প্রতীকের (symbols) সাহায্যে অবচেতন মনের অতৃপ্ত অবরুদ্ধ আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটে। এ আকাঙ্ক্ষাগুলি অনেক ক্ষেত্রেই যোনিকেন্দ্রিক, কিংবা তা সমাজের প্রচলিত ভদ্র আচার-বিরোধী। তাই মানুষের আলোকিত চেতন-মানসে তারা আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। কিন্তু এই সামাজিক মনের প্রহরা ঘুমের মধ্যে শিথিল হয়। সেই সুযোগে সেই অতৃপ্ত নিষিদ্ধ আকাঙ্ক্ষাগুলি স্বপ্নের মধ্য দিয়ে আত্মতৃপ্তির পথ খোঁজে। প্রকাশকালে এ গ্রন্থ জনসাধারণের মধ্যে বা বৈজ্ঞানিক মহলে বিশেষ কোন সাড়া জাগায় নি। ফ্রএড্ তাতে বিচলিত হলেন না। তাঁর চিকিৎসা-পদ্ধতিতে অনেক রোগী নিরাময় হচ্ছিল এবং ক্রমশ তাঁর চিকিৎসা-পদ্ধতির আদর বাড়ছিল। ফ্রএড-এর কাছে তাঁর চিকিৎসা-প্রণালীর সাফল্যের আনন্দ বড় ছিল না, তাঁর আনন্দ ছিল এই প্রত্যয়ে যে, তিনি যে সত্যের অনুসন্ধান করছিলেন তাকে তিনি অধিকতর পূর্ণরূপে জানতে পারছেন। নতুন নতুন রোগীর চিকিৎসার মধ্য দিয়ে তিনি নূতনতর তথ্যের সন্ধান পাচ্ছিলেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর পূর্বতন মত-পরিবর্তনেরও প্রয়োজনীয়তা বোধ করছিলেন।

১৯০৪ সালে তাঁর "The Psychopathology of Everyday Life" প্রকাশিত হয়। এতে তিনি অবচেতন মনের ক্ষেত্র বিস্তৃততর করে দেখতে পেয়েছেন। তিনি এ গ্রন্থে এ কথা প্রমাণ করলেন যে, হঠাৎ অ-খেয়ালে আমরা একটা ভুল করি, বা অন্যমনস্ক হয়ে ফস্ করে কোন কথা বলে ফেলি, বা কোন

ব্যাপার ভুলে যাই, এ সব আকস্মিক নয়—এ সবই আমাদের অবচেতন মনের ক্রিয়া।

এর পরের বছর "Wit and Its Relation to the Unconscious" গ্রন্থে তিনি অবচেতনার ক্ষেত্রকে আরো বিস্তৃততর করে দেখতে পেয়েছেন। তিনি বললেন, আমাদের ঠাট্টা তামাসা উপহাস নিন্দা এসবের মধ্য দিয়েও আমাদের অবচেতন মনের অবরুদ্ধ আবেগ ইঙ্গিতে নিজেকে প্রকাশ করে।

আরো দুখানা বইও এবছর প্রকাশিত হয়। "A Case of Hysteria"-তে তিনি হিষ্টিরিয়া ইত্যাদি মানসিক রোগের কারণ-বিশ্লেষণপদ্ধতি আলোচনা করেন। তাঁর তৃতীয় গ্রন্থ "Three Essays on Sexuality"-তে শৈশব থেকে শুরু করে পরিণত বয়স পর্যন্ত যৌন-চেতনার বিকাশ ও চেতনমানসে তার বিচিত্র প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এখানেই তিনি প্রথম স্পষ্টভাবে শিশুর জীবনে যৌনবোধের কথা বলেন এবং তিনি দেখাতে চেষ্টা করেন যে, মানবজীবনের সমগ্র ক্ষেত্রে, সমস্ত উদ্যম ও প্রচেষ্টার পশ্চাতে যৌনশক্তি ক্রিয়া করছে। এই বই প্রকাশের পর থেকে ফ্রএড-এর খুব দুর্নাম হয়। ভদ্র সভ্য ব্যক্তিরা বলতে শুরু করেন—ফ্রএড-এর এই 'সর্বব্যাপী যোনি-দর্শন' তাঁর পাপ-মনেরই বিকৃত প্রতিচ্ছবি। অবশ্য ফ্রএড যৌনতা (Sexuality) কথাটা সাধারণত প্রচলিত সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করেন নি এবং তাঁর সম্বন্ধে দুর্নীতির দুর্নামটা ভিত্তিহীন। তিনি জীবনের মৌলিক শক্তিকে যোনিকেন্দ্রিক বলে বিশ্বাস করেছেন বৈজ্ঞানিক প্রমাণের ভিত্তিতে,—এখানে অশ্লীলতা বা দুর্নীতির প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর। সম্ভবত তাঁর মতবাদের মধ্যে কিছু ভ্রান্তি ও অতিভাষণ আছে। এ প্রশ্নের বিচারে মতভেদের স্থান আছে, এবং বাস্তবিকপক্ষে এ প্রশ্নে তাঁর অনুগামী দু'জন প্রধান বিজ্ঞানী—অ্যাড্‌লার ও য়্যুঙ্গ—তাঁর সঙ্গে একমত না হতে পেরে ফ্রএড-এর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজস্ব স্বাধীন মত প্রচার করেছিলেন। কিন্তু ফ্রএড ছিলেন প্রকৃত বিজ্ঞানী, তিনি যা সত্য বলে বিশ্বাস করতেন, নিন্দা ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সে সত্যে তিনি অটল থাকতেন। তাঁর মতবাদ ক্রমশ বিজ্ঞানীদের সমর্থন-আকর্ষণ করতে সমর্থ হয় এবং বর্তমানকালে চিন্তার এমন কোন ক্ষেত্র নেই, যেখানে ফ্রএড-এর মতবাদ প্রভাব বিস্তার করে নি। আমেরিকার প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী G. Stanley Hall সত্যই লিখেছেন—Despite the fright-

ful handicap of the 'Odium Sexicum', far more formidable today, than the 'odium theologicum', involving as it has done for him, lack of academic recognition, and even more or less social ostracism, his views have attracted and inspired a brilliant group of minds, not only in psychiatry but also in many other fields, who have altogether given the world of culture more new and pregnant apparatus than those which have come from any other source within the wide domain of humanism."

যাক্, ১৯০৯ সালে তাঁর মতবাদের প্রথম উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতি আসে। অ্যামেরিকার ম্যাসাচুসেট্সের অন্তর্গত উস্টারে ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিংশ বার্ষিক উৎসবে বক্তৃতা দেবার জন্য তিনি আমন্ত্রিত হন। ইতিপূর্বেই স্ট্যান্‌লী হল্ ফ্রএড-এর অবদান সম্পর্কে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন এবং তাঁর চেষ্টায় আমেরিকায় ফ্রএড-এর মতবাদ প্রসারলাভ করে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ফ্রএড আরো বহু সম্মান নানা স্থান থেকে পেতে থাকেন। যুদ্ধের ফলে বহু মানুষ নানা প্রকার মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন এবং ফ্রএড-এর মনোবিকলন-পদ্ধতি অনুসরণ করে চিকিৎসায় অনেকে আশ্চর্যভাবে আরোগ্যলাভ করেন। তা'ছাড়া ফ্রএড-এর বহু অনুরাগী ছাত্রদের নানা আলোচনার ফলে ফ্রএড-এর মতবাদ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। নানা দেশেই ফ্রএডীয় দর্শন নিয়ে আলোচনা সজোরে চলতে থাকে। ক্যালভিন এস. হল্ লিখেছেন—"এ সময় মনোবিকলন তত্ত্ব ফ্যাসান হয়ে দাঁড়ায়। সাহিত্যে, শিল্প, ধর্ম, সামাজিক আচার, নীতি, শিক্ষা, সমাজবিজ্ঞান—সর্বক্ষেত্রে এ তত্ত্বের প্রবল প্রভাব অনুভূত হতে থাকে। মনোবিকলন-পদ্ধতিতে চিকিৎসিত হওয়াটা 'ফ্যাসানেবল্' বলে বিবেচিত হতে থাকে এবং কথায়-বার্তায় যত্রতত্র 'অবচেতন মন', 'অবদমিত আকাঙ্ক্ষা', 'অবচেতন মানসের বাধা', 'জটিল গ্রন্থি', 'অবরুদ্ধতা' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হতে থাকে।"

মনোবিকলন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের আগ্রহের পশ্চাতে ছিল এ মতবাদের সঙ্গে যৌনতার নিবিড় সম্বন্ধ। এর ফল হল: ফ্রএড-এর দর্শন সম্বন্ধে এমন অনেক কথা প্রচলিত হতে থাকল—যা ভ্রান্ত। এবং তাঁর মতবাদ ভাল করে না বুঝেই তাঁর সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনাও হতে থাকল প্রচুর। বাস্তবিকপক্ষে এ কথা সত্য যে, "One is dismayed by the prevalence of criticism

based upon incomplete understanding. Freud seems to have suffered more in this respect than any other major thinker of our times. His theories have been so widely misrepresented and distorted that it is almost impossible for the unsuspecting reader to separate fact from falsification."

ফ্রএড্ কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন এবং কাজের ফাঁকে ফাঁকে সর্বদাই লিখতেন। এমন বছর প্রায় যেতই না, যখন তিনি একখানা নতুন বই বা গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন নি। বর্তমানে তাঁর সব লেখা সংগ্রহ করে একটি আদর্শ ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে এবং তা চব্বিশ খণ্ডে সমাপ্ত হবে। তাঁর লেখা অত্যন্ত সরল এবং ভাষার ওপর তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। বৈজ্ঞানিক লেখকদের মধ্যে এমন স্বচ্ছতা ও সহজবোধ্যতা কমই দেখা যায়।

ফ্রএড্ কখনো মনে করতেন না যে তাঁর আলোচনার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে তিনি পৌঁচেছেন। তিনি তাঁর পরীক্ষা ও গবেষণার মধ্য দিয়ে সর্বদাই নতুন তথ্য সংগ্রহ করতেন এবং সত্তর বছর বয়সেও তাঁর মনের এমন নমনীয়তা ও সরসতা ছিল যে, তখনও তাঁর অনেক পূর্বের মতবাদ তিনি গুরুতর পরিবর্তন করেছেন, বর্জন করেছেন বা পরিবর্ধন করেছেন। বাস্তবিকই তিনি ছিলেন জ্ঞানতপস্বী, তাঁর একমাত্র উপাস্য ছিল 'সত্য', এবং একমাত্র বিচারবুদ্ধি-প্রয়োগ দ্বারা এ সত্যকে লাভ করাকেই একমাত্র পন্থা বলে তিনি স্বীকার করতেন।

ফ্রএড্ চিকিৎসক ছিলেন—তিনি মানসিক রোগ-চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রধান পরিচয় তিনি বিজ্ঞানী। কোন্ বিজ্ঞানে তাঁর বিশেষ রুচি, এ বিষয়ে ১৮৯০ সালে তিনি এক বন্ধুকে লিখেছিলেন, 'সমস্ত বিজ্ঞানের মধ্যে মনোবিদ্যাই আমাকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে।' যদিও 'মনোবিকলন'-রূপ নতুন পদ্ধতির আবিষ্কারেই তিনি সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, তথাপি এই মনোবিকলনকে তিনি আলাদা শাস্ত্র বলে মনে করেন নি। ১৯২৭ সালে তিনি লিখেছিলেন, 'মনোবিকলন মনোবিদ্যারই অন্তর্গত। এটা শুধু প্রাচীন চিকিৎসা-মনোবিদ্যা নয়, বা মনের রোগের বিজ্ঞানমাত্রই নয়। এটা সাধারণ মনোবিদ্যারই অচ্ছেদ্য অংশ। অবশ্য এটাই সমগ্র মনোবিদ্যা নয়, তবে একে মনোবিদ্যার মূল কাঠামো বা সম্পূর্ণ ভিত্তি বলা চলে।' অর্থাৎ ফ্রএড-এর নিজের মতে মনোবিকলন শুধু

মনের বিকার-চিকিৎসার একটা উৎকৃষ্ট পদ্ধতিমাত্রই নয়, এর প্রধান মূল্য মানব ব্যক্তিত্বের মূল প্রকৃতি সম্বন্ধে এ একটি নতুন আবিষ্কার।

কিন্তু ফ্রএড্ শুধু সঙ্কীর্ণ অর্থে বিজ্ঞানী মাত্র নন। তিনি দিয়েছেন মানব মন সম্বন্ধে একটি সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গী—জার্মান ভাষায় যাকে বলা হয় 'Weltanschauung'। তাই তিনি দার্শনিক। ফ্রএড্-দর্শনের মূলভিত্তি হচ্ছে বিজ্ঞান। সাধারণ দার্শনিকের মতো তিনি আত্মার স্বরূপ, ভগবানের বিভাব ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেন নি। যা পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিকষে প্রমাণিত হয় না, ফ্রএড-এর কাছে তা মূল্যহীন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী মানবিক (humanitarian) ও সমাজকল্যাণমূলক (conducive to social welfare)।

তবে মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে গভীর ও নির্ভুল জ্ঞান তাঁকে নৈরাশ্যবাদী ও মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরুৎসাহী করেছিল। তিনি তাঁর ভূয়োদর্শনের ফলে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, মানব-প্রকৃতিতে যুক্তিহীন আবেগই প্রবলতর শক্তি, যুক্তি বুদ্ধি বিচার দিয়ে তার জীবনের সামান্য অংশই প্রভাবিত ও পরিচালিত হয়। মানুষ তার মোহ, তার কুসংস্কার ও নির্বুদ্ধিতা আঁকড়ে ধরে অন্ধের মতো চলতেই ভালোবাসে। অল্প কয়েকজন অসমসাহসীই চোখ খুলে বুদ্ধির আলোকিত পথে অগ্রসর হন। কিন্তু তাঁরা এ পৃথিবীতে সুখে থাকতে পারেন না। সমাজ ও মানুষের এই নির্বুদ্ধিতা, কুসংস্কার ও অন্ধ আবেগের প্রতিফলন মাত্র। কাজেই বুদ্ধির পথে সমাজের সংস্কার সহজ নয়। মানুষ ও সমাজ সম্বন্ধে তাঁর নিরাশাবাদ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর দুটি গ্রন্থে—'The Future of an Illusion' ও 'Civilization and Its Discontents'। কিন্তু তাঁর মতে, বুদ্ধির পথে ছাড়া মুক্তি নেই। তাই বিষম দায়িত্ব রয়েছে পিতা, মাতা ও শিক্ষকের ওপরে। মনোবিদ্যার নতুন আলোকে সন্তানপালন ও তার সুশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হলে, তাদের নিজেদের মনের কুসংস্কার ও অন্ধকারের ক্লেদ অপসারণ করতে হবে। এ পথ সহজ নয়—কিন্তু এ ছাড়া ব্যক্তি ও সমাজের উদ্ধারের অন্য কোন পন্থা নাই। প্রাচীন উপনিষদের বাণী—'আত্মানং বিদ্ধি'ই মানুষের মুক্তির মূলমন্ত্র।*

* এ প্রবন্ধ লিখতে যে যে বইয়ের সাহায্য নেওয়া হয়েছে :

(1) Freud—A General Introduction to Psychoanalysis
(2) Murphy—A Historical Introduction to Modern Psychology
(3) Hart—The Psychology of Insanity
(4) C. S. Hall—A Primer of Freudian Psychology
(5) Flugel—A Hundred Years of Psychology

ষড়বিংশ অধ্যায়

ফ্রএড্ প্রসঙ্গ—ব্যক্তিমানসের ত্রিতল

ফ্রএড্ তাঁর প্রথম যৌবনে জীবিকার দায়ে মানসিক রোগের চিকিৎসা শুরু করেন এবং তাঁর অভিনব চিকিৎসা-পদ্ধতিতে যথেষ্ট খ্যাতিও অর্জন করেন। কিন্তু তিনি ছিলেন খাঁটি বিজ্ঞানী—শুধু সফল চিকিৎসাতেই তাঁর তৃপ্তি ছিল না—এই জ্ঞানসাধকের মন কেবলই প্রশ্ন করেছে 'কেন এমন হয়'? বহু বহু রোগীর সংস্পর্শে এসে তিনি নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, আমরা যাকে 'মন' বলি, তার পরিধি শুধুমাত্র চেতন মানসক্রিয়ার রাজ্যেই সীমিত নয়, তার আরো অনেক বিস্তার আছে,—আরো তল আছে। এর তল অল্পচেতন ও অবচেতনের অন্ধকারে আরো বহু নিম্নে—আরো বহুদূরে প্রসারিত। শুধু যে মানসবিকারের ব্যাখ্যা হিসাবেই অবচেতনকে তিনি গ্রহণ করেছেন তা নয়। তিনি বিশ্বাস করেছেন, সুস্থ মন ও বিকৃত মন দুই-ই একই মৌলিক সূত্রে গ্রথিত, মনের কলকব্জা, তার শক্তির ক্রিয়া সর্বক্ষেত্রে একই নিয়ম মেনে চলে। তাঁর ভূয়োদর্শনের ফলে তিনি জেনেছেন যে—মানুষের ব্যক্তিত্ব বহু কোষবিশিষ্ট একটি জটিল সক্রিয় ঐক্য। মন যেন চীনদেশীয় কৌটার মধ্যে কৌটা—তার ভিতরে আবার কৌটার ভেল্কিবাজী।

মনের তিন স্তর

ফ্রএড্ ব্যক্তিমানসের তিনটি প্রধান স্তর বা কোষের উল্লেখ করেছেন, তাদের নাম দিয়েছেন: 'ঈদ্', 'ঈগো' ও 'সুপার ঈগো'—অদস্, অহং ও অধিশাস্তা। মানসিক সুস্থ মানুষে এই তিনটি স্তরই বিরোধহীন সক্রিয় সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ। সুস্থ মানুষ তার পরিবেশের সঙ্গে স্বচ্ছন্দভাবে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং সফলভাবে পরিবেশের সঙ্গে আদানপ্রদান করতে সক্ষম হয়। এই আদানপ্রদানের উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনের মৌলিক আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজনের তৃপ্তি। যখন ব্যক্তিমানসের এই তিন স্তরের মধ্যে সহযোগিতার অভাব ঘটে তখন ব্যক্তি নিজের সঙ্গে ও পরিবেশের সঙ্গে নানা বিরোধিতার সম্মুখীন হয়

এবং তার ফলে ঘটে অতৃপ্তি ও অশান্তি। এতে জীবনে সাফল্যের পথে বাধা সৃষ্টি হয়।

প্রথম স্তর : অদস্ (Id)

এ স্তর হচ্ছে সকলের চেয়ে মৌলিক, এ হচ্ছে জীবের আদিমতম প্রবৃত্তি ও শক্তির উৎসস্থল। এর কাজ হচ্ছে ভেতর ও বাইরের নানা উত্তেজনার দ্বারা যে বেগ সৃষ্টি হয় তৎক্ষণাৎ তার প্রকাশের পথ করে দেওয়া। জীবনের মৌলিক দাবি হচ্ছে প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি। অদস্ হচ্ছে ব্যক্তিমানসের আদুরে দুলাল, এ কেবল বলে, 'চাই'। ফ্রএড্ তাই বিবেচনাহীন অন্ধ আদিম শক্তিকে বলেছেন—'প্লেজার্ প্রিন্সিপল্'। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে উত্তেজনার ফলে যে অস্বস্তি সৃষ্টি হয়েছে, তার অপসারণের পথ করে দেওয়া অথবা তা যথাসম্ভব কমিয়ে (tension reduction) একটা শান্ত অবস্থার সৃষ্টি করা। 'প্লেজার প্রিন্সিপল্'-এর কাজ হচ্ছে—অস্বস্তি- বা বেদনা-দূরীকরণ ও সুখপ্রাপ্তি। এটি হচ্ছে জীবজগতের সবচেয়ে মৌলিক শক্তি।

প্রাণীজীবনে এর সহজতম প্রকাশ হচ্ছে, প্রত্যাবর্ত-ব্যবস্থায় (Reflex mechanism)—যেমন কড়া আলো হঠাৎ চোখের রেটিনার ওপর পড়ে অস্বস্তির সৃষ্টি হল, আর তৎক্ষণাৎ চোখের পাতা বুঁজে গিয়ে অক্ষিপটকে (retina) ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাল—অস্বস্তির অবসান হল। এ ভাবে দেহের বাইরের ও ভেতরের নানা চাপ কমাবার হাজারো ব্যবস্থা রয়েছে প্রাণীদেহে।

যদি সমস্ত চাপ এমনি সহজভাবে নিঃশেষে কমাবার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা থাকত জীবদেহে, তবে কিন্তু চেতনা, বিচারবুদ্ধি ইত্যাদি জটিল মানসিক ক্রিয়ার বিকাশই ঘটত না। জীবের দেহে যে নানা অস্বস্তি সৃষ্টি হয়, তা নিঃশেষে ঝেড়ে ফেলবার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। অনভ্যস্ত নাকে নস্যি ঢুকেছে, হেঁচে-কেসে দেহ সে অবাঞ্ছিত উত্তেজনার কারণটি ঝেড়ে ফেলে দেয়, কিন্তু ক্ষিদে পেলে পেটের ভেতরের নাড়ী মোচড়াতে থাকে—দারুণ অস্বস্তির সৃষ্টি হয়—কিন্তু তার অবসানের উপায় দেহের ভেতরেই নেই; তখন বাইরে থেকে খাদ্যের জোগান দিতে হয়। অবশ্য দেহের নিজেরও কিছুটা ক্ষমতা আছে ক্ষুধার জন্য নাড়ীর মোচড় কিছুক্ষণের জন্যে থামিয়ে রাখবার; দারুণ ক্ষুধায়

পর উপযুক্ত সময়ে খাদ্য না পেলে ক্ষুধা মরে যায়, দেহের উপাদানগুলি ক্ষয়িত হয়ে কিছুক্ষণের জন্যে বিপদ বা অস্বস্তি ঠেকিয়ে রাখে। কিন্তু অবশেষে হার মানতেই হয়, খাদ্য ছাড়া দেহের মৃত্যু অনিবার্য।

ক্ষুধা দ্বারা দেহের যে যন্ত্রণা হয়, তা দূর করতে হলে খাদ্য চাই-ই। শিশুর পক্ষে এ খাদ্য মাতা বা পিতা সংগ্রহ করে দেন, কিন্তু অনেক সময় শিশুর দেহ ঠিক যে খাদ্যটি, যেভাবে, যে পরিমাণে আকাঙ্ক্ষা করছে—মাতাপিতার শত সতর্কতা সত্ত্বেও তা ঠিক ঠিক পূরণ করা সম্ভব হয় না। তাই কিছুটা অতৃপ্তি তার হয়তো থেকেই যায় এবং তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে খাদ্য শিশু চাইছে, তা না দিয়ে অন্য খাদ্য, অন্যভাবে বা পরিমাণে জোর করে দিলে তাতে নতুন অস্বস্তির সৃষ্টি হয়। এর থেকে 'অদস্'-এ মানসিকতার দিকে বিকাশ বা পরিবর্তন শুরু হয়।

আমাদের দেহের একদিকে আছে ইন্দ্রিয়াদি; এরা জ্ঞান আহরণ করে, আর অন্যদিকে আছে পেশীসমূহ; এরা কাজ করে। প্রত্যাবর্তক্রিয়ার ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা স্নায়ুমণ্ডলীর একটি সহজ পথ ধরে—পেশী-পরিচালক-কেন্দ্রকে উদ্বুদ্ধ করে, দেহের অভ্যন্তরে যে চাপ সৃষ্টি হয় তার বহিঃপ্রকাশের পথ করে দেয়। এ সব ক্ষেত্রে বুদ্ধি-বিবেচনার উচ্চ স্নায়বিক কেন্দ্রগুলি নিষ্ক্রিয়ই থাকে। যদি প্রত্যাবর্তক্রিয়ার দ্বারাই দেহের সব অস্বস্তি দূর হয়ে যেত, তবে মানসিকতার আর কোন বিকাশ ঘটত না। কিন্তু পূর্বেই বলেছি—দেহের সমস্ত অস্বস্তি এই সহজ উপায়ে নিঃশেষে দূর হয়ে যায় না। তাই জীবমানসে 'অদস্'-এর যে পরিবর্তন ঘটে, তকে ফ্রএড্ বলেছেন **'প্রাথমিক প্রক্রিয়া' (primary process)**। এটি কি, তা বুঝতে চেষ্টা করা যাক।

শিশু যখন খাদ্যগ্রহণ করে, তখন খাদ্যের গুণাগুণ সে লক্ষ্য করে। অভিজ্ঞতার ফলে যা ছিল বিচ্ছিন্ন সংবেদন (unrelated sensations) তা সুসংবদ্ধ প্রত্যক্ষে (perception) পরিণত হয়। পুনঃ পুনঃ খাদ্য ও তার প্রত্যক্ষ (perception of the food) একত্র শিশুর অভিজ্ঞতায় উপস্থিত হয় বলে এই দুই-ই তার কাছে সমার্থবাচক হয়ে যায়। আবার খাদ্য যেখানে উপস্থিত থাকে না, তার কল্প (image) সেখানে প্রত্যক্ষের স্থান অধিকার করে। শিশু ক্ষুধার্ত, কিন্তু খাদ্য তার সামনে উপস্থিত নেই,

তার দেহাভ্যন্তরস্থ অস্বস্তি সহজ প্রত্যাবর্তক্রিয়ার পথে পরিতৃপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এখানে শিশু তাই খাদ্যের ছবি বা কল্প (image) দিয়ে তৃপ্তির পথ খুঁজবে। একে ফ্রএড বলেছেন 'প্রাইমারী প্রসেস্' বা 'আইডেন্টিটি অব্ পারসেপ্‌শ্যান্' (identity of perception)। শিশু একটি বল নিয়ে খেলছে—হঠাৎ এক বড় ছেলে এসে বলটা তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গেল। শিশু তার অতৃপ্ত বাসনা-তৃপ্তির পথ খুঁজবে বলের স্মৃতিতে, বলের কল্পনায়। এ জন্যেই আমরা দেখি, শিশুর জীবনে কল্পনা অনেকখানি স্থান জুড়ে থাকে। রাত্রে ঘুমের মধ্যেও এই ইচ্ছাপূরণের প্রক্রিয়া চলতে থাকে, —স্বপ্নে। যে ছেলে পেটভরে খেতে পেল না, সে স্বপ্ন দেখল বিরাট ভোজের; পুজোর সময় অন্য মেয়েরা রঙীন জামা পরেছে, গরীব ঘরের মেয়ে নতুন জামা পায় নি, সে তাই রাত্রে স্বপ্ন দেখল, হাজারো সিল্কের জামা ফলে আছে তার উঠোনের আমগাছে! এই কল্পনা দেহের অভ্যন্তরের অস্বস্তি কমায়, তাই এটা ইচ্ছাপূরণ (wish-fulfilment)। এখানেই আমরা ফ্রএড-এর স্বপ্নতত্ত্বের মূল, কথাটি পাই। এমনি করেই, যা ছিল সহজ প্রত্যাবর্তক্রিয়া তা প্রত্যক্ষ স্মৃতি ও কল্পনার উন্নততর মানসিক স্তরে পরিণত হল। কিন্তু কল্পনা বাস্তবের পরিবর্ত হিসাবে কিছুক্ষণের জন্যে অস্বস্তি-দূরীকরণে সাহায্য করলেও তা বাস্তবের স্থানপূরণ করতে পারে না। কল্পনার জগতের সঙ্গে বাস্তব জগতের সংঘাত বাধে—প্লেজার প্রিন্সিপল্, রিয়্যালিটি প্রিন্সিপ্‌লের কাছে বাধা পায়, অন্ধ অবুঝ অদস্ অধিকতর মানসিকতার আধার 'অহং'-এর (ego) পথ করে দেয়। প্রাইমারী প্রসেস্ থেকেই আসে 'সেকেণ্ডারী প্রসেস্'। সে কথা পরে আলোচনা করব।

অদস্ হচ্ছে আদিম জৈব প্রবৃত্তি; এ হচ্ছে সহজ প্রবৃত্তি বা instinct-এর বাসা। অদস্ দেহকেন্দ্রিক—বাহ্য জগতের সঙ্গে সম্পর্ক তার তত ঘনিষ্ঠ নয়। অহং বা অধিশাস্তার তুলনায় অদস্ অসংবদ্ধ (unorganized)। অদসের শক্তি সচল এবং সহজেই এ শক্তির নিঃসরণ (release) হতে পারে। প্রত্যাবর্তক্রিয়ার বেলা এটা আমরা দেখতে পাই। সময়ের গতির সঙ্গে বা অভিজ্ঞতার দ্বারা এ আদিম শক্তির পরিবর্তন ঘটে না—কারণ বাহ্যজগৎ ও তার বাধানিষেধের দ্বারা এ শক্তি নিয়ন্ত্রিত নয়। যুক্তি ও বিচারের দ্বারা এ শক্তি প্রভাবিত নয়—নৈতিকতার ভিত্তি এতে অবর্তমান। ছোট শিশুর মতো নির্লজ্জ এর

আবদার,—এর একমাত্র দাবি বর্তমান আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি। অদসে শক্তি যেখানে ব্যাহত হল না, সেখানে সরাসরি আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটছে। যেখানে তা ঘটে না, সেখানে তা অহং-এর শক্তির শাসনে নিজের সহজ গতি হারায়—সেখানে তার মৌলিক রূপের পরিবর্তন ঘটে।

অদস্ হচ্ছে আদিম প্রবৃত্তি—ব্যক্তিমানসের মূলাধার। প্রত্যাবর্তক্রিয়া (reflexes) এবং সহজ প্রবৃত্তিই (instinct) শুধু সহজাত এবং অভিজ্ঞতানিরপেক্ষ তা নয়। এমন কি অস্বস্তি দূর করবার জন্যে যেখানে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়, ফ্রএড-এর মতে সে সকল কল্পও (image) অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ ও অন্তর্জাত (innate and subjective)। তার অর্থ, অভিজ্ঞতার ফলে ক্ষুধা ও খাদ্য মনের মধ্যে কার্য-কারণের সূত্রে বাঁধবার আগেই ক্ষুধার্ত শিশুর মনে খাদ্যের ছবি বা কল্পের উদ্রেক হয়। সেটা কি করে সম্ভব হয়? ফ্রএড-এর মতে বহু বহু পূর্বপুরুষের পুনঃ পুনঃ অভিজ্ঞতায় ক্ষুধা ও খাদ্য একসূত্রে বাঁধা হয়ে গেছে এবং বহুযুগসঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফল অদসে এসে স্থায়ীভাবে সঞ্চারিত হয়েছে। ব্যক্তির নিজস্ব জীবনেও অবদমনের ফলে নতুন নতুন উপাদান অদসে সংযুক্ত হয়। এই অবদমন ব্যাপারটা অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে।

জাতির বংশগতির দিক দিয়ে যেমন অদস্ আদিম শক্তি, ব্যক্তির জীবনেও এ আদিম। এই মূলের ওপর ভিত্তি করেই ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। জীবনের নানা পরিণতি ও জটিল বিকাশ সত্ত্বেও অদসের মৌলিক ধর্মের পরিবর্তন ঘটে না। অদস্ হচ্ছে আদুরে দুলাল—কোন বাধা, কোন অস্বস্তি সে সহ্য করতে রাজী নয়, যা চাই তার জন্য তার সবুর সয় না। সুখ তার একমাত্র কাম্য—সে অসামাজিক, অযৌক্তিক, খামখেয়ালী। অদস্ সর্বশক্তিমান, কারণ কল্পনার সাহায্যে সমস্ত ইচ্ছাপূরণ তার পক্ষে সম্ভবপর। সীমাহীন সাগরসদৃশ এর ব্যাপ্তি, এমন কিছু নেই যা এর মধ্যে নেই। নিজের বাইরে অন্য কোন শাসন মেনে নিতে সে অক্ষম। তার মূলমন্ত্র—দুঃখ-বর্জন ও সুখ-আহরণ।

ব্যক্তিমানসের এই অংশ সবচেয়ে দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যময়—একে ইচ্ছামত পরিবর্তন করা যায় না। যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে বা সামাজিক শাসনের চোখরাঙানি দিয়ে এর শক্তিকে স্থায়ীভাবে রুদ্ধ করা যায় না। ব্যক্তিমানসরূপ অতল সমুদ্রের গর্ভে অদস্ দুর্বার বাড়বানল। প্রচণ্ড নির্মম এর শক্তি; সাময়িকভাবে এর আপাতবশীকরণ আমাদের ভুল ধারণা জন্মায় যে, একে জয় করা চলে।

ব্যক্তির অহং-মানস বা সমাজের শাসনের (অধিশাস্তা) সামনে সে আপাত-নতি-স্বীকার করে, মনের গভীরতার অবচেতনায় আত্মগোপন করে প্রতিশোধের অপেক্ষা করে। মানবের সমগ্র চরিত্রকে এ মৌলিক অমোঘ শক্তি প্রভাবিত করে। এ অনন্ত-যৌবনা উর্বশী—তপস্যার অহঙ্কারে দৃপ্ত সংযমী কঠোর ঋষির বারে বারে এ ধ্যানভঙ্গ করে। অপ্রত্যাশিত এর আক্রমণ, নিতান্ত খামখেয়ালী এর প্রকাশ। এই অদসের অন্ধ তাড়নায় ভদ্র মানুষ নিতান্ত অকারণে পরের কাঁচের জানলায় ঢিল মারে—নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সামনের ভদ্রমহিলাকে রাস্তার কাদার মধ্যে আছাড় খাইয়ে দেয়, হঠাৎ খুন করে। এই অদসের চালনায় মানুষ দিবাস্বপ্ন দেখে, "কেবলি স্বপন করিনু বপন, আকাশে।" অদস্ চিন্তা করে না, বিচার করে না—সে আকাঙ্ক্ষা করে, আর নির্লজ্জভাবে ইচ্ছাপূরণে প্রবৃত্ত হয়।

দ্বিতীয় স্তর : অহং (Ego)

অদস্ হচ্ছে অন্ধ মূল প্রকৃতি—সে শুধু বলে 'চাই'। তার ইচ্ছাপূরণের দুটি পথ আছে। এক হচ্ছে প্রত্যাবর্তক্রিয়া-দ্বারা অস্বস্তি-দূরীকরণ, বা কল্পের মাধ্যমে তৃপ্তির সন্ধান। কিন্তু এই দুইয়ের কোন পথেই জীবের সব মৌলিক প্রয়োজন মেটে না। ক্ষুধার তাড়নার জৈব প্রতিক্রিয়া খাদ্য সৃষ্টি করে না—খাদ্যের কল্পনাতেও পেট ভরে না। জীবজগতের আর এক মূল প্রয়োজন, বংশ-রক্ষা; এ ক্ষেত্রেও আসঙ্গকামনা বা আসঙ্গকল্পনা জৈব প্রয়োজন মেটায় না। বরঞ্চ এ কামনাপ্রসূত অসংযত ব্যবহার বহির্জগৎ বা সমাজের নিকট থেকে তিরস্কার বা শাস্তিই লাভ করে। কাজেই এ সব মৌলিক আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিলাভের পক্ষে প্রয়োজন বহির্জগতের সঙ্গে (external reality) বোঝাপড়া, হয় বহির্জগতের বশ্যতা মানতে হবে, অথবা তাকে জয় করতে হবে। অদসের অন্ধ শক্তির দ্বারা তা সম্ভব নয়। এবং এই জন্যেই ব্যক্তিমানসের উচ্চতর স্তর অহং-এর (ego) উদ্ভব। অদস্‌কে বলা হয়েছিল, প্লেজার প্রিন্সিপল, অহংকে তাই বলা যায়, রিয়ালিটি প্রিন্সিপল।

অহং বা ঈগোকে তুলনা করা যেতে পারে সমগ্র ব্যক্তিমানসের সেক্রেটারী ও লিয়াজোঁ অফিসারের (liaison officer) সঙ্গে। ব্যক্তির স্বার্থে অদস্ ও অধিশাস্তার (সামাজিক বিবেকবুদ্ধি) নিয়ন্ত্রণ, অহং-এর কাজ। ব্যক্তির হাজারো প্রয়োজন যাতে সুসমঞ্জসভাবে মেটানো যায়, যাতে বহির্জগতের সঙ্গে

ও সমাজজীবনের সঙ্গে ব্যক্তির সামঞ্জস্য ঘটে, অহং সে চেষ্টায় সতত চেষ্টিত। যেখানে এ সামঞ্জস্যবিধান সম্ভব হয়েছে সেখানেই সুষম ব্যক্তিত্ব (integrated personality), যেখানে অহং অদসের অন্ধ অযৌক্তিক দাবির কাছে আত্মসমর্পণ করে, অথবা সামাজিক মতামতকে অতিরিক্ত মর্যাদা দিয়ে অদস্‌কে পদে পদে ক্ষুণ্ণ করে, সেখানে বিরোধ, অসামঞ্জস্য ও অশান্তি অনিবার্য।

অদসের মতো অহং অন্ধ আবেগচালিত নয়। সে বহির্জগতের বাধাকে স্বীকার করে। কাজেই সে জানে চাইলেই পাওয়া যায় না। তার হাতিয়ার তাই প্রত্যাবর্তক্রিয়া নয়। সে অপেক্ষা করে, বিচার করে, কখন কোন অবস্থায় কতটুকু আকাঙ্ক্ষার পূরণ হতে পারে, তার হিসাব করে। যেমন, শিশু একটু বড় হলেই বোঝে যে, ক্ষুধা পেলেই যে কোন দ্রব্য হাতের কাছে আসে তাই মুখে পুরে দিলে ঠকতে হয়, ভুগতে হয়। ওকে জানতে হয়, কোন্‌টা খাদ্য নয়, তাকে বুঝতে হয়, কোথায় বা কখন উপযুক্ত খাদ্য পাওয়া যাবে। কাজেই অহংকে শিখতে হয় কিছুটা পরিমাণ অস্বস্তি বা অসুবিধা সহ্য করতে। অবশ্য এখানেও মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে—অস্বস্তি-দূরীকরণএবং আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি। কিন্তু তা বিচারবুদ্ধি-চালিত।

অহং অন্ধ আবেগ-চালিত নয় বলেই ব্যক্তির চেতনমানসে উচ্চতর স্তরের বিকাশ প্রয়োজন। একে ফ্রএড্‌ বলেছেন, **সেকেণ্ডারী প্রসেস্‌ (secondary process)**। অদসের প্রাইমারী প্রসেস্‌-এর কথা পূর্বে বলেছি। যেখানে প্রত্যাবর্তক্রিয়ার পথে ইচ্ছাপূরণ হয় না, সেখানে ঈপ্সিত দ্রব্যের কল্পের সাহায্যে অতৃপ্তির অবসান খোঁজা হয়। কিন্তু সে হচ্ছে দুধের সাধ ঘোলে মেটানো। ঈগো বা অহং অত কাঁচা ছেলে নয়। শুধু কল্পনায় সে আকাঙ্ক্ষাপূরণে রাজী নয়। তাই প্রয়োজনের তাগিদে, উচ্চতর চেতনার উদ্ভব হয়। তখন ব্যক্তিকে ভাবতে হয়, চিন্তা করতে হয়, বিচার করতে হয়, আকাঙ্ক্ষাপরিপূরক দ্রব্যের প্রকৃত স্বরূপটি জানবার, কি করে সেটি সংগৃহীত হতে পারে সে সম্বন্ধে কার্যপদ্ধতি বা প্ল্যান স্থির করার কথা। এটি অন্ধভাবে হতে পারে না। বাস্তব জগতের অবস্থা বিবেচনা করে সেই অনুযায়ী কর্মপদ্ধতি স্থির করা ও অনুসরণ করা অহং-এর দায়িত্ব। এর নাম 'রিয়্যালিটি টেষ্টিং' (Reality testing)। প্রথম কর্মপন্থায় ঈপ্সিত দ্রব্য না পাওয়া গেলে

আবার নতুন করে বিবেচনা ও পরীক্ষা (hypothesis and experiment) করতে হয়। উপযুক্ত ঈপ্সিত বস্তুটি পাওয়া গেলে, তার সম্ভোগের দ্বারা অতৃপ্তির অবসান ঘটে।

প্রাইমারী প্রসেস্ থেকে সেকেণ্ডারী প্রসেস্ উচ্চতর মানসিক বিকাশের অপেক্ষা রাখে। অবশ্য এ দুটি বিভিন্ন বা বিচ্ছিন্ন অবস্থা নয়। সেকেণ্ডারী প্রসেস্ যা কাল্পনিক বা শুধুই মানসিক এবং যা বাস্তবিক ও বহির্জগৎ-বিষয়ক এ দুয়ের প্রভেদটি স্বীকার করে। সে কল্পনাকে বাস্তব বলে ভুল করে না এবং নিজেকে খেলনা দিয়ে ভোলায় না। স্বভাবতই এ স্তরে উন্নততর প্রত্যক্ষ, বিশ্লেষণ, স্মৃতি, চিন্তা ও সুবিবেচিত কর্মের ক্ষমতার বিকাশ প্রয়োজন। অতীত অভিজ্ঞতাকে কার্যকরী ভাবে কাজে লাগাবার প্রয়োজনে ভাষার উদ্ভব হয়। পেশী-ব্যবহারের ক্ষেত্রেও ব্যাপকতর, সূক্ষ্মতর ও অধিকতর সুসমঞ্জস শক্তি-সমাবেশের প্রয়োজন হয়। শুধু মাত্র সহজ প্রত্যাবর্তক্রিয়ার অন্ধতার দ্বারা বাস্তব জগতের সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধের নানা সমস্যার সমাধান হতে পারে না। অদস্ ও বাস্তব জগতের মধ্যবর্তী জটিল সম্বন্ধ এবং তাদের মধ্যে সংযোগসাধনক্ষম মানস সংস্থানই হচ্ছে অহং বা ঈগো।

কিন্তু অহং কি সর্বদাই সচেতন বুদ্ধিচালিত? সর্বদাই কি সে বাস্তবের কষ্টিপাথরে যাচাই করে সাবধানে অগ্রসর হয়? না, সেও মাঝে মাঝে বাস্তব জগতের কঠিন বাধা, কল্পনার অবাস্তবতার দ্বারা দূর করতে চায়। যখন ঈপ্সিত দ্রব্য নিজশক্তির অপ্রাচুর্যের জন্যে বাস্তবিক আহরণ করা যায় না, তখন সে সুসংবদ্ধ মনোহর স্বপ্নের জাল বুনে তৃপ্তি খোঁজে (phantasy & day-dream)। অবশ্য এখানে অহং এ কথা জানে যে, এ তৃপ্তি কাল্পনিক মাত্র, তথাপি কঠিন বাস্তবের হাঁপধরা নিগড় থেকে ব্যক্তি কল্পনায় মাঝে মাঝে ছুটি খোঁজে। এর থেকেই সৃষ্টি হয় কাব্য, উপন্যাস, গল্পের। এরও প্রয়োজন আছে।

যদিও বাস্তব জগতের সঙ্গে সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার ফলে অহং-এর বিকাশ ও পরিণতি, তথাপি এর শক্তি ও স্বরূপ বংশগতির দ্বারা নির্ধারিত ও সীমাবদ্ধ এবং এর বিকাশের ধারা স্বাভাবিক পরিপক্বতার (maturation) নিয়ম মেনেই চলে। সমস্ত সুশিক্ষার উদ্দেশ্যই হচ্ছে—মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির সুষম ও সুসম্পূর্ণ বিকাশ, যা একদিকে মৌলিক আদিম কাম (Id) ও অন্যদিকে বাস্তব বহির্জগতের সঙ্গে সুসামঞ্জস্যবিধান দ্বারাই কেবল সম্ভবপর।

তৃতীয় স্তর : অধিশাস্তা (Super Ego)

ব্যক্তিত্বের গঠন যেমন বহুলাংশে বহির্জগতের বাস্তবতার দ্বারা প্রভাবিত, তেমনি গভীরভাবে প্রভাবিত সমাজের নৈতিক বুদ্ধি দ্বারা। ব্যক্তিত্বের গঠনে সমাজমনের এই প্রতিফলনকেই ফ্রএড্ বলেছেন 'অধিশাস্তা' (Super ego)। ব্যক্তিত্বের এই অংশ অদসের মতো সম্পূর্ণ অন্ধ, অবুঝ, খামখেয়ালী নয়, এখানে বিচার আছে, নৈতিক আদর্শের বাধানিষেধ আছে, আদর্শে পৌছবার জন্যে আগ্রহ আছে। কিন্তু অধিশাস্তার মধ্যেও কিছুটা অধৈর্য ও অন্ধ পীড়নস্পৃহা আছে।

শিশুর নৈতিক জীবনের অনেকখানিই পিতামাতার মতামতের প্রতিফলন। পিতামাতা হলেন, সামাজিক রীতিনীতি বিচারের প্রতীক। তাঁরা যা পাপ-পুণ্য বলে বিবেচনা করেন, শিশুও তাই বিশ্বাস করে। তার নিজ বিচার-বিবেচনার স্থলে শিশু তার পিতামাতার বিচারবুদ্ধিকে স্থান দেয়। এমনি করে শিশু নিজেকে সমাজের মনের সঙ্গে যুক্ত করে। একদিকে যেমন তার অভিজ্ঞতার ফলে সে বহির্জগতের বাধানিষেধকে মেনে নিজ ব্যক্তিত্বকে সংযত করে, তেমনি পিতামাতার নিন্দা-প্রশংসা অনুযায়ী নিজ ইচ্ছাপ্রবৃত্তিকে সংযত করতে অভ্যস্ত হয়। মানব-শিশুকে বহুদিন পিতামাতার ওপর নির্ভর করতে হয়, তাই শিশুর মনে সামাজিক মনের ছাপ যথেষ্ট গভীর। অধিশাস্তার ভিত্তি তাই অদৃঢ় নয়।

অধিশাস্তার দুটি দিক—একটি গঠনাত্মক আর একটি নিষেধাত্মক। প্রথমটিকে ফ্রএড্ বলেছেন 'ঈগো আইডিয়াল' (ego ideal), দ্বিতীয়টিকে বলেছেন 'কন্‌স্সেনস্' (conscience)। প্রথমটি হচ্ছে শিশুর মনে পিতামাতা কোন্ ব্যবহার নীতিগতভাবে ভালো (morally good) মনে করেন, সে সম্বন্ধে ধারণা। যে ব্যবহার ভালো, পিতামাতা তা বুঝিয়ে দেন প্রশংসা দ্বারা, পুরস্কার দ্বারা। যেমন, শিশু যখনই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, তখনই বাবা-মা তাকে আদর করেন, প্রশংসা করেন, খেলনা কিনে দেন। এতে শিশুর মনে এ ধারণা জন্মে যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা ভালো, এটা উচিত। শিশুর মনে এমনি করে 'আদর্শ'নিষ্ঠা সৃষ্টি হয়। এর বিপরীত দিক হচ্ছে শিশুর মনের মধ্যে ধারণা, কোন্ কোন্ ব্যবহার পিতামাতার কাছে অন্যায়। এর নাম বিবেক বা conscience। শিশু দেখে জামাকাপড় নোংরা করলে মা বিরক্ত হন,

বাবা বকেন। এর থেকে সে বোঝে, এটা অন্যায় ব্যবহার—এটা খারাপ, এটা নিন্দনীয়। একই নীতিবোধরূপ মুদ্রার দুই পিঠ হচ্ছে 'ঈগো আইডিয়াল' ও 'কন্‌স্তেনস'।

পিতামাতা পুরস্কার-তিরস্কার দিয়ে শিশুর মনের মধ্যে আদর্শসৃষ্টি করেন। এ পুরস্কার-তিরস্কার শারীরিকও হতে পারে, মানসিকও হতে পারে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে মা আদর করেন, বাবা রঙীন খেলনা কিনে দেন—এটা শারীরিক পুরস্কার; আর তেমনি জামাকাপড় নোংরা করলে মা বকেন, বাবা মারেন—এও শারীরিক শাস্তি বা তিরস্কার। মানসিক পুরস্কার বা তিরস্কার হচ্ছে বাবা-মা'র প্রশংসা বা বিরক্তি। শিশু বোঝে, যেখানে পুরস্কার বা প্রশংসা পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে আছে ভালোবাসা,—বাপ-মাকে সে নিবিড়তর করে পাচ্ছে। আর যেখানে তিরস্কার বা শাস্তি, সেখানেই সে বোঝে, পিতা-মাতার ভালবাসা থেকে সে বঞ্চিত হচ্ছে। এতে তার শিশুমন ভীত ও উদ্বিগ্ন হয়। শিশুর জীবনে এই ভালোবাসার মূল্য অপরিসীম, কারণ ভালোবাসার বস্তুর সঙ্গে জড়িত তার জীবনের মৌলিক প্রয়োজন। মা ভালো, কারণ মা-ই যুগিয়ে থাকেন শিশুর খাদ্য। যতক্ষণ মা'র ভালোবাসা সে পাচ্ছে ততক্ষণ তার খাদ্য সম্বন্ধে সে নিশ্চিন্ত। কিন্তু মা রাগ করলে সে উদ্বিগ্ন হয়, তার শিশুমন ভীত হয়,—তার খাদ্যের যোগান বুঝি বন্ধ হয়ে গেল। এ দুই-ই তার কাছে সমার্থবাচক। তাই যে শিশুরা মায়ের বুকের দুধ যথেষ্ট পায় না, তাদের পর-বর্তী জীবনে মানসিক বিকারের সম্ভাবনা বেশী। মায়ের বুকের দুধ যদি যথেষ্ট না মেলে, তখনই সে মনে করে মায়ের ভালোবাসা সে হারাচ্ছে, মা তাকে সরিয়ে দিচ্ছেন (rejectance)।

পিতামাতার যেমন আছে পুরস্কার-তিরস্কারের ক্ষমতা, তেমনি অধিশাস্তারও আছে সে ক্ষমতা। শিশুর ব্যক্তিত্ব-বিকাশে এই ক্ষমতা অনেকখানি প্রভাব-বিস্তার করে। ব্যক্তির ক্রিয়ার দায়িত্ব অহং-এর। অধিশাস্তা এই অহংকে দায়ী করে কর্মের নৈতিক ফলাফলের জন্যে। অধিশাস্তার শাস্তি বা পুরস্কারকেই বলি ব্যক্তির নিজের কাজের জন্য গর্ব বা অনুশোচনা। শুধু যে কৃতকর্মের জন্যই অধিশাস্তার তিরস্কার-পুরস্কার মেলে তা নয়, কোন কাজের ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা, তা কার্যে পরিণত না হলেও, তার বিচার করে। অধিশাস্তা বা সামাজিক নীতি-বুদ্ধি ব্যক্তির মনের অতন্দ্র প্রহরী। তাই অন্যায় চিন্তা করলেও, পরো

অনুশোচনা জাগে। এখানে অদসের সঙ্গে অধিশাস্তার মিল আছে, বাস্তব জগৎ ও চিন্তাজগতের পার্থক্য তাদের কাছে অবর্তমান। অন্যায় কাজ ও অন্যায় চিন্তা, দুই-ই আমাদের সামাজিক বিবেকবুদ্ধির চোখে সমান গর্হিত।

পিতামাতার যেমন দৈহিক বা মানসিক দুই উপায়েই শাস্তি বা পুরস্কার দেবার ক্ষমতা আছে, অধিশাস্তারও তাই আছে। ভালো কাজ করার পরে অধিশাস্তা যেন খুশী হয়ে বলে, "বাহবা, বেশ, বেশ,—পুরস্কার-স্বরূপ এবার খানাপিনা-ইন্দ্রিয়, সম্ভোগের অনুমতি দেওয়া গেল।" আর অন্যায় কাজ করলে অধিশাস্তা যেন চোখ রাঙিয়ে বলে, "সমাজবিধি অমান্য করেছ, মনের খচ্‌খচি ভোগ কর, দৈহিক শাস্তিভোগ কর, দুর্ঘটনায় পড়ে বিব্রত হও।" এর থেকেই ফ্রএড্‌ বিস্ময়কর সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, দৈহিক রোগভোগ, দুর্ঘটনা, জিনিস হারানো ইত্যাদি আকস্মিক নয়। এর পশ্চাতে কাজ করছে মানুষের অধিশাস্তার তাড়না। একটি যুবক একটি মেয়ের সঙ্গে অবৈধ যৌন-সম্পর্ক স্থাপন করার পর নিজের দামী মোটর গাড়ীখানা চালিয়ে বাড়ী ফেরার পথে বিষম দুর্ঘটনায় পতিত হয়—তার গাড়ীখানা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। এটি একটি মাত্র বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ফ্রএড্‌ ভূরি ভূরি উদাহরণ পরীক্ষা করে দেখেছেন, বাস্তব বা কল্পিত পাপবোধ বহু ক্ষেত্রেই গুরুতর অসুস্থতা বা দুর্ঘটনার নিয়ত পূর্ববর্তী ঘটনা। ফ্রএড্‌ এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন তাঁর বহুজন-পঠিত বিখ্যাত 'সাইকোপ্যাথোলজী অব্‌ এভ্‌রিডে লাইফ' গ্রন্থে। দৈহিক পুরস্কার-তিরস্কার যেমন আছে, তেমনি আছে মানসিক পুরস্কার ও তিরস্কার। ভালো কাজ করলে মনের মধ্যে গর্ববোধ হয়, নিজেকে আরো ভালোবাসি। অন্যায় কাজ করলে তেমনি ভোগ করতে হয় বিবেকবৃশ্চিকের দংশন। উদ্দেশ্য সর্বত্রই হচ্ছে, ব্যক্তির কার্যকে সমাজানুগ করা। অধিশাস্তা হচ্ছে ব্যক্তির মনের মধ্যে সমাজের পুলিশী শাসন।

পিতামাতার মতামতই শুধু শিশুর নীতিবোধকে গঠন করে না। গুরুজন শিক্ষক, ধর্মযাজক, পুরোহিত সকলেই সমাজের প্রতিনিধি—তাঁরাও পিতা-মাতার মতো শিশুর নীতিবুদ্ধিকে, তার অধিশাস্তাকে প্রভাবিত করেন। অবশ্য সর্বক্ষেত্রেই শিশুর মনের ওপর প্রথম প্রভাব পিতামাতার, অন্যান্য আর সকলেই পিতামাতার স্থলবর্তী।

অধিশাস্তার কাজ হচ্ছে মানুষের সেই সমস্ত প্রবল প্রবৃত্তির সংযম, যাদের

বাধা না দিলে, সমাজের নিরাপত্তা বা সংহতি বিঘ্নিত হতে পারে। এই প্রবৃত্তির একটি হচ্ছে যৌনাকাঙ্ক্ষা, আর একটি কৌতূহল। যে শিশু অবাধ্য, বিদ্রোহী বা অতিমাত্রায় সব বিষয়ে কৌতূহলী, সে সভ্যসমাজের পক্ষে বিঘ্ন। এমন শিশুকে বলা হয় দুষ্ট বা মন্দ বা 'এঁচড়ে পাকা'। বড়রা যদি যৌনজীবনে অসংযত হয়, যদি সমাজব্যবস্থাকে না মানতে চায়, তাহলে তারাও এই সামাজিক বিচারকর্তা দ্বারা নিন্দিত হন। যা বাইরের শাসন, ব্যক্তির ভিতরে অধিশাস্তা তারই প্রতিফলন। এই অধিশাস্তা ব্যক্তির আত্ম-সংযমের শক্তি। কিন্তু অধিশাস্তার বিচার অনড়, বালসুলভ ও নির্মম। কখনো কখনো তা স্বচ্ছ যুক্তিবিরোধী।

অদস্ হচ্ছে জীবজগতে অভিব্যক্তির প্রথম স্তর। এ হচ্ছে ব্যক্তির মৌলিক জৈবশক্তির মানসিক প্রতীক। অহং হচ্ছে অভিব্যক্তির দ্বিতীয় স্তর, জীবের দেহ ও বাহ্য পরিবেশের পরস্পর সংঘাত ও সহযোগিতার ফল—এর থেকে উদ্ভব উচ্চতর মানসিক প্রক্রিয়াসমূহের। অধিশাস্তা হচ্ছে তৃতীয় স্তর—এ হচ্ছে ব্যক্তির মনে সমাজের আদর্শ ও শাসনকে মেনে নেওয়ার স্বীকৃতি।

একথা মনে করা অবশ্য ভুল হবে, যে সত্যই মানুষের মানস-জগতে তিনটি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন কক্ষ আছে। সমগ্র ব্যক্তিত্ব একটি অখণ্ড একক সত্তা। কিন্তু এ সত্তা নিষ্ক্রিয় নয়, সদা ক্রিয়াশীল, বিকাশমান। এই ক্রিয়াশীল জীবন্ত ব্যক্তিমানসের বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে নাম দেওয়া হয়েছে, 'ঈদ্' 'ঈগো' 'সুপার-ঈগো'—অদস্ অহং অধিশাস্তা।

প্রাথমিক আদিম জৈবশক্তি অদস্ থেকেই জন্ম হয় বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন অহং-এর আর অহং-এরই সমাজজীবনের প্রভাবে পরিণতি হচ্ছে বিবেকবুদ্ধি-সম্পন্ন অধিশাস্তায়। মানুষের সমগ্র জীবনব্যাপী চলে এসেছে এই ত্রিধারার মিলন ও বিরোধ। এই তিন শক্তির সুসমন্বয়েই সুস্থ ব্যক্তিত্ব। যেখানে এই শক্তিগুলির মধ্যে পরস্পর অমীমাংসিত বিরোধ সেখানেই দেখা যায় মানসিক বিকার।

মনোবিকলকের চোখে ব্যক্তিত্বের বিকাশের ধারা

মনোবিকলন বিংশ শতাব্দীর মনোবিদ্যার চিন্তায় একটি প্রচুর সম্ভাবনাপূর্ণ অভিনব মতবাদ। এই মতবাদ মনোবিদ্যাবিষয়ক চিন্তা সম্পূর্ণ নূতন এক

দৃষ্টিভঙ্গী সূচনা করে। মনোবিকলন বলতে একটি সামগ্রিক মতবাদ যেমন বোঝায়, তেমনি একটি চিকিৎসা-বিষয়ক পদ্ধতিও বোঝায়। এই মতবাদের পশ্চাতে আছে ফ্রএড-এর বহুবর্ষ (১৮৫৬-১৯৩৯) ব্যাপী সাধনার দ্বারা গ্রথিত এক সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গী বা দর্শন। এই সমগ্র মতবাদযদিও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের ভিত্তিতে (on experimental basis) গড়ে ওঠে নি, তথাপি মানসিক রোগীদের চিকিৎসায় আবেশ (hypnosis) ও অভিভাবনের (suggestion) সাফল্যের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি খুঁজতে গিয়েই ফ্রএড্ এই সামগ্রিক মতবাদের সুগঠিত হর্ম্যটি রচনা করেছেন। কাজেই এই মতবাদ নিতান্তই পুঁথিগত (academic) বিশুদ্ধ চিন্তার ফল নয় (not the result of pure abstract thinking)। মনোবিকলন-পদ্ধতির ব্যবহারই এসেছে আগে, ক্রমে ধীরে ধীরে মনোবিকলনরূপ দৃষ্টিভঙ্গী ও মতবাদ গড়ে উঠেছে। তাই ফ্রএড-এর চিন্তাকে সম্পূর্ণ অ-বৈজ্ঞানিক বলে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই। দীর্ঘকাল যাবৎ মানসিক রোগের চিকিৎসার অভিজ্ঞতা এবং নিবিড় চিন্তা এই সামগ্রিক মতবাদের পেছনে রয়েছে এবং ফ্রএড-এর বৈজ্ঞানিক সততা তাঁকে এই মতবাদের মৌলিক কাঠামোর বহু পরিবর্তন এবং সংশোধনে স্বতঃই প্রবৃত্ত করেছে।

ফ্রএড-এর মতে সমস্ত জৈবক্রিয়ার পশ্চাতে এক মৌল শক্তি ক্রিয়া করছে। এই শক্তি জড় বা দৈহিক শক্তি থেকে পৃথক এক অন্ধ মনঃশক্তি (psychic energy)। জীবনের সমস্ত পুষ্টিক্রিয়া, আকাঙ্ক্ষা, চেতনা ও উদ্যমের মূলে আছে এই শক্তির বেগ। এই শক্তি সম্বন্ধে মনোবিকলনের পদ্ধতি ব্যবহারের দ্বারা (এ পদ্ধতি দ্বারাই এর স্বরূপ সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা গঠন করা সম্ভব) আমরা যতদূর জানতে পারি তা হচ্ছে এই যে, এ শক্তি যোনিকেন্দ্রিক। তাই এই মৌলশক্তিকে ফ্রএড্ নাম দিয়েছেন আদিম কাম (Eros বা Libido)। এটি জীবনের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল সহজ প্রবৃত্তি—ফ্রএড-এর জার্মান ভাষায় লিখিত মূল গ্রন্থ অনুযায়ী Trieb (ইংরেজীতে এর অনুবাদ করা হয়েছে instinct, তবে আধুনিক মনোবিদ্যার ধারণা অনুযায়ী এই মৌল শক্তিকে impulse বা urge এমন কি drive বলাই বেশী সঙ্গত হবে)। গোড়ার দিকে ফ্রএড জীবনের কামশক্তির বিপরীত মৃত্যুর অন্ধ সংস্কারকেও (death-instinct) এর অনুষঙ্গী হিসাবে স্বীকার করেছিলেন। এই প্রকার বিপরীত দুই অনুষঙ্গী শক্তির কল্পনা আমরা ফ্রএড-এর চিন্তায় আরো অনেক দেখতে পাই (যথা conscious-unconscious সংজ্ঞান-নির্জ্ঞান; id-ego অদস্-অহং; pleasure

principle-reality principle—অন্ধ-সুখ আকাঙ্ক্ষা-বাস্তব জগতের স্বীকৃতি ও শাসন)।

জীবনের মৌল শক্তিকে ফ্রএড প্রথম দিকে সংকীর্ণ অর্থেই যোনিকেন্দ্রিক বলে বিশ্বাস করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আদিম কাম বা libido-র বিশেষ প্রবৃত্তি হচ্ছে যোনিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কামাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি। পরে অবশ্য তিনি আদিম কামের আকাঙ্ক্ষাকে যোনিক্রিয়ায় আবদ্ধ না রেখে সমস্ত প্রকারের স্নেহ ভালবাসা প্রেম প্রীতি শ্রদ্ধায় বিস্তৃত করে দেখেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে আদিম কামের বিস্তার, সংস্কার বা উদ্গতি (sublimation) সম্ভব হলেও তার নিজস্ব বিশেষত্ব হচ্ছে যোনিক্রিয়ার মাধ্যমে কামাকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি।[১] এই আদিম কামের মধ্যেই রয়েছে সমগ্র ব্যক্তিত্বের ভবিষ্যৎ বিকাশের সম্ভাবনা। এই শক্তি সকল ব্যক্তির মধ্যেই নির্দিষ্ট পরিমাণে আছে। এ দিয়েই মূলত ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে প্রভেদ। এই শক্তি কোন্ দিকে প্রবাহিত হয় এবং কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, তা-ই ব্যক্তির মানসিক সুস্থতা-ও অসুস্থতা-নির্ধারণ করে। এই বিষয়ে তাঁর অনুগামীদের মধ্যে অ্যাড্লার ও য়ুঙ্গ তাঁর মতকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারেন নি। মনো-বিকলনবাদী'দের চিন্তায় অ্যাড্লার ও য়ুঙ্গ নূতনত্ব এনেছেন এবং আদিম কামের ধারণাকে পরিশুদ্ধ করেছেন। অ্যাড্লার বলেছেন, জীবনের আদিম শক্তি যোনিজ কাম নয়, হীনমন্যতা ও পাপবোধ (consciousness of inferiority and guilt) অতিক্রম করে 'বড়' হবার আকাঙ্ক্ষা। এই সংঘাতই

[১] The energy of the life instinct or Eros is called libido. Perhaps the most fundamental psycho-analytic concept is that every person has only a limited store of this energy. The strength of libido, its nature, and the channels into which it flows are the prime factors in determining personality and in distinguishing between normality and neurosis. The libido is entirely mental or psychical energy, not synonymous with nutrition, appetite, or any physiological, chemical, or physical energy. Although the libido represents all life forces, Freud···held that a large and important part of libido may be viewed as the source of the sexual urge. The term "sexual" is employed both in a broader and narrower sense than in popular speech... Freud wrote that it includes everything ordinarily understood by the term "love" including self-love, love of parents, and love of mankind. In spite of this broad meaning, libido is also narrowly sexual, its aim being sexual union. Shaffer & Shoben—The Psychology of Adjustment, pp. 449-50

জীবনের সমস্ত উদ্যমকে বেগবান করে। য়ুঙ্গ অন্যদিকে বললেন, জীবনের আদিম শক্তি শুধু কামাকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিতে নয়, তা বহু ব্যাপক। জীবনের সমস্ত চিন্তা অনুভূতি ও ইচ্ছা, এক কথায় সমস্ত সক্রিয়তায় সেই এক আদিম শক্তির প্রকাশ। সমস্ত সচেতন ক্রিয়ার ওপরে রয়েছে সেই অদৃশ্য আদিম শক্তির প্রকাশ। এ আদিম শক্তিকে স্বীকার না করলে সমস্ত সচেতন ক্রিয়ার ব্যাখ্যা কেবলমাত্র অনুষঙ্গের সূত্র দিয়ে করা যায় না। ফ্রএড্ য়ুঙ্গ-কে ব্যক্তিগতভাবে হিংস্র আক্রমণ করলেও, এটা তাঁর বৈজ্ঞানিক সততার পরিচয় যে তিনি য়ুঙ্গ-এর মত অনেকটাই গ্রহণ করেছিলেন। যদিও পূর্বেই বলেছি যে তিনি শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করেছিলেন যে আদিম শক্তি মুখ্যত যোনিকেন্দ্রিক, পরবর্তীকালে তিনি আদিম জৈবশক্তিকে কাম (Eros বা libido) না বলে নপুংসক লিঙ্গ Id (das Es = the It) নাম দিয়েছিলেন। এর থেকেও বোঝা যায় তিনি য়ুঙ্গ-এর মত দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

এই আদিম শক্তি সতত সক্রিয়। জন্ম থেকেই এ শক্তি ক্রিয়াশীল এবং এই শক্তিই শিশু, কিশোর এবং প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রত্যেকের আচরণ বা ব্যবহার নির্দিষ্ট করে দেয়। অবশ্য শৈশবে এই শক্তি কেন্দ্রীভূত নয়—তা ছড়িয়ে থাকে সমস্ত আবেগ ও উদ্যমে। এই কামশক্তি যখন ব্যক্তির নিজের দিকেই ধাবিত হয় তখন তা হয় আত্মরতি (narcissism)।[২] সাধারণত এই কাম বাইরের কোন বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি (object-love) অর্পিত হয়। কখনো বা কাল্পনিক অবাস্তব চিন্তায় আত্মপ্রকাশ করে (introversion), আবার কখনো বয়স্ককালেও শৈশবের কামবস্তু পিতামাতায় অতিরিক্ত আকর্ষণ-রূপে (fixation) দেখা দেয়। এই শক্তিই অপ্রতিরোধ্য বাধা ও সংঘাতের সম্মুখীন হয়ে বয়স্ক ব্যক্তির শিশুসুলভ ব্যবহারে (regression) দেখা যায়। সমাজের কথিত বা অকথিত নিন্দার ফলে এ শক্তির স্বাভাবিক প্রকাশ রুদ্ধ (repression) হতে পারে; অথবা অপরিতৃপ্ত কাম, সমাজসেবা দেশপ্রেম সাহিত্য বিজ্ঞান -চর্চায় উন্নতিলাভ (sublimation) করতে পারে। অর্থাৎ সুস্থ ও অসুস্থ সমস্ত মানসিক ক্রিয়ার মধ্যেই আদিম কামের বিচিত্র প্রকাশ দেখা যায়।

২ Narcissism: extreme self-love; regarded by psychoanalysts as an early phase of psycho-sexual development, where the sexual object is the self-persisting or representing a regression in the narcissistic type of individual. Drever—A Dictionary of Psychology, p. 177

ব্যক্তিমানসের ত্রিতল—অদস্-অহং-অধিশাস্তা

ফ্রএড-এর প্রথম দিকের চিন্তায় তিনি মনের দুইটি তলের (নির্জ্ঞান ও সংজ্ঞান) উল্লেখ করেছিলেন। বয়স্ক মানুষের সামান্য অংশই অধিকার করে আছে সচেতন স্পষ্ট সংজ্ঞান। সাধারণ মনোবিদ্যায় মানুষের মনের এই সচেতন অংশ (প্রত্যক্ষণ স্মৃতি চিন্তন প্রক্ষোভ ইচ্ছা উদ্যম ইত্যাদি) নিয়েই আলোচনা। এই সচেতন মনেও সর্বদা পরিবর্তন চলছে—যা ছিল মনোযোগের কেন্দ্রে, তা সরে যাচ্ছে; আবার যা ছিল চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে, তা মনোযোগের কেন্দ্রস্থল অধিকার করছে। চেতনার কিছু উপাদান আসছে বহির্জগৎ থেকে, কিছু বা আসছে মনের অবচেতন বা অন্তর্জ্ঞান (sub-conscious) স্তর থেকে। এরই যে স্তর বিস্মৃতির আবছায়ায় ম্লান অথচ অল্প চেষ্টাতেই মনের সামনে উপস্থিত হয়ে থাকে, তাকে ফ্রএড বলেছিলেন fore-conscious বা pre-conscious।

কিন্তু মনের বৃহত্তর অংশ হচ্ছে অবচেতন বা নির্জ্ঞান স্তর। (কেউ কেউ এই স্তরকে বলেছেন unconscious, আবার কেউ বা ফ্রএড-এর ভাষার অনুবাদ করেছেন sub-conscious। আমরা ফ্রএড-এর মতানুযায়ী মনের সর্বনিম্ন, বৃহত্তর ও সর্বপ্রধান স্তরকে নির্জ্ঞান বা unconscious-ই বলব। অন্তর্জ্ঞান বা sub-conscious কথাটি আমরা পূর্ণ চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে কল্পিত অস্পষ্ট চেতন অংশকে বোঝাতেই ব্যবহার করব। ফ্রএড-এর fore-conscious বা pre-conscious স্তর এই sub-conscious-এরই অন্তর্গত। এ সম্বন্ধে 'অবচেতনবাদ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। শিশুর মনের অনেকখানিই জুড়ে আছে এই নির্জ্ঞান স্তর। বয়স্ক ব্যক্তির মনেও এটি বৃহত্তর অংশ। যদিও ব্যক্তি এর অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন নয়, তথাপি ব্যক্তির সচেতন ক্রিয়ার অনেকটা অংশই এই নির্জ্ঞান স্তর -দ্বারা প্রভাবিত। বাস্তবিক পক্ষে নির্জ্ঞান মনেই খুঁজতে হবে ব্যক্তিত্বের মূল। নির্জ্ঞান মনের ক্রিয়া শিশুসুলভ, বিশৃঙ্খল, অ-যুক্তিনিষ্ঠ, অ-নৈতিক। নির্জ্ঞান মনের উপাদান দুই প্রকারের: (১) যে সমস্ত প্রক্রিয়া কোন দিন চেতন-মনে এসে উপস্থিত হয় নি, আর (২) যে সমস্ত ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তির সামাজিক ও নৈতিক চেতনা দ্বারা ধিকৃত হয়ে চেতন স্তরে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত। এই অবদমিত (repressed) প্রবল কামেচ্ছাগুলিই নির্জ্ঞান মনে অধিক স্থান দখল করে আছে।

নির্জ্ঞান মনে তাই চিন্তা-ধারণার চেয়ে প্রক্ষোভ ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার প্রাধান্য।

অদসের প্রকৃতি

ফ্রএড্ যাকে বলেছেন আদিম কাম বা অদস্ (Id), তার বাস এই অন্ধকার স্তরে। এই স্তর চেতনার আলোকিত স্তর থেকে নির্বাসিত। বাহ্যজগতের সঙ্গে তার যোগ নেই, সমাজচেতনার ধার সে ধারে না। এই অদস্ হচ্ছে ছেলেমানুষের মতো একরোখা, জেদী, আবদেরে; সে কেবল বলে 'আমি চাই', 'আমি নেব'। অদসের এই অন্ধ আকাঙ্ক্ষার পেছনে কোন যুক্তি নেই। সে অবিমিশ্রভাবে স্বার্থপর, সে যে-কোন মূল্যে নিজ অন্ধ অনিয়ন্ত্রিত আকাঙ্ক্ষার তাৎক্ষণিক তৃপ্তি খোঁজে। সে পরের স্বার্থ, পরের সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তা করে না। তার সবুর সয় না, সে বাধা মানে না। অদসের সমস্ত আকাঙ্ক্ষাই হচ্ছে স্থূল এবং (ফ্রএড-এর মতে) যোনিকেন্দ্রিক।[৩]

অদসের বিশেষত্ব হচ্ছে সে নির্লজ্জভাবে সুখ কামনা করে এবং দুঃখ এড়াতে চায়। এই জন্যে এই অদস্‌কে pleasure principle বলা হয়েছে। কিন্তু সচেতন ব্যক্তিমানস বা অহং (Ego) যুক্তিনিষ্ঠ, সে বাস্তব জগতের বাধাকে স্বীকার করে, নিজ আকাঙ্ক্ষাকে বাহ্যজগতের অপ্রতিবোধ্য দাবি মেনে নিয়ে নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং অহংকে বলা হয়েছে—reality principle। এক হিসাবে অহং হচ্ছে অদসের বিরোধী। অদস তার অন্ধ আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তির জন্যে অন্যকে যেমন দুঃখ দিতে, পীড়ন করতে প্রস্তুত (sadism), তেমনি নিজের ক্ষতি করতেও পশ্চাৎপদ নয়। দৈহিক দুঃখ, বেদনা, আঘাত সম্বন্ধে অদসের দৃষ্টিভঙ্গী শিশু বা আদিম অসভ্যদের মতোই নির্মম। নিজ আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তির জন্যে সে শত্রুকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করতে নির্দ্বিধায় প্রস্তুত। এমন কি নিজ অহংকার-পরিতৃপ্তির জন্যে সে নিজের দেহের আঘাতকেও উপেক্ষা করে। হেরে যাওয়ার চেয়ে রক্তাক্ত আঘাত অসভ্য গুহাবাসীর কাছে অনেক কাম্য। যারা মানসিক অসুস্থ, তারা অদসের যুক্তিহীন আকাঙ্ক্ষার স্বাভাবিক পরিতৃপ্তিতে বাধা পেলে বিকল্প প্রতীকের (substitute symbols) মধ্য দিয়ে কাম

৩ To quote Ernest Jones, the main attribute of the id or unconscious is a "never-ceasing demand for immediate gratification of various desires of a distinctly lowly order and literally at any price". Jones—Papers on Psycho-Analysis (1923), p. 3

আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি খোঁজে। ফ্রএডপন্থীদের মতে স্বপ্ন এপ্রকার প্রতীকের সাহায্যে ইচ্ছাপূরণের উপায়। মূর্ছারোগ (conversion hysteria) ইত্যাদি মানসিক ব্যাধিতে আমরা দেখেছি অবাঞ্ছিত অবস্থা এড়াবার জন্যে ব্যক্তি কতকগুলি দৈহিক রোগ নিজ দেহে ডেকে আনে (যেমন সাময়িক অসাড়তা, অন্ধতা ইত্যাদি)।[৪]

অহং-এর উৎপত্তি ও স্বরূপ

অদস্ স্তরে শিশুর আকাঙ্ক্ষা নির্লজ্জ ও নির্বোধ। তার চিন্তায় তখনোও বহির্জগত ও সমাজ-পরিবেশের অস্তিত্বই নেই। কিন্তু শিশু যতই বড় হতে থাকে, ততই তার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার ফলে অন্যের প্রয়োজন এবং অন্যের মতামতের সঙ্গে বিরোধ শুরু হয়। তার অনেক ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা বাধাপ্রাপ্ত হয়, অনেক আকাঙ্ক্ষা নিন্দিত হয়। অর্থাৎ অন্ধ অদস চিন্তা ও বিবেচনা করতে বাধ্য হয়। তখন শিশু বুঝতে শেখে যে, সে যেমন খুশী তেমনভাবে চলতে পারে না, সে বাস্তব জগতের অস্তিত্বকে (reality principle) স্বীকার করতে আরম্ভ করে। এ-ও সে বুঝতে শেখে যে সমাজে তার একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে, সে সমাজের দশজনের মধ্যে বাস করে, তার একটি বিশিষ্ট সামাজিক অস্তিত্ব আছে, তাকে অন্যে একটি নির্দিষ্ট নাম ধরে ডাকে, কতকগুলি নির্দিষ্ট ব্যবহার তার কাছে দাবি করে, কতকগুলি বাধা-নিষেধ তাকে মেনে চলতে হয়।

৪ The outstanding characteristic of the baby is a primitive and ruthless egoism: he blindly pursues his own instinctive satisfaction, regardless of the claims, the comfort, or the convenience, of any one else...The sub-conscious mind of the adult is chiefly concerned with the satisfaction of the sex, self-assertive and aggressive impulses—these being the instincts that are most strongly repressed in adult life. But the sub-conscious mind pursues its ends in the same ruthless and intemperate fashion as the baby.

...The sub-conscious mind is not only a-moral; it is also supremely irrational. It has no more idea than the baby of counting the cost of anything it wants, and it will purchase immediate satisfaction with its own suffering as with that of others. Its attitude towards pain resembles that of the savage, to whom loss of "face" is far more abhorrent than physical suffering. This helps to explain a fact that is sometimes found puzzling: namely, the conversion hysteria so often takes physically painful forms.

Rex & Margaret Knight—A Modern Introduction to Psychology, pp. 240-42.

অর্থাৎ অদস স্তরের অন্ধ নির্বোধআকাঙ্ক্ষার পরিবর্তে,যুক্তি-বুদ্ধি-বিচার-বিবেচনা--দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিশিষ্ট সামাজিক অধিকার-যুক্ত অহং-এর (ego) ধারণা পরিপুষ্ট হতে থাকে। অহং নিজেকে বাহ্য জগৎ এবং সমাজের অন্য দশজনের সঙ্গে যুক্ত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের থেকে বিপরীত ও পৃথক হিসাবে, ব্যক্তি হিসাবে চিন্তা করতে শেখে। সেই সঙ্গে সঙ্গে অদসের আদিম কামাকাঙ্ক্ষা যে নিশ্চিহ্ন হয়ে অবলুপ্ত হয়ে যায়, তা নয়। তা অহং-এর বিচারবুদ্ধি ও নৈতিক চেতনার দ্বারা নিন্দিত হয়ে এবং বাধাপ্রাপ্ত হয়ে, প্রকৃত নির্জ্ঞানের পরিধিকে পুষ্ট করতে থাকে। কাজেই দেখা যায়, ব্যক্তির শৈশব থেকে ক্রমবিকাশের ধারায় আদিম অদস একটি নির্জ্ঞান (unconscious) এবং আর একটি সংজ্ঞান (conscious) এই দুই পরস্পরবিরোধী অথচ সতত পরস্পরযুক্ত দুই স্তরে বিভক্ত হয়ে যায়। এই বিরোধিতা-সহযোগিতার মধ্যেই রয়েছে ব্যক্তিত্ব-বিকাশের রহস্য। অদস ও অহং-এর এই বিরোধিতা-সহযোগিতার সম্বন্ধের রূপ (pattern of opposition and co-operation) বিভিন্ন ব্যক্তিতে-বিভিন্ন। এই হচ্ছে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে বিভিন্নতার মূল কারণ। অহং-এর মধ্যেও নির্জ্ঞান মন ক্রিয়া করে (বিশেষত শৈশব-কৈশোরে), কিন্তু তা কিছু পরিমাণে অদসের অন্ধ কামাকাঙ্ক্ষাও শাসন ও সংযত করে (বয়স্ক ব্যক্তিতে)।

অধিশাস্তার আবির্ভাব

গোড়ার দিকে ফ্রএড মনের, দুটি বিপরীত স্তর—সংজ্ঞান ও নির্জ্ঞান—স্বীকার করেছিলেন এবং এই দুই-এরসংঘর্ষ ও সহযোগিতারদ্বারা সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু চিকিৎসা-ব্যাপারে যতই তাঁর অভিজ্ঞতা বাড়তে লাগল, ততই তিনি দেখতে পেলেন যে, সংজ্ঞান ও নির্জ্ঞান এই দুই বিপরীত ধারণা ব্যাখ্যার সূত্র হিসাবে যথেষ্ট নয়। ফ্রএড প্রথম দিকে মনে করেছিলেন যে অদসের অপ্রতিরোধ্য অসামাজিক আকাঙ্ক্ষা-গুলিকে অহং-এর যুক্তিসিদ্ধ মনই শাসন ও সংযত করে (censor)। এই শাসনের ফলে অসামাজিক অবাঞ্ছিত কামনাগুলি অবদমিত হয়ে নির্জ্ঞানের অন্ধকার গুহায় নির্বাসিত হয়। কিন্তু ফ্রএড ক্রমেই বুঝতে পারলেন যে এই অবদমনের ব্যাপারটা শুধুমাত্র নির্জ্ঞান অদস এবং সংজ্ঞান অহং-এর বিরোধ দিয়ে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হয় না। অবদমনটা যদি সম্পূর্ণই সংজ্ঞান বুদ্ধিচালিত অহং-এর কাজ হয়, তবে তা ব্যক্তির সচেতন নিয়ন্ত্রণাধীন। এবং যখন ব্যক্তি

বুঝতে পারবে অবদমনের কুফলেই তার নানা মানসিক উদ্বেগ অশান্তি ইত্যাদি বিশৃঙ্খলা, তখনই সে সচেতন ইচ্ছা দ্বারা তার অবদমিত ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে সংজ্ঞান মনের সামনে এনে মুক্তি দিয়ে, নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাময় করে তুলতে পারবে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে দেখা যায় তা হয় না। **সংজ্ঞান অহং-এর মধ্যেই রয়েছে এই বাধার মূল।** অহং নিজেই জানে না শৈশবের অবদমিত যে লজ্জাকর বা বেদনাদায়ক আকাঙ্ক্ষা তা কেন সে চেষ্টা করেও স্মরণ করতে পারছে না। এই স্মৃতির পুনরুদ্ধার হলে ব্যক্তি মানসিক অশান্তি থেকে মুক্তিলাভ করবে, এটা তো সে জানে। অদস তো সুখই চায়—কাজেই এই স্মৃতির পুনরুদ্ধারে যে বাধা, তা অদসের কাছ থেকে আসছে না—আসছে অহং-এর মধ্যেই নির্জ্ঞান কোন অংশ আছে, তার থেকে। সুতরাং ফ্রএড নির্জ্ঞান 'অদস' এবং সংজ্ঞান 'অহং' ছাড়াও ব্যক্তিমনে অবস্থিত সামাজিক শাসনের প্রতীক 'অধিশাস্তা' (Super-ego) -রূপ তৃতীয় সত্তা স্বীকার করলেন।[৫] অধিশাস্তা অদসের মতোই বহুলাংশে নির্জ্ঞান। এর কাজ হচ্ছে প্রধানত অদসের অসামাজিক ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার ওপর খবরদারী করা (censor)। অধিশাস্তার বিচার-শাসন কিন্তু যুক্তি-নির্ভর ও সচেতন নয়, তা শিশুসুলভ, খামখেয়ালী ও অতিমাত্রায় কঠোর।[৬] অধিশাস্তার নৈতিক

৫ In the course of time, however, the child's blind strivings come into conflict with obstacles which cause frustration or pain; the 'ego' begins to emerge from the "it" as the child becomes aware of his own existence.

...The child learns through parental discipline, and other hard experience, that he cannot use the world as he will. This is the emergence of the "reality-principle". Moreover the words in training the child include many which refer to him, e.g., his own name and the various pronouns which are applied to him. Words referring to him as an individual becomes associated with one another and tend to be regarded as somet ing marking him off as a *social being*, in contrast to the blind instinctive strivings against which his family offers so much resistance. In this way the original id (it) becomes split into two parts, one remaining on a primitive instinctive basis, the other becoming the socially approved and recognized self or ego. Murphy—A Briefer General Psychology, pp. 500-1

৬ But as Freud's clininal work continued, it became clear this that original formulation was too simple. If all the repressing forces were part of the conscious mind, they would presumably be under conscious control, and once a patient had been enlightened about the evils of repression he would be able to cease repressing, and to bring buried memories and feelings

বিচারের মূল কতকাংশে জন্মগত। ওর কতকটা শিশু তার পিতামাতার অনুকরণ দ্বারা আয়ত্ত করে (identification)। অহং-এর চেয়ে অধিশাস্তা অদসের অসামাজিক ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে অধিকতর সতর্ক ও সচেতন। অধিশাস্তা হচ্ছে অন্ধ কঠোর নীতিবাগীশ। অধিশাস্তার প্ররোচনাতেই অহং অদসের অসামাজিক আকাঙ্ক্ষাগুলিকে অবদমিত করে। কাজেই এ কথা বলা হয়েছে যে অধিশাস্তা অদসের সঙ্গে সতত যে সংগ্রামে রত, তার যুদ্ধক্ষেত্র হচ্ছে অহং।[৭]

বাস্তবিক পক্ষে, অদসের মতো অধিশাস্তাও শৈশবের নির্জ্ঞান মনেরই এক উপাদান, যার চিহ্ন সংজ্ঞান অহং-এও বাহিত হয়েছে। শৈশবের নিতান্ত অসংস্কৃত বিচারবিহীন অন্ধ প্রাথমিক নীতিবোধের নামই হচ্ছে অধিশাস্তা। শিশুর ন্যায়-অন্যায়ের অস্পষ্ট বোধ কিছুটা জন্মগত আর অনেকটাই হচ্ছে পিতা-মাতার অনুকরণে, অথবা পিতামাতার সঙ্গে শিশুর তাদাত্ম্যের ফল। শিশু পিতামাতার কাছে শোনে কতকগুলি কাজ 'ন্যায়', কতকগুলি কাজ 'অন্যায়'। এগুলি তার কাছে অর্থহীন নাম মাত্র। সে যেমন বোঝে না কেন কতকগুলি প্রাণীকে 'ঘোড়া', আর কতকগুলি প্রাণীকে 'গাধা' বলা হয়, তেমনি সে বোঝে না কেন কতকগুলি কাজ 'ন্যায়' আর কতকগুলি কাজ 'অন্যায়'। আর শিশুর কাছে বিভিন্ন গোরুর মধ্যে যেমন কোন মাত্রাভেদ নেই, তেমনি বিভিন্ন 'অন্যায়ের' মধ্যেও কোন মাত্রাভেদ নেই। অধিশাস্তার নৈতিক বিচার সর্বদাই চরম—হয় ভালো, নয় মন্দ, মাঝামাঝি কিছু নেই। শিশু যখন ক্রমে বড় হয়, তখন বুঝতে শেখে যে সব অন্যায় সমান অন্যায় নয়। সে তখন ন্যায়-

back into consciousness, by an act of will. But in fact he could seldom do anything of the kind. He had no more control over many of the repressing forces than over the tendencies that have been repressing...These facts led Freud to revise his original dualism of conscious and unconscious. He postulated a threefold division into elements which he called the Ego, the Super-ego and the Id. Rex & Margaret Knight—A Modern Introduction to Psychology, pp. 242-43

৭ It (super-ego) is largely unconscious and is more aware of the id's a-moral impulses than is the ego. Hence, the super-ego strives to compel the ego to repress the tendencies of the id. As it is sometimes expressed, the super-ego fights with the id, the ego being the battleground. Shaffer & Shoben—The Psychology of Adjustment, p. 458

অন্যায়ের পরিমাণের প্রভেদ করতে শেখে, সে বুঝতে শেখে যে অবস্থা অনুযায়ী ন্যায় বা অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য হয়। তখন সে অন্যের কাজকে সহগুণ ও সহানুভূতি দিয়ে বিচার করে ক্ষমা করতে শেখে। বিচার-বিবেচনা-যুক্তি-নির্ভর যে নৈতিক বোধ, তা ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশের পরিণত ফল। অধিশাস্তার যে নৈতিক বিচার (?) তা হচ্ছে অন্ধ ও নির্মম। অধিশাস্তা হচ্ছে প্রাক্-বিচার, অন্ধ নৈতিক চেতনা। ক্রমে তা যুক্তিনিষ্ঠ নৈতিক-বিচারে পরিণত হয়।[৮] আবার শৈশব-কৈশোরের অধিশাস্তাও ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশের এক প্রাথমিক স্তর। পিতামাতার সঙ্গে তাদাত্ম্য -দ্বারা তাদের নীতিবোধের মানকে শিশু অনায়াসে নির্বিচারে গ্রহণ করে। কিন্তু এর মধ্যে আরো অনেকখানি অন্য উপাদানও আছে যাকে ফ্রএড বলেছেন introjected aggression। যখন শিশুর কোন কোন আচরণে তার পিতামাতা বাধা দেন— বলেন 'এটা অন্যায়', 'ওটা কোর না', তখনই স্বভাবতই শিশুর মনে পিতামাতার বিরুদ্ধে ক্রোধ ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত হয়। কিন্তু যখন পিতামাতার প্রতি ভালবাসার 'ভাবটি' (sentiment) তার আয়ত্ত হয়, তখন সে মনে মনে বুঝতে শেখে যে তার এই ক্রোধ বা বিদ্বেষ অন্যায় ও তা বিপজ্জনক।[৯] কিন্তু ক্রোধ বিদ্বেষ ইত্যাদি অনুভূতির সংযমন সর্বাপেক্ষা কঠিন। আবার শিশুর পক্ষে পিতামাতার বিরুদ্ধে ক্রোধ বা বিদ্বেষ সোজাসুজি-ভাবে প্রকাশ করা অনেক সময়ই কঠিন। তখন সেই অনুভূতিগুলি অবদমিত হয়। তার ফলে, সেই ক্রোধ বা বিদ্বেষ নিজের দিকেই প্রযুক্ত হয় (introjected), এবং তা হয় যুক্তিহীন আত্মপীড়ন ও নানাপ্রকার পাপবোধের ভিত্তি। শিশু বিশ্বাস করতে আরম্ভ করে, পিতামাতার প্রতি ক্রোধপোষণ করাতে সে তাঁদের ক্ষতি করেছে এবং তার 'পাপ' হয়েছে। এই অকারণ

৮ ...The super-ego consists partly of inherited moralities and taboos and partly of the moral notions acquired by the child from its parents...the function of the super-ego is criticism. The morality of the super-ego was more childish and less enlightened than of the conscious mind. Murphy—A Briefer General Psychology, p. 500

৯ শিশুদের মনোবিকলন -দ্বারা জানা যায় যে তারা তাদের আক্রমণাত্মক বিদ্বেষকে বিপজ্জনক মনে করে। তাদের অস্পষ্ট আশঙ্কা জন্মে যে তাদের ক্রোধ বা বিদ্বেষ পিতামাতার পক্ষে হানিকর। এই স্তরে শিশুর মনে আক্রমণাত্মক বিদ্বেষ এবং আক্রমণাত্মক কর্মের কোন পার্থক্য থাকে না। অসভ্য বর্বরদের মধ্যেও আমরা অনুরূপ মনোভাব দেখতে পাই। তারা মনে করে শত্রুর প্রতি কঠিন ক্রোধই এমন শক্তি উৎপন্ন করবে যে শত্রু বিনষ্ট হয়ে যাবে।

পাপবোধ বহু শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনকে বিড়ম্বিত করে। যেখানে অধিশাস্তার মধ্যে এই পাপবোধের মাত্রা অতিরিক্ত, সেখানেই ব্যক্তির মানসিক সুস্থতা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

পূর্বেই বলেছি পিতামাতার ন্যায়-অন্যায়-বোধই বাল্যকালে শিশুতে তাদাত্ম্য -দ্বারা সংক্রামিত হয়। সুতরাং পিতামাতার অতিরিক্ত কঠোর নীতিবোধ শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয়। কথাটা অদ্ভুত শোনালেও এটা সত্য যে, যে-সকল বাপ-মা ছেলেমেয়েদের মারধোর করেন তাঁরা সন্তানদের যতটা ক্ষতি করেন, তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতি করেন অতিরিক্ত নীতি-বাগীশ বাপ-মা যাঁরা বাল্যকালেই শিশুদের মনকে পাপবোধের দ্বারা বিড়ম্বিত করেন। যে-সব বাপ-মা ছেলেমেয়েদের মাঝে মাঝে দৈহিক পীড়ন করেন তাঁরা যদি বাস্তবিক স্নেহশীল হন, তা হলে সন্তানেরা নিজেদের তেমন অ-নিরাপদ বোধ করে না। কিন্তু যেখানে শিশু তার পিতামাতার অতি কঠোর দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে, এই চিন্তার দ্বারা পীড়িত হয়ে যে তার 'পাপ' আক্রমণাত্মক আকাঙ্ক্ষার জন্যে পিতামাতার স্নেহ ও বিশ্বাস সে হারিয়ে ফেলছে, সেখানে সে মানসিক মিথ্যা উদ্বেগ -দ্বারা পীড়িত হয়, সে নিজেকে অ-নিরাপদ বোধ করে। এই সমস্ত শিশুই ভবিষ্যতে 'নিউরোটিক্' (বায়ুরোগগ্রস্ত) হয়ে দাঁড়ায়। বাল্যকালে যখন 'অহং' অপরিণত ও দুর্বল, তখনই বায়ুরোগের বীজ অঙ্কুরিত হয়।[১০]

[১০] A child who feels fundamentally secure in his parents' affection suffers no harm from an occasional spanking. But the child who does not feel confident that he is loved and wanted, and who is constantly made to feel that he is falling far short of his parents' standards, is the potential adult neurotic: for it is in childhood, when the ego is weak, that the seeds of neurosis are sown. Rex & Margaret Knight.—A Modern Introduction to Psychology, p. 244

অধিশাস্তার মধ্যে পীড়নের আকাঙ্ক্ষা মিশ্রিত থাকে। আমরা দেখেছি সেই পীড়ন নিজের দিকেই প্রযুক্ত পরে তা অন্যের প্রতি গতি নেয়। অধিশাস্তার বিচার অন্ধ ও নির্মম এবং অন্যকে বিচারের বেলায়ও সেই কঠোরতা দেখা যায়। ফ্রয়েড ১৯৩২ সালে তাঁর Ego the Id গ্রন্থে প্রথমে অধিশাস্তার ধারণা-টি (Super ego) স্পষ্ট করে বিশ্লেষণ করেন। তাঁর মতে পরের সম্বন্ধে অধিশাস্তার নির্মম বিচার নিজেকে পীড়নেচ্ছার (introjected sadism) পরের স্তর—Often there is added another factor...This consists in an admixture of the cruel or "sadistic" elements which are a normal constituent of the libido...clearly seen when as often happens, the whole complex of moral tendencies embodied in the super-ego is projected outwards (the opposite process to the original introjection), in which case a cruel delight may be taken in the moral condemnation or punishment of others—a process to be observed almost daily in any educational establishment run on conventional lines. Flugel—A Hundred Years of Psychology, p. 289

অধিশাস্তাই পরিণত ব্যক্তিগত বিবেকের মূল হলেও এই দুই এক নয়। অধিশাস্তা অনেকটা জন্মগত, অযৌক্তিক। কিন্তু সামাজিক নীতিবোধ ও ব্যক্তিগত বিবেক কিছুটা যুক্তি-বিচার -দ্বারা গঠিত। তাই অধিশাস্তা কখনো কখনো আমাদের নির্দোষ কর্ম সম্বন্ধেও পাপবোধের গ্লানি মনের মধ্যে জাগ্রত করতে পারে, কিন্তু যুক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তিগত বিবেক হয়তো সে কর্মকে অন্যায় বলে বিচার করে না। কালীঘাটের মন্দিরের কাছ দিয়ে হাত জোড় করে প্রণাম না করে হেঁটে গেলে অধিশাস্তা হয়তো ধিক্কার দেবে, কিন্তু যুক্তিনিষ্ঠ বিবেক এর মধ্যে 'পাপ' কিছু দেখতে পায় না। অধিশাস্তার অন্ধ ও কঠোর নীতিবোধ শৈশবোচিত এবং অনমনীয় (rigid) এবং অধিকাংশ সুস্থ ব্যক্তিই এই কঠোর নির্মম নীতিবোধকে অতিক্রম করে 'পাপ' সম্বন্ধে অনেকটা 'উদার' ও সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে। এই শৈশবসুলভ অধিশাস্তা যে সব ব্যক্তিতে অতিপুষ্টি ও অতিরিক্ত অনমনীয়তা লাভ করে তারাই হয় ধর্মান্ধ উৎপীড়ক (fanatics)। এরা নিজের পক্ষে এবং সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক।[১১]

পূর্বেই দেখেছি অধিশাস্তা শুধু আমাদের বাহ্য কর্ম সম্বন্ধেই অতিরিক্ত কঠোর বিচার করে না—আমাদের ইচ্ছা বিদ্বেষ লোভ ক্রোধ ইত্যাদি আন্তর প্রক্রিয়া সম্পর্কেও তার অতিরিক্ত হুঁশিয়ারী। যুক্তি -দ্বারা এর প্রতিবিধান না হলে ব্যক্তির মানসিক সুখ ও শান্তি নষ্ট হবার যথেষ্ট আশঙ্কা থাকে। যুক্তি-বুদ্ধি -দ্বারা এটা আমরা বুঝতে পারি যে, সব মানুষের মনের মধ্যেই কিছু না কিছু কুচিন্তা আসবেই। তা নিয়ে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা করা ঠিক নয়। এগুলিকে বাতাসের মতো বয়ে যেতে দেওয়াই মানসিক সুস্থতার লক্ষণ। কুচিন্তাগুলি যাতে বাসা না বাঁধে, যাতে তারা কুকর্মে পরিণতি লাভ না করে,

১১ There is a tendency on the part of the small child to *identify himself with one or both of the parents*—the litte boy's tendency to put himself in the father's place, and to assume toward his own ego the attitude which his father would assume. Part of the little child's personality looks upon his own ego with disapproval, regards it as naughty and wishes to punish it; this usually results in the repression of a group of tendencies which become hard to reach. This part of the personality which undergoes parent-identification and looks upon the ego with a stern and critical eye, is the "super-ego". In later life it may harass the ego by burdening it with a sense of terrible sinfulness and unworthiness. Murphy—A Briefer General Psychology, p. 502

তাই শুধু দেখতে হবে। অধিশাস্তাকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিলে ব্যক্তিকে তার 'কুচিন্তা'র জন্যেও তা দায়ী করে তার জীবন বিড়ম্বনায় ভরে তুলবে। সুস্থ মানুষের যুক্তিনিষ্ঠ বিবেক বলবে, কুচিন্তা যদি অভ্যস্ত না হয়, যদি তা কুকর্মে মানুষকে প্রবৃত্ত না করে, তা হলে তার পাপের বোঝা চাপিয়ে মানুষকে বিব্রত করা অসঙ্গত। চার্টন কলিন্স চমৎকার করে বলেছেন, "কাকতাড়ুয়ার দায়িত্ব হচ্ছে যাতে কাক নতুন বীজ-রোয়া-ক্ষেতে বসতে না পারে। ক্ষেতের ওপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে কাক উড়ে গেলে তার জন্যে তাকে দায়ী করা ঠিক নয়। তেমনি আমাদের মনের ক্ষণিক পাপ-চিন্তার জন্যে আমাদের দায়িত্ব নেই। এগুলি মনের মধ্যে বাসা বাঁধলেই আমরা তার জন্যে দায়ী।[১২]

অদস্ অন্ধ কামনার বেগে ব্যক্তিকে তাড়না করে আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তির দিকে। অপর দিকে অধিশাস্তা কেবলই চোখ রাঙায়—কেবলই বলে 'এটা কোর না', 'ওটা পাপ'। ব্যক্তির সুস্থ বিকাশের এটাই লক্ষণ যে অহং এই দুই বিপরীত অন্ধ ও যুক্তিহীন শক্তির মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করে, যুক্তি বুদ্ধি ও বিচারের সাহায্যে। অদসের কামাকাঙ্ক্ষার স্বাভাবিক পরিতৃপ্তি বাস্তব জগতের অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করে কিভাবে সম্ভব, অহং তা বলে দেয়। আবার অধিশাস্তার নিন্দা ও শাসনকেও সে অনেকটা মর্যাদা দেয় আকাঙ্ক্ষাগুলির উপযুক্ত সংযম ও শাসন-দ্বারা। সুস্থ স্বাভাবিক ব্যক্তিত্বে অদস্, অহং ও অধিশাস্তার মধ্যে একটি সুসমঞ্জস সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। অহং অদস্ ও অধিশাস্তার মধ্যে সুসমঞ্জস সম্বন্ধস্থাপনে ব্যক্তি যখন অসমর্থ হয়, তখন ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়—তখনই মানসিক বিকারের সূচনা হয়।

ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের বিভিন্ন ক্রম

মনোবিকলনে ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশ একটি মৌলিক ধারণা। **ব্যক্তির ক্রমবিকাশকে তিনটি প্রধান স্তরে ভাগ করা হয়।** প্রথম হচ্ছে পাঁচ বা ছয় বছর পর্যন্ত **বাল্য ও শৈশবের স্তর (infantile stage)**। **দ্বিতীয় হচ্ছে প্রসুপ্তির স্তর (latent stage)** এবং তৃতীয় হচ্ছে উত্তর-কৈশোর বা

১২ We are no more responsible for the evil thoughts that pass through our minds than a scarecrow for the birds which fly over the seed-plot he has to guard; the sole responsibility in each case is to prevent them from settling. Churton Collins—Aphorisms, English Review, April, 1914

প্রাক্-যৌবন স্তর (adolescent stage)। ফ্রএডীয় চিন্তায় শৈশবের স্তরকেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব স্থাপন করা হয়। এই স্তরের সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশের উপরেই পরিণত ব্যক্তির মানসিক সুস্থতা বহুলাংশে নির্ভর করে। শৈশবের স্তরে দুটি প্রধান এবং পরস্পর-সংযুক্ত ধারা একসঙ্গে চলতে থাকে। প্রথমে আদিম কামাকাঙ্ক্ষা দেহের কয়েকটি সুখ-উৎপাদক এলাকায় কেন্দ্রায়িত হয়। দ্বিতীয়ত কামাকাঙ্ক্ষা-চরিতার্থের উপযোগী বস্তু ব্যক্তি অন্বেষণ করে। এই সঙ্গে সঙ্গে একই কালে কামাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যুক্ত অহং-এর পুষ্টিও ঘটতে থাকে।

জন্মকালে এবং শৈশবের প্রথম অবস্থায় আদিম কাম (libido) সর্বদেহেই ছড়িয়ে থাকে। কোন বিশেষ অঙ্গে তা কেন্দ্রীভূত হয় না। কিন্তু অল্প কিছু দিনের মধ্যেই দেহের তিনটি এলাকায় এই আদিম আকাঙ্ক্ষা কেন্দ্রীভূত হয়। বাল্যের প্রথম স্তরে শিশুর সমস্ত আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয় মুখে (oral-erotic stage)। শিশুর জীবনের প্রধান আনন্দ হল মাতৃস্তন্যপানে। মাতৃস্তন্য-পানের আকাঙ্ক্ষা যথেষ্টভাবে এবং স্বাভাবিকভাবে তৃপ্ত না হলে শিশু আঙুল চোষে। এরও পরের স্তরে শিশুর ভালবাসা বা অতৃপ্তি প্রকাশ পায় দাঁত দিয়ে দংশন বা চর্বণে। মা'র প্রতি তার বিরক্তি (তার কামাকাঙ্ক্ষার যথেষ্ট তৃপ্তি হচ্ছে না বলে) সে মা'র স্তন কামড়িয়ে বা গা কামড়িয়ে প্রকাশ করে। রাগ করে (যা অনুরাগেরই বিপরীত প্রকাশ) সে জিনিস কামড়িয়ে-চিবিয়ে ভাঙতে চায় (oral-sadistic phase)। এর পরের স্তরে শিশুর তৃপ্তি কেন্দ্রীভূত হয় পায়ুতে—মলত্যাগ এবং মল হাত দিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে শিশু আনন্দ পায় (oral-erotic stage)। এরও আবার দুটি স্তর: প্রথম স্তরে আনন্দ হচ্ছে মলত্যাগ, দ্বিতীয় স্তরে, আনন্দ হচ্ছে মলের বেগধারণে।[১৩] এরও পরের স্তরে লিঙ্গস্থান স্পর্শ ও ঘর্ষণ-দ্বারা (masturbation) শিশু অচেতনভাবে তৃপ্তিলাভ করে। এটাকে ফ্রএড বলেছেন (phallic stage)। সহজেই বোঝা যায় শিশু এ সব স্তরে বিভিন্ন ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যে তৃপ্তিলাভ করতে চেষ্টা করে তা নিতান্তই অচেতনভাবে। এই বাল্যের অচেতন কামাকাঙ্ক্ষা যা শিশুর নিজ

১৩ Then follows the anal-erotic stage in which the eliminative function and organs become the center of satisfaction. In the early anal phase expulsion is pleasurable, in the later, retention is the mode of pleasure-finding. Shaffer & Shoben—The Psychology of Adjustment, p. 454

দেহেই আবদ্ধ তাকে সাধারণভাবে ফ্রএড বলেছেন আত্মরতির (auto-eroticism) স্তর।

ফ্রএড যাকে phallic stage (আত্মলিঙ্গরতি-স্তর) বলেছেন, তারই প্রাক্-যৌবনে পরিণতি দেখা যায় অন্য লিঙ্গের সঙ্গে সঙ্গমক্রিয়ায় (genital stage)। সুস্থ স্বাভাবিক শিশু যখন ৫।৬ মাসে মায়ের স্তন্যপান থেকে বিরত হয় (weaning) তখন তার মুখকেন্দ্রিক কামতৃপ্তির স্তর (oral stage) সে স্বাভাবিক ভাবেই উত্তীর্ণ হয়। তেমনি সাত-আট মাসে শিশু মলমূত্রত্যাগের ক্রিয়া নিয়মিতভাবে সংযত করতে শেখে এবং সে পায়ুকেন্দ্রিক কামতৃপ্তির স্তর (anal stage) সহজেই উত্তীর্ণ হয়। শৈশবের কামাকাঙ্ক্ষার স্বাভাবিক তৃপ্তি ও পরিণতিতে বাধা ঘটলে কখনো কখনো পরবর্তী বয়স্ক জীবনে বিকৃতি দেখা দেয়। হয়তো দেখা যায় তেমন বয়স্ক মানুষ, বাল্যের মুখ- বা পায়ু-কেন্দ্রিক কামতৃপ্তির (oral or the anal stage) স্তরে প্রত্যাবর্তন করে। ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক পরিণতি ঘটলে বাল্যের কোন স্তরে প্রত্যাবর্তন (regression) অথবা কোন এক স্তরে আবদ্ধ হওন (fixation) ঘটে না।

শিশুর জীবনের দ্বিতীয় প্রধান পরিণতির স্তর হল যখন সে তার কামাকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি খোঁজে বাইরের বস্তুতে বা ব্যক্তিতে। এই স্তরে শিশু বাইরের বহু জিনিসের প্রতিই আগ্রহান্বিত হয় এবং পিতামাতা এবং পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিতে নির্বিচারে আসক্ত হয়। একে ফ্রএড্ উভলিঙ্গ কামাকাঙ্ক্ষা বলেছেন (bisexual stage)। শিশুর প্রাথমিক স্তর ছিল আত্ম-লিঙ্গ-কাম (homo-sexual) বা আত্মরতি (auto-eroticism)। এই উভলিঙ্গ-কাম-স্তরের শিশুকে ফ্রএড্ polymorphous perverse-ও বলেছেন। তার কারণ এই স্তরে শিশু নির্বিচারে বহু বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট (polymorphous)। আর এক হিসাবে তার কামাকাঙ্ক্ষা কিছুটা বিকৃত (perverse) যেহেতু কামাকাঙ্ক্ষার প্রকৃত বস্তু হচ্ছে বিপরীতলিঙ্গ অপরিচিত ব্যক্তি এবং কামাকাঙ্ক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে সঙ্গমক্রিয়ার দ্বারা সন্তান-উৎপাদন। কিন্তু শিশু পিতামাতা ভাই-বোনকে নির্বিচারে ভালবাসে।[১৪] অবশ্যই এটা স্বাভাবিক যে শিশু প্রথমে পিতামাতার প্রতিই আকৃষ্ট হয়। পুরুষ সন্তান স্বাভাবিক ভাবেই মায়ের প্রতি অধিকতর অনুরক্ত। মুখকেন্দ্রিক কাম-স্তরে

১৪ Freud—New Introductory Lectures on Psychoanalysis (1934)

সে মায়ের স্তনেই তার আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি পায়। আত্মলিঙ্গ স্তরে তা আরো স্পষ্টভাবে যোনিকেন্দ্রিক। শিশু মাকে স্পর্শ করতে ভালবাসে, মার চুম্বন-আলিঙ্গন সে আকাঙ্ক্ষা করে (এবং তা পায়ও), মা'র সঙ্গে ঘুমোতে সে ভালবাসে। এই আকাঙ্ক্ষাগুলি যে স্পষ্টতই যোনিকেন্দ্রিক, এ কথা ফ্রএড্ তাঁর "Three Contributions to the Theory of Sex" ((1908) বইয়ে যখন প্রথম বলেন তখন তাঁর বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন শুরু হয়।[১৫] কিন্তু ফ্রএড সব সময়েই বলেছেন যে **শিশুর মা'র প্রতি যে কামাকাঙ্ক্ষা তা সম্পূর্ণ অচেতন**। এই স্বাভাবিক এবং সম্পূর্ণ সঙ্গত কামাকাঙ্ক্ষা পরিবারের ব্যক্তিরা নিন্দা করতে শুরু করেন (ছিঃ, বুড়ো ছেলে কি মায়ের কোলে উঠবে !...মায়ের আঁচলধরা কেমন মেয়েলী ছেলে!)। এর ফলে, মাতার প্রতি যে আকাঙ্ক্ষা শিশু তা অবদমন করতে বাধ্য হয় এবং এই অবদমনের চেষ্টা তীব্র বা আকস্মিক হলে শিশুর অবচেতন মনে এই 'নিষিদ্ধ' কামাকাঙ্ক্ষার জটিল গ্রন্থি সৃষ্টি হয়—তার নাম দেওয়া হয়েছে **Odipus Complex**। [গ্রীক্ পুরাণে এ কাহিনী আছে থিবস্ দেশের রাজা ইদিপাস্ তাঁর পিতাকে যুদ্ধে হত্যা করে আপন মাতাকে বিবাহ করেন। অবশ্য একেবারেই বাল্যে পিতামাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য রাজ্যে লালিতপালিত হওয়াতে ইদিপাস্ পিতামাতাকে চিনতেন না এবং যখন পিতাকে হত্যা করেন বা মাতাকে বিবাহ করেন, তিনি জানতেন না যে তিনি নিজ পিতাকে হত্যা করেছেন বা মাতাকে বিবাহ করেছেন।]

এর ফলে পুং-সন্তান পিতার প্রতি (মাকে ভোগ করবার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে) গোপন বিদ্বেষ পোষণ করতে থাকে। এ বিদ্বেষও অস্পষ্ট এবং শিশু বোঝে প্রবল পরাক্রান্ত পিতার বিরুদ্ধে তার ক্রোধ বা বিদ্বেষ প্রকাশ নিষ্ফল। সুতরাং এই বিদ্বেষও অবদমিত হয়। এবং এই অবদমনের চেষ্টা তীব্র বা আকস্মিক হলে শিশুর অবচেতন মনে অকারণ ভয় এবং অন্যান্য নানা মানসিক বিকারের সূত্রপাত করে। অনুরূপভাবে মেয়ে-সন্তান স্বভাবত পিতার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয় এবং তার শৈশবের এই কামাকাঙ্ক্ষার সুস্থ

[১৫] In opposition to a long tradition in psychology which has held that sexlife does not begin until the onset of puberty, Freud holds that every child is intensively and dynamically sexual from earliest infancy. Griffith—An Introduction to Applied Psychology. p. 331

প্রকাশের পথ রুদ্ধ হলে তার অবচেতনায় যে বিশৃঙ্খল গ্রন্থি সৃষ্টি হয় তাকে আর একটি গ্রীক্ পৌরাণিক কাহিনী থেকে Electra Complex বলা হয়।[১৬] তবে মেয়ে সন্তানের শৈশব-কামাকাঙ্ক্ষার ক্রমবিকাশ পুংসন্তানের চেয়ে অধিকতর জটিল।[১৭]

ফ্রএড-এর প্রথম দিকের লেখায় এ কথাই বলা হয়েছিল যে পুং-সন্তানের কামাকাঙ্ক্ষা মাতার দেহাভিমুখী, কিন্তু পরবর্তী মনোবিকলকেরা এ কথার সংশোধন করে বলেছেন **এই কাম অচেতনভাবে মাতৃকল্পের প্রতি-প্রযুক্ত—মায়ের কাল্পনিক রূপই শিশুর প্রেমবস্তু। মাতার দেহ তার কামবস্তু নয়।** ইদিপাস্ কম্‌প্লেকস্-এর মূল, শিশুর প্রতি মাতার আদর-ভালবাসা নয়। এই কমপ্লেকস্-এর মূল শিশুর অবচেতনায় এবং এটা উত্তরাধিকার সূত্রে শিশু মানবজাতির অতীত থেকেই পেয়েছে।[১৮]

পুং-সন্তানের বাল্যের মাতৃকল্প-কেন্দ্রিক কামাকাঙ্ক্ষা অবরুদ্ধ হলে যেমন ইদিপাস্ কমপ্লেকস্ (অবচেতন পিতৃবিদ্বেষ-সৃষ্টি) হয় তেমনি আর একটি জটিল গ্রন্থিও সৃষ্টি হয় যাকে ফ্রএড বলেছেন—**Castration Complex** (পুংলিঙ্গ-ছেদনের অবচেতন ভয়)। পিতাকে পুংশিশু অবচেতনভাবে হিংসা করে

১৬ A male child has a natural tendency to express its sexnal urge toward its mother. When, in later development, this type of expression is hindered or thwarted, the child develops what is called an Oedipus Complex. The natural direction of sexual urge for a female child is toward the father and the repression of this urge leads to what has been called the Electra Complex. Ibid, p. 331

১৭ The personality development of the girl presents more difficulties than that of the boy. The primary attachment to the mother resulting from nursing must be overcome at the beginning and the solution at the end is not so clearly defined. Shaffer & Shoben—Psychology of Adjustment, p. 456

১৮ The child does not become aware of the direct sexual nature of the desire at all. It is manifested only by desire for caresses, for attention, in wanting to sleep with the mother, and in similar attenuated expressions. The earlier psychoanalytic view was that this complex concerned the person of the parent: later it was recognized as *carried out almost entirely in unconscious fantasy, a mother-image (or imago) in the unconscious*, being the love-object. The Oedipus Complex is not regarded as originating from the mother's affection for the child. It is innate in the boy, a heritage of the racial unconscious. Shaffer & Shoben—The Psychology of Adjustment, p. 455

এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ভয়ও করে। তার আশঙ্কা পিতা তাকে তাঁর প্রতি বিরুদ্ধ ইচ্ছার জন্যে শাস্তি দেবেন এবং যে শাস্তিটা সে ভয়ানক ভয় করে তা হচ্ছে এই যে, তিনি তার (শিশুর) লিঙ্গচ্ছেদ করে দেবেন। আত্ম-লিঙ্গ-কাম স্তর থেকেই নিজ পুংলিঙ্গ সম্বন্ধে তার আনন্দ ও গর্ব থাকে, সুতরাং লিঙ্গচ্ছেদের ভয়টা সাংঘাতিক। পূর্বের মনোবিকলক পণ্ডিতদের কেউ কেউ মনে করেছেন যে শিশুর মনে এই ভয়ের কারণ হচ্ছে শিশু নিজ লিঙ্গে হাত দিলে বাবা অনেক সময় তাকে শাসন করে. বলেছেন যে লিঙ্গচ্ছেদ করে দেবেন। তা ছাড়া তার ছোট বোনের এই বহির্লিঙ্গ নেই দেখে সে ভাবতে শেখে ওর লিঙ্গচ্ছেদ করে দেওয়াতে ওর এই অবস্থা ঘটেছে! কিন্তু ফ্রএড তার পরের অনেক লেখাতে এ মত অগ্রাহ্য করেছেন, কারণ তিনি এমন অনেক শিশুতে লিঙ্গচ্ছেদ-ভয়ের অবচেতন গ্রন্থি লক্ষ্য করেছেন যাদের অনুরূপ কোন অভিজ্ঞতা ঘটে নি। তার থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে এই গ্রন্থির মূলও জন্মগত এবং মানবজাতির প্রাক্-ঐতিহাসিক মগ্নচেতনা থেকে বর্তমান কালের শিশুরা এটা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। তাঁর এই পরিবর্তিত সিদ্ধান্তে য়্যুঙ্গ-এর গোষ্ঠীগত নির্জ্ঞান (collective unconscious) তত্ত্বের প্রভাব দেখতে পাই।[১৯]

লিঙ্গচ্ছেদ-আশঙ্কা-গ্রন্থি (Castration Complex) (পিতার প্রতি অকারণ ভয়) মাতৃ-কাম-গ্রন্থির (Oedipus Complex) (মাতার প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি) শত্রু। এর ফলে ইদিপাস্ কম্‌প্লেক্‌স্-এর উদ্গতি (sublimation) ঘটে এবং মা'র প্রতি কোমল স্নেহ-শ্রদ্ধার সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং পিতার সঙ্গেও তাদাত্ম্য (identification) -সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তখন পিতাকে শিশু আপন জীবনের আদর্শ বলে গ্রহণ করে। যখন ইদিপাস্ গ্রন্থির মোচন ঘটে, তখনই শিশুর মনে কঠিন নির্মম নীতিবোধ অর্থাৎ অধিশাস্তা আত্মপ্রকাশ করে। শিশু নিজের মাতৃ-কামাকাঙ্ক্ষাকে তখন কঠিনভাবে বিচার করে তার উদ্গতিসাধন করে।[২০]

১৯ Murphy—A Historical Introduction to Modern Psychology, p. 33

২০ The castration complex "explodes" the Oedipus complex. Because of its threat the boy gives up his incestuous desire for his mother. The solution of the Oedipus involves the *sublimation* of the feelings toward the the mother into tender affection and *identification* with the father so that his achievements come to be regarded as the child's own. The super-ego has its origin in the solution of the Oedipus, the intolerant conscience being formed in the process of renunciation of the infantile sexual aims. Shaffer & Shoben—Psychology of Adjustment, p. 456

শিশুর যখন আট-দশ বছর বয়স হয় তখন আবার তার আত্মরতির এক দ্বিতীয় অবস্থা দেখা যায়। শিশু নিজের দেহ নিয়েই ব্যস্ত, দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আবিষ্কার ও স্পর্শে তার আনন্দ। কিন্তু এই স্তর শীঘ্রই শিশু উত্তীর্ণ হয় এবং তার ভালোবাসা ও আনন্দ সমবয়স্ক অন্য কিশোরদের প্রতি প্রযুক্ত হয়। এ হল সমলিঙ্গ-কামের স্তর (homosexuality)। বন্ধুবান্ধবদের ভালবাসা যৌন-আকাঙ্ক্ষা-তৃপ্তির একটি স্বাভাবিক প্রয়োজনীয় স্তর।

প্রাক্-যৌবনকালে যোনিকেন্দ্রিক কামাকাঙ্ক্ষা তার নিজ রূপে আত্মপ্রকাশ করে।[২১] এর প্রথম অবস্থায় (**late genital period**) শৈশবের আত্মলিঙ্গ-সচেতনতা (auto-eroticism) আবার কিছুকালের জন্যে প্রবলতর হয়। আত্ম-অহংকার এবং নিজ দৈহিক সৌন্দর্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। কামবস্তু হিসাবে পিতামাতার প্রতি আকর্ষণও কিছুটা প্রবল হয়—সঙ্গে সঙ্গে নিজ স্বাধীন সত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের প্রতি বিরোধও (অবাধ্যতা) আত্ম-প্রকাশ করে। এর পরের স্তর (**later functioning of vaginal zone**) পরলিঙ্গের প্রতি সচেতন আকর্ষণ স্পষ্টভাবে দেখা দেয়। যৌন আকাঙ্ক্ষা (sex instinct) একটা অখণ্ড জন্মগত সংস্কার নয়—এ কতকগুলি জন্মগত খণ্ড সংস্কারের সমষ্টি। পরিণত জীবনে এই আকাঙ্ক্ষার স্বাভাবিক ইন্দ্রিয় হচ্ছে যোনি এবং এর স্বাভাবিক পরিণতি হচ্ছে বিপরীত যোনির সঙ্গে সঙ্গম—সন্তান-উৎপাদন-উদ্দেশ্যে। যৌবনাগমে ব্যক্তি বিপরীত-লিঙ্গ ব্যক্তির প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাকে সে সচেতনভাবেই সন্তান-উৎপাদনার্থে কামনা করে। এটাই যৌন-আকাঙ্ক্ষার স্বাভাবিক পরিণতি। যখন সন্তান-উৎপাদনার্থ যোনি-সঙ্গম এই মূল উদ্দেশ্যে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির কামাকাঙ্ক্ষা কেন্দ্রীভূত না হয়ে খণ্ড সংস্কার-গুলি প্রাধান্য লাভ করে, তখন তাকে বলা হয় বিকার বা perversion, যেমন ধর্ষণেচ্ছা বা sadism। শিশুকে সেইজন্যেই ফ্রএড্ Polymorphous **pervert** বলেছেন—যেহেতু তার জীবনে কামাকাঙ্ক্ষা তার প্রকৃত উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত না হয়ে খণ্ড সংস্কারে নিজেকে আবদ্ধ করছে।

২১ **Healy, Bronner, Bowers etc.—The Meaning of Psychoanalysis, p. 215**

সপ্তবিংশ অধ্যায়

ফ্রএড. প্রসঙ্গ—ব্যক্তি-মানসের কলকব্জা

আমরা আলোচনা করেছি ব্যক্তিমানসের তিনটি স্তরের কথা—অদস্ অহং ও অধিশাস্তার কথা। এবার আলোচনা করা দরকার এদের পরস্পরের সম্বন্ধ, এরা কিভাবে কাজ করে, কিভাবে পরস্পরকে প্রভাবিত করে এবং পরিবেশের সঙ্গেই বা এদের সম্বন্ধ কি। একথা বুঝতে গেলে মানস বা চিদ্শক্তি (Psychic Energy), সহজ প্রবৃত্তি (Instinct) এবং অদস্ অহং ও অধিশাস্তার মধ্যে শক্তির বণ্টন একটু বোঝা দরকার।

১। **চিদ্শক্তি (Psychic Energy)**—ফ্রএড খাঁটি বিজ্ঞানী। প্রাণ বা মনকে তিনি কোন রহস্যময় বস্তু বা শক্তি বলে মনে করেন না। তিনি বস্তু-বাদীদের শক্তির নিত্যতার তত্ত্বে (Doctrine of conservation of energy) বিশ্বাসী। তিনি এ কথা মানেন, যে শক্তির স্থান- বা রূপ-পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু শক্তি অবিনশ্বর, এক ও অখণ্ড। শক্তি সততই স্থান-পরিবর্তন করছে, বা রূপ-পরিবর্তন করছে। এক শক্তি অন্য শক্তিতে পরিবর্তিত হচ্ছে। এরই নাম কার্য-কারণ সম্বন্ধ। এক শক্তি অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় নতুন কোন শক্তি সৃষ্ট হয় না, কোন শক্তি ধ্বংসপ্রাপ্তও হয় না। কিন্তু জড়বাদীরা বলেন, এ তত্ত্ব শুধু জড়জগতেই ক্রিয়া করে, যথা উত্তাপ-শক্তি বৈদ্যুৎশক্তিতে পরিবর্তিত হয়, আবার বৈদ্যুৎশক্তি আলোতে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু ফ্রএড বলেন, এ তত্ত্বের ক্রিয়া ব্যাপকতর। জড়শক্তি মানসশক্তিতে রূপান্তরিত হয়, মানসশক্তিও জড়বস্তুর পরিবর্তন ঘটায়। আমার ইচ্ছা, মানসশক্তি,—তা সঞ্চালন করে বাহুর পেশীসমূহকে, যা হচ্ছে অ-চিৎশক্তির সমষ্টি। আবার ইথর-তরঙ্গের উত্থানপতন সৃষ্টি করে আমাদের বর্ণবোধ। দেকার্তে-র মতো দার্শনিক বলবেন, বস্তু ও চেতন সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাদের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যুক্তিবিরুদ্ধ, কিন্তু ভগবান এ অসম্ভবকে সম্ভব করেন। ফ্রএড জড় ও চেতনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যা প্রত্যক্ষ সত্য, তাকে মেনে নিচ্ছেন, কিন্তু তার দার্শনিক ব্যাখ্যার জন্যে তিনি ভগবান আত্মা ইত্যাদি টেনে আনেন নি।

২। **সহজ প্রবৃত্তি বা ইন্‌স্টিংকট্**—ব্যক্তির সমস্ত ক্রিয়ার মূল শক্তি হচ্ছে ইন্‌স্টিংকট্ (Instinct)—এ শক্তি জন্মগত ও আদিম। ব্যক্তির সমস্ত চেতন মানসক্রিয়ার গতি নির্ধারিত হয় এই সংস্কার দ্বারা। যেমন, ক্ষুধা প্রাণীর প্রত্যক্ষ জ্ঞান, স্মৃতি চিন্তা ইত্যাদি সমস্ত মানসিক ক্রিয়াকে খাদ্যপ্রাপ্তির পথাভিমুখী করে; নদী যেমন জলস্রোতকে একটা বিশেষ পথে নিয়ে যায়, তেমনি ইন্‌স্টিংকট্-ও মানুষের প্রাণশক্তিকে একটি বিশেষ গতি দান করে।

প্রত্যেক ইন্‌স্টিংকটেরই একটি মূল আছে, উদ্দেশ্য আছে, বস্তু আছে এবং আবেগ (impetus) আছে। ইন্‌স্টিংকট্ -রূপ আদিম শক্তির মূলে আছে, দেহের কতকগুলি আবেগ বা আকাঙ্ক্ষা। এ আবেগ বা আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে দেহের কোন অঙ্গ বা টিস্যুর ভেতরে সঞ্চিত একটি উত্তেজক শক্তির ক্ষরণ বা বহিঃপ্রকাশের পথ। যথা, ক্ষুধা হচ্ছে দেহের অভ্যন্তরে একটা অস্বস্তি,—যা খাদ্যান্বেষণ কার্যের শক্তিসঞ্চার করে এবং যা খাদ্যগ্রহণ -দ্বারা শান্ত হয়। এই অস্বস্তি বা আবেগই প্রাণীর প্রত্যক্ষ জ্ঞান, স্মৃতি ও চিন্তাকে খাদ্যরূপ বস্তুর অভিমুখী করে। ক্ষুধিত হলে প্রাণী খাদ্যের অন্বেষণ করে, অতীতে কোথায় খাদ্য মিলেছিল তা স্মরণ করে, খাদ্যের কল্পনা করে, খাদ্য কি করে পাওয়া যাবে তা চিন্তা করে, তা আহরণের উপায় মনে মনে বিচার করে। কাজেই ম্যাক্‌ডুগ্যাল্-এর মতো ফ্রএড-এর মতেও সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়াই উদ্ভূত হয়েছে আদিম শক্তি ইন্‌স্টিংকট্ থেকে। এবং ম্যাক্‌ডুগ্যাল্-এর মতোই তিনি মনে করেন ইন্‌স্টিংকট্ ও আবেগ একটি অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধে যুক্ত।

সমস্ত ইন্‌স্টিংকটেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে দৈহিক কোন প্রয়োজনের তৃপ্তি। ক্ষুধার পরিসমাপ্তি হচ্ছে খাদ্যগ্রহণে। খাদ্যপ্রাপ্তি হয়ে গেলে ক্ষুধারূপ ইন্‌স্টিংকট্ শান্ত হয়, তার তাড়না বিলুপ্ত হয়। কাজেই এক হিসাবে বলা যেতে পারে ইন্‌স্টিংকটের শেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্‌স্টিংকটের মূল আবেগ বা অস্বস্তির অপসারণ। সে হিসাবে বলা যায় ইন্‌স্টিংকট্‌ই ইন্‌স্টিংকটের শত্রু।

ইন্‌স্টিংকটের প্রধান উদ্দেশ্যসাধন করতে হলে কতগুলো গৌণ উদ্দেশ্যসাধন করতে হয়। যথা, ক্ষুধার নিবৃত্তি করতে গেলে খাদ্যসংগ্রহ করতে হয়, খাদ্য মুখে পুরতে হয়। ইন্‌স্টিংকটের প্রধান উদ্দেশ্যকে তাই আন্তরিক (internal), ও গৌণ উদ্দেশ্যকে বাহ্য (external) বলা যায়।

অদস্, অহং ও অধিশাস্তার শক্তি-বিনিময় ও পরস্পর সক্রিয় সম্বন্ধেই

ব্যক্তির পরিচয়। সমগ্র ব্যক্তিত্ব হচ্ছে একটি জটিল শক্তিসমন্বয়। বহু শক্তি এখানে সহযোগিতা ও বিরোধিতার সূত্রে একটি কেন্দ্রে বিধৃত। ব্যক্তিত্ব যে শক্তির দ্বারা ক্রিয়া করে, তাকে বলা হয় চিদ্‌শক্তি। কিন্তু এই শক্তির মূল কোথায়? দেহের প্রাণশক্তিই এর মূলের ক্রিয়া ও নানা সংস্কারের মধ্যে। কি করে প্রাণশক্তি চেতনশক্তিতে রূপান্তরিত হয়, তা আমরা জানি না। অদস্ হচ্ছে চিদ্‌শক্তির আধার। অদসের এই শক্তিই জীবন- ও মৃত্যু-সংস্কারের (life and death instinct) চাহিদা মেটায়। আবার তাদাত্মক্রিয়া (identifica-tion) -দ্বারা অদসের মূলাধার থেকে এ শক্তি আহৃত হয়, অহং ও অধিশাস্তাকে সক্রিয় করে তোলবার কাজে। অদসের চিদ্‌শক্তির আধার থেকে অহং ও অধিশাস্তা যে শক্তি আহরণ করে, তা দুটি প্রধান কাজে ব্যবহৃত হয়:—শক্তির উন্মোচন -দ্বারা অস্বস্তির **নিরসন** (cathexis) অথবা এর বিপরীত শক্তির **ক্রিয়া-নিবারণ (anicathexis)**।

ইন্‌স্টিংকটের উদ্দেশ্য (aim) **হচ্ছে উত্তেজনার পূর্ববর্তী শান্ত অবস্থায় ফিরে যাওয়া।** তাই বলা হয় ইন্‌স্টিংকট্ সংরক্ষণকামী (conser-vative)। ইন্‌স্টিংকটের গতি হচ্ছে বৃত্তাকারে আবর্তন—প্রথম আকাঙ্ক্ষা উত্তে-জনা ও অস্বস্তি; তারপর তার ক্রমশ বৃদ্ধি, সর্বশেষে শক্তির দ্বারোন্মোচন -দ্বারা (release of energy) পূর্ববর্তী শান্ত অবস্থায় পরিবর্তন। উত্তেজনা ও অস্বস্তির বৃদ্ধিতেই পরবর্তী উপশম ও তৃপ্তির স্তরটি নিবিড়ভাবে উপভোগ্য হয়। ইন্‌স্টিংকটের গতির এই আবর্তন পুনঃ পুনঃই ঘটে। এর একটা নির্দিষ্ট ছন্দ আছে। যেমন, একটা নির্দিষ্ট সময় পরে পরেই ক্ষুধা পায়, ঘুম পায় ইত্যাদি।

ইন্‌স্টিংকটের বস্তু (object) হচ্ছে, যে উপায় বা বস্তুর সাহায্যে সেই নির্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষা বা অস্বস্তির উপশম ঘটে, তা। ক্ষুধার বস্তু খাদ্যগ্রহণ, কামাকাঙ্ক্ষার বস্তু হচ্ছে, বিপরীত-লিঙ্গ ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গম। ইন্‌স্টিংকটের বস্তু সর্বদা এক না হতেও পারে। বহু বিভিন্ন বস্তুই একটি বিশেষ আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটাতে পারে। এখানে পরিবর্ত (substitute) -দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে কাজ চালানো যায়: শিশু মায়ের স্তনের অভাবে নিজের বুড়ো আঙুল চুষে তৃপ্তি পায়, স্বপ্ন ও কল্পনায় কামবস্তুর অভাব পূরণ করা হয়। কি ভাবে একটি ইন্‌স্টিংকট্ বিভিন্ন বস্তুর মধ্য দিয়ে অস্বস্তি-উপশম (tension reduction) খোঁজে তার দ্বারা ব্যক্তিত্ব-বিকাশের বিভিন্ন পথের সন্ধান মেলে।

কোন ইন্‌স্টিংকটের বেগ (impetus) নির্ভর করে এর পেছনে কতটা শক্তি ক্রিয়া করছে, তার ওপর। অল্প অল্প ক্ষুধার চেয়ে প্রচণ্ড ক্ষুধা ব্যক্তির মানসিক প্রক্রিয়ার ওপর অনেক বেশী প্রভাববিস্তার করে। অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ব্যক্তি খাদ্যের কথা ভাবে, খাদ্যের স্মৃতির রোমন্থন করে—তখন তার মনে অন্য কোন বস্তুর চিন্তা স্থান পায় না। যে মানুষ প্রেমে পাগল, সে অন্য বিষয়ে মন দিতে পারে না।

ইন্‌স্টিংকটের আধার হচ্ছে অদস্। ইন্‌স্টিংকটই হচ্ছে মানসশক্তির সমগ্র পরিমাণ (total amount of psychic energy)। কাজেই অদস্ হচ্ছে সমস্ত ব্যক্তিত্বর মূল শক্তির আধার। এই মূলাধার থেকে শক্তি-আহরণ করেই অহং ও অধিশাস্তার সৃষ্টি। কি করে এই মূল শক্তির আধার থেকে শক্তি আহৃত ও বণ্টিত হয়, তা এবার আলোচনা করা দরকার।

মানসশক্তির বণ্টন—অদস্‌ই হচ্ছে সমগ্র মানসশক্তির আধার। অদসের এ শক্তি ব্যয়িত হয় আদিম আকাঙ্ক্ষাগুলির পরিতৃপ্তিতে, প্রত্যাবর্তক্রিয়া (reflex action) ও ইচ্ছাপূরণে (wish-fulfilment)। বস্তিতে (bladder) মূত্র-সঞ্চয়ের অস্বস্তি দূর হয়, মূত্রত্যাগ দ্বারা। এটি একটি প্রত্যাবর্তক্রিয়া। আবার কামবস্তুর কল্পনা, বা স্বপ্নের দ্বারা কামাকাঙ্ক্ষার বিকল্প পরিতৃপ্তি দুইয়ের মধ্যেই আদিম প্রবৃত্তির (instinct) শক্তি সহজ প্রকাশের পথ পেয়ে ব্যক্তির দৈহিক অস্বস্তি দূর করে বা উপশম করে তার জীবনের মৌলিক প্রয়োজন মেটায়।

আদিম প্রবৃত্তি বা ইন্‌স্টিংকটের শক্তি যখন কোন বস্তুর কল্পনায় বা বস্তুর প্রাপ্তিতে নিযুক্ত হয়, তখন তাকে **object choice** বা **object cathexis** বলা হয়। অদসের সমস্ত শক্তিই ব্যয়িত হয় object cathexis-এ, আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রাপ্তি বা আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর কল্পনায়। পূর্বেই বলা হয়েছে, অদসের স্তরে বস্তুর প্রাপ্তি ও বস্তুর কল্পনা সমার্থবাচক।

অদসের এই শক্তি বহুমুখী ও অতি সহজেই এর গতি-পরিবর্তন করা যায়। তাই দেখা যায় আকাঙ্ক্ষার নির্দিষ্ট বস্তুটি না পাওয়া গেলে তার বিকল্পের দিকেই কামশক্তি ধাবিত হয়। ক্ষুধার্ত শিশু খাদ্য কাছে না পেয়ে হয়তো কাঠের খেলনাই মুখে পুরবে। দুইএর মধ্যে কিছুটা মিল থাকলেই হল। দুধের বোতল ও খেলনা, নিতান্ত শিশুর কাছে, দুইই এক বস্তু, কারণ দুটিকেই হাতে মুঠো করে ধরে মুখে পোরা যায়। অদসের এই নির্বোধ ক্রিয়াকে

বলা হয় **displacement**। অদস্ বাস্তব জগতের নিয়ম জানে না। কাজেই এই বিকল্প দিয়ে তাকে ভোলানো যায়। স্বপ্নতত্ত্ব-ব্যাখ্যার কালে ফ্রএড অদসের এই displacement-এর অভ্যাসকে কাজে লাগিয়েছেন। তিনি বলেছেন, স্বপ্নমাত্রই ইচ্ছাপূরণ। এবং কামবস্তু এই displacement-এর ফলে প্রতীকের আকার ধারণ করে,—যেমন ঘোড়ায় চড়ার, হলচালনার বা চাবি দিয়ে তালা খোলার স্বপ্ন হচ্ছে রতিক্রিয়ার বিকল্প,—প্রতীক-সাহায্যে কামাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি।

অদস্ যেমন বস্তু এবং তার কল্পনাকে একই মনে করে, তেমনি যে দ্রব্যগুলি বাস্তবিক বিভিন্ন, কিন্তু কোন একটি বিশেষ গুণে যাদের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে, অদস্ তাদেরও এক বলে মনে করে। এতে করে অনেক সময় চিন্তার ক্ষেত্রে ভ্রমের সৃষ্টি হয়। স্বপ্নে প্রতীকের ব্যবহার এই **predicate thinking**-এর উদাহরণ। জাগ্রত জীবনে এই predicate thinking-জনিত ভ্রমের উদাহরণ দেওয়া যাক। যা ময়লা, কালো, তা ঘৃণ্য, পাপ। তাই অনেক সময় কালো মানুষের প্রতি আমাদের বিরাগ। বিড়ালের পিঙ্গল চোখ,—বেড়াল হিংস্র। তাই পিঙ্গলচোখ মানুষও বদমেজাজী বলে মনে করি।

জীবন ও সমগ্র ব্যক্তিত্বের মূল শক্তি একটিই। অদস্ এই শক্তির মূলাধার। কিন্তু এই শক্তিই অদসের আধার থেকে বণ্টিত হয় অহং ও অধিশাস্তাতে। অহং আর অধিশাস্তার আলাদা কোন শক্তি নেই। অহং-এর বুদ্ধি বিবেচনা বা অধিশাস্তার বিবেক ও নৈতিকতা মৌলিক কামেরই ভিন্নতর প্রকাশ। এদের জাত আলাদা, এদের উৎস আলাদা, এটা মনে করা ভুল। ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন শক্তির সমন্বয় নয়,—ব্যক্তি-মানস আলাদা আলাদা প্রকোষ্ঠে বিভক্ত নয়। ব্যক্তিচরিত্রে এক মৌলিক শক্তিরই বিচিত্র প্রকাশ।

ইন্‌স্টিংকটের কামশক্তির ধারা যখন অহং বা অধিশাস্তার দ্বারা বাধা-প্রাপ্ত হয়—তখন এ বাধা অদস্ অতিক্রম করতে চেষ্টা করে কল্পনা বা প্রত্যাবর্ত-ক্রিয়ার দ্বারা। যেখানে অদস্ এ চেষ্টায় সফল হয়, সেখানেই অহং-এর বুদ্ধি ও বিচারের শক্তিতে ভাঁটা পড়ে—সেখানেই যুক্তি ও বিচারে বিভ্রম ঘটে। এ সব ক্ষেত্রে প্রবল কামশক্তির তাড়না ব্যক্তির যুক্তি ও বিচারের ক্ষেত্রে বিভ্রম জন্মায়, ব্যক্তির বাক্যে, লেখায়, স্মৃতিতে বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে নানা ভুল হয়, তারা সাংসারিক বাস্তব জীবনের সমস্যা-সমাধানে নানা ত্রুটি ঘটে। তাই

রাগের সময় বা কোন গভীর আবেগ দ্বারা যখন আমরা তীব্রভাবে আলোড়িত হই, তখন কোন কাজ সুস্থিরভাবে, সুষ্ঠুভাবে আমরা করতে অক্ষম হই। তখন সমস্ত জৈবশক্তি অদসের প্রয়োজনে ব্যয়িত হচ্ছে, অহং ও অধিশাস্তা তখন পঙ্গু ও অক্ষম। কিন্তু অদস্ যেখানে এমন অবিসংবাদী প্রাধান্য লাভ করতে পারে না, সেখানে জৈবশক্তি অহং ও অধিশাস্তার খাতে বাহিত হয়। সুস্থ বয়স্ক মানুষের জীবনে এটাই স্বাভাবিক অবস্থা। তাই মানুষ পশুর অন্ধতাকে অতিক্রম করে, বিচার-বুদ্ধি ও নীতিসম্পন্ন জীবে পরিণত হয়েছে।

মূল জৈবশক্তি অদসকে কিভাবে বিকশিত করে? অদসের নিজস্ব আলাদা শক্তি নেই, বাস্তবিক পক্ষে আদিম জৈবশক্তি অদসের দাবি উল্লঙ্ঘন করে ঊর্ধ্ব- ও বহি-র্মুখী হয় বলেই অহং অস্তিত্ব লাভ করে। সুস্থভাবে বিচার, বিশ্লেষণ, প্রভেদকরণ, স্মৃতি, যুক্তি—অদসের আদিম-শক্তির মধ্যেই সম্ভাবনা রূপে থাকে। কিন্তু অদসের আধার থেকে মৌলশক্তি ছাড়া পেয়ে যখন নিজস্ব আর একটি অস্তিত্বলাভ করে, অর্থাৎ সুপ্ত সম্ভাবনাগুলি যখন প্রকট হয়ে ওঠে তখনই অহং-এর কাজ শুরু হয়। অহং-এর এই বিকাশের ধারা দীর্ঘ ও অতীব জটিল।

অদসের শক্তি যেখান থেকে অহং-এ রূপান্তরিত হচ্ছে সে প্রক্রিয়াটিকে ফ্রএড্ বলেছেন তাদাত্মীকরণ বা identification। অদসের স্তরে মানসিক ও বাহ্যিক, মনোজগৎ ও বহির্জগতের মধ্যে কোন ভেদ নেই। বাস্তবিক পক্ষে অদসের স্তরে বাহ্য বলে কিছুর অস্তিত্বই নেই। কাম্যবস্তু ও তার কল্পনা দুইই অদসের কাছে সমতুল্য।

কিন্তু এ অন্ধতা দ্বারা পৃথিবীতে পদে পদে ঠকতে হয়। খাদ্যবস্তুর কল্পনা খাদ্যবস্তুর অভাব মেটাতে পারে না। তাই জীবনযাত্রার পথে ঠেকে ঠেকে, এই দুয়ের মধ্যে প্রভেদ করতে ব্যক্তি বাধ্য হয়। এবং জীব ক্রমে বুঝতে পারে খাদ্যের কল্পনার সঙ্গে প্রাপ্তির যোগাযোগ না ঘটাতে পারলে জীবনযাত্রা অচল। তাই এই দুই অর্থাৎ অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের মধ্যে কি করে মিল ঘটাতে হবে এ সমস্যার সমাধানেই অহং-এর জন্ম, বিকাশ ও পরিণতি। এমনি করে ভেতর ও বাইরের মিলের চেষ্টাতেই মানুষের বস্তু-জগতের জ্ঞান ক্রমশ পূর্ণতা-লাভ করে, পূর্বের ভুল ধারণার পরিবর্তন ঘটে। যেমন, আগে মানুষ ভাবত পৃথিবী সমতল, কিন্তু ক্রমেই এ ধারণার সঙ্গে মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতার অমিল হতে থাকল। তাই মানুষ পুরোনো মত পরিবর্তন করে, এ বিশ্বাস

করল, যে পৃথিবী গোলাকার। সমস্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, আমাদের ধারণাকে বাস্তব জগতের সত্যের অনুগামী করা। পূর্বে 'সেকেণ্ডারী প্রসেস্'-এর কথা বলা হয়েছে। তার বিকাশের মূলে আছে মন ও বাহ্য জগতের প্রভেদ সম্বন্ধে জ্ঞান এবং এ দুইয়ের মধ্যে সমন্বয়-সাধনের প্রয়োজনীয়তা। অদসের স্তরে অন্তর্জগৎই সব; বহির্জগত আর অন্তর্জগৎ অভিন্ন। কিন্তু যুক্তি, বিচারবুদ্ধি, বিভেদবোধ অর্থাৎ অহং-এর কাজ তখনই শুরু হবে যখন বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের বিভেদবোধ জাগবে এবং তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য ও মিলের চেষ্টা হবে। অদস্ তো অন্ধ। কিন্তু যুক্তিগত চিন্তা এ অন্ধতা অতিক্রম করেই সম্ভবপর। এ হিসাবে অহং অদসের শত্রু। অদসের রাজ্য হল প্রাইমারী প্রসেস্ বা কল্পনা ও ইচ্ছাপূরণের রাজ্য। অদসের হাত থেকে শক্তিকে কেড়ে নিয়েই অহং-এর বাস্তব চিন্তা বা সেকেণ্ডারী প্রসেস্ শুরু হয়। ব্যক্তিত্ব-বিকাশের ইতিহাসে এই ক্ষমতা বা শক্তির পুনর্বণ্টন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ (This redistribution of energy from the id to ego is a major dynamical event in the development of personality.)

অহং-এর স্তরে যুক্তিগত চিন্তা জীবের মৌলিক প্রয়োজনগুলি মেটাতে অধিকতর সক্ষম হয় বলেই জীবের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে অদসের শক্তি অধিকতর পরিমাণে অহং-এর কাছে হস্তান্তরিত হয়। কিন্তু বাস্তব জগতে ব্যক্তির সমস্ত ইচ্ছাপূরণ সহজে হয় না। তাই অহং-এর যুক্তিগত জীবন একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হয় না। যখন বাস্তব জগতের কঠিন বাধার জন্যে মৌলিক কোন প্রবল আকাঙ্ক্ষা যুক্তিসঙ্গত উপায়ে পূর্ণ হতে পারে না, তখন ব্যক্তি অদসের শিশুসুলভ কল্পনা দ্বারা ইচ্ছাপূরণের চেষ্টা করে। এটি স্বপ্নের মধ্যে সহজে ঘটে,কারণ যখন অহং-এর যুক্তিসঙ্গত চিন্তার দ্বারা কাঙ্ক্ষিত বস্তুকে ব্যক্তি পায় না তখন সে অনেক সময় ইচ্ছাপরিপূরক ভ্রান্ত চিন্তার (**autistic** বা **wishful thinking**) আশ্রয়গ্রহণ করে। আমরা যা চাই, তাই আমরা ভাবতে ভালোবাসি। প্রিয়জন বহুদিন ধরে জ্বরে ভুগছে, রোজই গায়ে হাত দিয়ে ভাবি আজ জ্বরটা কম আছে, এবার সেরে উঠবে। অভ্যস্ত সংস্কার ত্যাগ করে (unbiassed) বস্তুগত চিন্তা বিজ্ঞানীর পক্ষেও যথেষ্ট কঠিন, বারে বারেই অবুঝ অদস্ অহং-এর বস্তুগত চিন্তায় বাধা জন্মায়। কঠিন অভ্যাস দ্বারা অহংকে অদসের পিছুটান কাটাতে হয়। অহং সবল হয়ে যুক্তিগত চিন্তার পথে

অত্যন্ত হলে, ব্যক্তি আর তখন ইনষ্টিংকটের দাসত্ব করে না—তখন তার মনোজগতের প্রক্রিয়াগুলিকে প্রত্যক্ষীকরণ, বিশ্লেষণ, প্রভেদবোধ, বিশুদ্ধ চিন্তা ও বিচারের পথে কাজে লাগায়। কোন ব্যক্তি বা জাতি সেই পরিমাণেই উন্নত যে পরিমাণে সে অদসের দাসত্বমুক্ত হয়ে অহং-এর বস্তুনিষ্ঠ চিন্তার দ্বারা পরিচালিত। এই অহং-এর বিকাশের পথেই মানুষ অন্য সমস্ত পশুর চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব-লাভ করেছে। মানুষের উচ্চতর মানসিক প্রক্রিয়াগুলি অহং-এর বিকাশেই মূল্য লাভ করে (**ego-cathexis**)। তার যুক্তিগত বস্তুনিষ্ঠ জীবনের বিকাশের জন্যে অনেক সময় তাকে আকাঙ্ক্ষার অন্ধ অবুঝ আবদারে বাধা দিতে হয়। জীবনী-শক্তির অপচয়ের পথে এই যে বাধা অহং তার বস্তুনিষ্ঠ জীবনের অনুকূলে সৃষ্টি করে, একে বলা হয়—**anti-cathexis**। Cathexis হচ্ছে আগ্রহ-অনুরাগ-শক্তির বহির্গমনের পথ খুলে দেওয়া। আর **anti-cathexis** হচ্ছে বাধা, শক্তি-ব্যবহারের পূর্বে বিচার-বিবেচনার দ্বারা তার তৎক্ষণাৎ অনর্থক অপচয়-নিবারণ। অদসের cathexis বা অন্ধ আকাঙ্ক্ষার পথে বাধা সৃষ্টি করে অহং-এর anti-cathexis। যেখানে অহং-এর cathexis অতি প্রবল হয়ে অহং-এর anti-cathexis-এর বাধা অতিক্রম করে, সেখানেই ঘটে আবেগ-প্রধান অযৌক্তিক কর্ম (**impulsive action**)।

অহং-এর বিকাশের পথে যুক্তি ও বিচারের প্রবণতা অন্য একটা গতিও নিতে পারে। যে দ্রব্য প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তির প্রয়োজন মেটায় না, অথচ গৌণভাবে তার সহায়ক হয়, অহং-এর শক্তি সে দিকেও ব্যয়িত হতে পারে। সভ্যতা বা জীবনের উচ্চস্তরে বিকাশের এও একটা লক্ষণ যে তো শুধু জীবনধারণের স্থূল প্রয়োজন মেটাবার কাজেই ব্যয়িত হয় না, জীবনের অলঙ্করণও তার উদ্দেশ্য। তাই সভ্য মানুষ শুধু খাদ্যান্বেষণের উপায় চিন্তাই করে না, খাদ্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট নয় এমন গৌণ আচারও প্রতিষ্ঠা করে, অনুসরণ করে, উদ্ভাবন করে জীবনকে অধিকতর উপভোগ্য করে তোলবার জন্য। অহং-এর এই বাড়তি শক্তির জন্যেই মানুষ নানা নতুন রান্নার অনুসন্ধান করে, খাদ্যকে কেন্দ্র করে নানা শোভন সামাজিক রীতি ও আচার গড়ে তোলে—পূর্ববঙ্গে কাসুন্দী তৈরি নানা ধর্মীয়-আচরণের সঙ্গে যুক্ত, জাপানে অতিথিকে চা -দ্বারা অভ্যর্থনা একটি সুচারু আর্ট। অহং-এর বস্তুনিষ্ঠ যুক্তিচালিত জীবন মানুষের মৌলিক সমস্যার সার্থক সমাধানে ক্রমশই অধিকতর সফল হয়।

অনেক কম পরিশ্রমে অধিকতর খাদ্য-সংগ্রহের ও বাসস্থান-সংগ্রহের ব্যবস্থা মানুষ আজ করতে পারে, তার কারণ তার বৈজ্ঞানিক চিন্তা ক্রমেই অগ্রসর হয়ে চলেছে। কাজেই সভ্য মানুষের সমস্ত শক্তি শুধু খাওয়া-পরার স্থূল প্রয়োজনেই ব্যয়িত হয় না, তা অন্য নানাদিকে ছড়িয়ে জীবনে নতুন নতুন আগ্রহ- ও আনন্দ-সৃষ্টি করতে পারে।

অহং-এর এ বাড়তি শক্তি আর একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজে ব্যয়িত হয়,—সে হচ্ছে, অদস্ অহং ও অধিশাস্তার মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয়সাধন। অহং এ কাজে যতটা সফল হয় ততই সুস্থ ও সবল ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। যেখানে এই ত্রিশক্তির মধ্যে বিরোধ প্রবল, সেখানেই ব্যক্তিত্ব দুর্বল, দ্বিধাগ্রস্ত, অসফল ও অসুখী।

অদসের শক্তি চপল—বাধাবন্ধন তার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। সে শক্তি খামখেয়ালী, জেদী, অন্ধ। কিন্তু সে তুলনায় অহং-এর শক্তি সংযত; চিন্তা, যুক্তিবিচারের দ্বারা তার গতি নিয়ন্ত্রিত। আবেগের পথে শক্তি অযথা ব্যয় না করে, তা উচ্চতর মানসিক প্রক্রিয়ার বিকাশ, বিচার ও যুক্তির সংযম, বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষা ও শক্তির সমন্বয় এবং শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি ক্ষেত্রে জীবনের বিস্তারে ব্যবহৃত হয়। ব্যক্তিকে অন্ধ প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্তির পথ সে করে দেয়, যুক্তি ও বিচারের নিয়ন্ত্রণ -দ্বারা।

উচ্চতর নিয়ন্ত্রণের কাজ—অধিশাস্তা

ব্যক্তির নগ্ন আকাঙ্ক্ষা যেমন জগতের বাস্তবতার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়, তেমনি আর একটি উচ্চতর নিয়ন্ত্রণও আছে। সে হচ্ছে সমাজের শাসন, ব্যক্তির মনে যার প্রতিফলন হচ্ছে, নীতিবোধ। শিশু বাল্যে পিতামাতার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। তাঁদের ভালোবাসা ও সমর্থন তার জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। তাই যে ব্যবহারে পিতামাতা বিরক্ত হন তা আপাতক্লেশকর হলেও শিশু তা মেনে নেয়। পিতামাতার শাস্তি ও প্রশংসা তার স্বাধীন অন্ধ আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করে। শাস্তি ও প্রশংসার শক্তি আছে বলেই সামাজিক বুদ্ধি বা অধিশাস্তা শক্তিমান। যা পিতামাতার মতামত তা শিশু নিজের মতামত বলেই গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়। পিতামাতা সমাজ জীবনের প্রতিভূ। তাঁদের প্রশংসার মানই শিশুর মনে সৃষ্টি করে

আদর্শানুরক্তি বা ego-ideal আর তাঁদের নিন্দার মানই হল শিশুর মনে বিবেকের তাড়না বা conscience।

অধিশাস্তার শক্তি নিষেধাত্মক, তা বাধা দেয়। এ শক্তি এক হিসাবে অদসের তৎক্ষণাৎ-সুখের আকাঙ্ক্ষা বা pleasure principle এবং অহং-এর সাংসারিক বা বাস্তববুদ্ধি বা reality principle—এ দুয়েরই বিরোধী, দুয়েরই উর্ধ্বে। নীতিগতভাবে যা আদর্শ, তা ব্যক্তির তীব্র অন্ধ কামনাকে ধিক্কার দেয়। আবার বুদ্ধিবিচারের সংসারী হিসাবকে সে অগ্রাহ্য করে। অহং-এর বিচার বলে, 'এই হয়ে থাকে (this is)', আর অধিশাস্তা আদেশের সুরে বলে, 'এটা হওয়া উচিত (this ought to be)'। অদস্ ও অধিশাস্তা দুই-ই বাস্তব-বিরোধী।

যে মানুষের মধ্যে অধিশাস্তার বাধা অতি প্রবল অর্থাৎ যে মানুষ অতিরিক্ত নীতিবাগীশ, সে মানুষ কোন কাজ করতে পারে না। সে কেবলি খুঁতখুঁত করে, ভয় করে পাছে সে অন্যায় কিছু করে। অহং-এর বাধা (anti-cathexis) ও অধিশাস্তার বাধার মধ্যে প্রভেদ আছে। অহং বলে, "অপেক্ষা কর, আমি হিসেব করে দেখে নিই কি ভাবে কাজ করলে ঈপ্সিত ফল সব চেয়ে বেশী পরিমাণে, সব চেয়ে কম আয়াসে পাওয়া যেতে পারে।" কিন্তু অধিশাস্তা চোখ রাঙিয়ে বলে, "না, খবরদার!" অর্থাৎ সে কর্ম ও কর্মের চিন্তার পথ রুদ্ধ করে দেয়।

অধিশাস্তার গঠনাত্মক দিক হচ্ছে—ব্যক্তিগত নৈতিক আদর্শানুরক্তি বা ego-ideal। সে সর্বদা চায় শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্পূর্ণতা (perfection)। পূর্বেই বলেছি পিতামাতার নৈতিক মানই ব্যক্তি তাদাত্ম্যদ্বারা আপন করে নেয়; এই জন্তেই সমাজে ঐক্য বজায় থাকে, ঐতিহ্যের ধারা অব্যাহত থাকে। যে ব্যক্তির অধিকাংশ শক্তি এই ego-ideal-এর পথেই চালিত হয়, তিনি আদর্শবাদী ও উচ্চমনা। তাঁর কাছে সংসারিক সাফল্যের মূল্যের চেয়ে নৈতিক আদর্শের মূল্য বেশী। এ ব্যক্তি দৃঢ়চেতা এবং আদর্শের জন্তে দুঃখ ও দারিদ্র্য সহ্য করতে প্রস্তুত হন। এমন মানুষের কাছে যুক্তিগত বৈজ্ঞানিক সত্যের (logical truth) চেয়ে অবাস্তব নৈতিক আদর্শ অনেক বেশী সত্য। এঁরা চালাক ও বুদ্ধিমান নন, কিন্তু সমাজের এঁরা নমস্য।

এই আদর্শানুরক্তির মধ্যে ব্যক্তির মস্ত গর্ব ও আনন্দ থাকে। এই হচ্ছে

অধিশাস্তার পুরস্কার। যখন ভালো কাজ করি তখন এ উৎসাহ দিয়ে বলে "সাবাস্ বেটা।" আর অন্যায় কাজ করলেই অনুভব করি পিতামাতার অর্থাৎ বিবেকের বা অধিশাস্তার তিরস্কার—"ছিঃ ছিঃ!"

যখন সৎকাজ করে গর্ব অনুভব করি, তখন নিজেকেই ভালোবাসি। এ পরোক্ষ আত্মরতি (Secondary Narcissism) এবং আদর্শানুরক্তিতে ব্যক্তি নিজেকে পিতামাতা বা সমাজের সঙ্গে একীভূত করে। কাজেই বোঝা যায় এই তাদাত্ম্যতা-প্রক্রিয়া (mechanism of identification) -দ্বারাই অদসের শক্তি অহং বা অধিশাস্তার শক্তিতে পরিবর্তিত হয়। এক হিসাবে দুই-ই অদসের মৌলিক উদ্দেশ্যই অর্থাৎ সুখ-আহরণ ও দুঃখ-বর্জন সাধন করছে। অহং-এর শক্তি অনেক সময় ইনস্টিংকটের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যেই সচেতনভাবে ব্যবহৃত হয়। তেমনি অদস্ নিজে ইনস্টিংকটের উদ্দেশ্যসাধনের জন্যে অধিশাস্তাকেও কাজে লাগায়। অদসের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু-সংগ্রহে শক্তির দ্বারোদ্ঘাটন দ্বারা অস্বস্তি-নিবারণ (release of energy and elimination of tension)। অধিশাস্তার উদ্দেশ্যও মূলত তাই।

অহং ও অধিশাস্তা যেমন অদস্‌কে বাধা দেয়, ধিক্কার দেয়, অদসও তেমনি মাঝে মাঝে প্রতিশোধ নেয়। অদস্ গোপনে অহং-এর বাস্তব বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে, যেমন ঘটে wishful thinking-এর বেলায়। তেমনি ঘৃণাকে অহং-এর বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়ে অদস্ তার শক্তি প্রমাণ করে, প্রতিশোধ নেয়। অন্যায় কাজ করে কখনো কখনো ব্যক্তি এত বেশী আত্মগ্লানি ভোগ করে যে সে নিজ দেহকে আহত করে, যেমন কবি সুরদাস তাঁর কামাতুর চক্ষু দুটিকে উৎপাটন করেছিলেন। আবার বিবেকের তাড়নায় মানুষ আত্মহত্যা করেছে এমন উদাহরণও পাওয়া যায়! এখানে অদসের পীড়নাকাঙ্ক্ষা (instinct of aggression) অধিশাস্তাকে বিকৃত করে অধিশাস্তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিচ্ছে। অদসের ষড়যন্ত্রে অধিশাস্তার বিকৃতির উদাহরণ শুধু আত্মপীড়নে নয় —পরপীড়নেও। অতিরিক্ত সাধু বলে যাঁরা নিজেদের মনে করেন (fanatics) তাঁরাই অবিশ্বাসীদের (heretics) পুড়িয়ে মেরেছেন। আদর্শের নামেই হিট্‌লার জার্মানী থেকে ইহুদী-উৎখাত করেছিলেন। বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এখনও চলে তথাকথিত শত্রুদের নিশ্চিহ্নীকরণ বা liquidation, দেশপ্রেমের ছদ্মবেশে!

অদস্ ও অধিশাস্তার এক বিষয়ে মিল আছে—তারা উভয়েই বাস্তববিরোধী। অদস্ অন্ধ আবেগচালিত, সুতরাং অহং-এর যুক্তিগত বাস্তব চিন্তার সে বিরোধী। অধিশাস্তাও বাস্তবকে অস্বীকার করে, আদর্শের স্বপ্নরাজ্যে বিহারের প্রয়াসী। অদস্ চায় অহংকে নিজের অন্ধ আকাঙ্ক্ষার পথে চালনা করতে। আবার অধিশাস্তাও চায় বাস্তব অস্বীকার করে স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করাতে। অহং-এর মস্ত কাজ হচ্ছে এই শক্তির বৈপরীত্যকে একটি সুষম সমন্বয়ে বেঁধে রাখা।

সর্বশেষে আবারও স্মরণ রাখতে হচ্ছে যে ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন শক্তির যোগফল নয়। ব্যক্তিত্বের সমস্ত শক্তি একই শক্তি। শক্তির বণ্টন ও বিভাগে একের ভাগে যদি শক্তি বেশী পড়ে, তবে অন্য ভাগে তা কম পড়বে। অদস্ অহং ও অধিশাস্তার একটি প্রবল হলে অন্য দুটি দুর্বল হতে বাধ্য। একটি দুর্বল হলে অন্যেরা প্রবল হবে। যে ব্যক্তির অদস্ প্রবল সে আবেগপ্রবণ, যুক্তিদ্বারা বা আদর্শদ্বারা তার জীবন তত বেশী চালিত নয়। আবার যার অহং বা যুক্তি-বিচার প্রবল, সে ঘোর সাংসারিক, বাস্তববাদী; সে আবেগের ধার কম ধারে, আদর্শের স্বপ্নও সে কম দেখে। আর যাঁর অধিশাস্তা প্রবল, তিনি স্বার্থের আকাঙ্ক্ষাকে ঘৃণা করেন, বাস্তবের বাধাকেও অস্বীকার করেন; তিনি স্বপ্ন দেখেন ও নৈতিক আদর্শ-প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু অদস্ অহং ও অধিশাস্তা পরস্পর সহযোগীও বটে। ব্যক্তিত্ব এই তিনের প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতারই ফল। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের লক্ষণ হচ্ছে—সেখানে অদস্ অহং ও অধিশাস্তা একটি সুষম সমন্বয় খুঁজে পেয়েছে।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

মনোবিকলন—তত্ত্ব ও পদ্ধতি

মনোবিকলকদের মতে প্রত্যেক ব্যক্তিতে আদিম কামশক্তি জন্মাবধি নির্দিষ্ট। এ শক্তি সর্বদাই ক্রিয়াশীল এবং স্বাভাবিক ভাবে এ শক্তি বিকাশ-ধর্মী এক স্তর উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চতর স্তরে উত্তরণ করে। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই শৈশবের কামাকাঙ্ক্ষার স্বাভাবিক ও সম্পূর্ণ তৃপ্তির অভাবে অবচেতন মনে গ্রন্থি (complexes—যথা মাতৃ-কাম গ্রন্থি, লিঙ্গচ্ছেদ-আশঙ্কা গ্রন্থি·) সৃষ্ট হয়। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে উদ্গতি এবং তাদাত্ম্য -দ্বারা এই গ্রন্থিগুলির মোচন ঘটে একথা পূর্বে বলেছি। যদি এই গ্রন্থিগুলির যথোপযুক্ত মুক্তি (solution) না ঘটে, যদি উদ্গতির পদ্ধতি -দ্বারা কামাকাঙ্ক্ষা ক্রমশ উর্ধ্বতর স্তরে পৌছতে না পারে অর্থাৎ এই আদিম কামাকাঙ্ক্ষা যদি মধ্যবর্তী কোন স্তরে গতি হারিয়ে কামবস্তুকে আঁকড়িয়ে ধরে থাকে (fixation), তা হলেই ব্যক্তিত্বের বিকার ঘটে। অর্থাৎ কামাকাঙ্ক্ষার মন্ত্র হচ্ছে চরৈবেতি—এ মন্ত্রের আচরণ দ্বারাই এই আকাঙ্ক্ষা বন্ধনচ্ছেদন করে মুক্তিলাভ করে। যতই কামাকাঙ্ক্ষা অন্তর্গামী হবে ততই থাকবে তার বন্ধনের আশঙ্কা ও বিকারের সম্ভাবনা। যতই তা বহির্গামী হবে ততই সে সুস্থ ও সতেজ থাকে।[১] যেখানে এই বর্হিগামিতা (একে উদ্গতিও বলা যায়) অর্থাৎ বাস্তব জগৎ ও জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও সামঞ্জস্যের বেগ রুদ্ধ হয় (fixation); সেখানেই ব্যক্তি বাস্তব জগৎ থেকে বিচ্যুত হয়ে নিজের এক কাল্পনিক জগতে আশ্রয়গ্রহণ করে। এটাই মানসিক বিকারের লক্ষণ। রুদ্ধতার দুইটি পরস্পর সংযুক্ত কুফল—প্রথম হচ্ছে আদিম কামের প্রবল শক্তি বাহ্য বাস্তবের নানা বাধা, বিপদ অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে তাদের জয় করবার জন্যে যথেষ্ট হয় না। কাজেই নানা নিরাশা, দুঃখ, অনুভূতিগত নানা আঘাত ব্যক্তিকে পীড়িত করে।

---

১ Full development...implies a high degree of outward direction of the libido; and of the libido thus turned to object-love a large portion is "sublimated" or directed away from sexual ends to the various objects and activities which together make up human "culture". Flugel—A Hundred Years of Psychology, pp. 284-85.

দ্বিতীয়ত এই প্রাণশক্তির একটা অংশ অবাঞ্ছিত কামনা-বাসনা অবদমনের নিরর্থক কাজে ব্যয়িত হয়ে যায়। পূর্বেই বলা হয়েছে, প্রত্যেক ব্যক্তিতে এই আদিম প্রাণশক্তি সীমাবদ্ধ ও নির্দিষ্ট, কাজেই এই শক্তি কোথাও রুদ্ধ হয়ে থাকলে অন্যত্র স্বাভাবিক অগ্রগতি ও সুস্থ বিকাশের কাজে সে শক্তি যথেষ্ট হয় না। তা হলেই ব্যক্তি অব্যবস্থিত (mal-adjusted) এবং মানসিক বিকৃতিসম্পন্ন (neurotic) বলে বিবেচিত হয়। রুদ্ধতার প্রবণতার প্রকৃতি ও পরিমাণেই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ।[২]

প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই বাল্য কামাকাঙ্ক্ষা-জনিত গ্রন্থির কিছু কিছু উদ্বৃত্ত চিহ্ন থেকে যায় এবং বয়স্ক ব্যক্তির ব্যবহার ও আচরণে তার প্রকাশও কিছু কিছু থাকে। এর মূল কারণ হচ্ছে রুদ্ধতা (fixation)। এই রুদ্ধতা অতিরিক্ত হলেই তা মানসিক বিকৃতি রূপে বিবেচিত হবে। ব্যক্তির মানসিক বিকাশ সুস্থ না বিকৃত, তা নির্ধারণ করতে হলে পাঁচটি প্রশ্ন বিবেচনা করতে হবে। (১) অদস্ তার অবদমিত আকাঙ্ক্ষাগুলিকে এমন ভাবে গোপন করতে পারে কিনা যাতে অহং এবং অধিশাস্তা তাদের চিনতে না পারে? (২) বাস্তব জগতের সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার পক্ষে উপযুক্ত পরিমাণ অদসের শক্তি উদ্বৃত্ত থাকে কি না? অদসের শক্তি রুদ্ধ হয়ে গেলে অবদমনের চেষ্টায় অনেকখানি শক্তিই অপব্যয়িত হয়। (৩) বাস্তব জগতের সমস্যার সমাধান ব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত কঠিন কিনা এবং সে নিজেকে অপ্রতিরোধ্য বাধার সম্মুখীন এবং অসহায় বোধ করে কি না? (৪) অহং অদস্ এবং অধিশাস্তার সঙ্গে সম্পর্কে সবল না দুর্বল? বাল্যোচিত সংঘাতের পীড়নে সে অতিমাত্রায় বিব্রত কি না? (৫) অধিশাস্তা বাল্যের স্বাভাবিক কামাকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে অতিকঠোর ও যুক্তিহীন নৈতিক বিচারেই অভ্যস্ত কি না? যদি এই প্রশ্নগুলি সম্পর্কে ব্যক্তির ব্যবহার অনুকূল ও যথোপযুক্ত হয় তবে তাকে আমরা স্বাভাবিক ও সুস্থ বলব। তা যদি না হয় তা হলেই তাকে বলব মানসিক অসুস্থ বা বিকারগ্রস্ত।

২ ...The psycho-analytic theory holds that the individual's capacity for accomplishment depends on his having an adequate supply of energy available. If too much libido is fixated in infantile wishes, he will be weak and subject to maladjustment and neuroses. Individual differences in the degree of fixation depend upon variations of the psychic energy. Shaffer & Shoben—Psychology of Adjustment, p. 458

সঙ্গতিস্থাপনের কলকব্জা

একদিকে আদিম কামাকাঙ্ক্ষার প্রকাশ্য অথবা গোপন (অবদমিত) প্রবল তাড়না। অন্যদিকে বাস্তব জগৎ ও অধিশাস্তার পদে পদে বাধা, এই বিপরীত শক্তিগুলির মধ্যে সঙ্গতিস্থাপনের চেষ্টা, মানসিক সুস্থ এবং অসুস্থ সমস্ত মানুষই করে থাকে। এর জন্যে অহং কতকগুলি কলকব্জা বা কৌশল ব্যবহার করে, তার অনেকগুলির সঙ্গেই আমাদের ইতিমধ্যে পরিচয় ঘটেছে। অহংকে তিনটি প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়। তার মধ্যে দুটি হচ্ছে আন্তরিক—অদস্ ও অধিশাস্তা; আর একটি হল বাহ্য—বাস্তব জগৎ। এ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অহং একটি সুসঙ্গতিস্থাপনের সতত চেষ্টা করে। যে কলকব্জার মধ্য দিয়ে অহং এই সঙ্গতিস্থাপনের চেষ্টা করে তার কতকের উদ্দেশ্য হচ্ছে অদসের কামাকাঙ্ক্ষার সঙ্গত তৃপ্তিসাধন, আবার কতকগুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে অবদমিত ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে অহং-এর আত্মরক্ষা।

যা অবাঞ্ছিত তার থেকে **আত্মরক্ষার জন্যে অহং যে কৌশল ব্যবহার করে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে অবদমন** (repression)। এটি মনোবিকলন-তত্ত্বের একটি মূল ধারণা। ফ্রএড মানসিক রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে এটি লক্ষ্য করেছিলেন যে আবেশ-স্বারা ব্যক্তির বাল্যজীবনের স্মৃতি পুনরুদ্ধার করতে পারলে তার রোগমুক্তি ঘটে। কিন্তু তিনি বহু ক্ষেত্রেই দেখতে পেলেন রোগী বহু চেষ্টা করেও তার অতীত জীবনের কথা স্মরণ করতে পারছে না, অথবা কেমন যেন ইতস্তত করছে। তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, ব্যক্তির চেতন মনের গভীরে অবচেতনায়ই কোন বাধা (resistance) এর কারণ। এই বাধা দেয় যে শক্তি, তাকেই তিনি অধিশাস্তা (super-ego) বলেছেন। এই অধিশাস্তার চোখ-রাঙানীতেই ব্যক্তির অনেক প্রবল আকাঙ্ক্ষা চেতন মনে বা প্রকাশ্য ব্যবহারে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই বাধার ফলেই গভীর অবচেতনার অন্ধকার কারাগার থেকে সচেতন আলোকে তাদের এনে মুক্তি দেওয়া কঠিন হয়।

বিপরীত প্রতিক্রিয়া অহং-এর আত্মরক্ষার একটি পরিচিত উপায়। ব্যক্তির মধ্যে যে নিন্দিত কামনা প্রবল, তার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে সে তার বিপরীত প্রতিক্রিয়া (reaction formation) ব্যবহার করে। যার মধ্যে চৌর্যবৃত্তির প্রবণতা প্রবল, সে তারস্বরে চৌর্যবৃত্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বক্তৃতা করে।

যুক্ত্যভ্যাস (rationalization) -দ্বারা তার ব্যবহারের পশ্চাতে প্রকৃত অশিষ্ট ইচ্ছা ব্যক্তি নিজের কাছেও গোপন করে সমাজস্বীকৃত আপাত যুক্তিপূর্ণ কারণ-প্রদর্শন করে নিজের আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে চেষ্টা করে।

অভিক্ষেপণ (projection) -দ্বারা ব্যক্তি নিজের অবাঞ্ছিত কামনাগুলি, যেগুলি অদস্ অবদমিত করেছে, সেগুলিকে অন্যত্র আরোপ করে। অনেক বাতুল ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায় তারা অন্যে তাদের হানি করবার চেষ্টা করছে বা নিন্দা করছে অথবা অনুরূপ ভ্রান্তি (delusions) তারা পোষণ করে। বাস্তবিক পক্ষে ব্যক্তির মধ্যে অন্যের হানি করবার গোপন আকাঙ্ক্ষা থাকে। এটা ইদিপাস কমপ্লেক্স-এরই পরিপূরক। এই অন্যায় আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তি নিজের মধ্যে অস্বীকার করে অন্য ব্যক্তিতে তা আরোপ করে।

অহঙ্কারের আত্মরক্ষার অন্যান্য কৌশলগুলি আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

অহং-এর সুস্থ বিকাশের পক্ষে যে প্রক্রিয়া (dynamism) সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় তা হচ্ছে **উদগতি (sublimation)**। এর মধ্য দিয়েই ব্যক্তির আদিম কামাকাঙ্ক্ষা যোনিকেন্দ্রিকতার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে জীবনের বৃহত্তর স্বার্থানুসরণে প্রবৃত্ত হয়।

আর একটি অনুকূল প্রক্রিয়া হচ্ছে **তাদাত্ম্য (identification)**। এর মধ্য দিয়ে শিশু প্রথমে নিজ দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নিজেকে পিতা-মাতার জীবন ও আদর্শের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে। ক্রমশ তার আকাঙ্ক্ষা বৃহত্তর ও মহত্তর গোষ্ঠী বা আদর্শকে আশ্রয় করে ব্যক্তির জীবনের সুস্থ সম্পূর্ণ বিকাশের সহায়ক হয়।

বিপরীতভাবে অসুস্থ ব্যক্তিত্বের সহায়ক প্রক্রিয়া কয়েকটি হচ্ছে **পশ্চাদপসরণ** (regression), **অবচেতন কল্পনা** (unconscious phantasy), **মানসিক বিকৃতিকে দৈহিক রোগে পরিবর্তন** (**conversion**—যেমন আমরা দেখতে পাই **হিস্টিরিয়া-তে**), **অকারণ ভয়***

* মনোবিকলকদের মতে মানসিক বিকারের সমস্ত লক্ষণই কোন গভীর কামাকাঙ্ক্ষা তৃপ্তির বিকল্প উপায়, একথাটা মিথ্যা মনে হতে পারে। কারণ হিস্টিরিয়া, অকারণ ভয় ইত্যাদি লক্ষণ রোগীর পক্ষে ক্লেশকর। কিন্তু এগুলি রোগীর পক্ষে আপেক্ষিকভাবে বাঞ্ছনীয় কারণ কামাকাঙ্ক্ষার সোজাসুজি তৃপ্তি ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয় এবং আকাঙ্ক্ষার অবদমনে মানসিক শ্রম [illegible] সমস্ত মানসিক বিকারেই লক্ষ্য করা যায় অসমের শক্তির বদ্ধতা (fixation)—কোন

(phobia—এ ক্ষেত্রে বাল্যকালে অবদমিত বিষম ভয় পরবর্তী জীবনে অন্য কারণ বা বস্তুতে স্থানচ্যুত হয়, এ কৌশলকে বলে displacement)।[৩]

ফ্রএড্ তাঁর বহু বর্ষব্যাপী অনুসন্ধান ও চিন্তনের দ্বারা দৃঢ়ভাবে এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে মনের সর্বপ্রকার বিকৃতির মূলে থাকে অবদমন। অবদমিত ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিকভাবে যেখানে তৃপ্তির পথ পায় না সেখানে তাদের কেন্দ্র করে অবচেতন মনে অমীমাংসিত সংঘাত (unresolved conflicts) এবং জটিল গ্রন্থির (complexes) সৃষ্টি হয়। ১৯০০ সালে তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ Interpretation of Dreams প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা হিসাবে অবদমনের তত্ত্ব সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেন। তাঁর মতে, স্বপ্ন প্রতীক-সাহায্যে অবদমিত ইচ্ছার পূরণ। অধিশাস্তার চোখ-রাঙানী এড়াবার জন্যে আদিম ইচ্ছাগুলির অনেকগুলি একত্র মিশ্রিত হয়ে সংক্ষিপ্ত আকার (condensation) ধারণ করে, কখনো কখনো তাদের স্থানচ্যুতি (displacement) ঘটে। আদিম আকাঙ্ক্ষা ছদ্মবেশে প্রতীক বা চিহ্নের মধ্য দিয়ে (symbolism) আত্মপ্রকাশ করে।

১৯০৪ সালে তার Psychopathology of Everyday Life প্রকাশিত হয়। তাতেও তিনি অবদমন সংক্ষিপ্তকরণ স্থানচ্যুতি ইত্যাদি একই কলকব্জা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের বহু ভ্রান্তি ও আপাত বিস্মৃতির সুব্যাখ্যায় ব্যবহার করেছেন। ১৯০৫ সালে Wit & Its Relation to the Unconscious গ্রন্থে তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছেন যেসাহিত্য শিল্প ইত্যাদির মধ্যেও মানুষের অবচেতন ইচ্ছা-পরিপূরণেরই প্রয়াস অথবা অপ্রীতিকর বা বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা এড়াবার (escape) চেষ্টা।

সর্বত্রই ফ্রএড দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে জড় বাস্তব জগতে যেমন আকস্মিক (chance) বলে কিছু নেই, মনোজগতেও তাই। সমস্ত মানসিক ক্রিয়ার পেছনেই মানসিক কারণ বর্তমান থাকে (psychological determinism)। তা চেতন মানসিক কারণও হতে পারে, 'অবচেতন' কারণও

কামবস্তুকে শিশুর মতো ব্যক্তি আঁকড়ে ধরতে চায়। সে বন্ধন অতিক্রম করে যাবার শক্তি তার থাকে না। দ্বিতীয় আর এক লক্ষণ হচ্ছে অনুরাগ ও বিরাগ অনুভূতির একই বস্তুতে প্রয়োগ (ambivalence)। শিশুর মতো মানসিক অসুস্থ ব্যক্তিও এই দ্বন্দ্বের এক সুষ্ঠু সমাধানে অপারগ। Shaffer & Shoben—Psychology of Adjustment, pp. 461-62

৩ Shaffer & Shoben—Psychology of Adjustment, pp. 458-60

হতে পারে। প্রায় সমস্ত চেতন ক্রিয়ার পশ্চাতেই অবচেতন মনের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়।[৪]

মনোবিকলনের পদ্ধতি

ফ্রএড্ দেখেছিলেন যে সমস্ত মানসিক অসুস্থতার পশ্চাতে রয়েছে অবদমিত তীব্র আকাঙ্ক্ষা-অনুভূতির জট। তাদের আশ্রয় মনের গভীর অন্ধকার অবচেতনায়। সেই জন্যে তারা সচেতন মনের যুক্তি-বিচার-বুদ্ধির নাগালের বাইরে। সচেতন মনের সমস্ত সমস্যা-সমাধানের শ্রেষ্ঠ উপায় বুদ্ধি-বিচার। ফ্রএড্ তার গুরুত্ব অস্বীকার করেন না। কিন্তু অবদমিত ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার অস্তিত্ব সম্পর্কেই তো ব্যক্তি সচেতন নয়। তাদের অন্ধকার খোলসের ভেতর থেকে টেনে বের করে আনতে পারলে তবেই তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করা সম্ভবপর। কি উপায়ে তা সম্ভবপর?

প্রথম যখন ফ্রএড মানসিক রোগ-চিকিৎসার বিষয়ে শারকো-র (Charcot) কাছে শিক্ষালাভ করবার জন্যে প্যারীতে গিয়েছিলেন—তখন তাঁরা সম্মোহন-পদ্ধতি বা আবেশ (hypnosis) -দ্বারা রোগীর পুরাতন স্মৃতির উদ্ধার করে চিকিৎসায় সুফল পেয়েছিলেন। কেন এটা হয় সে বিষয়ে শারকো খুব গভীরভাবে চিন্তা করেন নি, কিন্তু মনে হয় তিনি এটা বুঝেছিলেন যে হিস্টিরিয়া রোগীদের উপসর্গের মূল সর্বদাই যৌন-আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি। এই অস্পষ্ট চিন্তার বীজ থেকেই ক্রমে ফ্রএড-এর মনোবিকলন-তত্ত্বের বিরাট মহীরুহ গড়ে ওঠে। যাই হোক্ মানসিক রোগের চিকিৎসার পদ্ধতি হিসাবেই প্রথম আবেশ-পদ্ধতি ব্যবহৃত হতে লাগল। ফ্রএড্ প্যারী থেকে ফিরে এসে ব্রয়ার-এর সহযোগিতায় হিস্টিরিয়া রোগীদের চিকিৎসা শুরু করলেন। তাঁরা আবিষ্ট অবস্থায় রোগীদের তাদের বাল্যজীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ সমস্ত কাহিনী অনর্গল বলে যেতে উৎসাহিত করতেন। অনেক সময় এইভাবে রোগীর অতীত জীবনের বিস্মৃত কাহিনী তাদের মনে পড়ে যেত যা তারা একেবারে ভুলেই গিয়েছিল। এটা দেখা যেত স্বচ্ছন্দভাবে অতীত জীবনের কাহিনীগুলি বলে ফেলে রোগীর মনের বোঝা হালকা হয়ে যেত এবং অনেক সময় তারা সুস্থ হয়ে উঠত। এই মনের কথা বলে ভারলাঘব-পদ্ধতির (the talking-

[৪] Flugel—A Hundred Years of Psychology, p. 233

out method) উন্নতিবিধান করেই পরে ফ্রএড্ বিখ্যাত মুক্ত অনুষঙ্গ -দ্বারা মনোবিকলন-পদ্ধতির (Psycho-analysis through the method of free association) প্রবর্তন করেন।

যাই হোক্, ফ্রএড্ সম্মোহন বা আবেশ -দ্বারা মানসিক রোগীর চিকিৎসার আরো অভিজ্ঞতা থেকে এই পদ্ধতির কতকগুলি অসুবিধা দেখতে পেলেন। তিনি দেখলেন যে, অনেক রোগীই অতীত জীবনের স্মৃতির পুনরুদ্ধারকালে মাঝে মাঝেই বলে, 'কিছু মনে আসছে না', কখনো কখনো অস্বস্তি বোধ করে, অস্থিরতা প্রকাশ করে, বলে 'কষ্ট হচ্ছে' ইত্যাদি। তিনি দেখলেন, চিকিৎসক অভিভাবন (suggestion) -দ্বারা রোগীকে ক্ষণিক শান্তি দিতে পারেন বটে, কিন্তু রোগীর সহযোগিতা সম্পূর্ণ না পেলে, রোগীকে একেবারে সুস্থ করে তোলা যায় না। অর্থাৎ তিনি এটা বুঝতে পারলেন যে রোগীর মনেই আছে তার রোগ-উপশমের বিরুদ্ধে বাধা (resistance) এবং আবেশ-ক্রিয়ার দ্বারা সে বাধা দূর করা যায় না। আরো দেখা গেল গভীর আবেশ (deep hypnosis) না হলে এ চিকিৎসায় সুফল পাওয়া যায় না; গভীর আবেশের প্রতিক্রিয়া কখনো কখনো বিপজ্জনক; আবার এ-ও দেখলেন যে সব রোগীকে আবিষ্ট করা যায় না এবং আবেশ -দ্বারা রোগের উপশম হলেও সম্পূর্ণ নিরাময় করা সম্ভব নয়। এ সব থেকে ফ্রএড-এর মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হল যে আবেশ-পদ্ধতির দ্বারা রোগের মূলে পৌঁছানো যায় না—এর দ্বারা তাকে এড়িয়ে যাওয়া হয়। রোগীর অবচেতন মনে কোন না কোন বাধা সম্পূর্ণ উল্লংঘন করা যাচ্ছে না বলেই এ পদ্ধতি সম্পূর্ণ সফল হতে পারছে না।[৫]

এর পর ফ্রএড্ আবেশ-পদ্ধতির পরিবর্তে রোগীকে আরামে শান্তভাবে শুইয়ে তার রোগ-সম্পর্কিত যে কোন কথা তার মনে আসে তা নির্দ্বিধায় বলে যেতে উৎসাহিত করে দেখলেন যে এ-পদ্ধতি আবেশ-পদ্ধতির চেয়ে কঠিন হলেও তাতে বেশী ভাল ফল পাওয়া যায়। আবিষ্ট অবস্থায় রোগীর ইচ্ছা-শক্তি স্তিমিত এবং চিকিৎসকের অভিভাবন (suggestion) -দ্বারা সে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত। অধিশাস্তার শাসন আবিষ্ট অবস্থায় শিথিল হওয়াতে রোগীর অবচেতন মনের গোপন অবদমিত ইচ্ছাগুলি আত্মপ্রকাশের সুযোগ

৫ Some obstacles or barriers were circumvented, rather than overcome by the hypnotic method. Flugel—A Hundred Years of Psychology, p. 281

পায়, কিন্তু তারা রোগীর সচেতন মনের সামনে এসে ব্যক্তির সঙ্গে খোলাখুলি বোঝাপড়া করে না। আবিষ্ট অবস্থার অবসানে ব্যক্তি স্মরণ করতে পারে না সে কি কথা বলেছে। তাই সেই পদ্ধতিতে ব্যক্তির অবচেতন মনের অবদমিত আকাঙ্ক্ষার যে সংঘাত তার সম্পূর্ণ অবসান হয় না। তার অবচেতনায় যে জটিল গ্রন্থি সৃষ্টি হয়েছিল তার সম্পূর্ণ উন্মোচন ঘটে না। নতুন পদ্ধতি অনুযায়ী চিকিৎসককে রোগীর সঙ্গে একটি **সহানুভূতিসূচক বন্ধু ও উপদেষ্টার সম্বন্ধস্থাপন করে নিতে হবে** যাতে রোগী তার জীবনের সমস্ত কাহিনী **নিঃসঙ্কোচে** প্রকাশ করে বলতে পারে। **এটি মনোবিকলন-প্রণালীর পক্ষে অত্যাবশ্যক**। রোগী তার মনের মধ্যে যে কোন কথা আসুক—তা যত তুচ্ছ, যত অসম্ভব, যত হাস্যকর, যত কুৎসিত বা বেদনাদায়কই হোক্ না কেন—অনবরত বলে যেতে থাকবে। এক কথার সঙ্গে স্মৃতির সূত্রে গ্রথিত অন্য কথা সে বলতে থাকবে—অনেক অবান্তর কথাও সে বলবে। যখন দেখা যাবে রোগী ক্লান্ত বোধ করছে, কোন কোন কথা বলতে অনিচ্ছা বা বিরক্তি প্রকাশ করছে—তখন সেদিনের মতো চিকিৎসক-রোগীর কথোপ-কথন বন্ধ থাকবে। চিকিৎসক যথাসম্ভব নিজের অভিভাবন -দ্বারা রোগীকে প্রভাবিত না করতে চেষ্টা করবেন। তবে যেখানে রোগী অতীত জীবনের কোন কাহিনী স্মরণ করতে অসুবিধা বোধ করছে, সেখানে তিনি নিজ অভিজ্ঞতা এবং মনোবিকলন -সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ জ্ঞান অনুসারে, তাকে তার স্মৃতিশক্তির কাজে সাহায্য করবেন। সর্বদাই উদ্দেশ্য হবে রোগীর অবচেতন মনে যে রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা বা অমীমাংসিত সংঘাত আছে তার প্রকৃত স্বরূপ তাকে স্পষ্টভাবে বুঝতে সাহায্য করা এবং রোগী যাতে তার সম্মুখীন হয়ে যুক্তি ও সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে তার সমাধান করতে পারে সে চেষ্টা করা। কিছুদিন ধরে এই মুক্ত অনুষঙ্গ-প্রণালী অনুসরণ করলে বহু অবান্তর কথার অন্তরালে অনেক সময় ছদ্মবেশী রোগের মূলটিকে অভিজ্ঞ চিকিৎসক চিনে নিতে পারেন এবং তা রোগীর চেতনার সামনে উদ্ঘাটিত করে দিতে পারেন। রোগী তখন বুঝতে পারে তার মনের ভয়, দুর্ভাবনা ইত্যাদি বাস্তবিক পক্ষে অর্থহীন। তার অন্তরের গোপন সংঘাতের স্বরূপও সে বুঝতে পারে এবং নিজের সচেতন ইচ্ছাশক্তি দিয়ে সে সমস্যার সমাধান করতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে ফ্রয়েড-এর মনোবিকলন -দ্বারা চিকিৎসার মূল কথা হচ্ছে যে রোগী নিজেই

নিজের রোগ-নিরাময় করে—চিকিৎসক তার অবচেতন মনে অবরুদ্ধ বিষাক্ত শক্তিকে পথের বাধা অপসারণ করে মুক্তির পথ করে দেন। এই জন্যেই এই পদ্ধতিকে মনোবিকলকেরা বলেছেন রেচন-প্রক্রিয়া (abreaction or catharsis)।

এই চিকিৎসা-পদ্ধতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর হচ্ছে স্থানান্তরণ (transference)। আগেই বলেছি যে এই পদ্ধতিতে চিকিৎসককে রোগীর সঙ্গে একটি অসঙ্কোচ বিশ্বস্ততা ও অকৃত্রিম শুভানুকাঙ্ক্ষীর সম্বন্ধস্থাপন করতে হবে। অর্থাৎ চিকিৎসক হবেন রোগীর কাছে পিতৃস্থানীয় (father-surrogate)। মুক্ত অনুষঙ্গ-প্রণালীর (method of free association) দ্বারা রোগীর রুদ্ধ কামনার মূল শিথিল হয় এবং তা স্রোতাপন্ন হয়। তখন রোগীর মনের সেই শৃঙ্খলমুক্ত কাম চিকিৎসককেই কামবস্তু হিসাবে অবলম্বন করতে চায়। এটি মানসিক রোগের নিরাময়ের একটি অত্যাবশ্যক অথচ সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা (a critical stage)[৬]—শিশু যেমন পিতামাতাকে ভালোবাসে, তাঁদের ওপর নির্ভর করে, তেমনি আবার তাঁদের প্রতি বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করে (ambivalent attitude)। এ সময়ে অনেক রোগিনী চিকিৎসকের প্রতি প্রবল অনুরাগ প্রকাশ করতে থাকে। এই রকম কয়েকটি ঘটনার পর ফ্রএড্-এর সহকর্মী ব্রয়ার মনোবিকলন-পদ্ধতি -দ্বারা মানসিক রোগ-চিকিৎসার পথ ছেড়েই দিয়েছিলেন। কিন্তু ফ্রএড্ চিন্তা করতে লাগলেন কেন এটা হয়। তিনি বুঝলেন রোগীর বাল্যের ইদিপাস্ বা ইলেক্‌ট্রা কমপ্লেক্‌স মুক্ত অনুষঙ্গ-পদ্ধতি -দ্বারা মুক্তি পেয়ে এবার পরিবর্তে নূতন কামবস্তু চিকিৎসককে (যিনি পিতামাতা-কল্পের স্থলাভিষিক্ত) আশ্রয় করে তার প্রতি গভীর আসক্তি-গভীর বিদ্বেষ এই উভমুখী অনুভূতি প্রকাশ করছে। এই বন্ধনদশা থেকেও রোগী বা রোগিনীকে মুক্তি দিতে হবে। বৈজ্ঞানিক নিরাসক্ততা -দ্বারা চিকিৎসক রোগী বা রোগিনীর অনুরাগ-বিরাগের প্রকৃত তাৎপর্য তাদের

---

৬ When the patient begins to recall and relive the emotional conflicts of his childhood, he assumes toward the psychoanalyst an attitude such as he had, as a child, toward his father; this attitude known as "transference" is essential to cure. Shaffer & Shoben—Psychology of Adjustment, p. 463

also Murphy—A Briefer General Psychology, p. 505

কাছে ব্যাখ্যা (**interpretation**) করে রোগী বা রোগিনীকে তাদের অবচেতন মনের দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হয়ে তার সমাধানে সাহায্য করেন। রোগীর কামাকাঙ্ক্ষা তার স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করে এবং রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে।[৭] রোগী যখন নিজে তার সমস্যার স্বরূপ বুঝতে পারে, নিজেই তার সম্মুখীন হবার সাহস অর্জন করে তখনই সে প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠবার পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ করে।

মানসিক রোগীদের মনোবিকলন-পদ্ধতি -দ্বারা চিকিৎসার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া হচ্ছে রোগীর স্বপ্ন-বিশ্লেষণ ও -ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যা দুভাবে হয়। ফ্রএড-এর স্বপ্ন-ব্যাখ্যার মূলসূত্র হল যে, স্বপ্ন ব্যক্তির ইচ্ছাপূরণের একটি সহজ উপায়। অধিশাস্তার শাসনে ব্যক্তির যে সব কামাকাঙ্ক্ষা অবদমিত হয় সেগুলিই ঘুমের মধ্যে অধিশাস্তার শিথিল প্রহরার সুযোগে ছদ্মবেশে ব্যক্তির মনের সামনে এসে উপস্থিত হয়। অধিকাংশ স্বপ্নেই যে ছবি ব্যক্তির মনের সামনে উপস্থিত হয় (**manifest content**) তা তার প্রকৃত তাৎপর্য নয়। তার প্রকৃত অর্থ গোপন থাকে এবং তা সংক্ষেপীকরণ,

---

৭ The free association method is employed by having the patient lie on a couch and relax, and then relate everything that comes to his mind. The relaxation and the reclining posture tend to minimize the influence of repression through their similarity to the state of sleep. Starting with some idea connected with his difficulties, the patient is made to tell everything that he thinks of, no matter how painful it may be or, on the other hand, how trivial or apparently irrelevant. Psycho-analysts are strict in enforcing the "conditions of free association". *Everything must be told, everything is really relevant and meaningful.* ...Through his training in psycho-analysis he penetrates the disguises and recognizes repressed material that is unintelligible to the patient himself. When the patient hesitates in the association process or when he protests that the ideas brought up are either too private or too trivial to tell, the presence of resistance and repression is indicated. As transference to the analyst progresses the resistances are broken down and the patient tells the analyst everything.

...The process of interpretation plays a large part in the treatment...The object of interpretation is to break down resistance, by revealing to the patient their origin in the infantile complexes...Dependence is placed on freeing the libido and strengthening the ego, after which the patient can solve his problems unaided.

(condensation) স্থানান্তরণ (transference) প্রতীকগ্রহণ (symbolism) ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ছদ্মবেশী রূপ ধারণ করেন। অভিজ্ঞ মনোবিকলন রোগীর স্বপ্নবৃত্তান্তগুলি বিশ্লেষণ করে কতকগুলি পুনঃ পুনঃ সংঘটিত প্রতীকের অর্থ সহজেই বুঝতে পারেন। তা ছাড়া রোগীর স্বপ্ন সম্বন্ধেও রোগীর সঙ্গে মুক্ত অনুষঙ্গ পদ্ধতি-অনুযায়ী চিকিৎসক নিঃসঙ্কোচে আলাপ করে তার অবদমিত সংঘাতের মূল কোথায় তার ইঙ্গিত পান। অবশ্য এই ব্যাখ্যার কাজটি মোটেই সহজ নয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই দীর্ঘদিন সহৃদয়তা ও ধৈর্য সহকারে রোগীর অনুষঙ্গগুলি আলোচনা না করলে সেই বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ মনের জটটি কোথায় এবং তার প্রকৃতি কি, তা ঠিক ধরা পড়ে না। অনুষঙ্গ-প্রণালীর ব্যবহার এবং ব্যাখ্যা এই দুই উপায়েই রোগীর বাল্যের অবদমিত জটিল গ্রন্থির সন্ধান পাওয়া যায় এবং তার স্বরূপটি রোগীর সামনে উদ্ঘাটিত করে তার প্রকৃত তাৎপর্য রোগীর কাছে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা যায়। তখনই রোগী নিজেকে জানতে পেরে নিজ সমস্যা সমাধানে নিজেই অগ্রসর হয়। যেমন জ্ঞানের রাজ্যে তেমনি মানসিক রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে ব্যক্তিজীবনের মূল মন্ত্র হল "আত্মানং বিদ্ধি"। যে আত্মাকে জানে সে-ই বাস্তবিক বন্ধনমুক্ত হয়। মানসিক রোগ সম্বন্ধে এ কথা খুব জোর করেই বলা চলে যে রোগীর নিজের কাছে রোগের কারণ যখন স্পষ্ট হয় তখনি সে আরোগ্যের পথে অগ্রসর হয়।[৮]

ফ্রএডীয় মনোবিকলনবাদের তাৎপর্য

ফ্রএড-এর মতামত আমরা গ্রহণ করি আর না করি, মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তা যে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর অবচেতন মন বা নির্জ্ঞানের ধারণা মনের পরিধিকে অনেকখানিই বাড়িয়ে দিয়েছে এবং ব্যক্তিত্বের রহস্যকে ব্যাখ্যা করতে অনেকখানি সাহায্য করেছে।

ফ্রএড্ বাল্যকালের অভিজ্ঞতাকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দিয়েছেন। ইতিপূর্বে

৮ ...The diagnosis of a psychological difficulty may be almost equivalent to an immediate cure. This fact appears nowhere to better advantage than in the use of the method of diagnosis known as the psycho-analytic method. Griffith—An Introduction to Applied Psychology, p. 345

মনোবিদেরা প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের মনই বিশ্লেষণ করেছেন, তাকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন; শিশুর মনকে তাঁরা বড়দের মনের ক্ষুদ্রতর সংস্করণ বলেই মনে করেছেন এবং তার পৃথক আলোচনার কোন প্রয়োজন তাঁরা বোধ করেন নি। কিন্তু ফ্রএড্ দেখিয়েছেন যে বাল্যের অনুরাগ-বিরাগ বিশেষ করে পিতামাতার সঙ্গে তার অনুভূতিগত সম্বন্ধের ওপরই নির্ভর করে ভবিষ্যৎ সুস্থ বা অসুস্থ ব্যক্তিত্ব।

তাঁর যে মতের জন্যে তিনি সর্বাপেক্ষা নিন্দিত হয়েছেন তা হল যে তিনি আদিম কামাকাঙ্ক্ষাকেই জীবনের কেন্দ্র বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। এমন কি তিনি শিশুর জীবনেও এই কামাকাঙ্ক্ষার নিশ্চিত চিহ্ন দেখতে পেয়েছেন এবং জীবনের সমস্ত উদ্যম-ইচ্ছার মূল তিনি যৌন-চেতনার মধ্যেই খুঁজেছেন। শারকো একটি হিস্টিরিয়া রোগিনীর চিকিৎসার বিষয়ে আলোচনা কালে বলেছিলেন—"এসব ক্ষেত্রে যৌন-চেতনাই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—সর্বদা, সর্বদা, সর্বদাই।" কিন্তু এ চিন্তাকে তিনি একটি সুসংবদ্ধ মতবাদে পরিণত করেন নি। কিন্তু ফ্রএড্ এই চিন্তাকেই তাঁর মতবাদের কেন্দ্রবিন্দু করে তার ওপর ভিত্তি করেই তাঁর মনোবিকলন মতবাদের বিরাট হর্ম্য গড়ে তুলেছিলেন। তিনি লোকনিন্দা উপহাস নির্যাতন উপেক্ষা করে বিজ্ঞানীর একনিষ্ঠ নির্মমতা ও নৈর্বক্তিকতা নিয়ে তাঁর যোনিকেন্দ্রিক মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে আমৃত্যু চেষ্টা করেছেন। সম্ভবত তাঁর চিন্তায় তিনি যৌনতাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়েছেন।[৯] আমরা দেখেছি য়ুঙ্গ, অ্যাডলার, আর্নেস্ট জোনস্ প্রমুখ অনুগামীরা ফ্রএড-এর মূল তত্ত্ব গ্রহণ করলেও যৌনতাকেই জীবনের সমস্ত ব্যাখ্যার মূল বলে গ্রহণ করেন নি। অবশ্য তাঁরাও স্বীকার করেছেন যে ইতিপূর্বে মনোবিদেরা যৌন-চেতনার প্রকৃত গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন নি। ফ্রএড-ই নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন যে, "মানুষ নিজেকে যতটা নীতিবান বলে বিশ্বাস করে, বাস্তবিক পক্ষে সে ততটা নয়।" যাকে বলা হয় কুপ্রবৃত্তি, তার বীজ শিশুর মনের মধ্যেও রয়েছে। কিন্তু

৯ Freud attributed immense significance to sex. An impulse of obvious importance which had long been neglected by psychologists had at last received full justice (or, as some think, more than justice). Flugel—A Hundred Years of Psychology, p. 285

মনোবিকলকদের অনুসন্ধানের ফলে এটাও স্বীকার করতে হবে মানুষের নীতি-বোধও তার জীবনের একটি মৌলিক সত্য—"তার নিজের যে ধারণা রয়েছে তার চেয়েও সে অনেক বেশী নীতিবান।"[১০] আমরা দেখেছি যে, শিশুর অন্তরে যে অধিশাস্তা তার শাসন অনেক বেশী কঠোর ও নির্মম।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ফ্রএড-এর অবদমন-তত্ত্ব ও তাঁর মনো-বিকলন-পদ্ধতি মানুষের ব্যক্তিত্ব বুঝতে আমাদের অনেকখানি সাহায্য করেছে এবং মানসিক অসুস্থতার চিকিৎসায় এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। আর্নেস্ট জোন্‌স-এর বিষঙ্গের(dissociation) ধারণা এবং য়্যুঙ্গ-এর জটিল-গ্রন্থির (complexes) ধারণা ফ্রএড-এর মতবাদের পুষ্টিসাধন করেছে।

ফ্রএড-এর মত যে মূলত নির্ভুল তার প্রমাণ এ থেকেই মিলবে যে তাঁর মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত মুক্ত অনুষঙ্গ-প্রণালী-ভিত্তিক মনোবিকলন-পদ্ধতি -দ্বারা মানসিক রুগ্‌ণ ব্যক্তিদের চিকিৎসা করে অনেক ক্ষেত্রে আশ্চর্য সুফল পাওয়া গেছে। তবে এটা ঠিক যে এ-পদ্ধতি বহু সময়- ও ব্যয়-সাপেক্ষ এবং অভিজ্ঞ, সহৃদয়, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় পটু মনোবিকলকের সুচিকিৎসা ছাড়া স্থায়ী সুফললাভের আশা নিতান্তই কম। তা ছাড়া মনোবিকলনের প্রণালীকে বৈজ্ঞানিক ফর্মুলার ধরাবাঁধা ছকে ফেলা যায় না এবং এর মধ্যে অভিজ্ঞ সমীক্ষকের অন্তর্দৃষ্টির যথেষ্ট স্থান আছে। সুতরাং আজও পরীক্ষণ-ভিত্তিক চিকিৎসাশাস্ত্রে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা এই পদ্ধতিকে অনেকটা সন্দেহের চোখে দেখে থাকেন।[১১]

ফ্রএড-এর স্বপ্নের ব্যাখ্যাও অভিনব এবং যদিও তাঁর সমস্ত স্বপ্ন-কাহিনীর

১০ Having already shown, in Freud's words that man is "far more immoral than he believed" psycho-analysis has in its more recent developments made us realize also that "he is far more moral than he had any idea of." Ibid, p. 291

১১ As a form of treatment it has now taken a recognized place in most civilized countries, and a new field has been opened in quite recent years by the extension (with a few modifications) of the analytic method to young children. But in its present form, it has the serious disadvantage of being slow and costly—and the attempts that have been made to shorten it have so far met with but doubtful or indifferent success. ...The trouble with psychoanalysis at present is that there is too much of the art about it, and too little of the scientific method.

ব্যাখ্যা আমরা গ্রহণযোগ্য মনে করি না, তথাপি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ব্যক্তির অনেক অবদমিত গোপন ইচ্ছা স্বপ্নের মাধ্যমেই পরিপূরণের চেষ্টা হয়। স্বপ্নের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সূত্র হিসাবে ফ্রএড অদস্‌ ও অধিশাস্তার ক্রিয়ার যে বিবরণ দিয়েছেন তা কোন কোন ক্ষেত্রে কষ্টকল্পিত হলেও মোটামুটিভাবে তা সত্য।[১২]

জীবনে বুদ্ধির স্থান সম্বন্ধে ফ্রএড-এর মত

অনেক সময় ফ্রএড-এর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা হয় যে তাঁর মতে মানুষ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব একথা সত্য নয়—বরঞ্চ বলা যায় মানুষ নির্জ্ঞান অথবা অন্ধ সহজ প্রবৃত্তি (instincts) দ্বারাই চালিত। এ কথা অবশ্যই সত্য যে আমরা যে কাজগুলি বা ইচ্ছাগুলি স্বচ্ছ বিচার-বুদ্ধি-দ্বারা পরিচালিত বলে মনে করি তার অনেকের পেছনেই রয়েছে নির্জ্ঞান মনের বিপুল প্রভাব। কিন্তু তিনি বারে বারেই এ কথা বলেছেন যে নির্জ্ঞানের উদ্‌ঘাতিতেই মানুষের সত্যিকারের পূর্ণবিকাশ। তিনি একথাই বারে বারে বলতে চেয়েছেন যে বুদ্ধিবিবেচনা দিয়েই মানুষ তার অন্ধ অদস্‌ ও যুক্তিহীন নির্মম অধিশাস্তার বিশৃঙ্খল শক্তিকে সংযত করে প্রকৃত ভাবে সুখী হতে পারে। ফ্রএড্‌ সম্বন্ধে একথা **নিতান্তই ভুল যে তিনি আদিম কামাকাঙ্ক্ষার নির্লজ্জ পরিতৃপ্তির পরামর্শই দিয়েছেন।** বরঞ্চ ফ্রএড বলেছেন যুক্তি-বুদ্ধি-বিচার দিয়ে যতই অহং-এর শক্তিকে আমরা প্রবল করে তুলতে পারব এবং বুদ্ধিদীপ্ত সহৃদয় অহং যখন নির্লজ্জ অদস ও ক্ষমাহীন অধিশাস্তার অন্ধ যুক্তি-হীনতাকে শাসন করতে শিখবে ততই জীবনে সে সফল ও সুখী হবে। তিনি আশাবাদী এবং তিনি বলেছেন অন্ধ সংস্কারের তুলনায় বুদ্ধির দুর্বলতা সত্ত্বেও

১২ Freud's statements on the dream-mechanisms are now widely accepted, but there is still considerable scepticism about other parts of the theory—in particular his view that all dreams are wish-fulfilments, direct or disguised. This view has been criticized by Hadfield and scornfully dismissed by Eysenck. His is not however as absurd as it appears at first sight. Freud did not say that the central element in every dream is a wish-fulfilment—that if we dream we are going to be hanged, for example, it means that we unconsciously want to be hanged. What he asserts could perhaps be better expressed by saying that every dream *contains a wish*. Rex & Margaret Knight—Modern Introduction to Psychology, p. 258

এবং নানা বিফলতা ও নৈরাশ্যের লক্ষণ উপস্থিত থাকলেও ক্রমেই বুদ্ধিদীপ্ত অহং-এর আদেশে মানুষ তার জীবনকে সংযত করে আত্মস্থ হবে এবং স্বরাজ্য লাভ করবে।[১৩]

অনিয়ন্ত্রিত অদস্‌ই নয়—অসংস্কৃত অধিশাস্তাও ব্যক্তি ও সমাজের জীবনের বহু দুঃখ ও মনস্তাপের জন্যে দায়ী। সুতরাং বুদ্ধি যেদিন ব্যক্তি ও সমাজের পরিচালনার ভারগ্রহণ করবে সেদিন সমাজজীবনের বহু অপ্রয়োজনীয় নিষ্ঠুর অত্যাচার ও পীড়নের অবসান হবে।[১৪]

১৩ We may insist as much as we like that human intellect is weak in comparison with human instincts, and be right in doing so. But nevertheless there is something peculiar about this weakness. The voice of the intellect is a soft one, but it does not rest until it has gained a hearing. Ultimately after endlessly repeated rebuffs, it succeeds. This is one of the few points in which we may be optimistic about the future of mankind ...The primacy of the intellect certainly lies in the far, but still probably not infinite distance. Freud—The Future of an Illusion, (1943) p. 93

১৪ There is often enough a conflict between reason and conscience (which is merely the conscious part of the super-ego), and psychoanalysis shows that, in a progressive and rapidly changing civilization like our own, our over-rigid and archaic morality is in some respects just as big an obstacle to successful adaptation as our instincts are. This is true in the individual and in the community as a whole.

These new discoveries of psycho-analysis would seem...to have cast a new light upon an all-important aspect of human personality, the moral aspect, in virtue of which man has learned to control his individualistic impulses and become a social animal ...nowhere else than in the psychology of the unconscious is there to be found the knowledge which may enable us to employ these abilities in a fundamentally more reasonable way; so as to find a means of escape from the predicament at once ridiculous and tragic in which by general consent, civilization finds itself in the present critical moment of its history. Flugel—A Hundred Years of Psychology

উনত্রিংশ অধ্যায়

অবচেতনবাদ

অন্তর্জ্ঞান, আসংজ্ঞান, সহাবসংজ্ঞান, নির্জ্ঞান বা মগ্নচৈতন্য

মানুষের মনের কথা যখন বলি, তখন সাধারণত তার চেতন অবস্থার কথাই আমরা চিন্তা করি। রাগ দুঃখ প্রত্যক্ষণ ইচ্ছা এ সবই **চেতন অবস্থা** (conscious)। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারি, চেতন অবস্থাগুলিই মনের সবটা নয়। আমাদের যখন কোন বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়, তখন তা মনের আলোকিত চেতন স্তরে অবশ্যই থাকে। কিন্তু কিছুদিন পরে ঘটনাটা যখন ভুলে যাই তা চেতন স্তর থেকে লুপ্ত হয়। আমরা বলি, মনে নেই। কিন্তু সত্যই কি অভিজ্ঞতার সমস্ত ছাপ মন থেকে চিরতরে মুছে গেছে? তা তো নয়। অনেক সময়ই কিছু চেষ্টা করে আবার সে ঘটনাটা মনে করতে পারি। স্পষ্টতই বোঝা যায়, যখন ঘটনাটা ভুলে গেছি, তখনও তা মনের মধ্যে ছিল, যদিও তা চেতনার মধ্যে ছিল না। তা হলে মানতে হয় মনের মধ্যে চেতনার নিচে আর একটি স্তর আছে, তাকে বলতে পারি **অন্তর্জ্ঞান** (subconscious)। এই যে মনের বিস্মৃত অবস্থাগুলি, যা সামান্য চেষ্টায়ই ব্যক্তি আবার চেতনার আলোকিত স্তরে টেনে তুলতে পারে, তাদের ফ্রএড নাম দিয়েছেন **foreconscious**—যার বাংলা করা হয়েছে **আসংজ্ঞান**। আবার এমনও দেখা যায় যে সংবেশিত অবস্থায় অভিভাবনের ফলে (under hypnotic suggestion) ব্যক্তি নিজ সুদূর শৈশবের এমন সব অভিজ্ঞতার কথা বলে, যা সংবেশিত অবস্থা অতিক্রান্ত হয়ে গেলে চেষ্টা করেও সে কিছুতেই স্মরণ করতে পারে না। কিন্তু অনুসন্ধান করে জানা যায় সত্যিই তেমন ঘটনা ব্যক্তির বাল্যকালে ঘটেছিল। তা হলে মানতে হয়, অন্তর্জ্ঞানের গভীরেও মনের আর এক অন্ধকার তল আছে যার সম্বন্ধে ব্যক্তি শুধুমাত্র অচেতনই নয়, নিজ স্বাভাবিক চেষ্টা দ্বারাও যার সম্বন্ধে সে চেতন হতে পারে না। এমন যে অন্ধকার মগ্নচৈতন্য, তাকে ফ্রএড বলেছেন **unconscious**—যার বাংলা পরিভাষা হয়েছে **নির্জ্ঞান**।

'নির্জ্ঞান' নাম সম্বন্ধে আপত্তি

দেকার্তে-র অনুগামী দার্শনিকেরা অবশ্য 'নির্জ্ঞান' নামে আপত্তি করেন। তাঁরা বলবেন, মন এবং চেতনা বা জ্ঞান সমার্থবাচক, কাজেই 'নির্জ্ঞান' মন কথাটিই স্ববিরোধী। জ্ঞান বা চেতনার পরিমাণ অনুযায়ী স্তর-বিভেদ থাকতে পারে—কিন্তু 'নির্জ্ঞান মন' হতে পারে না। ভাষার দিক থেকে 'নির্জ্ঞান মন' কথাটা যতই আপত্তিজনক হোক না কেন, মনোবিদের কাছে এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সম্ভাবনাপূর্ণ একটি ধারণা এবং মনের বাস্তব প্রকৃতি বুঝতে গেলে এই ধারণা অপরিহার্য। জেমস্ তাই বলেছিলেন, (১৯০২) "মনোবিদ্যার দিক থেকে নির্জ্ঞান এখন একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সত্তা।"[১] এর দশ বছর পরে সাবধানী মনোবিজ্ঞানী কোরিয়াট্ লিখেছিলেন, "আজ সমস্ত মনোবৈকল্যের চিকিৎসকেরাই এ বিষয়ে একমত যে মনের কতকগুলি অবস্থা আছে যার সম্পর্কে আমরা সচেতন, আবার এমন কতকগুলি অবস্থা আছে যার সম্পর্কে আমাদের কোন জ্ঞান বা চেতনা নেই।"[২]

অবশ্য নির্জ্ঞানের ধারণা নিয়ে আধুনিক সাহিত্যিক বা সংবাদপত্রের প্রবন্ধ লেখকেরা অনেক অদ্ভুত ও হাস্যকর মনগড়া সব কথা লিখেছেন। সে বিষয়ে অবশ্যই সাবধান হওয়া আবশ্যক। এ সম্বন্ধে কোন কোন ব্যাখ্যা আমাদের গ্রহণযোগ্য না-ও হতে পারে, কিন্তু এটি যে একটি মূল্যবান বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সূত্র এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।[৩] ভাষার দিক থেকে এ নামটিতে আপত্তি করার যথেষ্ট কারণ থাকলেও এটা মনের যে বাস্তব অবস্থাগুলিকে

১ The sub-conscious self nowadays is a well-accredited psychological entity. James—The Varieties of Religious Experience, p. 511

২ *all* psychopathologists agree...that our minds are made up of certain states for some of which we are conscious and *for some not conscious.*" Coriat—Abnormal Psychology, p. 10

৩ However, the criticisms that have been offered against the subconscious are after all properly of weight only against certain specific theories and interpretations of it, and not at all against the concept as such when rightly understood. Correctly interpreted, the concept is of fundamental importance to psychology. Moore & Gurney—The Foundations of Psychology, p. 232

নির্দেশ করে তাকে তো অস্বীকার করবার উপায় নেই। আজ মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে ব্যাখ্যার সূত্র হিসাবে নির্জ্ঞানের ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত।[৪]

নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্ব -বিষয়ে প্রমাণ

নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্ব চেতন অভিজ্ঞতা দিয়ে সম্ভব নয়, কারণ নির্জ্ঞান অবস্থাগুলো এমনই যে স্বাভাবিক অবস্থায় ব্যক্তি তাদের চেতনার সাহায্যে নাগাল পেতে পারে না। নির্জ্ঞানকে জানবার একমাত্র উপায় হচ্ছে অনুমান। কতকগুলি চেতন অবস্থার ব্যাখ্যা করতে হলে শুধুমাত্র সচেতন যুক্তিবুদ্ধি-দ্বারা তা সম্ভব নয়। কোন কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সম্বন্ধে আমাদের বিষম একটা বিরূপতা থাকে। কেন এই বিরূপতা, যুক্তি দিয়ে, বিচার দিয়ে তা বোঝা যায় না। কেন এই আপাত অকারণ বিদ্বেষ এর সুব্যাখ্যা করতে হলে মানতে হয়, মনের গভীরে কোন শক্তি আমাদের চেতন ইচ্ছা-বুদ্ধি-অনুভবকে প্রভাবিত করে।

আবার কখনো দেখি ব্যক্তি অকারণে ভয় পাচ্ছে। তাকে জিজ্ঞেস করে বুঝতে পারা যায় না, কেন সে ভীত হচ্ছে, কিসে তার ভয়। ব্যক্তি নিজেও তা জানে না। কখনো কোন দরকারী কথা, কোন বন্ধু, বা জায়গার নাম হঠাৎ ভুলে যাই, অথচ তা মনে রাখবার জন্যে বিশেষ চেষ্টাই করেছি। একটি বড় ঘরের ছেলের বাক্স অনুসন্ধান করে পাওয়া গেল তার বোর্ডিং-এর বন্ধুদের নানা তুচ্ছ জিনিস। সে এগুলি চুরি করেছে! অথচ তার কোন জিনিসের অভাব নেই। কেন সে চুরি করেছে তা সে নিজেও বলতে পারল না। হঠাৎ একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্র ব্যক্তি তাঁর চেয়ে বয়সে বড় এবং সম্বন্ধে গুরুজন, একজন বৃদ্ধা ভদ্রমহিলাকে ফস্ করে এক কুৎসিত গাল দিয়ে বসলেন। সবাই অপ্রস্তুত! ভদ্রলোক নিজেও লজ্জিত অপ্রতিভ! কেন তিনি এমন আচরণ করলেন তা তিনি নিজেই জানেন না। ফ্রএড-এর তীক্ষ্ণ

---

৪ The *terms* "subconscious memory" etc. are, perhaps, ill-chosen: some term like "quasi-memory" or "latent memory" might cause less misunderstanding. But whatever term is employed, the fact it denotes is now beyond dispute...the philosophers who object to such terms as "sub-conscious mind" are not thereby destroying the foundations of modern dynamic psychology. Rex & Margaret Knight—A Modern Introduction to Psychology. p. 289

প্রতিভার এটি নিদর্শন যে তিনি এ জাতীয় বহু বিচ্ছিন্ন এবং আপাত রহস্যময় অবস্থাগুলিকে নির্জ্ঞানের ধারণা দিয়ে একটি যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যার ঐক্যসূত্রে বাঁধতে সমর্থ হয়েছেন। এখানে নির্জ্ঞান সম্বন্ধে যে প্রমাণ তা প্রত্যক্ষনির্ভর নয়, তা অনুমাননির্ভর এবং এ অনুমান সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। একটি উপমা দিয়ে ব্যাপারটা বোঝানো যেতে পারে। মনে করা যাক, একটি সুবৃহৎ বৃত্তাকার প্রকোষ্ঠে বহু দ্রব্য চতুর্দিকে ছড়ানো রয়েছে। প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থলে একটি শক্তিশালী ঘোমটা-পরা বৈদ্যুতিক আলোয় ঘরের সামান্য অংশের দ্রব্যাদি উজ্জ্বলভাবে আলোকিত। সে দ্রব্যগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের চক্ষুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হচ্ছে। উজ্জ্বল আলোকিত অংশের দুইপাশের প্রায়ান্ধকার অংশে যে দ্রব্যগুলি তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের অস্পষ্ট চেতনা হচ্ছে, তাদের আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আলোর বিপরীত দিকে. প্রকোষ্ঠের সব চেয়ে দূর অংশ ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন। সেখানে যে দ্রব্যগুলি আছে তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের কোন চেতনা না থাকলেও তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে নির্ভুল অনুমান করা সম্ভব। নির্জ্ঞান সম্পর্কেও একই কথা বলা যেতে পারে। এর অস্তিত্ব -সম্পর্কে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই, কিন্তু সজ্ঞান মনের চেতনাকে তা যে প্রভাবিত করে সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। আমরা মনোবিকলন (psychoanalysis) ও স্বপ্নবিশ্লেষণের (dream analysis) সাহায্যে নির্জ্ঞানের অস্তিত্বের নিশ্চিত প্রমাণ পেয়েছি।[৫]

দর্শনের দিক থেকে নির্জ্ঞান মনের ধারণার প্রয়োজন দেখা দেয় এ জন্যে যে, জড়জগতে সরলতম থেকে জটিলতম বস্তুপুঞ্জের মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্নতা লক্ষ্য করি, কিন্তু মনোজগতে আপাতদৃষ্টিতে কোন অবিচ্ছিন্নতা নেই। ব্যক্তির মনে আমরা দেখি চেতন প্রত্যক্ষ স্মৃতি অনুভূতি ইচ্ছা ইত্যাদি মানসিক ক্রিয়ার মাঝে মাঝে যেন ফাঁক থেকে যাচ্ছে। জেম্‌স-এর ভাষায় চেতনার মধ্যে মাঝে মাঝে আছে যেন বিশ্রাম (substantive states), আবার আছে যেন গতি (transitive states)। আর গভীর ঘুমের সময় চেতনায় যেন ছেদ পড়ে। কিন্তু জড়জগৎ ও মনোজগতের প্রকৃতি সম্পূর্ণ পৃথক হতে পারে

[৫] Similarly, what knowledge we have of the deeper layers of the unconscious mind must be gained by other means than introspection,—by inference from behaviour, or by indirect methods such as pschoanalysis and the analysis of dreams. Rex & Margaret Knight—A Modern Introduction to Psychology, p. 240

না, কাজেই দার্শনিক চিন্তার সুসামঞ্জস্যের খাতিরেই স্বীকার করতে হয় সজ্ঞান অবস্থাগুলির ফাঁকগুলি নির্জ্ঞানের সূত্র দিয়ে বাঁধা হয়ে থাকে।[৬] লাইবনিৎস-এর মোনাডের ধারণায় আমরা সমস্ত বিশ্বজগৎব্যাপী চেতনার কল্পনা (pansychism) খুব স্পষ্ট দেখতে পাই। ব্যক্তির মনোজগতের নিরবচ্ছিন্নতার প্রয়োজনে নির্জ্ঞান মনের স্বীকৃতি হার্বার্ট-এর চিন্তায় দেখা যায়। ভারতীয় চিন্তায় এই ধারণাটি প্রায় স্বতঃসিদ্ধরূপে গৃহীত। সমস্ত বিশ্বজগতে একই প্রাণলীলা প্রবাহিত হচ্ছে—উদ্ভিদেরাও অচেতন নয়—অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখ-দুঃখ সমন্বিতা। ব্যক্তি এবং ব্যক্তির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে এক দুস্তর অশ্রুসিক্ত সাগরের ব্যবধান। কিন্তু বিভিন্ন মহাদেশের মধ্যে যেমন মহাসাগরের ব্যবধান ও পরস্পর-বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও সাগরের তলদেশে মাটির সংযোগ রয়েছে, তেমনি বিভিন্ন মনের আপাতবিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও সম্ভবত এক বিশ্বব্যাপী নির্জ্ঞানের ঐক্যবন্ধন রয়েছে।[৭] জেমস এবং বর্তমানকালে য়ুঙ্গ এপ্রকার চিন্তাকে (universal unconscious) রূপ দিয়েছেন।

মনোবিদ্যার দিক থেকে যে প্রমাণগুলি এসেছে সেগুলিই অবশ্য বর্তমানকালে অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। অর্থাৎ চেতনক্রিয়া প্রত্যক্ষণ ও বিশ্লেষণ -দ্বারা এমন কতকগুলি ঘটনা বা অবস্থার আমরা পরিচয় পাই যা থেকে নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্ব ও চেতন মনের ওপর তার প্রভাব সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না।

---

৬ It was early seen in the history of philosophy that among the contrasts to be observed between the psychological and the mental, one of the most prominent was the comparative discontinuity of the latter. The psychical life made its appearance in an irregular manner, in flashes of limited duration and in the intervals between these flashes it appeared to altogether cease to exist. In contrast to this, the material world seemed relatively continuous, permanent and independent of the individual. Hence if the study of the mind was to be brought into line with the rest of our knowledge an attempt had to be made to get rid of the apparent discontinuity and irregularity of psychical experience. Hart—Subconscious Phenomena, p. 104

৭ It is because of the absence of any such conscious psychical continuum between minds corresponding the physical continuum which subsists between bodies that some have suggested that there may be a sub-conscious continuum between minds as there is a submarine continuum between these various islands, so if we pass beneath the threshold of consciousness we may find that all conscious minds are merely separate "islands" projecting out of a single subconscious continuum. James—Varieties of Religious Experience, pp. 507-15

ব্যক্তিত্বের অবিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে ব্যক্তির প্রত্যয়

আমাদের চেতন অবস্থাগুলি প্রতিমুহূর্তেই পরিবর্তিত হচ্ছে এবং এক চেতনার সঙ্গে পরবর্তী চেতনার আপাত কোন সম্পর্ক নেই। তথাপি আমরা প্রত্যেকেই এই বিশ্বাস পোষণ করি যে ব্যক্তিত্বের ধারাটি অব্যাহত রয়েছে—সকালের আমি ও সন্ধ্যার আমি, কালকের আমি এবং আজকের আমি একই ব্যক্তি। ঘুমের সময় চেতনার সূত্র আপাতত ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু ঘুম থেকে উঠেই অতীতের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ সংযোগস্থাপন ঘটে।[৮] অর্থাৎ সজ্ঞান চেতনার ধারা ফল্গু নদীর মতো পাতালে অন্তর্ধান করলেও, চেতনার ধারা বাস্তবিক পক্ষে নির্জ্ঞান অবস্থাগুলির মধ্য দিয়ে অবিচ্ছিন্নতা বজায় রাখে।

স্মৃতিতে অতীতকে চিনে নেওয়া

কোন ঘটনা হয়তো ভুলে গেছি। চেষ্টা করে যখন সে ঘটনাকে মনের সামনে আবার আনতে সক্ষম হয়েছি (recall), তখন সে ঘটনা যে বিস্মৃত ঘটনারই প্রতিচ্ছবি তা আমরা চিনতে পারি (recognition)। এ থেকে বোঝা যায়, যা আমরা বিস্মৃত হয়েছিলাম তা একেবারে হারিয়ে যায় নি—তা মনের মধ্যে নির্জ্ঞান অবস্থায় সুপ্ত ছিল।

সুদূর অতীতের বিস্মৃত ঘটনা স্মরণ

বিশেষ করে বিস্ময়কর হচ্ছে সংবেশ ও অভিভাবন -দ্বারা (hypnotism & suggestion), অথবা মনোবিকলন-পদ্ধতির দ্বারা, অথবা স্বপ্ন-বিশ্লেষণ -দ্বারা, সুদূর অতীতের সম্পূর্ণ বিস্মৃত ঘটনাগুলির পুনরুদ্ধার। বাস্তবিক পক্ষে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে একথা বলা যায় যে শারকো, ঝানে বা ফ্রয়েড্ এই সংবেশ ক্রিয়ার ব্যবহার থেকেই নির্জ্ঞান মনের ধারণায় উপনীত হন।[৯]

৮ I go to sleep at night, and for a time consciousness ceases: but when I awake I have no doubt that I am the same person I was the day before, and the first moment of waking attaches itself directly to the last moment before going to sleep. James—Principles of Psychology, Vol. I, pp. 237-9

৯ An...especially striking type of phenomenon seeming to imply a sub-conscious continuum in mental life is the revival under abnormal circumstances—as in dreams, the deliria of fever, automatic writing, crystal gazing, hypnosis, waking hallucinatious ("visions") and the artificial devices of psychoanalysis, of experiences which have long been forgotten, and which no amount of conscious effort on the part of the subject has succeeded in bringing into the subject's consciousness. Moore & Gurnee—The Foundations of Psychology, p. 237

একটি উদাহরণ—কোন ব্যক্তিকে সংবেশিত করে মোহাবিষ্ট অবস্থায় এই অভিভাবন দেওয়া হল : "আপনি পঞ্চান্ন মিনিট পরে, ওপর তলার থেকে মাথার টুপিটা নিচে বসবার ঘরে টেবিলের ওপর ঠিক মধ্যস্থলে রাখবেন। তারপর তিনবার টেবিলটি প্রদক্ষিণ করবেন।" মোহাবিষ্ট অবস্থা থেকে জেগে উঠলে তার সংবেশিত অবস্থার কোন স্মৃতি থাকে না। তাঁকে সে সময়ে যে অভিভাবন দেওয়া হয়েছে তা-ও কেউ তাঁকে জানায় নি। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে ঠিক পঞ্চান্ন মিনিট পরে ব্যক্তিটি তাঁর অভিভাবন অনুযায়ী ঠিক ঠিক কাজ করলেন। তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল কেন তিনি কাজগুলি করলেন, তখন তার কারণ সম্বন্ধে বেশ যুক্তিসঙ্গত সদুত্তরই (rationalisation) দিলেন এবং বাস্তবিকই তিনি নিজেও বিশ্বাস করলেন যে নিজ স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ীই তিনি কাজ করেছেন। যেমন, তিনি বললেন যে, কদিন আগে তিনি তাঁর এক বন্ধুর টুপিটা লক্ষ্য করেছিলেন যে সেটা একটু একপাশে বাঁকা। তাই তিনি টেবিলের মাঝখানে টুপিটা রেখে তার চারদিকে ঘুরে দেখছিলেন, তাঁর নিজের টুপিটা ঠিক আছে কিনা।[১০]

গুরুতর রোগের মোহাবস্থায় (delirium) অনেক সময় সুদূর অতীতের সম্পূর্ণ বিস্মৃত ঘটনা হঠাৎ রোগী বলে। কোল্‌রীজ্‌ এ বিষয়ে একটি আশ্চর্যজনক উদাহরণ দিয়েছেন। একটি সম্পূর্ণ নিরক্ষর, বাড়ীর ঝি, রোগের মোহাবস্থায় অনর্গল প্রাচীন গ্রীক, ল্যাটিন, প্রাচীন হিব্রু ইত্যাদি ভাষায় কথা বলত। দীর্ঘকাল যাবৎ অনুসন্ধান করে জানা গেল ঝিটি যখন খুব ছোট ছিল তখন সে একজন বিদ্বান লোকের বাড়ীতে কাজ করত। এই বিদ্বান্‌ ব্যক্তিটির অভ্যাস ছিল তিনি যখন বিভিন্ন প্রাচীন ভাষায় বই পড়তেন, তখন ঘরের মধ্যে পদচারণা করে উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করে পাঠ করতেন। তখন কিছু না বুঝলেও ছোট মেয়েটি মুগ্ধ হয়ে আগ্রহের সঙ্গে সে পাঠ শুনত। রোগের মোহাবস্থার সেই অতীত লুপ্ত স্মৃতি আবার তার মনে ফিরে এসেছিল।[১১]

এই প্রসঙ্গেই বলা যায় যে ফ্রএড-এর মনোবিকলন-প্রণালী আবিষ্কারের পূর্বে সংবেশন-পদ্ধতি -দ্বারা (by hypnosis) হিস্টিরিয়া রোগীদের চিকিৎসা করা

১০ Rex & Margaret Knight—A Modern Introduction to Psychology, pp. 237-38

১১ Coleridge—Biographia Literaria, Chap. VI.

হত। তাতে দেখা যেত যে রোগীর হাত বা পা অবশ হয়ে গেছে বা ইন্দ্রিয় বিকল হয়েছে বলে রোগী অভিযোগ করে, সংবেশিত অবস্থায় তার হারিয়ে-যাওয়া স্মৃতি ফিরে আসে এবং অভিভাবন -দ্বারা তার অঙ্গের অবশতা অন্তত কিছুকালের জন্য দূর করা যায়।[১২]

চেতন মনে নির্জ্ঞানের প্রভাব

চেতন পর্যায়ে আমাদের মনে এমন অনেক ধারণা, অনুভূতি, আবেগ বা উদ্যম কখনো কখনো দেখা যায় যা 'অকারণ' বলে মনে হয়। চেতন কোন অবস্থা অথবা বহির্জগতের কোন বাস্তব ঘটনা দ্বারা এই সব মানসিক প্রক্রিয়ার সুব্যাখ্যা সম্ভব নয়। এই চেতন অবস্থার পেছনে নির্জ্ঞান মন ক্রিয়া করছে, এ কথা মেনে না নিলে এই চেতন অবস্থার সুব্যাখ্যা হতে পারে। কেন হঠাৎ এই অদ্ভুত চিন্তাটা আমার মনে এল তার কোন সঙ্গত কারণ দেওয়া যায় না। আবার একটা নাম জিহ্বার মাথায় এসেও হঠাৎ কেন যে ভুলে গেলাম তাও ঠিক বোঝা যায় না। বিপরীতভাবে, হঠাৎ কেন যে ভুলে-যাওয়া নামটা অদ্ভুতভাবে মনে পড়ে গেল, তা-ও নির্জ্ঞানের ধারণা ব্যতীত ব্যাখ্যা করা যায় না।[১৩]

অনেক মানুষ হঠাৎ অকারণ ভয়ে ক্লিষ্ট হয়, কাউকে দেখেই হয়তো মনটা বিরূপ হয়ে ওঠে, আবার কাউকে হয়তো হঠাৎ অকারণেই ভালো লেগে যায়। এ সব মানসিক অবস্থার ব্যাখ্যাও নির্জ্ঞান মনের স্বীকৃতি ভিন্ন সম্ভব নয়।[১৪]

অনুরূপভাবে আমরা অনেক সময় এমন কাজ করি, যা সচেতনভাবে করতে ইচ্ছা করি নি। হঠাৎ একটা বেফাঁস কথা বলে ফেললাম অথবা চিঠি লিখবার সময় এমন কিছু লিখে বসলাম যার বিপরীতটাই বরং লিখতে চেয়েছিলাম। ভাবছিলাম অধ্যাপক ম-র বাড়ী যাব,—তাঁর বাড়ী আমার বাড়ীর

১২ Rex & Margaret Knight—A Modern Introduction to Psychology, p. 238

১৩ Coriat—Abnormal Psychology, p. 22

১৪ These feelings are "unaccountable" in conscious terms. We cannot give our "reasons" for them; and yet there can be no doubt that every affective state has a cognitive basis somewhere. We say—"I do not like you Dr Fell: the reason why, we cannot tell"—but we do not say, "I have *no reason*". The real reason in other words, is sub-consciousness. Moore & Gurnee—The Foundations of Psychology, p. 239

পশ্চিম দিকে—সেদিকে রওনাও হয়েছিলাম, কিন্তু কখন অখেয়ালে উত্তর-পূর্বে শ্রীমতী রা-র বাড়ীর সামনে গিয়ে হাজির হয়েছি। এ কাজগুলির সুব্যাখ্যা আমাদের সচেতন মনের ওপর নির্জ্ঞান মনের প্রভাব দিয়েই শুধু করা সম্ভব।[১৫]

সম্পূর্ণ অকস্মাৎ কঠিন সমস্যার সমাধান

সাধারণত সচেতন যুক্তি, বিচার, বিশ্লেষণ ও সমন্বয়ের সাহায্যে সমস্যার সমাধান আমরা করে থাকি। কিন্তু এমন অভিজ্ঞতা খুব বিরল নয়, কোন সমস্যা অনেক চিন্তাভাবনা করেও যার সমাধান করতে পারছি না, হঠাৎ, যখন সে সমস্যা সম্বন্ধে একেবারেই চিন্তা করছি না, তখন যেন বিদ্যুৎস্ফুরণের মত বিনা আয়াসেই তার সমাধান মিলে যায় মায়ার্স তাঁর Human Personality গ্রন্থে[১৬] এবং জ্যাস্ট্রো তাঁর The Subconscious গ্রন্থে এ রকম কয়েকটি কঠিন সমস্যার নির্জ্ঞান সমাধানের উদাহরণ দিয়েছেন। স্বপ্নের মধ্যে কঠিন সমস্যা সমাধানেরও একাধিক দৃষ্টান্ত আছে।[১৭] রবীন্দ্রনাথ 'বিসর্জনের' গল্পের কাঠামোটি স্বপ্নে পেয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন।

সিয়াঁস-এ বা প্ল্যান্‌চেটে আপনা হতেই লেখা

যাঁরা ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন (যেমন থিয়োসফিস্ট ম্যাডাম্ ব্লাভ্যাটস্কি) তাঁরা অনেক সময় চক্র হয়ে বসে কোন মৃত ব্যক্তির আত্মাকে বা ভূতকে আহ্বান করেন। তখন বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন একজন ব্যক্তির ওপর ভূত 'ভর' করে এবং আবিষ্ট অবস্থায় তাঁর হাত দিয়েই নানা প্রশ্নের

১৫ Nor is it uncommon to find ourselves doing things with our hands or feet without conscious intention—starting to walk in a given direction and actually proceeding in some quite different one; to go into an adjacent room to get a knife, for example, and finding when we have returned that we have brought back a pencil instead. Ibid, p. 239

১৬ It is well known that Sir W. R. Hamilton invented the abstruse mathematical system of quaternious "while walking with Lady Hamilton in the streets of Dublin, the flash of discovery coming to him just as he was approaching the Brougham Bridge." Myers—Human Personality, p. 113

১৭ A striking instance of a similar character is the dream of Professor Hilprect, during which a problem in Assyriology was in a dramatic manner solved. Proceedings of the Society for Psychical Research, Vol. XII, pp. 14 ff.

উত্তর সামনে রক্ষিত কাগজে পেন্সিল দিয়ে লিখিত হয়। অনেক সময় অর্থহীন হিজিবিজি লেখা পড়ে, কিন্তু কখনো কখনো এমন সব প্রশ্নের উত্তর লেখা হয় যেগুলি সম্বন্ধে যার হাত দিয়ে লেখা আসছে তার জানবার কোন সম্ভাবনা নেই। অবশ্যই আধুনিক মনোবিদ্‌রা ভূতপ্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। তাঁদের মতে এগুলি একপ্রকার সংবেশিত অবস্থার ক্রিয়া এবং নির্জ্ঞান মনের ধারণার সাহায্য ব্যতিরেকে এদের ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।[১৮]

ব্যক্তিত্বের বিষঙ্গ

মানসিক সমস্ত বিকারেই ব্যক্তিত্বের বিচ্ছিন্নতা ঘটে, অথবা তার প্রবণতা দেখা যায়। এ নিয়ে অন্যত্র আলোচনা করেছি। কোন একটি অবদমিত ইচ্ছা বা তীব্র অনুভূতিকে কেন্দ্র করে একটি জটিল ঐক্য গড়ে ওঠে এবং তা চেতনতার বহমান ধারার ঐক্য (stream of consciousness) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেন স্বতন্ত্র একটি সত্তা (entity) সৃষ্টি করে। কখনো কখনো এরকম একাধিক বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বখণ্ড একই মনের মধ্যে ক্রিয়া করে—এদের সহাবসংজ্ঞান বা co-conscious states বলা হয়। এই কেন্দ্রগুলি সক্রিয় এবং সাধারণ সুস্থ ব্যক্তির মধ্যেও এমন বিচ্ছিন্ন সহাবসংজ্ঞানের অবস্থা থাকতে পারে।* মনের বিকারের বেলায় অবচেতন খণ্ড-ব্যক্তিত্ব কতকটা নিষ্ক্রিয় বা সুপ্ত অবস্থায় থাকে। কিন্তু তারা চেতন ব্যক্তিত্বের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এই সমস্ত বিবরণের পশ্চাতেই নির্জ্ঞান মনের ধারণা স্বীকৃত।[১৯] হার্ট এবং মর্টন প্রিন্স-এর মতে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মনেও ক্ষণস্থায়ী

১৮ এ বিষয়ে বহু তথ্যপূর্ণ ও মনোজ্ঞ জনপ্রিয় পুস্তক Eysenck-এর Sense & Nonsense in Psychology-র Hypnosis & Suggestibility এবং Telepathy and Clairvoyance এই দুইটি অধ্যায় বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

*এ বিষয়ে পেসেন্স ওয়ার্থ-এর উদাহরণটি প্রসিদ্ধ। মিসেস্ কারান নামে একজন মহিলাও সচেতন অবস্থায় এপ্রকার বিষঙ্গের ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। Yost—Patience Worth. Prince—The Unconscious.

১৯ Dissociation is a condition in which the mind seems to be divided, some of its contents being split off from the stream of personal consciousness, and leading a more or less independent existence beyond the control of the personality. When these dissociated contents become active they are usually now-a-days said to be *co-conscious*...Subconscious contents which are inactive or dormant and so do not come under the head of "co-conscious" are usually called *unconscious*. Morton Prince—The Unconscious, p. X, also pp. 249-54

ব্যক্তিত্বের বিচ্ছিন্নতা ঘটে থাকে।[২০] হার্ট এই ব্যক্তিত্বের বিচ্ছিন্নতার ধারণাটিকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সূত্র হিসাবে জনপ্রিয় করে তুলেছেন। সিদিস্-ও প্রিন্স-এর কাছে সহাবসংজ্ঞান ধারণাটির জন্য আমরা ঋণী।

স্বপ্ন

ফ্রএড-এর পর থেকে সমস্ত মনোবিকলনে বিশ্বাসীরাই স্বপ্নের ব্যাখ্যা হিসাবে নির্জ্ঞান মনের ধারণাকে অবশ্য গ্রহণীয় বলে স্বীকার করে থাকেন। এ নিয়ে আমরা অন্যত্র বিশদ আলোচনা করেছি।

সংজ্ঞান, অন্তর্জ্ঞান, আসংজ্ঞান, সহাবসংজ্ঞান ও নির্জ্ঞান

চেতনার বিভিন্ন পরিমাণ ও স্পষ্টতা অনুযায়ী আমরা মনের বিভিন্ন স্তর-নির্দেশ করতে পারি।

সংজ্ঞান (conscious) বলতে জাগ্রত চেতনার স্পষ্টালোকিত কেন্দ্রকে বোঝায়। যখন সম্পূর্ণ জেগে থাকি তখন সামনের বা আশেপাশের কিছু বস্তু বা ঘটনা-সম্বন্ধে আমরা পরিপূর্ণভাবে সচেতন। এ হল আমাদের **মনোযোগ-দ্বারা পূর্ণালোকিত চেতনার** মধ্যবিন্দু। আমি যখন লিখছি তখন যে জায়গাটা লিখছি সে অংশে পূর্ণ মনোযোগ দিচ্ছি—তা স্পষ্টভাবে আমি জানছি। এ হচ্ছে সংজ্ঞানের ক্ষুদ্র পরিসর কিন্তু স্পষ্ট চেতনার ক্ষেত্র (the field of attentive consciousness)।

কিন্তু সহজেই বুঝতে পারি, যে বিষয়গুলিতে স্পষ্ট মনোযোগ আছে, সেই স্পষ্ট চেতনার বলয়কে ঘিরে রয়েছে অস্পষ্ট চেতনার বৃহত্তর এক বলয়। তারা এই মুহূর্তে পূর্ণ মনোযোগ-আকর্ষণ না করলেও অস্পষ্টভাবে তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমি সচেতন। প্রতি মুহূর্তে সমনোযোগ চেতনার স্পষ্ট বলয় এবং তার সীমান্তে অবস্থিত স্বল্প মনোযোগের অস্পষ্ট আলোকে অনুজ্জ্বল বৃহত্তর বলয় স্থান-পরিবর্তন করছে। যা অস্পষ্ট চেতনার বিষয় ছিল তা মনোযোগের সন্ধানী আলোয় উজ্জ্বল স্পষ্ট চেতনা বা সংজ্ঞানের কেন্দ্রে পরিণত হয়। আবার যা ছিল সংজ্ঞানের স্পষ্ট আলোকিত কেন্দ্রীয় বলয়, মনোযোগ প্রত্যাহৃত

[২০] Common examples of dissociation in every *waking* life are the sudden forgetting of a name or the topic of a conversation, or of the intention of an action, slips of the tongue, or pen etc. Coriat—Abnormal Psychology, pp. 22-32

হওয়াতে তা সীমান্তস্থিত প্রায়ান্ধকার বৃহত্তর বলয়ে স্থানচ্যুত হয়। তবে জেমস্ এই দুই বলয়কে মিলিয়েই চেতনা বা সংজ্ঞানের সীমা-নির্ধারণ করেন।[২১]

অন্তঃর্জ্ঞান (subconscious) কথাটি কেউ কেউ (যেমন স্টাউট) কিন্তু এই অস্পষ্ট চেতনার বলয়টি বোঝাতেই ব্যবহার করেছেন। জেমস্ এ বলয়কে বলেছেন চেতনার (সংজ্ঞানের) প্রত্যন্ত প্রদেশে অবস্থিত বলয় (the fringe of consciousness)।[২২]

সাধারণত অন্তর্জ্ঞান বলতে এই প্রত্যন্ত প্রদেশেরও বাইরে অস্থির, অনির্দেশ্য মানসিক অবস্থা বোঝায় যাদের চেষ্টা করে মনের সামনে আনা যায়। তারা চেতন (সংজ্ঞান) অবস্থা নয় কিন্তু চেতনার সম্ভাবনা তাদের মধ্যে রয়েছে এবং ব্যক্তি-সচেতনতারই তা অঙ্গ। তার পৃথক কোন সত্তা নেই।[২৩]

২১ If you were to state what was in your mind at a given moment, it is the vivid elements upon which your attention was focussed that you would describe. But as everyone knows, these do not constitute the whole field of consciousness at any given moment. Besides these there is the background of the mind, outside the focus, a conscious margin or fringe of varying extent (consisting of sensations, perceptions and even thoughts) of which you are only dimly aware. It is a sort of twilight zone in which the contents are so slightly illuminated by awareness as to be scarcely recognizable. Morton Prince—The Unconscious, p. 341

২২ The field of consciousness at any one moment, therefore, contains two more or less clearly distinguished regions—(1) a *central* or focal region of *attention* or clearest-consciousness, and (2) a surrounding *marginal* or sub-attentive region of less clear contents. The latter was called by James the "fringe" of consciousness to indicate its less solid, more hazy character, and that the total field of consciousness is frayed out at the edges, so to speak, rather than of equal consistency throughout. Moore & Gurnee. The Foundations of Psychology, p. 248

২৩ Now the subconscious is to be thought of primarily as the further extension of this fringe into...the ultra-marginal region, containing a number of instable contents, any of which may at any moment, under normal conditions, come into actual consciousness. From this point of view, the sub-conscious is the *potentially conscious*, and does not, normally at least, constitute a "self" distinct from the conscious self. Ibid, p. 248

নিচের ছবিতে আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট করবার চেষ্টা হয়েছে—
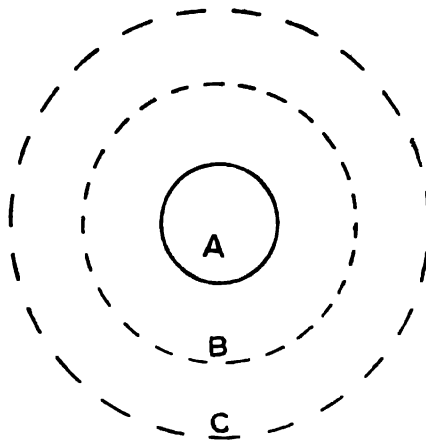
A. সমনোযোগ পূর্ণ চেতনার বলয়। B. অস্পষ্ট চেতনার বলয়।
C. অন্তর্জ্ঞানের অস্থির অনির্দেশ্য অবস্থাগুলি।

মায়ার্স এক ভিন্ন উপমা ব্যবহার করেছেন—তাঁর মতে সংবেদন (sensation) চেতনার এক নিম্নতম সীমা উৎক্রান্ত হলে (above the threshold of consciousness) তবেই স্পষ্ট চেতনা বা সংজ্ঞান বলে স্বীকৃতিলাভ করবে। কিন্তু এই সীমার বাইরে বা নিম্নে যা আছে (below the thereshold), যা ব্যক্তির চেতনায় কোন সাড়া জাগায় না, তা হয় অন্তর্জ্ঞান। এই দুই মিলিয়ে হল মন। এখানে অন্তর্জ্ঞান কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত এবং পরে আমরা যাকে নির্জ্ঞান বলব তা-ও এর-মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। ডাঃ স্ট্যানলী হল্ মূলত এই এক কথাই বলেছেন ভিন্নতর উপমার সাহায্যে। তিনি বলেছেন, ব্যক্তিগত চেতনা হচ্ছে, মেরুপ্রদেশে ভাসমান বিরাট হিমশৈল (iceberg)। হিমশৈলের সামান্য অংশই জলের ওপরে দৃশ্যমান, এই অংশকে তুলনা করা যেতে পারে স্পষ্ট চেতনা বা সংজ্ঞানের সঙ্গে। কিন্তু হিমশৈলের প্রধান বিরাট অংশ জলের নিচে অদৃশ্য, কিন্তু তার ওপরই নির্ভর করছে ওপরের দৃশ্য অংশ। তেমনি সংজ্ঞানের নিম্নে আছে বিরাট অন্তর্জ্ঞানের অনির্দেশ্য অংশ।[২৪]

[২৪] The whole field of mental content may be likened to an iceberg of which only a small portion is visible above the surface of water. In the same way only a small portion of the mental content is above the thereshold of consciousness. Dr. Stanley Hall

সহাবসংজ্ঞান

সহাবসংজ্ঞান (co-conscious) ধারণাটির জন্যে আমরা মর্টন প্রিন্স-এর নিকট দায়ী। তিনি মনে করেন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মনের মধ্যে ব্যক্তিত্বের ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন একাধিক সক্রিয় এবং কিঞ্চিৎ বুদ্ধিমিশ্রিত
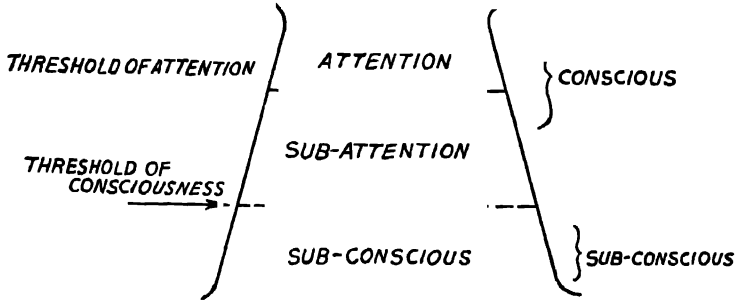
মনোযোগের ন্যূনতম সীমা অতিক্রম করে স্পষ্ট চেতনার স্তর; তার নিম্নের স্তর অস্পষ্ট চেতনার স্তর যেখানে কেন্দ্রীভূত মনোযোগের অভাব। সর্বনিম্নের স্তর অবচেতন মন—অন্তর্জ্ঞান ও নির্জ্ঞান এর অন্তর্ভুক্ত।

প্রক্রিয়া থাকতে পারে। প্রিন্স-এর মতে এদের ঠিক নির্জ্ঞানের দলে ফেলা যায় না এবং এদের বিশেষত্ব হচ্ছে যে এরা ব্যক্তিত্বের ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন।[২৫]

আসংজ্ঞান

ফ্রএড্ এই ধারণাটির জন্যে দায়ী। তিনি বলেন, সময়ের সঙ্গে এবং অন্যান্য নতুন অভিজ্ঞতার চাপে ব্যক্তি তার অনেক অতীত অভিজ্ঞতাই ভুলে যায়। কিন্তু তারা মনের মধ্য থেকে একেবারেই হারিয়ে যায় না। চেষ্টা করলে অনেকগুলি আপাত বিস্মৃত ঘটনাই আবার মনে পড়ে যায়। ফ্রএড এই বিস্মৃত অভিজ্ঞতার ওপরতলায় মানসিক অবস্থাগুলিকে (যেগুলিকে স্বল্প চেষ্টায়ই মনে আনা যায়) তাদের **আসংজ্ঞান** (foreconscious) বলেছেন। অবশ্য

২৫ The co-conscious always indicates an abnormal, if not necessarily a pathological, condition of mind. It refers to any active psychical states which are dissociated from the personality. Thus the division into the personally conscious and the co-conscious is a "vertical" division of mind, quite distinct from and additional to the "horizontal" division into levels. Morton Prince—The Unconscious, pp. 249-50

আমাদের চিন্তা অনুসারে আসংজ্ঞান বা foreconscious, অন্তর্জ্ঞান বা subconscious-এরই অন্তর্ভুক্ত।

নির্জ্ঞান

নির্জ্ঞান বলতে সেই মানসিক অবস্থাগুলিকেই বোঝায় যেগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন মনে কোন জ্ঞান নেই। ব্যক্তি নিজেও জানে না তার মনের মধ্যে এইগুলি লুকিয়ে আছে। নির্জ্ঞান সর্বদাই অবদমনের ফল এবং তা সর্বদাই ব্যক্তির ঐক্যের বলয় থেকে বিচ্ছিন্ন। শৈশবের তীব্র যৌনিকেন্দ্রিক আকাঙ্ক্ষাগুলি (ফ্রএড-এর মতে) ব্যক্তির বাহ্যজগতের অভিজ্ঞতা (ego) এবং
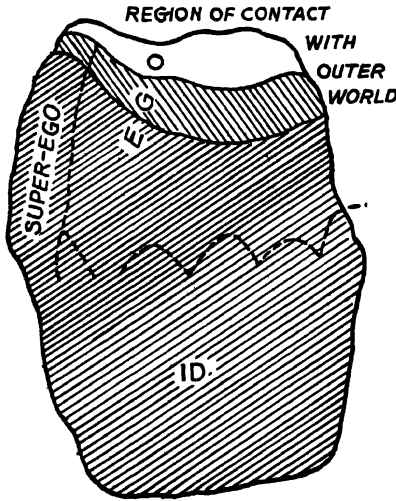
ফ্রএড-এর মতে মনের মানচিত্র। অদস্ অন্ধকার আদিম নির্জ্ঞান কামাকাঙ্ক্ষার সর্ববৃহৎ ও সর্বনিম্ন স্তর যার সঙ্গে বাহ্য জগতের যোগ নেই। অহং অদসের উচ্চতর স্তর। এর বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ আছে কিন্তু এ স্তর অদস্ দ্বারাও প্রভাবিত। অধিশাস্তা মূলত অন্ধ সামাজিক চেতনার স্তর, অহংএর চিন্তাকে এ অংশ প্রভাবিত করে
[Shaffer & Shoben-এর Psychology of Adjustment অনুসরণে।]

সমাজ-চেতনা (super-ego) দ্বারা বিকৃত। এই লজ্জাকর বা ক্লেশকর অভিজ্ঞতাগুলিকে ব্যক্তি তার চেতনার ভদ্র ও স্পষ্টালোকিত অঞ্চল থেকে জোর করে নির্বাসিত করে মনের গভীরতম এবং গাঢ় অন্ধকারময় কারাগারে। অহং (ego) এবং অধিশাস্তার (super-ego) বাধা অতিক্রম করে এরা চেতন মনের সামনে হাজির হতে পারে না। তবে স্বপ্নে ছদ্মবেশে এই কালো

বন্য যৌনাকাঙ্ক্ষাগুলি অধিশাস্তার বাধা (resistance) এড়িয়ে চেতনার সামনে হাজির হতে পারে। এরা ব্যক্তি-চেতনার ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু সংবেশন (hypnotism) বা মনোবিকলন (psychoanalysis) -রূপ বিশেষ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে বাধা-অতিক্রম করে আসংজ্ঞানের সাহায্যে তাদের চেতন মনের (সংজ্ঞান) আলোকে এনে মুক্তি দিলে তারা মানসিক বিকার নিরাময় করে সুস্থ ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়। এখানেই ব্যক্তিত্বের মূল।[২৬]

তাহলে সর্বশেষ আমরা মনের তিনটি প্রধান স্তরের সন্ধান পেলাম—

(১) **সংজ্ঞান** (conscious)—জাগ্রত সক্রিয় চেতন অবস্থা

(ক) ব্যক্তিগত চেতনা (personally conscious)—ব্যক্তিত্বের ঐক্য-বলয়ের অন্তর্ভুক্ত।

(খ) সহাবসংজ্ঞান (co-conscious) [ব্যক্তিগত ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন সক্রিয় (active dissociated)-চেতনা]

(২) **অন্তর্জ্ঞান** (subconscious) চেতনার সম্ভাবনাপূর্ণ নিষ্ক্রিয় অবচেতনা।

(ক) মনোযোগের সীমার বাইরে অস্পষ্ট চেতনা—(ব্যক্তির নিজস্ব চেষ্টায় যে অবস্থাগুলি চেতনার সামনে উপস্থিত করা চলে)

(খ) আসংজ্ঞান (foreconscious)—বর্তমানে বিস্মৃত হলেও ব্যক্তি তাদের আবার চেতনার সামনে আনতে সক্ষম।

(৩) **নির্জ্ঞান** (unconscious) (ব্যক্তিচেতনার ঐক্য-বলয় থেকে বিচ্ছিন্ন মগ্ন চেতনা, যাদের বিশেষ প্রক্রিয়া ভিন্ন চেতনার সামনে আনা যায় না)।

নির্জ্ঞান সম্বন্ধে ফ্রএড ও মর্টন-এর ধারণার প্রভেদ

ফ্রএড-এর নাম মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে কারণ তিনি মানুষের মনের বিপুল বিস্তার সংবন্ধে আমাদের সচেতন করেছেন। নির্জ্ঞানের

২৬ The unconscious is the "real self" whose inner nature is unknown to us, and is only imperfectly revealed to us in consciousness. It is made up of memories, thoughts, desires etc. which have been "repressed" because they are for one reason or another painful to consciousness or contrary to the higher moral nature; the result being that a certain "resistance" is set up against their recall into consciousness which can be overcome only by special methods. Freud—The Interpretation of Dreams, pp. 429, 488

ধারণাকে তিনি দৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছেন এবং এই ধারণার সাহায্যে মানুষের মনের বহু রহস্যের সুসমাধানে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর ব্যক্তিমানসের ত্রিতলের ধারণা সম্বন্ধে আমরা বিশদ আলোচনা করেছি।
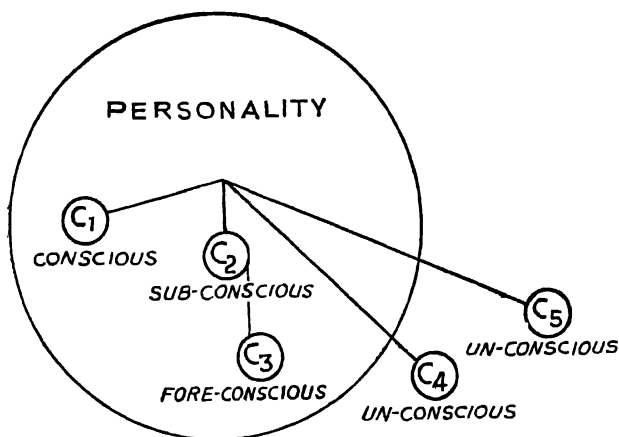
ব্যক্তিত্বের সুস্থ ঐক্যসম্পন্ন অবস্থা
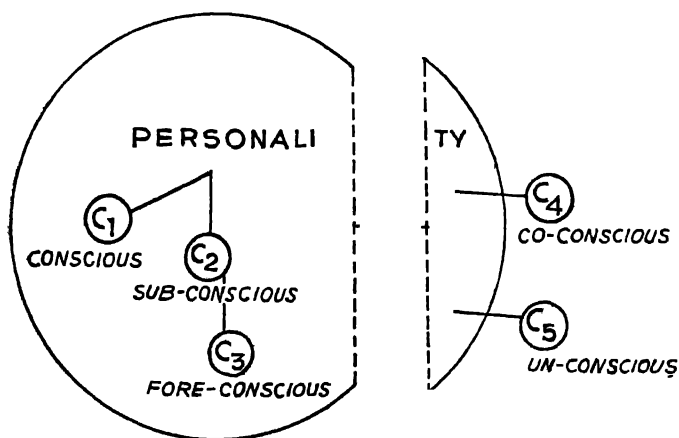
ব্যক্তিত্বের ঐক্য যেখানে বিচ্ছিন্ন

নির্জ্ঞানের ধারণাকে মর্টন প্রিন্স-ও গ্রহণ করেছেন। তবে নির্জ্ঞান সম্বন্ধে দুজনের ধারণার মধ্যে অনেকটা প্রভেদ আছে। (১) ফ্রএড-এর মতে নির্জ্ঞানই ব্যক্তিসত্তার মূল এবং এর সাহায্যেই মানুষের ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যা

করতে হবে। ফ্রএড-এর মতে নির্জ্ঞানের প্রকৃতি মূলত মানসিক, কিন্তু প্রিন্স-এর মতে নির্জ্ঞান কোন মানসিক অবস্থা হতে পারে না, এটা মস্তিষ্কের ক্রিয়ার একটা স্তিমিত অথচ মৌলিক অবস্থা (theory of neurograms) (২) ফ্রএড-এর মতে অবদমনেরই জন্যেই মনের তীব্র স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাগুলি নির্জ্ঞানের রাজ্যে নির্বাসিত হয় এবং অহং ও অধিশাস্তার বাধা অতিক্রম করে তবেই নির্জ্ঞান অবস্থাগুলি মনোবিকলন-পদ্ধতির সাহায্যে আসংজ্ঞানের (foreconscious) মধ্য দিয়ে সচেতন মনে (সংজ্ঞান) উপস্থিত হয়। মর্টন প্রিন্স কিন্তু স্বীকার করেন না যে বাধা ও অবদমনই নির্জ্ঞানের মূল কারণ। (৩) সহাবসংজ্ঞানের (co-conscious) ধারণা প্রিন্স-এর নিজস্ব। তাঁর মতে, সুস্থ ব্যক্তি-মানসেও ব্যক্তিত্বের ঐক্য হতে বিচ্ছিন্ন, সক্রিয় অথচ অবচেতন অবস্থা থাকতে পারে। (৪) দুজনের মধ্যে সর্বপ্রধান প্রভেদ হচ্ছে দুজনে দুটি সম্পূর্ণ পৃথক মূলনীতি অনুসারে মানসজীবনের বিভিন্ন উপাদানকে বিভক্ত করেছেন। ফ্রএড-এর মতে সংজ্ঞান অন্তর্জ্ঞান ও নির্জ্ঞান মনের বিভিন্ন স্তর। তারা গুণগতভাবে সম্পূর্ণ পৃথক নয়। ফ্রএড-এর বিভাগটা হচ্ছে অনুভূমিক (horizontal), কিন্তু প্রিন্স-এর বিভাগটা হচ্ছে গুণগত এবং উল্লম্ব (vertical)। অবশ্য এই দুই প্রকার বিভাগ-রীতিরই প্রয়োজনীয়তা আছে এবং তাদের এ বিভাগ পরস্পর বিপরীত নয়।[২৭]

নির্জ্ঞান তত্ত্ব -বিষয়ে আপত্তি—নির্জ্ঞান মন নয়, নির্জ্ঞান মস্তিষ্কক্রিয়া

অবচেতন বা নির্জ্ঞান মনের ধারণাটি আধুনিক মনোবিদ্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান। কিন্তু ফ্রএড ও মর্টন প্রিন্স-এর নির্জ্ঞান মনের ধারণার বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি তুলেছেন মুন্‌স্টারবার্গ, রিবো ও জ্যাস্‌ট্রো। এর মধ্যে মুনস্টারবার্গ-এর আপত্তিই সব চেয়ে মৌলিক। তিনি বললেন, "অবচেতন মনের কাহিনী সংক্ষেপে তিনটি কথায় বর্ণনা করা যায়: অবচেতন মন

[২৭] The chief differences between Freud's and Prince's theories of the unconscious are (1) that Freud's conception is a psychological one and Prince's conception a physiological one, and (2) that Prince's doctrine does not involve the Freudian concept of "resistence"...Their divisions of the sub-conscious field are based on entirely different principles...Freud's division is a horizontal one into *levels*; and Prince's a vertical one, into *kinds*...the divisions themselves are entirely compatible with each other...and each has value. Moore & Gurnee—The Foundations of Psychology, pp. 264-65

(বলে কিছু) নেই।"[২৮] তাঁর মতে অবচেতন বা নির্জ্ঞান মন, ব্যাখ্যার সূত্র হিসাবে নিষ্প্রয়োজন এবং স্ব-বিরোধী। অবচেতন প্রক্রিয়াগুলি মনের ক্রিয়া নয়, সেগুলি মস্তিষ্কের ক্রিয়া; আর সেগুলি যদি মনের ক্রিয়া হয় তা হলে তারা অবচেতন ক্রিয়া হতে পারে না।[২৯] তাঁর মতে মন ও চেতনা সমার্থ-বাচক।[৩০]

কিন্তু এ আপত্তি খুব প্রবল নয়। চেতনার বাইরে যে অস্পষ্ট চেতনার বলয় আছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং সে অস্পষ্ট বলয়ও অতিক্রম করে ব্যক্তিগত চেতনার বাইরে অনুমানযোগ্য কতকগুলি অবস্থা আছে তারও প্রমাণ পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি।[৩১]

মুন্স্টারবার্গ-এর আর একটি যুক্তি হচ্ছে: মানসিক প্রক্রিয়াগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং তাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ তা কার্য-কারণের সম্বন্ধ নয়, উদ্দেশ্যের সম্বন্ধ। তাদের পরস্পরের বিচ্ছিন্নতার সূত্র হিসাবে অবচেতনার ধারণা নিতান্তই অসার্থক।[৩২]

দেহ ও মনের মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ-বিষয়ে আপত্তি অবশ্যই গ্রাহ্য কিন্তু মানসিক প্রক্রিয়ার পরস্পরের মধ্যে কার্য-কারণের সম্বন্ধ স্বীকার করলে অবচেতনার অসার্থক তো নয়ই, বরং নিতান্ত আবশ্যক।[৩৩]

২৮ The story of the subconscious mind can be told in three words: "there is none." Munsterberg—Psychotherapy, p. 129

২৯ Subconscious mental facts are either not mental but physiological or mental but not unconscious. Ibid, p. 130

৩০ To have psychical existence at all, means to be object of awareness for a consciousness. Therefore psychical objects which have their existence below consciousness are as impossible as a wooden piece of iron,

অনুরূপ কথা বলডুইন-ও বলেছেন—Consciousness is the common and necessary form of all mental states: without it mind is not and cannot be conceived. It is the point of division and differentiation between mind and not mind. Baldwin—Handbook of Psychology, Vol. I, p. 44

৩১ According to the ultra-marginal view that we have taken "subconscious" does not mean "not conscious in any sense of the word" but merely outside the margin of personal consciousness. Moore & Gurnee—The Foundations of Psychology, pp. 252-53

৩২ ...if mental facts *qua* mental have no causal connection, it would be useless to try to fill up the gaps in the series of *conscious* ideas by the introduction of purely hypothetical *sub*-conscious ideas. Ibid, pp. 138ff

৩৩ ...however, if we *accept* the principle of independent psychical causation on general grounds...then acceptance of the subconscious necessarily follows. If we find it possible to admit "causal connection" between conscious processes (conscious causes) then we need have no hesitation in admitting it between sub-concious processes, or between

মুন্‌স্টারবার্গ অবচেতনা বা নির্জ্ঞান মনের ধারণার পরিবর্তে নির্জ্ঞান মস্তিষ্কক্রিয়ার ধারণা ব্যবহার করেছেন। তিনি চার প্রকার প্রক্রিয়া স্বীকার করছেন :

(ক) সমনোযোগ স্পষ্ট সংজ্ঞান (Clear attentive conscious processes)

(খ) সহাবসংজ্ঞান—ব্যক্তিত্ব-সংজ্ঞান হতে বিচ্ছিন্ন সক্রিয় ও সংজ্ঞান-মিশ্রিত চেতনা (Co-conscious processes)

(গ) মনোযোগের বলয়ের বাইরে অস্পষ্ট চেতনাযুক্ত প্রক্রিয়া (Sub-attentive mental processes—mental but not subconscious processes—mental contents which are outside the field of attention but inside the field of consciousness)

(ঘ) এমন কতকগুলি প্রক্রিয়া যেগুলি সংজ্ঞান বা মানসিক নয়, যেগুলি নির্জ্ঞান মস্তিষ্কের ক্রিয়া (not mental, but physiological processes—phenomena which may be explained on the theory of unconscious cerebration)

নির্জ্ঞান মস্তিষ্কক্রিয়া মতবাদ

নির্জ্ঞান মস্তিষ্কক্রিয়া (unconscious cerebration) কথাটি প্রবর্তন করেন উইলিয়ম্ কার্পেণ্টার।[৩৪] কার্পেণ্টার ও মুন্‌স্টারবার্গ মানসিক প্রক্রিয়ায় অনুষঙ্গী মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্তুতে যে চাঞ্চল্য জাগে তার ভিত্তিতেই বিস্মৃতি এবং পুনরায় স্মৃতিপথে আনয়ন প্রক্রিয়াগুলিকে ব্যাখ্যা করতে প্রয়াসী। তাঁরা বলেন, যখন কোন বস্তু সম্বন্ধে ব্যক্তি সচেতন হয়, তখন সেই বস্তু থেকে উদ্দীপক শক্তি (stimulus) কোন ইন্দ্রিয়ে এসে আঘাত করে, সেই আঘাত ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত স্নায়ুতন্তুগুচ্ছকে আন্দোলিত করে এবং সে আন্দোলন স্নায়ুসূত্র দ্বারা বাহিত হয়ে মস্তিষ্কের বোধকেন্দ্রে স্পন্দন জাগায়। চেতনার বস্তু ইন্দ্রিয়ের সম্মুখ থেকে অপসারিত হলেও সে স্পন্দন মৃদুভাবে চলতে থাকে। সেই

conscious *and* subconscious processes (*sub*-conscious causes). For advocates of independent psychic causation, then the hypothses of subconscious ideas is not futile, but actually necessary. Moore & Gurnee—Foundations of Psychology, pp. 253-54

৩৪ Wm. D. Carpenter—Principles of Mental Ps, chology

স্পন্দনগুলি পরবর্তী সময়ে কোন ক্ষীণতর উদ্দীপক শক্তির সম্মুখীন হলে পুনরায় সতেজ চঞ্চলতা লাভ করে, তখনই আমরা অতীতের ঘটনা স্পষ্টভাবে স্মরণ করতে পারি। আর যদি কোন উদ্দীপক শক্তি ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে উপস্থিত না হয় তবে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষ ও স্নায়ুতন্তুতে স্পন্দন ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসে, অবশেষে একেবারে নিতান্তই ক্ষীণ হয় বা স্তব্ধ হয়ে যায়। তখনই আমাদের বিস্মৃতি ঘটে। অর্থাৎ এ মত হচ্ছে—যখন কোন বস্তু চেতনকেন্দ্র থেকে অপসারিত হয়ে যায় তখন মনের মধ্যে কোন দাগ থাকে না, থাকে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষে স্তিমিত চাঞ্চল্য—ব্যাপারটা কোন অবচেতনা বা নির্জ্ঞানক্রিয়া নয়, মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের মৃদু স্পন্দন। কিন্তু যাঁরা নির্জ্ঞান বা অবচেতন-তত্ত্ব স্বীকার করেন তাঁরা বলেন, মনের চেতনার অন্তরালে ক্ষীণভাবে বা সুপ্তভাবে সচেতন অভিজ্ঞতার 'ছায়া' অনুকূল অবস্থার অপেক্ষা করতে থাকে এবং তেমন অনুকূল অবস্থা উপস্থিত হলে আবার স্পষ্ট চেতনায় স্মৃতিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। স্মৃতি বা বিস্মৃতি মানসিক প্রক্রিয়া—তাদের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা কেবলমাত্র মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের চাঞ্চল্য দ্বারা সম্ভব নয়, মানসিক ক্রিয়ার সহগামী হিসাবে মস্তিষ্কক্রিয়া থাকতে পারে, কিন্তু এই দৈহিক ক্রিয়াগুলিকে মানসিক প্রক্রিয়ার কারণ বলা ঠিক নয়।[৩৫]

নির্জ্ঞান মস্তিষ্কক্রিয়া মতবাদ দ্বারা চেতনক্রিয়ার সংরক্ষণ (retention) এবং প্রত্যাবর্তন (recall) হয়তো বা ব্যাখ্যা করা চলতে পারে। কিন্তু প্রত্যভিজ্ঞা (recognition—পুরাতন অভিজ্ঞতাকে আবার চিনতে পারা)

৩৫ The great test of theories of the sub-conscious is the *problem of memory*. What are the conditions, that make it possible to reproduce earlier sensory experience in terms of memory-images? The usual explanation is that every sensory experience leaves some modification in the neurones of the brain—"physiological dispositions," as they are sometimes called; and that memory in its reproductive stage is the conscious accompaniment of renewed activities in those neurones. This is the explanation adopted by those who defend cerebral theories of psychical causation. Advocates of the sub-conscious on the other hand, assert the existence of *psychical* dispositions also in the subconscious region itself as the source of the revived memory-image, and as the psychical correlate of the dispositions in the brain-cell. This is in conformity with the general principle of independence which demands psychical cause for all mental processes. Gurnee & Moore—The Foundations of Psychology, pp. 257-58

ব্যাখ্যা করা চলে না। এই মতবাদ -দ্বারা সহাবসংজ্ঞান (co-conscious) এবং বিষঙ্গ (dissociation) ক্রিয়া যেখানে লক্ষ্য করা যায় না এমন সমস্ত প্রক্রিয়ার মধ্যেও বুদ্ধির যে লক্ষণ থাকে তা ব্যাখ্যা সম্ভব হয় না। এই মতবাদের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি এই যে, এ-মত মানসিক ক্রিয়া এবং মস্তিষ্কের স্নায়বিক ক্রিয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য করে না, সমস্ত মানসিক ক্রিয়াকেই মস্তিষ্কক্রিয়ার সমার্থক বলে মনে করে।[৩৬]

একথা স্বীকার করতে হবে যে, ফ্রএড্ ও তাঁর অনুগামীরা ব্যাখ্যার সূত্রহিসাবে নির্জ্ঞানের যে ধারণা ব্যবহার করেছেন তা অনেকটাই বিশুদ্ধ যুক্তিনির্ভর এবং কাল্পনিক (an abstract hypothetical concept of explanation)। এর অস্তিত্বের প্রমাণ আনুমানিক এবং তা কোন বিজ্ঞান-সম্মত প্রত্যক্ষণ বা পরীক্ষণ -নির্ভর নয়। সেইজন্য জাস্ট্রো-র মতো শারীর-বিজ্ঞানভিত্তিক মনোবিদেরা রহস্যময় নির্জ্ঞানের ধারণার পরিবর্তে মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের ক্রিয়ার ধারণা গ্রহণের পক্ষপাতী। ডানল্যাপ, হলিংওয়ার্থ বা উডউয়ার্থ প্রমুখ ব্যবহারবাদীরা অনুষঙ্গ ও ব্যবহারের পরীক্ষাযোগ্য কলকব্জার সাহায্যে সমস্ত মানসক্রিয়ার ব্যাখ্যার পক্ষপাতী।[৩৭]

---

৩৬ Our final objection,...is one which applies to the theory of unconscious cerebration in its broadest significance...Our basic objection is that the theory of unconscious cerebration confuses the psychical with the physiological. Ibid, p. 260

৩৭ All of the fundamental concepts used in psychoanalytic literature have much of the mysterious about them. There is, for example, no experimental or logical reason for supposing that the mind can be divided into three parts...the Freudians obviously appeal to explanatory concepts which are purely psychological in character. Granted the existence of minds, both conscious and sub-conscious, it becomes possible to make new divisions of these minds or to attribute to them as many special insticts as are necessary to explain the behaviour that is actually observed. The history of science is full of instances which illustrate the futility of this procedure. Griffith—An Introduction to Applied Psychology, p. 334

ত্রিংশ অধ্যায়

ফ্রএডোত্তর মনোবিকলন

ফ্রএড-এর সহকর্মী অথবা অনুগামী সকলেই ফ্রএড-এর মনোবিকলন-তত্ত্ব এবং মনোবিকলন-পদ্ধতি পুরোপুরি গ্রহণ করেন নি। তত্ত্ব হিসাবে মনোবিকলনকে তাঁরা গ্রহণ করেছেন এবং মানস রোগের চিকিৎসায় মনোবিকলন-পদ্ধতিকেও তাঁরা গ্রহণ করেছেন, কিন্তু কোন কোন বিষয়ে তাঁরা পৃথক মতপোষণ করেছেন এবং পদ্ধতিরও কিছু কিছু পরিবর্তন করেছেন। যৌনতাই সমস্ত জীবনের মূল শক্তি কিনা এবং বাল্যকালের বিস্মৃত অভিজ্ঞতার মধ্যেই পরবর্তী জীবনের সমস্ত মানসিক অব্যবস্থিততার মূল লুক্কায়িত আছে কিনা এই প্রশ্ন দুটি নিয়েই ফ্রএড-এর সঙ্গে তাঁদের মতভেদ ঘটেছে, এ কথা মোটামুটিভাবে বলা যায়।

ফ্রএড-এর বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-প্রতিভা, আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টি এবং গভীর মনস্বিতা সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চিন্তাবীরদের মধ্যে তাঁর স্থান একেবারে প্রথম পঙ্‌ক্তিতে। কিন্তু তাঁর মধ্যে কিছুটা অসহিষ্ণুতা ছিল। নিজ সহকর্মী ও অনুগামীদের নিকট থেকে তাঁর নিজ মত ও পদ্ধতি -সম্পর্কে সমালোচনা তিনি শান্তভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি অত্যন্ত কঠোর ভাষায় ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের তিরস্কার করেছেন। ফলে আলফ্রেড্‌ অ্যাড্‌লার, কার্ল য়ুঙ্গ এবং অটো র‍্যাঙ্ক এই তিন প্রতিভাধর মনোবিদ্‌ ফ্রএড-এর ভিয়েনা কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেরা পৃথক পৃথক চিকিৎসা- ও গবেষণা-কেন্দ্র স্থাপন করেন। এঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিশিষ্ট চিন্তানুযায়ী এক একটি সম্পূর্ণ মতবাদ (a fully developed system of theory) গঠন করেছেন। এঁদের নতুন চিন্তাধারা ও পরিবর্তিত পদ্ধতি মনোবিকলন-তত্ত্ব ও -পদ্ধতিকে সমৃদ্ধ করেছে।

বর্তমানে আমেরিকায় মনোবিকলন-তত্ত্ব এবং এই মতবাদ ও পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল চিকিৎসাপ্রণালী বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। যাঁরা এই ব্যাপারে চিন্তায় বা প্রণালী-প্রয়োগে নতুনত্বের দাবি করতে পারেন তাঁদের

মধ্যে এরিশ্‌ ফ্রোম্, ক্যারেন্ হর্‌নি এবং হ্যারি স্টাক সুলিভ্যান্ অগ্রগণ্য। এঁরা অবশ্য কেউই পৃথক সুসম্পূর্ণ মতকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন নি (they have not constituted a school), কিন্তু এঁদের পরস্পরের চিন্তায় সামঞ্জস্য রয়েছে এবং এরা পরস্পরকে প্রভাবিত করেছেন। এঁদের তাই "নব্য ফ্রএড-বাদী" (neo-Freudians) অথবা "নব মনোবিকলন-পন্থী" (neo-analysts) বলা হয়ে থাকে।[১]

অ্যালফ্রেড্ অ্যাড্‌লার

অ্যাড্‌লার-এর বিশিষ্ট মতকে "ইন্‌ডিভিজুয়াল্ সাইকোলজী" নাম দিয়ে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। তার কারণ তিনি ব্যক্তির প্রকৃতি তার পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত করে বুঝতে চেয়েছেন। ফ্রএড-এর মতে ব্যক্তির প্রকৃতি জন্মগত, কিন্তু অ্যাড্‌লার মনে করেন প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের ধারা (style of life) বহুলাংশে পরিবেশ-নির্ভর। অ্যাড্‌লার-এর মতে জীবনের মূল শক্তি যৌনতা নয়। বড় হওয়ার আকাঙ্ক্ষা, নিজেকে দশ জনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ করে প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা। অধিকাংশ মানুষই সমাজের দশজনের সংস্পর্শে এসে নিজের শক্তি ও আকাঙ্ক্ষাকে বাহ্যপরিবেশের সঙ্গে সুসমঞ্জস সম্বন্ধে যুক্ত করে নিজের জন্য একটি বিশেষ স্থান সংগ্রহ করে নেয় এবং তাতে সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু বাল্যকালে বহু ব্যক্তিরই স্বাধীন ইচ্ছা ও শ্রেষ্ঠত্বের আকাঙ্ক্ষা পিতামাতা গুরুজনদের প্রবলতর ইচ্ছাদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। তার ওপরে শিশুর যদি কোন অঙ্গ বা ইন্দ্রিয়ের বৈকল্য থাকে, এবং পিতামাতার শাসন যদি কঠোর হয়, তা হলে শিশুর অবচেতন মনে "হীনমন্যতার জট" (inferiority complex) পাকিয়ে ওঠে। যে ছেলে জ্যেষ্ঠ, পরিবারের মধ্যে তার স্থান নিশ্চিন্ত, সে পিতামাতার আদর পায়, তার সমস্ত আবদার পালিত হয় এবং সে স্বভাবত শ্রেষ্ঠতার মনোভাব নিয়ে গড়ে ওঠে। কিন্তু দ্বিতীয় বা তৃতীয় ছেলের সংসারে সে মর্যাদা নেই। মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় সংসারে কিছুটা অবজ্ঞাত। এসব ক্ষেত্রে হীনমন্যতার গ্লানি তাদের অবচেতন মনে ক্রিয়া করে এবং এর বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের ভাবও তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে। যে ছেলে বাড়ীতে অতিরিক্ত আদর পেয়েছে সে-ও হয়তো বিদ্যালয়ে বা খেলার মাঠে গিয়ে দেখে

১ Shaffer & Shoben—Psychology of Adjustment, p. 465

যে তাকে কেউ বিশেষ খাতির করে না। এদের মনেও তখন হীনমন্যতার ভাবটি প্রবেশ করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যারা শ্রেষ্ঠতর, তাদের বিরুদ্ধে যারা তুলনায় হীন, তাদের প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ করবার উপায় থাকে না। কাজেই বিক্ষোভটা কতকগুলি প্রতীকের সাহায্যে শিশু প্রকাশ করে। অনেক সময় তারা বইয়ের পাতায় কোন মানুষের চোখ দুটি কলম দিয়ে খুঁচিয়ে দেয়—এটা হচ্ছে প্রবল বড়দের বিরুদ্ধে শিশুর অক্ষম প্রতিবাদ। শিশুর মনে পুরুষ হচ্ছে প্রবলের প্রতীক আর নারী হচ্ছে হীনতার প্রতীক। তাই দেখা যাচ্ছে শিশু তার ইতিহাস বইয়ে রানীদের ছবিতে গোঁফ এঁকে তাঁদের পুরুষ করতে চাচ্ছে। এটা তাদের অন্তরের আকাঙ্ক্ষারই প্রতীক। অনেক মানসিক বিকারগ্রস্তদের মধ্যেও পুরুষত্বের (masculinity) এই উৎকট আগ্রহ দেখা যায়। অ্যাড্‌লার-এর মতে মানসিক রোগগ্রস্তদের মধ্যে যৌনিবিষয়ক যে সংঘাত দেখা যায় তা একটি গৌণলক্ষণ মাত্র (secondary manifestation). মৌল কারণ হচ্ছে হীনমন্যতা অতিক্রম করে শ্রেষ্ঠ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা।[২]

হীনমন্যতার আর একটি প্রকাশ হচ্ছে অতি-প্রতিপূরণ (over-compensation)। যার কোন বিষয়ে কিছু ত্রুটি বা দুর্বলতা আছে সে সেই বিষয়ে বা অন্য কোন বিষয়ে অতিরিক্ত কুশলতা দেখাতে ব্যস্ত। যে ছেলে খোঁড়া সেই সকলের আগে স্বেচ্ছাসেবকদের মোট বওয়ার কাজে এগিয়ে যাবে, যে মেয়ে ইংরেজীতে কাঁচা সে ফর্‌ ফর্‌ করে ইংরেজী কথা যত্রতত্র বলতে ব্যস্ত; ব্যভিচারে লিপ্ত স্বামী স্ত্রীর স্বাস্থ্য বিষয়ে অতিরিক্ত উদ্বেগ প্রকাশ করে। এ কৌশল দ্বারা ব্যক্তি নিজের ত্রুটি ঢেকে রাখতে চায় এবং সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করে। এ চেষ্টা যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি না করে এবং ব্যক্তির সাফল্যের কারণ হয় ততক্ষণ ব্যক্তির ব্যবহারকে সুস্থ ও স্বাভাবিক বলা হয়। কিন্তু যখন ব্যক্তি এরূপ কৌশলকে অন্যের উৎপীড়নের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে, তখন তা মানসিক বিকৃতি সূচনা করে। সুস্থ ও বিকারগ্রস্ত মনের মধ্যে আর একটি প্রভেদ হচ্ছে যে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ নিজের হীনতা অতিক্রম করতে গিয়ে বাস্তবানুগ পন্থা

২ Adler—(a) The Practice & Theory of Individual Psychology, p. 465
(b) The Neurotic Constitution, p. 480

অবলম্বন করে, কিন্তু যারা মানসিক বিকারগ্রস্ত তারা নিজেদের সামনে এমন কাল্পনিক এক আদর্শ- বা লক্ষ্য-স্থাপন করে যা বাস্তবিক পক্ষে অসম্ভব বা ব্যক্তির পক্ষে অসাধ্য।[৩] অ্যাড্‌লার-এর মতে প্রত্যেক ব্যক্তির একটি "জীবনের ধরন" (style of life) আছে যেটা তার চরিত্রের প্রকাশ। প্রত্যেকের শৈশবের অভিজ্ঞতা, হীনতাবোধের প্রকার ও পরিমাণ এবং তা অতিক্রম করবার জন্যে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের কল্পনা, তার প্রতিপূরণের চেষ্টার গতি দিয়ে তার জীবনের ধরন-নির্ধারণ হয়। এই জীবনের ধরনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি তার সমাজ-পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিস্থাপন এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। ফ্রএড ও অ্যাড্‌লার দুজনেই ব্যক্তির বাল্যজীবনের অভিজ্ঞতার ওপর তার ব্যক্তিত্বগঠনের সম্বন্ধের জোর দেন। বয়স্ক ব্যক্তির মানসিক বিকার যখন দেখা দেয় তখন তা তার বাল্যজীবনের অমীমাংসিত সংঘাতেরই প্রতিফলন। ব্যক্তির 'জীবনের ধরন' সচেতনভাবে গৃহীত নয়। সর্বক্ষেত্রেই অবশ্য উদ্দেশ্য হীনমন্যতা অতিক্রম করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রমাণ। কখনো কখনো ব্যক্তি এ জন্যে সোজাসুজিই চেষ্টা করে। আবার কখনো বা বক্রভাবে কৌশলের মধ্য দিয়ে বা কল্পনার মধ্য দিয়ে এই লক্ষ্যে পৌছবার চেষ্টা করা হয়। কখনো কখনো (যেমন হিস্টিরিয়ায়) ব্যক্তি নিজের মধ্যে কোন শারীরিক ব্যাধি সৃষ্টি করে নিজের আহত আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে চেষ্টা করে।[৪] তার লক্ষ্য থাকে নিজের কোন একটা রোগ আবিষ্কারের দিকে,

৩ Another difference between normals and neurotics is in *guiding fictions* or imagined goals. A normal person is oriented to reality and does not set up goals which are impossible to attain. A neurotic pays less attention to reality, being engrossed in his fictions which urge him to an impossible superiority. Shaffer & Shoben—Psychology of Adjustment, p. 466

৪ They (Freud & Adler) hold that the situations that cause trouble in adult life are those that revive the unresolved conflicts of childhood. The Adlerians are less exclusively concerned than the Freudians with the child's reactions to his parents. They emphasise, also, the importance of his reactions to other members of the family, in particular to brothers and sisters. In the Adlerian view, it is primarily through the child's efforts to achieve a sense of adequacy in his interactions with parents, siblings and the physical environment that he forms his "style of life" his habitual, though not consciously formulated, way of feeling and acting and dealing with difficulties. They hold that the origin of the adult's "style of life" is to be found in the way in which as a child, he habitually sought to achieve a sense of adequacy, whether by a direct frontal attack on his difficulties or by an attempt to assert himself in some alternative way or by a retreat into phantasy or psycho-genic illness. Rex & Margaret Knight—A Modern Introduction to Psychology, p. 206

যাতে সে বলতে পারে এ রোগ না হলে আমি কত কী-ই না করতে পারতাম।*
ফ্রএড ব্যক্তির সঙ্গে তার পিতামাতার সম্বন্ধকেই বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন কিন্তু অ্যাড্‌লার শিশুর সঙ্গে শুধু পিতামাতা নয়, পরিবারের ভাইবোন এবং অন্যান্য আত্মীয়দের সম্পর্কটিও তার ব্যক্তিত্বগঠনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ এ কথা বলেন।

মানসিক রোগের চিকিৎসা -ব্যাপারেও ফ্রএড ও অ্যাড্‌লার-এর মধ্যে প্রভেদ আছে। ফ্রএড-এর মতে মানসিক বিকারের মূলে থাকে অহং এবং অদসের (সজ্ঞান ও নির্জ্ঞান) মধ্যে অন্তর্বিরোধ। কিন্তু অ্যাড্‌লার-এর মতে এই দুই শক্তিরই মূল উদ্দেশ্য এক—তা হচ্ছে ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব-অর্জনের আকাঙ্ক্ষা। সেই জন্যই অ্যাড্‌লার মনোবিকলন -দ্বারা অবচেতন মনের সংঘাত আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন। ফ্রএড অবচেতনায় 'বাধা'-র (resistance) যে ব্যাখ্যা দেন, অ্যাড্‌লার তা স্বীকার করেন না। অ্যাডলার-এর মতে এ 'বাধা'র তাৎপর্য হচ্ছে এর মধ্য দিয়ে রোগী চিকিৎসকের ওপর প্রভুত্ববিস্তার করতে চায়। অ্যাডলার বলেন, মানসিক রোগের চিকিৎসায় সবচেয়ে প্রধান কাজ হচ্ছে রোগীর "জীবনের ধরন"—তার কল্পিত লক্ষ্য এবং কিভাবে সে তার ত্রুটি-প্রতিপূরণের জন্যে চেষ্টা করে, তা বোঝা। চিকিৎসকের কাজ হবে ধীরে ধীরে তার জীবনের লক্ষ্য, তার জীবনের ধরন, তার প্রতিপূরণের কৌশলের প্রকৃত স্বরূপটি স্পষ্ট করে বুঝে এবং আত্মপরীক্ষা -দ্বারা সমাজ-পরিবেশের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার সামঞ্জস্যবিধানে সাহায্য করা। এর ফলে ব্যক্তি তার নিষ্ফল "জীবনের ধরন" পরিবর্তন ও সংশোধন করে বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী এবং নিজ শক্তি অনুযায়ী 'ভান' বা কৌশল পরিত্যাগ করে

* The problem of every neurosis is for the patient, the difficult maintenance of a style of acting, thinking and perceiving which distorts and denies the demands of reality...An individual goal of superiority is the determining factor in every neurosis but the goal itself always originates in...the actual experiences of inferiority...if I were not so anxious, if I were not so ill, I should be able to do as well as the others ; if my life were not full of terrible difficulties, I should be the first. By this attitude a person is able still to feel superior...His chief occupation in life is to look for difficulties...He does this more to impress himself than others, but naturally other people take his burdens into account and he is judged by a more lenient standard than others. At the same time, he pays the costs of it with his neurosis. Adler—Problems of Neurosis, pp. 41, 46-47

সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে।[৬] অ্যাড্লার-এর জীবনদর্শন (মানুষের জীবনের মূল্যহীনতা-বোধ) আনন্দদায়ক নয়, কিন্তু আমেরিকার মতো যে দেশ বাল্যকাল থেকেই শিশুদের বড় হবার, শ্রেষ্ঠ হওয়ার স্বপ্ন দেখতে উৎসাহ দেয়, সেখানে অ্যাডলার-এর মত যে জনপ্রিয় হবে তাতে আর আশ্চর্য কি। তাছাড়া ফ্রএড বলেছেন, 'যৌনতা'কে জীবনে গৌণ স্থান দিয়ে অ্যাডলার সস্তায় নীতিবাগীশদের প্রশংসা অর্জন করেছেন।[৭]

কার্ল জি. য়ুাঙ্গ

মনোবিকলনের প্রথম যুগে য়ুাঙ্গ ছিলেন ফ্রএড-এর সহকর্মীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল মনীষাসম্পন্ন ও শক্তিধর মনোবিদ্ এবং তাঁদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা মনোবিকলনের ক্ষেত্রে বহু মৌলিক চিন্তার জন্য দায়ী। য়ুাঙ্গ মনোবিকলনের শব্দ-অনুষঙ্গ-পদ্ধতি (free word-association method) ব্যবহারের পথপ্রদর্শক। বিকলক রোগীর চিকিৎসাকালে রোগীর কাছে তার রোগের সঙ্গে যুক্ত তাৎপর্যপূর্ণ কোন শব্দ উচ্চারণ করেন এবং রোগীর মনে এই শব্দটি শোনা মাত্রই যে ভাবটি মনে আসে তা বলতে বলা হয়। এমন করে অনেক সময় রোগীর অবচেতন মনে অবরুদ্ধ 'জটিল গ্রন্থি'র (complex) সন্ধান পাওয়া যায়। 'জটিল গ্রন্থি'র ধারণাটিও মূলত য়ুাঙ্গ-এর। তিনি বলেন, অবচেতন মনে অবরুদ্ধ কোন আকাঙ্ক্ষা ব্যক্তির সমগ্র জীবন্ত স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সেই আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করে আরো বহু চিন্তা ইচ্ছা কর্ম একটি স্বতন্ত্র সুশৃঙ্খল জটিল সত্তা সৃষ্টি করে। এইজন্যেই অবচেতন মনের জট ছাড়ানো খুব সহজ কাজ নয়—তার নাগাল পাওয়া এবং সেই জটের বন্ধনমুক্তি সচেতন বুদ্ধি দিয়ে সম্ভব নয় এই কঠিন কাজটি সম্পাদনের জন্যেই মনোবিকলন-রূপ কঠিন পদ্ধতি প্রয়োগের প্রয়োজন। য়ুাঙ্গ-এর এসব চিন্তাই ফ্রএড-এর পরবর্তী মতবাদকে প্রভাবিত করে। কিন্তু

৬ Flugel—A Hundred Years of Psychology, pp. 294-96

৭ Perhaps Adler's doctrines have peculiar applicability in a land in which individual ambition to "make good" is regarded as of greater moral significance, and has at the same time (in many spheres) a greater chance of success, than in other longer—settled countries. "We must not forget that, weighed down by the burden of its sexual desires humanity is ready to accept anything when tempted with 'ascendancy over sexuatity' as a bait." Freud—Letters.

আদিম কামের (libido) স্বরূপ নিয়ে ফ্রএড-এর সঙ্গে য়ুঙ্গ-এর মতবিরোধ শুরু হল। ফ্রএড বলেছিলেন, জীবনের মৌল শক্তি হচ্ছে যৌনতা—তা কাম-কেন্দ্রিক য়ুঙ্গ একথা অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন, জীবনে কাম বা যৌনতার বিরাট গুরুত্ব রয়েছে সত্য, কিন্তু তাই জীবনের মূল শক্তি নয়। জীবনের শক্তি হচ্ছে উত্তম, অগ্রগমন এবং এই আদিম শক্তির মধ্যে কামের তাড়না যেমন আছে তেমনি আছে নীতি-বুদ্ধি ও ধর্ম-চেতনার বীজ। এই আদিম নিজ্র্জান সত্তার দুটি তল বা স্তর আছে; এক হল ব্যক্তির অবদমিত ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা অভিজ্ঞতার স্তর, আর এক হল গভীরতর স্তর—যেখানে রয়েছে জাতির প্রাচীন সংস্কার এবং বংশপরম্পরার সূত্রে জন্মাবধি প্রাপ্ত তার দেহ ও স্নায়ুর এক একটি সুনির্দিষ্ট গঠন (inherited patterns of neural structure)। একেই য়ুঙ্গ বলেছেন the collective unconscious। এই জন্যেই অত্যন্ত আধুনিক মানুষের মধ্যেও কখনো কখনো তার প্রাচীন অসভ্য পূর্বপুরুষদের অসংস্কৃত চিন্তা বিশ্বাস বা ক্রিয়ার প্রবণতা দেখা যায়। পিতা, মাতা, সন্তান, পুরুষ, স্ত্রী, জন্ম, বৃদ্ধি, মৃত্যু ইত্যাদি ঘটনা মানব ইতিহাসের প্রথম থেকে আমাদের বিস্মৃত পূর্বপুরুষদের চিন্তায় এমন গভীর ভাবে প্রোথিত হয়ে গিয়েছে যে বর্তমান মানুষের অবচেতনায়ও এ সব চিন্তার রূপকল্প (images) ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে। তাই মানুষের চিন্তা ভাবনা অনুভব ও ইচ্ছায় নানা অস্পষ্টভাবে এরা বারে বারে দেখা দেয়। ভূতপ্রেতে বিশ্বাস, জাদুমন্ত্রে বিশ্বাস, রূপকথা এ সবই এই নিজ্র্জান মনের উপাদান। য়ুঙ্গ বলেছেন, ব্যক্তিমানস-বিশ্লেষণে এদের মূল্য সামান্য নয়।

এই কয়টি বিষয়েই ফ্রএড-এর পরবর্তী চিন্তা য়ুঙ্গ-এর মৌলিক চিন্তার অনুগামী হয়েছে। ফ্রএড-এর পরবর্তীকালে অধিশাস্তার ধারণা য়ুঙ্গ-এর চিন্তারই সমর্থক যে জীবনের আদিম শক্তি শুধুই কাম নয়, তার মধ্যে নীতি ও ধর্মবুদ্ধির বীজও সুপ্ত রয়েছে। পূর্বে যেখানে 'যোনি' বা sex কথা ব্যবহার করেছেন পরে ফ্রএড সেস্থলে যৌনিতা বা sexuality কথা গ্রহণ করেছেন এবং আদিম কামের ধারণাকে ব্যাপকতর ও বিশুদ্ধতর করে সমস্ত উত্তম সমস্ত সক্রিয়তাকেই কামের লক্ষণ বলে স্বীকার করেছেন। অবশ্য শেষ পর্যন্তও ফ্রএড শিশুর জীবনের আদিম ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে যৌনিকেন্দ্রিক বলেই বিশ্বাস করেছেন। যাই হোক য়ুঙ্গ-এর সমালোচনাকে তিনি ভাল চোখে দেখেন নি

এবং তাঁকে তিরস্কার করে বলেছিলেন যে যখন তিনি ফ্রএড-এর মৌলিক চিন্তাগুলিকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারছেন না তখন তাঁর নিজেকে মনোবিকলনে বিশ্বাসী বলে প্রচার করা উচিত নয়। ফলে য়্যুঙ্গ ফ্রএড-এর সঙ্গে সহযোগিতার সূত্র বিচ্ছিন্ন করে নিজের মতকে বিশ্লেষণাত্মক মনোবিদ্যা (Analytic Psychology) বলে চিহ্নিত করলেন।

য়্যুঙ্গ-এর চিন্তায় আর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে তিনি ফ্রএড ও অ্যাডলার-এর চেয়ে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও বিকারে পরিবেশ বিশেষত ব্যক্তির বর্তমান পরিবেশের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতেও ব্যক্তির শৈশব-অভিজ্ঞতা ও বাল্যের অনুভূতি-জীবনের সংঘাত ও অবদমন তার ব্যক্তিত্বকে বুঝবার পক্ষে এবং তার অব্যবস্থিততা দূর করার পক্ষে আবশ্যক, কিন্তু ফ্রএড-এর মতো ব্যক্তির পরিণত ও বর্তমান জীবনের অভিজ্ঞতাকে তিনি উপেক্ষা করেন নি। য়্যুঙ্গ-এর মতে ব্যক্তির মধ্যে যেসব সম্ভাবনা থাকে তার কোন্ কোন্‌টি বাস্তবরূপ পাবে তার অনেকটাই ব্যক্তির শৈশবের অভিজ্ঞতার ওপর এবং তার বর্তমান পরিবেশের ওপর নির্ভর করে।[৮]

কিন্তু য়্যুঙ্গ-এর খ্যাতি বহুল পরিমাণে তাঁর ব্যক্তিত্বের দুটি টাইপ-নির্ধারণের ওপরেই নির্ভরশীল। য়্যুঙ্গ বলেছিলেন যে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী ব্যক্তিদের দুটি প্রধান দলে ভাগ করা যায়—একদল যাঁরা বহির্বিশ্বকেই অধিক গুরুত্ব প্রদান করেন, যাঁদের আগ্রহ ও উদ্যম প্রধানত বহির্মুখী। এদের তিনি বলেছেন—Extrovert বা Extravert ; আবার আর একদল মানুষ আছেন যাঁরা নিজেদের অন্তর্জগতেই বাস করতে ভালবাসেন, যারা অভিমানী ও আত্মকেন্দ্রিক। এদের তিনি নাম দিয়েছেন Introverts। এই দুটি প্রধান দল হল—দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী বিভাগ (attitude-types)। মানুষের সংজ্ঞান ও নির্জ্ঞান মানস পরস্পরের বিপরীত। তাই যে মানুষের সংজ্ঞান দৃষ্টিভঙ্গী হল বহির্মুখী তার নির্জ্ঞান দৃষ্টিভঙ্গী হল অন্তর্মুখী ; আবার যার

৮ The Jungians attach much less importance to the individual's past than to his present, but they still consider it important to disentangle his previous history right back to infancy. Since in their view, childhood experiences and environment are important in determining which of the individual's potentialities are actualised, and which remain dormant. Rex & Margaret Knight—A Modern Introduction to Psychology, p. 206

সংজ্ঞান দৃষ্টিভঙ্গী হল অন্তর্মুখী তার নির্জ্ঞান দৃষ্টিভঙ্গী হল বহির্মুখী। আবার মানসক্রিয়া অনুযায়ী চার রকমের টাইপ আছে—চিন্তাশীল দল, অনুভূতি-প্রধান দল, সংবেদন-প্রধান দল ও স্বজ্ঞা-প্রধান দল—(Four function types—the thinking, feeling, sensation and intuition types.)। এই দলগুলির মধ্যে চিন্তাশীল ও অনুভূতি-প্রধান মানুষদের মতোই বৈপরীত্য রয়েছে; চিন্তাশীল দল হচ্ছে বহির্মুখী আর অনুভূতি-প্রধান দল হচ্ছে অন্তর্মুখী। এই দুটি দলকে য়ুঙ্গ বলেছেন rational types। আবার সংবেদন-প্রধান ও স্বজ্ঞা-প্রধান দল দুটি হচ্ছে বিপরীত—প্রথম দলটি হচ্ছে বহির্মুখী আর দ্বিতীয় দল হচ্ছে অন্তর্মুখী।[৯] এই দুটি হল irrational types। "কাণ্ট হলেন ক্রিয়ার দিক থেকে চিন্তাশীল ও দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে অন্তর্মুখী; ডারুইন-ও ক্রিয়ার দিক থেকে চিন্তাশীল দলের, কিন্তু তিনি দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে বহির্মুখী। অনুভূতি-প্রধান দল যুক্তির চেয়ে অনুভূতির দ্বারা অধিক প্রভাবিত। এজাতীয় ব্যক্তি যখন অন্তর্মুখী তখন তাঁদের অনুভূতি তীব্র ও প্রবল; আবার যখন এ ব্যক্তি (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্ত্রীলোক) বহির্মুখী তখন সে অনুভূতির যে বিশেষ ধরনের বাধ্যতা ও সামঞ্জস্য (logic of feeling) আছে তা দ্বারা চালিত। সংবেদনের দিক থেকে যিনি অন্তর্মুখী যেমন—শিল্পী, তাঁর কাছে বাহ্যজগতের সংবেদনের তাৎপর্য হচ্ছে তা তার মধ্যে তা কি অনুভূতি জাগায়, অন্যদিকে গ্রাম্য চাষী ভদ্রলোক তিনি বহির্জগতের সংবেদনকে তাঁর বাহ্য প্রয়োজন দিয়েই মূল্য দেন। সর্বশেষ ব্লেক-এর মতো মরমীয়া কবি হলেন স্বজ্ঞা-প্রধান অন্তর্মুখী দলের; কিন্তু তীক্ষ্ণ রাজনীতিবিদ্ লয়েড জর্জ-এর অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁর শ্রোতাদের মন তৎক্ষণাৎ বুঝবার এবং সেই অনুযায়ী তার বাস্তব কর্মনীতি নির্ধারণ করবার অর্থাৎ তিনি ছিলেন স্বজ্ঞা-প্রধান বহির্মুখী দলের।"[১০]

য়ুঙ্গ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং রোগীর চিকিৎসাদ্বারা যে জ্ঞানলাভ করেছিলেন সেই ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের টাইপ-বিভাগ করতে চেষ্টা করেছেন। পরবর্তীকালে ব্যক্তিত্বের প্রধান গুণগুলি (personality traits) সম্পর্কে নানা সমীক্ষার মধ্য দিয়েও তাঁর প্রধান দুটি টাইপ—অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী

৯ Jung—Contributions to Analytic Psychology, pp. 306-7

১০ Flugel—A Hundred Years of Psychology, pp. 301-'2

এই দুটি মোটামুটি পৃথক দলের পৃথক অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে।[১১] কিন্তু তাঁর আটটি উপবিভাগের সূক্ষ্ম পার্থক্য সম্পর্কে একথা বলা চলে না।

ব্যক্তিদের টাইপে ভাগ করার দিকে প্রবণতা মনোবিদ্‌দের মধ্যে নতুন নয়। কিন্তু বাস্তব জগতে এরকম সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক 'টাইপ' কম দেখা যায়। অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই কিন্তু দুটি বিপরীত টাইপের কিছু কিছু গুণ মিশ্রিত (ambiverts) দেখতে পাওয়া যায়। যার মধ্যে যেই দলের গুণ দোষের আধিক্য দেখা যায় তাকে সেই 'টাইপে' চিহ্নিত করাই কেবলমাত্র সম্ভব।[১২]

য়্যুঙ্গ-এ সমন্বয়ের চেষ্টা

য়্যুঙ্গ-এর চিন্তার বিশিষ্ট ধারা যে তা সমন্বয়-প্রয়াসী। তিনি ফ্রএড ও অ্যাডলার-এর চিন্তার গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক্ সচেতন এবং তাদের লঘু করার পরিবর্তে তিনি তাদের আপাতবিরুদ্ধ মতকে একটি উচ্চতর ক্ষেত্রে নিয়ে সমন্বয়ের চেষ্টাই করেছেন। ফ্রএড বলেছেন, কামই জীবনের মূল শক্তি আর অ্যাডলার বলেছেন, হীনতাবোধ অতিক্রম করে শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিষ্ঠাই মূল শক্তি। য়্যুঙ্গ বললেন, জীবনের মূল শক্তি এ দুয়েরই উর্ধ্বে এক সাধারণ উদ্যোগিতা; কাম এবং শ্রেষ্ঠত্বের আকাঙ্ক্ষা দুই-ই সেই একই সাধারণ শক্তির দ্বিবিধ প্রকাশ। য়্যুঙ্গ-এর জীবনের মূল সাধারণ উদ্যোগিতাকে আমরা সহজেই বের্গসঁ-এর জীবন-স্রোত (elan vital) অথবা সোপেনহয়্যার-এর জীবনাবেগ (will to live) -এর তুলনা করতে পারি। এই সাধারণ উদ্যোগিতা বহুরূপে আপনাকে প্রকাশ করে। তার মধ্যে কাম ও শ্রেষ্ঠত্বের আকাঙ্ক্ষা দুটি প্রধান রূপ।[১৩]

১১ Rex & Margaret Knight—A Modern Introduction to Psychology, p. 194

১২ Such facts have driven psychologists to scepticism regarding types of people. Accordingly, we are inclined to be sceptical of the introvert and extrovert types, if the implication is that mankind fall into these two groups. However, Jung recognized this difficulty in a measure and spoke also of the 'ambivert' whose libido went both outward and inward and whose interests were not predominantly either in the self or in the object. Woodworth—Contemporary Schools of Psychology, pp. 185-86

১৩ He sought to include in the libido both Freud's sex-urge and Adler's

য়্যুঙ্গ-এর অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী এই দুই টাইপ স্বীকারের মধ্যেও দেখতে পাই এই বিপরীতকে সমন্বয়ের চেষ্টা। ফ্রএড-এর মতে সমস্ত মানসিক বিকৃতি বা স্বপ্নের পশ্চাতে আছে অবদমিত কামাকাঙ্ক্ষা আর অ্যাডলার বলেন, এদের ব্যাখ্যা শক্তির আকাঙ্ক্ষা দিয়েই করতে হবে। য়্যুঙ্গ সমন্বয় করে বললেন, দু-জাতের ব্যক্তি আছেন—একদল, যারা অ্যাডলারীয় পন্থায় ব্যক্তির হীনতাবোধ অতিক্রম করে শ্রেষ্ঠতা আকাঙ্ক্ষা করে, তাদের দৃষ্টি হচ্ছে নিজের দিকে ফেরানো, তারা হচ্ছে অন্তর্মুখী বা introvert; আর একদল ফ্রএডীয় পন্থায় কামাকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি খোঁজে, তাদের দৃষ্টি ফেরানো নিজের বাইরে কামবস্তুতে, তারা হল বহির্মুখী বা extrovert।[১৪]

য়্যুঙ্গ-এর অতীন্দ্রিয়বাদ ও ধর্মে বিশ্বাস

ফ্রএড্ ঈশ্বরে বিশ্বাসী নন্—ধর্ম তাঁর কাছে মিথ্যা কল্পনার কাছে আত্ম-সমর্পণ দ্বারা বাস্তব জগতের দুঃখ-কষ্ট-অপূর্ণতা থেকে পলায়নের একপ্রকার চেষ্টা। তিনি এই জগতের অন্তরালে কোন অপ্রাকৃত শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন। এ বিষয়ে ফ্রএড-এর মত আধুনিক বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গীরই সমর্থক। কিন্তু য়্যুঙ্গ মনে করেন ধর্ম এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস গাঁজাখুরী হাস্যকর ব্যাপার নয়। ধার্মিক মানুষ বিশ্বাস করেন যে এই বাস্তব জগতের পশ্চাতে এক অতীন্দ্রিয় অদৃশ্য শক্তি মানুষের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। তিনি এই গভীর বিশ্বাসকে অবহেলা করে উড়িয়ে দেন নি। তিনি জেমস-এর মতো এই বিশ্বাসকে

striving for superiority or will for power. Jung, the monistic harmonizer, regarded the primary libido as a general urge, equivalant to Schopenhauer's will to live or to Bergson's elan vital. It is the total vital energy seeking the goal of growth as well as of activity and reproduction. Woodworth —Contemporary Schools of Psychology, pp. 180-81

১৪ Freud regarded a dream or a neurosis as motivated by repressed sex-desires, Adler by the will for power. Each motive alone appears adequate, but the two are irreconcilable. Jung solved the enigma by his famous doctrine of psychological types. One person may be motivated

মর্যাদা দিয়েছেন এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে এই বিশ্বাসের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে রত হয়েছেন।[১৫]

পরিণত জীবনে তিনি ধর্ম ও সাহিত্য নিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকতে ভালবাসতেন। তাঁর মতে ধর্মগুরু এবং শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরা মানুষকে এই প্রত্যক্ষ জড়জগতের পশ্চাতে এক অতীন্দ্রিয় জগতের ইঙ্গিত দিয়ে তার প্রকৃত আত্মোপলব্ধির সহায়ক হন। শুধু জডবিজ্ঞান কথনোই মানুষকে সম্পূর্ণ শান্তি দূরে থাক্, সাংসারিক সুখও এনে দিতে পারে না। বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান্ হয়ে মানুষ চন্দ্র বা মঙ্গল গ্রহে হানা দিতে পারে—তার দৈহিক আরাম ও সাংসারিক সম্পদ সহস্রগুণ বৃদ্ধি হতে পারে, কিন্তু শুধু জড়বস্তুর জ্ঞান ও জড়শক্তির ওপর অধিকার মানুষকে শান্ত করতে পারে না। কিন্তু মানুষ আজ অন্ধভাবে সাংসারিক সুখ ও সম্পদেরই পশ্চাদ্ধাবন করে আপনার মহতী বিনষ্টির পথই প্রস্তুত করছে। য়্যুঙ্গ বলেন, "আজ (বিজ্ঞানের বলে) যা কিছুর পশ্চাতে মানুষ ছুটে চলেছে তা নিতান্ত পলায়নী বৃত্তি (escapism) ভিন্ন কিছু নয়। নিজেকে আবিষ্কার করা, নিজের মধ্যে ফিরে আসা মঙ্গলগ্রহে যাওয়া অপেক্ষা অনেক বেশী কঠিন। কিন্তু মানুষ যদি নিজেকে আবিষ্কার না করে, নিজের নীড়ে ফিরে না আসে তবে সে নিজের সকলের চেয়ে বেশী বিপদ ডেকে আনছে, সে মনুষ্যজাতির সম্পূর্ণ ধ্বংসেরই আয়োজন করছে।"[১৬]

এই আত্মস্থ হওয়ার আহ্বান যোগদর্শনেরই প্রতিধ্বনি নয়? মানব সভ্যতার আসন্ন বিপদ তিনি যেন যোগীর দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করতেন। অত্যন্ত

in the Freudian way another in the Adlerian way. The one who is motivated by the will for power, Jung argued, must have his interests focussed on the self, while the one who is sex-motivated must focus his interests on the love-object. Generalizing, Jung believed it possible to distinguish two types of individual, one whose interest and attettion centred by preference within himself, and the other, whose interest and attention went out to the social and physical environment. The introver was turned inward, the extrovert (or extravert) was turned outward, the extrovert motivated by Freud's libido was dominated by feeling; the introvert motivated by Adler's will for power, was dominated by thought and inclined to reverie and rumination. Ibid, pp. 184-85

১৫ The mystic's faith in a living God is just as much a psychological fact as the homing instinct of the pigeon, the psychologist must be prepared to investigate the whole range of mental phenomena and it was Jung's distinction, as it had been James's to face such a task without fear or prejudice. Sir Herbert Read—The Achievements of Dr. Jung

১৬ **Quoted by Migual Serrane—A Last Meeting with Jung, Tr. Frank Mcshane**

বেদনার সঙ্গে তিনি বর্তমান শিল্প ও সাহিত্যের তুচ্ছতা ও উৎকেন্দ্রিকতা লক্ষ্য করতেন। তাঁর মনে হত মানবজাতির এই ঘোর দুর্দিনে শিল্পী সাহিত্যিক দার্শনিক নিজ নিজ মহান কর্তব্যচ্যুত হয়েছেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে তাঁর আজীবন সাধনার ধন তথাকথিত চিন্তাশীল বিজ্ঞানীরা উপেক্ষার বস্তু বলেই গণ্য করেছেন। তথাপি তিনি বিশ্বাস হারান নি। তিনি অসংশয় এ প্রত্যয়ে অবিচলিত ছিলেন যে সত্যের পরাজয় নেই—তার মৃত্যু নেই। তাঁর গৃহদ্বারের শীর্ষে ল্যাটিন ভাষায় এই বাণীটি উৎকীর্ণ আছে—"Whether or not you think about God, He is always present."

য়্যুঙ্গ-এর চিন্তায় ভারতীয় প্রভাব

য়্যুঙ্গ-এর অতীন্দ্রিয় সত্তায় বিশ্বাস, ব্যক্তির আত্মস্থ হওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ, তাঁর বিশ্বব্যাপী সমষ্টিগত নির্জ্ঞান তত্ত্ব ভারতীয় চিন্তার সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা প্রমাণ করে। ভারতীয় দার্শনিকদের মতই তিনি গভীরভাবে সমাজ-সচেতন। ফ্রএড ব্যক্তিমানসের বিস্তার তার নিজস্ব অবচেতনায়ই অনুসন্ধান করেছেন, কিন্তু য়্যুঙ্গ-এর মতে ব্যক্তি পরস্পরবিচ্ছিন্ন একক নয়, ব্যক্তি ও সমাজের মানস পরস্পর অবিচ্ছিন্ন, অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধে যুক্ত। এমন কি প্রত্যেক ব্যক্তির অবচেতনার মূল রয়েছে সুদূর অতীতে মানুষের আদিম পূর্বপুরুষদের অন্ধ বিশ্বাস, অনিয়ন্ত্রিত আবেগ-অনুভূতি, ও যুক্তিহীন ইচ্ছা উদ্যম ও প্রতীক -ধর্মী নানা প্রথা-আচারের মধ্যে। ব্যক্তির অবচেতন মনও পরস্পরকে স্পর্শ করে, প্রভাবিত করে। চিন্তামানসের দিক দিয়ে আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছে ঋণী এবং আমরা পরস্পরের সন্তান।[১৭] এমন চিন্তা পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের কাছে নিতান্তই স্বাভাবিক। য়্যুঙ্গ ভারতীয় চিন্তাধারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এটা একটা অলস কল্পনা নয়। তিনি বাস্তবিকপক্ষে ভারতবর্ষে এসে কিছুদিন ছিলেন এবং কয়েকজন শক্তিশালী যোগী পুরুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁদের অদ্ভুত ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করে চমৎকৃত হয়েছিলেন। ভারতীয় সাধুদের প্রভাব তাঁর ওপর কতটা গভীর

১৭ Sir Herbert Read—The Achievements of Dr. Jung.

ছিল তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ—জুরিখে তাঁর বাসভবনে যে ঘরে বসে তিনি কাজ করতেন সে ঘরের দেয়ালে অল্প কয়েকটি ছবি টাঙানো আছে, তার মধ্যে একটি সহজেই দৃষ্টি-আকর্ষণ করে—সে হচ্ছে কৈলাস-শিখরে ধ্যানমগ্ন শিবের প্রতিমূর্তি। ভারতীয় যোগীরা এ কথা বিশ্বাস করেন যে, যোগাভ্যাসের ফলে মানুষ তার মনের ক্ষমতা এতটা বাড়াতে পারে যে তা দেশ ও কালে বিচ্ছিন্ন অন্য মানুষের মনকে জানতে পারে, তাকে প্রভাবিত করতে পারে, এমন কি দেহের বাইরে দূর বস্তুকে তা চালনা করতে পারে। এ বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন, "এটা যদি সত্য হয় যে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মন পৃথকভাবে ক্রিয়া করতে পারে, তা হলে এটাও খুবই সম্ভব যে, মন দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করতে পারে এবং যা দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করতে পারে তা অজর অমর।" কিন্তু মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মন ক্রিয়া করতে পারে, এমন কোন প্রমাণ আছে কি? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "যুদ্ধের সময় আমি এমন কয়েকজন সৈন্য দেখেছি, যাদের মস্তিষ্কে গুলি প্রবেশ করাতে সমস্ত স্নায়ুকেন্দ্র বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এরাও স্বপ্ন দেখত এবং সে স্বপ্নের স্মৃতিও তাদের থাকত। নিতান্ত ছোট শিশু যাদের মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্র এবং তাদের পরস্পরের সংযোগসূত্র একেবারেই পরিণতি লাভ করে নি, তারাও অত্যন্ত স্পষ্ট স্বপ্ন দেখে এবং সে স্বপ্ন তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের ওপর প্রভাব-বিস্তার করে। আমাদের দেহ, মস্তিষ্ক, অহং-এর অতিরিক্ত আরও কোন্ সত্তা আছে যা স্বপ্ন দেখে।" তাঁকে তখন বিস্মিত প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞাসা করলেন: "তবে কি আপনি হিন্দু দার্শনিকদের মতো বিশ্বাস করেন যে এই স্থূলদেহের অতিরিক্ত 'লিঙ্গদেহ' আছে, যা অ-জড়ের সঙ্গে যুক্ত, এবং যা মৃত্যুকালে স্থূলদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়?" উত্তরে তিনি বললেন, "তা আমি জানি না। কিন্তু এই জড় দৃশ্যমান জগৎ থেকে পৃথক এবং তদতিরিক্ত অন্য সত্তা আছে, তা আমি স্বীকার করি। আমি দেখেছি, যেখানে কোন জড়বস্তুর অস্তিত্ব ছিল না সেখানে (যোগপ্রভাবে) জড়বস্তু রূপ-পরিগ্রহ করেছে। আমি প্রত্যক্ষ করেছি যোগীরা দূরে অবস্থিত কোন দ্রব্য হস্ত বা অন্য কিছু দ্বারা স্পর্শ না করেও অন্য স্থানে নিয়ে যেতে পারেন।"[১৬]

১৬ Mignol Serrane—A Last Meeting with Jung (tr. Frank McShane)

অটো র‍্যাঙ্ক :

ফ্রএড্ ব্যক্তিত্বের গঠনে এবং মানসিক বিকারের কারণ-অনুসন্ধানে ব্যক্তির বাল্যের অভিজ্ঞতাকে অতিশয় গুরুত্ব দিয়েছেন। র‍্যাঙ্ক আরো পশ্চাতে সেই মূলের অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর মতে, জন্মের পূর্বে মাতৃগর্ভের কবোষ্ণ অন্ধকার আশ্রয়ে শিশু নিশ্চিন্ত নিরাপদে বিকশিত হতে থাকে। প্রসবকালে অকস্মাৎ সে অতি-আলোকিত কোলাহলপূর্ণ শীতল এই পৃথিবীতে তার পুরাতন আশ্রয় থেকে সবলে নিক্ষিপ্ত হয়। নবজাত শিশুর পক্ষে এই প্রথম অভিজ্ঞতা ভীতিপূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর। জন্মকালের এই আকস্মিক আঘাতে (birth trauma) শিশুর অপরিণত মনে যে বিষম উদ্বেগ ভয় ও অস্থিরতা সৃষ্টি হয় তা কাটিয়ে উঠতে ব্যক্তির দীর্ঘ শৈশবে পিতামাতার আদর, আত্মীয়-পরিজনদের স্নেহ, সমবয়স্কদের প্রীতিপূর্ণ সঙ্গের প্রয়োজন হয়। কিন্তু তার প্রথম জন্মকালের উদ্বেগ ও অশান্তি সে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয় না। ভবিষ্যৎ জীবনে মানুষের সমস্ত মানসিক বিকারের মূল খুঁজতে হবে জন্মকালের সেই বিহ্বলকর উদ্বিগ্ন অভিজ্ঞতায়। অধিকাংশ মানুষই এই আদিম অশান্তি-উদ্বেগ পরবর্তী অভিজ্ঞতায় কাটিয়ে উঠতে পারে, কিন্তু যারা তা পারে না, তাদের মধ্যেই প্রবণতা থাকে মানসিক অসুস্থতার। এই মতের ওপর নির্ভর করে তিনি ইদিপাস্ কমপ্লেক্স্-এর এক নতুন ব্যাখ্যা দিলেন। তিনি বললেন, এই কমপ্লেক্স্-এর অর্থ এ নয় যে বালক তার মাতার সঙ্গে কাম-সম্বন্ধে যুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষা-পোষণ করে (ফ্রএড্ এ ব্যাখ্যাই করেছেন)। এর তাৎপর্য হচ্ছে যে বালক মাতৃগর্ভের নিরাপদ আশ্রয়ে প্রত্যাবর্তন করতে ইচ্ছা করে।[১৭]

র‍্যাঙ্ক-এর মতে, সুস্থ সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের লক্ষণ হল স্বতন্ত্র স্বাধীন ইচ্ছা। এ প্রকার স্বাধীন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের বিকাশ সময় ও অভিজ্ঞতা -সাপেক্ষ। শৈশবে ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছাপ্রকাশের প্রধান বাধা পিতা-মাতা-গুরুজনদের প্রবলতর ইচ্ছা দ্বারা তার পদে পদে খণ্ডিত হওয়া। এর ফলে শৈশবেই বাইরের শাসনের বিরুদ্ধে প্রচ্ছন্ন অবাধ্যতা ও নেতিমূলক ব্যবহারের প্রবণতা সৃষ্টি হয়। এর পরে সাধারণত তিনটি স্তরের মধ্যদিয়ে ব্যক্তির স্বতন্ত্র ইচ্ছা বিকশিত হয়। প্রথম স্তরে পিতামাতার ইচ্ছাকে নিজের ইচ্ছা বলেই গ্রহণ করে

১৭ Rank—The Trauma of Birth, pp. 15-25

(identification)। র‍্যাঙ্ক-এর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী অধিকাংশ মানুষই এই বাধ্যতার সহজ আরামের পথ (the line of least resistance) অতিক্রম করতে পারে না। এর পরের স্তরে বালক পিতামাতা-শিক্ষক-গুরুজনের বাইরে থেকে চাপানো ইচ্ছা ও আদেশের বিরুদ্ধে নিজ স্বাধীন স্বতন্ত্র ইচ্ছা-প্রতিষ্ঠার জন্যে বিদ্রোহের প্রবণতা দেখায়। এই সংগ্রামী ভাবটা কৈশোরোত্তরদের (adolescents) মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কিন্তু তৃতীয় স্তরে সম্পূর্ণ বাধ্যতা এবং নেতিমূলক অবাধ্যতা এই দুইয়েরই সমন্বয়ের প্রয়োজন। যাঁরা সুস্থ সবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন তাঁরা সর্বোচ্চ স্তরে উত্তীর্ণ হন। এঁদেরই প্রকৃত স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ইচ্ছাসম্পন্ন সুপরিণত ব্যক্তি বলা যায়। এঁরাই যুক্তি ও বিবেচনা -দ্বারা আত্মসংযমে অভ্যস্ত এবং নিজের ও সমাজের সঙ্গে সুসঙ্গত। খুব বেশী লোক সাফল্যের সঙ্গে এই সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছতে পারে না। কিছু ব্যক্তি এই দুই বিপরীতের (বাধ্যতা-অবাধ্যতা) সংঘাতে বিভ্রান্ত হয়ে আত্মসমালোচনা ও অপরাধবোধের দ্বারা নিয়ত পীড়িত হয়। এদেরই বলা হয় মানসিক পীড়িত বা বিকারসম্পন্ন। এ ব্যক্তিরা নিজের সঙ্গেও সামঞ্জস্যস্থাপনে অক্ষম, আবার সমাজের সঙ্গেও নিজেদের এরা মিলিয়ে নিতে পারে না। তাই তারা নিজদের নিঃসঙ্গ ও অসহায় মনে করে। এরা তাই পশ্চাদপসরণ করে মাতৃগর্ভের নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে যেতে চায়।[১৮]

র‍্যাঙ্ক-এর মতে সমস্ত মানসিক চিকিৎসার উদ্দেশ্যই হচ্ছে স্বয়ংশাসিত ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার প্রতিষ্ঠা। ব্যক্তির নিজের সঙ্গে এবং পরিবেশের সঙ্গে সুসঙ্গতিস্থাপন -দ্বারাই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। চিকিৎসকের প্রধান এবং প্রথম কাজ হবে রোগীর সঙ্গে সহানুভূতিপূর্ণ বিশ্বাসের সম্বন্ধস্থাপন করা, যাতে রোগীর মনে নিঃসঙ্গতার অশান্তি ও দুর্ভাবনার অবসান ঘটে। রোগী আত্মপ্রত্যয় ফিরে পেলে তখন সে সহজেই সমাজের দশজনের সঙ্গে সুসমঞ্জস সম্বন্ধস্থাপন করে আত্ম-আবিষ্কার করতে পারে এবং সমাজের মধ্যে নিজের স্থানটি খুঁজে নিতে পারে এবং তার অন্তর্নিহিত সৃজনীশক্তিকে মুক্তি দিয়ে সুখী ও শান্ত হতে পারে। এ জন্যেই র‍্যাঙ্ক-চিকিৎসা-পদ্ধতিকে will therapy অথবা relationship therapy বলা হয়েছে।[১৯]

১৮ Shaffer & Shoben—Psychology of Adjustment, pp. 469-70

১৯ Rank—Will Therapy, and Truth & Reality, p. 79

এ-কথা খুবই স্পষ্ট যে ব্যক্তিত্বের গঠন-ব্যাখ্যায় র‍্যাঙ্ক শুধুমাত্র বাল্যের অভিজ্ঞতার ওপরই জোর দেন নি, তিনি পরিবেশ ও পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতার গুরুত্বও স্বীকার করেছেন। তিনি অবচেতন মনের জটিল গ্রন্থি-মোচন এবং স্বপ্নবিশ্লেষণের ওপর ফ্রএড-এর মতো অতটা জোর দেন নি। বরঞ্চ রোগীর বর্তমান পরিবেশের সঙ্গে তার অব্যবস্থিততা নিরসনের ওপরই বেশী জোর দিয়েছেন। তিনি রোগীকে চিকিৎসায় তার সাধারণ সুস্থ সাম্যাবস্থায় (restoration of normality) ফিরিয়ে আনাকেই শেষ উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করেন নি—তাঁর মতে রোগীর সরল স্বতন্ত্র সৃজনীশক্তিতে উদ্যোগী, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠাই সমস্ত চিকিৎসা ও শিক্ষার উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করেছেন। সে জন্যে আদর্শবাদী দার্শনিকদের কাছে তাঁর মত বিশেষ আকর্ষণীয়।[২০]

নব্য-বিকলনবাদ

জার্মানীর পরে অ্যামেরিকায়ই মনোবিকলন তত্ত্ব হিসাবে এবং চিকিৎসা-পদ্ধতি হিসাবে সবচেয়ে বেশী আলোচিত এবং অনুশীলিত হচ্ছে। আধুনিক মনোবিকলনবাদীরা নৃতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানকেও মনোবিকলনের সঙ্গে যুক্ত করে একে এক নতুন তাৎপর্যদান করছেন। এরিশ্ ফ্রোম্, ক্যারেন্ হরনি, হ্যারী স্ট্যাক্ সুলিভ্যান্ এঁরা সকলেই ফ্রএডীয় আদিম কামকে একমাত্র মূলশক্তি হিসাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। তাঁরা বলেন, জীবনের প্রয়োজনে কামের অবশ্যই অত্যাবশ্যক ভূমিকা রয়েছে, কিন্তু ব্যক্তির সুস্থ বিকাশ বা বিকারের ব্যাখ্যায় ব্যক্তির সামাজিক পরিবেশ এবং তার গভীর প্রভাব অবশ্যই বিচার্য। দ্বিতীয়ত শৈশবে ব্যক্তির বিকাশের সমস্ত স্তরই যোনি-কেন্দ্রিক কামের ওপর নির্ভরশীল, একথাও তাঁরা স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন যে, ব্যক্তির প্রকৃতি ও চরিত্রের বিকাশ তার ক্রমবর্ধমান সমাজীকরণের ওপরই অধিকতরভাবে নির্ভর করে। এই সমাজ-পরিবেশের তাৎপর্য বিভিন্ন সংস্কৃতিমূলক চিন্তা-উদ্যম-কর্ম -দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত।[২১] সুলিভ্যান-এর মতে, ব্যক্তির বিকাশ সমাজে অন্য ব্যক্তির সঙ্গে তার পারস্পরিক সম্বন্ধ দ্বারা নির্ধারিত। এই ব্যক্তিদের কাছ থেকে নানারূপে ব্যক্তি তিরস্কার-পুরস্কার লাভ করে। এই অন্য ব্যক্তিরা তাকে কি চোখে দেখে—কিভাবে তার

২০ Shaffer & Shoben—Psychology of Adjustment, p. 470
২১ Fromm—Man for Himself (1947) ; The Sane Society (1955)

সঙ্গে ব্যবহার করে, তা দিয়ে ব্যক্তির নিজসম্বন্ধে ধারণাও গঠিত হয়। কাজেই নিজ পরিবারে পিতামাতা যদি তাকে স্নেহ বিশ্বাস প্রীতি দিয়ে লালন-পালন করেন তবেই নিজ মূল্য সম্বন্ধে সে নিশ্চিন্ত হতে পারে এবং শান্তভাবে নিজের সাধ্য-সম্ভাবনা অনুযায়ী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং তার নিজের বাস্তবিক মূল্য যাই হোক্ যদি তার পরিবারের নিকট-আত্মীয়দের কাছ থেকে সে অবহেলা অপ্রীতি অবজ্ঞা লাভ করে থাকে, তবে যুক্তিহীন-ভাবে সে নিজের সম্বন্ধে হীন ও বিকৃত ধারণা পোষণ করতে থাকে; অন্যকেও সে বিকৃত দৃষ্টিতে দেখতে শেখে। এতে তার ব্যক্তিত্বের সুস্থ বিকাশ ঘটতে পারে না। এ জাতীয় যুক্তিহীন ধারণাকে সুলিভ্যান্ বলেছেন parataxic experiences। এই বিকৃত ধারণার বশবর্তী হয়ে ব্যক্তি কল্পনার আশ্রয় নেয় এবং তার চিন্তা বাস্তববিরুদ্ধ ও প্রতীকধর্মী হয়ে পড়ে। তখন সে মা'কেই সমস্ত স্নেহ-ভালবাসা-পুষ্টি-সৌন্দর্য ও আদর্শের প্রতীক হিসাবে কল্পনা করে। এ আদর্শ বাস্তবের আঘাতে খান্‌খান্ হয়ে যায় এবং ব্যক্তি মনে দুঃখ পায় ও ক্ষুব্ধ হয়। আবার সে পিতা বা যে কোন গুরুজন-শাসককে বিরুদ্ধ-নিষ্ঠুর-ভীতিজনক বলে কল্পনা করে তার প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়। বাল্য-কালের এই বিকৃত ধারণাগুলি সমাজের দশজনের অভিজ্ঞতার নিরিখে মিলিয়ে নিয়ে ক্রমে ক্রমে সাধারণত সংশোধিত হয় (consensual validation)। কোন ব্যক্তিকে বুঝতে হলে এবং তার মানসিক বিকৃতির চিকিৎসা করতে হলে সে নিজেকে কি চোখে দেখে এবং অন্যকেই বা কি দৃষ্টিতে দেখে তা জানা অবশ্যই দরকার এবং যাতে সে বস্তুনিষ্ঠ সুস্থ ধারণা গঠন করতে পারে, সেজন্যে প্রয়োজন বাল্যকালে পিতামাতার অকুণ্ঠ বিশ্বাস ও প্রাণঢালা স্নেহ।[২২]

পরিণত বয়সের মানসিক রোগের অনুষঙ্গী অকারণ দুশ্চিন্তার মূলে আছে বাল্যকালের স্নেহ-সহানুভূতিহীন পারিবারিক সম্পর্ক। হরনি-র মতে, শিশুকে সমাজের সঙ্গে সঙ্গতিস্থাপন ও অন্যের ওপর নির্ভর করা শিখতে হয় এবং পূর্বেই বলা হয়েছে তারই সঙ্গে সঙ্গে যাদের ওপর নির্ভর করতে হয় তাদের প্রতি বিরুদ্ধতা ও বিদ্রোহের একটি প্রচ্ছন্ন মনোভাবও শিশুর মনে গড়ে ওঠে। এই দুই বিপরীত শক্তির সামঞ্জস্যবিধানের অসামর্থ্যই ভবিষ্যৎ জীবনে মানসিক বিকারের মূল কারণ। বাল্যকালে শিশু পিতামাতা-

২২ Sullivan—The Interpersonal Theory of Psychiatry (1953)

পরিজনদের কাছ থেকে যথেষ্ট স্নেহ-ভালবাসা না পেলে, তাঁদের প্রতি প্রচ্ছন্ন বিরোধ বদ্ধমূল হয়ে তার মানসিক সুস্থতাকে বিঘ্নিত করে। সুলিভ্যান-এর ব্যাখ্যা কিছুটা পৃথক হলেও মূলত অনুরূপ। তাঁর মতে, মানসিক বিকৃতির মূলে আছে ব্যক্তির জীবনের মৌলিক আকাঙ্ক্ষা-আগ্রহের সঙ্গে তার আত্মরক্ষার জন্যে সমাজের প্রচলিত আদর্শ ও সংস্কৃতির ওপর নির্ভরতা—এ দুই বিপরীত মনোবৃত্তির মধ্যে সমন্বয়ের অভাব। বাল্যকালের বিভ্রান্তিকর অভিজ্ঞতার ফলে শিশুর মনে যে বিভ্রান্তিকর ও দুঃখজনক দুশ্চিন্তা তার অবচেতন মনে সঞ্চিত হয় ভবিষ্যতে তার সমাজজীবনে নানা সংঘর্ষ ও বিরোধিতার অভিজ্ঞতায় তার সেই বাল্যকালের উদ্বিগ্নতা পুনর্জাগ্রত হয়। আধুনিক বিত্ত-ভিত্তিক সভ্যতার মধ্যেই রয়ে গেছে অমীমাংসিত স্থায়ী বিরোধ—একদিকে এই সভ্যতার দাবি হল তীব্র প্রতিযোগিতার জন্যে সমাজকে প্রস্তুত করা, আবার অন্য দিকে এর দাবি হল সমাজের আদর্শ ও সংস্কৃতির প্রতি বাধ্যতা ও অন্যের প্রতি বিদ্বেষ-পোষণ না করা। এই অমীমাংসিত বিরুদ্ধ দাবির নিয়ত সংঘর্ষে অধিকাংশ আধুনিক মানুষের মন অশান্তি ও উদ্বেগে পূর্ণ।

হরনি বলেন, এই অশান্তি-উদ্বেগ -নিরসনের জন্যে ব্যক্তির কাছে তিনটি পথ খোলা আছে—(১) বাধ্যতা-দ্বারা সমাজের ইচ্ছার কাছে নতিস্বীকার, (২) বিদ্রোহ বা অবাধ্যতা -দ্বারা সমাজের সঙ্গে সংগ্রাম এবং (৩) সমাজের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে কূর্মবৃত্তি অবলম্বন। সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ প্রয়োজন এবং অবস্থা -অনুযায়ী কখনো এই পথ কখনো বা অন্য পথ-অবলম্বন করে। কিন্তু যারা মানসিক অসুস্থ তারা একটিমাত্র অনড় অনমনীয় মনোভাবের পরিচয় দেয়—হয় তারা সর্বদা নির্বিচারে বিনা প্রতিবাদে অবাধ্য অথবা সর্বদাই কলহপরায়ণ বিরুদ্ধভাবাপন্ন ; অথবা সর্বদাই সমাজজীবন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের খোলসে নিজেকে গুটিয়ে নিতে অভ্যস্ত। এরা হল মানসিক বিকৃত মানুষদের তিন প্রকারের চরিত্রের গঠন (character structures)। হরনি-র এ বিষয়ে চিন্তা অ্যাড্‌লার-এর বিভিন্ন জীবনের ধরন (styles of life) -মতবাদের অনুরূপ।[২৩]

নব্য-মনোবিকলনবাদীরা মানসিক রোগের চিকিৎসায় রোগীর সঙ্গে চিকিৎসকের সহৃদয় বিশ্বাস ও প্রীতির সম্বন্ধস্থাপনের ওপর সকলের চেয়ে

২৩ Horney—Our Inner Conflicts (1945)

বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন। এই সম্বন্ধ হল ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সুস্থ পারস্পরিক সম্বন্ধের প্রতীক। রোগী ও চিকিৎসকের মধ্যে এ সম্বন্ধ স্থাপিত হলে তার অশান্তির মূল যে অকারণ উদ্বেগ, তা দূরীভূত হয় এবং তার সুস্থ সমাজীকরণের পথ প্রশস্ত হয়। তাঁরা ফ্রএড-এর মুক্ত-অনুষঙ্গ-প্রণালী ও স্বপ্নবিশ্লেষণকে চিকিৎসার অঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করার পক্ষপাতী, কিন্তু তাঁরা ফ্রএড্ থেকে কিছু ভিন্নভাবে এ সব পদ্ধতির তাৎপর্য-ব্যাখ্যা করেন। এই পদ্ধতিগুলি দ্বারা জানতে পারা যায় ব্যক্তি নিজেকে এবং অন্যকে কি চোখে দেখে, অন্যের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গী কোন্ দিকে বিকৃত হয়েছে (his parataxic distortions) এবং কিভাবে, কোন্ প্রতীকের সাহায্যে সে অন্যকে কল্পনার সাহায্যে কিভাবে রঞ্জিত করে। রোগীর অবচেতন মনের জটিল গ্রন্থি বহুল পরিমাণে সমাজের বিরূপ ব্যবহার-সঞ্জাত। কাজেই এই নব্য-বিকলনবাদীরা ব্যক্তির পারস্পরিক সামাজিক সম্বন্ধের উন্নতির দিকেই জোর দেন। তাঁরা ব্যক্তির বাল্যজীবনের সংঘাত উদ্বেগ অশান্তি -উদ্ঘাটন করে ব্যক্তিকে যেমন বুঝতে চান তেমনি তার বর্তমান পরিবেশও বুঝতে চান। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে ব্যক্তির সমাজজীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যের সম্বন্ধস্থাপন করে ব্যক্তির নিজস্ব সত্তায় তাকে প্রতিষ্ঠা করাই সমস্ত মানসিক চিকিৎসার উদ্দেশ্য।[২৪]

২৪ Shaffer & Shoben—Psychology of Adjustment, p. 472

একত্রিংশ অধ্যায়

মনের রোগের চিকিৎসা

মানসিক রোগের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা বিংশ শতাব্দী থেকেই বাস্তবিক শুরু হয়েছে। কিন্তু মানসিক রোগ সম্বন্ধে মানুষের ভয় আছে। সে ভয় বিজ্ঞানের অগ্রগতি সত্ত্বেও আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি নি। অথচ বিচার করে দেখতে গেলে, মনের রোগ অন্যান্য দেহের রোগের চেয়ে ঘৃণ্য নিশ্চয়ই নয়। আর এই দুই প্রকার রোগের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট ভেদরেখা টানা সম্ভব নয়। তার কারণ, দেহ ও মনের সম্বন্ধ তো অচ্ছেদ্য ও পরস্পরনির্ভর। যতই মানুষের জ্ঞানের প্রসার ঘটছে ততই বোঝা যাচ্ছে, যে সব মনের কলকব্‌জা সুস্থ মানুষের মধ্যে ক্রিয়া করে, সেগুলিই বিকৃতভাবে বা বাড়াবাড়ি-ভাবে (in an exaggerated way) মানসিক যারা অসুস্থ তাদের মধ্যেও দেখা যায়। পূর্বে মানুষ যে মানসিক রোগগ্রস্তদের ভয় ও সন্দেহের চোখে দেখত তার কারণ মানসিক রোগের প্রকৃতি, এই রোগীদের মনের গঠন, মনের কলকব্‌জা এবং এই কলকব্‌জাগুলি কি ভাবে কাজ করে তা আমরা জানতাম না, বুঝতাম না। তাই আমরা মনে করতাম তারা বুঝি সৃষ্টিছাড়া। কিন্তু ফ্রএড-এর নির্জ্ঞান তত্ত্ব আমাদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গী এনে দিয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে ফ্রএড প্রমুখ মনোবিদরা যে সব মানুষ মনের দিক দিয়ে ব্যতিক্রম, যারা বিকারগ্রস্ত, তাদের সযত্নে পর্যবেক্ষণ করেই মানুষের মনের মূল যে নির্জ্ঞান মনের গভীরে কাজ করে সে সংবাদটি জানতে পেরেছিলেন। এই নির্জ্ঞান মনে কি ভাবে বিরোধ ও সংঘাত নানা অস্বস্তি সৃষ্টি করে, কিভাবে অস্বস্তিকর অবস্থার সম্মুখীন হয়ে অবচেতন মনে তাদের সমাধানের চেষ্টা হয়, কি ভাবে অস্বস্তিকর অবস্থার মুখোমুখি না হয়ে প্রবল ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে নির্জ্ঞান মনের অন্ধ কারাগারে নির্বাসন দেওয়া হয়, কিভাবে নানা কৌশলের মধ্য দিয়ে অহং অপ্রীতিকর অবস্থার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে, কিভাবে প্রতিকূল অবস্থার আঘাতে ব্যক্তিত্বের সুষম ঐক্য ছিন্ন হয়ে যায়, কি করে এই বিষম অবস্থায় ব্যক্তির খণ্ড ইচ্ছা অনুভূতি চিন্তা কর্ম এক

একটি জটিল গ্রন্থি সৃষ্টি করে বাস্তব জগৎ থেকে বিচ্যুত হয়, কি করে ব্যক্তির ভগ্ন বিশ্লিষ্ট চৈতন্যগুলিকে আবার যুক্তি চিন্তা ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সুষম ব্যক্তিত্বের ঐক্যে প্রতিষ্ঠা করা যায়, এ সমস্ত তত্ত্ব আজ মনোবিদেরা আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত করে দিচ্ছেন এবং আজ তাই মানসিক রোগ বা বিকারকে রহস্যময় এবং ভীতিপ্রদ বলে মনে করবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। তা ছাড়া, মনোবিজ্ঞানীরা শুধুই শুদ্ধ 'তত্ত্ব' উপহার দেন নি। তাঁরা আবেশ (hypnotism) অভিভাবন (suggestion) মনোবিকলন-পদ্ধতি দ্বারা চিকিৎসায় রোগ-নিরাময় করে প্রমাণ করেছেন যে মানসিক রোগ দুশ্চিকিৎস্য নয়। বাস্তবিক পক্ষে এই সব চিকিৎসা-পদ্ধতি পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করে সুফললাভ করার পরই ফ্রএড্ এই রোগ-নিরাময়ের 'কারণ' ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ক্রমে ক্রমে এ তত্ত্বগুলি প্রতিষ্ঠা করেন। অবশ্যই গুরুতর বাতুলতা ইত্যাদি কঠিনতম মানসিক রোগের চিকিৎসায় খুব বেশী চমকপ্রদ সুফল পাওয়া গেছে এমন দাবি করা যায় না। তার একটি প্রধান কারণ দৈহিক রোগের মতো মানসিক রোগের বেলায়ও রোগের প্রথম অবস্থায় চিকিৎসা করালে সুফললাভের সম্ভাবনা বেশী থাকে। কিন্তু নিজেদের বা নিকট আত্মীয়স্বজনের মানসিক বিকৃতি দেখা দিলে, সেটা আমরা চেপে যেতেই চাই। তখন সহৃদয় ও বিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রতিকারের ব্যবস্থা করলে অনেক ক্ষেত্রেই রোগ সেরে যেতে পারে। কিন্তু আমাদের যুক্তিহীন অন্ধতার জন্যেই সেটা হয় না। রোগ গুরুতর হওয়ার আগে, প্রথম বিকৃতির লক্ষণ দেখা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক রোগের 'মানসিক চিকিৎসায়' (psycho-therapy) অনেক ক্ষেত্রেই সুফল পাওয়া যায়।[১]

১ All types of treatment have a greater chance of being effective if they are begun early in the development of psychosis. Early treatment, however, requires the prompt recognition of symptoms of withdrawn, erratic and depressed behaviour. The chief obstacle to such recognition is not ignorance but the superstitious fear of mental disorders that prevents families from recognizing the condition and seeking professional assistance. Boring, Langfeld & Weld—Foundations of Psychology, p. 588

মানসিক রোগের চিকিৎসার বিভিন্ন পদ্ধতি

মানসিক রোগের সঙ্গে শারীরিক কিছু না কিছু গ্লানি সর্বদাই যুক্ত থাকে। হজমের গোলযোগ, কোষ্ঠবদ্ধতা, শীর্ণতা, মাথার যন্ত্রণা, মাথা ঘুরানী, হাত-পা কাঁপা, অতিরিক্ত উত্তাপবোধ এই সব লক্ষণগুলি অনেক মানসিক অশান্তির সঙ্গেই দেখা দেয়। কাজেই এ সবের চিকিৎসার জন্যে প্রচলিত সাধারণ চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স্, গ্লিসারো-ফস্ফেট্স্, ভিটামিন্ বি-টুয়েল্ভ্ এবং হর্মোন-ঘটিত ঔষধ অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষণ-অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়ে থাকে। গুরুতর রোগের ক্ষেত্রে বৈদ্যুৎ-তরঙ্গ মস্তিষ্কে চালনা দ্বারা হঠাৎ তীব্র আঘাত (Electric shock) এবং অনুরূপভাবে ইনস্যুলিন্ ও মেট্রাজোল ইন্জেক্শন দ্বারা সাময়িক সংজ্ঞালোপ ও মস্তিষ্কে তীব্র আঘাত (Insulin shock) ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মানসিক চিকিৎসার মধ্যে আবেশ, অভিভাবন, উপদেশ (counselling), প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে রোগীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বিশ্বস্ততার সম্বন্ধ-স্থাপন (questioning and rapport), রোগীর আন্তর অনুভূতির প্রতিফলন (reflection of feelings), মানসিক দ্বন্দ্ব ও অশান্তির প্রকৃতি- ও তাৎপর্য-ব্যাখ্যা (interpretation), মুক্ত অনুষঙ্গ-প্রণালী দ্বারা অবচেতন মনের গ্রন্থিমোচন (abreaction), স্বপ্ন-বিশ্লেষণ (psychoanalysis of dreams) এবং নির্দেশ (guidance) প্রধান।

এ সব উপায় ছাড়াও রোগীর মনকে অন্য প্রীতিপ্রদ কোন দিকে আকর্ষণ করে এবং তার জীবনে নতুন আগ্রহ ও উৎসাহের কেন্দ্র সৃষ্টি করে তার অবচেতন মনের আবদ্ধতা দূর করার চেষ্টা করা হয়। এজন্য দেশভ্রমণ, ধর্মচর্চা, সাহিত্যসেবা, নানাপ্রকারের খেলাধুলা ও সৃজনমূলক নানা হাতের কাজের সাহায্যও নেওয়া হয়।

কখনো কখনো রোগীকে তার বিষাক্ত পরিবেশ থেকে সরিয়ে নতুন পরিবারভুক্ত করে অথবা পাড়া-পরিবর্তন করে, কি বিদ্যালয় পরিবর্তন করে সুফল পাওয়া যায়। রোগীর পিতামাতাকে শিক্ষা দেওয়ারও কোথাও কোথাও ব্যবস্থা আছে।

অব্যবস্থিত ও মানসিক রুগ্ণ শিশুদের চিকিৎসালয় স্থাপনের সূচনা

অ্যামেরিকাতেই প্রথম শিশুদের মানসিক অব্যবস্থিততা ও বিকারের জন্যে

পৃথক চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়। এগুলিকে চাইল্ড্ গাইডেন্স্ ক্লিনিক্ বা চাইল্ড্ গাইডেন্স্ সেণ্টার (শিশুর সমস্যা-বিষয়ে নির্দেশ-দানে রত শিশু-চিকিৎসালয় বা চিকিৎসাকেন্দ্র) বলা হয়। ১৮৯৬ সালে লাইট্নার উইট্মার পেন্সিল্ভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সাইকোলজিক্যাল্ ক্লিনিক্' (মানসিক প্রক্রিয়া -দ্বারা মনের রোগের চিকিৎসালয়) স্থাপন করেন। শিশুদের মানসিক রোগ-চিকিৎসার জন্যে সর্বপ্রথম আধুনিক চিকিৎসালয় স্থাপিত হয় শিকাগোতে। তার নাম ছিল শিকাগো জুভেনাইল্ সাইকো-প্যাথিক্ ইন্স্টিট্যুট্। ১৯০৯ সালে উইলিয়ম্ হীলি এর পুনর্গঠন করে স্থাপন করেন ইনস্টিট্যুট্ ফর জুভেনাইল্ রিসার্চ। বীয়ার্স-প্রবর্তিত মেণ্টাল হাইজীন্ আন্দোলনের পর থেকে (১৯১০) থেকে এ সম্বন্ধে আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমে মানসিক রোগ-চিকিৎসার জন্যে বিশেষ ধরনের চিকিৎসালয় স্থাপিত হতে থাকে। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক শিশুদের সম্বন্ধেই আগ্রহান্বিত, তার কারণ মানসিক বিকারের মূল অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাল্যকালেই খুঁজতে হবে এবং এই বিকৃতিকে বাধা দিতে হলে (prevention) বাল্যকালেই সুশিক্ষা দ্বারা তার ভিত্তিস্থাপন করতে হবে। ইংল্যাণ্ডে অবশ্য এই আন্দোলন এত দ্রুত প্রসারলাভ করে নি। তা ছাড়া এ বিষয়ে অ্যামেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য আছে। ইংল্যাণ্ডে বিদ্যালয়-পরিবেশে শিশুর অব্যবস্থাজনিত মানসিক অশান্তির কারণ-অনুসন্ধান ও চিকিৎসা প্রকাশ্য ও সাধারণ চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানের কর্তব্যের অন্তর্গত বলে স্বীকার করলেও পরিবার-পরিবেশ-জনিত শিশুর অব্যবস্থিততা বিষয়ে অনুসন্ধানকে তাদের পারিবারিক সম্ভ্রম ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিরোধী বলে মনে করা হয়। অর্থাৎ এ বিষয়ে ইংল্যাণ্ডের মানুষ অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল। যাই হোক্ শিশুদের অবাধ্যতা, অপরাধ-প্রবণতা ইত্যাদি প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভয়াবহ আকার ধারণ করে এবং শিশুদের মানসিক বিকার-চিকিৎসার জন্যে প্রকাশ্য ও সাধারণ ক্লিনিক্ স্থাপনের দাবি প্রবল হতে থাকে। ব্রিটিশ কমনওয়েলথের রাষ্ট্রগুলিতেই (Commonwealth countries) এ বিষয়ে আগ্রহ-সৃষ্টি হয় এবং এই বিষয়ে অনুসন্ধান ও প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে গবেষণার জন্যে কমন্ওয়েলথ ফাণ্ড-সৃষ্টি হয় (১৯২২-২৭) এবং কিছু পরীক্ষামূলক ও প্রচার-মূলক চিকিৎসালয় (demonstration clinics) স্থাপিত হয়। তার পর

থেকে ইংল্যাণ্ডে বহু সরকারী ও বেসরকারী শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত ক্লিনিক্ স্থাপিত হয়েছে। ইয়োরোপে রাশিয়া শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য-সংরক্ষণ ও -উন্নতি বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অধিক যত্নবান—যদিও তাঁরা ফ্রএডীয় তত্ত্ব এবং মনোবিকলন-প্রণালীতে একেবারেই আস্থাশীল নন। তাঁরা মনে করেন সামাজিক সাম্যের আদর্শে শিশুর পরিবেশের উন্নয়ন, সুশিক্ষা এবং সৃজনমূলক সহযোগিতা-ভিত্তিক নানা কর্মের মধ্য দিয়েই শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব।

শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক চিকিৎসালয়ের কাজ

এ সব চিকিৎসা-কেন্দ্রের কাজকে চারটি প্রধান দলে ভাগ করা যায়—(১) রোগ-নির্ণয় (Diagnosis); (২) রোগীর পুনর্বাসন (Rehabilitation); (৩) চিকিৎসা (Treatment) এবং (৪) গবেষণা (Research)। সংক্ষেপে রোগী যাতে নিজের বিকারের প্রকৃতি ও তাৎপর্য বুঝতে পারে এবং যাতে নতুন করে নিজের পরিবেশ ও নিজের অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতিস্থাপন করতে পারে নতুন করে সেই সুশিক্ষাদান—ইংরেজীতে এক কথায় যাকে বলা হয় re-education—তাই হল এই প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্দেশ্য।

চাইল্ড গাইডেন্স্ ক্লিনিকের সংগঠন

এই সব চিকিৎসা-কেন্দ্র একজন বা কয়েকজন চিকিৎসক দ্বারাই পরিচালিত হয় না। রোগীর ব্যক্তিত্বের প্রকৃতি-নির্ণয়, তার পরিবার ও সামাজিক পরিবেশ, তার অব্যবস্থিততার কারণ-অনুসন্ধান, রোগ-নির্ণয়, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন ইত্যাদি দীর্ঘ সময় ও ধীর অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ -সাপেক্ষ কাজের জন্যে বহু সুদক্ষ কর্মী ও বিজ্ঞ পরিচালকের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা প্রয়োজন। কে কে এই ব্যক্তি ?

(১) প্রথম হচ্ছেন এই সংগঠনের কর্তা ও নিয়ন্তা (director) মনের রোগের চিকিৎসায় অভিজ্ঞ, সুশিক্ষিত চিকিৎসক (psychiatrist)। তিনিই রোগ-নির্ণয় ও চিকিৎসা-বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টা।

(২) শিশু-মনোবিজ্ঞানী (psychologist) যাঁর কাজ হচ্ছে বুদ্ধি রুচি শক্তি ব্যক্তিত্ব-নির্ণায়ক নানা বৈজ্ঞানিক অভীক্ষা (mental tests) প্রয়োগ -দ্বারা রোগীর মানসিক বিকাশের স্তর ও তার বিশিষ্ট প্রকৃতিটি বোঝা।

(৩) শিশুর চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ সাধারণ চিকিৎসক (pediatrician)। তিনি রোগীর শারীরিক লক্ষণগুলি নির্ধারণ করেন ও চিকিৎসা সম্বন্ধে উপদেশ দেন।

(৪) সমাজকর্মী (social worker) যাঁর কাজ হচ্ছে রোগীর পরিবার ও সমাজ-পরিবেশ সম্পর্কে যথাসম্ভব পূর্ণ সংবাদ-সংগ্রহ।

(৫) বিত্যালয়ের পরিচালনার সঙ্গে সংযুক্ত শিক্ষক (school administrator)। বিত্যালয়ে রোগীর ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি সংবাদ সরবরাহ করেন এবং রোগীর পুনর্বাসন সম্পর্কে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

(৬) রোগীর শুভানুধ্যায়ী পদস্থ ব্যক্তি, ধর্মযাজক, সমাজসেবী বা শিক্ষাব্রতী দরদী পরামর্শদাতা।

(৭) পিতামাতা ও নিকট আত্মীয়স্বজন।

রোগ-নির্ণয়, চিকিৎসা ও গবেষণার কাজে পূর্বোক্ত সমস্ত ব্যক্তিরই নিবিড় ও সোৎসাহ সহযোগিতা নিতান্ত প্রয়োজন। বিশেষ করে মানসিক রোগের চিকিৎসক (psychiatrist) ও শিশু-মনোবিদের দায়িত্ব সর্বাধিক। এই সহযোগিতা যাতে সুফলপ্রসূ হতে পারে সে জন্যে তাঁদের পরস্পরের বিজ্ঞান ও পদ্ধতি -সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক।[২] তাঁদের পক্ষে এটা একেবারেই কঠিন নয় কারণ মানুষের মনের সুস্থতা এবং বিকার সম্পর্কে দুজনেই আগ্রহী, যদিও তাঁরা বিভিন্ন দিক থেকে মানুষের মনকে বুঝতে চেষ্টা করেন। মনোবিদ সাধারণত সুস্থ মনের প্রকৃতি নিয়েই আলোচনা করেন আর মানসিক রোগের চিকিৎসক মনের বিকার সম্পর্কে অধিক আগ্রহী, কিন্তু এদুটি দিক তো পরস্পরের পরিপূরক।

কিভাবে শিশু-চিকিৎসালয়ে কাজ চলে

যে শিশুর ব্যবহারে গুরুতর অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে, যে তার আচরণ

২ Psychologists and Psychiatrists collaborate in the diagnosis and treatment of mal-adjustment in children and adults and in research into the nature and cause of personality problems and mental illnesses. In such a professional partnership effective collaboration depends on the existence of a common language and an appreciation by both partners of the contributions which each speciality can make to the solution of common problems. May Davidson—The relation between Psychologists and Psychiatrists in the service of mal-adjusted adults & children, British Journal of Psychiatry, 1952

যারা নিজের ও অপরের বিষম অশান্তি সৃষ্টি করছে, যে স্কুলে পিছিয়ে পড়ছে, ঝগড়াঝাঁটি অবাধ্যতা যার এমন স্তরে পৌঁচেছে যে, পিতামাতা-শিক্ষক স্বাভাবিক শাসন দিয়ে তাকে সংশোধন করতে পারছেন না—এমন শিশুকে নিয়ে পিতামাতা ক্লিনিকে এলেন। ক্লিনিকের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক পিতামাতার কাছ থেকে শিশুটির ব্যবহারে কি অসঙ্গতি দেখা দিচ্ছে, কেন সে এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে সম্বন্ধে যথাসম্ভব সংবাদ গ্রহণ করেন। এবার ক্লিনিকের সঙ্গে সংযুক্ত সমাজকর্মী (social worker) সেই ছেলের বাড়ী গিয়ে তার গৃহ-পরিবেশ সম্পর্কে সংবাদ-সংগ্রহ করেন। ছেলেটির সঙ্গেও আলাপ করে তার বক্তব্য শোনেন। তার পাড়াটি কেমন, কোন্ কোন্ ছেলের সঙ্গে সে মেশে, তার আচরণ কেমন, সব খবরও তিনি সংগ্রহ করেন। আর একজন সমাজকর্মী ছেলের বিদ্যালয়ের পরিচালক (school administrator), প্রধানশিক্ষক ও শ্রেণী-শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করে সে লেখাপড়ায় মনোযোগী কিনা, বিভিন্ন বিষয়ে তার উন্নতি-অবনতি কতটা, বিদ্যালয়ে তার আচরণ কেমন ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করেন। এর পর ক্লিনিকের শিশুচিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ (pediatrician) ছেলেটির স্বাস্থ্য এবং তার কোন শারীরিক বিকৃতি আছে কিনা (যথা দৃষ্টিশক্তি কেমন, লিভারের কোন দোষ আছে কিনা, হৃৎপিণ্ডের কাজ স্বাভাবিক কিনা, টন্‌সিল্ বেড়েছে কিনা, গ্ল্যাণ্ডগুলির ক্রিয়া স্বাভাবিক কিনা) এসব যত্ন করে পরীক্ষা করেন। তারপর শিশু-মনোবিদ্ শিশুর বুদ্ধি রুচি প্রবণতা শক্তি নিপুণতা, ইত্যাদি বিষয়ক নানা অভীক্ষা (psychological tests) প্রয়োগ করে তার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ও বিকাশের অবস্থার একটি যথাসাধ্য সম্পূর্ণ চিত্র পেতে চেষ্টা করেন। এ সমস্ত লিপিবদ্ধ তথ্যসমূহ রোগীর ভারপ্রাপ্ত মানসিক রোগের চিকিৎসকের কাছে উপস্থাপিত করা হয়। এবার তিনি শিশুটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহৃদয় সম্বন্ধস্থাপন করেন। তার সঙ্গে নানাভাবে আলোচনা করেন, তাকে তার অসুবিধা ও সমস্যার কথা অসংকোচে বলবার ও আলোচনা করবার সুযোগ দেওয়া হয়। প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্য দিয়ে (interview) চিকিৎসক রোগের প্রকৃতি, তার কারণ, তার বিশেষ সমস্যা, তার অসঙ্গতির ও অশান্তির মূল কোথায় তা বুঝতে চেষ্টা করেন। এরপর তিনি পিতামাতার নিকট থেকে সংগৃহীত অভিযোগ, শিশুর

গৃহ, সমাজ-পরিবেশ ও বিদ্যালয় -সম্পর্কিত সমস্ত সংগৃহীত তথ্য একত্র মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করেন, বিশ্লেষণ করেন, নিজের মনে মনে মোটামুটি কিছু সিদ্ধান্ত করেন। শেষে ছেলেটির রোগ-নির্ণয় এবং চিকিৎসা-পদ্ধতি চূড়ান্তভাবে নির্ধারণের জন্য শিশু-মনের রোগ-চিকিৎসক তাঁর প্রধান সহকর্মীদের (শিশু-মনোবিদ ও শিশু-রোগ-বিশেষজ্ঞ) নিয়ে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত দায়িত্ব ক্লিনিকের পরিচালক মনঃরোগ-সম্পর্কিত ভারপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞের (psychiatrist)। তিনি সহকর্মীদের পরামর্শ গ্রহণ করেন, কিন্তু রোগ-নির্ণয় ও চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্পর্কে দায়িত্ব তাঁর ওপরেই ন্যস্ত। এর পর থেকে কয়েক সপ্তাহ পর পর শিশুর অভিভাবক ও শিশুটি পৃথক পৃথক ভাবে ক্লিনিকে আসতে থাকেন। তাদের প্রশ্ন করে ও পরীক্ষা করে দেখা হয় চিকিৎসায় ছেলেটির উন্নতি হচ্ছে কিনা এবং কতটা উন্নতি হয়েছে। রোগ গুরুতর না হলে দুতিন মাসের চিকিৎসায়ই রোগী আত্মবিশ্বাস ফিরে পায়, এবং নিজের সমস্যার সমাধানে সমর্থ হয়, কিন্তু গুরুতর ক্ষেত্রে দুই তিন বৎসরব্যাপী এ চিকিৎসা চালাতে হয়। যেখানে রোগের মূল বংশগত অথবা যেখানে রোগীর প্রতিকূল পরিবেশ পরিবর্তন বা সংশোধনের সম্ভাবনা নেই সেখানে রোগনিরাময় হওয়া দুঃসাধ্য।[৩] মানসিক রোগের চিকিৎসার এই বিশেষত্ব স্মরণ রাখা বিশেষ প্রয়োজন যে দৈহিক রোগে বেলায় চিকিৎসকই বাইরে থেকে ঔষধ প্রয়োগ করে রোগীকে নিরাময় করেন, কিন্তু মানসিক রোগের বেলায় রোগী নিজেই নিজেকে সারিয়ে তোলে। ডাক্তার রোগীর শিথিল বা দুর্বল ইচ্ছাশক্তিকে জাগ্রত করে সবল আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে তাকে সাহায্য করেন। কথাটা খুব সোজা মনে হলেও কাজটি মোটেই সোজা নয়।[৪] মানসিক যে রুগ্ণ, সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে, নিজের

৩ Murphy—A Briefer General Psychology, pp. 463-464

৪ [The ordinary man] will simply not be able to see how it happens that these [mental] disorders can be treated by psychological methods. Not the least of his troubles will be created by the fact that physical or structural ailments always seem very real, whereas psychological disorders appear to be imaginary or highly fanciful. In truth it is odd that a person could be sick and that his recovery may depend upon the fairly easy process of "changing his mind" about the matter. Of course the psychological arts of healing are by no means so simple as this. Griffith—An Introduction to Applied Psychology, p. 336

আত্মবিশ্বাস তার নষ্ট হয়ে যায়, সে তখন নিজের ভার নিতে অসমর্থ হয়, তার ব্যক্তিত্বের বিচ্ছিন্ন খণ্ডগুলি সে ঐক্যবন্ধনে বেঁধে স্বস্থ হতে পারে না। মনোরোগের চিকিৎসকের কাজ শুধু রোগ-নির্ণয় নয়, তাঁর কাজ রোগীকে ভরসা দেওয়া (reassurance), তার নির্জ্ঞান মনের জটগুলি খুলে দেওয়া, তার আবদ্ধ মনের শক্তিকে মুক্ত করে দিয়ে নতুন স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে নিজের সমস্যাকে বুঝে নতুনভাবে সঙ্গতিস্থাপনে সাহায্য করা।[৫]

চাইল্ড্ গাইডেন্স ক্লিনিক্ ও মেণ্টাল্ হস্‌পিটাল্

এই দুইপ্রকারের মানসিক রোগের চিকিৎসালয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। চাইল্ড গাইডেন্স ক্লিনিকে শুধুমাত্র অব্যবস্থিত শিশুদের রোগ-নির্ণয় ও চিকিৎসা সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া হয়। সাধারণত যারা গুরুতর মানসিক রোগাক্রান্ত অথবা বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব-বিকাশের দিক থেকে যারা নিতান্ত পিছিয়ে আছে তাদের জন্যে ক্লিনিকগুলি নয়। এ জাতীয় রোগীদের ক্লিনিকে পরীক্ষা করে মেণ্টাল্ হস্‌পিটালে অথবা জড়বুদ্ধিদের জন্য যে সব সেবায়তন আছে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ক্লিনিকে রোগীদের ভর্তি করে তাদের যত্ন ও চিকিৎসার সম্পূর্ণ ভার নেওয়া হয় না। সে কাজ মেণ্টাল্ হসপিটালের। সাধারণত প্রাপ্তবয়স্ক গুরুতর মানসিক রোগীদের তত্ত্বাবধান, পর্যবেক্ষণ, সেবা-যত্ন, চিকিৎসার সম্পূর্ণ ভার হাসপাতালগুলি নেয়। সেখানেই রোগীদের চিকিৎসক সেবিকা ইত্যাদির সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে থাকতে হয়। গাইডেন্স্ ক্লিনিকে রোগী ডাক্তারের নির্দেশ নিয়ে বাড়ীতে বাবা-মার কাছে ফিরে যায়। ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ীই চিকিৎসা চলে এবং রোগ আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত রোগী কিছু দিন অন্তর অন্তর ক্লিনিকে আসে। তখন তাকে ডাক্তার আবার পরীক্ষা করেন, চিকিৎসায় কতটা উন্নতি হল তা লক্ষ্য করেন, চিকিৎসা-বিষয়ে নতুন করে নির্দেশ দেন।

---

৫ Thus he is led to gain *insight* about himself, his problem, his relationships to other people and the demands of his environment. Insight can sometimes be promoted by the counselor's interpretations, but it can never be forced. It has to be constructed by the client through his own problem-solving efforts...After the insight has been achieved, the client usually makes his own self-initiated attempts toward readjustment. His new adjustments are superior to his old ones because of his freedom from tension and his superior appreciation of reality. Langfeld, Boring & Weld —Foundations of Psychology, pp. 541-42

চাইল্ড গাইডেন্স ক্লিনিকে কোন্ জাতীয় রোগীরা সর্বাপেক্ষা বেশী উপকৃত হতে পারে

এই বিষয়ে ন্যু ইয়র্কের ইন্স্টিট্যুট্ ফর চাইল্ড গাইডেন্সের পরিপত্রে (circular) বলা হয়েছে—

(১) যে সমস্ত শিশুদের গৃহে বা বিদ্যালয়ে অসঙ্গতি-প্রকাশক নিম্নলিখিত ব্যবহার দেখা যায় এবং যারা পিতামাতা-শিক্ষকের নিকট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তারা এখানের নির্দেশ মান্য করে চললে উপকৃত হবে। অব্যবস্থিত আচরণগুলি হচ্ছে—বিষম মেজাজমর্জি, অন্য ছেলেমেয়ের সঙ্গে অতিরিক্ত কলহপরায়ণতা, অন্যের ওপর জবরদস্তি (bullying), অবাধ্যতা, অতিরিক্ত বাহাদুরী, ঘর বা স্কুল থেকে পালানো, চুরি, মিথ্যাকথা, শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, নৃশংসতা, যৌন-ব্যবহারে বিকার, ইত্যাদি।

(২) ব্যক্তিত্ব-বিষয়ক গুণে যেখানে ন্যূনতা বা বিশৃঙ্খলা দেখা যায় সেখানে ক্লিনিকের নির্দেশনা অনুসরণ করলে উপকার হয়। এ জাতীয় সমস্যাগুলি হল অতিরিক্ত ভয়, লজ্জা, অসামাজিকতা, অতিরিক্ত অভিমান, কাপুরুষতা, অতিমাত্রায় কল্পনা-প্রবণতা, বিষণ্ণতা, নীরব অশ্রুপাত, আত্ম-কেন্দ্রিকতা, অতিরিক্ত জেদ, অতি-চঞ্চলতা ইত্যাদি।

(৩) অভ্যাস-গঠন-বিষয়ক নানা সমস্যা যেখানে দেখা যায়, সেখানে ক্লিনিকের নির্দেশনা সমস্যা-সমাধানে সহায়ক। এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে—খাদ্য ও ঘুম -বিষয়ে অসুবিধা, বাক্যের জড়তা বা তোতলামী, নখ কামড়ানো, বুড়ো-আঙ্গুল চোষা, হস্তমৈথুন, শয্যামূত্র ইত্যাদি।

(৪) সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেরা যখন বিদ্যালয়ে কোন কোন বিষয়ে পিছিয়ে পড়ে, তখন ক্লিনিকের চিকিৎসকের পরামর্শ নিলে উপকার হতে পারে।

ইনষ্টিট্যুট্ ক্লিনিকের বহু দিনের অভিজ্ঞতার ফলে দেখেছেন যে, যে বিষয়ে ক্লিনিকের পরামর্শ সর্বাধিক চাওয়া হয় পর্যায়ক্রমে তাদের এভাবে সাজানো যায়: অবাধ্যতা, নেতিবাচকতা (negativism), জেদ, বিদ্রোহের ভাব, অস্বস্তিবোধ (nervousness), মেজাজমর্জি, চুরি ও মিথ্যাকথা বলা, খাওয়া বিষয়ে যন্ত্রণা, সমবয়স্কদের সঙ্গে মিশতে না পারা, পড়ায় পিছিয়ে পড়া, পরীক্ষায় ফেল করা বিষয়ে অতিরিক্ত ভয়, মারামারি, যৌন ও অন্যান্য গুরুতর অপরাধ।

রোগীর সমস্যা সম্বন্ধে তথ্য-সংগ্রহ-পদ্ধতি

রোগ-নির্ণয় করতে হলে তার কারণ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান প্রয়োজন। দৈহিক রোগের পক্ষে বাহ্য লক্ষণগুলি দ্বারাই রোগ-নির্ণয় অনেকটা করা যেতে পারে। কিন্তু মানসিক রোগের পক্ষে রোগীর ব্যক্তিত্বের প্রকৃতি-নির্ণয়, রোগের কারণ ও আনুষঙ্গিক অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান নিতান্ত আবশ্যক। মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যেক রোগীই পৃথক। তাদের ব্যবহারের বাহ্য লক্ষণ এক হলেও তাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত পটভূমিকা না জানলে তাদের প্রকৃত রোগ-নির্ণয় করা যায় না। সেইজন্যেই আমরা দেখেছি যে রোগীর গৃহ-পরিবেশ, তার বিদ্যালয়-পরিবেশ ইত্যাদি সম্বন্ধে যথাসাধ্য সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতে চেষ্টা করা হয়। শুধু বাইরে থেকে সংগৃহীত তথ্যই (outside data) নয়, এজন্যে রোগীর দৈহিক পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তার বুদ্ধি প্রবণতা রুচি সামর্থ্যও পরীক্ষা করা হয়। ফ্রএড্‌পন্থীদের মতে, সমস্ত মানসিক রোগের মূল খুঁজতে হবে ব্যক্তির বাল্যের অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা বা অবদমিত আকাঙ্ক্ষার মধ্যে। এটি জানতে চেষ্টা করা হয় রোগীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়ে।

রোগীর পটভূমিকা সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ হলে, তখন হয় রোগ-নির্ণয় ও চিকিৎসা।

ব্যক্তিগত তথ্য-সংগ্রহ-পদ্ধতি

প্রত্যেক রোগীই পৃথক। প্রত্যেক রোগীর সমস্যা পৃথক পৃথক ভাবেই বুঝতে হবে। কোন রোগীর সমস্যা ও রোগের প্রকৃতি বুঝতে হলে তার পারিপার্শ্বিক যেসব প্রভাব (কু এবং সু) তার বিকাশের বা বিকৃতির জন্যে দায়ী সেগুলি জানা দরকার। তথ্য-সংগ্রহ-পদ্ধতিতে সেই কাজটি করা হয়। এর বিভিন্ন স্তরগুলি হচ্ছে—

(ক) রোগীর পরিচয়—নাম, পিতামাতার নাম, বয়স, লিঙ্গ, জাতি, বাসস্থান ইত্যাদি। কে রোগীকে নিয়ে এসেছেন, তাঁর সঙ্গে রোগীর সম্বন্ধ।

(খ) কি জন্য রোগীকে ক্লিনিকে আনা হয়েছে—যিনি রোগীকে নিয়ে এসেছেন তাঁর কাছ থেকে রোগীর সম্বন্ধে বক্তব্য লিপিবদ্ধ করা। রোগীর

সম্বন্ধে পিতা, মাতা, শিক্ষক বা অন্য অভিযোগকারীর বক্তব্য কি তা জানা হয়।

(গ) সমাজকর্মীদের রিপোর্ট—তাঁরা অনুসন্ধান করেন এবং জানান—

(১) কবে থেকে কিভাবে রোগ শুরু হয়।

(২) পারিবারিক ইতিহাস ও পরিবেশ—বংশে পূর্বতন পুরুষদের মধ্যে মানসিক রোগের লক্ষণ ছিল কিনা, গৃহ-পরিবেশ পরিচ্ছন্ন ও শান্তিপূর্ণ কিনা, রোগীর প্রতি গৃহের অন্যান্য ব্যক্তিদের মনোভাব কেমন, তাদের প্রতি রোগীর ব্যবহার ও মনোভাব কেমন, ভাইবোন ক'টি, কার কত বয়স, পরিবারে রোগীর স্থান কোথায়, ঠাকুরদা ঠাকুরমা সৎপিতা বা সৎমাতা থাকলে তাদের রোগীর প্রতি মনোভাব, পরিবারের আত্মীয়-কুটুম্ব-বন্ধু ইত্যাদি।

(৩) গৃহে শাসন ও পরিচালনার ব্যবস্থা কেমন? পিতামাতার শাসন অতি কঠোর, না অতিমাত্রায় শিথিল? শাস্তি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা কি? রোগীকে দায়িত্ব কতটা দেওয়া হয়? সে কতটা স্বাধীনতা ভোগ করে?

(৪) পরিবারের আর্থিক অবস্থা।

(৫) পরিবারের সাংস্কৃতিক আবহাওয়া, বইপত্র, খেলাধুলার ব্যবস্থা, সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানে এরা কতটা যোগ দেয়? সমাজে এবং পাড়ায় এদের কতখানি মান্যমানতা আছে?

(৬) কি ভাষাভাষী এরা?

(৭) পাড়ার সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা কেমন?

(ঘ) রোগীর দৈহিক পরীক্ষা—তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদি সুগঠিত কিনা, কোথায় কোন ত্রুটি-বিকৃতি আছে কিনা? তার বিকাশ স্বাভাবিক ও সুসমঞ্জস কি না? স্নায়বিক গোলযোগের কি লক্ষণ আছে? তার যোনির বিকাশ ও ক্রিয়া বয়স অনুযায়ী স্বাভাবিক কিনা?

(ঙ) রোগীর বিভিন্ন বিষয়ে বিকাশের ধারা—এ সম্বন্ধেও যথাসম্ভব সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতে চেষ্টা করা হয়। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হয়:

(১) জন্মের পূর্বের ইতিহাস—শিশুর গর্ভাবস্থায় মায়ের স্বাস্থ্য কেমন ছিল?

প্রসব যথাসময়ে এবং স্বাভাবিক ভাবে হয়েছিল কিনা? গর্ভাবস্থায় মাতা বা শিশু কোন আঘাত পেয়েছে কিনা?

(২) বাল্যের বিকাশের ইতিহাস—কখন শিশুকে মাতৃস্তন্য ছাড়ানো হয়েছে? শিশু কান্নাকাটি কেমন করত? হজম ও ঘুম কেমন হত? কখন দাঁত উঠল, হামা কাটতে শিখল? প্রথম দাঁড়াতে শিখল? কথা বলতে শিখল? ইত্যাদি।

(৩) বুদ্ধির বিকাশের ইতিহাস—বুদ্ধি-পরিমাপক অভীক্ষার ফলে বিভিন্ন বয়সের বুদ্ধ্যঙ্ক (I. Q.)।

(৪) বাক্য-উচ্চারণ ও ভাষা-ব্যবহারে দক্ষতার বিকাশ।

(৫) প্রক্ষোভ ও অনুভূতি -বিষয়ক বিকাশ—রাগ ভয় ভালোবাসা সহানুভূতির বিকাশ স্বাভাবিক ও সুসমঞ্জস কিনা?

(৬) সামাজিক সম্বন্ধ-বিকাশ—পিতা মাতা ভাই বোন ও অন্যান্য সমবয়স্কদের সঙ্গে সম্বন্ধ সহজ ও স্বাভাবিক কিনা?

(চ) লেখাপড়া ও বিদ্যালয়ে অন্যান্য ক্রিয়া -বিষয়ে তার বিকাশসম্বন্ধীয় তথ্য—স্কুলে তার বিভিন্ন বিষয়ে উন্নতি আশাপ্রদ কিনা? কোন বিষয়ে সে কি পিছিয়ে আছে? ক্লাসে তার স্থান কত? স্কুলে শিক্ষক সহপাঠী ও অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কেমন? স্কুলে তার আচরণ কেমন? সে স্কুল পালায় কিনা? অবাধ্য কিনা? মারামারি করে কিনা? ভবিষ্যতে কি পড়বে, এ বিষয়ে তার ইচ্ছা ও ধারণা কি?

(ছ) আর্থিক দৃষ্টিভঙ্গীর ইতিহাস—সে কোন জীবিকাগ্রহণের জন্যে ইচ্ছুক? জীবিকা এবং সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠা-বিষয়ে তার চিন্তা বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা কি?

(জ) আইনগত অবস্থা—সে পূর্বে কোন অপরাধের জন্যে আদালতে অভিযুক্ত হয়েছিল কিনা? হয়ে থাকলে কি অপরাধের জন্যে কি শাস্তি সে ভোগ করেছে?

রোগ-নির্ণয় ও চিকিৎসা

মানসিক রোগের ক্ষেত্রে মানসিক উপায়ে চিকিৎসায় রোগ-নির্ণয় (diagnosis) ও রোগের চিকিৎসা (treatment) একই পদ্ধতির অঙ্গ।

এর প্রধান উপায় হচ্ছে কিছু দীর্ঘকাল ধরে রোগীর সঙ্গে চিকিৎসকের ঘনিষ্ঠ সাক্ষাৎকার (interview) ও প্রশ্নোত্তরের মধ্যদিয়ে (questionnaire) রোগীর মনের জটের সন্ধান ও গ্রন্থিমোচনে সহায়তা। মানসিক পদ্ধতিতে চিকিৎসায় সাধারণ বা নাতি-গুরুতর বায়ুরোগ চিকিৎসার পদ্ধতিকে পরামর্শদান বা Counselling বলা হয় আর গুরুতর বাতুলতা ইত্যাদি মানসিক বিকারের (psychoses) মানসিক চিকিৎসা-পদ্ধতিকে বলা হয় সাইকোথেরাপী। এই উপলক্ষ্যেই আবেশ অভিভাবন মনোবিকলন ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। কাউন্সেলিং বা সাইকোথেরাপী দুইয়েরই মূল্য উদ্দেশ্য এক—ব্যক্তির অবদমিত আকাঙ্ক্ষা, ভয় ইত্যাদিকে মুক্তি দিয়ে সচেতন মনের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া। তা হলেই রোগী মুক্ত যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে নিজের রোগের প্রকৃতি স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরে এবং নিজেরও প্রকৃত পরিচয় পেয়ে নিজেই নিজ অব্যবস্থিততা সংশোধন করে সুস্থ হয়ে উঠতে পারে।[৬]

সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নোত্তর

মানসিক রোগ-নির্ণয়ে ও চিকিৎসায় চিকিৎসক (psychiatrist) রোগীর সঙ্গে একটি বিশ্বাস ও সহানুভূতির সম্বন্ধ (rapport) স্থাপন করে তার মুখ থেকেই তার অসুবিধা, অশান্তি, মানসিক দ্বন্দ্বের বর্ণনা শুনতে চান। রোগীর সঙ্গে এই সাক্ষাৎকার কালে (interview) চিকিৎসক খুব কম কথাই বলেন। রোগীকেই নিজের কথা বলবার নির্বাধ সুযোগ দেওয়া হয়। কখনো কখনো চিকিৎসক (Counsellor) রোগীকে প্রশ্ন করে করে তার মনের কথা বার করতে চান। কিন্তু প্রশ্নোত্তর-ভিত্তিক সাক্ষাৎকারের কতকগুলি অসুবিধা আছে। রোগীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ বিশ্বস্ততার সম্বন্ধ স্থাপিত না হলে চিকিৎসক প্রশ্ন করলে রোগী সাবধান হয়ে উত্তর দেয়, পাছে নিজের কোন দোষ বা

৬ Psychological treatment is usually called *counselling*. when it deals with minor adjustments and *psychotherapy* when it treats psychoneuroses or psychoses. The aims of counselling and psychotherapy are essentially the same: to free the individual from inhibitions and repressions and to give him improved insight into his own conflicts and adjustments, so that he can work out a more satisfactory solution to his problems. Boring, Langfeld & Weld—Foundations of Psychology, p. 539

দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। তখন সে সত্য গোপন করে এবং আত্মপক্ষ-সমর্থনে বানিয়ে আপাত যুক্তিসঙ্গত কারণ (rationalisation) প্রদর্শন করতে পারে। তাতে সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। তাছাড়া অনেক সময় প্রশ্নের মধ্যেই প্রশ্নকর্তা চিকিৎসকের পূর্বকল্পিত ধারণা (preconceptions) ও অভিভাবন (suggestion) থাকে। সেটা একেবারেই উচিত নয়। তার কারণ মানসিক রোগীরা অতি মাত্রায় অভিভাবন প্রবণ। যে সমস্ত অসুবিধা বা দ্বন্দ্ব-সংঘাত তার সত্যিই নেই তাই সে কল্পনা করে তদনুযায়ী আচরণ করতে থাকে। এ সব অসুবিধা এড়াবার জন্যে রোজার্স এবং ওয়ালিন্ মিলে একটি সংশোধিত পদ্ধতি-উদ্ভাবন করেছেন যাতে চিকিৎসক একেবারেই প্রশ্ন করেন না—কেবল মাত্র প্রয়োজন হলে রোগীর বক্তব্য আরো পরিষ্কার ব্যাখ্যা করে তাকে আরো কিছু নিজের বক্তব্য বলতেই উৎসাহ দেন। এই পদ্ধতিকে রোগী-ভিত্তিক পরামর্শদান (client-centred counselling) বলা হয়।[৭] রোজার্স ও ওয়ালিন্-এর বই থেকে এর সামান্য উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে :

রোগীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের সামান্য অংশ—

রোগী—হ্যাঁ অবস্থাটা এমন দাঁড়িয়েছে যে আমার পক্ষে তা অসহ্য! এখন আমার যে অবস্থা চলছে তার চেয়ে মরে যাওয়াও ভালো।

চিকিৎসক—এখন তুমি যে অবস্থা ভোগ করে বেঁচে আছ তার চেয়ে মরে যাওয়াই তোমার ভালো মনে হয়? আচ্ছা, তোমার এই অসহ্য অবস্থা সম্বন্ধে আর একটু কিছু বল না।

রোগী—অবশ্য আশা তো কিছু থাকেই। আশার ওপর নির্ভর করেই তো মানুষ সর্বদা বেঁচে থাকে।

চিকিৎসক—হাঁ, তা ঠিক।

রোগী—কিন্তু না, সচেতনভাবে আত্মহত্যার প্রবৃত্তি বোধ করি, তা নয়। এটা অনেকটা এরকম—যুক্তি দিয়ে দেখতে গেলে মনের অবস্থাটা এরকম দাঁড়িয়েছে বলতে পারি। আমি অনুভব করছি—আমি নিঃস্ব হয়ে গেছি, আর এরকম নিঃস্ব হয়ে বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না। (কিছুক্ষণ স্তব্ধতা)

৭ Boring, Langfeld & Weld—Foundations of Psychology, p. 539

চিকিৎসক—আচ্ছা, তুমি আমাকে আর একটু···ধর, বিস্তারিতভাবে বলতে পার কি—কী তোমার পথ এমন করে রুদ্ধ করে দিয়েছে যে কখনো কখনো তোমার মনে হয় এর চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো ?

রোগী—অ্যাঁ, আমার মনের অবস্থাটা আরো স্পষ্ট করে বলতে পারব কিনা জানি না। কিরকম জানেন—মনে হয় বিষম বেদনাদায়ক একটা ভার যেন আমার সমস্ত তলপেটের ওপর চেপে আছে—আমাকে যেন পিষে ফেলতে চাচ্ছে—আমি যেন ওটাকে স্পর্শ করতে পারি, ঠিক কোন্ জায়গায় ওটা চাপ দিচ্ছে তা যেন দেখিয়ে দিতে পারি। আমার যেন মনে হয় আমার সত্তার মূলে এ কঠিন বাধা···আমার সমস্ত শক্তি ও উদ্যমের মূলে যেন এ ভার পাষাণের মতো চেপে আছে ···আমি যে দিকেই চেষ্টা করি না কেন, যে বিষয়েই উদ্যোগী হই না কেন—এই পাষাণ আমার পথ রুদ্ধ করে আছে।[৮]

পরামর্শদানকালে চিকিৎসক যে কয়েকটি নিয়ম অবশ্যই পালন করবেন তা হচ্ছে—

(১) রোগীর প্রতি আপনার সম্পূর্ণ মনোযোগ দিন। সাক্ষাৎকার-কালে রোগী যেন বুঝতে পারে তার ব্যক্তিগত সমস্যায় আপনি আন্তরিক-ভাবেই মনোযোগ দিচ্ছেন।

(২) রোগীর বক্তব্য মন দিয়ে শুনুন—নিজে কথা বলবেন না।

(৩) রোগীর সঙ্গে তর্ক করবেন না, তাকে উপদেশ দেবেন না।

(৪) মন দিয়ে শুনুন—

(ক) রোগী কি বলতে চায়।

(খ) সে কি কথা বলতে চায় না।

(গ) সে কি কথা সাহায্য ব্যতিরেকে বুঝিয়ে বলতে পারছে না।

(৫) যখন রোগীর কথা মন দিয়ে শুনছেন তখন নিজের মনের মধ্যে তার ব্যক্তিত্বের গড়ন সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করে নিন। পরে এই ধারণা সত্য কিনা, তা মিলিয়ে দেখবেন। কিছুক্ষণ পরে পরে, রোগী যে

৮ Rogers—Counselling & Psychotherapy. pp. 272-73

এ-সম্বন্ধে আরও উদাহরণের জন্যে—Rogers. & Wallen-এর Counselling with Returned Servicemen দ্রষ্টব্য।

কথা বলছে তার সংক্ষিপ্তসার তার সামনে উপস্থিত করুন এবং তাকে জিজ্ঞেস করুন সে এ কথাই বলতে চাইছে কিনা। (তুমি তো একথাই বলতে চাইছ যে তোমার সামনে সর্বদাই একটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা রয়েছে যা তোমার সব চেষ্টা ও উদ্যমকে বারে বারে ব্যর্থ করে দিচ্ছে ?) কিন্তু এ জাতীয় প্রশ্ন করবার সময় বিশেষ সাবধান হবেন, যেন রোগীর বক্তব্য শুধু ব্যাখ্যাই করছেন—তার বক্তব্যে কিছু যোগ করছেন না, বা তার বক্তব্যের বিকৃত ব্যাখ্যা করছেন না।

(৬) এ কথা স্মরণ রাখুন যে যে-কথা রোগী আপনার কাছে বলেছে তা তার জীবনের বিষম গোপনীয় তথ্য, তা অন্যের কাছে আপনি কখনো প্রকাশ করবেন না।[৯]

যাঁরা গোঁড়া ফ্রএড-এর মনোবিকলন-পদ্ধতিতে বিশ্বাসী, তাঁরা কিন্তু মনে করেন যে রোজার্স-এর সাক্ষাৎকার-পদ্ধতির দ্বারা ব্যক্তিত্বের গভীরে তার নির্জ্ঞান মনের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় না। হয়তো গুরুতর বাতুলতা (insanities) ইত্যাদি রোগের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি তেমন সফল হয় না, কিন্তু রোজার্স এবং ওয়ালিন্ তাঁদের ব্যক্তিগত চিকিৎসার অভিজ্ঞতা থেকে এ পদ্ধতির সাফল্য সম্পর্কে (বিশেষত যে সব মানসিক রোগ খুব গুরুতর নয় সেগুলির চিকিৎসার বেলায়) যে সাক্ষ্য দিয়েছেন তা অবিশ্বাস করবার হেতু নেই। আসল কথা হচ্ছে সমস্ত মানসিক রোগ চিকিৎসার জন্যে মাত্র একটিই পাকা সড়ক নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার-পদ্ধতি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মনোবিকলন-পদ্ধতিই অধিক সফল হয়।[১০]

মুক্ত অনুষঙ্গ-ভিত্তিক মনোবিকলন-পদ্ধতি

পূর্বেই বলা হয়েছে যে ব্যক্তির মনে বহু অসামাজিক ও অবাঞ্ছিত আকাঙ্ক্ষা প্রবৃত্তি থাকে কিন্তু তার নির্জ্ঞান মনে সঙ্গে সঙ্গেই থাকে পিতামাতার অনুকরণ-ভিত্তিক প্রবল নীতিবুদ্ধিরও বাধা। ফলে অসামাজিক ইচ্ছাগুলি অধিশাস্তার শাসনে অবদমিত হয়। এই অবদমনের চেষ্টায় নির্জ্ঞান মনে

৯ Elton Mayo—The Social Problems of an Industrial Civilization, pp. 73-74

১০ Munn—Psychology, p. 186

Also see Rogers & Dymond (Ed)—Psychotherapy & Personality Change

দ্বন্দ্ব ও জটিল গ্রন্থির সৃষ্টি হয় এবং তারা চেতন মনের স্রোতোধারার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্যক্তিত্বের ঐক্যকে বিপন্ন করে। মনোবিকলন-পদ্ধতির উদ্দেশ্য হল নির্জ্ঞানের অন্ধকার গুহা থেকে কারারুদ্ধ কামনাগুলিকে সংজ্ঞান মনে মুক্তি দিয়ে ব্যক্তিত্বের ঐক্যের স্রোতোধারাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। এর একটি প্রধান উপায় হচ্ছে রোগীকে আরামে শুইয়ে তার নিজের অশান্তি সম্বন্ধে নিঃসঙ্কোচে সব কথা বলতে তাকে উৎসাহ দেওয়া এবং এর সঙ্গে সঙ্গে রোগীর মনে যে কোন ভাব বা কথা আসে তা অনর্গল বলতে বলা। এতে তার নির্জ্ঞান মনের অর্গল খুলে গিয়ে তার মনের রুদ্ধ জঞ্জাল সে ঝেড়ে ফেলতে পারে (abreaction) এবং বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকও রোগীর ব্যবহৃত কথা বা ধারণার মধ্যে কতকগুলি প্রতীক আবিষ্কার করতে পারেন যার থেকে তার অন্তরের দ্বন্দ্বের বিষয়টির সন্ধান পাওয়া যায়।

এই পদ্ধতি-প্রয়োগের সাফল্য অনেকখানিই নির্ভর করবে রোগীর সঙ্গে চিকিৎসকের বিশ্বাস ও প্রীতির সম্বন্ধস্থাপনের (rapport) ওপরে। তা না হলে রোগী নিজের অন্তর কিছুতেই অসঙ্কোচে উদ্ঘাটন করতে পারে না। পারে না। এই পদ্ধতি সফলভাবে ব্যবহৃত হলে এর শেষের দিকে রোগীর রুদ্ধ কামনা চিকিৎসকে কেন্দ্রিত হতে চায়। চিকিৎসকের নিজের মধ্যেও কোন আবেগের বাষ্প না জমে ওঠে সে বিষয়ে তাঁকে বিশেষ সাবধান হতে হবে। না হলে, রোগীর মন আর এক জটিল গ্রন্থিতে আবদ্ধ হয়ে যাবে। চিকিৎসক নিজে কঠোর বৈজ্ঞানিক ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে রোগীর রোগ সম্পর্কে দৃষ্টি রাখবেন এবং রোগীর এই আসক্তির প্রকৃত ব্যাখ্যা (interpretation) দ্বারা তাকে তার নিজ ব্যক্তিত্বের প্রকৃতি ও তার সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করে দেবেন। রোগী যখন স্বচ্ছ দৃষ্টিতে (insight) নিজ সমস্যার সম্মুখীন হতে পারবে তখনই সে প্রকৃতিস্থ, সুস্থ ও সুসমঞ্জস হয়ে উঠবে। রোগী নিজেই তখন নিজের সমস্যার সমাধানে সমর্থ হবে। স্বচ্ছ হওয়া মানেই সুস্থ হওয়া।

স্বপ্ন-বিশ্লেষণ ও -ব্যাখ্যা

পূর্ণবয়স্ক মানুষের অবচেতন মনে অধিশাস্তার শাসন-জনিত বাধা প্রবল। তাই তার অন্তরের দ্বন্দ্ব ও জটিল গ্রন্থির সংবাদ পাওয়া কঠিন। কিন্তু

ফ্রএড্-তত্ত্ব অনুযায়ী ঘুমের মধ্যে অধিশাস্তার (censor) প্রহরাও শিথিল হয়। সেই অবসরে স্বপ্নে কতকগুলি প্রতীকের সাহায্যে অদস্ তার আদিম কামাকাঙ্ক্ষাগুলি পরিতৃপ্তির জন্যে চেষ্টিত হয়। তাই বিজ্ঞ মনোবিকলকের পক্ষে স্বপ্ন-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির অবচেতন মনের আদিম আকাঙ্ক্ষাগুলির সংবাদ পাওয়া সম্ভব হয়।

ফ্রএড্-এর মতে, স্বপ্নই সাধারণ মানুষের রুদ্ধ কামাকাঙ্ক্ষা-চরিতার্থ করবার স্বাভাবিক ও সহজ উপায়। সমস্ত স্বপ্নই ব্যক্তির কোন আকাঙ্ক্ষা-পরিপূরণ করে। কাজেই স্বপ্নও একপ্রকার রেচক (catharsis) এবং নির্জ্ঞান মনে রুদ্ধ অশান্তি-প্রশমনের উপায় (a way of tension-reduction)। স্বপ্নই ঘুমের অভিভাবক (dream is the guardian of sleep)। শিশুর স্বপ্নে ইচ্ছা-পরিপূরণ অত্যন্ত স্পষ্ট। পেটরোগা শিশুকে ইলিশ মাছভাজা দেওয়া হয় না। তাই সে হয়তো স্বপ্ন দেখে সে পেটভর্তি আস্ত একটি ইলিশ মাছ-ভাজা খাচ্ছে। স্বপ্নে তার ইচ্ছার পরিপূরণ ঘটে বলেই শিশু আরামে ঘুমায়। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির স্বপ্নে ইচ্ছা-পরিপূরণ প্রত্যক্ষভাবে ঘটে না। তার বহু ইচ্ছাই আদিম কামজ। এবং অধিশাস্তা এই ইচ্ছা-পরিপূরণে প্রাণপণে বাধা দেয়। ঘুমের মধ্যে তার প্রহরা শিথিল হলেও তা একেবারে দূর হয় না। তাই ইচ্ছাগুলি ছদ্মবেশ পরে স্বপ্নে দেখা দেয় এবং এ ভাবে অধিশাস্তার প্রহরা এড়ায়। স্বপ্নে যে ছবিগুলি ভেসে ওঠে তারা হল স্বপ্নের প্রকাশ্য উপাদান (manifest content)। শিশুদের স্বপ্নে অনেক সময়ই সেই প্রকাশ্য উপাদানের মধ্যে শিশুর মনের ইচ্ছা স্পষ্ট ধরা যায়। কিন্তু বড়দের স্বপ্নে অধিশাস্তার শাসনের জন্যে তার অবচেতন মনের কামাকাঙ্ক্ষাগুলি প্রকাশ্যভাবে মনের সামনে নিজেদের ধরা দেয় না। গোপন ইচ্ছাগুলি কতকগুলি প্রতীক বা ছদ্মবেশ ধরে আসে। স্বপ্নের প্রকৃত অর্থ মনোবিকলককে আবিষ্কার করতে হয় সেই প্রতীকগুলির যথার্থ ব্যাখ্যা দ্বারা।[১১] স্বপ্নের সেই গোপন তাৎপর্যকে ফ্রএড্ বলেছেন latent content।

---

১১ More often, however, particularly with adults, the impulse seeking fulfilment is one that is not merely unsatisfied but repressed. Such impulses cannot be directly expressed, even in dreams. But in dreams, as in hypnosis, the vigilance of the super-ego is relaxed: and to use Freud's metaphor, when the watchman drowses, the prisoner may slip past in disguise. The interpretation of a dream involves the progressive stripping off of the disguises, until the identity of the fugitive is revealed. Rex & Margaret Knight—A Modern Introduction to Psychology, p. 249

স্বপ্নে ব্যক্তির অবদমিত কামেচ্ছাগুলি কতকগুলি কৌশল অবলম্বন করে অধিশাস্তার দৃষ্টি এড়িয়ে মনের সামনে উপস্থিত হয়। এ কৌশলগুলি হচ্ছে স্থানচ্যুতি (displacement), প্রতীক-গ্রহণ (symbolisation), সংক্ষেপীকরণ (condensation) ও নাটকীকরণ (dramatisation)।

স্বপ্নের প্রকাশ্য উপাদানগুলি নানা সূত্র থেকে সংগৃহীত—তার একটা মস্ত অংশ ব্যক্তির নিকট-অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া যায় (pre-conscious)।

স্থানচ্যুতি দুই প্রকারের। একটি হচ্ছে এক বস্তু বা ঘটনার সঙ্গে যুক্ত কোন তীব্র অনুভূতিকে গোপন করবার উদ্দেশ্যে সেই অনুভূতি অন্যবস্তুতে স্থানচ্যুত হয় (displacement of affect)। একই উদ্দেশ্যে কখনো গুরুত্বপূর্ণ প্রকৃত ইচ্ছাটি স্বপ্নে তার গুরুত্ব হারিয়ে নিতান্ত নগণ্য ও নির্দোষ ভূমিকা গ্রহণ করে (displacement of emphasis)। একটি যুবক এক তরুণীর প্রতি আসক্ত। কিন্তু তরুণীর অনুরাগ অন্য একটি প্রৌঢ় ব্যক্তির প্রতি, যার চুলে পাক ধরেছে। বিফলমনোরথ যুবক স্বপ্ন দেখল একটি অপরিচিত বৃদ্ধ মানুষ মোটর চাপা পড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। কিন্তু তাই দেখে পাড়ার ছেলেরা আনন্দ করছে। এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা: পরিচিত বৃদ্ধ ব্যক্তিটি হচ্ছে যুবকের প্রেমের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী সেই প্রৌঢ় ব্যক্তি। মোটর হচ্ছে যুবকের প্রেমপাত্রী। মোটরে চাপা পড়ে সেই বৃদ্ধের ক্ষতবিক্ষত হওয়ার তাৎপর্য হচ্ছে যুবকের এই ইচ্ছা, যে তার প্রেমপাত্রী সেই প্রৌঢ়কে প্রত্যাখ্যান করে তার হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করুক। ছেলেদের আনন্দটা বাস্তবিকপক্ষে তার নিজের আনন্দেরই স্থানান্তরণ।[১২]

ফ্রএড্-এর মতে স্বপ্নের প্রকাশ্য উপাদান বিশৃঙ্খল ও অর্থহীন মনে হলেও বাস্তবিকপক্ষে সমগ্রভাবে স্বপ্নটি নিশ্চয়ই ব্যক্তির কোন গোপন ইচ্ছাপূরণের ইঙ্গিত বহন করছে। শুধু তাই নয়, স্বপ্নের প্রত্যেকটি খণ্ড উপাদানও তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তার অর্থ বোধগম্য হয় না, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তির কামাকাঙ্ক্ষা প্রতীকের অন্তরালে আত্মগোপন করে। এ প্রকার প্রতীক-ব্যবহার সাহিত্যে এবং রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্রেও (cartoon) সর্বদাই হয়ে থাকে। স্বপ্নে এর ব্যবহার অতিশয় ব্যাপক। কতকগুলি প্রতীক

১২ Shaffer & Shoben—The Psychology of Adjustment, p. 461

সকলের স্বপ্নেই (ফ্রএড-এর মতে) একই অর্থ বহন-করে। যেমন স্বপ্নে রাজারানী পিতামাতার প্রতীক। ছোট জীবজন্তু ভাইবোনের প্রতীক। লাঠি, বন্দুক, গাছ পুংযোনির প্রতীক। বাক্স, থলে, ঘর, মোটরগাড়ী স্ত্রী-যোনির প্রতীক। সিঁড়িতে ওঠানামা, ট্রেনের সান্টিং রতিক্রিয়ার প্রতীক। সব মানুষের স্বপ্নেই এই প্রতীকগুলির ব্যবহার দেখা যায় এবং এদের তাৎপর্য-ব্যাখ্যা কঠিন নয়। কিন্তু অনেক প্রতীক আছে যা ব্যক্তির অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত এবং ব্যক্তির মানস-জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকলে তাদের তাৎপর্য বোঝা যায় না।[১৩] অভিজ্ঞ মনোবিকলকই কেবল স্বপ্নের প্রকাশ্য উপাদান কি পদ্ধতি অনুযায়ী (dream-work) তার বাস্তবিক গোপন তাৎপর্যের ইঙ্গিত দেয় তা বলতে পারেন।

স্থানান্তরণ ও প্রতীকগ্রহণ (সাফার-এর মতে, প্রতীকগ্রহণ স্থানান্তরণেরই একটি বিশিষ্ট রূপ) ছাড়া নাটকীকরণও (dramatisation) অবচেতন মনে কামাকাঙ্ক্ষার ছদ্মরূপের সহায়ক একটি পদ্ধতি। এর উদাহরণও আমরা সাহিত্যে, নাটকে দেখতে পাই। বিবেক বা ধর্ম যাত্রাগানের মঞ্চে মানুষ বা দেবতার মূর্তি নিয়েই অবতীর্ণ হন। স্বপ্নেও আমরা দেখি সামনে খাড়া পাহাড তা অতিক্রম করতে না পেরে উদ্বিগ্ন বোধ করছি; এর তাৎপর্য সম্ভবত যে বাস্তবজীবনে কোন এক ইচ্ছাপূরণের পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধার জন্যে নিরাশ বোধ করছি। নিচে একটি স্বপ্ন-কাহিনী দেওয়া হল; কাহিনীটি দিয়েছেন গর্ডন। এতে স্বপ্নে নাটকীকরণ ও প্রতীকগ্রহন এই দুই পদ্ধতিরই উদাহরণ মিলবে। একটি দুর্বলচরিত্র যুবক। তার মাতা বিত্তশালিনী এবং মাতার ওপরই ছেলে জীবিকার জন্যে নির্ভরশীল। যুবকটি একটি মেয়ের প্রতি অনুরক্ত হল। কিন্তু মা'র এ মেয়ে পছন্দ নয়। ছেলের মনের এক দোদুল্যমান অবস্থা: সে মেয়েটির প্রতি প্রবল আকর্ষণ বোধ করে এবং তার কাছে

১৩ Some symbols appearing in dreams arise through the individual experiences of the dreamer, but others are consistent symbols which always have the same significance for all persons. Among the fixed symbols described by Freud were the following: anything long and pointed as a sword, a whip, a tree signifies the male: rooms, receptacles and bags are symbols of the female: going up or down a stairway indicates the sex act. Coming out of the water is a symbol of birth. Shaffer & Shoben—Psychology of Adjustment, p. 461

বিবাহের প্রস্তাব করবে মনে করে। আবার মা'র অমতের কথা ভেবে সে অগ্রসর হতে সাহস পায় না। একদিন সে স্বপ্ন দেখল সে একটি উঁচু বেড়ার ওপর অস্বস্তিকরভাবে বসে আছে (মেয়েটির সম্বন্ধে তার মনের অবস্থার চমৎকার নাটকীয় প্রতীক), মেয়েটি নিচে দাঁড়িয়ে তাকে লাফিয়ে পড়তে (সাহসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের নাটকীয় প্রতীক) বলছে। কিন্তু সে দুই-একবার দুর্বলভাবে চেষ্টা করল এবং সর্বদাই শেষ মুহূর্তে তার লাফিয়ে পড়ার পথে কোন না কোন বাধা সৃষ্টি হ'ল। তখন সে আবিষ্কার করল (এবং এর জন্য সে খুব দুঃখবোধও করল না) যে তার টাইপিন্‌টা বেড়াতে আটকে গিয়েছে বলেই সে লাফিয়ে নিচে পড়তে পারছে না। এই টাইপিনটা সম্পর্কে মনোবিকলনবিদ্ চিকিৎসক যখন তাকে প্রশ্ন করলেন—তখন সে যে উত্তর দিল তা-ও তার মানসিক প্রকৃতির স্বরূপটিই প্রকাশ করছে; সে বলল, "আসলে ওটা টাইপিন নয়—একটা সেফ্‌টিপিন্, ওটা মা-ই আমাকে দিয়েছিলেন।"[১৪] এ স্বপ্নের তাৎপর্য বোঝা কঠিন নয়! এই দুর্বলচিত্ত যুবকের মা'র ওপর নিরাপদ নির্ভরতা পরিত্যাগ করে সাহসিক সিদ্ধান্তগ্রহণে অনিচ্ছা প্রতীকের মধ্য দিয়ে নাটকীয়ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

কখনো কখনো স্বপ্নে একটি প্রতীক দুই বা ততোধিক ঘটনা, ধারণা বা ব্যক্তিকে প্রকাশ করে। কখনো কখনো বিপরীতও ঘটে—অর্থাৎ একই ব্যক্তি বা ঘটনা বা ধারণা একাধিক প্রতীকের দ্বারা প্রকাশিত হয়। এই পদ্ধতিকে ফ্রএড্ বলেছেন সংক্ষেপীকরণ (condensation)। দ্রব্য এবং তার প্রতীকের মধ্যে সম্বন্ধটি সম-সম সম্বন্ধ (one-one relation) থাকে না, তাই প্রতীকের তাৎপর্য-নির্ণয় যথেষ্ট কঠিন এবং এই কারণে একই স্বপ্নের বিভিন্ন ব্যাখ্যা সম্ভবপর (বাস্তবিকপক্ষে ফ্রএড্, য়ুঙ্গ বা মর্টন প্রিন্স ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ মনোবিকলকেরাও একই স্বপ্নের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন)। সম্ভবত এই ব্যাখ্যাগুলি যদি পরস্পর-বিরোধী না হয় তা হলে তারা অসম্পূর্ণ এবং পরস্পরের পরিপূরক। ফ্রএড্ নিজের একটি স্বপ্ন-বিবরণ দিয়েছেন এবং এটিতে সংক্ষেপীকরণ-পদ্ধতির ক্রিয়া সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্যণীয়। ফ্রএড্ তাঁর একটি সহকর্মীকে স্বপ্নে দেখলেন। ভদ্রলোক পরিষ্কার দাঁড়িগোঁফ-কামানো, কিন্তু ফ্রএড্ তাঁকে স্বপ্নে দেখলেন তাঁর নিজের কাকার মতো হলদে লম্বা-দাড়িওয়ালা

১৪ Gordon—An Introduction to Psychology

চেহারা। এ কাকার সম্বন্ধে ফ্রএড্ পরিবারের সকলেরই ধারণা ছিল যে তাঁর বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু কম। ফ্রএড্ এ স্বপ্নের ব্যাখ্যাতে বলেছেন যে, সহকর্মীতে সেই হলদে দাড়ি যোগ করার অর্থই হচ্ছে যে ফ্রএড্ সেই সহকর্মীর বুদ্ধি সম্পর্কে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করেন না।[১৫]

ফ্রএড্ স্বপ্ন ও স্বপ্ন-ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আর দুটি লক্ষণেরও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, স্বপ্নে ব্যক্তি যেন তার বাল্যজীবনে প্রত্যাবর্তন করে (regression)। অর্থাৎ স্বপ্নে যে কল্পগুলি (images) ব্যবহৃত হয় সেগুলি অনেক সময়ই বালসুলভ, আজগবী ও হাস্যকর। আর স্বপ্ন দেখার পর যখন সে স্বপ্নের বর্ণনা দেয়, তখন কল্পনা দিয়ে আমরা তাতে আরো রং চড়িয়ে (secondary elaboration) তাকে আরো কিম্ভুতকিমাকার করে তুলি। বাস্তব জগতেও একপ্রকার রং-চড়ানো অনেক সময় আমরা লক্ষ্য করি। এমনি করেই গুজব ক্রমে পল্লবিত ও ক্রমশ অধিকতর রোমহর্ষক হয়ে দাঁড়ায় এবং বাল্যজীবনের স্মৃতি-চারণাকালে, তা ক্রমেই অধিক মনোহারী হয়ে ওঠে।

ফ্রএড-এর স্বপ্নতত্ত্বকে হ্যাড্ফিল্ড[১৬] ও আইজেন্ক্[১৭] কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাঁরা বিশেষভাবে এ মতের বিরুদ্ধে মত জানিয়েছেন যে, স্বপ্নমাত্রই প্রত্যক্ষ বা গৌণভাবে ব্যক্তির কোন না কোন ইচ্ছাপূরণ। একথা তাঁরা সত্য বলে মনে করেন না। সমস্ত স্বপ্নই একই সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাঁরা এ প্রশ্ন তুলেছেন যে, সব স্বপ্নই যদি ইচ্ছাপূরণ হয় তবে দুশ্চিন্তার স্বপ্ন, ভয়ের স্বপ্ন আমরা দেখি কেন? যখন কোন মানুষ স্বপ্ন দেখে তার ফাঁসী হচ্ছে তখন কি বুঝতে হবে যে সে মানুষ সত্যি নিজের ফাঁসী হোক এরকম ইচ্ছা করছে? এ আপত্তিগুলিতে ফ্রএড-এর তত্ত্বকে অতি-সরল বা অতি-স্থূলভাবে বুঝতে চেষ্টা করা হচ্ছে। এটা সত্য যে কোন কোন ক্ষেত্রে ফ্রএড-এর স্বপ্নব্যাখ্যা কষ্টকল্পিত, তবে এটা সম্ভবত বলা যায় প্রত্যেক স্বপ্নের মধ্যে ব্যক্তির ইচ্ছার কোন না কোন উপাদান গোপন থাকে, তবে সেটা স্বপ্নের প্রকাশ্য উপাদানকে (manifest content) স্থূলভাবে বিশ্লেষণ দ্বারা ধরা যাবে না। প্রকাশ্য উপাদানের প্রতীকের আবরণকে ভেদ না করতে পারলে স্বপ্নের মূল

১৫ **Freud—The Interpretation of Dreams (3rd ed., 1932), pp. 142-47**
১৬ **Hadfield—Dreams & Nightmare (1954)**
১৭ **Eysenck—Sense & Nonsense in Psychology (1957), p. 161**

তাৎপর্যটি বোঝা যায় না। ব্যক্তির জীবনের মূল শক্তির (dynamism) সঙ্গে তার প্রত্যেকটি মানস ক্রিয়ার যোগ আছে। স্বপ্ন বাস্তবিকপক্ষে কতগুলি ধারণা বা স্মৃতির বিশৃঙ্খল অনুবন্ধ মাত্র, একথা সত্য নয়। প্রাচীন অনুষঙ্গবাদী-দের (associationists) স্বপ্নের ব্যাখ্যা নিতান্ত যান্ত্রিক, বাহ্যিক এবং আকস্মিকতা-নির্ভর। কিন্তু ফ্রএড-এর স্বপ্নব্যাখ্যা জীবনের শক্তির মূল উৎসের সঙ্গে গভীরতর, জীবন্ত ও সক্রিয় সম্বন্ধে যুক্ত। সে হিসাবে ফ্রএড-এর স্বপ্নতত্ত্ব অনেক বেশী দার্শনিক যুক্তিনিষ্ঠ ও উদ্দেশ্যাভিমুখী। ফ্রএড সর্বদাই এ কথাটির ওপর জোর দিয়েছেন যে, ব্যক্তির স্বপ্ন আকস্মিক নয়, তার স্বপ্নে কেন একটি বিশেষ রূপকল্পই ভেসে উঠল, অন্য রূপকল্প কেন দেখা দিল না—তার সুব্যাখ্যা করতে হলে ব্যক্তির অতীত অভিজ্ঞতা তার ব্যক্তিত্বের মূল শক্তির সঙ্গে তাকে যুক্ত করে তাকে বুঝতে হবে।[১৮] এবং ফ্রএড-এর মতে, জীবনের মূল শক্তি হচ্ছে 'ইচ্ছা' বা কাম। প্রত্যেক স্বপ্নকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করলে তার কেন্দ্রে সেই ইচ্ছাটিকেই চিনে নিতে পারা যায়। সেই ইচ্ছাকে বাদ দিলে স্বপ্নটির ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কেন আমরা অপ্রীতিকর বা আশঙ্কাজনক স্বপ্ন দেখি, কি করে সে জাতীয় স্বপ্নকে ইচ্ছা-পূরণ বলা যায়, তা ব্যাখ্যা করবার জন্যে তিনি নানাভাবে চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, স্বপ্নের কাজ হচ্ছে ঘুমকে রক্ষা করা। যখন বাইরে গোলমাল চলতে থাকে, ঘুমের মধ্যে সে গোলমাল স্বপ্নের উপাদান হয়ে ঘুমকে রক্ষা করে। যেসব স্বপ্নে ব্যক্তির ইচ্ছা-পূরণ সোজাসুজি হয় তাতে ব্যক্তি স্বভাবতই তৃপ্তিলাভ করে এবং আরামে ঘুমায়। কিন্তু বড়দের ইচ্ছা সোজাসুজিভাবে পূরণের পথে মস্ত বাধা হচ্ছে অধিশাস্তার কড়া শাসন। পূর্বেই বলেছি এই কারণেই স্বপ্নে ইচ্ছা-পূরণ হয়

[১৮] Previous psychologists had explained dreams simply as disordered train of uncontrolled association. They had not, to Freud's way of thinking, explained why the individual dreamed of one thing rather than of another; they left much to accident and for the rest regarded the dreams as just a mechanical running on of the associative machine...Freud holds fast and consistently to certain fundamental assumptions...one such assumption is that all dreams are motivated...A cause in psychology...must be a psychic cause and a psychic cause must be a wish or motive. ...A dream is a "full psychic act." It is, then, essentially the same as a voluntary act, it is a wish-fulfilment. Woodworth—Contemporary Schools of Psychology, pp. 154-56

কুটিলভাবে ছদ্মবেশের মধ্য দিয়ে। অধিশাস্তাকে ফাঁকি দেওয়ার কাজের মধ্যে কিছুটা উদ্বেগ স্বাভাবিক। তাছাড়া পাছে তার ইচ্ছাপূরণের কৌশলটা ধরা পড়ে যায়, সেজন্যই কখনো কখনো দুশ্চিন্তার ছদ্ম আবরণ পরে স্বপ্ন দেখা দেয়—যেমন মদের চোরাকারবারী মদের বোতলে লেবেল্ লাগিয়ে দেয় "চিরতার নির্যাস"—এই কৌশল অবলম্বন করে সে আবগারী কর্মচারীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াতে চেষ্টা করে।[১৯] তাঁর "ইন্টারপ্রিটেশন্ অব ড্রীমস্" গ্রন্থে তিনি অন্য আর একটি ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। তাঁর মতে, সমস্ত স্বপ্নই অদসের ক্রিয়া নয়, কোন কোন স্বপ্নে অধিশাস্তারও প্রভাব রয়েছে। তাই তাতে বেদনা বা অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আত্মপীড়নের চেষ্টা দেখা যায়।[২০]

ফ্রএড সর্বদাই তাঁর স্বপ্নব্যাখ্যায় একথাটি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে স্বপ্নে প্রতীকের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির নির্জ্ঞান মন তার দুশ্চিন্তাকে ঢেকে দিয়ে ঘুমকে রক্ষা করতে চেষ্টা করে। স্বপ্নের প্রতীকগুলি ব্যক্তির দুশ্চিন্তা থেকে তার নির্জ্ঞান মনকে অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে ঘুমকে রক্ষা করে। এইভাবেই ব্যক্তির দ্বন্দ্ব ও দুশ্চিন্তার সমাধান কোন পথে হতে পারে তারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[২১] যেসব ভয়াত্মক দুঃস্বপ্নে ব্যক্তি চীৎকার করে ঘুম থেকে জেগে যায় (nightmares) সে ক্ষেত্রে স্বপ্নকে ঘুমের রক্ষক বলে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে? এক্ষেত্রেও ফ্রএড একটি নাটকীয় (যদিও কষ্টকল্পিত) ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, কোন কোন ক্ষেত্রে অদসের তীব্র কামাকাঙ্ক্ষা বড়

১৯ When the wish is repressed, the fulfilment has always to be smuggled, so to speak, past the super-ego, and there is no more effective way of concealing a wish-fulfilment than by including it in a dream of which the affective tone is pre-dominantly unpleasant as a smuggler might attempt to get brandy through the Customs in a bottle labelled "cascara". Rex & Margaret Knight—A Modern Introduction to Psychology, p. 254

২০ Freud—The Interpretation of Dreams, 3rd Ed., p. 164

২১ Freud was always mainly concerned to argue that, though the dream was based on the sleeper's anxieties, it was none the less fulfilling its function as guardian of sleep by disguising the anxieties under a cloak of symbolism, and by steering the sleeper's thoughts as far as possible, away from the worst aspects of his problem in the direction of solution and reassurance. Rex & Margaret Knight—A Modern Introduction to Psychology, p. 255

বেশী সাহসী হয়ে প্রায় ছদ্মবেশ ত্যাগ করেই ব্যক্তির ঘুমের মধ্যে আত্মপ্রকাশে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু এতে ব্যক্তির অবদমিত উদ্বেগ (ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে) চরমে ওঠে। অধিশাস্তাও সন্দিগ্ধ হয়ে পাগলা ঘণ্টা বাজিয়ে দেয়। এর ফলে ব্যক্তির ঘুম ভেঙে যায়। এখানেও দেখা যায় ব্যক্তির অবদমিত কামাকাঙ্ক্ষা-পূরণের চেষ্টা, যদিও সে চেষ্টা এ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে।[২২]

স্বপ্ন সর্বক্ষেত্রেই কোন না কোন ভাবে ব্যক্তির অবদমিত ইচ্ছাপূরণ ফ্রএড-এর এই মত, সম্পূর্ণভাবে অনেকেই গ্রহণ করেন নি। তাঁরা বলেন, অবদমিত ইচ্ছা নয়, স্বপ্নে অবদমিত ভয়েরও প্রকাশ হতে পারে। অনেকে মনে করেন স্বপ্নের ব্যাখ্যা সর্বক্ষেত্রেই 'মনস্তাত্ত্বিক কারণ' দিয়ে করতে হবে এটাও সত্য নয়। ব্যক্তির অতীতের অভিজ্ঞতা (বিশেষতঃ নিকট-অতীতের অভিজ্ঞতা) যা ব্যক্তিকে ভয়ানক নাড়া দিয়েছে, বা যে সমস্যার অসমাপ্ত সমাধানের জন্যে ব্যক্তি ব্যগ্র ও উদ্বিগ্ন, মানুষের জাগ্রত জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা কল্পনা ভয় ঈর্ষা রাগ সবই স্বপ্নে প্রতিফলিত হ'তে পারে। ঠিক এ কারণেই অধিকাংশ স্বপ্নই অনুভূতির রংয়ে রঞ্জিত (emotional tone) থাকে। কিন্তু অনেক স্বপ্ন আবার ভৌত (physical) বা শারীরিক কারণ (physiological causes) দ্বারাই সহজে ব্যাখ্যা করা চলে। ঘুমের মধ্যে বৃষ্টির ছাঁট মুখে লাগলে ব্যক্তি মেরুপ্রদেশে ভ্রমণের স্বপ্ন দেখতে পারে। ক্লীন্ কতগুলি ল্যাবরেটরী-পরীক্ষাধীন ব্যক্তির স্বপ্ন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে দেখেছেন যে ব্যক্তির শোয়ার ধরনের (posture) সঙ্গে তার স্বপ্নের প্রকৃতির সম্বন্ধ আছে। ঘুমের মধ্যে গায়ের চাদর উড়ে গিয়ে মুখ ঢেকে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করে ফেললে, ভয়ের স্বপ্ন দেখা কিছু বিচিত্র নয়। জেমস্ স্বপ্নের বিচ্ছিন্নতা ও অসংলগ্নতা ব্যাখ্যা করবার জন্যে বলেছেন যে, ঘুমের মধ্যেও সমস্ত মস্তিষ্ক নিদ্রা যায় না—তার কোন অংশ জেগে থাকে তখন সংযোজক কেন্দ্রের ক্রিয়া শিথিল হয়, সে কারণেই স্বপ্ন এত অসংলগ্ন হয়।[২৩]

২২ In some cases however, the mechanisms fail. The waking anxieties, repressed or conscious, are too strong and insistent for the dreamwork to deal with them, and they force their way into the sleeper's thoughts and produce an acute anxiety dream, or nightmare from which he usually wakens in a panic. To call dreams of this type wish-fulfilments (as Freud insisted on doing) is to strain language to breaking point; but they may at least be described as attempted wish-fulfilments, in which the dream has done its best, but failed. Rex & Margaret Knight—A Modern Introduction to Psychology, p. 256

২৩ Murphy—A Briefer General Course, Psychology pp. 347-49 and 432

মানসিক রোগ চিকিৎসায় স্বপ্ন-বিশ্লেষণ

আমরা পূর্বেই দেখেছি, ফ্রএড-এর মতে অবদমিত কামেচ্ছা এবং বাল্যে পিতা বা মাতার প্রতি অত্যধিক আকর্ষণ ও সেই কারণে মানসিক শক্তির আবদ্ধতাই (fixation) বহু মানসিক রোগের মূল কারণ। অবদমিত ও আবদ্ধ মানসশক্তিকে সচেতন মনে মুক্তি দিতে পারলেই রোগীর রোগ-নিরাময় হয়। স্বপ্ন বিশ্লেষণ -দ্বারা অবচেতন মনের অবদমন-জনিত গ্রন্থি ও আবদ্ধতার সংবাদ মেলে। স্বপ্নে ব্যবহৃত রূপকল্পগুলি প্রতীকের মধ্য দিয়ে অবদমিত ইচ্ছার ইঙ্গিত দেয়। বড়দের সচেতন চিন্তায়, অধিশাস্তার কঠিন শাসনের জন্য, তার অবচেতন মনের দ্বন্দ্ব ও গ্রন্থির সংবাদ পাওয়া যায় না। কিন্তু স্বপ্নে সেই শাসন শিথিল হয় এবং অধিশাস্তার অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে অবচেতন মনের রুদ্ধ ইচ্ছাগুলি ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায়। সেই জন্যেই মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে স্বপ্ন-বিশ্লেষণের গুরুত্ব সমধিক। ফ্রএড-পন্থীরা স্বপ্নকে "অবচেতন মনের ব্যাখ্যার পাকা সড়ক" বলে বর্ণনা করেছেন -dreams may be aptly described as the royal road to the interpretation of the unconscious. পূর্বে ফ্রএড্ ও তাঁর সহকর্মীরা এই কাজের জন্যে আবেশ-পদ্ধতি (hypnotism) ব্যবহার করতেন। কেন তাঁরা সে পদ্ধতি পরিত্যাগ করে, স্বপ্ন-বিশ্লেষণ ও মুক্ত অনুষঙ্গ-প্রণালী ব্যবহার অধিকতর উপযোগী বলে বিবেচনা করেছেন তা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।

ফ্রএডীয় চিকিৎসা-পদ্ধতিতে স্বপ্ন-বিশ্লেষণ, রোগ-নির্ণয় এবং রোগ-চিকিৎসা দুইয়েরই পথ। এর মধ্য দিয়ে ব্যক্তির নির্জ্ঞান মনের দ্বন্দ্ব, তার অব্যবস্থিততার প্রকৃতি, তার দৃষ্টিভঙ্গী ও অনুভূতি -বিষয়ে নানা অসুবিধার সংবাদ অনেক সহজে জানতে পারা যায় এবং রোগীর সামনে স্বপ্ন-বিশ্লেষণের সাহায্যে তার সমস্যাকে স্পষ্ট করে তুলে ধরতে পারলে, সে তার সচেতন মন দিয়ে জীবনের সমগ্র ধারার সঙ্গে তার বিচ্ছিন্ন রুগ্ণতার সামঞ্জস্য বিধান করে সুস্থ হয়ে উঠতে পারে।[১৯] শিশুদের স্বপ্ন-বিশ্লেষণ অনেক সহজ, কারণ তাদের ইচ্ছাগুলি অনেক সময় নগ্নভাবেই স্বপ্নে ধরা দেয়। কিন্তু তারা প্রায়ই

১৯ Dreams may serve as a helpful starting point for exploring reactions underlying mal-adjustment and as indicators of attitudes, emotional difficulties etc. Watts—The Common Sense of Dreams (1929).

তাদের স্বপ্নগুলির ভাষায় বিবরণ দিতে পারে না। অবশ্য একথা সত্য যে স্বপ্ন বিশ্লেষণের কাজটি সহজ নয়। কিন্তু সফলভাবে এ কাজটি করতে পারলে বাস্তবিকই অবচেতন মনের দ্বন্দ্ব নিরসন করে রোগীকে সুস্থ করে তোলা সহজ হয়।[২০]

কল্পনার খেলার মধ্য দিয়ে অবচেতন মনের সন্ধান

শিশুর সামনে একটি মনোহর ছবি রেখে সেই ছবি থেকে গল্প তৈরি করতে বললে, অনেক সময় তার মনের আশা ইচ্ছা ভয়, বিরক্তি ইত্যাদি অবদমিত চেতনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ ভাবে শিশুদের অবরুদ্ধ ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা মুক্তি পায় এবং তারা দ্বন্দ্ব-মুক্ত হয়ে ওঠে। এই পদ্ধতিকে the phantasy approach বলা হয়। এই পদ্ধতি ব্যক্তিত্বের পরিচয় লাভের একটি উপায় (Thematic Apperception Test, সংক্ষেপে T. A. T.) অনেক ক্ষেত্রেই এই কল্পনার খেলায় শিশু নিজেকে কেন্দ্র করেই গল্প বোনে এবং তার পরিচিত মানুষ পশু নিকট আত্মীয়-স্বজন সেই কল্পনার খেলায় স্থান পায়। এর থেকেই শিশুর নিজের সম্পর্কে এবং অন্যের সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী, বিরুদ্ধতা ইত্যাদি টের পাওয়া যায় এবং তার চিকিৎসা সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

খেলার মধ্য দিয়ে মানসিক রোগের চিকিৎসা

কল্পনার খেলার অনুরূপ আর একটি আনন্দময় পদ্ধতি হচ্ছে সত্যিকারের দল বেঁধে খেলা। এই খেলা সুচিন্তিত ও সুপরিচালিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। শিশুর বয়স তার মনের বিকাশের স্তর, খেলার উপাদান, খেলার

২০ Would it be true, then to say that dreams are useful in the treatment of mental disorders? If we are correct in believing that dreams are simply a 'continuation of thinking by other means' (to paraphrase a famous saying) then they should be able to tell us something about the problems, wishes, and fears of the dreamer. However, it is probable that we would get as much information, and more easily, by asking him directly. The possibility remains that in a small number of cases such revelation is impossible because the patient is truly unconscious of his complexes and thoughts. If it could be demonstrated that under such conditions dreams do, in fact reveal this unconscious material, then we would have to answer our question in the affirmative. Eysenck.—Sense and Nonsense In Psychology, p. 173. Eysenck এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

সঙ্গীসাথী ইত্যাদি অনেক অবস্থার ওপরই এ পদ্ধতির সাফল্য নির্ভর করে। এটা বহু মনোবিজ্ঞানীই লক্ষ্য করেছেন যে, যেসব শিশুরা খেলাধুলা ভালোবাসে না, যারা সঙ্গীসাথীদের সাথে একত্র হয়ে স্বাভাবিকভাবে আনন্দ করে না, যারা একা একা অনির্দেশ্যভাবে ঘুরে বেড়ায়—এই সব আত্মকেন্দ্রিক অন্তর্মুখী ছেলেমেয়েরা মনের দিক থেকে অসুস্থ এবং শরীরের দিক থেকেও নির্জীব। আবদ্ধতা (fixation), বিষঙ্গ (dissociation), নিজের খোলসের মধ্যে আশ্রয়-গ্রহণ করে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি ইত্যাদি সবই এই ইঙ্গিত বহন করে যে এমন শিশুর মনে নিরাপত্তা-বোধের অভাব ও হীনতা-বোধ, অন্যের প্রতি গভীর সন্দেহ ও ভয় ইত্যাদি মানসিক অসুস্থতার কারণ রয়েছে—এমন শিশু অব্যবস্থিত। তার সুস্থতা বা অব্যবস্থিততার প্রকৃতি শিশু কি জাতীয় খেলা ভালোবাসে; খেলায় কি উপাদান ব্যবহার করে; খেলার বস্তুগুলির সঙ্গে কি রকম সম্বন্ধে নিজেকে যুক্ত করে; খেলার জিনিসগুলি তার কাছে আদরের বস্তু না অবহেলার বস্তু, না বিদ্বেষের বস্তু; সে খেলার জিনিষগুলি ভেঙেচুরে, কেটেকুটে নষ্ট করে, অঙ্গহানি করে, ইতস্তত ছড়িয়ে রাখে, না যত্ন করে গুছিয়ে রাখে—এ সব থেকে বুঝতে পারা যায়। তাই মানসিক রোগের চিকিৎসকেরা শিশুকে বাইরে দশজনের মধ্যে খেলার আনন্দময় স্বতোৎসারিততায় টেনে এনে তার বিচ্ছিন্নতা দূর করে দিতে চেষ্টা করেন। মনের মধ্যের স্বয়ংসৃষ্ট বেড়াগুলি ভেঙে ফেললে তবেই তার মুক্তি ঘটবে। তাই মেলানী ক্লাইন্ শিশুদের মানসিক রোগের চিকিৎসায় এই পদ্ধতির ওপর বিশেষ জোর দেন। শিশুর সুস্থ বিকাশের জন্যে তার রচনাত্মক আগ্রহ ও শক্তির পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা অবশ্যই থাকতে হবে। যখন শিশু স্বাভাবিকভাবে খেলতে ভালবাসবে তখনই বুঝতে হবে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছে।[২১] প্রাণশক্তির স্বচ্ছন্দ প্রকাশের শক্তির নামই স্বাস্থ্য। খেলা হচ্ছে সেই স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণ-ক্রিয়ার সর্বাপেক্ষা প্রীতিপ্রদ লীলাবিলাস। এই সহজ কথাটিই ফ্রএড্ বলেছেন তার নিজস্ব চিন্তাধারায় অনুবাদ করে যে, খেলা হচ্ছে ব্যক্তির অবদমিত আদিম কামেচ্ছার অশান্তি থেকে মুক্তির একটি সহজ উপায়। কিন্তু খেলা মাত্রই প্রমাণ করে শিশুর অন্তরে অবদমিত কামাকাঙ্ক্ষা বা অমীমাংসিত দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব, এ কথা মেনে নেওয়া কঠিন। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে খেলা

২১ Melanie Klein—The Psychology of Children, p. 93

হচ্ছে ইচ্ছাপূরণ এবং অবরুদ্ধ অশান্তির রেচন (catharsis) এ কথা অবশ্যই সত্য।

প্রীতিপ্রদ কাজের মধ্য দিয়ে মানসিক রোগের চিকিৎসা

ছোটদের বেলায় খেলা যেমন মনের বন্ধন মুক্তি তেমনি বড়দের বেলায়, জীবিকার প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত নয়, এমন সব প্রীতিপ্রদ কাজের মধ্যে মনের অশান্তি ও উত্তেজনা উপশমিত হয়। মন যেখানে "পা ছড়িয়ে আরামে বসতে পারে" সেখানেই মনের জট ধীরে ধীরে খোলে। সাইক্যাস্থেনিয়া, নিউর্যাস্থেনিয়া এসব হচ্ছে মানসিক ক্লান্তি বা দৌর্বল্য -সঞ্জাত। কাজেই মনের সেই ক্লান্ত জট-পাকানো শক্ত অশান্ত অবস্থার (tensive states, stress situations) দূর করবার প্রধান উপায় হচ্ছে বিশ্রাম এবং নিদ্রা।[২২] কিন্তু মনে অশান্তি থাকলে ঘুম বা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে গড়গড়া টানলেও সত্যিকারের বিশ্রাম হয় না। সবচেয়ে কার্যকর শ্রান্তিহর বিশ্রাম হচ্ছে নিত্যনিমিত্তিক রুটিন্-বাঁধা কাজ থেকে ছুটি, আর এই ছুটি তখনই সার্থক হয়, যখন কোন প্রীতিপ্রদ কাজের (hobby) নেশায় ডুবে যাওয়া যায়। তাই ফটোগ্রাফী, বাগানের কাজ, সঙ্গীত-চর্চা, ছবি-আঁকা, কাঠের কাজ, কারো কারো কাছে ছিপ দিয়ে মাছ ধরা চমৎকার ছুটির আমেজ আনে মনে। বিশেষত যে কাজের মধ্যে ছন্দ আছে, সুর আছে, সে কাজ মানসিক অশান্ত ব্যক্তিদের পক্ষে খুবই উপযোগী। গান্ধীজী বলেন, চরকাকাটা উত্তেজিত মনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ঔষধ। অনেক হাসপাতালেই রোগীদের মনকে প্রফুল্ল রাখবার জন্যে রেডিওর ব্যবস্থা আছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে কোমল, মৃদু, ছন্দায়িত কিছুটা একটানা ঘুমপাড়ানিয়া সুর উত্তেজিত মানসিক রোগীদের পক্ষে উপকারী; যারা অত্যন্ত বিমর্ষ, নিরাশা মনোভাবাপন্ন তাদের জন্যে উদ্দীপক দেশপ্রেমের বা বীরত্বব্যঞ্জক সঙ্গীত তাদের মনকে চাঙ্গা করে

২২ Jacobson—You Must Relax. (McGraw. Hill, 1934)

তুলতে সাহায্য করে।* আবার যারা সিজোফ্রেনিয়ার রোগী তাদের এমন সব হালকা কাজই ভালো যা দশজনের সঙ্গে মিলেমিশে করা যায়।[২৩] আসল কথা হল রোগীকে তার নিজের শক্ত খোলসের থেকে বের করে এনে তার মনকে আবার স্রোতাপন্ন ও বাহ্যবস্তু-আগ্রহী করে তোলা।[২৪] মানসিক রোগীদের মনকে শান্ত করবার উদ্দেশ্যে কোন কোন চিকিৎসক নগর সভ্যতা থেকে দূরে প্রকৃতির সহজ পরিবেশে প্রত্যাবর্তনের ওপর বিশেষ জোর দেন। তাঁরা বলেন, অধিকাংশ মানসিক রোগের মূল হচ্ছে আধুনিক নাগরিক সভ্যতার কৃত্রিম জীবন—কেবল দ্রুত গতি, উচ্চ শব্দ, চমকানো আলো, আর নিত্য পরিবর্তনশীল তীব্র উদ্দীপকের দ্রুত পরিবর্তন। এই কৃত্রিম জীবন থেকে পালিয়ে প্রকৃতি-মায়ের কোলে তার শান্ত মনজুড়ানো শ্লথতার মধ্যে কিছুকালের জন্যে হলেও আশ্রয় নিতে হবে। আবার কোন কোন চিকিৎসক মনে করেন, ঈষদুষ্ণ জলে অঙ্গ মার্জনা, অথবা শীতল জলে অবগাহন ও সন্তরণ, তলপেটে ও মাথায় কাদার প্রলেপ, জলের সাহায্যে অন্তর্ধৌতি মানসিক রোগ-প্রশমনে বিশেষ উপযোগী।[২৫]

* অলোকেন্দু বোধ নিকেতনের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী দীপা রায় এম-এ, বি,টি, এবং মনোবিদ্ শিক্ষিকা শ্রীমতী শিপ্রা দত্ত এম্ এস্ সি জানিয়েছেন যে কাদা দিয়ে, রঙীন কাপড়ের টুক্‌রো দিয়ে পুতুল গড়া, মাটির জিনিষে রং করা, চটের আসন সেলাই ইত্যাদি কাজ দিয়ে তাঁরা বোধনিকেতনের অব্যবস্থিত, অল্পবুদ্ধি, অঙ্গহীন, পিছিয়ে পড়া শিশুদের বেলায় সবচেয়ে ভাল ফল পান। নাচ, গান, আবৃত্তি অভিনয়েও এ সব শিশুরা যথেষ্ট আগ্রহ বোধ করে এবং এর মধ্য দিয়ে ওদের মনের মেঘ কেটে যায়। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত মনোবিদ্ শ্রীযুক্ত শশী রায় মহাশয়ের অভিজ্ঞতা যে গুডেনাফ্ প্রবর্তিত মানুষ আঁকা পরীক্ষা (man drawing test) শিশুদের মনের খবর পাওয়ার একটি উৎকৃষ্ট উপায়। যে সব শিশুরা মানুষের ছবি আঁকতে গিয়ে কেবলই হিজিবিজি লেখে, বুঝতে হবে তাদের মনের মধ্যেও হিজিবিজি রয়েছে। যারা কেবলই একই বিন্দুর চারিদিকে ঘুরে ঘুরে গোল আঁকে, তাদের মনে আবদ্ধতার জট পাকানো আছে বোঝা যায়। অলোকেন্দু বোধ নিকেতন এ জাতীয় শিশুদের চিকিৎসা ও শিক্ষার একটি সুন্দর সেবা প্রতিষ্ঠান (11-7A, Ramkrishna Das Lane, Cal-9.)

২৩ Dunton—Occupational Therapy and Rehabilitation, 1922

এই বইয়ে তিনি আরো বহুপ্রকার কাজের উদাহরণ দিয়েছেন এবং কোন্‌টি কোন্ অবস্থায় উপযোগী তা আলোচনা করেছেন।

২৪ Dorcus & Shaffer—Textbook of Abnormal Psychology, Ch. XII

২৫ Watts—Psychotheraphy—East & West. p. 7

সম্মিলিত চিকিৎসা

বায়ুরোগগ্রস্তদের (neurotics) চিকিৎসায় বর্তমানে আর এক প্রকার পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তাকে বলা যেতে পারে সম্মিলিত চিকিৎসা (Group therapy)।[২৬] মোটামুটি একই ধরনের মানসিক রুগ্ণতায় যারা ক্লিষ্ট এমন কয়েকজন ব্যক্তি তাদের চিকিৎসক ও পরামর্শদাতাদের সঙ্গে একত্র বসে নিজেদের সমস্যাগুলি পরস্পর আলোচনা করে থাকে। একে অন্যের সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে পরস্পর পরামর্শ দান করে এবং এটাও বুঝতে পারে যে মানসিক রোগের দুর্ভাগ্য একা তারই নয়। এতে সহানুভূতি ও সৌহার্দ্যের স্বাভাবিক সম্বন্ধ গড়ে ওঠে, মনের ভয় ও নিরাশা কেটে যায়।[২৭] কথনো কথনো এ জাতীয় রোগীদের মানসিক বিকার সম্পর্কে নাটক রচনা করে অভিনয় (Psychodrama) করতে উৎসাহ দেওয়া হয়। এতে রোগীর মনের বিষণ্ণতা দূর হয়ে যায় এবং ব্যক্তি কতকটা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে নিজের রোগকে দেখতে পারে এবং রোগমুক্তি এতে সহজ হয়।[২৮] কিন্তু কোন কোন রোগী তাদের দুঃখদুর্দশা, দুর্বলতা অন্যের কাছে প্রকাশ করতে রাজী নয় এবং তার অব্যবস্থিততার মূলে যে অপ্রীতিকর বা অগৌরবজনক ব্যক্তিত্ব, চিকিৎসক এমন ব্যাখ্যা অন্য দশজনের সামনে আলোচনা করেন, এটা তারা ইচ্ছা করে না। কাজেই এ চিকিৎসা-পদ্ধতিতে তাদের সহযোগিতা পাওয়া যায় না। গোঁড়া মনোবিকলকেরা সম্মিলিত চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্বন্ধে বিরূপ মত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন, মানসিক রোগ মাত্রই বিশেষ ও ব্যক্তিগত। সেই বিশেষ ব্যক্তিটির অবচেতনার গভীরে (depth psychology) প্রবেশ না করলে তার সমস্যার প্রকৃত সমাধান হতে পারে না। ব্যক্তিগত চিকিৎসা ও দলবদ্ধ চিকিৎসা পরস্পর বিপরীত নয়। কারো কারো পক্ষে একটি, কারো কারো পক্ষে অন্যটি বেশী উপযোগী

২৬ Klapman—Group Psychotherapy. Grune & Stratton, N. Y. 1941

২৭ Out of their common experience of anxiety and ineffective adjustment, they tend to develop a degree of emotional kinship. In consequence, their feelings of being isolated and unworthy tend to decline...Accepted by other members of the group on the basis of a shared misery they can begin to develop more constructive ways of relating to others. Shaffer & Shoben—Psychology of Adjustment, p. 541

২৮ Moreno—Psychodrama, Beacon House, N. Y. 1946

এবং অনেক ক্ষেত্রেই দুটি চিকিৎসা-পদ্ধতি একত্র ব্যবহার করে বেশী সুফল লাভের আশা থাকে।[২৯]

অভিভাবন

বহু মানসিক রোগী বিশেষ করে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত ব্যক্তিরা অতি সহজেই অভিভাবন দ্বারা প্রভাবিত হয়। চিকিৎসক অনেক সময় রোগীর এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে এই পদ্ধতি নিরাময়ের উপায় হিসাবে ব্যবহার করেন। অনেক সময় এতে ফল ভাল হয়। তার কারণ অনেক মনের রোগের মূলে আছে মানসিক দুর্বলতা। অভিভাবন -দ্বারা রোগীর কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে সাহস ও সান্ত্বনা -সঞ্চার করা যায়। হিস্টিরিয়া রোগীরা নিজের রোগটা পুষে রাখতেই চায়—ভালো হতে সত্যি তারা চায় না। এসব ক্ষেত্রে অনেক সময় অভিভাবনে কাজ দেয়। ম্যাক্‌ডুগ্যাল্‌ এরকম চিকিৎসা -দ্বারা সাফল্যের একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন।[৩০] তবে গভীর ও কঠিন মানসিক রোগীদের পূর্বে আবেশ-পদ্ধতির (hypnotism) সঙ্গে অভিভাবন -দ্বারা রোগ-নির্ণয় এবং রোগ আরোগ্য করা হত। কিন্তু এ পদ্ধতি অনেক সময়ই রোগ নির্মূল করতে সক্ষম নয়, যদিও এতে সাময়িক উপশম হতে পারে। তাগা, তাবিজ, স্বপ্নাদ্য ঔষধ ইত্যাদি দ্বারা আরোগ্যের মূলেও আছে তাদের প্রবল অনুকূল অভিভাবনের প্রভাব। এদ্বারা রোগ অনেক ক্ষেত্রে সারে এটা পরীক্ষিত সত্য, কিন্তু এখানে বুজরুকীরও মস্ত সুযোগ আছে তাতে সন্দেহ নেই। গ্রিফিথ্‌ মনে করেন এই সব ধর্মবিশ্বাসভিত্তিক চিকিৎসার সাফল্য বাস্তবিকপক্ষে অজ্ঞাতসারে অন্যান্য মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিরই

২৯ Meninger, Psychiatry in a Troubled World, Macmillan. N. Y. 1946

৩০ McDougall reported a typical instance of the use of suggestion in the treatment of a soldier of World War I who had hysterically paralyzed legs and a "stocking anaesthesia" which is a loss of the superficial skin sensitivity over an area that would be covered by a pair of stockings McDougall explained to the soldier that his anaesthesia would recede day by day, and that when it was gone he would have full use of his legs...The soldier seems to have been a gullible and superstitious man to have been susceptible to such a treament, and it has been widely noted that an hysteric is often that kind of a person. McDougall—Outline of Abnormal Psychology, p. 268

ব্যবহার।[৩১] তবে এখানে রোগী ও চিকিৎসক উভয়েই অপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস দ্বারা এর ব্যাখ্যা করেন।

যারা সহজেই বিশ্বাসপ্রবণ (suggestible)[৩২] এমন রোগীদের ক্ষেত্রে আবেশ এবং আবেশোত্তর অভিভাবন (post-hypnotic suggestion) -দ্বারা রোগ-নিরাময়ের বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে এবং চিকিৎসক সঙ্গত ভাবেই দাবি করতে পারেন যে, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে যত শীঘ্র, যে কোন উপায়ে আরোগ্য করা। আবেশ ও অভিভাবন -দ্বারা কঠিন ও বিষম বেদনাদায়ক গুরুতর অস্ত্রোপচারও ইথার, ক্লোরোফরম্ ইত্যাদি অজ্ঞান বা অসাড় করবার কোন ঔষধ ব্যতিরেকেই করা সম্ভব, এটা লণ্ডনের এক হাসপাতালে এলিয়টসন্ এবং ভারতবর্ষে এস্‌ডেইল্ নামে শল্যচিকিৎসক বহু ক্ষেত্রে প্রমাণ করেছেন। এগুলি বুজরুকী নয়। সুতরাং আবেশ ও অভিভাবনকে চিকিৎসার পদ্ধতি হিসাবে গাঁজাখুরী বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এটা লক্ষ্য করা যায় যে-ব্যক্তিরা অতিমাত্রায় বহির্মুখী (extremely extroverted) তারাই বেশী সহজে আবেশে আচ্ছন্ন হয়। এ জাতীয় মানুষেরাই হিস্টিরিয়াগ্রস্ত বেশী হয়। যারা অতিমাত্রায় অন্তর্মুখী (introverted) তাদের আবেশ -দ্বারা মোহাবিষ্ট করা এবং অভিভাবন -দ্বারা প্রভাবিত করা বেশী কঠিন। সিজোফ্রেনিয়া এদের মধ্যেই বেশী। কিন্তু বিজ্ঞানীও এটা তেমনি সঙ্গত-ভাবে দাবি করতে পারেন যে, যে-কোন চিকিৎসা-পদ্ধতিই ব্যবহৃত হোক না কেন তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার দৃঢ় প্রমাণ থাকা চাই। আবেশ ও অভিভাবন -বিষয়ে কোন কোন আধুনিক মনোবিদ্ কিছু কিছু বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। কিন্তু আইজেন্‌ক এই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগুলি আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, এই পদ্ধতিগুলির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দুর্বল এবং পদ্ধতি হিসাবে এরা যে অভ্রান্ত এবং সুফলপ্রসূ এমন দাবিও করা চলে না। তার কারণ এ পদ্ধতিতে চিকিৎসা যেখানে ব্যর্থ হয়েছে এবং কোন

৩১ It still remains true, of course, that any method of healing which is put into a religious setting may have its curative value increased because of an especially favourable attitude both on the part of the patient and on the part of the healer. Griffith—An Introduction to Applied Psychology, p. 345.

৩২ By suggestibility we mean the tendency which is found in most individuals in varying degrees to accept statements and suggestion of fact which are contrary to their own knowledge and experience. Fisher—An Introduction to Abnormal Psychology, p. 459.

প্রকার মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা ব্যতিরেকেই যারা আরোগ্য হয়েছে তাদের সংখ্যা সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য কোন তথ্য সংগ্রহ করা হয় নি। যেখানে কিছু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হয়েছে সেখানেও তার মূল্য খুব অধিক নয়, কারণ কোন ক্ষেত্রেই বিফলতা নেতিবাচক উদাহরণ হিসাবের মধ্যে আনা হয় নি, এবং কোন control group ব্যবহার করা হয় নি।[৩৩]

EEG ও GSR

ই, ই, জি—মস্তিষ্কের বিভিন্নস্থানে তড়িৎদ্বার (electrodes) লাগাইয়া মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্রের তড়িৎ প্রবাহ ক্রিয়ার লেখ (Electro-

সুস্থিত ও উদ্বিগ্ন ব্যক্তির মস্তিষ্কে বৈদ্যুৎ তরঙ্গের রেখে লক্ষ্যণীয় পার্থক্য
Rex & Margaret Knight এর Modern Introduction to Psychology অনুসরণে p. 45.
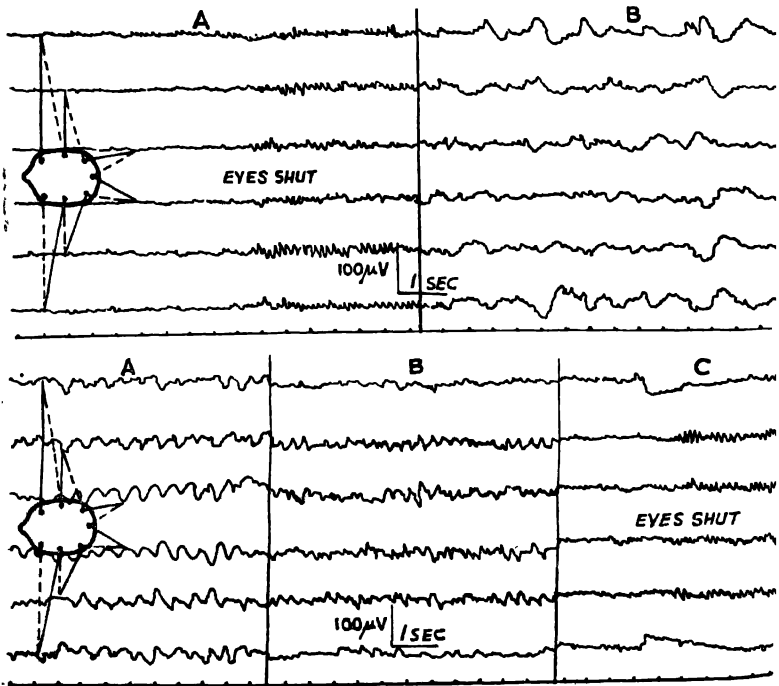
Encephalogram সংক্ষেপে E. E. G.) তৈরী করা যায়। যাহারা সুস্থিত

৩৩ Eysenck—Sense & Nonsense in Psychology, pp. 69-70

আইজেন্‌ক-এর বইয়ের সমগ্র প্রথম অধ্যায়—Hypnosis & Suggestibility-তে এ বিষয়ে চমৎকার তথ্যভিত্তিক ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনা আছে।

এবং যাহারা আবেগ অনুভূতি বিষয়ে অব্যবস্থিত তাদের মধ্যে এই লেখ লক্ষ্যনীয় ভাবে পৃথক। চোখ বুজে শান্ত অবস্থায় এই লেখে (graph) সূক্ষ্ম ও নিয়মিত Alpha তরঙ্গের প্রাধান্য দেখা যায়। কিন্তু চোখ খুলে কোন বিষয়ে মনোযোগ দিলে এই তরঙ্গগুলি অবলুপ্ত হয়। গভীর ঘুমে বা অচৈতন্য অবস্থায় মন্থর ও অনিয়মিত Delta তরঙ্গের রেখ পাওয়া যায়। ছোট ছোট শিশুদের মস্তিষ্কের রেখে উচ্চতায় কিছু কম, নিয়মিত Theta তরঙ্গের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। কিশোর ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের মস্তিষ্কের রেখে Theta তরঙ্গের প্রাধান্য আবেগ, অনুভূতি বিষয়ে অস্থিরতা নির্দেশ করে। উপযুক্ত উত্তেজনার কারণ ব্যতীত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির বেলায় এই তরঙ্গের প্রাচুর্য ও অনিয়মিততা মানসিক অব্যবস্থিততার লক্ষণ সুতরাং মানসিক রোগনির্ণয় ব্যাপারে এই রেখ সহায়ক।

আর একটি উপায় হচ্ছে Galvanic Skin Reflex সংক্ষেপে G. S. R. তীব্র প্রক্ষোভের কালে গাত্রচর্মের তড়িৎ বহনের ক্ষমতা বিশেষ ভাবে হ্রাস পায়। ইহা পরিমাপের রেখ-কেই G. S. R. বলে। শারীরবিদ্‌দের মতে তীব্র প্রক্ষোভ-কালে স্বেদ গ্রন্থি হতে ক্ষরণ এই হ্রাসের কারণ। যে সব ব্যক্তিতে উপযুক্ত উত্তেজক কারণ ব্যতীতই এমন হ্রাস নিয়মিত ভাবে দেখা যায়, সেখানে সন্দেহ করা যায় যে ব্যক্তি মানসিক অব্যবস্থিত। এই যান্ত্রিক লক্ষণগুলি চিকিৎসার উপায় নয়। তবে রোগ লক্ষণ নির্দেশে সহায়ক।[৩৪]

শক্-থেরাপী

সিজোফ্রেনিয়া বাতুলতা (insanity, psychosis) ইত্যাদি গুরুতর মানসিক রোগ-চিকিৎসায় এক প্রকার আসুরিক চিকিৎসা দ্বারা রোগীর আচ্ছন্ন চেতনাকে আকস্মিক ও কঠিন আঘাত দিয়ে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করা হয়। এটাই সাধারণ মানুষের ধারণা যে এই সব বৈদ্যুৎশক্তি বা ইন্‌স্যুলিন্, মেট্রাজোল ইত্যাদির আকস্মিক তীব্র আঘাতে মস্তিষ্কের রুগ্‌ণ স্নায়ুসূত্রগুলির নির্জীবতা দূর হয়ে তারা চমকে উঠে, এবং সুস্থ ও সতেজ হয়। কিন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের মতে বাস্তবিক যা ঘটে, তা হচ্ছে এর বিপরীত। এ সমস্ত গুরুতর মানসিক রোগের ক্ষেত্রে গুরু মস্তিষ্কের সম্মুখ পিণ্ডের (frontal lobe)

৩৪ Rex & Margaret Knight. A Modern Introduction to Psychology. pp. 44—46

কোন কোন কেন্দ্র শীর্ণ ও রুগ্‌ণ হয়ে তাদের স্বাভাবিক ক্ষমতা হারায়। এই কেন্দ্রগুলিকে বিশ্রাম দিতে পারলে তাদের স্বাভাবিক ক্ষমতা কিছুটা ফিরে আসতে পারে।[৩৫] এ সমস্ত কেন্দ্রগুলি গভীর নিদ্রার কালে সুস্থ বিশ্রাম পায়। কিন্তু মানসিক রোগীদের ঘুম প্রায়ই ভাল হয় না। তার ফলে রুগ্‌ণ স্নায়ু-কেন্দ্রগুলি উত্তেজিত হয়েই থাকে। তাতে সেই কেন্দ্রগুলি মোটেই বিশ্রাম পায় না এবং তাদের রুগ্‌ণতা দূর হওয়ার সুযোগ হয় না। এই কারণেই এ রোগীদের ঘুমের ঔষধ দিয়ে শান্ত করার চেষ্টা হয়। কিন্তু ঔষধ দিয়ে কৃত্রিমভাবে ঘুমেও মস্তিষ্কের উত্তেজিত কেন্দ্রগুলির প্রকৃত বিশ্রাম হয় না এবং গুরুতর মানসিক রোগে উল্লিখিত কেন্দ্রগুলির রুগ্‌ণতা ক্রমেই বেড়ে চলে। আবেশেরও উদ্দেশ্য চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ব্যক্তিত্বের সুস্থ ঐক্যসাধনের শক্তিকে পুনরায় সঞ্জীবিত করে তোলা। উচ্চমাপের বৈদ্যুৎশক্তি মস্তিষ্কের রুগ্‌ণ কেন্দ্রগুলিতে চালনা করলে অকস্মাৎ সমস্ত মস্তিষ্ক-কেন্দ্রগুলিই প্রবলভাবে উত্তেজিত হয় এবং রোগী হাত পা-ছুঁড়তে থাকে। তার হাত-পা জোর করে চেপে রাখা হয়। তার পরেই মস্তিষ্কের কেন্দ্রগুলি সম্পূর্ণ অসাড় হয়ে পড়ে। তখন রুগ্‌ণ কেন্দ্রগুলি সম্পূর্ণ বিশ্রাম পায় এবং তাদের মধ্যের সুস্থ হয়ে ওঠার স্বাভাবিক ক্ষমতা তখন সক্রিয় হয়ে ওঠবার সুযোগ পায়।[৩৬] অতি স্বল্প কালের জন্যেই (পনেরো সেকেণ্ডের বেশী নয়) এই বৈদ্যুৎশক্তি চালনা করা হয়। এর ফলে রোগী সম্পূর্ণ অচৈতন্য হয়ে পড়ে। অল্পক্ষণ পরেই তার চেতনা ফিরে আসে এবং রোগীর সেই আচ্ছন্ন অবস্থায় অভিভাবন দ্বারা রোগীর মনে সাহস ও আশাবাদ সঞ্চারের চেষ্টা হয়ে থাকে। ক্রমে ক্রমে বৈদ্যুৎশক্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করে মস্তিষ্কের গভীরতম কেন্দ্রগুলিকে অসাড় করে দেওয়া হয়। কিছুদিন বিশ্রামের পর আবার বৈদ্যুৎশক্তি প্রয়োগ করা হয়; এভাবে কয়েক মাস ধরে রোগের উন্নতি অনুসারে ২৪ বার পর্যন্ত

৩৫ কারো কারো মতে এ চিকিৎসার ফলে রুগ্‌ণ স্নায়ুকেন্দ্রগুলি ধ্বংস হয়ে যায় এবং সুস্থ অন্য কেন্দ্রগুলি নতুন করে সুস্থ সঙ্গতিস্থাপনের চেষ্টা করে এবং অনেক সময় তাতে সফল হয়। অন্যদের মতে এর ফলে উচ্চতর চিন্তার ক্রিয়া-কেন্দ্রগুলির কাজ সাময়িকভাবে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয় এবং এর ফলে স্বয়ংক্রিয় মণ্ডলের (autonomous system) সক্রিয়তা বেড়ে নতুন করে সঙ্গতি স্থাপনের চেষ্টা হয়। Boring, Langfeld & Weld, Foundations of Psychology, p. 538

৩৬ Munn—Psychology, pp. 415-16

তড়িতাঘাত দেওয়া হয়। এ চিকিৎসা খুব সাবধানে দেওয়া দরকার। বৈদ্যুৎশক্তির মাত্রা বা কাল অতিরিক্ত হলে মস্তিষ্ক কেন্দ্রের অপরিপূরণীয় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং রোগীর হৃদপিণ্ডের দুর্বলতা থাকলে এর ফল গুরুতর হতে পারে।

ইনস্যুলিন্ ও মেট্রাজোল্ শক্-থেরাপীর উদ্দেশ্যও একই। মস্তিষ্ক কেন্দ্রগুলিকে অচৈতন্য করে তাদের স্বাভাবিক বিশ্রামের সুযোগ দেওয়া। মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্রগুলির সুস্থ ক্রিয়ার জন্য অক্সিজেনের প্রয়োজন। রক্তে শর্করার (blood sugar) পরিমাণের সঙ্গে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষ ও স্নায়ুতন্তুতে অক্সিজেন সরবরাহের নিবিড় যোগ রয়েছে। ইন্স্যুলিন্ একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ (বিভিন্ন ব্যক্তিতে এর পরিমাণে পার্থক্য ঘটে) ইন্জেকশ্যন্ করলে ব্যক্তির রক্তে শর্করার পরিমাণ অনেকটা কমে যায়, ফলে মস্তিষ্কের কোষগুলির অক্সিজেনের খোরাকও বন্ধ হয়ে যায়। তাতে মস্তিষ্কে এবং সমস্ত পেশীতে প্রবল আক্ষেপ (spasms) দেখা দেয় এবং রোগী যন্ত্রণায় চীৎকার করতে থাকে। তখন তাকে অনেকে মিলে জোর করে ধরে রাখতে হয়। শীঘ্রই রোগী অচৈতন্য হয়ে পড়ে। তখন ধীরে ধীরে গ্লুকোজ ইন্জেক্শ্যন্ দিয়ে রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়ানো হতে থাকে এবং রোগী চেতনা ফিরে পায়। রোগীর সেই আচ্ছন্ন অবস্থায় মনঃসমীক্ষক অভিভাবন প্রয়োগ করে তার মনে সাহস ও শক্তি সঞ্চারে চেষ্টিত হন। এ চিকিৎসায়ও ক্রমে ক্রমে ইন্স্যুলিনের মাত্রা বাড়ানো হয়, এবং রোগীর অবস্থা অনুযায়ী কিছুদিন বিরামের পর ইন্জেকশ্যনের শক্ দেওয়া হয়।

এ চিকিৎসা রোগীর পক্ষে যথেষ্ট ক্লেশকর, ব্যয়সাধ্য, সময়সাপেক্ষ এবং খুব বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক সহজে এ পদ্ধতি ব্যবহার করেন না। এখানেও চিকিৎসক ভুল করলে বা অতিরিক্ত মাত্রায় ইন্স্যুলিন্ বা মেট্রাজোল্ প্রয়োগ করলে পরিণাম অত্যন্ত গুরুতর হতে পারে। কোন কোন চিকিৎসক এবং বিজ্ঞানী এ পদ্ধতি বিপজ্জনক এবং অনিশ্চিত বলে পরিত্যাগের পক্ষপাতী এবং রাশিয়া এবং অ্যামেরিকাতেও এই পদ্ধতি প্রয়োগের বিরুদ্ধে চিকিৎসকদের মত ক্রমে প্রবলতর হচ্ছে। তাঁরা বলেন, এ সব 'শক্' চিকিৎসায় মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম স্নায়ুকোষ ও সূত্রগুলিতে কি প্রভাব হ'তে পারে সে সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এখনও যথেষ্ট নয়। এ অবস্থায় এমন ঝুঁকি নেওয়া অনুচিত; বিশেষতঃ এ

চিকিৎসা পদ্ধতি এখনও পরীক্ষার স্তরে (experimental state) এবং এমন 'অন্ধকারে ঢিল মারা' চিকিৎসকদের পক্ষে অকর্তব্য।[৩৭]

বিষম গুরুতর ক্ষেত্রে যেখানে অন্য সমস্ত চিকিৎসাপদ্ধতি নিষ্ফল হয়েছে সেখানে মস্তিষ্কের রুগ্ণ অংশ অস্ত্রোপচার করে অপসারণ করা হয়। একে loboctomy অথবা topectomy বলা হয়।

এতে অনেক সময় আশ্চর্য উপকার পাওয়া যায়, কিন্তু এমনও দেখা গেছে যে, এপ্রকার অস্ত্রোপচার দ্বারা রোগীর বিশেষ উপসর্গগুলির উপশম হয় বটে, কিন্তু রোগীর ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। এ প্রকার সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচার খুবই কঠিন এবং কদাচিৎ এ চিকিৎসা শেষ চেষ্টা হিসাবেই করা হয়। এ জাতীয় চিকিৎসায় (Neurosurgery) রাশিয়া সর্বাধিক সাফল্য অর্জন করেছে।

৩৭ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ আধুনিক একজন চিন্তাশীল সৎ বিজ্ঞানীর মত হচ্ছে, "Our knowledge of neurology if this should prove the basis of psychiatry is as yet extremely limited. To make things worse there is still no clear evidence that psychotherapy is anything more than a hit-or-miss placebo and save in the case of psychotic symptoms that can be controlled by certain drugs, there is no sure way of distinguishing its "cure" from spontaneous remission. And some of its techniques, including lobotomy and shock treatment, are nothing but measures of sheer desperation. Watts—Psychotherapy: East and West, p. 16

সুলেখক এবং মনের স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে আগ্রহী শ্রীরামেন্দ্র দেশমুখ্য মহাশয় আমাকে জানিয়েছেন যে বর্তমানে ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকাতেও এ চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে চিকিৎসকেরা আস্থা হারাচ্ছেন এবং এই পদ্ধতি কদাচিৎ তাঁরা ব্যবহারের পরামর্শ দেন। দেশমুখ্য মহাশয় প্রসিদ্ধ একটি বিদেশী ভেষজ প্রস্তুত কারক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

নীর ও ক্ষীর

ফ্রএড্-এর মনোবিকলন-তত্ত্ব এবং চিকিৎসা-পদ্ধতি দুদিক থেকেই অভিনব। মনোবিকলনবাদীদের নির্জ্ঞান মনের ধারণা মনোবিদ্যার পরিধিকে অনেকখানিই বাড়িয়ে দিয়েছে,—মানুষের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে নতুন আলোকপাত হয়েছে। এটা বোঝা যাচ্ছে যে ব্যক্তিকে জানতে গেলে শুধু তার চেতন মানসের খবর নিলেই চলবে না, তার অবচেতন মানসের খবরও অবশ্যই নিতে হবে। অবচেতন মনের কলকব্জা ফ্রএড আমাদের সামনে উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেছেন এবং এতে ব্যক্তিত্বের রহস্য কিছুটা যেন বোঝা যাচ্ছে। এটাও বোঝা যাচ্ছে যে জড়জগতে যেমন আকস্মিকতার কোন স্থান নেই—সব ঘটনাই নিয়মের সূত্রে গ্রথিত—তেমনি অবচেতন মানসে বিষঙ্গ (dissociation), গ্রন্থি-গঠন (complexes) এবং অধিশাস্তার বাধা (barrier) ইত্যাদি ধারণা সাহায্যে ফ্রএড প্রমাণ করলেন যে মনোজগতেও কোন ঘটনা অকারণে ঘটে না। অকস্মাৎ ভুলে যাওয়া, আপাতদৃষ্টিতে অকারণ ভয়, কল্পনাবিলাস, যুক্তিহীন আকর্ষণ বা বিরুদ্ধতা, স্বপ্ন ইত্যাদি প্রাত্যহিক ঘটনা থেকে শুরু করে গুরুতর উন্মাদ রোগ পর্যন্ত সমস্ত মানসিক ঘটনারই উপযুক্ত এবং যথেষ্ট কারণ আছে (psychological determinism)। সমস্ত সুস্থ ও অসুস্থ মানসিক প্রক্রিয়ায় আমরা দেখতে পাই একই ধরনের মানসিক কলকব্জার সাহায্যে ব্যক্তির সামঞ্জস্যস্থাপনের চেষ্টা (mechanisms of adjustment)। বাস্তবিক পক্ষে আপাতদৃষ্টিতে যতই অদ্ভুত, যতই অসাধারণ যতই দুর্বোধ্য হোক্ না কেন, কোন মানসিক প্রক্রিয়াই বিচ্ছিন্ন নয়। ফ্রএড্-এর প্রতিভার এটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন যে, তিনি মানুষের মনের একটি সুসম্বদ্ধ সামগ্রিক মানচিত্র অঙ্কিত করতে সমর্থ হয়েছেন,—যদিও তা অতিশয় জটিল। তাঁর এই সুসম্বদ্ধ সামগ্রিক চিন্তার খুঁটিনাটি নিয়ে অবশ্যই মতভেদ আছে। তাঁর ব্যাখ্যাও, এমন কি জীবনের মৌলিক শক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর কোন কোন মতও পরবর্তী পণ্ডিতেরা সমালোচনা করেছেন এবং তাঁর রচিত সুদৃশ্য হর্ম্যের কোন কোন অংশ পরিত্যক্তও হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই তাঁর মূল সিদ্ধান্তগুলি

আজ মনোবিদ্যার মূল্যবান সাধারণ সম্পত্তি। এটা একটা মস্ত কথা যে তাঁর ক্রিয়াধর্মী মানসের ধারণা তিনি বাস্তব জীবনের সমস্ত ঘটনা-ব্যাখ্যায়ই ব্যবহার করে মনোবিদ্যার 'পুঁথিগত পণ্ডিতী আলোচনা'কে বাস্তব জীবনের সঙ্গে জীবন্ত সূত্রে যুক্ত করেছেন। আর একটা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ফ্রএড্-এর ব্যাখ্যার ধারা যান্ত্রিক নয়, উদ্দেশ্য-অনুসারী (not mechanical but teleological)।[১]

এ কথা সত্য যে মানুষের ব্যবহার-ব্যাখ্যায়, সংজ্ঞান সচেতন থেকে নির্জ্ঞান মনকে তিনি বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন।[২] কিন্তু তিনি মানুষের জীবনে যুক্তি বিচারকে লঘু করে দেখেছেন, এ অভিযোগ সত্য নয়। অনুরূপভাবে অন্ধ কামকে জীবনের আদিম ও মুখ্যশক্তি হিসাবে মর্যাদা দিলেও, এ কথাও তিনি মেনেছেন যে মানুষের নীতিবোধও জন্মগত এবং মানুষের সুস্থ জীবন—অন্ধ কামাকাঙ্ক্ষার যুক্তি ও নৈতিক আদর্শ দ্বারা সংযম ও শাসনে। তিনি মানুষকে পশুর স্তরে অবনমিত করেছেন—এ অভিযোগ কতকটা ভ্রান্ত ধারণার ওপর স্থাপিত।[৩]

বিরুদ্ধ সমালোচনা

ফ্রএড্ নিজে এবং তাঁর অনুগামীরা মনোবিকলনবাদকে অভিজ্ঞতা-নির্ভর উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান বলেই দাবি করে থাকেন। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ফ্রএড্ তাঁর ধারণাগুলি বিশুদ্ধ চিন্তা মাত্র দ্বারা (on the basis of pure abstract thinking) সংগ্রহ করেন নি। বহু বর্ষব্যাপী বহু সহস্র মানসিক রোগীর সযত্ন পর্যবেক্ষণ এবং সাবধান বিশ্লেষণ দ্বারা তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে পৌঁছেচেন এবং নিজ ও সহকর্মীদের অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে তাদের যাচাই

১ Shaffer & Shoben—Psychology of Adjustment. pp. 472-74

২ Historically psycho-analysis spurred psychology to study the motives a person does not know he has, and the blind learning which modifies his behaviour without also giving insight. Shaffer & Shoben—Psychology of Adjustment, p. 473

৩ The new discoveries of psychoanalysis would seem, at the very lowest estimate, to be at least of equal importance to the earlier findings with regard to sex. They have cast a new light upon an all-important aspect of human personality, the moral aspect, in virtue of which man has learnt to control individualistic impulses and become a social animal. Flugel. A Hundred Years of Psychology, p. 291

করেছেন, সংশোধন করেছেন, কখনো বা ভ্রান্তি স্বীকার করে পূর্বসিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ কথা বলা যায় তাঁরা যে সব প্রকল্প (hypotheses) ব্যাখ্যার সূত্র হিসাবে রচনা করেছেন সেগুলিকে কঠোর বৈজ্ঞানিক রীতিতে যাচাই করা অসম্ভব, সুতরাং তাদের সত্যতা-নিরূপণ করা বা মূল্য-নির্ধারণ করবার উপায় নেই।[৪] ফ্রএড-এর (এবং তাঁর অনুগামীদেরও) ধারণাগুলি অধিকাংশই রহস্যময় এবং তাঁদের ভাষা কল্পনা-রঞ্জিত সাহিত্য-রসসিক্ত, অলংকার-প্রধান। উদাহরণ হিসাবে ত্রি-তল-বিশিষ্ট মানব-মানসের কল্পনা, অদস্ ও অধিশাস্তার ধারণা, বাধা ও প্রহরার ধারণার উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ধারণাগুলির কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই এবং এদের মধ্যে অনেকটাই অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতা আছে। ফ্রএডীয় ধারণাগুলি সবই 'মানসিক'—এই ধারণাগুলি ব্যাখ্যার সূত্র হিসাবেই গ্রহণ করা হয়েছে। সম্ভবত মস্তিষ্কের স্নায়ুসংযোগ এবং পরিচিত অনুষঙ্গবাদের দ্বারাই এ সমস্ত ঘটনার ব্যাখ্যা করা চলে।[৫]

এমন কি, মনোবিকলক বিভিন্ন মনোবিদের ব্যাখ্যার মধ্যেও বহু প্রভেদ আছে। তার থেকে এ সন্দেহ অন্যায় নয় যে তাঁদের ধারণাগুলির পশ্চাতে যথেষ্ট বিজ্ঞানসঙ্গত প্রমাণের অভাব আছে। উদাহরণস্বরূপ ফ্রএডীয় স্বপ্ন বিশ্লেষণের কথা ধরা থাক্। ফ্রএড-এর মতে সমস্ত স্বপ্নই ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা পূরণের উপায়। স্বপ্নে যে কল্পগুলি (ছবি) মনের সামনে ভেসে ওঠে (manifest content) তারা কিন্তু প্রতীক বা ছদ্মবেশ মাত্র। তারা ব্যক্তির

৪ A good science, among other attributes, presents testable hypotheses, uses clearly defined concepts and obtains reliable or verifiable data. By such criteria psycho-analysis is not a very good science. Shaffer & Shoben. —Psychology of Adjustment, p. 75

৫ All of the fundamental concepts used in psycho-analytic literature have much of the mysterious about them. There is. for example no experimental or logical reason for supposing that the mind can be divided into three parts...The Freudians obviously appeal to explanatory concepts which are purely psychological in character. Granted the existence of minds both conscious and sub-conscious, it becomes possible to make some new division of these minds or to attribute to them as many special instincts as are necessary to explain the behaviour that is actually observed. The history of science is full of instances which illustrates the futility of this procedure. Griffith—An Introduction to Applied Psychology, p. 337

প্রকৃত আকাঙ্ক্ষাকে গোপন করবার কৌশল মাত্র। কিন্তু অন্য প্রসিদ্ধ মনোবিকলক হল্-এর (Hall) মতে, দুষ্ট কল্পগুলি ব্যক্তির প্রকৃত আকাঙ্ক্ষাগুলির স্বরূপ গোপন করে না, বরঞ্চ তাদের মধ্য দিয়েই ব্যক্তির প্রকৃত ইচ্ছাগুলির পরিচয় পাওয়া যায়।[৬] ফ্রএড-এর মতে অধিকাংশ স্বপ্নই প্রতীক-ধর্মী। প্রতীকের সাহায্যেই নাটকীয়তা, সংক্ষেপীকরণ, স্থানান্তরণ (dramatisation, condensation and displacement) ইত্যাদি কৌশলের সহায়তায় ব্যক্তি তার গোপন ইচ্ছাপূরণে প্রয়াসী হয়। এ বিষয়ে ফ্রএড-এর পরবর্তীরাই একমত। কিন্তু মজা এই যে প্রত্যেক লেখকই নিজ নিজ মত অনুযায়ী প্রতীকগুলির অর্থ উদ্ধার করেন। তাই একই স্বপ্নের ব্যাখ্যা এঁরা প্রত্যেকেই বিভিন্ন ভাবে করে থাকেন। প্রত্যেকেই দাবী করেন যে সব স্বপ্নই তাঁর নিজ নিজ মতবাদ সমর্থন করে। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে দেখতে গেলে এ কথাই সত্য বলে মনে হয় যে সমস্ত স্বপ্নই একটি মাত্র মতবাদ দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায় না। এতেও মনোবিকলনবাদের ভিত্তির বৈজ্ঞানিক দুর্বলতাই প্রমাণিত হয়।[৭] মনোবিকলনবাদীদের নিষ্ঠা, তাঁদের ব্যাপক প্রচারের ক্ষমতা এবং ব্যাখ্যার অভিনবত্ব সাধারণ মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করেছে কিন্তু এই মতবাদগুলির চারপাশে ভক্ত ও বিশ্বাসীদের আরোপিত জ্যোতির্বলয় থাকলেও নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসাবে মনোবিকলনবাদ এখনো প্রশ্নচিহ্নই রয়ে গেছে। এবং বর্তমানে অনেক মনোবিদ্ ও মানসিক রোগের চিকিৎসক সম্পূর্ণভাবে কোন মতবাদ

৬ Symbols in dreams are not used to hide the meaning of the dream, but quite on the contrary, are used to reveal not only the act of the person with whom the dreamer is concerned but also his conceptions of these actions or persons. Hall—A Primer of Freudian Psychology, p. 43

৭ Freudian analysts always report that their patients dream in Freudian symbols whereas analysts who follow the teaching of Jung report that their patients always dream in Jungian symbols, which are entirely different from the Freudian! ...The truth appears to be that any writer on dream interpretation seems to find it possible to quote a few dreams in support of his views, but that these theories cannot usually be applied to dreams quoted by people having a different theoretical outlook—This suggests that all heories of dream-interpretation may have a certain limited amount of truth in them, but that they do not possess universal significance, and apply only to a relatively small part of the field. Eyesenck—Sense & Nonsense in Psychology, p. 168

গ্রহণ না করে, বরঞ্চ কাজ চলার সুবিধার জন্যে বিভিন্ন মতের পৃথক পৃথক অংশ গ্রহণ করছেন। তার ফলে ফ্রএডীয় সুরম্য হর্মের যে সামগ্রিক সুষম ঐক্য ছিল তা অক্ষুণ্ণ থাকছে না।[৮]

চিকিৎসা-পদ্ধতি হিসাবে মনোবিকলন

ব্যাখ্যার সূত্র হিসাবে মনোবিকলনবাদ মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে যেমন অভিনব তেমনি মানসিক রোগের চিকিৎসায় মনোবিকলন-পদ্ধতির ব্যবহার ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক দুঃসাহসিক পদক্ষেপ। পিনেল্-এর পূর্বে উন্মাদদের কোন বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ছিল না। তখন মনে করা হত কোন দুষ্ট ভৌতিক শক্তি মানুষের ওপর ভর করলে তারা জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে পাগল হয়ে যায়। ইয়োরোপে তখন উন্মাদদের লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হত, অর্ধাহারে রাখা হত এবং তাদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করা হত। মনে করা হত,

পিনেল্ উন্মাদাগারে বন্দীদের বন্ধন মোচন করে দিচ্ছেন (Munn. অনুসরণে পৃঃ ১০)

এই অনাহার ও উৎপীড়নের দ্বারা দুষ্ট ভূতকেই আঘাত করা হচ্ছে এবং তাতে হয়তো 'ভূত' পালিয়ে যাবে। প্রায় পৌনে দু'শ বছর আগে ফরাসী দেশে পিনেল্ উন্মাদাগারে হতভাগ্য বন্দীদের শৃংখলমোচন করে (১৭৯২)

[৮] In the present, the academic psychologist has a vision of these attractive theories and connection surrounded each one by a halo which on closer observation takes the, form of a question mark...Eyesenck—sense & nonsense in Psychology. p. 169.

সহৃদয় ব্যবহার দ্বারা এবং উপযুক্ত শিক্ষা দ্বারা তাদের অনেককে নিরাময় করে তুললেন। পিনেল্‌-ই প্রথম স্পষ্ট করে বললেন যে, উন্মাদ ব্যক্তিরা অভিশপ্ত, অ-চিকিৎসাযোগ্য দুষ্টপ্রকৃতিবিশিষ্ট অথবা রহস্যময় অশুভ শক্তি দ্বারা চালিত নয়। তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, মানসিক রোগের কারণও সম্পূর্ণই প্রাকৃতিক (not super-natural); অনেক ক্ষেত্রেই এই কারণ মানসিক। তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরাই প্রথম উন্মাদদের সযত্ন পর্যবেক্ষণ দ্বারা তাদের শ্রেণীবিভাগের চেষ্টা করেন এবং তাদের ব্যবহার ও অভ্যাস পর্যালোচনা করে বাতুলতা-র (insanity) কারণ নির্দেশে প্রবৃত্ত হন।[৯]

আমরা দেখেছি আধুনিককালে মানসিক রোগের চিকিৎসায় শারকো, ফ্রএড্‌ ইত্যাদি প্রথম আবেশ (hypnotism), পরে নিরবচ্ছিন্ন কথার-পিঠে-কথা বলা (word-association method) এবং সর্বশেষ মুক্ত অনুষঙ্গ-প্রণালী ও মনোবিকলন দ্বারা সাফল্য অর্জন করেছিলেন। এঁরা গোড়াতে মূর্ছা রোগ (hysteria) ও গুরুতর মানসিক বৈকল্যের (psychoses) চিকিৎসায় এই পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু ক্রমেই লঘুতর মানসিক বিকারেও (যথা, বায়ুরোগ বা psychoneurosis) এ চিকিৎসা-পদ্ধতি বিস্তারলাভ করে। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের পরে যুদ্ধক্ষেত্রে গোলার শব্দ-তরঙ্গে আহত (shell-shock) অথবা যুদ্ধের বিষম অভিজ্ঞতার ফলে বিকৃত-মস্তিষ্ক সহস্র সহস্র ব্যক্তির চিকিৎসা উপলক্ষে মনোবিকলন-পদ্ধতি ব্যবহারের ব্যাপক সুযোগ পাওয়া যায়। এ পদ্ধতি দ্বারা চিকিৎসার ফলে বহু রোগী আরোগ্যলাভ করে এবং চিকিৎসা-শাস্ত্রে এই মানসিক চিকিৎসা (psychiatric treatment) স্থায়ীভাবে স্বীকৃতি-লাভ করে।[১০] সৈন্যদের মধ্যে মনোবিকলন-পদ্ধতি ব্যবহার দ্বারা চিকিৎসা

৯ It was Pinel's belief that insane people are mentally' ill rather than wicked, or controlled by supernatural forces; and that they should receive humane treatment. When he became superintendent of a "lunatic" asylum in Paris, Pinel's first act was to remove the irons from his charges and to take them out of dungeons in which they had been locked for years. By treating them like human beings he was able to restore many of them to sanity. But Pinel and those who followed him were scientists, as well as humanitarians. They observed, described, classified and and attempted to discover the causes of mental (behaviour) disorders. Munn. Psychology, p. 11

১০ Rex & Margaret Knight. A Modern Introduction to Psychology, p. 261

উপলক্ষ্যে এটা লক্ষ্য করা যায় যে বায়ুরোগগ্রস্ত (psychoneurosis) অথবা এ বিষয়ে প্রবণতাসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা অজস্র। সমাজের সকল স্তরে, এমনকি শিশুদের মধ্যেও এই মানসিক অশান্তির ব্যাপক অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গেছে, এবং অ্যামেরিকাতে প্রত্যেক শহরেই মানসিক প্রক্রিয়া দ্বারা চিকিৎসার জন্যে বহু প্রতিষ্ঠান আছে এবং বহু সহস্র মনোবিকলক এই চিকিৎসার কাজে নিযুক্ত আছেন। বড় বড় সমস্ত বিদ্যালয়ের সঙ্গে শিশু-রোগের চিকিৎসার অঙ্গ হিসাবে মনোবিকলন-পদ্ধতি দ্বারা মানসিক অব্যবস্থিততা-নির্ণয় এবং চিকিৎসারও ব্যবস্থা আছে। ইংল্যাণ্ডে মনোবিকলন পদ্ধতি দ্বারা চিকিৎসার একটা প্রসার না হলেও বহু কারখানা, ফ্যাক্টরীর শ্রমিকদের মধ্যে মানসিক রোগের প্রাবল্য কতটা ব্যাপক, তা নিয়ে কিছু কিছু অনুসন্ধান হয়েছে এবং মানসিক অব্যবস্থিতদের পরামর্শদান ও চিকিৎসার কিছু কিছু ব্যবস্থা হয়েছে।[১১] ফ্রএড্ দাবি করেছিলেন যে মনোবিকলনবাদের সত্যতা আজ অবিসংবাদিত সত্য, কারণ এর বাস্তব ব্যবহারে বহু ক্ষেত্রেই সুফল পাওয়া গেছে।[১২]

মনোবিকলন পদ্ধতি দ্বারা চিকিৎসার সমালোচনা

মনোবিকলন-পদ্ধতি দ্বারা চিকিৎসার সাফল্য বিষয়ে যে দাবী করা হয় সে বিষয়ে কিছু সাবধানবাণী উচ্চারণের প্রয়োজন আছে। এ পদ্ধতি ব্যবহারে বহু রোগী আরোগ্য লাভ করেছে সুতরাং এ পদ্ধতি নিশ্চিতই সত্য এমন দাবি খুব যুক্তিসঙ্গত নয়। ইতিপূর্বে মেস্মার্ (1733-1815—যার থেকে Mesmerism কথা এসেছে)।[১৩] হস্ত চালনা এবং অভিভাবন (suggestion) দ্বারা সম্মোহন (hypnotism) দ্বারা অনেক রোগীর আরোগ্যসাধন করেছিলেন। তিনি বলে-

১১ Russell Fraser. The Incidence of Neurosis among Factory Industr. Health Res. Works, Bd, Report, No 90, 1947

১২ Freud and many other psycho-analysts often wrote that the ultimate proof of the entire psycho-analytic theory is that it "works"—that it accomplishes the cure of neurotic patients. Shaffer & Shoben—Psychology of Adjustment, p. 474

১৩ Mesmerism: Methcd of sending a person into a trance or sleep by the use of suggestion and movements of the hands. It was callfd after Friedrich Mesmer who used these methcds and other aids, such as a darkened room hung with mirrors and filled with scents. The New Standard Encyclopaedia.

ছিলেন যে, মানুষের জীবনে গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব আছে এবং তিনি জৈব চৌম্বক শক্তি ব্যবহার দ্বারা রোগীর ভিতরের কুগ্রহকে আকর্ষণ করে এনে তাদের রোগ-নিরাময় করেন বলে দাবি করতেন। তিনি তাঁর পদ্ধতি ব্যবহার করে সহস্র সহস্র রোগীর আরোগ্যবিধান করেছিলেন এবং এককালে তিনি প্রচুর অর্থ ও রাজকীয় সম্মান লাভ করেছিলেন।[১৪] কিন্তু তাঁর বিপুল সাফল্য সত্ত্বেও সেকালের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা দ্বারা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছেন যে তাঁর জৈব চৌম্বকশক্তিতে বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং তাঁর চিকিৎসা-পদ্ধতির মধ্যে অনেকখানিই ছিল বুজরুকী।[১৫] সাফার ঠিকই বলেছেন যে, সফলতাই কোন মত বা পদ্ধতির সত্যতার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ নয়।[১৬]

আমরা মেস্‌মার-এর বুজ্‌রুকীর কথা বলেছি। মনোবিকলন পদ্ধতি দ্বারা চিকিৎসা একেবারেই সহজ নয়। এ বিষয়ে পারদর্শিতালাভ করতে হলে চিকিৎসকের পক্ষে দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা প্রয়োজন। মুক্ত অনুষঙ্গ প্রণালীর শৃঙ্খলে রোগী যে সমস্ত বিচ্ছিন্ন কথা বলে বা স্মৃতি পুনরুদ্ধার করে, তার মধ্যে কোনটির মধ্যে রোগীর মনের জটের সত্যিকার সন্ধান পাওয়া যাবে, তা নির্ধারণ করবার কোন নির্দিষ্ট বা ধরাবাঁধা পথ নেই। এমন কি দুটি রোগীর চিন্তায় একই প্রতীকের ব্যবহার দেখা যেতে পারে, কিন্তু দুজনের মনের রহস্য বুঝতে গেলে সে প্রতীকের তাৎপর্য-ব্যাখ্যা ভিন্ন ভিন্ন ভাবেই করতে হয়। প্রত্যেক রোগীই পৃথক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং তাদের মানসিক বিকৃতির স্বরূপ বুঝতে হলে দীর্ঘকাল ধরে রোগীর মানসিক গড়ন, তার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও মানসিক সংগ্রামের লক্ষণগুলি বিশ্লেষণ ও বিচার করতে হয় তবেই যদি রোগের মূলটি আবিষ্কার করা যায়। যে চিকিৎসকের গভীর অন্তর্দৃষ্টি নেই, অসীম ধৈর্য নেই, রোগীর প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি নেই, তিনি কখনও এই মানসিক চিকিৎসা-প্রণালী ব্যবহারে সাফল্য লাভ করতে পারেন না। অথচ ফ্রএড্‌-তত্ত্বে পল্লবগ্রাহী বহু ব্যক্তি এই মানসিক রোগের চিকিৎসার 'দোকান'

১৪ Tourneur- A Prince of Medical charlatans. Med. Rev of Rev, 1915, 21, 216-19

১৫ Haggard. Devils, Drugs & Doctors.

১৬ This alleged proof (viz. that it "works") is highly suspect for, to the contrary, that which "works" is not necesarily true. Shaffer & Shoben. Psychology of Adjustmsnt, p. 474

খুলে লাভজনক ব্যবসায়ে রত আছেন। অ্যামেরিকায় তো মনোবিকলন-প্রণালীতে চিকিৎসা একটা 'দারুণ ফ্যাসান্' হয়ে দাঁড়িয়েছে। বড় বড় চিত্রতারকাদের প্রত্যেকের অন্ততঃ একজন করে নামজাদা মনোবিকলনবিদ থাকেন। তাঁদের তথাকথিত মনোবিকলনের চমকপ্রদ কাহিনী বিখ্যাত সব রংবেরং-এর পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়। সমস্ত পৃথিবীব্যাপী চলে মনোবিকলন-পদ্ধতি দ্বারা চিকিৎসায় সাফল্যের সাড়ম্বর প্রচার! একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই চিকিৎসকদের মধ্যে শতকরা নব্বুই জনই বুজরুক্ এবং এই প্রচারের শতকরা নিরেনব্বুই অংশই মিথ্যা ও মেকী! মনোবিকলনতত্ত্বের মধ্যে যেমন, চিকিৎসা-পদ্ধতির মধ্যেও তেমনি অনেকখানি রহস্যময়তা, অস্পষ্টতা, ও অবাস্তবতা আছে এবং এসবই এ চিকিৎসা-পদ্ধতির আকর্ষণের (অ্যামেরিকার মতো হুজুগপ্রিয় দেশে) কারণ, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বাস্তবিকপক্ষে, বর্তমান যুগের সর্বপ্রকার চিকিৎসা-পদ্ধতিই বিজ্ঞানের নাম দিয়ে বোকা মানুষকে ভোলাবার চেষ্টা—কথাটি রূঢ় হলেও মারাত্মকভাবে সত্য।

যাক্ আমাদের বক্তব্য মনোবিকলন শিক্ষাপদ্ধতিতেই সীমিত রাখতে হবে। এই অত্যন্ত কঠিন মনোবিকলন-পদ্ধতি দ্বারা চিকিৎসা বৃহৎ সংখ্যক অনধিকারীর হাতে পড়ার আর একটা মস্ত বিপদ আছে। মানসিক রোগীদের ইচ্ছাশক্তি দুর্বল এবং তাদের অধিকাংশই সহজে অভিভাবন এবং ইঙ্গিত (suggestion) দ্বারা প্রভাবিত। অনভিজ্ঞ এবং অসতর্ক মানসিক রোগের চিকিৎসক নিজ বাহাদুরী দেখাবার জন্যে রোগীর রোগ সম্বন্ধে নানা ইঙ্গিত করে থাকেন। নিজের রোগ সম্বন্ধে কোন একটা ভ্রান্ত ধারণা রোগীর মাথায় একবার ঢুকলে তা দূর করা মুস্কিল হয়। কাজেই এসব হাতুড়ে বৈদ্যদের হাতে পড়লে রোগীর রোগ উপশম না হয়ে বরঞ্চ তার অপকারই হতে পারে।

এ চিকিৎসা-পদ্ধতির মূল্য-বিচারে আরো কয়েকটি কথাও স্মরণ রাখা দরকার। যাঁরা মনোবিকলন-পদ্ধতি প্রয়োগে মানসিক রোগের চিকিৎসা করেন তাঁরা সকলেই ফ্রএডীয় নির্জ্ঞান তত্ত্বে বিশ্বাসী হলেও, অধিকাংশ চিকিৎসকই রোগ-চিকিৎসায় মনোবিকলন-পদ্ধতি ব্যবহারের উপরই কেবলমাত্র নির্ভর করেন না। তাঁরা বিভিন্ন প্রকার স্নায়বিক-মানসিক প্রেষ (tension) লাঘবকারক নানা ঔষধ (tranquilisers যথা Largactil,Equanol ইত্যাদি), ঘুম পাড়াবার ঔষধ (bromides and barbiturates) গরম জলে অঙ্গ

মার্জনা (hot bath), ঠাণ্ডা জলে অবগাহন (cold bath) এবং গুরুতর মানসিক রোগে মস্তিষ্কে বৈদ্যুতিক শক্ (electric shock), ইন্‌সুলিন্ বা মেট্রাজোল্-এর সাহায্যে শক্ (Insulin or Metrazol shock therapy) ইত্যাদি প্রক্রিয়াও ব্যবহার করেন। সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যে এবং পরিপাক ক্রিয়ায় সহায়তার জন্যে Vitamin B-Complex, এবং অন্যান্য ধাতবলবণ ইত্যাদিও ইনজেক্‌সনের সাহায্যে বা পানীয়ের সঙ্গে দিয়ে থাকেন। সুতরাং আরোগ্য যেখানে হয় তা এই সম্মিলিত প্রক্রিয়ার ফল। আরোগ্যের কতটুকু অংশের জন্য মনোবিকলন দায়ী এটা হিসাব করে বলা অসম্ভব। কখনও কখনও বিভিন্ন রকমের কাজ ও খেলার (play & occupational therapy) মধ্যদিয়েও রোগীর বিক্ষিপ্ত মনকে শান্ত ও কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করা হয়।[১৭]

মনোবিকলন সাহায্যে চিকিৎসা যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ। যদিও য়্যুঙ্গ ও পরবর্তী মনোবিকলকেরা রোগীর অতীত বাল্য জীবনের স্মৃতির পুনরুদ্ধারের উপর ততটা জোর না দিয়ে, বর্তমান জীবনের অশান্তিপূর্ণ পরিবেশের বিশ্লেষণ দ্বারা রোগের মূল অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন। এতে রোগের মূল অনুসন্ধানের কাজে কিছুটা সময় সংক্ষেপ হয়। তা হলেও এ চিকিৎসায়ও বহু সময় এবং বহু অর্থের প্রয়োজন।

ফ্রএড-পন্থীরা সাধারণত রোগীর বাল্যকালের স্মৃতিতে কোথায় রোগের মূল নিহিত তার আবিষ্কার এবং অবচেতন মনের গ্রন্থিমোচন করে' তাকে রোগীর সচেতন মনে টেনে এনে মুক্তি দেওয়াকেই রোগ-নিরাময়ের উপায় বলে মনে করেন। কিন্তু ক্যাসেল্ ও হাইম্যান্ ঠিকই বলেছেন যে, রোগীর অবচেতন মনে দ্বন্দ্বের প্রকৃতি যখন সে সচেতন ভাবে জানবে, তখনই সে আরোগ্য হয়ে যাবে, এ কথা সত্য নয়। তার নিজ অনুভূতি জীবনে যে বিশৃংখলা আছে, স্ব-শাসন এবং স্বয়ংনিয়ন্ত্রণ দ্বারা যেমন তাকে নিজ অন্তর্দ্বন্দ্ব মেটাতে হবে, তেমনি তার সমাজ-পরিবেশের সঙ্গেও সচেতনভাবে সঙ্গতি-স্থাপন করতে হবে। এই পুনর্বাসনের কাজে (rehabilitation) ব্যক্তির

১৭ The general psychiatrist may use the psycho-analytic theories but often he does not use the psycho-analytic technique alone, He uses psychotherapy (discussion of the reasons of behaviours) drugs, electro-shocks and other methods. (Ed. Readers Digest. Jan, 1961)

যুক্তি বুদ্ধি জ্ঞানই যথেষ্ট নয়। সমাজেরও এ বিষয়ে যথেষ্ট দায়িত্ব আছে। ব্যক্তির অনুভূতি-জীবনের বিশৃংখলা ছাড়াও আরো অনেক দিক আছে যা তার মানসিক রোগের সঙ্গে জড়িত যথা, অশান্তিময় পারিবারিক সম্বন্ধ, অস্বাস্থ্যকর সামাজিক পরিবেশ, আর্থিক দুশ্চিন্তা, শিক্ষা ও জীবিকা -অর্জনের উপযুক্ত সুযোগের অভাব ইত্যাদি। এই সমস্যাগুলির সুসমাধান না হলে শুধুমাত্র মানসিক চিকিৎসা দ্বারা সুফল আশা করা যেতে পারে না। তাঁরা এ বিষয়ে কিছু অনুসন্ধান করে মনোবিকলন-পদ্ধতি দ্বারা চিকিৎসিত রোগীদের আরোগ্যের শতকরা হার নিরূপণের চেষ্টা করেছেন। "তাঁরা ৩৩টি মানসিক রোগীর বিবরণ বিশ্লেষণ করেছেন এবং তাদের বিবরণ দিয়েছেন। তাঁরা দেখলেন যে, এ চিকিৎসায় ৫ জন সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেছে। ৬ জন মানসিক চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ পরিবর্তন করে নিরাময় হয়েছে; ৮ জনের অবস্থার সামান্য উন্নতি হয়েছে: ১৪ জনের অবস্থা পূর্ববৎ আছে অথবা অবনতি ঘটেছে। এই শেষোক্ত দলে ৬ জনের গুরুতর মানসিক বৈকল্য দেখা দিয়েছে এবং একজন আত্মহত্যা করেছে।" সুতরাং চিকিৎসা-পদ্ধতি হিসাবে মনোবিকলন খুব উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে নি। কার্ল রোজার্স-ও অনুরূপ সমীক্ষার পর অনুরূপ সিদ্ধান্তেই পৌঁছেচেন এবং মানসিক রোগের চিকিৎসায় পরিবেশের উন্নতি সাধনের উপরই বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন।[১৮]

আইজেন্‌ক বর্তমান কালের একজন প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ মনোবিদ্। তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক (Professor), তিনি ইনষ্টিট্যুট্ অব সাইকিয়াট্রির মনোবিদ্যা বিভাগের সঞ্চালক (Director)। ফ্রএড্-দর্শনে তিনি সুপণ্ডিত, নিজে বিজ্ঞ চিকিৎসক, মানসিক রোগের চিকিৎসা বিষয়ে তাঁর প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু শুধু মনোবিকলন-পদ্ধতি দ্বারা মানসিক রোগ-চিকিৎসায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করা যায়, এই দাবিতে তিনি সংশয় প্রকাশ করেছেন। তিনি ইনষ্টিট্যুট্ অব্ সাইকিয়াট্রির খাতাপত্র অনুসন্ধান করে দেখিয়েছেন যে, মানসিক রোগের চিকিৎসায় শুধুমাত্র মনোবিকলন পদ্ধতি ব্যবহারে আরোগ্যের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য নয়। যাঁরা মনোবিকলন-পদ্ধতিতে গোঁড়া বিশ্বাসী, তাঁরা এ চিকিৎসা দ্বারা যারা আরোগ্য

১৮ C. R. Rogers, The clinical treatment of the Problem Child, p, 338

লাভ করেছে তাদের কথাটাই সরবে প্রচার করেন, কিন্তু আইজেনক্ তাঁর কাছে লেখা বহু চিঠিপত্র থেকে দেখতে পেয়েছেন যে, যারা এ চিকিৎসায় সুফল পায় নি, এমন কি যাদের অবস্থার অবনতি ঘটেছে, তাদের সংখ্যাও বিপুল।

হিসাব করে দেখা গেছে যে শুধু মনোবিকলন পদ্ধতিতে চিকিৎসার দ্বারা প্রতি তিনজন রোগীর মধ্যে দুজন আরোগ্য লাভ করে। এবং অনেক ক্ষেত্রেই চিকিৎসা দীর্ঘ কয়েক বৎসর ধরে চালাতে হয়। সাধারণ চিকিৎসা পদ্ধতি দিয়ে মানসিক রোগ-চিকিৎসার বেলায়ও আরোগ্যের হার প্রায় একই। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে লণ্ডনের হাসপাতালে যখন সেখানে 'মানসিক চিকিৎসা'র রেওয়াজ ছিল না—মানসিক রোগীদের আরোগ্যের হার এর চেয়ে কম ছিল না। ন্যু ইয়র্কের ডাঃ পিটার ডেন্‌কার (Dr Peter Denker) পাঁচশতের ওপর কঠিন মানসিক রোগীকে চিকিৎসার জন্যে তাদের পুরাতন পারিবারিক চিকিৎসকের কাছেই চিকিৎসার পরামর্শ দেন। সেই চিকিৎসকেরা কেউই মনোবিকলন-প্রণালী প্রয়োগ করেন নি। সাধারণ প্রচলিত চিকিৎসা-পদ্ধতি, পরামর্শ, উৎসাহ ও অভিভাবনের ওপরই তাঁরা নির্ভর করেছেন। তাতেও ডেন্‌কার দেখতে পেলেন যে, দুই বৎসর চিকিৎসার পর আরোগ্যের হারও ওই একই—প্রতি তিন জনের মধ্যে দুইজন। ডাঃ মেলিটা স্মিড্‌বার্গ (Dr Melitta Schmideberg) অ্যামেরিকার একজন প্রধান মনোবিকলনে বিশেষজ্ঞ। তাঁর ভূয়োদর্শনের ফলও অনুরূপ। তিনি লিখেছেন, "এ কথা মনে করবার যথেষ্ট কারণ নেই যে বর্তমান মনোবিকলন-প্রণালী দ্বারা চিকিৎসার সাফল্য বিগত ত্রিশ বৎসরের চেয়ে অধিক সন্তোষ-জনক, অথবা এ চিকিৎসার ফলে আরোগ্য অধিক দীর্ঘকালস্থায়ী। বরঞ্চ বিপরীতই বোধ হয় সত্য। এ কথা মনে করবার উপযুক্ত কারণ নেই যে সাইকোথেরাপী বা অন্যান্য পদ্ধতিতে চিকিৎসা দ্বারা, এমন কি বিনা চিকিৎসায় যে পরিমাণ রোগী আরোগ্য হয়, মনোবিকলন-পদ্ধতি দ্বারা আরোগ্যের সংখ্যা তার চেয়ে বেশী।"

তত্ত্বের দিক থেকে অন্তত শিশুদের মানসিক রোগ-চিকিৎসায় মনো-বিকলনের ফল খুবই আশাপ্রদ হওয়া উচিত—কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা হয় না।

অ্যামেরিকার সাইকো-অ্যানালিসিস্ অ্যাসোসিয়েশুন স্পষ্টই বলেছেন, "চিকিৎসা-পদ্ধতি হিসাবে মনোবিকলনের সাফল্য সম্পর্কে কোন উঁচু দাবি

আমরা করি না। যে সব ব্যক্তিরা এমন দাবি করেন, তাঁদের উৎসাহ বাস্তবিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যা অর্জিত হয়েছে তাকে অতিক্রম করে গেছে (individuals in whom enthusiasm may outrun scientific knowledge)। এমন কি ফ্রএড্ নিজেও পরিণত জীবনে চিকিৎসা-পদ্ধতি হিসাবে মনোবিকলন সম্বন্ধে পূর্বের মতো আশাবাদী ছিলেন না।

রাশিয়ায় মনোবিকলন চিকিৎসা-পদ্ধতি হিসাবে সামান্যই মূল্য দেওয়া হয়। তাঁরা বলেন, ব্যক্তির অশান্তি ও অপরাধপরায়ণতার কারণ জন্মগত, এ কথা ঠিক নয়। এর মূলে আছে আর্থিক ও সামাজিক অব্যবস্থা। আর্থিক ও সামাজিক পরিবেশ উন্নত হলে প্রতি ব্যক্তিই নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী নিজেকে বিকশিত করে তুলবার সুযোগ পাবে এবং সেই সুন্দর সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যক্তি অনাবশ্যক দ্বন্দ্ব ও হতাশার দ্বারা পীড়িত হয় না। সুতরাং মানসিক রুগ্ণতা সেখানে দেখা দিতে পারে না। কারণ সমস্ত মানসিক অসুস্থতার মূল কারণ হচ্ছে ব্যক্তিত্বের সুস্থ বিকাশের পথে নিজকৃত বা সমাজসৃষ্ট বাধা। প্রসিদ্ধ মনোবিদ্ এবং মানসিক রোগের অভিজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ আলেক্জাণ্ডার ও ডাঃ হীলি মনোবিকলন-পদ্ধতির সাফল্যের জন্যে আর্থিক ও সামাজিক অব্যবস্থা দূরীকরণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আমরা দেখেছি এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী হরনি, সুলিভ্যান্ ও নব্য-মনোবিকলনবাদীদের মধ্যে সুস্পষ্ট। কার্ল রোজার্স-এর মতও যে অনুরূপ তা আমরা দেখেছি। ডাঃ হীলি বলেন, "কেউ হয়তো বলবেন যে একজন পুরাতন পাপীকে অন্তর্দ্বন্দ্বের গ্লানি থেকে মুক্তি দেওয়া খুবই পুণ্য কর্ম। কিন্তু এ রকম একজন ব্যক্তির পক্ষে শান্ত অবস্থা লাভ করতে হলে পরিবেশের সঙ্গে নতুন সম্বন্ধস্থাপনই (re-adjustment) সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয়। মনোবিকলনের শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি ব্যবহার দ্বারা রোগীর রোগ-নির্ণয় নির্ভুলভাবে হতে পারে কিন্তু তার পরও ব্যক্তিকে যদি প্রতিকূল সমাজ-পরিবেশের মধ্যেই বাধ্য হয়ে বাস করতে হয় তবে কিছুতেই ভালো ফল আশা করা যেতে পারে না। আমি এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, যদি আমরা উন্নততর সামাজিক ও আর্থিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে না পারি, তবে মনোবিকলন-পদ্ধতি দ্বারা চিকিৎসায় সামান্য সুফলই আমরা আশা করতে পারি।[১৯]

[১৯] W. Healy, Psycho-analysis of older offenders Am. J. of Orthopsychiatry. vol, V.

মনোবিকলন-পদ্ধতি দ্বারা চিকিৎসা আজ পঞ্চাশ বৎসর ধরে পরীক্ষিত হয়েছে। কাজেই এখন মোটামুটি তার মূল্য-নিরূপণ করা যেতে পারে। এর মধ্যে নীর ও ক্ষীরের প্রভেদ করা প্রয়োজন। তত্ত্বের দিক থেকে মনের বিকারের মূল অবচেতন মনে দ্বন্দ্ব এ সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এ কথা স্বীকার করা যায়। মনোবিকলন-পদ্ধতি বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ সুচিকিৎসকের দ্বারা সযত্নে ব্যবহৃত হলে অনেক ক্ষেত্রে অবচেতন মনের জটিল সংঘাত ও বিশৃংখলার সন্ধান মেলে এবং রোগীর মানসিক শৃংখল মুক্তির সহায়ক হয়, এ কথাও সত্য। ফ্রএড-এর চিন্তা বর্তমান জটিল যান্ত্রিক যুগের মানুষকে এই পুরাতন সত্যটিই নূতন করে শিখিয়েছে যে সরল স্বাভাবিক নির্মল শৈশব, শান্ত পরিণত জীবনের নিরাপদ ভিত্তি। এ কথাও মনে রাখতে হবে যে মনোবিকলন ম্যাজিক বা যাদুমন্ত্র নয়। ফ্রএড তত্ত্ব নিয়ে বহু আজগুবী কথা তাঁর মূর্খ স্তাবকের দলেরা বলে থাকে—বহু বুজরুক এ চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্বন্ধে অদ্ভুত ও অতিরিক্ত দাবি করে থাকে। কিন্তু ফ্রএড্ নিজে শুধু এ দাবি করেছেন যে, তাঁর তত্ত্ব ও চিকিৎসা-পদ্ধতি আজীবন দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ ও ধীর ও গভীর যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তনের ফল। কিন্তু এ তত্ত্ব বা পদ্ধতি চূড়ান্ত ভাবে সত্য বা নির্ভুল, এমন দাবি তিনি করেন নি। আর একটি মূল্যবান্ কথাও তিনি বলেছিলেন যে, চিকিৎসক কোন আশ্চর্য ও রহস্যময় শক্তি দিয়ে রোগীকে নিরাময় করেন না। রোগী যুক্তি দ্বারা যখন নিজের অবচেতন মনের দ্বন্দ্ব ও বিশৃংখলার স্বরূপ জানতে পারে এবং আত্মসংযম ও আত্মনির্ভরতা নিয়ে নিজের জীবনের সমস্যা-সমাধানে দৃঢ়সংকল্প হয়, তখনই তার রোগমুক্তি ঘটে। অন্ধ প্রবৃত্তির কাছে আত্ম-সমর্পণ সুখ ও শান্তির পথ নয়। এ বিষয়ে বহু ভুল ধারণা মানুষের মনে বর্তমান। গভীর মানসিক বৈকল্যের ক্ষেত্রে বিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা মনোবিকবন প্রযুক্ত হলে তা আরোগ্যের সহায়ক। কিন্তু এ চিকিৎসা সহজ নয় এবং বাস্তবিক বিজ্ঞ ও সহৃদয় মনোবিকলক বিশেষজ্ঞের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। এবং এই পদ্ধতি দ্বারা চিকিৎসার সাফল্য সম্পর্কে অতিমাত্রায় আশাবাদী হবার সময় এখনও আসেনি এবং তত্ত্বের দিক থেকেও মনোবিকলন সুপ্রতিষ্ঠিত নির্ভুল সত্যতার দাবি এখনও করতে পারে না—আইজেন্‌ক্, উড্‌ওয়ার্থ, জোড্, ফ্লুগেল্ ইত্যাদি বহু মনোবিদই এ মত প্রকাশ করেছেন।[২০]

২০ The answer to the question "Is psycho-analytic tratment of proven value? cannot be honestly be anythig but 'not yet' Freudian hypothesis such as stressing the role of anxiety in the causation of neurotic symtoms have contributed substantially to modern psychiatric thinking, but the psycho-analytic therapy based on these hypotheses has not yet justified itself in practice...The psycho-analytic practitioner has yet to make good his claim that his is the only truly scientific system in the case of mental disorders. Eysenck—The Truth about Psycho-analysis, Reader's Digest. Jan 1961

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

শেষ সিদ্ধান্ত

মানসিক রোগ সম্পর্কে কয়েকটি সিদ্ধান্ত

সমস্ত মানসিক রোগের সম্বন্ধেই এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে রোগ-চিকিৎসার চেয়ে রোগ-নিবারণই অনেক বেশী প্রয়োজন। যেখানে ব্যক্তিত্বের ভিত্তি দুর্বল, সেখানেই মনের বিভিন্ন ও বিপরীত ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা-ক্রিয়ার মধ্যে জীবন্ত ঐক্যবন্ধনের সূত্র শিথিল হয়। যে সব ব্যক্তিরা বাল্যকলে হতে কুশিক্ষা লাভ ও কু-অভ্যাস গঠনের ফলে আত্মসংযমের শক্তি হারায়, তারা বিপদের মুখে অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হয়ে স্থির থাকতে পারে না,—তারা ভেঙ্গে পরে। বারে বারেই আমরা বলেছি সমস্ত মানসিক রুগ্‌ণতার মূল হল এই ভেঙ্গে-যাওয়া, এই বিষঙ্গ (dissociation)। যে উপযুক্ত শিক্ষা এবং সুঅভ্যাস দ্বারা নিজেকে শাসন করতে, সংযত করতে শেখে নি. সে তো তার বাইরের বিশ্বজগতের সঙ্গে মিলতে পারবে না ; সে নিজ স্বার্থ আর নিজ সুখের জন্যে কাড়াকাড়ি করে' অন্যকে অহরহ আঘাত করবে, নিজেও ক্ষতবিক্ষত হবে। কিন্তু এই বাইরের সঙ্গে মিলতে না পারার দুঃখ বেদনা বিভ্রান্তির চেয়েও বড় বিপদ হচ্ছে, ব্যক্তির অন্তরে যেখানে নিজের সাথেই বিরোধ ও সংঘাত ঘনীভূত হয়েছে। তার বহু ইচ্ছা কামনা আবেগ প্রবৃত্তি তাকে পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। এ ব্যক্তির শান্তি কোথায়? এখানেও গোড়ার কথা হচ্ছে, আত্মশাসন ও আত্মসংযমের অভ্যাস-গঠন। বিষঙ্গ ও অস্থিরতার পেছনে কখনো কখনো আছে জন্মগত ও দেহগত পীড়া যার উপর ব্যক্তির কোন হাত নেই। আবার সমাজের অব্যবস্থাও হয়তো ব্যক্তির অব্যবস্থিততাকে প্রকট করে তুলেছে। সম্ভবত আধুনিক সভ্যতার কৃত্রিমতা, অতি-উদ্দীপনা (over-stimulation), দ্রুততার প্রতি মোহ, ব্যক্তিকে একটি স্থির কেন্দ্রে শান্ত হয়ে থাকতে দেয় না। এর ওপরও পৃথক পৃথক ভাবে ব্যক্তির কোন হাত নেই। কিন্তু এই বাইরের বাধা-সংশোধনের দায়িত্ব রয়েছে রাষ্ট্রচালক, সমাজ-নেতা,

শিক্ষক ও পিতামাতার ওপর। বাল্যকালে সদভ্যাস-গঠন, সদ্দৃষ্টান্ত-স্থাপন, সুশিক্ষা ও সুপরিচালন -দ্বারা মানসিক রুগ্‌ণতা-নিবারণে তারা অনেকখানি সাহায্য করতে পারেন। সুস্থ দেহ ও সুস্থ মন অঙ্গাঙ্গিসম্বন্ধে যুক্ত। বাল্যকালে শিশুর দেহকে সুস্থ রাখার দায়িত্ব প্রধানত পিতামাতার। সুস্থ দেহ ও সু-অভ্যাস গঠন করে দিয়ে পিতা-মাতা-শিক্ষক ব্যক্তির ভবিষ্যৎ মানসিক রুগ্‌ণতা-নিবারণের পথ অনেকখানি প্রস্তুত করে দিতে পারেন।[১]

কিন্তু ব্যক্তি তো বাইরের কতগুলি শক্তির নিষ্ক্রিয় সম্মিলিত ফল নয়। ব্যক্তিত্বের শক্তি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি এবং এই শক্তির উদ্বোধনে ব্যক্তির নিজস্ব দায়িত্ব সামান্য নয়। শৈশব থেকেই তার নিজস্ব ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা দেখা যায় এবং শৈশব অতিক্রান্ত হলে ক্রমশই সে স্বাধীন ব্যক্তিত্বের অধিকার দাবি করতে থাকে। এখানেই তো মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। সে প্রকৃতির হাতের ক্রীড়নক নয়। সে নিজের ভাগ্য অনেকটাই নিজের চেষ্টায় গড়ে তুলতে চায়। তাই মানসিক সুস্থ থাকবার দায় তার নিজের স্কন্ধেই অনেকখানি বহন করতে হবে। এখানেই গোড়ার কথা হচ্ছে আত্মসংযম ও আত্মশাসনের অভ্যাস-গঠন। একথা সর্বদাই সত্য যে সুস্থ দেহ ও সুস্থ মন আকস্মিক নয়, ব্যক্তিকে নিজের চেষ্টা দ্বারাই তা আয়ত্ত করতে হয়—শ্রম ও ঘর্মের মূল্যে, সহানুভূতি ও বিবেচনা, বুদ্ধি ও নিপুণতার সাহায্যেই সুস্থ ব্যক্তিত্ব অর্জন করতে হয়। কিন্তু উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে, বুদ্ধির অভাবে বা উদ্যমের অভাবে, ব্যক্তি নিজের সর্বোচ্চ স্বার্থরক্ষায়, দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষায় অসমর্থ হতে পারে। সে সব ক্ষেত্রেই তার উপযুক্ত নির্দেশনা (guidance) ও পরিচালনা প্রয়োজন। মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যায় মানসিক স্বাস্থ্যের মূল নীতি ও পদ্ধতিগুলি সহজবোধ্য ভাবে আলোচনা করা হয় এবং চাইল্ড গাইডেন্স ক্লিনিকে প্রত্যেক শিশুর সমস্যা পৃথকভাবে বিবেচনা করে, তাকে

[১] It must be clear that a great problem in the field of medical psychology should be the problem of prevention rather than the problem of cure. Aside from pathological conditions, it seems to be quite clear that psychological disorders are essentially dissociative in character. Dissociation may be effected either because of poor training or because of an extreme depletion in the store of bodily energies. To say these same things in another way, sound health at the psychological level implies sufficient rest and complete organization or integration among a wide variety of behaviour patterns. Griffith—An Introduction to Applied Psychology, p. 352

বা তার অভিভাবককে নির্দেশ দেওয়া হয়। কখনো কখনো এজন্যে শাসন-তিরস্কারেরও প্রয়োজন হতে পারে।[২]

স্রোত যখন তার বেগ ও চলমানতা হারায় তখনি তাতে আবর্জনা জমে উঠে; মনের পক্ষে, ব্যক্তিত্বের সুস্থ বিকাশের পথেও প্রয়োজন এই অকারণ অবারণ চলা।

শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও
উদ্দাম উধাও ;
ফিরে নাহি চাও ;
যা-কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।
কুড়ায়ে লও না কিছু, কর না সঞ্চয় ;
নাই শোক, নাই ভয়
পথের আনন্দ বেগে অবাধে পাথেয় কর ক্ষয়॥[৩]

এ কথা শুধু নদীর পক্ষেই সত্য নয়, মানুষের মনের পক্ষেও সত্য।

সমস্ত মানসিক চিকিৎসারই উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যক্তির চেতনার পরিবর্তন এবং তার মনের বন্ধনমুক্তি। এর জন্য প্রয়োজন নিজেকে সত্য করে জানা—মোহমুক্ত চোখে নিজেকে বোঝা, নিজেকে আবিষ্কার করা—নিজেকে বিশ্বের জীবনস্রোতের সঙ্গে সানন্দে যুক্ত করে দেওয়া।[৪]

২ Practical experience with people, especially adolesoents, indicates that even strong positive motivation is often not enough. As with young children, it must sometimes be as negative as the ultimate withholding of a diploma, if the student has not followed all reasonable instructions for the oorrection of remediable defects...Above and beyond this comparatively low standard, it is hoped that students will acquire knowledges, attitudes and skills which will help them solve their future health problems. The school can do no less than to keep a watchful eye and a guiding hand on each boy and girl to the end that at a critical age, he or she may be saved from those acts of commission or omission that result in lifelong psysical discomfort or disability. Keller—Principles of Vocational Education, p. 219

৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—নদী (বলাকা)

৪ Psychotherapy & the ways of liberation have two interests in common: first the the transformation of consciousness, of the inner feeling of one's own existence; and second, the release of the individual from forms of conditioning imposed upon him by social institutions. Watts. Psychotherapy—East & West. p. 18

কিন্তু সাধারণভাবে একথা বলা যেতে পারে যে, পাশ্চাত্যদেশ ব্যক্তির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে বাইরেই খুঁজেছে বহির্জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগকেই তাঁরা সুস্থতার মাপকাঠি বলে গ্রহণ করেছেন। মানসিক অসুস্থ যারা, তারা বাস্তব বহির্জগতের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের কল্পনার জগতে আশ্রয় নিয়েছে। সে বাস্তবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পাচ্ছে না—তার সমাজ-পরিবেশের সঙ্গেও সে সঙ্গত সম্বন্ধে যুক্ত হতে পারছে না। তার খোলসটা ভেঙে দিয়ে তাকে বাস্তব সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিতে পারলে. তবেই তার মুক্তি। ফ্রএড-এর মতে অসুস্থ ব্যক্তিরা তাদের অতীতের মাতৃগর্ভের আদিম অন্ধকার চেতনায় প্রত্যাবর্তন করে। তাদের ব্যবহার তাই শিশুসুলভ ও অসঙ্গত। একে তিনি ব্যক্তিত্বের ধ্বংস বলেই নিন্দা করেছেন।[৫]

মনের স্বাস্থ্য : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিভঙ্গী

সব দেশের সব কালের মানুষই একমত যে, ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন ও সুষম বিকাশই মনের স্বাস্থ্যের আদর্শ। যে ব্যবস্থায় ব্যক্তি নিজের সঙ্গে ও পরিবেশের সঙ্গে সংঘর্ষ ও বৈপরীত্য -শূন্যভাবে স্বীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বে গড়ে উঠতে পারে তাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ আদর্শ। অধিকাংশ মানুষ মনের দিক থেকে অসুস্থ। সমস্ত মানসিক চিকিৎসার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই অসুস্থ মানুষদের চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গী, অভ্যাস ও ক্রিয়া, তাদের সমগ্র ক্রিয়ার ও চেতনার এমন পরিবর্তন-সাধন, যাতে তারা নিজেদের মধ্যে আত্ম-বিরোধ এবং পরিবেশের সঙ্গে সংঘর্ষ দূর করে শান্ত ও সতেজ হয়ে উঠতে পারে।[৬] এ বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা একমত যে স্বভাব-বিরুদ্ধ অসংযত জীবন এবং স্নেহহীন, আদর্শহীন, অনিয়ন্ত্রিত বাল্য-পরিবেশ ভবিষ্যৎ জীবনের অশান্তির পথ প্রস্তুত করে দেয়। একথাও স্বীকৃত যে ব্যক্তিকে সাধনা ও

৫ Indeed Freud designated the longing for return to the oceanic consciousness of the womb as the Nirvana-principle and his followers have persistently confused all ideas of transcending the ego with mere loss of "ego-consciousless" Ibid, p, 20

৬ The main resemblance between the Eastern ways of life and Western psychotherapy is in the concern of both with bringing about clanges of consciousness, changes in our ways of feeling our own existence and our relation to human society and the natural world. Alan, W, Watts. Psychotherapy. East & West, p, 11.

সংযমের মধ্য দিয়েই নিজের জীবন সুন্দর করে গড়ে তুলতে হবে—দেহে ও মনে সুস্থ হয়ে গড়ে উঠবার দায়িত্ব প্রধানত প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের ওপরই ন্যস্ত। সুস্থ সুন্দর জীবন আকস্মিক নয়। মানুষ নিজ কর্মের ফলই ভোগ করে। অন্ধ প্রবৃত্তি ও আবেগকে যুক্তি-বিচার, কল্যাণ বুদ্ধি ও সেবাধর্মের মধ্য দিয়ে সংযমন ও পরিচালনের দ্বারাই সুস্থ ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠতে পারে।

পাশ্চাত্য চিন্তাজগতে ফ্রএড-এর দান মূল্যবান, কারণ তিনি ব্যক্তিত্বের মূলকে বাইরের শক্তির মধ্যে অনুসন্ধান করেন নি। তিনি এই গভীর সত্যটি আবিষ্কার করেছিলেন যে নির্জ্ঞান মনের গভীরেই রয়েছে ব্যক্তিত্বের মূল—তার সুস্থতা ও অসুস্থতার প্রধান কারণ। এটিও তাঁর মূল্যবান্ অবদান যে, তিনি স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অস্বাভাবিক অবদমনকে মানসিক অসুস্থতার প্রধান কারণ বলে নির্দেশ করেছেন। ফ্রএড-এর এই চিন্তাও মূল্যবান যে, চেতনার বিচ্ছিন্নতা এবং আবদ্ধতাই মানসিক স্বাস্থ্যহানির জন্যে দায়ী। কিন্তু প্রাচ্যের চিন্তায়, বিশেষত বেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গীতে, ব্যক্তির সুখ ও স্বাস্থ্য বাস্তবজগতে নিজেকে হারিয়ে ফেলে নয় (কারণ এ জগৎ তো মায়ার খেলা) তার আত্মার গভীরে পরম ব্রহ্মসত্তাকে আবিষ্কারে। এই জীবের মধ্যেই রয়েছেন শিব। তাঁকেই জানতে হবে, তাঁর মধ্যেই নিজেকে সত্য করে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সুখ, শান্তি, স্বাস্থ্য বাইরে খুঁজো না—আত্মস্থ হও, সমস্ত বিশ্বশক্তির মূলাধারকে নিজের মধ্যেই আবিষ্কার করো; সেই ব্রহ্মসত্তায় নিজেকে একাত্ম করে জানাই সত্য জ্ঞান, তাতেই শান্তি, তাতেই পরিপূর্ণতা। সেই আত্মস্থ হওয়ার উপায় হল, সমস্ত চঞ্চল চিত্তবৃত্তির নিরোধ।

ভারতীয় দর্শন "বাস্তব বাহ্য জগৎ"কে অস্বীকার করেছে, তাকে মিথ্যা, শূন্য, অলীক বলে অবহেলা করেছে, একথা সত্য নয়। বেদান্ত বাস্তব জগৎকে 'ব্যবহারিক সত্য' বলে স্বীকার করে, এবং ব্যক্তির উপর সেই ব্যবহারিক জগতের দাবি আছে, একথাও স্বীকৃত। যদিও সন্ন্যাস শ্রেষ্ঠ আদর্শ, কিন্তু সে আদর্শ তো সর্বসাধারণের জন্যে নয়, তা শুধু ব্রহ্মজ্ঞানীদের জন্য। সাধারণ মানুষের কল্যাণার্থ বিভিন্ন আশ্রমের জন্য ভোগ ও কর্তব্য নির্দিষ্ট করা আছে। অসংযত ব্যক্তিগত ভোগ নিন্দিত হয়েছে বটে, কিন্তু একথাও স্বীকৃত হয়েছে যে বিভিন্ন আশ্রমের উপযোগী প্রচুর বৈধ ভোগ ভিন্ন মুক্তি সম্ভব নয়।

একথা ফ্রএড-এর চিন্তা সম্বন্ধে বলা যায় যে তিনি ব্যক্তিত্বের মূল যে নির্জ্ঞান মনে, তার সন্ধান দিলেও বাস্তবিক পক্ষে তিনি ব্যক্তিত্বের গভীরতম মূলের অনুসন্ধান করেন নি। তাঁর ব্যক্তিত্বের ধারণা সংকীর্ণ ও অসম্পূর্ণ। তিনি এই গাত্রচর্ম দ্বারা সীমিত অহংকেই ব্যক্তিসত্তা বলে মনে করেছেন। ব্যক্তির মনের প্রবল শক্তির সামান্য একটু আভাস তিনি দিয়েছেন অদস্ (Id) বা আদিম কামের ধারণায়। কিন্তু তা তো ব্যক্তিসত্তার অত্যন্ত অসম্পূর্ণ পরিচয়। যোগ দর্শন স্পষ্টভাবেই বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে ব্যক্তি কি করে ঐশী বিপুল ঐশ্বর্য (অণিমা লঘিমাদি অষ্টসিদ্ধি) লাভ করতে পারে, তার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু 'এহো বাহ্'। ভারতীয় দর্শন শিক্ষা দিয়েছে ব্যক্তিত্বের এই আবরণকে (মায়া) অতিক্রম করে সমগ্র বিশ্বসত্তার ও বিশ্বশক্তির মূলাধার ব্রহ্মে একাত্ম হয়ে যাওয়াতেই ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণতা। পাশ্চাত্ত্য চিন্তায় ব্যক্তিত্বের ধারণা অতি-মাত্রায় সংকীর্ণ। বাস্তবিক মুক্তি এই "গাত্রচর্মদ্বারা সীমিত অহং"-কে অতিক্রম করে বিশ্বসত্তার সঙ্গে সানন্দ যোগে। আমরা ফ্রএড-এর পর য়ুঙ্গ-এর চিন্তায় সম্মিলিত সার্বিক নির্জ্ঞানের (Collective Unconscions) ইঙ্গিতে সেই গভীরতর সত্যের স্বীকৃতি দেখতে পাই। অ্যাড্‌লার-এর সৃজনধর্মী ব্যক্তিসত্তা (creative selfhood) ম্যাস্‌লো-র ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ রূপায়ণ (self-actualization) বা অলপোর্ট-এর "স্বতন্ত্র ক্রিয়াপরায়ণতা"র (functional autonomy) ধারণায় ভারতীয় দর্শনের স্বীকৃত এই সত্য আরো বেশী সুপরিস্ফুট যে, বিশ্বজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বের ধারণা অর্থহীন। বাস্তবিক পক্ষে ভারতবর্ষ পাশ্চাত্ত্য জগৎকে এই কথা শিখিয়েছে যে মানুষ সমস্ত সৃষ্টি হতে পৃথক নয়, সমস্ত সৃষ্টির সঙ্গেএকাত্ম। মানুষের সেবা ও ভোগের জন্য অন্য সমস্ত জীব নির্দিষ্ট হয় নি; মানুষ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে একাত্মবন্ধনে যুক্ত এবং পরমাত্মার অচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবেই তার সার্থকতা। এই সামগ্রিক দৃষ্টি যিনি লাভ করেছেন তিনিই শান্ত, নির্ভীক, সুস্থ, স্থিতধী ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যে তিনিই সার্থক। তিনি সমাজের সঙ্গে সুসঙ্গত সম্বন্ধে যুক্ত হয়েও মুক্ত ও স্বাধীন।[৭]

৭ জেন্ বুদ্ধ মতে এই স্বাধীন আত্মার স্বরূপ এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

He walks always by himself, goes about always by himself; every perfect one saunters along one and the same pa sage of nirvana, His tone is classical, his spirit is transparent, his airs are naturally elevated. His features are rather gaunt, his bones are firm, he pays no attention to others.

ফ্রএড-এর পরবর্তী বহু মনোবিকলক ফ্রএড-এর চিন্তার এই দুর্বলতা দূর করতে চেষ্টা করেছেন। ফ্রএড-এর ব্যক্তি নিতান্তই নিঃসঙ্গ। বৃহৎ পরিবেশের সঙ্গে তার কোন নিবিড় যোগ নেই। ফ্রএড্ ব্যক্তির মনের সমস্ত অসুস্থতার মূল খুঁজেছেন তার ক্ষুদ্র পরিবারের সংকীর্ণ গণ্ডিতে, বাল্যকালে তার পিতা ও মাতার সঙ্গে অস্বাভাবিক এবং অ-তৃপ্তিকর সম্বন্ধে। কিন্তু য়ুঙ্গ, অ্যাড্লার থেকে শুরু করে বর্তমানে হর্নি, ফ্রোম্, বেণ্টলী এ কথা জোর দিয়ে বলছেন ব্যক্তির আদিম কাম বা তার মানসশক্তি-র (psycho) রহস্যকে শুধুমাত্র ব্যক্তি-গত নির্জ্ঞান এবং তার সংকীর্ণ বাল্যজীবনের মধ্যে খুঁজলেই চলবে না; বৃহত্তর এমন কি, সামগ্রিক সংস্কৃতিগত পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে, কখনোই তার মানসিক অশান্তি ও ব্যক্তিত্বের বিকারের সংশোধন সম্ভব হবে না।[৮] মনোবিকলনের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার ব্যতিরেকে তা ব্যক্তিজীবনের সংকীর্ণ গোলকধাঁধার মধ্যেই নিষ্ফল ভাবে ঘুরে মরবে। সেদিক থেকে ফ্রএড-এর চিন্তা প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগতিবিরোধী।[৯]

যখন পাশ্চাত্ত্য মনোবিকলনবাদীরা সমাজের দাবির সঙ্গে ব্যক্তির ব্যবহারের সামঞ্জস্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন, তখন তার মধ্যেও কিছুটা অসম্পূর্ণতা ও বিপদের আশঙ্কা আছে। কোন ব্যক্তি অব্যবস্থিত কিনা, তার বিচার করে সমাজ, এবং এই বিচারের মাপকাঠি হল গোষ্ঠীর নিজের দ্বারা গৃহীত,

৮ Our mistake has been to suppose that the individual is honoured and his uniqueness enhanced by emphasizing his separation from the surrounding world or his eternal difference in essence from his Creator, As well honour the hand by lopping it from the arm. But when Spinoza said that "the more we know of particular things the more we know of God", he was anticipating our discovery that the richer and more articulate our picture of man and of the world becomes, the more we become aware of the relativity and of all the interconnections of all its patterns in an undivided whole, Ibid, p, 24

৯ এ সম্বন্ধে একজন আধুনিক মনোবিকলক পণ্ডিতের মত :

There is a certain loss of insight in the tendency of psycho-analysis to isolate the individual from culture. Once we recognize the limitations of talk from the couch or rather once we recognize that the talk from the couch is still an activity in culture, it becomes plain that there is nothing for the psycho-analyst to analyse except these cultural projections—the world of slums and telegrams and newspapers and thus psychoanalysis fulfils itself only when it becomes historical and cultural analysis. Norman. O. Brown—Life Against Death: The Psychoanalytical Meaning of History, pp. 170.71

প্রচলিত এবং নিজ স্বার্থ দ্বারা শাসিত কতকগুলি বিশ্বাস, সংস্কার, বিধিব্যবস্থা বা আদর্শ। ব্যক্তি তা বিনা বিচারে অনুসরণ করছে কিনা তা দিয়েই বিচার হবে তার সুস্থতা। কিন্তু সমাজের এই প্রচলিত বিশ্বাস ও ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে বহু আত্মবিরোধ, চিন্তাহীন নির্বুদ্ধিতা ও নির্মম আদর্শহীনতা। সে জন্যে বিবেকবান ও বুদ্ধিমান, আত্মসম্মানযুক্ত অনেক ব্যক্তি সমাজের দাবির সঙ্গে নিজেকে সহজে মানিয়ে চলতে পারে না। এবং এই মানিয়ে চলতে না পারলেই ব্যক্তিকে উন্মাদ, বাতুল বলে নিন্দিত হতে হয়। এটা অবশ্যই প্রকৃত মানসিক সুস্থতার লক্ষণ হতে পারে না। তাই আধুনিক এই জটিল ও কৃত্রিম সমাজ-ব্যবস্থায় অনেক ব্যক্তি সহজ শান্তির পথ খুঁজে নিচ্ছে বুদ্ধিবেবেচনাহীন বাধ্যতা দ্বারা, গড্ডলিকা-প্রবাহে বিনা চিন্তায় গা ভাসিয়ে দিয়ে। তারা বিবেক ও ব্যক্তিত্বের মূল্যে নির্বোধ আপাত শান্তি ও আরাম ক্রয় করছে। আর যারা এটা সহজে মেনে নিতে পারছে না, তারা বারে বারে ঘা খাচ্ছে, বিভ্রান্ত হচ্ছে এবং অবশেষে তার পরিবেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পেরে, বায়ুরোগী ও বাতুলদের সংখ্যা বৃদ্ধি করছে। বর্তমানে কৃত্রিম, উত্তেজনা-বহুল, বহির্মুখী, প্রতিযোগিতা-ভিত্তিক, ক্রমশ অতিরিক্ত, জটিল সমাজ-ব্যবস্থাই মানসিক অসুস্থতা-সৃষ্টির একটি প্রধান উর্বর ক্ষেত্র। তাই পাশ্চাত্যদেশে দেখতে পাচ্ছি উত্তরোত্তর মানসিক রোগীদের জন্য চিকিৎসালয়, পরামর্শ-কেন্দ্র স্থাপন করেও ক্রমশই মানসিক অব্যবস্থিততা বেড়েই যাচ্ছে। চিকিৎসার চেয়ে বড় প্রয়োজন, নিবারণের—সমাজের সুস্থতর সরলতর শান্তি ও সমতার অনুকূল, নতুন স্বাভাবিক সমাজ-ব্যবস্থা সংগঠনের।

সম্ভোগ ও শক্তিলাভের উদ্দেশ্য নিয়ে শিল্পসমৃদ্ধি-ভিত্তিক, তীব্র প্রতিযোগিতামূলক যে জটিল সমাজ-ব্যবস্থা পাশ্চাত্য সভ্যতা গড়ে তুলছে, তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, ক্ষমাহীন শ্রেণীসংঘর্ষ, উগ্র জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম। প্রচারপটু, সর্বগ্রাসী, ক্ষমতালোলুপ, আধুনিক জড়বাদী রাষ্ট্রে ব্যক্তির বিবেক ও স্বাধীন চিন্তার আকাঙ্ক্ষা পদে পদে ক্ষুণ্ণ না হয়ে পারে না। তার ফলে ব্যক্তি-সত্তার মূল ক্ষয়প্রাপ্ত হতে বাধ্য এবং তার আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও আত্মমর্যাদা-বোধ পদে পদে ক্ষুণ্ণ ও বিঘ্নিত হবেই।

আধুনিক মানুষের এই বিষম সংকট যে একদিকে বিজ্ঞানের প্রয়োগে

জড়শক্তির ব্যবহার দ্বারা বিপুল শক্তিসম্পন্ন জড় পরিবেশ গড়ে তুলেছে যা তাকে সর্বদা উদ্বিগ্ন করছে। অন্যদিকে সে গড়ে তুলেছে ক্ষমতা ও ভোগ লোলুপ এক সুসংগঠিত নির্মম সমাজব্যবস্থা যা তাকে অহরহ আঘাত ও উত্তেজিত করছে। তাই আধুনিক মানুষ তার কৃত্রিম পরিবেশের মধ্যে নিজেকে নিতান্ত নিঃসঙ্গ, বিব্রত বোধ করছে। বিশ্বজগতের সঙ্গে তার জীবন্ত যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে—আজ সর্বংসহা স্নেহকরুণাশীতলা ধরিত্রী মায়ের কোলে আশ্রয় নিয়ে সে তার দেহ মন আত্মার তৃপ্তির একটি নিরাপদ ধ্রুব আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছে না। পাশ্চাত্য সভ্যতার মস্ত অভিশাপ,—নিঃসঙ্গতা ও বিচ্ছিন্নতা। এই মূল ব্যাধির চিকিৎসা না করে ক্ষতে কিছু বাহ্য প্রলেপের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, মনোবিকলনের পদ্ধতি -দ্বার', মানসিক চিকিৎসালয় স্থাপন করে।

আধুনিক সভ্যতার ভোগবাদী ও খণ্ডিত জীবনদর্শনের পরিবর্তন না হলে মানুষের নিষ্কৃতি নাই। হয়তো এই ব্যাপারে পাশ্চাত্যদেশ প্রাচ্য দর্শনের নিকট থেকে কিছু শিক্ষালাভ করতে পারে। ভারতীয় উপনিষদ্ এই শিক্ষাই দিয়েছে যে সমগ্র বিশ্বজগৎ একই জীবন্ত প্রেমময় সত্তার প্রকাশ—অমৃতের সন্তান মানুষ, সেই সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তার সূত্রে যুক্ত হয়েই শুধু প্রাণরস ও শান্তিলাভ করতে পারে। পশু পাখী কীট পতঙ্গ এমন কি উদ্ভিদ ও তথাকথিত জড়বস্তু সকলেই সেই একই ব্রহ্মের প্রসাদ বহন করছে—সকলের সঙ্গেই মানুষের প্রাণের যোগ রয়েছে, সকলের সম্বন্ধেই তার কর্তব্য রয়েছে, আর সকলের ঘরেই রয়েছে তার সাদর আমন্ত্রণ—সেই আনন্দময়ের লীলা খেলায় সবারই ডাক পড়েছে। ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকেই রয়েছে সেই প্রাণপ্রদ আনন্দের মন্ত্র :

ঈশাবাস্যমিদম্ সর্বম্ যৎ কিঞ্চ জগত্যাংজগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধ কস্যসিদ্ধনম্ ॥

এই বিশ্বজগৎ সেই ঈশ্বর দ্বারাই পরিব্যাপ্ত—এই জগতের সমস্ত দ্রব্যের মধ্যেই রয়েছে সেই পরমপুরুষেরই অধিষ্ঠান। এই জগতের সমস্ত ভোগকে তাঁরই প্রসাদ হিসাবে বিনম্র হয়ে গ্রহণ কর, কারো ধনে লোভ কোর না। ভারতীয় ঋষির গভীর সত্যোপলব্ধিতে মানুষের বাহ্যজগৎ ও জীবজগতের সঙ্গে নিবিড় যোগের কথাই স্পষ্ট করে বলা হয়েছে এবং সুস্থ জীবনের অভ্রান্ত পথনির্দেশ করা হয়েছে। ভারতীয় ঋষি আশ্রম ও বৃত্তি-বিভাগ করে

মানুষকে সেই সংযোগ-সাধনের বাস্তব পথেরই সন্ধান দিয়েছেন। হয়তো বর্তমানের পরিবর্তিত অবস্থায় প্রাচীন ভারতীয় সমাজচিন্তার বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব নয় কিন্তু তাঁদের চিন্তার মূলে এমন সত্য রয়েছে যা সর্বমানবের সর্বদেশের, সর্বকালের। ভারতীয় চিন্তায় সমাজের ব্যবহারিক মূল্য এবং মানুষের সামাজিক দায়িত্বের কথা সম্পূর্ণভাবেই স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু এ কথাও স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে সমাজের রীতি-নীতি-শাসন সবই হচ্ছে দেশকাল-সাপেক্ষ। সমাজের অনুশাসন ব্যবহারিক জীবনে মূল্যবান হলেও, তা অভ্রান্ত চিরন্তন পারমার্থিক সত্য নয়—তাও মায়ারই খেলা। মানুষকে এই মায়ার খেলায় যোগ দিতে হবে, কিন্তু এই মায়াকে অতিক্রম করে ভূমা ও চিরন্তন ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতাই হবে সমস্ত মানবজীবনের চরম লক্ষ্য।[১০] ভারতীয় চিন্তায় প্রচলিত ধর্মাচার, অর্থ, কাম সকলেরই প্রয়োজন ও আপেক্ষিক মূল্য স্বীকৃত, কিন্তু চিরন্তন মূল্য হচ্ছে মোক্ষে। তাই ব্যক্তিকে সমাজের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে সুখশান্তি ক্রয়ের কথা বলা হয় নি, বলা হয়েছে 'এহ বাহ্য—আগে কহ আর'। আত্মস্থ হওয়াতেই ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠ পরিপূর্ণতা—আর আত্মস্থ হওয়া অর্থই বিশ্বজগতের মূল উৎসের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করা। এই আত্মস্থ হওয়ার পথ দুর্গম। তার জন্যে চাই কঠোর সংযম, অশ্রান্ত আত্মজিজ্ঞাসা ও দুর্গম সাধনা—কিন্তু এ দুর্গমের পথে মানুষকে বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একাই হয়তো চলতে হবে। দাদূ বলেছেন

স্যুরা চঢ়ি সংগ্রাম কৌ পাছা পগ কৌঁ দেই

এ হল বীরদের সাধনার পথ, এখানে কাপুরুষদের স্থান নেই। হয়তো এ চলার পথে পদস্খলন হবে, আসফল্য আসবে, ক্লান্তি আসবে, প্রলোভন আসবে,

[১০] This is just what so many psychotherapists are recognizing and what, at the same time, makes the Eastern ways of liberation so pertinent to their work. For they are dealing with people whose distress arises from what may be termed 'maya', to use the Hindu-Buddhist word whose exact meaning is not merely "illusion" but the entire "world conception of a culture, considered as illusion in the strict etymological sense of a play" (Lat-ludere) The aim of liberation is *not* the destruction of maya, but seeing it for what it is or seeing through it. Play is not to be taken seriously, or in other words, ideas of the world or oneself which are social conventions and institutions are not to be confused with reality. The rules of communication are not necessarily the rules of the universe, and man's is not the role or identity which society thursts upon him. Watts—Psychotherapy. East, West p. 15

পথে পড়ে গিয়ে পায়ে কাদা লাগবে, কিন্তু কবীর বলেছেন "মারগ চলতে জো গিরৈ তাকো নাহী দোস।" পথে চলতে গিয়ে কেউ যদি পড়েও যায়, তাতে কোন দোষ নেই—কারণ চলাই হল প্রাণ, থেমে যাওয়া মানেই মৃত্যু। কবীর তাই আবার বলেছেন—

বহতা পানী নিরমলা বংধা গংদা হোয়।
সাধ তো চালতা ভলা দাগ না লাগৈ কোয়॥

বহমান জলই থাকে নির্মল, বদ্ধ জলই হয়ে ওঠে দূষিত দুর্গন্ধ। সাধকদেরও তাই সচলতাই মঙ্গল, তাতে কোন দোষই তাঁদের স্পর্শ করতে পারে না। ভারতীয় চিন্তা তাই স্থিতিশীলতা এবং জীবন-বিমুখতার আদর্শকে সুস্থতার লক্ষণ বলে গ্রহণ করে নি।

পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানীরা ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাকে অবজ্ঞার চোখেই দেখেছেন। ফ্রএড পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের নিরীক্ষণ-পরীক্ষণ-ভিত্তিক পদ্ধতি -ব্যবহারে যা পাওয়া গেল তাকেই একমাত্র সত্য বলে স্বীকার করেছেন, অতীন্দ্রিয় বা অপ্রাকৃত কোন শক্তিকে বা প্রণালীকে তিনি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছেন। তিনি তাঁর মনোবিকলন-তত্ত্ব এবং মানসিক রোগ-চিকিৎসার পদ্ধতিকে নিতান্তই নির্মম বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্ব হিসাবেই প্রচার করেছেন। কিন্তু কোন গভীর জীবন-জিজ্ঞাসা, কোন অধিবিদ্যার (metaphyics) ভিত্তি স্বীকার তিনি প্রয়োজন বোধ করেন নি। কিন্তু তাঁর 'বৈজ্ঞানিক' মতবাদের যে সুবৃহৎ হর্ম্য তিনি তিলে তিলে আজীবন সাধনায় গড়ে তুলেছিলেন, বিজ্ঞানের নানা দিকে অগ্রগতির সঙ্গে তার কোন কোন অংশ যে নিতান্ত দুর্বল, সেটা বুঝতে পারা যাচ্ছে। ফ্রএড স্বভাবতই ভারতীয় দার্শনিক মত সম্বন্ধে আগ্রহী ছিলেন না এবং সে সম্বন্ধে তাঁর কোন শ্রদ্ধাও ছিল না।

কিন্তু পাশ্চাত্ত্য চিন্তাশীল মানুষদের দৃষ্টি প্রাচ্যের গভীর জ্ঞানভাণ্ডারের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে এবং তাঁরা বুঝতে পারছেন মানবাত্মা সম্বন্ধে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ব্যতীত মানুষের জীবনের দুঃখ ও অশান্তির অবসান কেবলমাত্র 'বৈজ্ঞানিক' পদ্ধতি দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়। ১৯২৯ সালে, য়ুঙ্গ, রিচার্ড ভিল্‌হেলম্ কর্তৃক অনূদিত চৈনিক দর্শনের একটি গ্রন্থের (The Secret of the Golden Flower) দীর্ঘ মনস্তত্ত্ব-মূলক টীকায় স্পষ্টভাবেই এ সত্যটি

স্বীকার করেন।[১১] য়ুঙ্ যে ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং ভারতীয় দর্শন যে তাঁর চিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল, তা আমরা য়ুঙ্গ-প্রসঙ্গ আলোচনাকালে দেখেছি। জেরাল্‌ডিন্ কস্টার ১৯৩৪ সালে তাঁর সুলিখিত গ্রন্থ Yoga and Western Psychology গ্রন্থে অত্যন্ত নিপুণভাবেই প্রমাণ করেন যে যোগদর্শনে যম দম আসন প্রাণায়াম ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ব্যক্তির অস্থির চিত্তবৃত্তির শাসন দ্বারা শান্ত ও সুস্থ ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার যে পথ প্রদর্শন করেন তা 'বৈজ্ঞানিক' পাশ্চাত্ত্য মনোবিদ্যা- নির্দিষ্ট পথের চেয়ে অনেক বেশী সত্য—কারণ, তা ব্যক্তিত্বের মূলকে অনেক বেশী গভীরে অনুসন্ধান করেছে। বৌদ্ধ দর্শন নিয়ে আগ্রহ আরো অনেক পূর্বেই জাগ্রত হয়েছিল। ওল্ডেন্‌বার্গ, হামফ্রিজ্ ইত্যাদি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত বৌদ্ধ দর্শনের বৈজ্ঞানিক ও মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিস্মিত হয়েছিলেন। সুজুকী এবং সোগেন-এর বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন যানের বিস্তৃত আলোচনা ইংরেজীতে প্রকাশিত হওয়ার পর বহু পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মনোবিদ্যা সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এ বিষয়ে শ্রীযুক্তা রীজ ডেভিস-এর Buddhist Psychology (1914) একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তাতে তিনি লিখেছেন, পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের পক্ষে সম্পূর্ণতর দৃষ্টি লাভ করতে হলে অবশ্যই প্রাচ্যের ঋষিদের জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। কারণ হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনে ব্যক্তিত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে যে বিশ্লেষণাত্মক অথচ গভীর চিন্তা রয়েছে তার তুলনা নেই।[১২] মনঃসমীক্ষণের তত্ত্ব যে সম্পূর্ণ নূতন নয়,—পাশ্চাত্ত্য

১১ When I began my life-work in the practice of psychiatry and psychotherapy I was completely ignorant of Chinese philosophy, and it is only later, that my professional experiences have shown me that in my technique I had been unconsciously led along that secret way which for centuries has been the pre-occupatiou of the best minds of the East. Jung in The Secret of the Golden Flower, p. 83

১২ [In the western manuals and special studies on psychology] we find no reference to the patient work of many centuries accomplished by the introspective genius of the East. In this field none have laboured with greater industry and acumen than the Buddhist thinkers whose whole philosophy and therewith also their religion rests on a psychological basis. Not only so, but some of their main contentions are very similar to the later views advanced by the dominant schools of modern research. The work of these profound analysts of the nature of mind, should, therefore, by no means be neglected by modern psychologists and those who are interested in their instructive labours, and who that desires to know himself, can fail to be so interested? Mrs Rhys Davids. Buddhist Psychology, Editor's note.

বিজ্ঞানীদেরও যে প্রাচ্য পণ্ডিতদের কাছে এ বিষয়ে শিক্ষণীয় আছে এরিশ্ ফ্রোম্ ও সুজুকী-র Zen Buddhism & Psychoanalysis (1960) গ্রন্থে তাঁর অকুণ্ঠিত স্বীকৃতি রয়েছে। এ প্রকার সমন্বয়মূলক সর্বাধুনিক পুস্তক হচ্ছে অ্যালান্ ওয়াটস-এর সাইকোথেরাপী ঈষ্ট এ্যাণ্ড ওয়েষ্ট (1963, Mentor Books edition)।

হিন্দু ও বৌদ্ধ ঋষিরা পুনঃ পুনঃ এ কথাটি বলেছেন মানুষের সমস্ত দুঃখ, দুর্দশা ও অশান্তির মূল হচ্ছে অহংকার ও তজ্জনিত অনিয়ন্ত্রিত আকাঙ্ক্ষা। এই অহং-এর ক্ষুদ্র গণ্ডী না ভেঙে ফেললে, এই কোষের আবরণ ছিন্ন করে ভূমার সঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জীবন্ত প্রবাহের উৎসমূলের সঙ্গে যুক্ত হতে না পারলে মানুষের মুক্তি নেই। ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠ মূল্যে বিশ্বাসী অহংবাদী পাশ্চাত্য চিন্তায়, ব্যক্তিত্বের অহং-এর অবসান হচ্ছে মানুষের সর্বাপেক্ষা বড় সর্বনাশ! কিন্তু ভারতীয় দার্শনিক, ব্যক্তির অহংবোধের অবসানের যে আদর্শকে মানুষের চরম মুক্তি বলে বিশ্বাস করেন, তাঁর কাছে এই ব্যক্তিত্বের অবলুপ্তি তো নেতিবাচক পরম শূন্যতা নয়,—বরং তাতেই তো ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ সার্থকতা। পৃথক অহং ব্যক্তিত্বের শেষ কথা নয়; ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠ পরিপূর্ণতা বৃহৎ ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতায়।[১৩] 'কাঁচা আমি'র মৃত্যুতেই হয় পাকা আমি'র প্রতিষ্ঠা। কি করে সেই পরমার্থ লাভ করতে পারা যায় সমস্ত ভারতীয় চিন্তা সেই পথই নির্দেশ করেছে।

১৩ If...we are serious about understanding all we can of personality, its integration and disintegration we must understand the meaning of depersonalization, those experiences in which individual self-awareness is abrogated and the individual melts into an awareness which is no longer anchored upon self-hood. Such experience, are described by Hinduism in terms of the ultimate unification of the individual in the atman, the super-individual cosmic untity which transcends both self-hood and materiality... Some men desire such experiences; others dread them, Our problem here is not their desirability, but the light which they throw on the relativity of our present-day psychology of personality...Some other mode of personality configuration in which self-awareness is less emphasized or even lacking may prove to be the general (or the fundamental). G, Murphy,—Personality: A Bio-social Approach to Origins & Structure, 1947